ত্রয়োদশ বর্ষ

ফাল্গুন, ১৩২২ হইতে মাঘ, ১৩২৩।

সম্পাদক—

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত এম্-এ, বি-এল্

অর্চ্চনা-কার্য্যালয়
১৮ নং পার্ব্বতীচরণ ঘোষের লেন, (অর্চ্চনা পোষ্ট) কলিকাতা
হইতে শ্রীকৃষ্ণদাস ধর কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা
রাধাপ্রসাদ লেন, (সুকিয়া ষ্ট্রীট্) মণিকা প্রেসে
শ্রীউপেন্দ্রনাথ রায় দ্বারা মুদ্রিত।

সহর মফঃস্বল সর্ব্বত্র বার্ষিক মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা মাত্র।

বর্ণানুক্রমিক সূচী।

ত্রয়োদশ বর্ষ]　　ফাল্গুন, ১৩২২।　　[প্রথম সংখ্যা

নৈয়ায়িকের আচার-ব্যবহার।

[লেখক—শ্রীহরিহর শাস্ত্রী।]

এই ভারতবর্ষের মধ্যেই এখন যেমন জাতিভেদে, দেশভেদে ও অন্যান্য নানা অবান্তরভেদে লোকের বেশভূষা ও আচার-ব্যবহারের পার্থক্য দৃষ্ট হয়, অতি পূর্ব্বে দার্শনিকদিগের মধ্যেও যে এইরূপ একটা পার্থক্য ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটী হইতে হরিভদ্রকৃত "ষড়্দর্শন-সমুচ্চয়" নামক যে জৈনগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, সেই গ্রন্থের গুণরত্নসূরিকৃত 'তর্করহস্যদীপিকা' নামক টীকায় কতিপয় দার্শনিকের বেশভূষা ও আচার-ব্যবহারের বিশিষ্ট পরিপাটী লিখিত আছে। এই গ্রন্থে নৈয়ায়িকগণের বৈশিষ্ট্য-সম্বন্ধে যাহা কথিত হইয়াছে, নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইল।

নৈয়ায়িকেরা এক হস্তে দণ্ড, অপর হস্তে অলাবুনির্ম্মিত জলাধার ও পরিধানে কৌপীন ধারণ করেন। ইহাদিগের ভস্মসমাচ্ছাদিত দেহে যজ্ঞোপবীত বিলম্বিত, শীত নিবারণের জন্য ইহারা অনতিবৃহৎ কম্বলমাত্র ব্যবহার করিয়া থাকেন। নৈয়ায়িকেরা ফলমূলভোজী, যথাশক্তি সস্ত্রীক অতিথিসেবা করিয়া থাকেন। অনেকে বিবাহ করেন না, তাঁহারা অরণ্যে বৃক্ষতলে বাস করেন। নৈয়ায়িকদিগের মধ্যে ইঁহারাই উত্তম। ইঁহারা জটাধারী ও পঞ্চাগ্নি-সাধনপর, অতিমাত্র সংযত হইয়া নগ্ন অবস্থায়ও ভ্রমণ করেন।

সকল নৈয়ায়িকই প্রাতঃকালে পাদাদিশৌচ ও দন্তধাবনাদি কার্য্য সমাপনান্তে শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে কণ্ঠাদি দেশে ভস্মদ্বারা তিনটী তিনটী রেখা অঙ্কিত করেন। এই সময়ে অন্তেবাসী শিষ্যেরা গুরুর পাদবন্দনা করিয়া বলেন, "ওঁ নমঃ শিবায়"। গুরু উত্তরে বলেন, "শিবায় নমঃ"। এই নৈয়ায়িকেরা সভায় গিয়া বলেন,—

"শৈবীং দীক্ষাং দ্বাদশাব্দীং সেবিত্বা যোঽপি মুঞ্চতি।
দাসী দাসোঽপি ভবতি সোঽপি নির্ব্বাণমৃচ্ছতি॥"

নৈয়ায়িকেরা ঈশ্বর স্বীকার করেন এবং তাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞ ও সৃষ্টিসংহারাদি কার্য্যের কর্ত্তা বলেন। এই নৈয়ায়িক-সম্মত ঈশ্বরের অষ্টাদশ অবতার;—(১) নকুলী, (২) শোষ্য কৌশিক, (৩) গার্গ্য, (৪) মৈত্রী, (৫) অকৌরুষ, (৬) ঈশান, (৭) পারগার্গ্য, (৮) কপিলাণ্ড, (৯) মনুষ্যক, (১০) কুশিক, (১১) অত্রি, (১২) পিঙ্গল, (১৩) পুষ্পক, (১৪) বৃহদার্য্য, (১৫) অগস্তি, (১৬) সন্তান, (১৭) রাশীকর, (১৮) বিদ্যাগুরু। এই সমস্ত তীর্থাধীশ্বর, নৈয়ায়িকগণের পূজনীয়। এই প্রত্যেক অবতারেরই ভিন্ন ভিন্ন পূজার প্রণিধান আছে। নৈয়ায়িকেরা সম্মুখ ভাগে দেবতার নমস্কার করেন না।

বৈশেষিক-সম্প্রদায়ের বেশভূষা ও আচার-ব্যবহারও নৈয়ায়িকদিগেরই তুল্য। ঈশ্বর-সম্বন্ধেও উভয় সম্প্রদায়েরই এক মত। নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক উভয় দার্শনিককেই 'তপস্বী' সংজ্ঞায় অভিহিত করা হয়। এই তপস্বীরা চারি প্রকার;—শৈব, পাশুপত, মহাব্রতধর ও কালমুখ। এই জন্যই উক্ত হইয়াছে,—

"আধারভস্মকৌপীনজটাযজ্ঞোপবীতিনঃ।
স্বস্বাচারাদিভেদেন চতুর্দ্ধা স্যুস্তপস্বিনঃ।
শৈবাঃ পাশুপতাশ্চৈব মহাব্রতধরাস্তথা।
তুর্য্যাঃ কালমুখা মুখ্যা ভেদা এতে তপস্বিনাম্॥"

এই চারিপ্রকার তপস্বীদিগের মধ্যেও ভরট, ভক্তর ও লৈঙ্গিকাদিভেদে নানা অবান্তরভেদ আছে। ভরটাদি ব্রতের গ্রহণে ব্রাহ্মণাদি বর্ণনিয়ম নাই, শিবের উপর ভক্তি থাকিলেই ভরটাদি নামে অভিহিত হইতে পারে। আচার-ব্যবহারাদি সম্বন্ধে নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকগণের কোনও ভেদ না থাকিলেও নৈয়ায়িকগণ 'শৈব' ও বৈশেষিকগণ 'পাশুপত' নামে আখ্যাত হইয়া থাকেন। এইজন্য ন্যায়শাস্ত্রকে শৈব দর্শন ও বৈশেষিক শাস্ত্রকে পাশুপত দর্শন বলা হয়।

এই পর্য্যন্ত লিখিয়া টীকাকার গুণরত্নসূরি লিখিয়াছেন,—"ইদং ময়া যথা-শ্রুতং যথাদৃষ্টং চাত্রাভিদধে। তত্তদ্বিশেষস্তু তদ্‌গ্রন্থেভ্যো রিজ্ঞেয়ঃ।" অর্থাৎ আমি যেরূপ শুনিয়াছি ও যেরূপ দেখিয়াছি, এস্থানে তদনুসারেই নৈয়ায়িকগণের আচার-ব্যবহারাদি লিখিত হইল; বিশেষ পরিপাটী জানিতে ইচ্ছা কারলে মূল-গ্রন্থ সকল দ্রষ্টব্য।

'তর্করহস্যদীপিকা'কার গুণরত্নসূরি, নৈয়ায়িক বৈশেষিক সম্প্রদায়ের যেরূপ বেশভূষার কীর্ত্তন করিয়াছেন, ন্যায়শাস্ত্রের কোনও মূলগ্রন্থে ইহার কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকেরা যে শিবভক্ত, তাহার প্রমাণ দুর্লভ নহে। বৈশেষিক সূত্রকার মহর্ষি কণাদ যে, শিবের পরমভক্ত ছিলেন এবং তাঁহারই বরপ্রসাদে যে বৈশেষিক শাস্ত্র প্রণয়ন করেন, ইহা বৈশেষিক সূত্রের ভাষ্যকার প্রশস্তপাদাচার্য্যের উক্তিতেই স্পষ্ট জানিতে পারা যায়। ভাষ্যকার গ্রন্থ-শেষে লিখিয়াছেন,—

"যোগাচারবিভূত্যা যস্তোষয়িত্বা মহেশ্বরম্।
চক্রে বৈশেষিকং শাস্ত্রং তস্মৈ কণভুজে নমঃ॥"

[যিনি যোগৈশ্বর্য্যের প্রভাবে শঙ্করকে সন্তুষ্ট করিয়া বৈশেষিক শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন, সেই মহর্ষি কণাদকে নমস্কার করি।]

'কিরণাবলী'কার উদয়নাচার্য্য ও 'উপস্কার'-রচয়িতা শঙ্করমিশ্রও স্ব স্ব গ্রন্থারম্ভে ভাষ্যকারের উক্তিরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন (১)। স্বয়ং মহর্ষি কণাদও, তাঁহার "নাড়ীবিজ্ঞান" গ্রন্থের প্রথম শ্লোকে পঞ্চাননের প্রতি ভক্তি থাকিবার প্রার্থনা করিয়াছেন (২);

সুতরাং মহর্ষি কণাদ যে শিবভক্ত ছিলেন, একাধিক গ্রন্থেই তাহার সুব্যক্ত পরিচয় পাওয়া যায়। এখন মহর্ষি গৌতম শৈব ছিলেন কি না, তাহাই অনু-সন্ধেয়। বাৎস্যায়ন ভাষ্য বা "ন্যায়বার্ত্তিক" প্রভৃতি গ্রন্থে গৌতমের কোনও পরিচয় লিপিবদ্ধ নাই। তবে জরন্নৈয়ায়িক জয়ন্তভট্ট, স্বকৃত "ন্যায়মঞ্জরী"র

---

(১) "স্মর্য্যতে হি যৎ কণাদো মুনির্ম্মহেশ্বরনিয়োগপ্রসাদাবধিগম্য শাস্ত্রং প্রণীতবান।"
—কিরণাবলী।

"শ্রূয়তে হীশ্বরনিয়োগপ্রসাদাবধিগম্য কণাদো মহর্ষিঃ শাস্ত্রং প্রণীতবানিতি।"—উপস্কার।

(২) "যদ্‌বক্ত্রেভ্যঃ পঞ্চসন্ধ্যাগতেভ্যো
জাতা বেদা ঋগ্‌যজুঃসামভেদাঃ।
আয়ুর্ব্বেদাশ্চার্থবেদাশ্চ তস্মিন্
আস্তাং শম্ভৌ শ্রীকণাদস্য ভক্তিঃ॥"

শেষে লিখিয়াছেন যে,—"অর্জ্জুন যেমন কিরাতাকৃতি মহাদেবকে যুদ্ধনৈপুণ্যে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন, সেইরূপ যিনি অনুমানাদির কৌশলে পরিপূর্ণ গভীর ও নির্ম্মল বাক্যের উদ্ভাবনা করিয়া বিচারে ভগবান্ গৌরীপতিকে আপ্যায়িত করেন এবং তাঁহারই নিকটে প্রকৃষ্ট বর প্রাপ্ত হন, যাঁহার চরণ-সরোরুহ, বহু মহর্ষির শীর্ষদেশে সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে, সেই অক্ষপাদ (গৌতম) মুনি সর্ব্বোৎকর্ষের সহিত বিরাজ করিতেছেন (১)।"

ন্যায়দর্শনের প্রথম সূত্রের ব্যাখ্যাবসরে বৃত্তিকার বিশ্বনাথ লিখিয়াছেন যে, "অত্র কেচিৎ সূত্রাদৌ মঙ্গলাকরণেন মঙ্গলং ন প্রামাণিকমিত্যত্র সূত্রকৃতাং তাৎপর্য্যং বর্ণয়ন্তি। তদসৎ, কৃতস্যাপ্যনিবন্ধনসম্ভবাৎ, বিঘ্নাভাবনির্ণয়েনাকরণসম্ভবাচ্চ। বয়ন্তু "প্রমাণং প্রাণনিলয়" ইতি ভগবন্নামগণান্তঃপাতি 'প্রমাণ' শব্দস্যোচ্চারণমেব মঙ্গলমিতি ব্রূমঃ।" অর্থাৎ 'অনেকে বলেন, গৌতমসূত্রের প্রথমে কোনও মঙ্গলাচরণ না থাকায় মঙ্গলাচার যে প্রামাণিক নয়—ইহাই সূত্রকার মহর্ষির অভিপ্রেত। কিন্তু এ সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ, গৌতম হয় ত গ্রন্থ রচনার প্রথমে পরমেশ্বরের প্রণামাদিরূপ মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন,—গ্রন্থে তাহা লিপিবদ্ধ হয় নাই ; অথবা তিনি যোগবলে গ্রন্থ যে নির্ব্বিঘ্নে সমাপ্ত হইবে, ইহা জানিতে পারিয়াই সম্ভবতঃ কোনও মঙ্গলাচরণ করেন নাই। কিন্তু আমরা বলি যে, গৌতম প্রথমে 'প্রমাণ' শব্দের উচ্চারণ করিয়াই মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন। কারণ, "প্রমাণং প্রাণনিলয়ঃ" ইত্যাদি 'বিষ্ণুসহস্রনামে' প্রমাণ যে ভগবান্ নারায়ণের একটী নাম, তাহা কথিত হইয়াছে।' বিশ্বনাথের এই সিদ্ধান্তানুসারে গৌতম যে বৈষ্ণব ছিলেন, তাহা নির্দ্ধারণ করা যায় না। কারণ, এখানে প্রমাণ শব্দে বিষ্ণুর নাম অভিপ্রেত হইলেও তাহা সম্পাতায়াতরূপেই প্রযুক্ত হইয়াছে।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে স্বর্গীয় জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননের সম্পাদকতায় বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটী হইতে সর্ব্বপ্রথম যে বাৎস্যায়ন-ভাষ্য মুদ্রিত হয়, তাহাতে এবং সেই গ্রন্থের আদর্শে মুদ্রিত অন্যান্য বাৎস্যায়ন-ভাষ্যের প্রথমে "ওঁ নমঃ

---

(১) "ন্যায়োদ্গারগভীরনির্ম্মলগিরা গৌরীপতিস্তোষিতো
বাদে যেন কিরীটিনেব সমরে দেবঃ কিরাতাকৃতিঃ।
প্রাপ্তোদারবরস্ততঃ স জয়তি জ্ঞানামৃতপ্রার্থনা
নাম্নাঽনেকমহর্ষিমস্তকবলৎপাদোঽক্ষপাদো মুনিঃ॥"

—ন্যায়মঞ্জরী, ৬৫৯ পৃষ্ঠা।

প্রমাণায়” লিখিত আছে। এই পাঠ প্রকৃত হইলে ন্যায়ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন, ছলতঃ ভগবান্ বিষ্ণুকেই নমস্কার করিয়াছেন, বলিতে হইবে; কিন্তু "ন্যায়-কন্দলী”-প্রণেতা অতি প্রাচীন দার্শনিক শ্রীধরাচার্য্যের উক্তিতে প্রতিপন্ন হয় যে, ন্যায়ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন, লিখিত ভাবে গ্রন্থের প্রথমে নমস্কারাত্মক কোনও মঙ্গলাচরণ করেন নাই (১)। সুতরাং গৌতমসূত্রের ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের গ্রন্থে তাঁহার ইষ্টদেবতার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

কণাদসূত্রের ভাষ্যকার প্রশস্তপাদাচার্য্য স্বকৃত গ্রন্থের প্রথমে মঙ্গলাচরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—

"প্রণম্য হেতুমীশ্বরং মুনিং কণাদমন্বতঃ।
পদার্থধর্ম্মসংগ্রহঃ প্রবক্ষ্যতে মহোদয়ঃ॥”

এই মঙ্গলাচরণে সাধারণভাবে ঈশ্বরের প্রণাম কথিত হইলেও এখানে ঈশ্বর শব্দের প্রতিপাদ্য যে শঙ্কর, তাহা নির্দ্ধারণ করিলে নিতান্ত অপসিদ্ধান্ত হয় না। কেন না, ঈশ্বর শব্দ ব্রহ্মের বাচক হইলেও সামান্য শব্দের বিশেষপরতার স্বীকারানুসারে শিবশরীরধারী দেবতাবিশেষকেই বুঝাইয়া থাকে। এই জন্যই প্রাচীন অভিধানকার অমরসিংহ শিবের পর্য্যায়ে লিখিয়াছেন,—

"ঈশ্বরঃ সর্ব্ব ঈশানঃ শঙ্করশ্চন্দ্রশেখরঃ।”

দ্বিতীয়তঃ উদয়নাচার্য্য স্বকৃত "দ্রব্যকিরণাবলী”তে ভাষ্যকারোক্ত মঙ্গলাচরণ শ্লোকের চরমকল্পে যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে শ্লোকস্থ ‘ঈশ্বর’ শব্দের অর্থ যে শিব, তাহাই অভিব্যক্ত হয়। তিনি কথিত শ্লোকের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন যে, ‘যিনি বৈশেষিক শাস্ত্ররচনার হেতু, সেই ঈশ্বরকে প্রণাম করিয়া আমি গ্রন্থ প্রণয়ন করিতেছি (২)’। বৈশেষিক শাস্ত্ররচনার হেতু যে শঙ্কর—ভূত-ভাবন মহেশ্বরের বরপ্রসাদেই যে বৈশেষিক দর্শন রচিত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণরূপে স্বয়ং ভাষ্যকার প্রশস্তপাদাচার্য্য, উদয়নাচার্য্য ও শঙ্কর মিশ্রের লিখিত সন্দর্ভ, এই প্রবন্ধেই ইতিপূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে।

ন্যায়ভাষ্যের ব্যাখ্যাকর্ত্তা উদ্যোতকর, শৈব ছিলেন, না, বৈষ্ণব ছিলেন—ইহা জানিবার উপায় নাই। কারণ, তাঁহার প্রণীত "ন্যায়বার্ত্তিকে”র প্রথমে

---

(১) "ন চ ন্যায়মীমাংসাভাষ্যকারাভ্যাং ন কৃতো নমস্কারঃ কিন্তু তত্রাপ্যনুপনিবদ্ধঃ।” —ন্যায়কন্দলী, ১ম পৃষ্ঠা।

(২) "প্রস্তুতশাস্ত্রহেতুত্বাদ্ বা হেতুমিত্যাহ। * * *
তেন তং হেতুং প্রণম্য ময়া সংগ্রহঃ প্রবক্ষ্যত ইত্যর্থঃ।”

কোনও মঙ্গলাচরণ শ্লোক লিপিবদ্ধ নাই। কিন্তু বাচস্পতি মিশ্র স্বকৃত "ন্যায়-বার্ত্তিকতাৎপর্য্যটীকা"র প্রথমে বিশ্বসংহারকারী পিনাকীর নামোচ্চারণ করিয়াই মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন (১)। গৌতমসূত্রের তাৎপর্য্য বিবৃতিরূপ "ন্যায়মঞ্জরী" গ্রন্থের আদি অন্তে ও অন্যান্য স্থানে গ্রন্থকার জয়ন্তভট্ট, শঙ্করের নামকীর্ত্তন করিয়াছেন, দেখা যায় (২)। জয়ন্তভট্ট যে ধূর্জ্জটির চরণানুধ্যানে তৎপর ছিলেন, তাহা তিনি গ্রন্থের উপান্ত্য শ্লোকে নিজমুখেই স্পষ্টতঃ প্রকাশ করিয়াছেন (৩)।

প্রশস্তপাদভাষ্যের সর্ব্বপ্রধান টীকাকার শ্রীধরাচার্য্য, পরমব্রহ্মের কোন্ মূর্ত্তির ভক্ত ছিলেন, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। তিনি স্বকৃত "ন্যায়কন্দলী"র দ্বিতীয় ও তৃতীয় মঙ্গলাচরণ শ্লোকে লক্ষ্মীপতি পুরুষোত্তমকে নমস্কার করিলেও চতুর্থ ও সপ্তম মঙ্গলাচরণ শ্লোকে শিবের এবং ষষ্ঠ মঙ্গলাচরণ শ্লোকে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার নমস্কার করিয়াছেন (৪)। পঞ্চম মঙ্গলাচরণ শ্লোকে ত শ্রীধরাচার্য্য

---

(১) "বিশ্বব্যাপী বিশ্বশক্তিঃ পিনাকী বিশ্বেশানো বিশ্বকৃদ্বিশ্বমূর্ত্তিঃ।
বিশ্বজ্ঞাতা বিশ্বসংহারকারী বিশ্বারাধ্যো রাধয়ত্বীহিতং নঃ॥"

(২) "নমঃ শাশ্বতিকানন্দজ্ঞানৈশ্চর্য্যময়াত্মনে।
সঙ্কল্পসফলব্রহ্মস্তম্ভারম্ভায় শম্ভবে॥"
"নমঃ শশিকলাকোটিকল্প্যমানাঙ্কুরশ্রিয়ে।
প্রপন্নজনসঙ্কল্পকল্পবৃক্ষায় শম্ভবে॥"
"যস্যেচ্ছয়ৈব ভুবনানি সমুদ্ভবন্তি তিষ্ঠন্তি যান্তি চ পুনর্বিলয়ং যুগান্তে।
তস্মৈ সমস্তফলভোগনিবন্ধনায় নিত্যপ্রবুদ্ধমুদিতায় নমঃ শিবায়॥" ২০৪ পৃষ্ঠা।
"অলমতিবিততোক্ত্যা ত্যজ্যতাং নিত্যবাদঃ
কৃতক ইতি নয়জ্ঞৈর্গৃহ্যতামেষ শব্দঃ।
সতি চ কৃতকভাবে তস্য কর্ত্তা পুরাণঃ
কবিরবিরলশক্তির্মুক্ত এবেন্দুমৌলিঃ॥"—২৩২ পৃষ্ঠা, ইত্যাদি।

(৩) "বাদেষ্বাপ্তজয়ো জয়ন্ত ইতি যঃ খ্যাতঃ সতামগ্রণী
রন্বর্থো নববৃত্তিকার ইতি যং শংসন্তি নাম্না বুধাঃ।
স্তম্ভব্যাপ্তদিগন্তরস্য যশসা চন্দ্রস্য চন্দ্রত্বিষা
চক্রে চন্দ্রকলাবচূলচরণধ্যায়ী স ধন্যাং কৃতিম্॥"

(৪) ধ্যানৈকতানমনসো বিগতপ্রচারাঃ পশ্যন্তি যং কমপি নির্ম্মলমদ্বিতীয়ম্।
জ্ঞানাত্মনে বিঘটিতাখিলবন্ধনায় তস্মৈ নমো ভগবতে পুরুষোত্তমায়॥"—১ পৃষ্ঠা।
"ওঁ নমো জলদনীলায় শেষপর্য্যঙ্কশায়িনে।
লক্ষ্মীকণ্ঠগ্রহানন্দনিষ্পন্দায়াসুরদ্বিষে॥"—২৪ পৃষ্ঠা।

স্পষ্টভাবে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর—এই ত্রিমূর্ত্তিরই নামকীর্ত্তন করিয়াছেন (১) সুতরাং শ্রীধরাচার্য্য, ভগবানের কোন্ মূর্ত্তির প্রতি সবিশেষ ভক্তিপরায়ণ ছিলেন, তাহা জানিবার উপায় নাই। তবে এটা ঠিক যে, তিনি শিবের বিদ্বেষী ছিলেন না। শিবের প্রতি অভক্তি থাকিলে শ্রীধর গ্রন্থমধ্যে কখনই শিবের নমস্কারাত্মক শ্লোক লিপিবদ্ধ করিতেন না।

"কুসুমাঞ্জলি", "বৌদ্ধাধিকার", "কিরণাবলী", "ন্যায়বার্ত্তিক-তাৎপর্য্য-পরিশুদ্ধি"-প্রমুখ গ্রন্থের প্রণেতা জগদ্‌বিখ্যাত তার্কিক উদয়নাচার্য্য যে পরম শৈব ছিলেন, তাহা তাঁহার প্রধান গ্রন্থ "কুসুমাঞ্জলি"র "তস্মিন্নেবং জাতিগোত্রপ্রবরচরণকুলধর্ম্মাদিবদাসংসারং সুপ্রসিদ্ধানুভবে ভগবতি ভবে সন্দেহ এব কুতঃ", "বিশ্বাসৈকভুবং শিবং প্রতি নমন্ ভূয়াসমন্তেষ্বপি", "তন্মে প্রমাণং শিবঃ"—ইত্যাদি লিপি দেখিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

নব্যন্যায়ের প্রথম প্রবর্ত্তয়িতা গঙ্গেশোপাধ্যায়ও শিবেরই ভক্ত ছিলেন। তিনি তাঁহার "তত্ত্বচিন্তামণি"র মঙ্গলাচরণ শ্লোকে কৃপাপারাবার মহেশ্বরকেই নমস্কার করিয়াছেন (২)। গঙ্গেশোপাধ্যায়ের স্বানুরূপ পুত্র বর্দ্ধমানোপাধ্যায়ও শিবভক্ত ছিলেন। কারণ, তিনি স্বরচিত "কুসুমাঞ্জলিপ্রকাশ" ও "কিরণাবলীপ্রকাশ" গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ শ্লোকে ভূতভাবন মহাদেবের প্রতিই স্তুতিগীতির প্রকাশ করিয়াছেন (৩)।

"জগদঙ্কুরবীজায় সংসারার্ণবসেতবে।
নমোজ্ঞানামৃতস্যন্দিচন্দ্রার্দ্ধেন্দুমৌলয়ে॥"—২৯০ পৃষ্ঠা।
"অন্তর্ধ্বান্তভিদে বিশ্বসংহারোৎপত্তিহেতবে।
নির্ম্মলজ্ঞানদেহায় নমঃ সোমায় শম্ভবে॥"—৩২৫ পৃষ্ঠা।
"চতুর্ব্বর্গচতুর্ব্বিদ্যাচতুর্ব্বর্ণবিধায়িনে।
নমঃ পঞ্চমুখায় চতুর্মুখভৃতে সদা॥"—৩২২পৃষ্ঠা।

(১) "জয়ন্তি জগদুৎপত্তিস্থিতিসংহৃতিহেতবঃ।
বিশ্বস্য পরমাত্মানো ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ॥"—৩১২ পৃষ্ঠা।

(২) "গুণাতীতোঽপীশস্ত্রিগুণসচিবস্ত্র্যক্ষরময়
স্ত্রিমূর্ত্তির্যঃ সর্গস্থিতিবিলয়কর্ম্মাণি তনুতে।
কৃপাপারাবারঃ পরমগতিরেকস্ত্রিজগতাং
নমস্তস্মৈ কস্মৈচিদমিতমহিম্নে পুরভিদে॥"

(৩) "ভক্তানাং কামদস্তুষ্টো রুষা কামং দহন্নপি।
অপি জ্ঞানময়ঃ স্থাণুর্বস্তমীশং স্তবীমহি॥"

"কিরণাবলীপ্রকাশে"র অন্যতম ব্যাখ্যাকর্ত্তা ভগীরথ ঠক্কুর নিজনির্ম্মিত "কিরণাবলীপ্রকাশপ্রকাশিকা" গ্রন্থের প্রথমে নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করিলেও * উপসংহারে করুণাময় শঙ্করের কাছেই কাতর প্রার্থনা জানাইয়াছেন †।

অসাধারণ নৈয়ায়িক পক্ষধর মিশ্র, স্বকৃত "প্রসন্নরাঘব" নাটকের প্রস্তাবনায়—

"লক্ষ্মণস্যেব যস্যাস্য সুমিত্রাকুক্ষিজন্মনঃ।
রামচন্দ্রপদাম্ভোজে ভ্রমদ্ভৃঙ্গায়তে মনঃ॥"

—এই শ্লোকে শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি নিজের অতিমাত্র ভক্তি প্রদর্শন করিলেও তিনি মহাদেবের অভক্ত ছিলেন না। কারণ, পক্ষধর, যে গ্রন্থ রচনা করিয়া বিশ্ববিখ্যাত হইয়াছেন, "তত্ত্বচিন্তামণি"র সেই 'আলোক' নামক টীকার মঙ্গলাচরণে তিনি গৌরীপতির পবিত্র নামের কীর্ত্তন করিয়াছেন (১)।

বঙ্গগৌরব রঘুনাথ শিরোমণি, পরমেশ্বরের কোন্ মূর্ত্তির উপাসক ছিলেন, স্পষ্টভাবে তাহা জানিতে পারা যায় না। তিনি "তত্ত্বচিন্তামণি"র 'দীধিতি' নামক টীকায় যে মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন, তাহাতে কোনও ধরা ছোঁয়া দেন নাই,—সাধারণভাবে বিশ্বনিয়ন্তা পরমাত্মাকে নমস্কার করিয়াছেন। রঘুনাথের মঙ্গলাচরণ শ্লোকটী এই,—

"ওঁ নমঃ সর্ব্বভূতানি বিষ্টভ্য পরিতিষ্ঠতে।
অখণ্ডানন্দবোধায় পূর্ণায় পরমাত্মনে॥"

"মিলন্মন্দাকিনীমল্লীদামাং মূর্দ্ধ্নি পুরদ্বিষঃ।
বিশ্ববীজাঙ্কুরপ্রখ্যাং বৈধবীং তাং কলাং স্তুমঃ॥"

* "কৈশোরং কলয়ন্তং মায়াকায়ং পুরাতনং পুরুষম্।
নন্দালিন্দনিকেতং নিগমরহস্যং নমস্যামি॥"

† হংহো গিরীশ করুণাময়মানসোঽসি
কিং মাং মুহুঃ ক্ষিপসি দুঃখময়ে শরীরে।
মৎকর্ম্ম তাদৃশিতি চেন্ননু চন্দ্রচূড়
তৎ কর্ম্ম কারয়সি কিং হতচেতসং মাম্॥"

(১) "বক্ত্রাণি পঙ্কুচয়োঃ প্রতিবিম্বিতানি
দৃষ্ট্বা দশাননসমাগমনভ্রমেণ।
ভূয়োঽপি শৈলপরিবৃত্তিভয়েন গাঢ়
মালিঙ্গিতো গিরিজয়া গিরিশঃ পুনাতু॥"

রঘুনাথ অন্যান্য যে সকল গ্রন্থ লিখিয়াছেন, প্রত্যেক গ্রন্থে এই একই মঙ্গলাচরণ শ্লোকের ব্যবহার করিয়াছেন। তবে তিনি মিথিলায় গিয়া পক্ষধর মিশ্রের নিকটে স্বীয় গর্ব্বসূচক যে কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, সেই কবিতাপাঠে তাঁহার কৃষ্ণভক্তিরই পরিচয় পাওয়া যায় (১)।

"তত্ত্বচিন্তামণি"র 'রহস্য' নামক টীকার লেখক ও অন্যান্য নানা গ্রন্থের টীকাকার মথুরানাথ তর্কবাগীশও বোধ হয় কৃষ্ণভক্ত ছিলেন। কারণ, তিনি রহস্যে'র মঙ্গলাচরণে স্বীয় পিতাকে নমস্কার করিলেও "বৌদ্ধাধিকারে"র টীকা, 'গুণপ্রকাশবিবৃতি"র টীকা প্রভৃতি গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে মুরলীধর কৃষ্ণেরই নামোচ্চারণ করিয়াছেন (২)।

ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ, শিরোমণি-কৃত অনুমানখণ্ডীয় "দীধিতি"র ব্যাখ্যায় কোনও দেবতাকে নমস্কার না করিয়া স্বীয় গুরুকুলকে নমস্কার করিয়াছেন (৩)। কিন্তু তাঁহার রচিত "কারকচক্রে"র প্রথমে কৃষ্ণ-চরণাম্বুজের নমস্কারাত্মক মঙ্গলাচরণই দৃষ্ট হয় (৪)। সুতরাং ভবানন্দেরও কৃষ্ণভক্তিরই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

ভবানন্দের ছাত্র, জগদীশ তর্কালঙ্কার, "দীধিতি"র টীকার প্রারম্ভে শ্রীকৃষ্ণের শৈশব মূর্ত্তির স্মরণ করিয়াছেন (৫)। তাঁহার রচিত "শব্দশক্তিপ্রকাশিকা"র প্রথমে বাগ্‌দেবতা সরস্বতীর স্মরণাত্মক মঙ্গলাচরণ দৃষ্ট হয়। বর্ত্তমান প্রবন্ধলেখকের নিকটে একখানি প্রাচীন হস্তলিখিত "শব্দশক্তিপ্রকাশিকা" আছে; তাহার প্রারম্ভে নিম্নলিখিত শ্লোকটী অধিক দেখিতে পাওয়া যায়,—

(১) "কাব্যেঽপি কোমলধিয়ো বয়মেব নান্যে
তর্কেঽপি কর্কশধিয়ো বয়মেব নান্যে।
তন্ত্রেঽপি যন্ত্রিতধিয়ো বয়মেব নান্যে
কৃষ্ণেঽপি সংযতধিয়ো বয়মেব নান্যে॥"

(২) "কুঞ্চিতাধর পুটেন পুরয়ন্ বংশিকাং প্রচলদঙ্গুলিপঙ্‌ক্তিঃ (?)।
মোহয়ন্নখিলবামলোচনা পাতু কোঽপি নবনীরদচ্ছবিঃ॥"

(৩) "নমস্কৃত্য গুরূন্ সর্ব্বান্ নিগূঢ়ং মণিদীধিতৌ
শ্রীভবানন্দসিদ্ধান্তবাগীশেন প্রকাশ্যতে॥"

(৪) "নত্বা কৃষ্ণপদদ্বন্দ্বং কারকাদ্যর্থনির্ণয়ঃ।
শ্রীভবানন্দসিদ্ধান্তবাগীশেন বিতন্যতে॥"

(৫) সস্মিতাননসরোজমঙ্গনে রিঙ্গমানমতিলোলকুন্তলম্।
রোচনোল্লসিতভালমস্তু মে কৈশবং মনসি শৈশবং বপুঃ॥"

"কর্পূরকুন্দকুমুদকৈলাসোদরসোদরম্।
বিঘ্নবিধ্বংসকং ধাম নমামঃ শৈবদৈবতম্॥"

শ্লোকটীতে বিঘ্নবিধ্বংসকারী শুভ্রবর্ণ শৈব তেজের নমস্কার লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং অনুমিত হয়, জগদীশ, শিবের অভক্ত ছিলেন না।

ন্যায়শাস্ত্রের অন্তিম গ্রন্থকার, গদাধর ভট্টাচার্য্য, নব্যন্যায়ের প্রত্যক্ষখণ্ডের অন্তর্গত "প্রামাণ্যবাদে"র 'দীধিতি'র টীকার প্রথমে নন্দনন্দনকে নমস্কার করিলেও (১) অনুমান-খণ্ডের 'দীধিতি'র আখ্যার প্রারম্ভে সসমাদরে মহাদেবের পাদপদ্ম বন্দনা করিয়াছেন (২)। কাজেই বুঝিতে পারা যায় যে, গদাধর, শিবের প্রতি অভক্তি করিতেন না।

বৈশেষিক সূত্রের 'উপস্কার' নামক ব্যাখ্যার রচয়িতা শঙ্করমিশ্রও শিবের ভক্ত ছিলেন। 'উপস্কারে'র প্রথমে মহাদেবের নমস্কারাত্মক ও তৎকৃত "বাদি-বিনোদ" গ্রন্থের প্রারম্ভে হরপার্ব্বতীর লীলাবর্ণনাত্মক মঙ্গলাচরণ অনুষ্ঠিত হইয়াছে (৩)।

প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন, "ন্যায়সূত্রবৃত্তি"র ও "ভাষাপরি-চ্ছেদে"র প্রথমে সজলজলদশ্যামল শ্রীকৃষ্ণের নামকীর্ত্তন করিয়া মঙ্গলাচরণ করিলেও "সিদ্ধান্তমুক্তাবলী"র প্রারম্ভে মঙ্গলের আকাঙ্ক্ষায় মহাদেবের নামো-চ্চারণ করিয়াছেন (৪)।

---

(১) "নত্বা নন্দতনুজসুন্দরপদং স্মৃত্বা গুরোরাদরা
দুর্ব্বীমণ্ডলমণ্ডনায়িতযশোরাশেরশেষা গিরঃ।
সংক্ষিপ্তোক্ত্যতিদক্ষদীধিতিকৃতঃ প্রত্যক্ষচিন্তামণে
র্ব্যাখ্যাং ব্যাকুরুতে গদাধরসুধীর্মোদায় বিদ্যাবতাম্॥"

(২) "অভিবন্দ্য মুহুঃ সমাদরাৎ পদপাথোজযুগং পুরদ্বিষঃ।
বিবৃণোতি গদাধরসুধীরতিদুর্ব্বোধগিরঃ শিরোমণেঃ॥"

(৩) "উদ্বদ্ধজটাজূটক্রোড়ক্রীড়ৎসুরাপগম্।
নমামি যামিনীকান্তকান্তভালস্থলং হরম্॥"—উপস্কার।
"জয়তি রতিবিলাসে সাগসঃ শঙ্করস্য
স্মরনিগড়নিবদ্ধঃ কাঞ্চনঃ শৈলপুত্র্যাঃ।
গরলকবলকালীভূতভূতেশকণ্ঠ
স্থলজলধরবিদ্যুদ্বিভ্রমা বাহুবল্লী॥"

(৪) চূড়ামণীকৃতবিধুর্ব্বলয়ীকৃতবাসুকিঃ।
ভবো ভবতু ভব্যায় লীলাতাণ্ডবপণ্ডিতঃ॥"

"কুসুমাঞ্জলি"র টীকাকার রামভদ্র সার্ব্বভৌমও স্বীয় গ্রন্থের প্রথমে মঙ্গলাচরণরূপে শঙ্করেরই লীলা বর্ণনা করিয়াছেন (১)।

এই সকল ন্যায় বৈশেষিক গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ শ্লোক দৃষ্টি করিলে স্পষ্টই অনুভূত হয় যে, নৈয়ায়িক বা বৈশেষিকেরা অবচ্ছেদাবচ্ছেদে শৈব না হইলেও শিবের অভক্ত কেহই ছিলেন না। সুতরাং "ষড় দর্শনসমুচ্চয়ে"র টীকাকার গুণরত্নসূরি, নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকগণকে যে শৈব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা একেবারে অমূলক নহে। নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকের মধ্যে দুই একজন অন্য দেবতার ভক্ত হইলেও অধিকাংশই শিবের প্রতি নিরতিশয় প্রীতিপরায়ণ ছিলেন।

যাঁহার দেহের সঙ্গে সঙ্গে নৈয়ায়িকতা অন্তর্হিত হইয়াছে, সৌভাগ্য বশতঃ সেই বিশ্বপূজ্য নৈয়ায়িকচূড়ামণি মহামহোপাধ্যায় ৺রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়ের চরণচ্ছায়ায় আশ্রয়লাভ করিতে পারিয়াছিলাম। তিনি যে শিবের একজন পরমভক্ত ছিলেন, ইহা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে লক্ষ্য করিয়াছি। প্রতিদিন শিবপূজার সময়ে 'শিব' 'শিব' বলিতে বলিতে তিনি তন্ময় হইয়া যাইতেন,—নিরন্তর অশ্রুধারায় তাঁহার বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইত। এই মহাপুরুষের রচিত শিবভক্তিসূচক একটী শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধ সমাপ্ত করিলাম।

"স্থাণো বিদ্ধি ন বা ভবান্বিতরণৈস্ত্বন্নামসঙ্কীর্ত্তনৈ
স্বদ্ধ্যানৈশ্চ মুদং সমেত্য সময়ং সংযাপয়ামো বয়ম্।
শ্রীখণ্ডাচলচারুচন্দনতরোর্মন্দানিলৈঃ সৌরভং
জিঘ্রন্ মোদভরং বিভর্ত্তি কিমিদং বিজ্ঞাদয়ং পাদপঃ॥"

৺৩৮

(১) "আমোদৈঃ পরিতোষিতাঃ পরিষদঃ প্রত্যেকমাশাভৃতাং
সান্দ্রৈঃ পিঞ্জরিতাঃ পরাগপটলৈরাশাবকাশা দশ।
আহুতা মকরন্দবিন্দুনিকরৈঃ পুষ্পন্ধয়শ্রেণয়ো
যেনাহার্য্য স বঃ পুনাতু নটতঃ শম্ভোঃ প্রসূনাঞ্জলিঃ॥"

তৃষা।

[লেখক—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত, এম-এ, বি-এল।]

(১)

আমার বৃদ্ধা পিতামহী শ্রীক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া যত গল্প বলিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে জগন্নাথদেবকে কামরাঙ্গা অর্পণের গল্পটা আমার বড় রহস্যময় বলিয়া বোধ হইয়াছিল। আমরা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—"ঠাকুমা, এত ফল থাকৃতে জগন্নাথকে কামরাঙ্গা ফল দিলে কেন?" ঠাকুরমা দন্তবিহীন মুখে একমুখ হাসিয়া বলিয়াছিলেন—"কি জানিস্ রে ভাই, যে ফল খাবার দরকার হয় না লোকে সেই ফলই জগন্নাথদেবকে দেয়।" আমি তৃতীয়বার এণ্ট্রেন্স পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হওয়ায় যখন পিতা বলিলেন—'যাক্ আমার অন্য ছেলেগুলোতো ভাল হ'য়েছে, নসুর পয়সায় আমার দরকার কি?'—তখন আমার ঠাকুরমার কামরাঙ্গার গল্প মনে পড়িল। কিন্তু অন্যান্য ভাইগুলি উকীল, মুনসেফ, ডেপুটি প্রভৃতি হইয়া সম্মানিত হইবে অথচ আমি একেবারে সওদাগরি অফিসে টাইপরাইটার হইব, পিতা সেটা মোটেই পছন্দ করিলেন না। তিনি বলিলেন—'নসু জাতব্যবসা করুক, কবিরাজ হ'ক।' কিন্তু শর্ম্মা নশীরামের যে রকম জোর মেধা তাহাতে সে কার্য্যেও সে সফল হইবে না, এইরূপ হিসাব করিয়া পরমারাধ্য পিতৃদেব হানিমানরূপ জগন্নাথদেবকে এই কামরাঙ্গাটি অর্পণ করিলেন। আমি কলিকাতার একটি হোমিওপ্যাথিক স্কুলে যথাসাধ্য চিকিৎসা-পদ্ধতি আয়ত্ত লাভ করিতে সচেষ্ট হইলাম।

ডাক্তার হইয়া ছোট ছোট শিশি সাজাইয়া যখন দেশে চিকিৎসা করিতে বসিলাম, তখন মনে বড় ধিক্কার হইল—কেন লেখাপড়া শিখিলাম না। দেশের চাষাভূষা মুটে মজুর কেহই আমার ঔষধ পান করিয়া সন্তুষ্ট হইত না। যে খুব সাহসী সে বলিত—'ছোটবাবু এ কেমন ওবুধ গো, এর তো কোন ঝাঁঝ নেই।' আর যে সাহস করিয়া সম্মুখে ঐরূপ কথা বলিতে পারিত না, সে মনে মনে ঐ কথা ভাবিয়া শিশির জল ফেলিয়া দিত এবং আমা অপেক্ষাও হাতুড়ে 'এলোপাথি' ডাক্তারের ঝাঁঝাল ঔষধ পান করিত। দেশের শত্রুপক্ষ এবং জ্ঞাতিবর্গ আমাকে হুমোপাথি, হৈমবতী, হোমপাতি. শেষে পাত্তিনেবু অবধি বলিয়া শ্লেষ করিত।

(২)

একদিন পিতার এক কলিকাতার বন্ধু আসিয়া বলিলেন যে, আমার পক্ষে কলিকাতায় প্র্যাক্‌টিস করা শ্রেয়ঃ। তিনি বলিলেন—'কলিকাতায় পয়সা ছড়ান আছে। যার কলকাতায় অন্ন হয় না তার কোথাও অন্ন নেই।'

বাস্তবিক সেই কথায় কলিকাতায় আসিয়া আমার জীবনের পরিবর্ত্তন ঘটিল। ভাল পোষাক-পরিচ্ছদ পরিতাম, একটু জাঁক-জমকের সহিত গৃহসজ্জা করিতাম, খুব গম্ভীরভাবে ললাট কুঞ্চিত করিয়া রোগের লক্ষণ শুনিতাম। তাহাতে কিছু কিছু উপার্জ্জন হইতে লাগিল। তিন বৎসর পরে আর পিতার নিকট হইতে সাহায্য না লইয়া বাসা খরচ চালাইলাম। চতুর্থ বৎসরে স্ত্রীকে কলিকাতায় আনিলাম।

একদিন বেলা এগারটার সময় চিকিৎসালয়ে বসিয়া নিজের দায়িত্বের কথা ভাবিতেছিলাম—মনে বড় ভয় হইতেছিল, আবার যদি বাসা খরচের জন্য পিতার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতে হয়, এমন সময় অতি ব্যস্তভাবে গৃহে একটি হিন্দুস্থানী প্রবেশ করিল। আমি তাহাকে বসিতে বলিলাম, তাহার আগমনের উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করিলাম। সে বলিল,—ডাক্তারবাবু আপনাকে এখনি যেতে হ'বে, বস্‌বার সময় নেই।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—কোথায় যেতে হ'বে?

সে বলিল—টিক্‌টিকি বাজার! আপনার গাড়ি আছে?

আমার গাড়ি আছে? শুনিয়া হাসি আসিল। তাহাকে বলিলাম—না, ভাড়াটে গাড়িতে যা'ব।

সে বলিল—সে কি মশায়, আপনার এমন নাম হ'য়েছে গাড়ি নেই? আচ্ছা আপনাকে যে রোগী দিচ্ছি একটু কাজ দেখাতে পার্‌লে গাড়ি ছেড়ে মোটর হ'বে।

আমি বুঝিলাম, লোকটা ছদ্মবেশী হারুণ-অল-রসিদের মত একটা মস্ত বড় কেহ। গাড়িতে বসিয়া অত বড় লোকের পরিচয় একেবারে জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না। কিন্তু সে নিজেই পরিচয় দিতে আরম্ভ করিল। চুংচুং নামক এক চীনদেশীয় সওদাগরের সে কর্ম্মচারী। চুংচুং খুব ধনবান। টাকা পয়সা গ্রাহ্য করেন না, শরীরের জন্য কেবল ব্যস্ত। তাঁহার পেটে একটা বেদনা হয়, ডাক্তার-কবিরাজ সকলে হারি মানিয়াছে, কেবল বাকি হোমিওপ্যাথি।

দুর্গা! শ্রীহরি! এবং সেই অসাধ্য সাধন করিতে হইবে ডাক্তার নশীরাম

সেন এল, এইচ, এম, এসকে। লোকটা খুব ভুখোড়। সে আমার মনের ভাবটা একদণ্ডে ধরিয়া ফেলিল।

সে বলিল—"কিছু বলা যায় না ডাক্তারবাবু, যখন ভাগ্যে থাকে তখন ছোটর দ্বারাই কাজ হয়। এই দেখুন না—কবিরাজ একটা দুঃসাধ্য রোগ সারিয়ে কল্‌কাতায় কি পসারই করেছে। সবারই তাই। যুব্‌রং সিঙের মামলা জেতার পর থেকে পুলিসকোর্টের—বাবুর অত পশার। কে জানে আপনার ভাগ্যে কি আছে?

আমি একটু হাসিলাম। কে জানে হয়ত এই চুংচুং চীনেই আমার ভাগ্য পরিবর্ত্তন করিয়া দিবে। আমি বলিলাম—বেদনাটা কি রকম হয়?

সে বলিল—সব তা'র মুখেই শুন্‌বেন। তিনি হিন্দী বল্‌তে পারেন, তবে উচ্চারণ গুলো বাঁকা; বুঝ্‌তেই তো পারেন হাজার হ'ক চীনে।

আমি বলিলাম—হ্যাঁ! চীনের হিন্দী আমি বেশ বুঝ্‌তে পারি। আমি বরাবর চীনের দোকান থেকে জুতা কিনে আসছি। 'নি হায়' মানে 'নেই হায়'। 'লু লুপি'—মানে 'দু'টাকা'।

লোকটা হাসিল, বলিল—এখন বেদনাটা সারাতে পারেন তবেই ত?

আমি বলিলাম—হ্যাঁ চেষ্টা করব, তবে ওরা যে সব জিনিস খায়—আরশুলা, টিকটিকি—

পদারত দূবে জিব কাটিল, বলিল—ছিঃ ছিঃ ও সব বাজে কথা! আমিত মশায় চীনের কাছে আজ সাত বছর কাজ করছি। ও সব কথা একেবারে বাজে। তবে ওরা মাংস খায়—হাঁসটা খায় বেশী।

সর্ব্বনাশ! চুংচুং চীনের সম্মুখে কথাটা বলিলেই ত আমার বিশ্বব্যাপী নামের আশার দফারফা হইত। তাঁহার সম্মুখে অল্প কথা কহিতে সংকল্প করিলাম।

(৩)

চুংচুং চীনে যে সম্ভ্রান্ত, তাহার বাটীতে প্রবেশ করিয়াই তাহা বুঝিলাম। বেশ প্রশস্ত কাঠের সিঁড়ি, লাইনোলিয়ম ঢাকা। বসিবার গৃহটি ইংরাজি রকমের সাজানো। বেশ ভাল দেশী গালিচা বিস্তৃত, চারিদিকে কৌচ চৌকী সমস্ত সাটিন কিংখাপে আবৃত। ঘরে ভাল ভাল ইংরাজি ছবি। প্রথমে ঘরে ঢুকিয়াই মনে হইল ইংরাজের বাটী। একটা নরম কেদারায় একজন বাঙ্গালী বাবু বসিয়াছিলেন—মাথার চুল বারো আনা চার আনা ফ্যাসনে কাটা, চোখে চসমা, গায়ে পাতলা মখমলের চুড়িদার পিরাণ। পরিচয় পাইলাম লোকটা

ম্যানেজারবাবু। আমার মনে প্রথম প্রশ্ন হইল—এসব একত্র জুটিল কেমন করিয়া? চীনে মনিব, ইংরাজি গৃহসজ্জা, বাঙ্গালী ম্যানেজার এবং হিন্দুস্থানী কর্ম্মচারী।

ম্যানেজারবাবু বেশ সৌজন্য দেখাইয়া বলিলেন—মশায়ের নাম নবীরাম সেন? আপনার কতদিনের পশার?

আমি বলিলাম—এই পাঁচ বছরের।

তিনি বলিলেন—এর মধ্যেই মশায়ের নাম হ'য়েছে।

অবশ্য এত বড় সত্য কথা, আজ অবধি আমাকে কেহ বলে নাই। ভিতরে ভিতরে যে আমার এমন নাম হইতেছিল অবশ্য সে সন্দেহ পূর্ব্বে দুই একবার মনের আশেপাশে উকিঝুঁকি মারিলেও আমি সেটাকে মনের মধ্যে প্রবেশ করিতে দিই নাই—যেহেতু আত্মপ্রশংসা মৃত্যু-তুল্য। তাঁহার কথায় আমি বিনয় দেখাইয়া মৃত্তিকা-পানে চাহিয়া একটু মুচ্‌কি হাসিলাম।

ম্যানেজার বলিল—মশায় যদি আমাদের সাহেবকে সারাতে পারেন তো একবার দেখবেন। লোকটা ভারি উঁচুদরের।

আমি বলিলাম—হ্যাঁ তা শুনেছি। তিনি কোথা?

ম্যানেজার এবং পদারত দুবে পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিল। আমি হাসির অর্থটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না দেখিয়া ম্যানেজারবাবু বলিলেন—মশায় দশাই ঐ। কাল্ রাত্রে পেটের বেদনায় সাহেব ছট্‌ফট্ করছিলেন আর আজ আপনাকে ডাকতে বলে কোথা চলে গেছেন। ঐ রকমই দশা।

আমি মনে মনে চৈনিক ক্রিয়াকলাপের পদ্ধতি ভাবিয়া হাস্য করিতেছিলাম। তবে কি এতটা আশার পর বিনা পারিশ্রমিকে গৃহে ফিরিতে হইবে? ম্যানেজার খুব বুদ্ধিমান। পুরাণ চোরের মত কবাট ভাঙ্গিয়া একেবারে মনের নিভৃত কক্ষে প্রবেশ করিল। মৃদু হাসিয়া বলিল—তবে আর আপনি বৃথা সময় নষ্ট করবেন কেন। আপনার ভিজিট নিয়ে যান। কাল্ আবার ডাক্‌ব।

পদারত বলিল—আর গাড়ী ভাড়া?

আমি বলিলাম—না আমার এখন তাড়াতাড়ি নেই, আর একটু বসি না।

ম্যানেজার আমাকে একটি চুরুট দিল। পাঁচ মিনিট গল্প করিতে করিতে একটি ইহুদি সাহেব আসিয়া ম্যানেজারকে অভিবাদন করিল। স্থানটা দেখিলাম Hall of all Nations—সব জাতির শ্রীক্ষেত্র।

ইহুদী ইসরেল বেশ [illegible] বাক্যবাণ বলিতে [illegible] —
আরে বাবা তুমি আছ, তা কিছু [illegible] বাড়ির [illegible]
সোণা বিক্রী।

ম্যানেজার বলিল—কোথা ?

ইসরেল বলিল—একটা ইলিয়ট রোডে—দু বিঘে জমি, একতাও বাড়ি, বাগান—দাম মাত্তর তিন।

আমি বিস্মিত হইয়া শুনিলাম। চুংচুং সাহেব তিন লক্ষ টাকার বাটী খরিদ করিয়াছে। লোকটা চীন মুলুকের হারুণ-অল-রসিদ ইহাই যে কথায় অকাট্য প্রমাণ। ম্যানেজার বলিল—ভারি সস্তা! আর আমাদের এখন অত টাকার বাড়ি চাই না। দু'লাখ আড়াই লাখের উর্দ্ধে যাব না।

ইস্রেল হাসিল। বিদ্রূপ করিয়া বলিল—ওঃ লক্ষীর মা ভিক্ষে মাগে!

দেখিলাম লোকটা প্রবচনে খুব সুপণ্ডিত। ঐ সম্বন্ধে আরও পাঁচ মিনিট কথাবার্ত্তা হইল। তাহার মধ্যে—"মাঠে পিঠে বড় ঘোড়ার উপর চড়", "ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে" প্রভৃতি প্রবচন বৃষ্টি করিয়া ইহুদী দালাল উঠিল। ম্যানেজার আমার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া নগদ চারি টাকা ভিজিট এবং দুই টাকা গাড়ি ভাড়া দিয়া বিদায় দিল।

বড় সুখে ঘরে ফিরিলাম। অচিরে নিজের গাড়ি চড়িয়া লোক মারিতে—না না—লোক সারাইতে যাইব,—এরূপ উচ্চাশার মূর্ত্তিটা যেন চোখের সামনে ভাসিতে লাগিল। অবশ্য তুচ্ছ চার টাকার মোহে নয়—ম্যানেজারের কথায়। কলিকাতার মত বড় সহরে আমার 'নাম' হইয়াছিল।

(৪)

দ্বিতীয় দিবস আবার সদারঙ্গ আসিয়া আমায় চুংচুং সাহেবের বাটীতে ডাকিয়া লইয়া গেল। পথে চীনে সাহেবের নাম ভুলিয়া বলিয়া ফেলিয়াছিলাম চুংচুং সাহেব। সদারঙ্গ সংশোধন করিয়া বলিয়া দিয়াছিল—'আজ্ঞে চুংচুং না, চুংচুং।"

আমি বলিলাম—মশাই মাপ করবেন, বিদেশী নাম কি না। আর বিশেষ চ্যাংচ্যাং চুং চুং, টুন টুন এসব [illegible] আওয়াজ আমার [illegible]—উঁহুকে [illegible] [illegible] [illegible] লোকের [illegible]।

পদারত লোকটার মেজাজ ভাল। সে হাসিল। যাক্ সে কথা, আমি দ্বিতীয় দিন চীনেম্যানের গৃহে গিয়া শুনিলাম যে,সাহেব ভিতরে আছেন। একটা লোক বসিয়া ম্যানেজারের সঙ্গে তর্ক করিতেছিল। লোকটা বাঙ্গালী। ম্যানেজার বলিল—না মশায়, সাহেবের সঙ্গে দেখা হ'বে না। আপনার মতলব ত জহরত বেচা নয়—সাহেবের সঙ্গে জুয়াখেলা।

বাঙ্গালী ভদ্রলোক বলিল—আজ্ঞে না মশায়, সত্যিই এইগুলা ভাল জিনিস, আপনার সাহেবকে দেখাব। তিনি খেল্‌তে চাহিলেও খেলব না।

লোকটা ছোট একটা থলি হইতে নানা রকমের কতকগুলা বেল্লোয়ারী কাঁচ বাহির করিল। ম্যানেজারও সেগুলাকে হীরা মাণিক পান্না বলিয়া বিশ্বাস করিল, তাহাদের প্রভায় মুগ্ধ হইল। কে জানে সেগুলা কাঁচ কি জহরত। ম্যানেজার বলিল—ঠিক্ ত প্রভাতবাবু, খেলার কথা মুখে আনবেন না?

প্রভাতবাবু ভ্রূকুঞ্চন করিয়া, জিব কাটিয়া বলিল—রামচন্দ্র।

ম্যানেজার বলিল—দেখুন ডাক্তার বাবু আপনি সাক্ষী। সাহেব এত বুদ্ধিমান হ'লেও চীনে কি না। জুয়াখেলা তার অস্থিমজ্জায়। সব ভাল কিন্তু একটা দোষেই লোকটা মাটি—

প্রভাতবাবু বলিল—মশায় বড়লোক যদি খেলে একটু সুখ পায় তো আপনার কি?

তাহাদের কথা শেষ হইতে না হইতে চুংচুং সাহেব গৃহে প্রবেশ করিল। লোকটা একেবারে ষোল আনা চীনে—ছাতার কাপড়ের ঢিলা পাজামা, ছাতার কাপড়ের দড়ি বাঁধা কোট, তবে চীনের রাষ্ট্রবিপ্লবের ফলে টিকি কাটা। চুংচুংকে দেখিয়া আদৌ ধনী বা মহৎ বলিয়া মনে হইল না—যেমন জুতাওয়ালা চীনেরা হয় লোকটা সেই শ্রেণীর। পদ্মমালার কথা মনে পড়িল—রূপেতে কি করে বাপু গুণ যদি থাকে?

বলিয়াছি শ্রীমান্ চুংচুং চেহারার বিষয়ে খাঁটি চীনে। তাহার হস্তে পিতলের তামাক টানিবার যন্ত্র। আমার পরিচয় পাইয়া একটা পাথরের টেবিলের উপর সেই ধূমযন্ত্রটী রাখিয়া সে সেক্‌হ্যাণ্ড করিল, বলিল—ডাঙ্‌তাল বাবু, কাল্ আম গল্‌মে নিথা মাপ মানতা।

আমি সৌজন্য প্রকাশ করিলাম। তিনি আমাকে একটা খুব মোটা বাঁকা বর্ম্মা চুরুট দিয়া বলিলেন—আমকো সালানে ওগা। লোসো মাস সে বিমাল হুয়া।

পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম—লোকটা দশ মাস ভুগিতেছে। তাই 'লোঁসো মাস' মানে বুঝিলাম দশ মাস। সে একটা চৌকীতে বসিল। প্রভাত বলিল—"পিল্‌বুর্ত বাবু জুলত লি আয়া"।

প্রভাতবাবু জহরৎ বাহির করিল। টেবিলের উপর ফেলিয়া সেগুলা পরীক্ষা করিতে করিতে চুংচুং তিনটি দানা বাছিয়া লইল। দাম ঠিক হইল—সাত শত টাকা। ম্যানেজার অগত্যা অনিচ্ছাসত্ত্বে আমার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া প্রভাতের জন্য টাকা গণিতে লাগিল।

ইত্যবসরে চুংচুং আমাকে তাহার পীড়ার কথা বুঝাইতে লাগিল। আমি মনোযোগ দিয়া শুনিতে লাগিলাম। তাহার কথার ভাবে বুঝিলাম, রোগ অম্লশূল।

তাহার পীড়ার লক্ষণ শুনিতেছি, এমন সময় প্রভাত বলিল—সাব্ হোগা নেই। এই সাত শ হায় দু'চার হাত—

চুংচুং বেশ আগ্রহসহকারে সম্মত হইল। ম্যানেজার নিষেধ করিবার জন্য বলিল—সাব্ আজ ডাক্তারবাবু হায় আপ্—

চুংচুং বলিল—ডাঙতাল্ বাবু—

আমি ব্যস্ত হইয়া বলিলাম—না আমার তাড়াতাড়ি নেই। হাম্ বৈঠ্‌তা।

লোকটা ক্রীড়ার জন্য উন্মত্ত, এমন সময় বাধা দিয়া লাভ কি? চুংচুং সন্তুষ্ট হইয়া টেবিলের একদিকে বসিল। একটা চীনে চাকর আসিয়া কতকগুলা আতার বীজ, দু'টুকরা বাখারি আর একটা চীনে মাটির পেয়ালা আনিল। তিন চার ইঞ্চি লম্বা বাখারি, একটা লাল একটা কালো। টেবিলের উপর সেই বাখারি দুইটা রাখা হইল। চুংচুং এক মুষ্টি আতার বীজ লইয়া টেবিলের উপর রাখিয়া পেয়ালা চাপা দিল। প্রভাত কালো বাখারিটার উপর এক তাড়া নোট রাখিল। তাহার পর পেয়ালা তুলিয়া সেই চীনাটা দুইটা দুইটা করিয়া আতার বীজ গণিতে লাগিল। শেষে একটা বীজ বাকি রহিল। প্রভাত হাসিল। বলিল—তিন শত টাকা।

ম্যানেজার তাহাকে তিন শত টাকা বাহির করিয়া দিল।

সাহেবকে বলিলাম—কাল আপ্‌কা দাওয়াই মিলেগা।

সে আমাকে অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল।

ম্যানেজার বলিল—আমারটা?

প্রভাত তাহাকে দেড় শত টাকার নোট দিল। সে আবার তাহার ভিতর হইতে সেই চীনা ভৃত্যটাকে পঁচাত্তর টাকার নোট দিল।

(৫)

পরদিন আবার গেলাম। সঙ্গে ঔষধের বাক্স। মনে মনে বড় ইচ্ছা হইয়াছিল খেলাটার অর্থ বুঝিব। ম্যানেজারকে বলিলাম—খেলাটা কি মশায়?

সে বলিল—খেলা মাথা আর মুণ্ডু—জোড় বিজোড় খেলা। লাল কাঠিটার ওপর টাকা রাখলে আপনি জোড় ধরলেন—আর কালো কাঠিটার ওপর টাকা রাখ্‌লে আপনি বিজোড় ধরলেন। আতার বীজ গুণে জোড় বিজোড় হ'লে আপনার হার জিত। লাভ হ'লে যত টাকা রাখবেন তত টাকা পাবেন।

আমি বলিলাম—আর শেষের টাকাটার ভাগ বুঝলাম না।

সে হাসিয়া বলিল—ওটা বুঝবেন না।

আমি পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলাম। সে বলিল—মশায় বুঝতেই তো পারেন। মধু না থাক্‌লে ব্রাহ্মণের ছেলে শুয়ার-খোর চীনের গোলামী কেন কর্‌ব। অবশ্য যথাসাধ্য লোকটাকে বাঁচাবার চেষ্টা করি। কিন্তু যখন নেহাত না খেলে থামে না, তখন কিছু করিনি।

আমি বলিলাম—খেলার কি কিছু মেচ্‌কোফের আছে নাকি?

সে বলিল—বাহিরে খেলে সাহেব টাকা জিতে আনে, কিন্তু এখানে খেললেই হারে। বুঝেছেন ত?

আমি বুঝিলাম না। সে চুপি চুপি বলিল—ওর চীনে চাকরটার সঙ্গে আধাআধি বন্দোবস্ত। গুণবার সময় হাতের কায়দা আছে।

তবে ম্যানেজারটীকে যত ভদ্র ভাবিয়াছিলাম সে তত ভদ্র নহে। অবাধে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া মনিবের সর্ব্বনাশ করিতেছিল।

বলিয়াছি, লোকটা মনের কথা বুঝিতে পারে। সে বলিল—ভাববেন না যে আমি অধর্ম্ম করি। জাহাজের কণ্ট্রাক্টরি ক'রে, জুয়াখেলে সাহেবের যে আয় তাতে দুশো পাঁচশো রোজ হার্‌লে ওর কিছু এসে যায় না। তবে এক বিষয়ে আমার নিয়ম বড় কড়া। এক দিনে দু'হাজার টাকার বেশী আমি সাহেবকে হার্‌তে দিই না।

আমি বিশেষ কিছু বাললাম না। সে বলিল—আমি টাকা এখানে রাখি না সন্দেহ হ'বে ব'লে। আপনাকে এই পঞ্চাশ টাকা দিলাম। সাহেবের সঙ্গে খেল্‌বেন।

আমার বুক্ দুর্ দুর্ করিল। জীবনে কখনও জুয়া খেলি নাই। আর এ তো জুয়া নয়, জুয়াচুরি। আমি অসম্মত হইলাম। ম্যানেজার ছাড়িল না।

অব্যবস্থিতচিত্ত হইয়া টাকাটা হাতে করিয়াছি এমন সময় সাহেব আসিল। আমি যতক্ষণ তাহার রোগের কথা কহিতেছিলাম ও ঔষধের ব্যবস্থা করিতেছিলাম, ম্যানেজার আমাকে ইঙ্গিতে উত্তেজিত করিতেছিল। সুতরাং কথাবার্ত্তার শেষে ইতস্ততঃ করিলাম। সাহেব বুঝিতে পারিয়া বলিল—বাবু খেলেগা ?

আমি বলিলাম—সবেরে কোই পঞ্চাশ টাকা আন্দাজ রোজগার হুয়া, আওর খেলেগা।

জয় মা কালী। নগদ একশত টাকা হাতে পাইলাম। আর খেলিতে সম্মত হইলাম না। সাহেব হাসিতে হাসিতে ভিতরে চলিয়া গেল।

তাহার আসল পঞ্চাশ টাকা আর লাভের পঁচিশ টাকা লইবার সময় ম্যানেজার কানে কানে বলিয়া দিল—কাল কিছু টাকা এনে গাড়ি ঘোড়ার খরচাটা তুলে নিয়ে যেও।

(৬)

লোকে বলে রাগ চণ্ডাল। আমার মনে হয় লোভের মত চণ্ডাল কিছু নাই। একবার রক্তের আস্বাদন পাইলে ব্যাঘ্র কেন এত ভীষণ হয়, একবার দ্বিতীয় পুরুষের প্রেমালিঙ্গন পাইলে কেন রমণীর প্রণয়-তৃষা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিলাভ করে, তাহা বেশ বুঝিলাম। এই দ্যূতক্রীড়ায় মাত্র পঁচিশ টাকা লাভ করিয়া আমি এক মুহূর্ত্তে ভীষণ অর্থলোলুপ হইলাম। মনের মধ্যে কত সুখ-স্বপ্ন দেখিলাম, কল্পনার সাহায্যে কত সুখসৌধ গড়িলাম, ভাঙ্গিলাম। একবার ভাবিলাম না যে, সেই পঁচিশটা টাকা জুয়াচুরি করিয়া আনিয়াছি, একটা বিদেশীকে ষড়যন্ত্র করিয়া প্রতারণা করিয়াছি। মনকে কত প্রবোধ দিলাম—চীনেম্যানের আমাদের দেশ হইতে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া লইয়া যাইবার অধিকার নাই—সেও অপরকে বঞ্চিত করিয়া দ্যূতলব্ধ অর্থ উপভোগ করে—আমি তো আর নিজ হস্তে তাহাকে প্রতারণা করি নাই—তাহার নিজের জাতি ভাই, তাহারই আপনার ধর্ম্মাবলম্বী বিশ্বাসী ভৃত্য গণনায় ভুল করিয়া তাহাকে হারাইয়াছে, ইহাতে আমার নৈতিক দায়িত্ব কোথা ? কেবল অর্থ সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম—কি উপায়ে কিছু মূলধন লইয়া চুংচুং চীনাকে হারাইয়া ঘরে অর্থ আনিব কেবল সেই ভাবনা ভাবিতে লাগিলাম। একটু মূলধন জোগাড় করিয়া গাড়ি ঘোড়া কিনিব, ঔষধালয় সাজাইয়া বসিব, তাহার পর আবার সরল পথে অর্থ উপার্জ্জন করিব। এই যে কলিকাতার চতুর্দ্দিকে এত বড় বড় অভ্রভেদী সৌধমালা, কে জানে কোন্‌টার ভিতরে কি জাল জুয়াচুরি উঞ্ছবৃত্তির কাহিনী লুক্কায়িত আছে ?

টাকা ত ঘরে ছিল না। এক রকম দিন আনা দিন খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। কি রকমে পাঁচশত টাকা জোগাড় করিব তাহার জন্য আকাশ পাতাল ভাবিলাম। স্ত্রীর অলঙ্কার—ছিঃ ছিঃ স্ত্রীধন—স্ত্রীলোকের সাধের সামগ্রী—বেশ ত' তাহাতে দোষ কি? আমি তো আর তাহা একেবারে আত্মসাৎ করিতেছি না। কেবল একদিনের মত বন্ধক দিয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ করিব। তাহার পর সন্ধ্যার পূর্ব্বে তাহার অলঙ্কার তাহাকে দিব—মায় সুদ হিসাবে কিছু বেশী দিব। গাড়ি চড়িলে তাহারও তো মনের সন্তোষ হইবে।

সেদিন স্ত্রীকে একটু আদর বেশী করিলাম। তাহার মন খুব প্রসন্ন, প্রাণে যেন বুকভরা তৃপ্তি। তাহাকে বলিলাম—আহা তোমার মত এমন স্ত্রী, যার এত রূপ এত গুণ—সে কি না হোমিওপ্যাথি—

স্ত্রী আমার মুখ টিপিয়া ধরিল—বলিল—ছিঃ! অমন কথা মুখে এনো না, বরং আমি তোমার উপযুক্ত নই।

আমি বলিলাম—দূর পাগল। আচ্ছা সোনা, তোমার গাড়ি ঘোড়া চড়তে ইচ্ছে যায়?

সে বলিল—'না'।

কিন্তু বুঝিলাম প্রাণের ভিতর হইতে কামানের আওয়াজের একটা 'হাঁ' শব্দ বাহির হইবার চেষ্টা করিতেছিল।

আমি তাহার সহিত আরও প্রেমালাপ করিয়া বলিলাম—আচ্ছা আমি যদি তোমার সমস্ত চাই তো তুমি দাও?

সে বলিল—আমার আর কি আছে?

আমি বলিলাম—গহনা।

সে বলিল—ওঃ গহনা!

আমি বলিলাম—হ্যাঁ গহনা! আমি যদি বলি—এই দণ্ডে তোমার সমস্ত গহনাগুলা আমায় দাও?

সে একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—হ্যাঁ তা দি। আমার গহনায় আর—

আমি একটু দৃঢ়স্বরে বলিলাম—ওঃ বুঝেছি সামান্য তুচ্ছ গহনাগুলা—

সে বলিল—কি জ্বালা! এই নাও!

সাধ্বী একে একে সমস্ত গহনাগুলা খুলিয়া আমার হস্তে দিল। একবার সন্দেহ হইল যেন একটা পৈশাচিক ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে। কিন্তু সে দুর্ভাবনাকে মনের মধ্যে প্রবেশ করিতে দিলাম না।

(৭)

প্রথমে আড়াই শত টাকা খেলিয়া পাঁচশত টাকা পাইলাম। তাহার পর একেবারে সাড়ে সাত শত টাকা লাগাইলাম লাল কাঠিতে। চীনে ভৃত্য আতার বীজ গণিতে লাগিল—জোড়, জোড়, জোড়—বিজোড়। সকলে হাসিয়া উঠিল—চীনা বাজি জিতিল।

কে যেন মাথার ঠিক ব্রহ্মতলে ভীষণ মুষল মারিল। হাত পা টলিতে লাগিল। মুখে কথা সরিল না। সাধ্বী স্ত্রীর অলঙ্কার খোলার চিত্র চোখের সামনে নাচিতে লাগিল—ওঃ কি তীব্র বেদনা, কি ভীষণ মনস্তাপ! ম্যানেজার হাসিতে হাসিতে বলিল—ডাক্তারবাবু ভয় কি? কাল আবার কিছু টাকা আনবেন। বুঝেছেন কাল আবার ডবল জিত—বুঝেছেন গাড়ি—মোটর গাড়ির দাম—

আমি বলিলাম—চোপ্ জুয়াচোর—চোরের দল।

সে হাসিয়া বলিল—জুয়াচোর কে? আমরা না মশায়? ওরে ডাক্তারবাবুর মাথা খারাপ হ'য়েছে, বার করে দে।

সেই চীনা চাকরটা হাত ধরিতে আসিল। আমি তাহাকে ধাক্কা দিয়া বলিলাম—ম্যানেজার! জুয়াচোরের ম্যানেজার! আমি ও টাকা হেরে ঘরে গিয়ে মুখ দেখাতে পারবো না—

ম্যানেজার হাসিল—বিদ্রূপের হাসি। আমার দেহের ভিতর রক্ত জমাট বাঁধিতেছিল। কি করিয়া কালামুখ লইয়া গৃহে ফিরিব! সাধ্বী সরলা স্ত্রীকে কি বলিয়া সান্ত্বনা দিব? মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। লোকটার পায়ে ধরিলাম—কাঁদিলাম, তাহার মুখে সেই হাঁসি।

শেষে দুর্বৃত্ত বলিল—দেখ ডাক্তার বেশী বাড়াবাড়ি কর তো 'অপমান করে' তাড়িয়ে দ'ব। জুয়াচুরি করতে এসেছিল কে?

আমি বলিলাম—পিশাচ আমাকে প্রলোভন দেখিয়েছিল কে? আজ তোদের ঘুঘুর বাসা ভাঙ্গব। পুলিস! পুলিস!

তখন যদি স্বয়ং নারায়ণ সশরীরে আসিতেন তো আমি অত বিস্মিত হইতাম না। বাস্তবিক চারি পাঁচ জন ইংরাজ ও দেশী পুলিস আসিয়া সেইক্ষণে গৃহে প্রবেশ করিল। কি আশ্চর্য্য!

ম্যানেজার আমা অপেক্ষা বিস্মিত হইল। তাড়াতাড়ি আমার হস্তে পাঁচ শত টাকার নোট দিয়া বলিল—যাও বাড়ি যাও।

আবার আমার অর্থ হস্তে আসিল—আমি আনন্দে অশ্রুবর্ষণ করিলাম। তুচ্ছ টাকার জন্য নয়;—সাধ্বী স্ত্রীর নিকট আবার মুখ দেখাইতে পারিব, আবার তাহার অলঙ্কার তাহাকে প্রত্যর্পণ করিতে পারিব বলিয়া।

ম্যানেজার আমার হস্তে টাকা দিয়াই বলিল—কি মশায় আপনারা ভদ্র-লোকের বাটীতে ঢোকেন কেন?

বাঙ্গালী ইন্‌সপেক্টর বলিল—অবশ্য এঁর চীৎকারে নয়। ভাগ্যক্রমে ঠিক সময়ে এসে পড়েছিলাম বলে একটা গরীবের অর্থরক্ষা হ'ল। কেহে তুমি বোকা এদের জালে পড়েছিলে?

আমি বলিলাম—ইনস্‌পেক্টরবাবু, যেই হই, আজ এই নাকে কাণে খৎ—এই বিদ্যে বুদ্ধি নিয়ে আর প্রাণের মাঝে তৃষা রাখব না, উচ্চাশা রাখব না। আমি যাই।

ইনেস্‌পেক্টর বলিল—রোসো, তল্লাসীর সাক্ষী হ'বে। তোমার নাম নরেন ওরফে রাখাল ঘোষ, ওরফে ফেলু বাঁড়ুর্য্যে না? এই দেখ ওয়ারেণ্ট।

তাঁহার ইঙ্গিতে একজন ইংরাজ সার্জ্জেণ্ট ম্যানেজারকে বাঁধিল। চুংচুংকেও অনেকগুলা নাম বলিয়া ধরিল। চীনে নাম স্মরণ নাই। চীনে চাকরটাকে ধরিল। প্রভাতকে ও ইসরেলকে ধরিবে বলিয়া ওয়ারেণ্ট দেখাইল। ওঃ কি জুয়াচুরি! আমার সম্মুখে লোকগুলা কেমন অভিনয় করিয়াছিল। সব মিথ্যা। সব সাজানো। তাহারা অনেককে ঠকাইয়াছিল। পাঁচটা জুয়াচুরি মামলার জন্য তাহারা ধৃত হইল। শেষে সকলের পাঁচ বছর সাত বছর করিয়া জেল হইয়াছিল।

'সেয়ানা ঠকিলে বাপকে বলে না।' আমি বোকা হইয়াও এ কাহিনী কাহাকেও বলিলাম না। স্ত্রীকে অলঙ্কার প্রত্যর্পণ করিয়া বলিলাম—তোমায় পরীক্ষা করিতেছিলাম।

সে বলিল—জানা কথার আবার পরীক্ষা কেন?

আমি তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া মুখ চুম্বন করিবার সময় চোঁখে জল আসিয়াছিল, সে সংবাদ সে রাখে নাই।

মোসলেম জ্যোতির্ব্বিদ্ আলি এব্‌নে ইউনুস।

[লেখক—মোহাম্মদ কে, চাঁদ।]

মধ্যযুগে আরবগণ মানবজ্ঞানের উচ্চতম বিষয় গণিত, দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্র গভীরভাবে আলোচনা করিয়া যেরূপ যশস্বী হইয়াছিলেন, তাঁহারা জ্যোতিষশাস্ত্র আলোচনা করিয়াও তদ্রূপ কৃতিত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের পর্য্যবেক্ষণ-ফল, গ্রন্থাবলী ও অন্যান্য জ্যোতিষশাস্ত্রমূলক আবিষ্কার ও উদ্ভাবন-তত্ত্বাবলী বহুকাল পর্য্যন্ত ইউরোপের প্রাথমিক জ্যোতিষশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত-সম্প্রদায়ের জ্যোতিষশাস্ত্রানুশীলনের ভিত্তিস্বরূপ ছিল।

যে সকল আরব জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিত পাশ্চাত্য জ্যোতিষশাস্ত্রের ইতিহাসে উচ্চস্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন ও যাঁহাদিগের আবিষ্কার ও উদ্ভাবন-তত্ত্বাবলীর সাহায্যে ইউরোপের প্রাথমিক জ্যোতিষশাস্ত্রজ্ঞেরা জ্যোতিষশাস্ত্রের উন্নতি করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে আলি এব্‌নে ইউনুস অন্যতম। ইঁহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল।

এই বিখ্যাত জ্যোতিষশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের পূর্ণ নাম আবুল হাসান আলি এব্‌নে আবি সৈয়দ আব্দ অর্-রহমান এব্‌নে আহম্মদ এব্‌নে ইউনুস এব্‌নে অল আলা অস্-সদফী। সাধারণতঃ এব্‌নে ইউনুস (ইউরোপের জ্যোতির্ব্বিদগণের নিকট 'এব্‌নে জুনিস') নামেই পরিচিত। মিশর দেশই ইঁহার জন্মস্থান। মিশর দেশের ঐতিহাসিক পণ্ডিত আব্দ-অর্-রহমান ইঁহার পিতা। মিশরে জ্যোতিষশাস্ত্রমূলক বিজ্ঞান-চর্চ্চা ফতেমিয়া খলিফা অল-আজিজের রাজত্ব সময়েই (হিঃ ৩৬৫—৩৮৬=খ্রীঃ ৯৭৫—৯৯৬) আরম্ভ হয়। এই খলিফাই কায়রোর প্রসিদ্ধ পর্য্যবেক্ষণিকার সংস্থাপক। ইহা মোকৃতম পাহাড়ের শিখরদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহার কার্য্যনির্ব্বাহের জন্য খলিফা অল-হাকিমও (হিঃ ৩৮৬—৪১১=খ্রীঃ ৯৯৬—১০২১) প্রভূত বৃত্তিদান করিয়াছিলেন। এই মান-মন্দিরেই এব্‌নে ইউনুস হিঃ ৩৬৭ (৯৭৭) খ্রীঃ হইতে ৩৯৮ হিঃ (১০০৭) খ্রীঃ পর্য্যন্ত নিয়মিতভাবে পর্য্যবেক্ষণ-কার্য্য সম্পাদন করেন ও সেই সকল পর্য্যবেক্ষণ-ফল তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'অল-জীজে' ব্যবহার করিয়াছিলেন। তিনি "অল-জীজ-অল-হাকিমী" নামক প্রসিদ্ধ জ্যোতিষশাস্ত্র-তালিকাগ্রন্থের প্রণেতা। এই গ্রন্থকে "জীজ-অল-ইউনুস"ও বলা হইত। তিনি তাঁহার পৃষ্ঠপোষক খলিফার

নামানুসারে তাঁহার ঐ গ্রন্থের ঐরূপ নাম দিয়াছিলেন। ইহা জ্যোতিষশাস্ত্র-বিষয়ক একখানি বিরাট গ্রন্থ। এই গ্রন্থখানি বৃহৎ চারিখণ্ডে সমাপ্ত। ইহা কসন ডি পার্সিভাল কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে তিনি জ্যোতিষশাস্ত্র-সংক্রান্ত বিষয়াবলীর সুবিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন এবং ইহাতে যে সকল নিয়ম প্রদত্ত হইয়াছে, সেই সকল নিয়মের ব্যবহার (প্রয়োগ) ও প্রদর্শন করিয়াছেন। পক্ষান্তরে, এই গ্রন্থের অভ্রান্ত সিদ্ধান্তসমূহ হইতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ইহা অতি সাবধানতার সহিত লিখিত হইয়াছিল।

এব্‌নে খল্লিকান বলিয়াছেন, "আমি জ্যোতিষিক তালিকা-সম্বলিত অনেক গ্রন্থ দেখিয়াছি বটে, কিন্তু কখনও ইহার ন্যায় এরূপ পূর্ণ গ্রন্থ দেখি নাই।" গ্রন্থকার বর্ণনা করিয়াছেন যে, খলিফা অল-হাকিমের পিতা ও মিশরাধিপতি খলিফা অল-আজিজের আদেশানুসারেই এই গ্রন্থের রচনা আরব্ধ হয়।

জ্যোতিষশাস্ত্রই তাঁহার বিশেষ আলোচনার বিষয় ছিল। তিনি কিন্তু অন্যান্য বিষয়ও বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন এবং কাব্যে বিশেষ যোগ্যতা দেখাইয়াছিলেন। ভ্রান্তিশূন্যতা হেতু তাঁহার (জ্যোতিষ) গ্রন্থ এরূপ সমাদৃত যে, এহিয়া এবনে আবু মনসুরের 'জীজের' ন্যায় ইহাকেও মিশরের লোকেরা জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলীর অবস্থিতি গণনা-করণোপযোগী প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া বিবেচনা করেন।

তিনি এরূপ চরিত্রবান্ লোক ছিলেন যে, ৩৮০ হিঃ (জুলাই-আগষ্ট ৯৯০ খ্রীঃ) কাজি মোহাম্মদ এবনে অন্‌নোমান তাঁহাকে 'আদল' (পদবী-বিশিষ্ট এক শ্রেণীর নিম্নপদস্থ বিচার কর্ম্মচারীর) পদে কার্য্য করিবার জন্য নিয়োজিত করিয়াছিলেন। তাঁহার একটিমাত্র পুত্র ছিল। কিন্তু সে এতদূর মূর্খ ছিল যে, সে তাহার পিতার সমস্ত পুস্তক ও অন্যান্য রচনাবলী অতি অল্প মূল্যে সাবান-প্রস্তুতকারীদিগকে বিক্রয় করিয়াছিল।

আলি এব্‌নে ইউনুস জ্যোতিষ্কমালা পর্য্যবেক্ষণ ও কোষ্ঠী-গণনায় জীবন অতিবাহিত করেন ও তাহাতে তিনি অতুল পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এমন কি, এক একটি নক্ষত্রের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে তাঁহাকে বহুদিন ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থান করিতে হইত।

আমির-অল্‌-মোখতার-অল্‌-মোসাবিবহী বলিয়াছেন :—"আমি জ্যোতির্ব্বিদ্ আবু-হাসান অৎ-তবরাণির নিকট হইতে অবগত হইয়াছিলাম যে, তিনি এব্‌নে ইউনুসের সঙ্গে মোকতম পাহাড়ে গিয়াছিলেন ও শুক্র গ্রহের পর্য্যবেক্ষণ গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে তথায় আড্ডা করিয়াছিলেন; তিনি পৌঁছিবামাত্রই তাঁহার

পরিচ্ছদ ও উষ্ণীষ খুলিয়া ফেলিলেন ও তৎপরিবর্ত্তে রক্তিমবর্ণের স্ত্রীলোকের ঘাঘরী ও মস্তকাবরণ (শিরস্ত্রাণ) পরিধান করিলেন ও অতঃপর তিনি একটি সেতার বাহির করিয়া বাজাইতে লাগিলেন ও তাঁহার সম্মুখে আবার সুগন্ধি দ্রব্যও জ্বালাইতে লাগিলেন ; তিনি বলিয়াছেন, ইহা একটি অদ্ভুত দৃশ্য !" এই লেখক তাঁহার মিশরের ইতিহাসে বলিয়াছেন যে, এব্‌নে ইউনুস উদাসীন যোগী লোক ছিলেন। তিনি তাঁহার পাগড়ীর কাপড় একটি উন্নত চূড়া-বিশিষ্ট টুপির চতুর্দ্দিকে জড়াইয়া দিয়া তদুপরি তাঁহার পোষাক রাখিয়া দিতেন। তিনিও অত্যন্ত দীর্ঘাকৃতি ছিলেন। যখন অশ্বারোহণ করিয়া বাহির হইতেন, লোকে তাঁহার অদ্ভুত আকৃতি, কুৎসিত দেহ ও জীর্ণ পরিচ্ছদের জন্য তাঁহাকে দেখিয়া হাস্য-পরিহাস করিত। কিন্তু, তাঁহার এই অপরূপ ভাব সত্ত্বেও, তিনি নক্ষত্রগণনামূলক গণনা ও ভবিষ্যদ্বাণীতে অত্যাশ্চর্য্যরূপ সৌভাগ্য-শালী ও অদ্বিতীয় ছিলেন।

তিনি নানাশাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন ও আত্মবিনোদনার্থ সঙ্গীতানুশীলনকারীর ন্যায় সেতারও বাজাইতেন।

অল্‌-মোসা-বিবহী লিখিয়াছেন যে, তিনি সওয়াল মাসের ৩রা তারিখে হিঃ ৩৯৯ (জুন ১০০৮ খ্রীঃ) সোমবার প্রাতঃকালে অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন। প্রাচীন কায়রোর প্রধান মসজিদে তাঁহার 'জানাজা' (অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াসূচক উপাসনা) কাজি মালিক এব্‌নে সয়েদ এব্‌নে আহম্মদ এব্‌নে মোহাম্মদ এব্‌নে সোয়াব কর্ত্তৃক সম্পাদিত হয় ও তাঁহার নিজ পল্লিবাটিতেই তাঁহাকে সমাহিত করা হয়। যে পল্লিতে লোমজ-বস্ত্র-ব্যবসায়ীরা বাস করিত, সেই পল্লিতেই তাঁহার বাস-বাটিকা ছিল।

তিনি জ্যোতিষ্কমণ্ডলী পর্য্যবেক্ষণ করিয়া খগোলমণ্ডলের বহুতত্ত্ব আবিষ্কার ও উদ্ভাবন করেন। তিনিই প্রথমে সময় নিরূপণার্থ ভারযুক্ত দোলকের ('রক্কাস'—পেণ্ডুলমের) ব্যবহার করেন। এই বাক্যের সত্যতা নির্ণয়করণার্থ এস্থলে পণ্ডিতবর ড্রেপার সাহেবের মন্তব্য উদ্ধৃত করা হইল, "অশেষ প্রতিভা-সম্পন্ন জ্যোতির্ব্বিদ এব্‌নে ইউনুস সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট কাল-নিরূপণ-যন্ত্রসংক্রান্ত উন্নতিকার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন ; তিনি কালনিরূপণার্থে পেণ্ডুলম ব্যবহার করেন। ল্যাপ্লেস (Laplace) তাঁহার "সিষ্টেম ডু মণ্ডি"র ("Systeme du Monde"র) পঞ্চম টীকায় অল্‌-বাতানী ও অন্যান্য আরব পণ্ডিতের পৃথিবীর কক্ষের কেন্দ্রভ্রষ্টতায় পর্য্যবেক্ষণসহ এই দার্শনিকের পর্য্যবেক্ষণকে অখণ্ডনীয়

প্রমাণস্বরূপ ধরিয়া আপনার কার্য্যোপযোগী করিয়াছেন। অধিকন্তু, তিনি বর্ণনা করিয়াছেন যে, এব্‌নে ইউনুসের রাশিচক্রের পর্য্যবেক্ষণ যাহা লক্ষণ ও পরাবৃত্তি (আলোকরশ্মির দিকপরিবর্ত্তন) জন্য যথার্থরূপে সংশোধিত হইয়া ১০০০ খ্রীঃ যে ফল প্রকাশ করিয়াছে, তাহা গভীর চিন্তাশীলতার ফল। তিনি এব্‌নে ইউনুসের আর একটি পর্য্যবেক্ষণ (অক্টোবর ৩১,১০০৭ খ্রীঃ অঃ) বৃহস্পতি ও শনিগ্রহের অতিবৈষম্য (Inequality) সম্বন্ধে অতি প্রয়োজনীয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।"

ইহার (এব্‌নে ইউনুসের) পূর্ব্বোক্ত জ্যোতিষশাস্ত্রবিষয়ক গ্রন্থ টলেমি-কল্পিত প্রাচীন জ্যোতিষশাস্ত্রের ভ্রমাত্মিকা যুক্তি সম্পূর্ণরূপে খণ্ডিত করিয়া দিয়াছে। উক্ত মহামূল্য গ্রন্থ গ্রীস, পারস্য, মঙ্গোলিয়া এমন কি চীনদেশেও সাদরে গৃহীত হইয়াছিল। ইহার মৃত্যুর পর কিঞ্চিন্ন্যূন দুই শতাব্দী পরে চীন-জ্যোতিষী কে-চু-কিং উক্ত গ্রন্থ চীন ভাষায় অনুবাদ পূর্ব্বক উহা হইতে নূতন তত্ত্ব শিক্ষা করিয়া যশস্বী হন। বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্‌ কবি ওমর খৈয়াম এই গ্রন্থখানি পারস্য ভাষায় অনুবাদিত করেন। অতএব মোসলেম জ্যোতিষী-গণের পুস্তক অন্যান্য জাতির জ্যোতিষ শাস্ত্রশিক্ষার আদর্শ ও ভিত্তি।

ঊষা।

[লেখক—শ্রীঅতুলচন্দ্র মহাপাত্র।]

একি এ লাবণ্যদীপ্তি, অপূর্ব্ব মাধুরী
ফুটি ওঠে প্রাচী-প্রান্তে দিগন্ত-ললাটে।
অফুরন্ত সৌন্দর্য্যের কি লীলালহরী
লীলায়িত বিথারিত দূর মেঘপটে!
কি শান্ত মহিমাচ্ছবি দ্যুলোকে ভূলোকে
জাগি ওঠে, স্নিগ্ধ ম্লান কুহেলীর মাঝে!
কি সুষমা ও নিঃসঙ্গ কুসুমকোরকে
মন্দিরে মন্দিরে শঙ্খ মেঘমন্দ্রে বাজে!
ওই দূরে মূর্চ্ছি' পড়ে প্রভাতী মর্ম্মর
সিন্ধুগর্ভে ওকি সান্দ্র লহরী-উচ্ছ্বাস।
অমর মহিমা গীতে পূর্ণ দিগম্বর;
সসীমেতে অসীমের কি মহাবিকাশ!
সবি যেন প্রহেলিকা রহস্য জটিল,—
সৃষ্টি ও স্রষ্টার ব্যাপ্ত অনন্ত নিখিল।

ভারতের অর্ণবযান।

[লেখক—শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়।]

(২)

রাধাকুমুদবাবুর "Indian Shipping"এর পক্ষ লইয়া সম্প্রতি দুই একজন লেখক খুবই রুখিয়া উঠিয়াছেন। এ রচনা সম্বন্ধে যে তিনি 'তত্ত্ববোধিনী'র লেখকের নিকট আদৌ ঋণী নহেন, এই কথা তাঁহারা, যুক্তি না থাকিলেও, জোর করিয়া বলিতেছেন। তাঁহাদের লেখার সে ভঙ্গী দেখিয়া মনে হয়, সুবিধা পাইলে তাঁহারা এটুকু বলিতেও সঙ্কুচিত নহেন যে, রাধাকুমুদবাবুর লেখা হইতেই 'তত্ত্ববোধিনী'র লেখক চুরি করিয়া তাঁহার অর্ণবযান সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ লিখিয়াছেন!

কিন্তু সত্যের তো মরণ নাই। আদালতে দেখিয়াছি বটে, পেটের দায়ে উকীল বেচারী মিথ্যার পক্ষ লইয়া লড়াই করিতেছে; কিন্তু সাহিত্যের উদার ক্ষেত্রে এ রীতি শোভা পায় না।—সত্যই যে সাহিত্যের প্রাণ!

প্রথম কথা:—রাধাকুমুদবাবুর এই নূতন বহিকে যখন ১৭৭০ শকাব্দীর 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার চেয়ে পুরাতন প্রতিপন্ন করা অসম্ভব; তখন উহাকে এদেশের 'অর্ণবযান সম্বন্ধীয় প্রথম পুস্তক' বলা কিছুতেই চলে না।

দ্বিতীয় কথা:—যাঁহারা বলিতেছেন যে, রাধাকুমুদবাবু 'তত্ত্ববোধিনী'র লেখা না পড়িয়াই 'Indian Shipping' গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাঁহারা মিথ্যা বলিতেছেন। কেন না, এই দুই লেখার স্থানে স্থানে এমন সব আশ্চর্য্য মিল আছে, যাহা দেখিলে একজন বালকেও বলিবে যে, 'Indian Shipping' গ্রন্থের বহু অংশ 'তত্ত্ববোধিনী'র লেখা হইতে গৃহীত। পাঠক সাধারণকে সে কথা বুঝাইবার জন্য এখানে একটু নমুনা দিলাম।

রাধাকুমুদবাবু তাঁহার গ্রন্থের এক পাদ-টীকায় লিখিয়াছেন,—

" "The passage in question is: ভূমিঞ্চ কোষকারাণাং ভূমিঞ্চ রজতাকরাং। (Kishkindhya Kandam, 40. 23.) The commentator explains কোষকারাণাং ভূমিম্ as কৌষেয় তন্তুৎপাদক জন্তুৎপত্তি স্থানভূতানাং ভূমিম্ or the land where grows the worm which yields the threads of silken clothes. The silken cloth for which China has been famous from time immemorial has been termed in Sanskrit literature চীনাংশুক and চীনচেল to point to the place of its origin. Thus in Kalidasa's Sakuntala we come across the following passage:—

গচ্ছতি পুরঃ শরীরং ধাবতি পশ্চাদসংস্থিতং চেতঃ।
চীনাংশুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্য॥

In the Yatratattva of Raghunandana we find the following :—

সর্ব্বাঙ্গ মনুলিপ্যোচ্চ চন্দনেন্দুমৃদুদ্রবৈঃ।
সুগন্ধি মাল্যাভরণৈশ্চীনচেলৈঃ সুশোভনৈঃ॥

The following further evidence of a western scholar may be adduced to show that China was the prime producer of silk."

এইবার আপনারা 'তত্ত্ববোধিনী'র প্রবন্ধের পাদ-টীকার সহিত উপরি-উদ্ধৃত পাদ-টীকা মিলাইয়া দেখুন। 'তত্ত্ববোধিনী'র পাদ-টীকা এই :—

ভূমিঞ্চ কোষকারাণাং ভূমিঞ্চ রজতাকরাং।

কিস্কিন্ধাকাণ্ডে ৪০ সর্গে ২৩ শ্লোক।

টীকাকার এইরূপ অর্থ করেন যে, "কোষকারাণাং ভূমিং কৌষেয় তন্তূৎপাদক জন্তূৎপত্তি স্থানভূতাং ভূমিং।" "কোষকারদিগের ভূমি এ বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে কৌষেয় বস্ত্রের তন্তূৎপাদক যে জন্তু, তাহার উৎপত্তি স্থান।" অতি পূর্ব্বকালাবধি চীনদেশের কৌষেয় বস্ত্র বিশিষ্টরূপ বিখ্যাত আছে, এবং তদনুসারে সংস্কৃত গ্রন্থকারেরাও তাহা চীনাংশুক ও চীনচেলক নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যথা।—

গচ্ছতি পুরঃ শরীরং ধাবতি পশ্চাদসংস্থিতং চেতঃ।
চীনাংশুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্য।

শকুন্তলানাটকে প্রথমাঙ্কে।

সর্ব্বাঙ্গ মনুলিপ্যোচ্চ চন্দনেন্দুমৃদুদ্রবৈঃ।
সুগন্ধি মাল্যাভরণৈশ্চীনচেলৈঃ সুশোভনৈঃ॥

* * * *

রঘুনন্দনকৃত যাত্রাতত্ত্বে।

অতএব 'কোষকারদিগের ভূমি' এ বাক্য চীনদেশেরই প্রতিপাদক বোধ হইতেছে।"

ইহা ছাড়া, আরও মজার কথা এই যে, 'Indian Shipping' গ্রন্থের ঐ পাদটীকার উপর আর এক যে পাদটীকা আছে, সেই একই পাদটীকা আবার 'তত্ত্ববোধিনী'র উপরি-উদ্ধৃত পাদটীকার উপরেই বিরাজ করিতেছে। বাহুল্যভয়ে, তাহা আর উদ্ধৃত করিলাম না। আমরা সে লেখা যখন 'অর্চ্চনা'য় ছাপিতেছি, তখন পাঠকগণ ইচ্ছা করিলেই 'Indian Shipping' গ্রন্থের সহিত তাহা মিলাইয়া দেখিতে পারেন।

আর একটা কথা এইখানে বলিয়া রাখা ভাল। এই 'তত্ত্ববোধিনী' কাগজেই আবার ২৮ বৎসর পরে, অর্থাৎ ১৭৯৮ শকাব্দীতে ভারতীয় অর্ণবযান সম্বন্ধে গুটিকয়েক বেশ জানিবার যোগ্য কথা বাহির হইয়াছিল। সেটিও পাঠক-সাধারণের গোচরার্থ এখানে উদ্ধৃত করিলাম।—

এক সময়ে ভারতবর্ষের অর্ণবপোত সকল নানা দেশে গমন করিত। এ বিষয়ে আমরা এই প্রস্তাবে কিঞ্চিৎ বিশেষ রূপে বলিতে অভিলাষ করি। সুমাত্রা, জাবা, বালী, সকোট্রা (সুখতর) প্রভৃতি উপদ্বীপ হিন্দু-উপনিবেশ। বালীতে এখনও সহমরণাদি সামাজিক প্রথা, রামায়ণ মহাভারতাদি কাব্য, এমন কি সংস্কৃত ছন্দ পর্য্যন্ত প্রচলিত আছে। এক্ষণে যেমন ইংলণ্ডের লোকেরা সকল দেশে ধর্ম্ম ও সভ্যতা বিস্তার করিতেছেন তেমনি বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবের সময় ভারতবর্ষের লোকেরা সমস্ত এশিয়া খণ্ডে, এমন কি, ইওরোপ ও আমেরিকা পর্য্যন্ত অধিকতর সফল-প্রযত্নতার সহিত ধর্ম্ম ও সভ্যতা প্রচার করিয়াছিলেন। সিংহলের মহাবংশ নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে বঙ্গরাজকুমার বিজয় সিংহ পিতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হওয়াতে পঞ্চশত সহচর সঙ্গে সমুদ্রযাত্রা করিয়াছিলেন। অর্ণবপোত জলে মগ্ন হওয়াতে তাঁহারা সিংহল-উপকূলে সমুদ্রতরঙ্গ দ্বারা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা তথাকার আদিম নিবাসীদিগকে যুদ্ধে জয় করিয়া তথায় রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। বিজয়ের বংশাবলী ঐ উপদ্বীপের ইংরাজাধিকার পর্য্যন্ত তথায় রাজত্ব করিয়াছিল। তাঁহার বংশীয় উপাধি "সিংহ" হইতে ঐ দ্বীপের বর্ত্তমান নাম সমুদ্ভূত হইয়াছে। তিনি যখন সমুদ্র-তরঙ্গ দ্বারা সিংহলের উপকূলে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন তখন উপকূলের তাম্রবর্ণ বালুকার উপর তাঁহার হস্ত স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া, সেই অবধি ঐ দ্বীপের অন্যতর নাম "তাম্রপাণি" হইল। এই "তাম্রপাণি" শব্দ হইতে রোমকদিগের 'ট্যাপ্রোবেন্'' শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। সিংহলের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর সর ইমর্সণ টেনেণ্ট তাঁহার প্রণীত সিংহলবিবরণে ঐ উপদ্বীপের বাঙ্গালীবিজেতা দিগের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ফাহিয়ান নামক চীন দেশীয় পর্য্যটক তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে উল্লেখ করিয়াছেন যে, তাঁহার সময়ে তাম্রলিপ্ত অর্থাৎ তমলুক একটি বন্দর ও হিন্দু বিশেষতঃ বাঙ্গালী নাবিকদিগের অর্ণব পোতারোহণের একটি প্রধান স্থান ছিল। প্রাচীন ভারতবর্ষীয়েরা যে কেবল এশিয়াখণ্ডের সকল স্থানে গমনাগমন করিতেন এমন নহে, তাঁহারা আফ্রিকা, ইওরোপ এমন কি আমেরিকা পর্য্যন্ত গমনাগমন করিতেন তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কাপ্তেন স্পীক্, যিনি নীল নদীর উৎপত্তিস্থান আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন তিনি তাঁহার ভ্রমণের প্রাত্যহিক বিবরণে লিখিয়াছেন যে পদ্মপুরাণে উল্লিখিত কালী নদী, যাহার সহিত এশিয়াটিক রিসার্চ্চ গ্রন্থে কর্ণেল উইলফোর্ড সাহেব নীল নদীর একত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাহার উৎপত্তির স্থানের যেরূপ বিবরণ উল্লিখিত পুরাণে আছে তাহার সহিত নীল নদীর উৎপত্তি স্থানের বিলক্ষণ একতা আছে। প্রাচীন মিসর দেশের ধর্ম্মের সহিত ভারতবর্ষের পৌরাণিক ধর্ম্মের যেরূপ ঐক্য তাহাতে প্রতীতি হইতেছে যে, মিসর দেশে হিন্দুজাতির গমনাগমন ছিল। উল্লিখিত ঐক্য এরূপ নিকটতর যে নেপোলিয়নের যুদ্ধের সময় যে সকল সিপাহী এতদ্দেশ

হইতে মিসরে প্রেরিত হইয়াছিল তাহারা তথাকার প্রাচীন মন্দিরের দেবদেবী সকল আপনাদিগের দেশের দেবদেবী মনে করিয়া তাহাদিগকে পূজা করিয়াছিল। নোনস নামক মিসরদেশজাত গ্রীক কবি বলিয়াছেন যে, খ্রীষ্টাব্দের দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীতে হিন্দুপোত সকল মিসরে ও অন্যান্য দেশে বাণিজ্যার্থ গমন করিত। এখনও গুর্জ্জর প্রদেশের হিন্দুবণিকেরা আফ্রিকার পূর্ব্বভাগে সংস্থিত জাঞ্জিবার প্রভৃত নগরে বাণিজ্যার্থ গমন করিয়া থাকে। রোমক প্রাকৃতিক ইতিবৃত্তবেত্তা প্লিনি বলেন যে, খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভের ষাইট বৎসর পূর্ব্বে কতকগুলি হিন্দুনাবিকের জাহাজ জলমগ্ন হওয়াতে তাহারা জর্ম্মেনীর উপকূলে আসিয়া উঠে। তাহারা তথা হইতে সেই দেশের এক জন রাজা কর্ত্তৃক গল অর্থাৎ ফ্রান্সের মিটেলস নামক রোমান শাসনকর্ত্তার নিকট প্রেরিত হয়। তিনি তথা হইতে তাহাদিগকে রোম মহানগরে প্রেরণ করেন। ইহা অতি আশ্চর্য্য কথা। এই সকল পরম উদ্যমশীল সাহসিক হিন্দুনাবিক জর্মেন সাগরে কি প্রকারে উপনীত হইয়াছিল? তাহারা কি উত্তমাশা অন্তরীপ এবং আটলান্টিক মহাসাগর দিয়া অথবা ভারত মহাসাগর, প্রশান্ত মহাসমুদ্র ও উত্তর মহাসমুদ্র দিয়া তথায় উপনীত হইয়াছিল? যাহা হউক, ইহারা কলম্বস অথবা বাসকোডিগামাকে জিতিয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। ডক্‌টর রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রমাণ করিয়াছেন যে, এক সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম নরওয়ে দেশে প্রচারিত হইয়াছিল। তিনি আরও বলেন যে, এক সময়ে ইউরোপে রুদ্রের উপাসনা প্রচলিত ছিল। রটলেণ্ড, রটারডেম, র্যাটিস্বন প্রভৃতি নগরের নাম তাহার প্রমাণস্বরূপ। স্কটলেণ্ডের হাইলেণ্ড প্রদেশ যখন অসভ্য অবস্থায় অবস্থাপিত ছিল তখন তথায় ব্যালট্যান্ নামক এক ক্রিয়া প্রচলিত ছিল। যাহারা ঐ ক্রিয়া করিত তাহারা একটি অগ্নিকুণ্ড করিয়া প্রজ্বলিত অগ্নির উপর নবনীত ও গোধূম প্রভৃতি শস্য নিক্ষেপ পূর্ব্বক "আমাকে অশ্ব দেও, আমাকে ধন দেও" ইত্যাদি প্রার্থনা করিত। এই ক্রিয়া অবিকল ঋগ্বেদোক্ত হোম। ইহাতে প্রতীতি হইতেছে যে, ঋগ্বেদের ধর্ম্ম তথায় এক সময়ে প্রচলিত ছিল। প্রায় দুই বৎসর হইল ম্যাক্‌মিলন্স ম্যাগ্যাজীন নামক ইংলণ্ডের সাময়িক পত্রিকায় "পিরুদেশের আর্য্যগণ" এই শিরস্ক একটী প্রস্তাব প্রকাশিত হয়; সেই প্রস্তাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে, ভারতবর্ষীয় আর্য্যেরা এমেরিকার অন্তর্বর্ত্তী পিরু দেশ পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন। সম্প্রতি অনরেবল্ পীবেল্‌স নামক ইউনাইটেড ষ্টেট্‌স দেশের এক জন অতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি মধ্য আমেরিকায় ভ্রমণ করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, অতি প্রাচীন কালে তথায় ভারতবর্ষীয় আর্য্যদিগের গমনাগমন ছিল। সম্প্রতি একটী চীন গ্রন্থে দৃষ্ট হইয়াছে যে, কতকগুলি বৌদ্ধ প্রচারক আমেরিকায় গমন করিয়াছিল।

ভারতবর্ষের সহিত অন্যান্য দেশের পূর্ব্বকালীন বাণিজ্য বিবরণ।

প্রথম অধ্যায়

উত্তরে তুষার-মণ্ডিত হিমালয়, দক্ষিণে সাগর-ধৌত কন্যাকুমারী, পূর্ব্বে সমুদ্র ও ব্রহ্মরাজ্য, পশ্চিমে পশ্চিম সমুদ্র ও সিন্ধুনদ পারস্থ হিন্দুকোহ্ পর্ব্বত,

এই চতুঃসীমাবদ্ধ অতি বিস্তীর্ণ ভারতবর্ষের অন্তঃপাতি বিচিত্র দেশের বিচিত্র ভূমিতে বিচিত্র প্রকার স্থলজ জলজ দ্রব্যের উৎপত্তি হয়। এরূপ ফলশালি দেশের লোক সকল ঐ সমস্ত সামগ্রীর পরস্পর বিনিময়ার্থে অবশ্য অতি পূর্ব্ব-কালেই অল্প বা বিস্তৃত বাণিজ্যে নিযুক্ত হইয়াছিল। যে অপরিজ্ঞাত কালে বর্ণ বিভাগ হইয়াছিল, তখনও সামান্য রূপ ব্যবসায়ের আরম্ভ হওয়া সম্ভব, কারণ বাণিজ্যাবলম্বন বৈশ্যদিগের প্রধান বৃত্তি। বেদ ভিন্ন আর কোন সংস্কৃত গ্রন্থ মনুসংহিতা ও বাল্মীকি রামায়ণের অপেক্ষায় প্রাচীন নহে; ঐ উভয় গ্রন্থের রচনা কালে ভারতবর্ষীয় লোকেরা দেশ দেশান্তর গমন পূর্ব্বক বাহুল্য রূপ বাণিজ্য ব্যবসায় সম্পাদন করিতেন। মনু সংহিতায় যে রূপ হিন্দুদিগের উৎকৃষ্ট অবস্থা প্রকাশ পাইতেছে ও রামায়ণে নগর ও রাজধানীর অত্যুচ্চ প্রশস্ত অট্টালিকা শ্রেণি, শত শত বিমান ও দেবায়তন, গৃহারূঢ় উড্ডীয়মান বিবিধ পতাকা, রথ-হস্তি-ঘোটকাদি নানা যান-সমাকীর্ণ জল সংসিক্ত রাজমার্গ, বহুতর রাজদূত সমাগম, ধন-ধান্য-রত্নপূর্ণ ধাম, নানাবিধ শিল্পকার ও বহুতর বণিকের অবস্থান, সুরম্য উদ্যান, বিচিত্র বিহার স্থান, বিদ্যার প্রাদুর্ভাব, বাণিজ্যের আড়ম্বর, মনোহর শোভা, জন সমারোহ, উৎসব ব্যাপার, আমোদ প্রমোদাদি সর্ব্বাংশে যে প্রকার অত্যুৎকৃষ্ট বৈভব বর্ণনা আছে, * তাহাতে বোধ হয়, যে ঐ সকল ব্যবস্থা বিধান ও বর্ণনার সময়ে আর্য্যাবর্ত্ত ধন, ধর্ম্ম, বিদ্যাতে পরিপূর্ণ ছিল; সে অবস্থায় সুখ-সম্ভোগোপযোগি সামগ্রী কেবল বাণিজ্য যোগেই প্রাপ্ত হওয়া সম্ভাবিত হয়। অরণ্যবাসি নির্দ্ধন অসভ্য লোকদিগের অন্তঃকরণে এরূপ ঐশ্বর্য্যের ভাব উদয়ই হইতে পারে না; অতএব যদিও রামায়ণ কাব্য বটে, তথাপি এ সমস্ত বর্ণনাকে তৎকালিক ভারতবর্ষীয় লোকের অবস্থা-মূলক বলিতে হয়। ফলতঃ রামায়ণের ভূরি ভূরি স্থলে বহু ব্যবসায়ি স্থলপথ ও সমুদ্র-পথ-গামি বণিকদিগের বৃত্তান্ত এবং মনু সংহিতাতে তাহারদের ব্যবসায়ের ব্যবস্থা লিখিত আছে। অতএব যৎকালে রামায়ণ প্রমাণে সমুদায় দাক্ষিণাত্য কেবল দুর্গম মহারণ্য এবং বন্য ও পর্ব্বতীয় লোকের বাস স্থান ছিল, এবং মনুসংহিতানুসারে উৎকল ও দ্রাবিড়াদি দেশ ম্লেচ্ছ ভূমি বলিয়া গণিত ছিল, তখনও আর্য্যাবর্ত্তে এবং বিশেষতঃ তাহার পশ্চিম ও মধ্যভাগে বিশিষ্ট রূপ

---

* আদিকাণ্ডে পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়, অযোধ্যাকাণ্ডে ৭১ অধ্যায়, সুন্দরকাণ্ডে চতুর্থ পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায় ইত্যাদি।

বাণিজ্য ব্যবসায় প্রচলিত থাকা সম্ভব বোধ হয় *। আর মহাভারতীয় সভাপর্ব্বে নানা দেশীয় ও নানা জাতীয় ভূপালদিগের মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে বিবিধ প্রকার সুভোগ্য সামগ্রী উপহার দিবার যেরূপ সবিশেষ বর্ণনা আছে, তাহাতে অনায়াসেই বোধ হয় যে ঐ উপাখ্যান রচনার পূর্ব্বে ভারতবর্ষের পশ্চিম ও উত্তরবর্ত্তি শক তুখারাদি বিবিধ জাতীয় লোকের সহিত হিন্দুদিগের বিশিষ্ট রূপ বাণিজ্য ঘটিত সংশ্রব ছিল,এবং তখন ভারতবর্ষের ধন, সৌভাগ্য, সুখ, সভ্যতার বিস্তর উন্নতি হইয়াছিল। বিশেষতঃ সে কালে বাণিজ্য বৃত্তির সমাদর ছিল, এবং বণিকেরা সম্ভ্রান্ত ও বিচক্ষণ লোক ছিল। তাহারা নিতান্ত মূর্খ ছিল না; তাহারদের বেদাধিকার ছিল; সুতরাং শাস্ত্রাধ্যয়ন করা অবশ্যই অবশ্য কর্ত্তব্য বোধ ছিল।

মনু এক স্থানে কহিয়াছেন, † যে বণিকেরা নানা দেশের গুণাগুণ শিক্ষা করিবেক, ও নানা জাতীয় ভাষা অভ্যাস করিবেক, এবং অন্য স্থানে তাঁহারদিগকে স্বীয় বিবেচনানুসারে বাণিজ্য বিষয়ক ব্যবস্থা করিবারও ক্ষমতা দিয়াছেন ‡।

---

* কিন্তু রামায়ণ রচনার সময়ে দাক্ষিণাত্যে হিন্দুদিগের গমনাগমন আরব্ধ হইয়াছিল, তাহার সংশয় নাই; কারণ তাহাতে নদী পর্ব্বতাদির যথার্থ সংস্থান লিখিত আছে। আর ইহাও স্বীকার করা কর্ত্তব্য, যে রামায়ণের স্থানে স্থানে অনেকানেক প্রক্ষিপ্ত বচনও প্রাপ্ত হওয়া যায়।

† "মনু কহিয়াছেন," "মনু উপদেশ করিয়াছেন" এই রূপ বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে মনুসংহিতাতে সেই উক্তি আছে। ইহা বলা বাহুল্য যে আদি মনুষ্য বা মনুষ্য-পিতা স্বায়ম্ভুব মনু দ্বারা মনুসংহিতা রচিত হওয়া কোন প্রকারেই সম্ভাবিত নহে।

সারাসারঞ্চ ভাণ্ডানাং দেশানাঞ্চ গুণাগুণান্।
লাভালাভঞ্চ পণ্যানাং পশূনাং পরিববর্দ্ধনং॥
ভৃত্যানাঞ্চ ভৃতিং বিদ্যাৎ ভাষাশ্চ বিবিধানৃণাং।
দ্রব্যাণাং স্থানযোগাংশ্চ ক্রয়বিক্রয়মেব চ॥

মনু ৯ অধ্যায়ে ৩৩১ ও ৩৩২ শ্লোক।

বৈশ্যেরা দ্রব্যের উৎকর্ষাপকর্ষ, দেশের গুণাগুণ, পণ্য দ্রব্য বিক্রয় দ্বারা লাভালাভের বিষয়, পশুদিগের উৎকর্ষ সাধন, ভৃত্যদের ভৃতি, বিবিধ প্রকার ভাষা, দ্রব্যের স্থান যোগ অর্থাৎ কোন দ্রব্য কিরূপে স্থাপন করিলে বহুকাল থাকে তদ্বিষয়, ও ক্রয় বিক্রয়ের রীতি অবগত হইবেক।

‡ সমুদ্রযানকুশলাদেশকালার্থদর্শিনঃ।
স্থাপয়ন্তি তুযাং বৃদ্ধিং সা তত্রাধিগমংপ্রতি॥

৮ অধ্যায়ে ১৫৭ শ্লোক।

যে দেশে কোন বিষয়েরই পুরাবৃত্ত নাই, তথায় বাণিজ্যের বৃত্তান্ত লিপি-বদ্ধ থাকিবার সম্ভাবনা কি? তবে অতি পূর্ব্বে বাণিজ্য বৃত্তি যে হিন্দুদিগের প্রিয় ব্যবসায় ছিল, ও তাঁহারদের দেশ দেশান্তর গমনাগমন ছিল, আমারদের প্রাচীন গ্রন্থ সমুদায়ে যে তাহার যৎ কিঞ্চিৎ নিদর্শনও প্রাপ্ত হওয়া যায় এই বিস্তর। বণিক্‌দিগের বৃত্তি রক্ষা ও বাণিজ্য ক্রিয়ার বিধান করা মন্বাদি ধর্ম্ম শাস্ত্রের অঙ্গ ছিল। আর কামন্দকীয় নীতিসারানুসারে অবগত হওয়া যায়, যে বাণিজ্য বিধান বিষয়ে বার্ত্তা নামে এক শাস্ত্র ছিল, তাহাতে পাশুপাল্যাদি সমস্ত বৈশ্য বৃত্তির নিয়ম থাকিত *। ইহা অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় যে ইদানীং সে সকল গ্রন্থ নিতান্ত অপ্রাপ্য হইয়াছে—বুঝি লুপ্ত হইয়া থাকিবেক! বিদেশীয় ইতিহাস বেত্তাদিগের গ্রন্থ ব্যতিরেকে এবিষয়ের সবিশেষ বিবরণ প্রাপ্ত হইবার উপায় নাই।

অতি পূর্ব্বে মিশরদেশীয় লোকের সহিত ভারতবর্ষীয় বণিক্‌দিগের বিস্তৃত বাণিজ্য প্রচলিত থাকিবার বিস্তর নিদর্শন পাওয়া যায়। সেই অতিপ্রাচীন সৌভাগ্যশালি সভ্যলোকে ৩৫০০ সার্দ্ধ ত্রিসহস্র বৎসরেরও পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয় সুভোগ্য সামগ্রী সকল উপভোগ করিতেন। ৩৫৫৬ বৎসর পূর্ব্বে যখন যুষফ ঐ দেশে উপনীত হইয়াছিলেন, তখন আরব রাজ্যের ইস্‌মায়েলীয় বণিকেরা তথায় ভারতবর্ষ-জাত ও ভারতসমুদ্রবর্ত্তি-দ্বীপোৎপন্ন তেজস্কর ভক্ষ্য গন্ধদ্রব্য সমুদায় † বিক্রয়ার্থে লইয়া যাইতেছিল ‡। এবং যখন ৩৩৫০ বৎসর পূর্ব্বে ও তাহার কিয়ৎকাল পরে তৃতীয় থোথ্‌মিস ও তদুত্তর-কালবর্ত্তি ফিরোণ নামক

সমুদ্র গমন বিষয়ে নিপুণ এবং দেশ, কাল, ও লাভালাভদর্শি বণিকেরা যান-ভাটক বিষয়ে যে ব্যবস্থা করেন তাহাই প্রমাণ।

আন্বীক্ষিকী ত্রয়ী বার্ত্তা দণ্ডনীতিশ্চ শাশ্বতী।
বিদ্যাশ্চতস্র এবৈতা লোকসংস্থিতিহেতবঃ॥
পাশুপাল্যং কৃষিঃ পণ্যং বার্ত্তা বার্ত্তানুজীবিনাং।
সম্পন্নোবার্ত্তয়া সাধুর্ন বৃত্তের্ভয়মৃচ্ছতি॥

কামন্দকীয় নীতিসারে দ্বিতীয় সর্গে।

† গরম মশলা Spices. তাহা কেবল ভারতবর্ষে ও বিশেষতঃ ভারতসমুদ্রবর্ত্তি কতিপ উপদ্বীপেই উৎপন্ন হইয়া থাকে, সুতরাং মিশর দেশীয় লোকদিগের ভারতবর্ষীয় বাণিজ্য যোগে তাহা প্রাপ্ত হওয়া সম্ভাবিত হয়।

‡ Bible Genesis XXXVII. 29.

নৃপতিদিগের সময়ে * তথায় বৈদূর্য্য মণি প্রভৃতি বিবিধ প্রকার ভারতবর্ষীয় রত্ন, এবং নীল † ও অন্যান্য সামগ্রী উপস্থিত ছিল, তখন ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়, যে ঐ বাণিজ্য বহুকাল ধারাবাহিক রূপে প্রচলিত ছিল ‡। ভারতবর্ষের সহিত যে মিশর দেশের বাণিজ্য-ঘটিত সম্বন্ধ থাকিবেক তাহা আশ্চর্য্য নহে; তথাকার বহুতর প্রাচীন সমাধি-মন্দিরে অনেক চীন দেশীয় পাত্র প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, এবং তাহাতে চীন অক্ষরে চীন ভাষার শব্দ সকল লিখিত আছে ¶। ইহা সম্ভব বটে, যে মিশর লোকেরা এদেশীয় বাণিজ্য যোগেই তৎ সমুদায় প্রাপ্ত হইতেন, এবং এই বাণিজ্য দ্বারা যে তাঁহাদের সুখ সৌভাগ্যের বিশিষ্ট রূপ উন্নতি হইয়াছিল তাহার সংশয় নাই। এই সমস্ত প্রামাণিক ইতিহাস দ্বারা কেবল ভারতবর্ষীয় বাণিজ্য মাত্রের প্রাচীনত্ব সপ্রমাণ হইতেছে না, ইহাতে ৩৫০০ ও ৩৬০০ বৎসরেরও পূর্ব্বে হিন্দুদিগের সভ্যতা ও সৌভাগ্যের উন্নতি হওয়া সূচিত হইতেছে। যাহারা শারীরিক শোভার্থে রত্ন ব্যবহার করিত, যাহারদের মধ্যে খনিখনক ও মণিকারের ব্যবসার প্রচলিত ছিল, যাহারা বস্ত্র রঞ্জনার্থে নীলাদি প্রস্তুত করিত, যাহারা ভারতসমুদ্রস্থ দ্বীপবাসি লোকের নিকট হইতে নানাবিধ গন্ধ দ্রব্য আহরণ করিয়া দেশ দেশান্তরীয় বণিকদিগকে বিক্রয় করিত, তাহারা কখনও নিতান্ত নির্দ্ধন ও অসভ্য ছিল না।

আরবীয় বণিকেরা যে হিন্দুদিগের নিকটে ঐ সকল পণ্য দ্রব্য ক্রয় করিয়া মিশর দেশে বিক্রয়ার্থ লইয়া যাইত, তাহা স্পষ্টই বোধ হইতেছে; এবং যদিও হিন্দুদিগের ন্যূনাধিক দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মিশর দেশে গমনাগমন থাকিবার ইতিহাস আছে, এবং এক আরবীয় গ্রন্থকর্ত্তার প্রামাণিক লিপি প্রমাণে ১২০০

* মিশর দেশাধিপতি তৃতীয় থোথ্‌মিস নামক ভূপতি খ্রীষ্টাব্দের ১৪৯৫ বৎসর পূর্ব্বে এবং তদনুসারে এক্ষণকার ৩৩৪৫ বৎসর পূর্ব্বে রাজপদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন।

† মিশর দেশের যে প্রকার বস্ত্রের প্রান্তভাগে নীল বর্ণ ছিল, ৩৬০০ বৎসর পূর্ব্বে তথায় তদনুরূপ বস্ত্র প্রস্তুত হইত। অতএব তৎকালের বস্ত্রে নীল রাগ থাকিলে ভারতবর্ষীয় বাণিজ্যের প্রাচীনত্ব আরও কত বৃদ্ধি হয়।—Wilkinson's Ancient Egyptians. Vol. 3rd. p. 123—125.

‡ Wilkinson's Ancient Egyptians Vol. 3. p. 216—17.

¶ Ibid P. 107—109.

শক পর্য্যন্তও হিন্দুরা সমুদ্র পথে আরব দেশে উত্তীর্ণ হইয়া * পরে স্থলপথে মিশর দেশে গমন করিতেন † কিন্তু ৩৪০০। ৩৫০০ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহারা এইরূপ যাতায়াত করিতেন কি না তাহা নিশ্চয় করা কঠিন। আর ফিনিসিয়া দেশীয় মহোৎসাহি বণিক্‌দিগের দ্বারাও ঐ সকল ভারতবর্ষীয় সামগ্রী মিশর রাজ্যে প্রেরিত হওয়া সম্ভব ‡; অতএব অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে যখন উক্ত রাজ্য গ্রীক ও রোমানদিগের অধিকার ভুক্ত হইয়াছিল, তৎকালের ভারতবর্ষীয় বাণিজ্য বিবরণ করিবার পূর্ব্বে ফিনিসিয়ার বণিক্‌দিগের সহিত হিন্দুদিগের কিরূপ ব্যবসায় প্রচলিত ছিল, তাহার অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য।

ফিনিসিয়া দেশীয় ভুবন-বিখ্যাত মহোৎসাহি বণিকেরা এককালে ভারতবর্ষেও গমনাগমন করিত। তাহারদের সমুদ্র-পোতের ধ্বজা পশ্চিমে ব্রিটন দ্বীপ ও পূর্ব্বে ভারতবর্ষ সন্নিহিত মহাসাগরে এককালেই উড্ডীয়মান থাকিত। এ প্রকার লিপি আছে, যে ন্যূনাধিক ২৮৫০ বৎসর পূর্ব্বে হিরাম ও সলমন রাজার অনুমত্যনুসারে ভারতবর্ষের সহিত নিয়মিত বাণিজ্য স্থাপনার্থে ফিনিসীয় ও ইজরেল জাতীয় নাবিকেরা লোহিতসাগর ¶ দিয়া ওফর দেশে অর্থাৎ গুজরাটের নিকটবর্ত্তী সুপার দেশে আগমন করে § এবং তথা হইতে স্বর্ণ, রৌপ্য, রত্ন, চন্দন, হস্তি-দন্ত, বানর ও ময়ূর ক্রয় করিয়া লইয়া যায়। এ সমস্তই ভারতবর্ষীয় দ্রব্য, এবং ঐ বৃত্তান্তে তাহারদের ভারতবর্ষীয় নামই লিখিত আছে। যদিও য়িহুদিদিগের পুস্তকে এই বাণিজ্য অতি প্রশংসনীয় ও মহোপকারী বলিয়া বর্ণিত আছে, কিন্তু ফিনিসীয় বণিকেরা তাহারাও পূর্ব্বে স্থলমার্গে তদপেক্ষায় প্রবলতররূপে ভারতবর্ষীয় বাণিজ্যে নিযুক্ত ছিল।

* তাহারা আরবের পূর্ব্ব ভাগে সমুদ্র-তীরস্থ অয়দাব নামক স্থানে উত্তীর্ণ হইত, এবং তথা হইতে পশ্চিম দিকে মরুভূমি দিয়া মিশর দেশে গমন করিত।

† Heeren's Historical Researches. Egyptians. Chapt. 4th Note 70.

‡ হিরোডোটাসের গ্রন্থ ও বাইবেল পুস্তকের প্রমাণানুসারে নিশ্চিত অবগত হওয়া যায়, যে ফিনিসিয়ার সহিত মিশর দেশের বিশিষ্ট রূপ বাণিজ্য প্রচলিত ছিল।—Heeren. Phenicians. Chap 4.

¶ Red Sea.

§ এই প্রকার লিপি আছে যে ফিনিসীয় ও ইজরেল জাতীয়েরা ওফর দেশে আসিয়াছিল নানা গ্রন্থে ঐ স্থানের "সোফির" "সোফর" প্রভৃতি তদনুরূপ নানাপ্রকার নাম লিখিত আছে আফ্রিকার পূর্ব্বাংশে সোফলা নামে এক দেশ আছে, এবং টলেমি নামক মিশর দেশীয় পণ্ডি

কবিতায়।

[লেখক—শ্রীসতীশচন্দ্র বর্ম্মণ, বি-এল।]

আমি যবে লিখিলাম কবিতা আমার
চেয়ে দেখি কোন ছত্রে বিকসিত তার
কপোলের হেমকান্তি, অন্য ছত্র-মাঝে
ঢলঢল নীলপদ্ম আঁখি দু'টী রাজে!
তার পর যত পড়ি—কত যে সাবাসি—
বসন্ত মাধুরী সম প্রিয়ার সে হাসি
করিয়াছে চুরি মোর চতুর কবিতা;
কোথাও প্রিয়ার মত রয়েছে 'গুণ্ঠিতা,'
ব্রীড়ানম্র নববধূ নবীন বাসরে!
কোনখানে ফুটিয়াছে তারি কণ্ঠস্বরে
প্রেমের প্রথম ভাষা—অস্ফুট গুঞ্জন,
পুষ্পবনে কোকিলার নব সম্ভাষণ।
তেমনি গ্রীবার ভঙ্গী, তেমনি রূপসী,
কবিতার মাঝে মোর দাঁড়ায়ে প্রেয়সী!

নৃত্য গীত ও নারী-সমাজ।

[লেখক—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দে।]

(১)

আর্য্যঋষিযুগ হইতে ভারতে চৌষট্টী কলার পূর্ণভাবে বিস্তাররূপে আলোচনা ও ব্যবহার হইয়া আসিতেছে। নৃত্য ও গীত এই কলারাশির অন্তর্গত। এতদুভয়ই এত উপাদেয় ও চিত্তোন্মাদক যে, সকল যুগে, সকল দেশে, সকল জাতির মধ্যে তাহা আপনা হইতেই স্থানলাভ করিয়াছে এবং সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে নানাভাবে তাহার উৎকর্ষতাও সাধিত হইয়াছে, কিন্তু গ্রহবৈগুণ্যে এমন জিনিষগুলি অনেকের নিকট অপ্রীতিকর ও অশ্লীল হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

সপ্ফর নামে এক দেশ আরবের অন্তঃপাতি ও সুপার নামে এক স্থান ভারতবর্ষের পশ্চিম খণ্ডে গুজরাটের দক্ষিণস্থ কাম্বোয় সাগরের তীরস্থ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে পুরাবৃত্ত বিদ্যা-বিশারদ হীরেন ও হম্বোলট সাহেবেরা উভয়েই ওফর দেশীয় বাণিজ্যকে আফ্রিকাবধি ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত নানা স্থানের বাণিজ্য বলিয়া অনুমান করেন, (Heeren's Historical Researches Phenicians. Chap. 3rd. and Humboldt's Cosmos. by Sabine. Note 181) কিন্তু পূর্ব্বোক্ত দ্রব্য সমুদায় ভারতবর্ষে উৎপন্ন হওয়াতে ও হিব্রু গ্রন্থে তাহাদের ভারতবর্ষীয় নাম লিখিত থাকাতে ইহা একপ্রকার নিশ্চিত বলিতে হয়, যে সলমন্ ও হিরাম রাজার প্রেরিত বণিকেরা ভারতবর্ষের পশ্চিমাংশেও আসিয়াছিল।

এই দূষিত ভাব সঙ্গীত বা নৃত্যের অঙ্গীভূত নহে,ইহা রচয়িতৃদিগের বা অভিনেতৃ-দিগের রুচিসম্ভূত, দর্শক ও শ্রোতারও রুচিহীনতার পরিচায়ক। সমাজ হইতে সুনীতির ভাব ক্রমে অন্তর্হিত হইতেছে,এবং সে স্থান পাশবিক ও কামিলভাবের প্রহেলিকা দ্বারা পূর্ণ হইতেছে। কিন্তু তাহাও বলি, যাহাকে পাশবিক বা কামভাব বলিয়া নীতিবাদীরা প্রাধান্য দিতেছেন, তাহার মধ্যে অনুসন্ধনীয় কি কিছুই নাই ?

ভারতবর্ষ চিরদিন আদিরসপ্রধান এবং সেই আদিরসে যত কাব্য ও কবিতার প্রখর প্রবাহ আর কোনও ভাবে বা রসে তাহা দেখা যায় না। সংসারে বীররসের যদি প্রয়োজন থাকে, তাহা হইলে কাব্যরসেরও প্রয়োজন আছে। স্ত্রীপুরুষের প্রেমালাভকালে বীর বীভৎস রসের ব্যবহার চলে কি ? কোনও স্নেহাস্পদকে আদর করিবার সময় তাঁহার সুকোমল গণ্ডে সজোরে চপেটাঘাত করিলে কি মমতা প্রকাশ হয় ? না, সহধর্ম্মিণী বীররসের আশ্রয় লইয়া প্রেমপূর্ণ স্বামী মহাশয়কে আঁচড়াইয়া দিলে, কিম্বা মুক্তাপাঁতিবিনিন্দিত দন্তশ্রেণী দ্বারা কোমল অঙ্গ হইতে শোণিতের ধারা বাহিত করিলে প্রেমের মাত্রা উথলিয়া উঠে ? প্রেমালাপ আদিরসের বহির্বিকাশ মাত্র। যে সে রসে বঞ্চিত, সে পশু। না, পশুরও অধম—কারণ পশুর প্রেমালাপও আদিরসজনিত। আদিরস না থাকিলে বহুদিন পূর্ব্বেই মানবসমাজের স্নিগ্ধ শ্যামলক্ষেত্রে মরুভূমির আবির্ভাব হইত,—মানব-সমাজ বিলুপ্ত হইত। নহে কি ? সংসারে আদিরস-বিবর্জ্জিত কে ?

কতকগুলি নবরুচিপরিপ্লুত ব্যক্তি নৃত্যগীতকে অতিশয় হীন চক্ষে দেখেন, নৃত্যগীতের মজলিসে গমনও পাপ মনে করেন, অথচ কোথায় কুরুচি তাহার নির্দ্দেশ করেন না, কিম্বা কুরুচির কেন্দ্র পাইয়াও তাহার সংস্কার সাধন করিতে সমর্থ নহেন। এরূপ রুচিবাগীশতার আমরা পক্ষপাতী হইতে পারি না। কলামধ্যে কোনও আবর্জ্জনা আসিয়া স্থান পাইলে, সেই আবর্জ্জনা দূর করিতে হইবে,—কলাকে বিতাড়িত করিলে চলিবে না। বারবনিতায় গীত গাহে, নৃত্য করে, হয়ত দর্শক বা শ্রোতার মন তাহাতে বিচলিত হয়, হয়ত নর্ত্তকীর প্রতি কাহারও কুদৃষ্টি পতিত হইতে পারে কিন্তু তাহা বলিয়া কি গীতের দোষ, না নৃত্যের দোষ ? না নর্ত্তকী বা গায়িকার দোষ ? আমাদিগের মনে হয়—সে দোষ দর্শকের, সে দোষ শ্রোতার। দর্শক বা শ্রোতা পাপ মন লইয়া রঙ্গস্থলে বা মজলিসে যায় কেন ? যাঁহারা রুচির স্পর্দ্ধা করেন তাঁহারা নিজেই অসংযত,

সংযম কি তাহা তাঁহারা কখনই শিক্ষা করেন নাই। চিত্তবিকারজনক দৃশ্যে বা বিষয়ে যদি চিত্ত উদ্বেলিত হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে; দর্শকের চিত্ত কলুষিত, এদেশে অনেক প্রকার নৃত্য আছে এবং প্রত্যেক নৃত্যের মধ্যে বিশেষত্ব পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত। বাই নাচ, খেমটা নাচ, থিয়েটারের নাচ, সঙ্কীর্ত্তনের নাচ, গ্রাম্য নাচ, মেথরদিগের নাচ, নাগাদিগের নাচ, বেহারের নটুয়া নাচ প্রভৃতি কত রকমের নাচ আমার চক্ষে পড়িয়াছে, আগ্রহের সহিত দেখিয়াছি, কোন নাচ ভাল লাগিয়াছে, কোনটা ভাল লাগে নাই। যে সকল নৃত্য-দর্শনে রুচিবিকারের সম্ভব, তাহাও আগ্রহসহকারে দেখিয়াছি; কিন্তু কখনও চিত্তবিকার হইয়াছে, কিম্বা সেই নর্ত্তকীর সহবাস-সুখলাভের স্পৃহা নিমেষের জন্যও মনে উদিত হইয়াছে—এমন ত মনে হয় না। কেবল আমিই সেজন্য স্পর্দ্ধা করিতেছি তাহা নহে, সহস্র সহস্র শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত পুরুষ রমণী সেরূপ নৃত্য কত দেখিতেছেন, কিন্তু তদ্দর্শনে কাহার মনে বিকার আসিয়াছে? বিকৃত ভাবদর্শনে বিকৃতচিত্ত ব্যক্তির হৃদয় ক্ষণেকের নিমিত্ত তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিতে পারে। সে শ্রেণীর লোক সর্ব্বদাই পরিহার্য্য, ভদ্রসমাজের অযোগ্য। সমাজের আবালবৃদ্ধবনিতা সংযমী নহে স্বীকার করি; কিন্তু অসংযমীদিগের চিত্ত যাহাতে নৃত্যদর্শনে বিচলিত না হয়, তাহার উপায় করিলে দোষ কি? নৃত্যবিশেষকে সংস্কার করিয়া লইলে তাহার দোষ ক্ষালিত হইতে পারে না কি? কিন্তু সে উদ্যোগ কোথায়, উদ্যোগী বা কোথায়?

সমাজের ছিদ্রান্বেষণে যাঁহারা সহস্রলোচন, কিন্তু তাহার ক্ষালনোপায়-নির্দ্ধারণে একবারেই অসমর্থ, তাহাদিগের অভিযোগ ধর্ত্তব্য নহে এবং সেইজন্যই রুচিবাদীদিগের মত তিষ্ঠিতে পারিতেছে না, নাট্যকলার সংস্কার হইতেছে না। অথচ ইদানীং দেখিতেছি ভদ্রমহিলাগণ অভিনেত্রীরূপে আসরে দেখা দিয়াছেন। প্রকাশ্য রঙ্গালয়ে নৃত্যগীতের পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতেছেন। বলা বাহুল্য, নটনটীরূপে অর্থোপার্জ্জনকে আমরা গর্হিত কর্ম্ম মনে করি না, বরং একটা বৃত্তি বলিয়া সম্ভ্রম প্রদর্শন করিয়া থাকি। তবে সে সম্ভ্রম পাত্রবিশেষানুসারে কোথাও উচ্চ, কোথাও লঘু হইয়া থাকে; কারণ এস্থলে ব্যক্তিত্ব লইয়া কথা, কলা বা বিদ্যা লইয়া নহে। পাশ্চাত্য সভ্য সমাজে নৃত্য ও গীত বিদ্যার যেরূপ আদর আছে, সেই সেই কলারও সেইরূপ বা ততোধিক আদর আছে। বিজ্ঞানের বিকাশ-কলা; কিন্তু বিজ্ঞান সকলের জন্য নহে। জনসাধারণ—পণ্ডিতমূর্খনির্ব্বিশেষে কলার পৃষ্ঠপোষক। ধামার চৌতাল

কয়জন বুঝে? কিন্তু গান শুনিলে সকলেই বলিতে পারে যে, সে গানটী কেমন গীত হইল। সকলেই গাহিতে পারে না, সকলে গাহিতে জানেও না, তথাপি কোন আসর বসিলে শত শত লোক সে অভিনয় দেখিবার জন্য বহুদূর হইতে আসিয়া আসর আগুলিয়া বসিয়া থাকে। কেন? কলার আকর্ষণী শক্তিই সকলকে আহ্বান করিয়া একস্থানে সমবেত করে।

পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে ও পাশ্চাত্য জাতিগণের জীবিকা-অর্জ্জনের বহু উপায় আছে, নৃত্যগীতও তাহার অন্তর্গত। বহু পুরুষ রমণী এই দুই বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়া থাকেন, অনেকে যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করেন, অনেকে যশস্বী হইয়া থাকেন। এ বিষয়ে পুরুষ অপেক্ষা রমণীগণের প্রতিপত্তি অধিক, কার্য্যক্ষেত্রও অধিক। নৃত্য, গীত ও বাদ্যযন্ত্র ক্রীড়ায় রমণীগণ যত মুগ্ধ করিতে পারেন, পুরুষে সেরূপ পারে না, এই কারণেই এ কয়টী, বিশেষতঃ নৃত্য ও গীত—স্ত্রীলোকদিগের একায়ত্তস্বরূপ মনে হয়। অভিনয় কার্য্যেও স্ত্রীলোকদিগের যথেষ্ট সামর্থ্য আছে, অনেক রমণী—সারা বার্ণহার্ড, আমাদিগের স্বদেশী গায়িকা গহরজান প্রভৃতি অভিনয় কার্য্যে অতুলনীয় কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। ইঁহারা মজুরা করিয়া প্রতি রজনীতে রাশি রাশি টাকা উপার্জ্জন করিয়া থাকেন। ইউরোপ ও আমেরিকার রঙ্গালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ এই শ্রেণীর বিখ্যাত অভিনেত্রী, গায়িকা ও নর্ত্তকীদিগের সহিত চুক্তি করিয়া তাঁহাদিগকে সাধারণ সমক্ষে অভিনয়ে নিযুক্ত করেন। এইরূপে সেই সকল কলাপারদর্শিণী রমণীগণ বর্ষে বর্ষে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করেন, অন্য দিকে রঙ্গালয়ের কর্ত্তৃপক্ষও বহু অর্থের সংস্থান করেন। এ সকলই সত্য, আমাদিগের দেশেও অত্যুন্নতিশীল সম্প্রদায় হয়ত ইচ্ছা করেন যে, আমাদিগের অসূর্য্যম্পশ্যা কুলকামিনীগণ প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হইয়া অঙ্গসৌষ্ঠব প্রদর্শন করেন এবং কোকিলকণ্ঠবিনিন্দিত স্বরে আগন্তুকগণের প্রাণমন হরণ করেন কিম্বা সীতারূপে রামরূপী পরপুরুষকে আলিঙ্গন কিম্বা তাঁহার অধরসুধা পান করিয়া দাম্পত্যপ্রেমের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন! আমরা অনেকটা সেকালের মানুষ, এ দৃশ্যটা আমাদের চক্ষে ভাল ত লাগিবেই না, অধিকন্তু এ চিন্তা করিতেও আমরা শিহরিয়া উঠি, লজ্জায় অধোবদন হই। তবে, যাঁহারা অন্তঃপুরের মসিমণ্ডিত (?) প্রাচীরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, যাঁহারা অন্তঃপুরকে কারাগার মনে করেন, যাঁহারা পথে পথে অবাধে ভ্রমণ করেন, তাঁহারা এ কার্য্যে ব্রতী হইলে ক্ষতি নাই; বরং আমরা তাঁহাদিগের অভিনয় ও নৃত্যগীতাদিতে

উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করিতেও প্রস্তুত আছি, কিন্তু কুল-মহিলাগণকে এ সকল কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে আমরা উৎসাহিত করিব না।

নৃত্যগীত-সম্পর্কীয় শিল্প যতই উচ্চ হউক, তৎসমুদায় অপেক্ষা উচ্চতর ও অধিকতর প্রয়োজনীয় কার্য্য সংসারে অনেক আছে, এবং কুলমহিলাগণ তাহাতে কৃতিত্ব লাভ করিলে সংসার সুখময় হয়, সংসার স্বচ্ছল হয়। দাক্ষিণাত্যে ও আর্য্যাবর্ত্তে কুলমহিলাগণ গৃহস্থালীতে সঙ্গীতের চর্চ্চা রাখেন, পাল-পার্ব্বণে গ্রাম্য পথিমধ্যে অনেক সময় রাজপথে, দলে দলে 'গীতযাত্রা' করিয়া থাকেন—ইহা তাঁহাদিগের দেশীয় আচার মধ্যে পরিগণিত; সুতরাং তৎসম্বন্ধে আলোচনা অতি গর্হিত কর্ম্ম। কিন্তু বাঙ্গালায় যখন সে প্রথার প্রচলন নাই, এবং যখন লোকাচার তাহার পরিপন্থী, তখন এদেশে তাহার প্রবর্ত্তন কোনও ক্রমে স্পৃহনীয় নহে। কোমলপ্রাণা বালিকাদিগকে শৈশব হইতে সুশিক্ষা দাও, সৎপথে বিচরণ করিতে অভ্যস্ত কর। পাপে ঘৃণা ও পুণ্যকার্য্যে তাহাদিগের প্রবৃত্তি হউক। তাহারা আদর্শ কন্যা হউক, ভবিষ্যতে পবিত্র-হৃদয়া সহধর্ম্মিণী হউক, অন্নপূর্ণারূপে আত্মীয়-স্বজন অতিথি-প্রতিবেশী-পালনপরায়ণা হউক, সৎশিক্ষাদানে সন্তান-সন্ততিদিগকে উন্নত, উদারচরিত্র, মিষ্টভাষী, সদালাপী ও স্বদেশবৎসল হইতে উদ্বুদ্ধ করুক। অর্থব্যয় করিলে আমোদ-প্রমোদ সহজপ্রাপ্য; কিন্তু অর্থব্যয়ে আদর্শ রমণী,—কন্যা, ভগিনী, সহধর্ম্মিণী বা জননী মিলে না। দেশের মধ্যে ঘরে ঘরে আদর্শ জননী গড়িতে হইবে, তবেই দেশের মুখ উজ্জ্বল হইবে, দেশের অতীত গৌরব পুনরায় দীপ্তিমান্ হইয়া উঠিবে। বলা বাহুল্য, আমরা যেরূপ শিক্ষার প্রয়াসী তাহা আধুনিক পাশ্চাত্য প্রণালী-গত শিক্ষা নহে। পাশ্চাত্য ভাব, পাশ্চাত্য আচার, পাশ্চাত্য সামাজিকতা দেশের মধ্যে বর্ষার নদী-প্রবাহের ন্যায় প্রবেশ করিতেছে। রমণীকুলও তাহাতে প্লাবিত হইতেছেন—ইহা আশার কথা নহে। সে স্রোত রোধ করিতে হইবে, সমাজ-রঙ্গমঞ্চে সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তীকে আদর্শরূপে স্থাপন করিতে হইবে,—তবে আধুনিকতার সহিত সামঞ্জস্য করিয়া লইবার জন্য স্বামীর মুখরোচক দুই চারিটা ইংরাজী বুলি ফুটাইয়া দাও—কিন্তু আসলটা যেন আর্য্যনারীরই অনুরূপ হয়। তেমনটী না হইলে সমাজ আর থাকে না।

"না জাগিলে সব ভারত ললনা,
এ ভারত আর জাগে না, জাগে না"—

এ সঙ্গীতটী আমরা অনেকস্থলে ও অনেকের মুখে শুনিয়াছি; কিন্তু তাহার তাৎপর্য্য

আমরা আজও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। অনেক সময়ে ভাবি যে, ভারত-ললনার জাগরণ অর্থে কি বুঝিব? ভারত-ললনার রাজনীতি আলোচনা, না তাঁহাদিগের সফ্রিগেট দলভুক্ত হইয়া পুরুষের প্রতিদ্বন্দ্বিতাচরণ করা, না পুরুষের কাজের পরিপন্থী হওয়া? ভারতের ললনা-চরিত্র জগতের আদর্শ। তাঁহারা এমন কি অজ্ঞানান্ধকারে বিচরণ করিতেছেন যে, তাঁহাদিগকে জবরদস্তি করিয়া পবিত্র অন্তঃপুরের বাহিরে আর না আনিলে চলে না? পাশ্চাত্য সমাজকে ভারতের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা দেশহিতৈষিতা বলিয়া আমরা মনে করি না, বরং যাঁহারা তজ্জন্য উদ্যোগী তাঁহাদিগকে কালাপাহাড় নামে অভিহিত করিলে বোধ হয় অন্যায় হয় না।

গিরিশ-অর্চ্চনা।

[লেখক—শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র, এম্‌-এ।]

'নিমচাঁদ'-ভূমিকায় তুষি সুধীজন
নিদ্রাশেষে যবে তুমি হ'লে জাগরিত,
দেখিলে জয়ের ধ্বনি কাঁপায়ে পবন,
গৃহ পথ রঙ্গমঞ্চ করে মুখরিত।
প্রয়োগ-বিজ্ঞানে সেই প্রতিভা-উন্মেষ
নাটকে হইল সে যে পূর্ণ বিকশিত—
স্ফীতধারা ভাগীরথী পার্ব্বত্যপ্রদেশ
ত্যজিয়া বিশাল স্রোতে যথা প্রবাহিত।
বাণীর বরেতে তুমি দিব্য তুলিকায়
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ করিলে চিত্রিত,
নানা গন্ধে নানা বর্ণে নানান ধারায়
কুসুম-কাননে যথা করে সুশোভিত।
রহিবে তোমার কীর্ত্তি অক্ষয় অপার,—
একাধারে হ'লে শ্রেষ্ঠ নট-নাট্যকার।

দীক্ষা।

[লেখক—শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার, বি-এ।]

কি মন্ত্রে ভুলালে মন?—কেমনে তা বলি,
কি মন্ত্রে 'অন্তর' হ'তে আনিলে অন্তরে,
বাঁধিলে আছিল মোর যা কিছু সকলি
অচ্ছেদ বন্ধনে এক জনমের তরে!

জনমের তরে?—সে ত সব সত্য নয়,
সেইটুকু নহে তার পূর্ণ ইতিহাস,
দুইটি আত্মার এ যে চির-পরিচয়,
এ যে জন্মান্তের স্মৃতি—ভবিষ্যের আশ!

কি মন্ত্র জনম দিল এ চির-বন্ধনে
কোন্ যুগে হ'ল গীত উদ্বাহ-সঙ্গীত—
সে কথা পরেরে আজ বুঝাব কেমনে?
শুধু করি অনুভব,—ভরি' ওঠে চিত!

যা'তে বিশ্ব পড়ে বাঁধা, যাহার কুহকে
ফোটে ফুল, গাহে পাখী, ঝরে প্রস্রবণ,
চলে গ্রহ উপগ্রহ শূন্যে মহালোকে
এও তাহারি সৃষ্টি—প্রেমের স্বপন!

প্রতি জনমের প্রাতে উষার আলোকে
অনুভবি ইহারই বিচিত্র উন্মেষ;
অর্দ্ধ-জাগরণ আধ-তন্দ্রা-ভরা চোখে
হেরি শুধু তোমারই নব-জন্ম-বেশ!

এ জন্মের পুরাতন-নব-পরিচয়ে
অতীতেরি স্নেহ-জাল আনিয়াছ টানি',
সুখে দুঃখে একসাথে মায়া-সূত্র লয়ে
বাঁধিছ দোঁহারে এক অনুভব আনি'।

যেথা শুধু পরিহাস—দিয়েছ সান্ত্বন,
যেথা মিথ্যা অবিচার—দেছ চিত্তে বল,
যেথা শুধু 'দাও দাও' খিন্ন করে মন
বিলায়েছ আপনারে,—চাহ নি সম্বল!

শান্ত প্রেম, স্থিরা ভক্তি, অটল বিশ্বাস,
করুণা-সহানুভূতি-স্নেহ-ভরা প্রাণ,
হৃদয়ে হৃদয় দিয়া জাগানো আশ্বাস,
এই যদি মন্ত্র হয়—দাও দীক্ষা-দান।

গ্রন্থ-সমালোচনা।

চীবর।—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র মিত্র-প্রণীত। মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা। দীনধাম হইতে প্রকাশিত।

'আকিঞ্চন'-প্রণেতা শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের এই কাব্যগ্রন্থখানিতে পঞ্চাশটি কবিতা আছে। শিশু চীবরখণ্ড কুড়াইয়া পাইলে ছুটিয়া আসিয়া যখন মাতাকে বলে—

"দেখ মা এনেছি আমি কেমন বসন,
একবার পর দেখি, হয় মা কেমন।"

তখন জননী—"ছিন্ন ম্লান মূল্যহীন অমূল্য সে ধনে", বড় মহার্ঘ মনে করেন। বিনয়ী কবি তাঁহার কবিতাগুলিকে সেইরূপ সামান্য চীবর ভাবিয়া জননী বঙ্গভাষাকে উপহার দিয়াছেন, তাঁহাকে শুধাইয়াছেন—"তুমি কি লবে না তাহা স্নেহে বুকে করে?" অসহায়া বঙ্গমাতাকে আমরা বস্তা বস্তা পূতিগন্ধময় ছেঁড়া নেকড়া আনিয়া দিতেছি, ঝুড়ি ঝুড়ি পচা ফুল আনিয়া তাহা

পারিজাতের মত যত্ন করিয়া উৎসর্গ করিতেছি, মা'র আমার বিরক্তি নাই, ব্যাজার নাই, সকলগুলিই স্নেহ করিয়া লইতেছেন। কিন্তু কাহার অর্ঘ্যে জননীর কি শোভা হইতেছে সে কথার মীমাংসার ভার মায়ের সন্তানদের উপর। বঙ্কিমবাবুর চীবর-ভূষিতা জননীর হাস্যোজ্জ্বল অথচ গম্ভীর মুখ দেখিয়া, মায়ের মুখে জ্ঞান-ভক্তির দিব্যকান্তি নিরীক্ষণ করিয়া, তাঁহার চক্ষে পুণ্যের কল্যাণকর মাধুরী উপলব্ধি করিয়া সকলকে বলিতে হইবে যে, আজ যে চীবরে বঙ্কিমবাবু জননীর পূতদেহ সুসজ্জিত করিয়াছেন তাহাতে আজ দুঃখিনী ভাষা-জননী বাস্তবিকই লাবণ্যময়ী হইয়াছেন। আজ তাঁহার চীবর-ভূষিতা বঙ্গভাষা গভীরভাবে বিভোরা, ভক্তিরসে স্নাতা।

'চীবরে'র মূলমন্ত্র পাওয়া যায়—'অর্চ্চনা' নামক কবিতায়। চৌদ্দ লাইনের ছোট সনেট ভক্তিরসে 'ডগমগ' করিতেছে, ভক্তের হৃদয়ের বিভোর সাধনার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। হিন্দুর প্রাণের প্রধান তারে ঝঙ্কার দিয়া কবি বলিয়া উঠিয়াছেন—

"এ জীবন হ'ক চির অর্চ্চনা তোমার
প্রতি কর্ম্ম হ'ক তব পূজা উপচার"

"প্রতি নিঃশ্বাসে হোমাগ্নি জ্বলুক, সকল সম্ভোগ সেথা আহুতি পড়ুক", গন্ধময়ী প্রকৃতির গন্ধে কেবল আরতির ধূপগন্ধ অনুভূত হউক, জগতের কণ্ঠরব পবিত্র বাদিত্র, এবং একাদশ ইন্দ্রিয়ের বিষয় চিরনিবেদিত নৈবেদ্য হউক।" শেষে

"প্রসাদের পূতচিহ্নে লাঞ্ছিত এ প্রাণ
তব বাঞ্ছারূপ যূপে যাক বলিদান।"

এত আবেগময়ী ভাষায় গভীর ভক্তির কবিতা বহুদিন বঙ্গভাষায় শুনি নাই। এখন ন্যাকামীর যুগ, বাহ্যিক চাকচিক্যের কাল। আজকাল লোকে ভাব ফেলিয়া ভাষার পূজা করে, এখনকার কবির দল বাগর্থের চির-মিলনের বিচ্ছেদ ঘটাইতে চাহে—এখন শব্দে অর্থ বুঝিতে গেলে হাস্যাস্পদ হইতে হয়—এখনকার শব্দ 'গন্ধ'-বাহক। এই যুগে শব্দের ভিতর দিয়া প্রাণের গভীরতম ভাবের উচ্ছ্বাস ছুটাইয়া কবি ভাষা-জননীর প্রকৃত নিষ্ঠাবান্ সাধক সন্তানের কাজ করিয়াছেন।

বলিয়াছি, 'অর্চ্চনা' কবিতায় চীবরের মূলমন্ত্র পাওয়া যায়। সে মূলমন্ত্র ঐকান্তিকী ভক্তি। সেই বিশ্বপ্রেম প্রাণে লইয়া কবি পিককণ্ঠে পার্থিব নায়িকার জন্য বিরহবিধুর না হইয়া, কবি সেই পিককণ্ঠে "সন্ধ্যার আরতি"র "শঙ্খঘণ্টা" শুনিয়াছেন। প্রাণে এই ভাব লইয়া কবি "আকাশ" দেখিয়াছেন। "আকাশ"—"অতীতের ভাষ্যে ভরা মূল সূত্র ভবিষ্যের।" কবির "আকিঞ্চনে" অতীতের গরিমা বড় বেশী; কিন্তু "চীবরে" ভবিষ্যতের আশাটুকু বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। "প্রবাহিণী" কবিতায় কবি অতীতের "বিশাল তট" ও "রূপের হাটে"র জন্য শোক করেন নাই। তিনি বুঝিয়াছেন, প্রবাহিণীর "অনাদি অনন্ত যাত্রা" "মানস-যমুনা" কবিতাতেও ভবিষ্যতের সুখমদিরার আস্বাদন। কেন ভবিষ্যৎ জীবন সুখের, সে প্রশ্নের উত্তর কবি এবার পাইয়াছেন। তিনি বুঝিয়াছেন, তিনি বিশাল বিশ্বনিয়ন্তার অংশ মাত্র, "সিন্ধুমাঝে বিন্দুবিন্দু" আমি অস্ফুটের দ্বারা ফুটিতেছি মাত্র। সেই বিশ্বাসে হিন্দু কবি বড় স্পর্দ্ধা, বড় আত্মহারা হইয়া বলিতেছেন—

"তুমি আমি চিরসাথী
আমাতে তোমারি ভাতি
তোমারি মৃণালে আমি বিকসিত শতদল।
তোমারি বরণ শোভা, তোমারি সে পরিমল।"

এই সুরে বীণা বাঁধিয়াছেন বলিয়া বঙ্কিমবাবুর "চীবর" হিন্দুর প্রাণের "চির আহ্বান" ভবিষ্যৎ আশা জাগাইতে পারিবেন।

'ধ্রুব' কবিতায় বালক সাধকের মনের দ্বন্দ্ব, তাহার তীব্র বাসনার উদ্বেগ, তাহার শিশু হৃদয়ের কল্পনা-জল্পনা, তাহার অপরিমেয় মাতৃভক্তি বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রবৃত্তি মার্গের উপকারিতা বুঝাইয়া কবি বড় সাদা কথায় বলিয়াছেন—"সেই, বল চালাবার, সেই, ফল পাইবার"। এইরূপ মনোবিজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন কবি "নিমাই সন্ন্যাস" কবিতায়। "বৃন্দাবন-স্বপ্ন" পাঠ করিতে পুলক অনুভব করিতে হয়; ক্ষণেকের জন্য সহরের কলরব হট্টগোল ছাড়িয়া অতীতের যমুনা-কূল কদম্বমূল বংশীবটে ভ্রমিতে হয়—কবি-কল্পনায় নিজেকে নানাভাবে দেখিতে হয়। বাস্তবিক স্বপ্নের মাদকতা এ বর্ণনায় বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে। স্বপ্নে যেমন ক্ষণে ক্ষণে ভাবের পরিবর্ত্তন ঘটে, কবিরও তেমনই ঘটিয়াছে—তিনি অনুভব করিতেছেন—

"আমি যেন নন্দরূপে জনকের স্নেহরাশি,
পশিতেছি যশোদায় জননীর মায়া আসি,
আমি যেন সে স্নেহের সে মায়ার অধিকারী
নিখিল লাবণ্যভরা গোপালের বেশধারী।"

"চীবরে"র প্রত্যেক কবিতার সমালোচনার স্থান আমাদের নাই। আমরা কতকগুলি কবিতার পরিচয় দিয়া দেখাইয়াছি, কোন্ শ্রেণীর কবিতায় পুস্তকখানি সমুজ্জ্বল। কেবল 'কৃষ্ণনগর' "সমর-মঙ্গল" "গোবরডাঙ্গা" প্রভৃতি কতকগুলি কবিতা এ পুস্তকে 'হংসমধ্যে বক'রূপে অধিষ্ঠিত। সেগুলিকে "চীবরে"র অঞ্চলে স্থান না দিলে ভাল হইত।

"চীবরে"র ভাষা হেঁয়ালি-বর্জ্জিত, মনোরম। "চীবরে"র তান প্রাণ-মন পুলকিত করে, কাব্যের ছলে রহস্যময় জটিল ধর্ম্মের সমস্যা ভঞ্জন করিয়া দেয়। ইহাতে ভণ্ডামির মুখোস নাই, ধর্ম্মোপদেশকের বক্তৃতার আড়ম্বর নাই। ধর্ম্মপ্রাণ সাধক কবির প্রাণে যেমন একটি ভাবের লহর আসিয়াছে, তিনি অমনি সেগুলিকে ধরিয়া ভাষায় প্রকটিত করিয়াছেন। আর্টের দোহাই দিয়া সে গুলিকে কাটিয়া ছাঁটিয়া অভিধান হইতে ভাবহীন তরল শব্দ চয়ন করিয়া 'আধুনিক কাব্যি' রচনা করেন নাই। একটা উদাহরণ দিলে এ কথাটা পরিস্ফুট হইবে। "বঙ্গভাষা" কবিতায় তিনি বলিয়াছেন, বঙ্গভাষা আমাদের "রসনার প্রথম বিকাশ" "এই শ্রবণের প্রথম বিলাস।"

"সে যে 'চলি চলি পায় পায়' চলি
এ শিশু চরণে চলা শিখায়েছে;
সে যে 'ঘুম আয় ঘুম আয়' বলি
শৈশবে সবারে ঘুম পাড়ায়েছে।"

এই রকম ছন্দে তিনি 'আয় চাঁদ' 'ষাট ষাট' 'কে রে' 'সোনা' 'হীরা' 'মণি' 'আঃ' 'মা' 'হরি' প্রভৃতি বাঙ্গালা কথার মহিমা বুঝাইয়াছেন। এই সকল শব্দ প্রক্ষেপ করিয়া ছন্দ মিলাইতে গেলে কবিতা বড় বেশী শ্রুতিমধুর হয় না, স্থানে স্থানে ছন্দের পতন ঘটে। কিন্তু এই কথাগুলি

বসাইয়া কবি আমাদের প্রাণের এমন একটা কোমল স্থলে আঘাত করিয়াছেন যে, আমরা এ কবিতাটি পড়িবার সময় মধুর ভাবে ভরিয়া উঠি—তখন ভাবেই সৌন্দর্য্য অনুভব করি ; ভাষার সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার প্রবৃত্তি হয় না। এরূপ কবিতা কষ্টকল্পনা নহে; টেলিগ্রাফের সিগনালার যেমন তারের অস্ফুট ভাষা অজ্ঞের গোচরীভূত করে, কবি তেমনি বিশ্ববার্ত্তা আমাদের সমক্ষে ধরিয়াছেন। বার্ত্তাটুকু সরস বলিয়া কবিতা সরস হইয়াছে, মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছে। তথা-কথিত আর্টের চিক্কণতায় উহা সরস হয় নাই। 'হরিনাম' কবিতার কবি একস্থলে লিখিয়াছেন—

"তখন আকাশ বারিদ আভাসে
সে যে স্নিগ্ধকরা বারি দিতে চায়।"

অবশ্য 'স্নিগ্ধকরা বারি' মোটেই শ্রুতিমধুর নহে। একটু মাজিয়া ঘসিয়া দিলে লাইনটা আরও সুশ্রাব্য হইত। ভাব বজায় রাখিয়া ভাষাকে কোমল করিতে পারিলে কবিতার সৌষ্ঠব-বৃদ্ধি হয়। কিন্তু ভাষার জন্য ভাবের বলিদান একেবারে বর্জ্জনীয়। আগামী বারের সংস্করণে কবি কতকগুলা ভাষা মাজিয়া ঘষিয়া দিলে কাব্যখানি নির্দ্দোষ হইবে। কিন্তু যদি মাজিতে গিয়া ভাববিরোধ ঘটিবে তিনি এরূপ মনে করেন, তাহা হইলে ওরূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার প্রয়োজন নাই।

'বংশীধ্বনি' 'জীবনের তারা' 'আগমনী' প্রভৃতি কবিতায় ভাব ও ভাষার খুব সমন্বয় হইয়াছে ; যেমন গভীর অথচ মধুর ভাব, তেমনি গম্ভীর অথচ স্বচ্ছন্দ ভাষা।

তাই বলিতেছিলাম, কবি-সন্তানের চীবর-ভূষিতা হইয়া মাতার শ্রীঅঙ্গের লাবণ্য বাড়িয়াছে, জননীর মুখে প্রসন্নতার বিমল হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

দরিদ্রের ক্রন্দন।—শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়, এম্, এ প্রণীত। বহরমপুর শাখা সাহিত্য পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ৷৷৵০ বার আনা।

আমরা শ্রীযুত রাধাকমল বাবুর এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছি। এ পুস্তকের প্রতিপাদ্য বিষয় আমাদের জাতীয় দারিদ্রের সমস্যাপূরণ, কিরূপে দেশের আর্থিক অবস্থা উন্নত হইতে পারে তাহার উপায় নির্ণয়। রাধাকমলবাবু এ পুস্তকে এ সমস্যার যে মীমাংসা করিয়াছেন তাহা আধুনিক শিক্ষিত সমাজের মীমাংসা। আমাদের আধুনিক বিলাসিতা কালকীটরূপে সমাজের অন্তস্তল জীর্ণ করিতেছে, পরানুকরণে আধুনিক হিন্দুসমাজ অন্তঃসার শূন্য হইতেছে, একান্ন-পরিবার-প্রথা ধ্বংস হইতেছে, তাহাতে সমাজের নৈতিক অবনতি ঘটিতেছে। এখন আবার বাঙ্গালাদেশের প্রাণ পল্লী-সমাজকে না গড়িয়া তুলিতে পারিলে আমাদের রক্ষা নাই, রাধাকমল বাবুর ইহাই অভিমত। কিরূপে পল্লী-সমাজের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্য লইয়া কিরূপে পল্লীগ্রামে জন-শিক্ষার প্রসার করিতে হইবে, বিজ্ঞান প্রচার করিতে হইবে এবং যৌথ-ক্রয়-বিক্রয় ও নূতন ব্যবসার প্রবর্ত্তন করিতে হইবে, গ্রন্থকার তাহা অতি সুন্দরভাবে বুঝাইয়াছেন। রাধাকমলবাবু বয়সে নবীন হইলেও বেশ জ্ঞানবৃদ্ধ প্রবীণসমাজতত্ত্ববিদের মত এ সকল কথার আলোচনা করিয়াছেন। বিবেকানন্দের সেই আবেগময়ী বাণীকে বীজমন্ত্র করিয়া পল্লীগ্রামে ঘুরিয়া, অনেক statistics সংগ্রহ করিয়া রাধা-

কমল বাবু 'দরিদ্রের ক্রন্দন' শুনাইয়াছেন। এখন বিলাসীদিগের কর্ণে সে ক্রন্দন প্রবেশ করিলে, অলস বাঙ্গালীর বাহুতে সেই আর্ত্তনাদ নূতন বল সঞ্চার করিলে তাঁহার শ্রম সফল হইবে। জাতিকে তুলিতে হইলে জাতীয় দেহের সমস্ত অঙ্গের স্বাস্থ্য আবশ্যক। আমাদের স্মরণ রাখা উচিত বিবেকানন্দের সেই যুগ 'প্রবর্ত্তক বাণী—নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙ্গল ধরে, চাষার কুটীর ভেদ করে, জেলে, মালা, মুচি, মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হ'তে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালায় উনানের পাশ থেকে। বেরুক ঝোড় জঙ্গল পাহাড়, পর্ব্বত থেকে।'

পাপের প্রায়শ্চিত্ত।—শ্রীচণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। "শ্রীমদ্ভাগবত অবলম্বনে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি রচিত" হইয়াছে।

এই গ্রন্থে ভক্ত লেখক 'ভক্তি, ভক্ত ও ভগবানের অসীম মহিমাত্মক অপার মহাসিন্ধুর বিন্দু আস্বাদন' করাইয়া নিজেও ধন্য হইয়াছেন, পাঠককে ধন্য করিয়াছেন। গ্রন্থখানির ভাষা প্রাঞ্জল নহে; তবে স্থানে স্থানে উচ্ছ্বাসগুলি ভক্তের মুখ-নিঃসৃত বলিয়া মার্জ্জনীয়। মোটের উপর, আমরা গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া প্রীত হইয়াছি; পাঠক সাধারণের মধ্যে ইহার বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। লেখক এই "পাপের প্রায়শ্চিত্তের সর্ব্বসত্ব সুরক্ষিত" রাখিয়াছেন। ইহা বোধ করি ত্যাগের দৃষ্টান্ত নহে, মুদ্রাকর প্রমাদ!

মহাভারত।—শ্রীযুক্ত হরিপদ ঘোষ-সঙ্কলিত। মূল্য ৶০। নামেই বিষয় সূচিত হইতেছে। গ্রন্থখানি ৺কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের মহাভারতের সংক্ষিপ্তসার। এই 'অপিন্যাস-কাব্যি'র যুগে, ন্যাকামি-ভণ্ডামির দিনে এবং সুলভে 'সাহিত্যিক' সাজিবার শুভ অবসরে যিনি একনিষ্ঠ সাহিত্য-সাধনায় মহাভারত-মহাকাব্যের অমৃতবাণী আবালবৃদ্ধবনিতাকে শুনাইবার শুভ উদ্দেশ্য লইয়া—এই গ্রন্থখানি সঙ্কলন করিয়াছেন তিনি ধন্য। ভূমিকায় একস্থলে তিনি বলিতেছেন—"অনেকে মহাভারত ক্রয় করিতেছেন, কিন্তু সময়াভাবে পাঠ করিতে পারিতেছেন না; কাহারও গ্রন্থের কলেবর-দর্শনে ধৈর্য্যচ্যুতি হইয়া পড়িতেছে; কেহ বা গ্রন্থের কোন্ স্থানে কি আছে তাহা অন্বেষণ করিয়া পাইতেছেন না। কাজেই মহাভারতের কলেবর এক্ষণে বঙ্গসমাজে ভীতি উৎপাদন করিতেছে।" এই কৈফিয়ত খাঁটি সত্য। লোকে এখন পরিশ্রম করিতে চাহে না, সস্তায় নাম কিনিতে চাহে। তাই মনে হয় পাঠক-সাধারণের হৃদয়ে মহাভারত-পাঠের আকাঙ্ক্ষা-বীজ উপ্ত করিবার জন্য এইরূপ একখানি গ্রন্থ-প্রকাশের ঐকান্তিক আবশ্যকতা উপলব্ধি হইতেছিল। বলা বাহুল্য, গ্রন্থখানি সে উদ্দেশ্য সফল করিবে, দেশের কল্যাণসাধন করিবে।

ভূমিকায় আর একস্থলে আছে—"কৃষ্ণ অসাধারণ চরিত্রবলে কিরূপ জাতীয় ভাবের উদ্দীপন করিয়াছিলেন, এই সংক্ষিপ্ত মহাভারত পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। এই পুস্তকে আমার রচনা বা নিজস্ব কিছুমাত্র নাই। আমি উপাখ্যানভাগ পরিত্যাগ করিয়া কেবল আদর্শ-চরিত্র গুলির ইতিহাস সংক্ষেপে সংগ্রহ করিয়াছি। আমার বিশ্বাস, এইগুলি ব্যাসের প্রথম উদ্যমে যে চতুর্ব্বিংশতি শ্লোকে মহাভারতের ইতিহাস ভাগ রচিত হইয়াছিল, তাহারই অন্তর্ভূত।" এই ক্ষুদ্র মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ ও ভীষ্মের আদর্শ চরিত্র মানস-পটে মূর্ত্তিমান্ হইয়া প্রকটিত হয়। মহাভারতে বর্ণিত স্থানগুলি বর্ত্তমান সময়ে কি নামে অভিহিত হয় লেখক বহু পরিশ্রম ও গবেষণা করিয়া তাহার পরিচয় দিয়াছেন। ইহা সঙ্কলন-কর্ত্তার কৃতিত্বের পরিচয়।

এই গ্রন্থে অনেকগুলি ত্রুটিও আছে। 'অশুদ্ধ শোধন পত্রে' উল্লিখিত শব্দগুলি ব্যতীত আরও অনেক অশুদ্ধ শব্দ রহিয়া গিয়াছে। সরল ভাষায় লিখিত হইলে গ্রন্থখানি শিশুপাঠ্যের উপযোগী হইত। এই গ্রন্থমধ্যে অনেক পৌরাণিক নাম সন্নিবিষ্ট হইয়াছে যাহাদের পরিচয় প্রদত্ত হয় নাই। আমাদের মনে হয় মহাভারতের ছোট বড় সমগ্র চরিত্রগুলি লইয়া একটী বংশতালিকা দিলে পরস্পরের সম্বন্ধ কি জানিবার পক্ষে পাঠকের একটা বিশেষ সুবিধা হইত। আশা করি পর-সংস্করণে আমাদের অনুরোধ উপেক্ষিত হইবে না।

বৈদ্যক-শব্দ-সিন্ধু।—স্বর্গীয় কবিরাজ উমেশচন্দ্র গুপ্ত-সঙ্কলিত। সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কর্ত্তৃক সংশোধিত, পরিবর্দ্ধিত ও প্রকাশিত। গ্রন্থের মূল্য ৬৲ টাকা মাত্র। পুস্তকখানি ১৯নং লোয়ার চিৎপুর রোডে কবিরাজ মহাশয়ের ঔষধালয়ে কিনিতে পাওয়া যায়।

গত বৎসর বর্দ্ধমানের সাহিত্য-সম্মিলনে, সভাপতির আসনে বসিয়া মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বাঙ্গালার কুড়িটি গৌরব-কথা একে একে বিবৃত করেন ;—তাহার মধ্যে প্রথমেই উল্লিখিত হয়—'হস্তী-চিকিৎসা'র কথা। কিন্তু এদেশের যেটি প্রধান গৌরব—মানব-চিকিৎসা, তাহার নাম-গন্ধও তিনি ভুলিয়া করেন নাই। আশঙ্কা, পাছে বৈদ্য জাতির নাম করিতে হয়!

কিন্তু সত্যের কি বিনাশ আছে? যাহার নাম করিতে শাস্ত্রী হরপ্রসাদ ভয় পাইয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে তাঁহার গুরু বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়া গিয়াছেন,—"দেশী চিকিৎসা অদ্যাপি বিলাতী চিকিৎসার প্রতিযোগিনী হইয়া, প্রচলিত আছে,—বিলাতী চিকিৎসার প্রচার সত্ত্বেও দেশী চিকিৎসার মান আজিও বজায় আছে,—কোন গুণ না থাকিলে কি এরূপ ঘটিত? দেশী ভূতত্ত্ব, দেশী জ্যোতিষ, দেশী গণিত, সকল প্রকারের দেশী বিজ্ঞান, দেশী প্রাচীন ভাষা পর্য্যন্ত, বিলাতী বিজ্ঞান, বিলাতী ভাষার কাছে দাঁড়াইতে পারিতেছে না, কেবল দেশী দায় মীমাংসা শাস্ত্র, এবং দেশী চিকিৎসা-শাস্ত্র অদ্যাপি প্রবল। কোন গুণ না থাকিলে কি এরূপ ঘটিতে পারে?"

আসল কথাই হইতেছে তাই। বাঙ্গালার হরপ্রসাদগণ স্বীকার না করিলেও, নিরপেক্ষ ব্যক্তিমাত্রেই দেশী চিকিৎসা-শাস্ত্রের গৌরব উপলব্ধি করেন—মুক্তকণ্ঠে তাহার গুণগান করিয়া থাকেন।

আয়ুর্ব্বেদ—অথর্ব্ববেদান্তর্গত পঞ্চম বেদ। ইহাতে তন্ত্র, স্মৃতি, ন্যায়, সাংখ্য, বেদ ও বেদান্তাদির বহু কথা—বহু শব্দ সন্নিবিষ্ট আছে। তাহার উপর, ইহাতে যে সকল বৃক্ষ, লতা, গুল্মাদিবাচক শব্দ পাওয়া যায়, তাহা প্রায়শঃ রূঢ় ;—প্রকৃতি-প্রত্যয়াদি দ্বারা তাহার অনেক সময় যথাযথ অর্থ উপলব্ধি হয় না। এই জন্য, এই শাস্ত্রের একটি উৎকৃষ্ট অভিধানের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। সুখের বিষয়, সে অভাব পূরণ করেন—স্বর্গীয় কবিরাজ উমেশচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়। আরও সুখের কথা এই যে, সেই মূল্যবান গ্রন্থকে সুলভ করিয়া দিয়াছেন—কবিরাজ শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়। সেই বহিখানি আমাদের অদ্যকার আলোচ্য—বৈদ্যক-শব্দ-সিন্ধু। এই সুবৃহৎ অভিধানটির পূর্ব্বে মূল্য ছিল দশ টাকা ; এখন হইয়াছে ছয় টাকা মাত্র। এই অমূল্য গ্রন্থ কবিরাজগণের গৃহে গৃহে গৃহ-পঞ্জিকার ন্যায় বিরাজ করুক, ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা।

হিন্দুর দেবতত্ত্ব।

অর্দ্ধনারীশ্বর।

[লেখক—শ্রীগিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ]

অর্দ্ধনারীশ্বর বা হরগৌরীর মিলিত মূর্ত্তি হিন্দুর অতি সুপরিচিত। সংস্কৃত সাহিত্যে নানা স্থানে ইহার প্রভূত বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। সুন্দরী-দিগের ঔৎসুক্যবশতঃ অসমাপ্ত প্রসাধনাবস্থার বর্ণনা সংস্কৃত কবির একটা অবশ্য কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য হইয়াছিল। এই বর্ণনায় এক চরণে অলক্ত মাখিয়া তাড়াতাড়ি রাস্তায় বাহির হওয়াতে ভূতল-দৃশ্য এক পদের অলক্ত-চিহ্ন হর-গৌরীর বা অর্দ্ধনারীশ্বরের পদচিহ্নের সহিত উপমিত হইয়া থাকে। শিশু-পাল বধ কাব্য হইতে ইহার একটি উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে—

"ব্যতনো দপাস্য চরণং প্রসাধিকা-করপল্লবাদ্রসবশেন কাচন
দ্রুতযাব কৈকপদ চিত্রিতাবনিং পদবীং গতেব গিরিজা হবার্দ্ধতাম্ ১৩।৩৩।

এই শ্রেণীর বর্ণনা সংস্কৃত সাহিত্যে গদ্যপদ্যে সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়, অনাবশ্যক-বোধে অধিক উদাহরণ প্রদর্শিত হইল না।

স্মৃতিশাস্ত্রেও দৃষ্টান্তরূপে হর-গৌরী বা উমা-মহেশ্বরের উল্লেখ দেখা যায়, যথা—

"অষ্টমী নবমী যুক্তা নবমী বাষ্টমী যুতা
অর্দ্ধনারীশ্বর প্রায়া উপামাহেশ্বরী তিথিঃ।"—তিথিতত্ত্বে বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর বচন্।

লৌকিক ব্যবহারেও এক শরীরে বিভিন্নাকার দৃষ্ট হইলে তাহাকে হর-গৌরী নামে উল্লেখ করা হয়। অর্দ্ধাঙ্গে শোথ হইলে লোকে তাহাকে হর-গৌরী শোথ বলিয়া থাকে।

অর্দ্ধনারীশ্বরের পূজা-বিবরণ বিবিধতন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। এই মূর্ত্তির ধ্যান সারদাতিলকে তন্ত্রসার প্রভৃতি নিবন্ধে বর্ণিত হইয়াছে। সারদাতিলকোক্ত ধ্যানটী এইরূপ—

"বন্ধূক কাঞ্চননিভং রুচিরাক্ষমালাম্
পাশাঙ্কুশৌচ বরদং নিজ বাহু দণ্ডৈঃ
বিভ্রাণ মিন্দু সকলাভরণং ত্রিনেত্র
মর্দ্ধাম্বিকেশ মনিশং বপুরাশ্রয়ামঃ॥

যিনি বন্ধূক পুষ্পের এবং স্বর্ণের সমান বর্ণশালী, যিনি স্বকীয় বাহুদণ্ডের দ্বারা সুন্দর অক্ষর অক্ষমালা (জপমালা) পাশ অঙ্কুশ এবং বরদ মুদ্রাধারণ করিতেছেন, চন্দ্রখণ্ডাবতংশ ত্রিনেত্র সেই অর্দ্ধনারীশ্বর শরীরকে আমরা নিরন্তর আশ্রয় করি।

সারদা তিলক-বর্ণিত রূপ হইতে তন্ত্রসারোক্ত ধ্যানগম্যরূপের অনেকাংশে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তন্ত্রসারোক্ত বর্ণনানুসারে এই মূর্ত্তি—নীল-প্রবাল-কান্তি শোভমান নেত্রত্রয়যুক্ত ইঁহার হাতে পাশ রক্তোৎপল কপাল (ভিক্ষাপাত্র) এবং শূল বিদ্যমান। ইঁহার ভূষা অর্থাৎ অলঙ্কার প্রবিভক্ত অর্থাৎ পুরুষভাগে পুরুষাভরণ এবং নারীভাগে মহিলাভরণ বর্ত্তমান, অভিনব শশিকলা ইহার মুকুটরূপে আবদ্ধ রহিয়াছে।

> "নীল প্রবাল রুচিরং বিলস ত্রিনেত্রম্
> পাশারুণোৎপল কপালক-শূলহস্তম্
> অর্দ্ধাম্বিকেশ মনিশং প্রবিভক্ত-ভূষম্
> বালেন্দুবদ্ধ মকুটং প্রণমামি রূপম্।"

এই উভয় বর্ণনাতেই রূপটী বিশদভাবে কথিত হয় নাই, কিন্তু অন্যত্র মূর্ত্তি-নির্ম্মাণ-প্রসঙ্গে ইঁহার সম্পূর্ণ রূপ বর্ণিত হইয়াছে, যথা—

অর্দ্ধনারীশ্বরদেবের অর্দ্ধভাগ শুভলক্ষণযুক্ত নারীস্বরূপ এবং অর্দ্ধভাগ সর্ব্বলক্ষণালঙ্কৃত পুরুষস্বরূপ করিতে হইবে। ঈশ্বরার্দ্ধে (পুরুষভাগে) চন্দ্র-ভূষিত জটাজুট এবং উমার্দ্ধে (নারীভাগে) তিলক সীমন্ত এবং অলক করিতে হইবে। অর্দ্ধভাগ (পুরুষাংশ) ভস্মোদ্ভাষিত এবং অর্দ্ধভাগ (নারীভাগ) কুঙ্কুমভূষিত হইবে। পুরুষার্দ্ধ নাগোপবীতযুক্ত এবং নারীভাগ হার-বিভূষিত করিতে হইবে। বামার্দ্ধে ঘন পীন সুগোল স্তন করিতে হইবে, এবং এই অংশ সুন্দর বস্ত্রের দ্বারা আচ্ছাদিত করিতে হইবে। এই অংশে হীরক-বৈদূর্য্য-মণি-ভূষিত মেখলা (কটিসূত্র) নিহিত করিতে হইবে। শিবভাগ ঊর্দ্ধলিঙ্গ এবং সর্পমেখলার দ্বারা শোভিত হইবে। দেবদেবের চরণপদ্মোপরি সমভাবে অবস্থিত হইবে, বামপাদ (নারীভাগ) অলক্তকযুক্ত এবং অঙ্গদ-ভূষিত হইবে। দক্ষিণ-হস্তদ্বয়ে ত্রিশূল এবং জপমালা, বাম ভুজদ্বয়ে দর্পণ এবং উৎপল নিহিত করিতে হইবে।

(অভিধানে সব্য শব্দে বামভাগ এবং অপসব্য শব্দে দক্ষিণভাগ অভিহিত হইয়াছে, কিন্তু তান্ত্রিক ভাষায় এই উভয় শব্দেরই বিপরীত অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে।)

অর্দ্ধং দেবস্য নারীতু কর্ত্তব্যা শুভলক্ষণা
অর্দ্ধন্তু পুরুষঃ কার্য্যঃ সর্ব্ব-লক্ষণ ভূষিতঃ ॥
ঈশ্বরার্দ্ধে জটাজুটং কর্ত্তব্যং চন্দ্র-ভূষিতম্
উমার্দ্ধে তিলকং কুর্য্যাৎ সীমন্ত মলকং তথা ॥
ভস্মোদধুলিত মর্দ্ধন্তু অর্দ্ধং কুঙ্কুম-ভূষিতম্
নাগোপবীতিন শ্চার্দ্ধ মর্দ্ধং হার-বিভূষিতম্ ॥
বামার্দ্ধে তু স্তনং কুর্য্যাদ্ ঘনং পীনং সুবর্ত্তুলম্
উমার্দ্ধন্তু প্রকর্ত্তব্যং সুবস্ত্রেণ চ বেষ্টিতম্ ॥
মেখলাং দাপয়েত্তত্র রত্নবৈদূর্য্য-ভূষিতাম্
উর্দ্ধলিঙ্গং মহেশার্দ্ধং সর্পমেখল-মণ্ডিতম্ ॥
পাদঞ্চ দেবদেবস্য সমং পদ্মোপরিস্থিতম্
সালক্তকং স্মৃতং বাম মঞ্জনেন বিভূষিতম্ ॥
ত্রিশূল মক্ষসূত্রঞ্চ ভুজয়োঃ সব্যয়োঃ স্মৃতম
দর্পণঞ্চোৎপলং কার্য্যং শুভয়োরপ সব্যয়োঃ ॥

এই সকল বচনে যদিও অবয়ব প্রভৃতির স্বরূপ বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তথাপি প্রতিমার বর্ণ-সম্বন্ধে কিছুই কথিত হয় নাই। সুতরাং সারদা-তিলকোক্ত ধ্যানে এবং তন্ত্রসারোক্তধ্যানে যে বর্ণ কথিত হইয়াছে, তদনুসারেই বর্ণের স্বরূপ বুঝিতে হইবে। সারদা তিলকের মতে অর্দ্ধভাগ বন্ধূকপুষ্পবর্ণ, অপরার্দ্ধভাগ কাঞ্চনবর্ণ, কিন্তু তন্ত্রসারোক্ত ধ্যানানুসারে, অর্দ্ধভাগ নীল অপরার্দ্ধভাগ প্রবালের মত বর্ণ। বন্ধূক পুষ্প এবং প্রবাল উভয়ই প্রায় তুল্যবর্ণ, বন্ধূক পুষ্প গাঢ় রক্ত প্রবাল ঈষৎ রক্ত, কিন্তু কাঞ্চনের এবং নীলের কোনও প্রকার সাম্য নাই। পুরুষভাগে কোন বর্ণ এবং নারীভাগে কোন বর্ণ তাহারও স্পষ্ট কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় না। 'বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি'র সংগ্রহাগারে অর্দ্ধনারীশ্বরের একটী প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে নির্ম্মাণ-পদ্ধতি-কথিত অবয়বাদিবিন্যাস পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু প্রস্তরমূর্ত্তিতে বর্ণ-পরিচয়ের কোনও সাহায্য পাওয়া যায় না। এই মূর্ত্তিটীর হস্ত নাই, সুতরাং এই ভগ্নমূর্ত্তিতে আয়ুধ-বিন্যাসেরও পরিচয় পাওয়া যায় না।

হিরণ্যকশিপু।

(শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত-লিখিত ।

আমাদের অফিসের নূতন চিফ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে আমরা বলিতাম হিরণ্যকশিপু, ফিরিঙ্গি কেরাণীরা বলিত হেরড্। তিনি কৃতবিদ্য বাঙ্গালী, খুব সদাশয় ব্যক্তি। কাজ-কর্ম্মের ভ্রম হইলে মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিতেন, অতি মৃদুস্বরে বলিতেন—"কাজটা ঠিক হয় নি।" আমরা তাহাতেই লজ্জিত হইতাম, ভবিষ্যতে সাবধান হইতাম। প্রভাতে উঠিয়া তিনি যখন এল্‌ফ্রেড পার্কের ভিতর ঘুরিয়া বেড়াইতেন, তখন আমাদের একাউণ্ট অফিসের কোনও কেরাণীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি অতি অমায়িকভাবে তাহার সহিত নানা বিষয়ে বাক্যালাপ করিতেন। বাঙ্গালী উচ্চপদপ্রাপ্ত হইলে সাধারণতঃ একটু স্বার্থপর হয়, নিম্নপদস্থ ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে পৃথক্ থাকিতে ভালবাসে। আমাদের নূতন চিফ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মথুরবাবুর প্রাণে আমাদিগের প্রতি সহানুভূতি পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান ছিল।

এক বিষয়ে কিন্তু তাঁহার একটা বিশেষ দুর্ব্বলতা ছিল। তিনি ছোট ছেলে মেয়ে দেখিলে বড় বিচলিত হইতেন। অফিসের বাগানের ভিতর যদি কোনও রকমে একটা পথের বালক আসিয়া পড়িত, মথুরবাবু অমনি চাপরাসীর দলকে ধমক দিতেন, বালককে অফিসের ত্রিসীমার বাহির করিয়া দিলে তবে স্থির হইতেন। ক্ষেত্রে নূতন মটরসুঁটি বা ফুলকপি রোপণ করিয়া মালীকে যেমন সর্ব্বদা ছাগল তাড়াইতে হয়, আমাদের নূতন বাবুর জন্য চাপরাসী, পিয়াদাদিগকে তেমনি বালক তাড়াইতে হইত। অপর সময় পথে কোনও কেরাণী দেখিলে, মথুরবাবু স্বয়ং উপযাচক হইয়া তাহার সহিত বাক্যালাপ করিতেন; কিন্তু কোনও কেরাণীর সহিত পুত্রকন্যা থাকিলে মথুরবাবু মুখ ফিরাইয়া অপর দিকে চলিয়া যাইতেন। একবার অফিসের ডিস্যাণ্টো নামক একটি কেরাণীর মেমের বুকে অকস্মাৎ বেদনা হইয়াছিল। তাহার সাত বৎসরের পুত্র একটি ভৃত্য সমভিব্যাহারে ডিস্যাণ্টোকে সংবাদ দিতে আসিয়াছিল। মথুরবাবুর প্রাণে দয়ার উদ্রেক হইবে বলিয়া ডিস্যাণ্টো ছেলেটিকে লইয়া মথুরবাবুর গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল। মথুরবাবু তাহাকে সে যাত্রায় ছুটি দিলেন বটে; কিন্তু ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া দিলেন যে, অফিস কর্ম্মস্থল, গবর্ণমেণ্ট পয়সা খরচ করিয়া লোক নিযুক্ত করে আমোদের

জন্য নহে, সুকোমল বৃত্তির প্রসারের জন্য নহে। ছেলে মেয়ে লইয়া আদর করিবার উপযুক্ত স্থান নিজ নিজ গৃহে। তিনি আশা করেন প্রত্যেক কেরাণী যেন অফিস ও গৃহের পার্থক্য স্মরণ করিয়া ভবিষ্যতে তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করেন। সামান্য কারণে তিনি আমাদের ছুটি মঞ্জুর করিতেন, কিন্তু একবার মাতাদীনপ্রসাদ লাল নামক একটী কেরাণী পুত্রের পীড়ার জন্য অবসরের আবেদন করিয়া প্রায় বিফলমনোরথ হইয়াছিল। তাই আমরা তাঁহাকে বলিতাম—হিরণ্যকশিপু, খৃষ্টানেরা বলিত হেরড্।

(২)

আমার পুত্র বিনয়কুমারের জ্বরবিকার হইয়াছিল। বিদেশে অল্প বেতনে রুগ্ন শিশু লইয়া বড় বিপদে পড়িয়াছিলাম। এলাহাবাদে অনেক বিচক্ষণ চিকিৎসক আছেন বটে, কিন্তু অর্থ গ্রহণ করিতে তাঁহারা প্রভূত বিচক্ষণতা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। একটি নূতন সহৃদয় ডাক্তার দেখাইতেছিলাম। রজনীতে আমরা উভয়ে বসিয়া শিশুর পরিচর্য্যা করিতাম—প্রকৃত পক্ষে আমি নিদ্রা যাইতাম, সহধর্ম্মিণী একাকিনী শিশুর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত। দিবাভাগে একটু বিশ্রাম না করিলে সে স্বয়ং পীড়িতা হইবে এই আশঙ্কা অহরহঃ আমাকে উৎপীড়ন করিতে লাগিল। শিশুর পীড়ার উল্লেখ করিলে হিরণ্যকশিপুর নিকট ছুটীর প্রত্যাশা করা বাতুলতা—অথচ তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া একেবারে সাহেবদের কাছে যাওয়া বিধিবিরুদ্ধ। মনে মনে লোকটার উপর বড় ক্রোধ হইল—কি নির্ম্মম নিষ্ঠুর লোক। রুগ্ন শিশুর মুখ দেখিয়া যেমন প্রাণের মধ্যে বেদনা অনুভব করিতাম ঠিক সেই পরিমাণে ঘৃণায় ক্রোধে প্রাণটা ভরিয়া উঠিত। অফিসের বাবুরা উত্তেজিতভাবে বলিলেন—"যাও না, বল না, একি চালাকী নাকি? না হয় একাউণ্টেণ্ট-জেনারেল সাহেবের কাছে আপিল কর।"

আমি একখানি দরখাস্ত লিখিয়া লইয়া ধীরে ধীরে মথুরবাবুর গৃহে প্রবেশ করিলাম। তিনি বেশ মধুর হাসিতে আমাকে আপ্যায়িত করিলেন। সাক্ষাৎ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি ধীরে ধীরে ছুটির দরখাস্তখানি তাঁহার সম্মুখে টেবিলের উপর রাখিলাম। সমস্ত দরখাস্তখানি পাঠ করিয়া তিনি বলিলেন—"কেন ছুটি চাইছেন তা লেখেন নি?"

আমি একটু মাথা চুলকাইলাম। ভয় হইল বুঝি বা কাহারও মুখে হিরণ্যকশিপু বিনুর পীড়ার সংবাদ শুনিয়াছে। শেষে কিন্তু সাহসে ভর করিয়া বলিলাম—আজ্ঞে মানে হচ্ছে বাড়ীর অসুখ।

মথুরবাবু একটু হাসিয়া বলিলেন—বাড়ীর অসুখ? কি ইট কাঠের ন কি?

আমি আর একটু সাহস পাইলাম। বলিলাম—আজ্ঞে না, মানে হচ্চে, অর্থাৎ ব্যারামটা হয়েছে আমার পরিবারের।

সে দিন হিরণ্যকশিপুর মেজাজ ভাল ছিল। কিন্তু "ন ব্যাপার শতেনাপি শুকবৎ পঠ্যতে বকঃ।" প্রকৃতি যাবে কোথা? হস্তী পদতলে না হয় বিষদানে তিনি অভীষ্ট সিদ্ধি করিবেন।

তিনি বলিলেন—পরিবার কার?

আমি বলিলাম—আজ্ঞে মানে হ'চ্চে আমার এক সংসার অর্থাৎ ব্যারামটা হ'য়েছে আমার পরিবারের মানে হ'চ্চে স্ত্রীর।

তিনি বলিলেন—ওঃ স্ত্রীর। আচ্ছা ছুটি পাবেন।

আমি ত্রাহি ত্রাহি বলিতে বলিতে বাহিরে আসিলাম।

বিনু একুশদিন সমানভাগে ভুগিল। দিন দিন কৃশ হইতেছিল, সর্ব্বদা মাথা নাড়িতেছিল, শয্যার চাদর ধরিয়া টানিতেছিল, শিবনেত্র হইয়া গোঁ গোঁ শব্দ করিতেছিল। পেটের মধ্যে সর্ব্বদাই গুড় গুড় করিয়া শব্দ হইতেছিল। শিশুর মুখ চাহিয়া দুইজনে বসিয়া থাকিতাম। সহৃদয় ডাক্তারটি আসিয়া দেখিয়া যাইতেন, অভয় দান করিতেন। দুই দিন বড় ডাক্তার ডাকিয়াছিলাম। স্ত্রীর গহনা বন্ধক দিয়া সাহেববাড়ী হইতে ভাল ভাল ঔষধ আনিয়া কুমারের চিকিৎসা করিতেছিলাম। কিন্তু ব্যাপার দেখিয়া মনে হইতেছিল সকল চেষ্টা পণ্ড হইবে, আমাদের মত দরিদ্রের কষ্টলাঞ্ছিত সংসারে এ রত্ন থাকিবে না। যখন স্ত্রী কাঁদিত তাহাকে সান্ত্বনা দিতাম। নিজের বুক ভরিয়া আসিয়া যখন চোখ ছল ছল করিত, তখন বাহিরে গিয়া চোখের জল ফেলিয়া একটু শান্তি পাইতাম। হাঃ ভগবান্! হতভাগ্যের ঘরে ভুল করিয়া কেন এমন পারিজাত ফেলিয়া দিয়াছিলে, এত শীঘ্র ভ্রম সংশোধন করিবার জন্য কেন আবার তাহাকে কাড়িয়া লইতে উদ্যত হইলে! এত কষ্টে সামান্য সুখ ছিল সেই শিশুর বিমল হাস্য—তাহার সেই লাবণ্যময় পবিত্র মুখখানি। বিধাতা সে সুখ হইতেও বঞ্চিত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছিল। ডাক্তার অনেক আশা দিয়া গিয়াছিলেন। রাত্রি কাটিলে শিশুর প্রাণের আশা হইবে—কিন্তু আজিকার রাত ভীষণ রাত—কাটিবে কি? অন্য দিন সন্ধ্যার পর আমরা কিছু আহারের বন্দোবস্ত

করিতাম। সে দিন আর করিলাম না। ভগবান্, নারায়ণ আজিকার রাত্রিটা কাটাইয়া দিন।

তখন প্রায় রাত্রি আটটা। বাহিরের দরজায় কে কড়া নাড়িল। আমি অনিচ্ছাসত্ত্বেও দ্বার খুলিয়া দিলাম। হিরণ্যকশিপু! জীবনে নিরাশা আসিয়াছিল, ভয় ছিল না। তাঁহাকে দেখিয়া অবশ্য ভদ্রজনোচিত নমস্কার করিলাম।

তিনি বলিলেন—কেমন আছে?

ভয় কি? না হয় চলিয়া যাইবে। না হয় মিথ্যা কথা বলিয়া প্রবঞ্চণা করিয়া ছুটি লইয়াছি বলিয়া কর্ম্মচ্যুত করিবে। তাহাতেই বা ভয় কি?

আমি বলিলাম—ব্যারাম আমার স্ত্রীর নয়—ছেলের—পুত্রের—ছোট ছেলের—যাদের দেখে আপনি ক্ষেপে উঠেন—যাদের নাম শুন্‌লে আপনি—

মথুরবাবু আমার হাত ধরিয়া বলিলেন—জানি—জানি শুনেছি। তোমার ছেলের, শিশুর, প্রাণের ছেলের—

বালকের মত লোকটা কাঁদিয়া উঠিল। আমিও কাঁদিলাম। আমার চক্ষে সর্ব্বদাই জল আসিত, একটু অবসর পাইলেই গড়াইত। জল গড়াইল—মথুরবাবু কাঁদিলেন আমিও কাঁদিলাম।

তাহার পর হঠাৎ বিস্ময় আসিল। আমি কিছু বুঝিলাম না। বালকের নামে যাহার ধৈর্য্যচ্যুতি হয় তাহার চক্ষে সহানুভূতির অশ্রু—আমার শিশুর জন্য, অপরিচিত কুমারের জন্য পবিত্র অশ্রু—গঙ্গাযমুনাসঙ্গমের জলের অপেক্ষা বিশুদ্ধ পবিত্র অশ্রু।

মথুরবাবু বলিলেন—চল। দেখে আসি।

আমি তাঁহাকে উপরে লইয়া যাইতে লাগিলাম। হঠাৎ তিনি চক্ষু মুছিয়া বলিলেন—শুন, আগে বুঝাই, তার পর যাব। আগে কথাটা খুলে বলি। ছেলে দেখ্‌লে সরে যেতাম, পালাতাম, ছেলের নাম শুনতাম না। কেন জান? ঘৃণা ক'রে? ছেলেকে ঘৃণা? সদ্য ভগবানের কাছ থেকে এসেছে, সংসারের ময়লা লেগে কলুষিত হয় নি, যাদের মুখে বিশুদ্ধ পবিত্র হাসি দেখ্‌লে সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণা ভুলে যেতে হয় তাদের দেখে ঘৃণা! লোকে তাই বুঝে, তাই তোমরা আমার নাম রেখেছ হিরণ্যকশিপু—

আমি অপ্রতিভ হইলাম। বলিলাম—আজ্ঞে হ্যাঁ, সেইজন্য আপনার কাছে ছুটি নেবার সময় ছেলের নাম বলিনি।

তিনি বলিলেন, হ্যাঁ শুনেছি। কাল অফিসে শুনলাম। দেখ আমারও ছেলে ছিল.

পবিত্র বিমল হাসি। একদিন আদর করছিলাম—লুপ ছিলাম। শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে হাত দিয়ে ধরছিলাম।"

মথুর বাবু স্থির হইল। পাগলের মত আমার হাত ধরিয়া বলিল—"ভাই লুপ তে লুপ তে হাত ফসকে পড়ে. শিশু তখনই স্বর্গে চলে গেল। তখনই! নিজের ছেলে নিজের হাত করে মেরেছি—নরঘাতক, পুত্রঘাতক—আহা কি দিব্য চেহারা—

মথুরবাবু কাঁপিতেছিল। বুঝিলাম, শিশু দেখিয়া পুত্রশোক স্মরণ হয় বলিয়া সে হিরণ্যকশিপু হইয়াছিল।

মথুর বাবু একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিল—না ভাই দূরে রেখে শান্তি নাই, ঠিক করেছি বুকে রেখে সুখ। তাড়িয়ে শান্তি নাই—বোধ হয় নেড়ে চেড়ে, কোলে নিয়ে শান্তি পাব। হিরণ্যকশিপু না হ'য়ে—ঠাকুরমা হব। ছেলে দেখলেই কোলে তুলে নেব। ওঃ বাবা! নারায়ণ! চল।

* * * * *

রোগমুক্ত হইয়া বিনু মথুর বাবুর প্রিয়পাত্র হইয়াছিল। মথুর বাবুর করুণ কাহিনী শুনিয়া সকলে তাঁহাকে দেবতাজ্ঞান করিয়া ভক্তি করিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

প্রাকৃত বর্ণনে রাজকৃষ্ণ।

[লেখক—শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়]

বহিঃপ্রকৃতির সৌন্দর্য্যকে ছন্দোবদ্ধ ভাষায় অবতীর্ণ করিতে পারিলেই প্রাকৃত বর্ণন-কবিতা (descriptive poem) হয়। কিন্তু এই অবতীর্ণ করিতে পারাটাই বড় শক্ত কাজ। যিনি তাহা পারেন, তাঁহাকে আমরা কবি বলি। "হিমালয়ের শিখর কত হাজার ফিট উঁচু, তাহার মাথায় কতখানি বরফ আছে, তাহার কোন্ অংশে কোন্ শ্রেণীর উদ্ভিদ্ জন্মে, তাহা তন্ন তন্ন করিয়া বলিলেও হিমালয় আমাদের গোচর হয় না।" কিন্তু কবির লেখনী হইতে যেই বাহির

অসীম নীরদ নয়,
ওই গিরি হিমালয়!
উথলে উঠেছে যেন অনন্ত জলধি ;
ব্যেপে দিগ্‌ দিগন্তর,
তরঙ্গিয়া ঘোরতর,
প্লাবিয়া গগনাঙ্গন জাগে নিরবধি।

মনশ্চক্ষুর সম্মুখে যেন হিমালয় ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু এমন কবিতার এ দেশে আজকাল দুর্ভিক্ষ। বাঙ্গালা কাগজে 'প্রাকৃত বর্ণন কবিতা'র নাম দিয়া যে সকল কবিতা বাহির হইয়া থাকে, যাহা ছন্দে ও মিলে আগেকার কবিতার চেয়ে ভাল হইলেও চিত্রহিসাবে সচরাচর ভাল হয় না।—সে সকল কবিতার ভিতর দিয়া প্রকৃতির ছবি প্রায়ই ফুটিয়া উঠে না। ন্যাকামিই সে সব কবিতার প্রাণ।

পূর্ব্বে কিন্তু কবিতার এতটা দুর্দ্দশা ছিল না। 'না অনুভব করিয়া কবি হইবার যে এক প্রকার গিল্‌টি করা কল্পনা আছে', পূর্ব্বে তাহার প্রচলন খুব কমই ছিল। তখনকার কবিরা বড় একটা 'প্রকৃতির বহির্দ্বারে বসিয়া কেবল কতকগুলা বড় বড় টানাবোনা তুলনা লইয়া ছন্দ নির্ম্মাণ করিতে যাইতেন না।' এ কথার উজ্জ্বল উদারণ—ঈশ্বর গুপ্ত। স্বভাব-বর্ণনে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁহার আগেকার কোনও বাঙ্গালী কবিই এ বিষয়ে তাঁহার সমান কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। তার পর, মদনমোহন, রঙ্গলাল, দীনবন্ধু, মাইকেল ও বলদেব প্রভৃতি কবিগণও অল্পবিস্তর বহিঃপ্রকৃতির ছবি আঁকিয়া গিয়াছেন। এ চিত্র-গুলিরও অধিকাংশই সুচিত্রিত। তবে ইঁহাদের মধ্যে কোনও কবি যে এ ক্ষেত্রে ঈশ্বর গুপ্তকে হটাইতে পারিয়াছেন, এমন মনে হয় না।

আধুনিক যুগের শুধু একজন কবি এ ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিহীন সম্রাট। তিনি—রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ গদ্যে ও পদ্যে যে সকল বহিঃপ্রকৃতির চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহা গুণের ও সংখ্যার হিসাবে বঙ্গসাহিত্যে অতুলনীয়।

রবীন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমার প্রভৃতির মত দুই চারি জন কবিকে ছাড়িয়া দিলে আধুনিক যুগের আর একজন কবির প্রতি আমাদের নজর পড়ে। ইনিও বিহারীলালের শিষ্য। ইঁহার নাম বড় একটা কেহ করেন না বটে, কিন্তু ইঁহার নাম জানেন না, এমন পাঠক বোধ করি, বাঙ্গালায় নাই। ইনি স্বর্গীয় রাজকৃষ্ণ রায়। প্রাকৃত-বর্ণন-কবিতা যে তিনি অনেক লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা বলি না। তবে তাঁহার কবিতাবলীর মধ্যে ঐ শ্রেণীর কবিতা যা' অল্প-বিস্তর পাওয়া যায়, সেগুলি উপভোগের সামগ্রী বলিয়া মনে করি। ছোক্‌রা 'কবি-

বয়ে'রা রাগ করিবেন না; বলিতে কি, তাঁহারা রাজকৃষ্ণের নামে নাসিকা কুঞ্চিত করিলেও তাঁহাদের লেখায় এমন অনেক লাইন দেখিয়াছি, যাঁহা রাজকৃষ্ণের রচনা হইতে গৃহীত। আমরা কাহারও অপহরণের উদাহরণ উদ্ধৃত না করিয়া কেবলমাত্র রাজকৃষ্ণের গুটিকয়েক বহিঃপ্রকৃতির চিত্র পাঠকবর্গকে উপহার দিতেছি। তাঁহারা দেখিবেন,—স্বভাব-বর্ণনে রাজকৃষ্ণ কিরূপ শক্তিশালী।

প্রভাত-বর্ণনা,—

নাইকো রাতি, নিবিয়ে বাতি, উষা সতী এল।
মলিন মুখে, মনের দুঃখে, আঁধার চলে গেল॥
সূয্যিমামা, রাঙ্গা জামা প'রলে টেনে গায়।
রাঙা চোকে, থেকে থেকে, পাহাড় পানে চায়॥

এই চারি লাইনে প্রভাতের একটি সুন্দর দৃশ্য প্রতিভাত হইয়াছে। তার পর একটি সন্ধ্যার চিত্র দেখুন,—

সন্ধ্যা হ'ল ডুবে গেল, রাঙা রঙের ছবি;
পূব আকাশে একটি পাশে উঠলো ভাঙা চাঁদ।
শাদা-কাল-রঙ-মাখানো সন্ধ্যে রাণীর ছবি,—
শাদা টানা, কালো পোড়েন সুতোয় বোনা ফাঁদ॥

আর একটী সন্ধ্যার ছবি,—

ক্রমে ক্রমে এ দিকেতে সন্ধ্যা হয়ে এলো॥
পাখীগুলো শাবক সাথে বাসায় ঢুকে পড়ে।
পূর্ব্ব দিকের আঁধার রাশি ছড়িয়ে ভুঁয়ে পড়ে॥
হাওয়ার যেন ঘাম দিয়ে জর এখন গেছে ছেড়ে।
ঠাণ্ডা-নাড়ী-হ'য়ে হাওয়া চলচে পাখা নেড়ে॥

এই দুইটি চারি ছত্রের কবিতায় দুই রকম সন্ধ্যা বর্ণনা হইয়াছে। প্রথমটিতে শুক্ল পক্ষের সন্ধ্যার কমনীয়তা যেন মাখানো রহিয়াছে। আর দ্বিতীয়টি যেন কৃষ্ণ পক্ষের সন্ধ্যার ছবি। "পূর্ব্ব দিকের আঁধার রাশি ছড়িয়ে ভুঁয়ে পড়ে। 'হাওয়ার যেন ঘাম দিয়ে জর এখন গেছে ছেড়ে।' পড়িলেই মনে আপনা হইতেই কৃষ্ণ পক্ষের সন্ধ্যার কথা জাগিয়া উঠে। ইতিপূর্ব্বে রাজকৃষ্ণের প্রভাত-বর্ণনের একটু পরিচয় দিয়াছি,—আবার একটি তাহার অঙ্কিত বসন্তকালের প্রভাত-চিত্র দেখুন,—

'ফাগুন মাসের দশই তারিখ, শুক্রমুনির বার।
ছটা বেলা, সূর্য্যোদয়ের শোভা চমৎকার॥
সূয্যিদেবের ভাগ্যের কথা পক্ষিগণে বোলে।
খানিক আগে উষা গেছে, আকাশ দিয়ে চোলে॥
রাজা, নবাব, লাট সাহেবের যাবার আগে ধেয়ে।
ঘোড়ায় চোড়ে কোটাল ছোটে ভিড় সরিয়ে দিয়ে॥
উষা দূতী তেম্নি এর আঁধার ঠেলে ফেলে।
হাওয়ায় চড়ে তেড়ে ফুড়ে আগে গেছে চোলে॥
নাইলো আঁধার, পথ পরিষ্কার নীল আকাশের গায়।
রাঙ্গ পোসাকে সূয্যিরাজা রাজাপানে চায়॥
নুইয়ে মাথা তৃণ-লতা রাজভক্তি-ভরে।
সূয্যিরাজায় রাজভেট দেয়, শিশির ফোঁটা ধ'রে॥
শিশির-মাখা ফুল ভেট দেয় রকম রকম গাছ।
হাওয়ায় দুলে পাতাগুলি রাজায় দেখায় নাচ॥
শামা, দোয়েল, বৌ-কথা-ক, কোকিল, শালিক, টিয়ে।
বন্দিভাবে বন্দনা গায় সুর ছড়িয়ে দিয়ে॥
নাইকো পাতা, নেড়া মাথা আমড়া তরুবর।
বউল আঙ্গুল তুলে বলে, সূয্যিমামার জয়॥
নেড়া নেড়া শিমুল ডালে শিমুল ফুলের ঘটা।
সূয্যিমামার দ্বারী যেন লাল পাগড়ী আঁটা॥"

ইত্যাদি।

এই চিত্রটি খুব চমৎকার না হইলেও মন্দ নহে। এখনকার কবিরা যেমন বসন্ত-বর্ণন করিতে বসিয়া তাহার মধ্যে বর্ষা বা অন্য ঋতুর মাল-মশলা সকল ঢুকাইয়া দেন, সে দোষ রাজকৃষ্ণের কবিতার কোথাও নাই। বর্ষাকালের ফুলকে তিনি বসন্তকালে ফুটাইতে চেষ্টা করেন নাই। তাঁহার বর্ষা-বর্ণনায় 'নেড়া শিমুল গাছে শিমুল ফুলের ঘটা'রও উপদ্রব নাই। তাঁহার বর্ষার চিত্র দেখুন,—

"ভাদোর মাসের বর্ষা পচা ; আকাশ ঢাকা মেঘে।
মেঘ সরিয়ে পূবের হাওয়া বইচে বিষম বেগে।
এই আট্‌কা—এই চট্‌কা—এই ঝট্‌কা মেরে।
ঝর্‌ঝরিয়ে তড়্‌তড়িয়ে বৃষ্টিধারা ঝরে॥
সূয্যিঠাকুর গেছে ডুবে জমাট মেঘের কোলে।
ঘোর ঘোর ঘোর আঁধার শূন্যপানে ঝোলে।"

ধানের ক্ষেত্রের ছবি, —

'মেঠো পথের দু'দিক পানে, ক্ষেত পূরেচে নধর ধানে।
যত দূরে চক্ষু চলে, তত দূরেই ধান !
সবুজ রঙে মাঠ একাকার,
চোক্ জুড়ানো কেমন বাহার,
স্বভাব যেন সোব্‌জে কাপড় কোচ্চে পরিধান।"

একটি পুষ্করিণীর চিত্র,—

হাটের পাশে একটি পুকুর, কাকচক্ষু জল।
পানকৌড়ী ডুবচে জলে, ভাস্‌চে হাঁসের দল॥
গলা-জলে বালি জ্বলে, এমনি পরিষ্কার।
উঁচু পারে তালের গাছ নীচে ঘাসের ঝাড়॥

সে দিন আমাদের দেশের এক খুব বড় কবির পুকুর-বর্ণনা পড়িতেছিলাম। তাহাতে "বামেতে মাঠ", "ডাইনে বাঁশবন" প্রভৃতি মাল-মশলা অনেক আছে, কিন্তু তাহা পড়িবার সময় মনশ্চক্ষুর সাম্‌নে পুকুরের ছবি ফুটিয়া উঠে না। কিন্তু রাজকৃষ্ণের অঙ্কিত ঐ পল্লীর পুষ্করিণী-চিত্র খুব মনোহর না হইলেও পল্লীর পুকুরের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

এবারে রাজকৃষ্ণের প্রাকৃত-বর্ণন কবিতার পরিচয় সংক্ষেপে দিবার চেষ্টা করিলাম, আগামীবারে এ দেশের আর এক কবির ঐ বিষয়িণী কবিতার আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়।

স্বর্গীয় দ্বারকানাথ অধিকারী।

[লেখক—শ্রীঅমূল্যচরণ সেন]

সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র ও নাট্যরথী দীনবন্ধু গুপ্তকবির ‘সংবাদ প্রভাকরে’ কবিতা লিখিতেন। তখন তাঁহারা কলেজের ছাত্র। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ‘সংবাদ প্রভাকরে’র সম্পাদক ছিলেন। তিনি উঁহাদিগকে যথেষ্ট উৎসাহ দিতেন। ইহা হইতেছে ১৮৫৪।৫৫ খৃষ্টাব্দের কথা।

এই সময়ে ‘প্রভাকরে’ একটী কবিতা বাহির হয়। কবিতাটীর নাম,—“সরস্বতীর মোহিনী বেশধারণ।” এই কবিতায় বঙ্কিম ও দীনবন্ধুর কবিতার উপরে কিছু ব্যঙ্গোক্তি ছিল। কবিতাটী দ্বারকানাথের লেখা; কিন্তু ‘বুনো কবি’ স্বাক্ষরে ‘প্রভাকরে’ বাহির হইয়াছিল।

বঙ্কিমবন্দ্র ও দীনবন্ধু ‘বুনো কবি’র কবিতার উত্তর দিয়াছিলেন। ‘বুনো কবি’ তাহার প্রত্যুত্তর কবিতা লিখিয়াছিলেন। ক্রমশঃ এই উত্তর-প্রত্যুত্তর কবিতা-যুদ্ধে পরিণত হয়। এক দিকে ‘বুনো কবি’ বা দ্বারকানাথ অধিকারী; অন্য দিকে বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধু। এক বৎসর কাল এই যুদ্ধ চলিয়াছিল। ‘প্রভাকর’-প্রভা ঈশ্বরচন্দ্র “কালেজীয় কবিতা যুদ্ধ” নামে এই যুদ্ধকে অভিহিত করেন।

এই কবিতা-যুদ্ধে দ্বারকানাথ জয়মাল্য লাভ করিয়াছিলেন। রঙ্গপুর—কুণ্ডীর স্বর্গগত ভূম্যধিকারী কালীচন্দ্র রায় চৌধুরী তাঁহাকে পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার দিয়াছিলেন। শিষ্য-বৎসল ঈশ্বরচন্দ্র দ্বারকানাথের সম্মতিক্রমে এই টাকা ভাগ করিয়া তিনজনকে দান করেন। তাহার পর “কালেজীয় কবিতা-যুদ্ধের” নিবৃত্তি ঘটে।

এই ঘটনা হইতে বুঝা যায় যে, দ্বারকানাথের কবিতা-রচনার শক্তি ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের “ললিতা ও মানস” যে শ্রেণীর কবিতা, দ্বারকানাথের কবিতা সেই শ্রেণীর বা তদপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীর ছিল।

বঙ্কিম, দীনবন্ধু ও দ্বারকানাথ তিনজনই প্রথম জীবনে ‘প্রভাকরে’ সাহিত্য-সাধনা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের পাঠশালায় প্রবেশ করিবার জন্য তাঁহারা তিনজনেই ‘প্রভাকরে’ হাতে খড়ি দিয়াছিলেন। তিনজনেই গুপ্ত-কবির প্রিয় শিষ্য। বঙ্কিম ও দীনবন্ধু উত্তর কালে বাঙ্গালার সাহিত্যক্ষেত্রে অমর কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন: কিন্তু দ্বারকানাথের সে অবসর ঘটে

নাই। তিনি অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। দ্বারকানাথ বাঁচিয়া থাকিলে তাঁহার প্রতিভা কোন পথে যাইত, কে বলিতে পারে?

যৌবনের প্রারম্ভে তিনজনেই 'প্রভাকরে' কবিতা লিখিতেন। কিন্তু উত্তর-জীবনে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা বাঙ্গালায় অপূর্ব্ব গদ্যসাহিত্যের সৃষ্টি করিল; দীনবন্ধুর প্রতিভায় বাঙ্গালার আধুনিক নাট্যসাহিত্যের এক দিক গড়িয়া উঠিল; কিন্তু অকাল মৃত্যু দ্বারকানাথের প্রতিভা অঙ্কুরেই বিনষ্ট করিল!

দ্বারকানাথের জন্মভূমি নদীয়া জেলার গোস্বামী দুর্গাপুর গ্রামে। ১২৩৭ সালের ৩০শে কার্ত্তিক তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহারা জাতিতে ব্রাহ্মণ এবং বংশপরম্পরায় পৌরহিত্য ব্যবসায় করিতেন। কিন্তু দ্বারকানাথের পিতা স্বর্গীয় রামশঙ্কর অধিকারী পূর্ব্বপুরুষের ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া নীলকুঠীর নায়েবী পদ গ্রহণ করেন।

দ্বারকানাথ পিতার একমাত্র পুত্র। স্বগ্রামের পাঠশালায় ইঁহার বাল্যশিক্ষা সমাপ্ত হয়। এখানে পড়িবার সময়েই দ্বারকানাথ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা রচনা করিতে পারিতেন।

ব্যঙ্গ-কবিতা-রচনায় তাঁহার বড় মন্দ হাত ছিল না। পনের ষোল বৎসর বয়সেই তিনি ব্যঙ্গ কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। আমরা নমুনা দিতেছি,—

শুন শুন সর্ব্বজন করি কিছু নিবেদন
কুলীনগণের বিবরণ।
হয় সবে প্রধানতঃ গাঁজা অহিফেনে রত
পরিশেষে মদে মত্ত হন॥
গেলে পরে ভিন্ন গ্রাম বিষ্ণু ঠাকুরের নাম
লোক মাঝে অগ্রে বলা আছে।
যেন নীচ, লোকে বলে অন্য লোকে জিজ্ঞাসিলে
রাজবাড়ী আমার বাড়ীর পাছে॥
কুল ভ্রমে হয়ে অন্ধ বিবাহের সম্বন্ধ
যদি কেহ করে উপস্থিত।
লোভ দেবীর আজ্ঞামতে, আরোহিয়া স্পৃহা-রথে
অগ্রে করে পণের বিহিত॥

না হইলে দক্ষিণান্ত কামিনী না পান কান্ত
শাশুড়ীর রাঁধা ভাত খান্ না।
পদব্রজে মক্কা যান যদি একটী পয়সা পান
শ্বশুর বাড়ী যান ভিন্ন যান্ না॥

কুলীন জামাতাদিগের গুণের কথা সেকালে কাহারও অবিদিত ছিল না। ইঁহাদের অধিকাংশই আমাদের সমাজের কলঙ্কস্বরূপ ছিলেন। দ্বারকানাথ ব্যঙ্গের 'পাচনি' লইয়া ইহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। এই কবিতাটুকু পড়িয়া মনে হয়, তিনি ভণ্ডামি দেখিতে পারিতেন না। বাঙ্গালা দেশে—বিশেষ বাঙ্গালা সাহিত্যে ভণ্ডের শত্রু বড় কম। দ্বারকানাথ বাঁচিয়া থাকিলে হয়ত ভাষার চাবুকে ভণ্ডদিগকে জব্দ করিতেন। অল্প বয়সে যিনি সমাজের দোষ দেখিয়া তাহা দূরীভূত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, উত্তর জীবনে তাঁহার সে চেষ্টার পরিণতি কিরূপ হইত তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

শিক্ষার উপর কবির তীব্র অনুরাগ ছিল। নীলকুঠীর ম্যানেজার মিঃ টমাস পারকারের জ্যেষ্ঠা কন্যার নিকট তিনি প্রত্যহ এক ঘণ্টা করিয়া ইংরাজী পড়িতেন। পরে যখন কৃষ্ণনগরে কলেজ স্থাপিত হয়, তখন তিনি বাটী হইতে পলাইয়া আসিয়া এই কলেজে ভর্ত্তি হন। তার পর 'জুনিয়র স্কলারসিপ' পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলেজের লেখাপড়া ছাড়িয়া দেন। তার পর স্কুলে শিক্ষকতা করেন।

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কৃষ্ণনগরে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। সেই সময়ে দ্বারকানাথ "মনের প্রতি উপদেশ" নামক এক কবিতা রচনা করিয়া কবিবরকে উপহার প্রদান করেন। ঈশ্বরচন্দ্র এই কবিতাটী পাঠ করিয়া সন্তুষ্ট হন এবং উহা প্রভাকরে" প্রকাশিত করিয়া দেন। এই হইতে তরুণ কবিবরের সহিত ঈশ্বরচন্দ্রের পরিচয়।

১২৬২ সালে কবি দ্বারকানাথ "সুধীরঞ্জন" নামক এক পুস্তক রচনা করেন। সে পুস্তকের এক খণ্ড (২য় সংস্করণ) এক্ষণে আমাদের নিকট আছে। পুস্তক-প্রকাশের দুই বৎসর পরে—১২৬৪ সালে অর্থাৎ সিপাহী বিদ্রোহ সংঘটনের এক বৎসর পূর্ব্বে ২৫ বৎসর বয়সে দ্বারকানাথ জ্বরবিকাররোগে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

'সুধীরঞ্জন' ব্যতীত তাঁহার অপর কোনও গ্রন্থ নাই। তবে শুনা যায়, তিনি কৃষ্ণনগরে কোনও যাত্রাদলের স্বত্বাধিকারীকে আগমনী-বিষয়ক একটী পালা লিখিয়া দিয়াছিলেন। ইহার গানগুলি অতি মধুর হইয়াছিল; কিন্তু সে পালার চিহ্ন নাই।

"জগদীশ্বরের মহিমা বর্ণন" নামক একটী কবিতা আমরা ছেলেবেলায় বিদ্যালয়পাঠ্য পুস্তকে পড়িয়াছিলাম; উহার কোনও কোনও অংশ এখনও মুখস্থ আছে।

"দয়ার সাগর, সর্ব্বগুণাকর
যিনি অখিলের স্বামী।
যাঁহার ইচ্ছায় জীব সমুদয়,
জন্ম মৃত্যু অনুগামী।
যাঁর কৃপাবলে, গ্রহগণ চলে,
দিবাকর করে কর।
জগৎ জীবন রাখিতে পবন,
চরিতেছে চরাচর॥" ইত্যাদি।

এই অতি সরল মিষ্ট কবিতা দ্বারকানাথের রচিত।

প্রতিশোধ।

[লেখক—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।]

(১)

"ভায়া হে!"

"বলুন দাদা, আজ্ঞা করুন।"

"আজ্ঞা আমার নয়, আমার ও দাদার। এই দেখ পুলিশ-সাহেবের চিঠি।"

বড় দারোগাবাবু আমার হাতে একটা বড় সরকারী লেফাফা দিলেন। টান দিয়া পত্রখানি বাহির করিয়া দেখিলাম, পুলিশসাহেব আমাদের—জেলার প্রধান সহরের নির্ভীক মুখপত্র "মেঘমন্দ্র" হইতে খানিকটা সম্পাদকীয় মন্তব্য কাটিয়া পাঠাইয়াছেন এবং গন্ধগোকুল গ্রামের গুলিমারা মামলার সম্বন্ধে বিশেষ রিপোর্ট চাহিয়াছেন। "মেঘমন্দ্র"-সম্পাদকের কথায় বুদ্ধিমান সাহেবও বিচলিত হইয়াছিলেন, ইহা বড় আশ্চর্য্যের বিষয়। সম্পাদক মহাশয় নিজ "স্তম্ভে" লিখিয়াছিলেন—

"গন্ধগোকুল গুলিমারা ব্যাপার সবই চুপ চাপ! হায় রে এদেশী পুলিশ—প্রজার করপুষ্ট অকর্ম্মণ্য পুলিশের কথা স্মরণ করিলে প্রাণ শিহরিয়া উঠে। জ্যোৎস্না রাত্রিতে গন্ধগোকুলের বয়োবৃদ্ধ জ্ঞানবৃদ্ধ প্রজারঞ্জন জমিদার রথহরি বাবুর উপর গুলি চালাইয়া নরঘাতক পলায়ন করিল, অথচ পুলিসের বাবুরা এ সামান্য রহস্যের মর্ম্মোদ্‌ঘাটন করিতে পারিল না। এ কথা স্মরণ করিলে মনে হয় যে, আমরা যেন ইংরাজ রাজত্বের বাহিরে বাস করিতেছি। যাহাতে দারোগা বাবুদের কুম্ভকর্ণ-নিদ্রার অবসান হয় আমাদের সহৃদয় পুলিস সাহেবের সে বিষয়ে একটু দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। দুর্বৃত্ত অবাধে রথহরি বাবুকে গুলি মারিয়া চলিয়া গেল, তাহার শাস্তি হইল না—ইহা অপেক্ষা কলঙ্কের বিষয় আর কি হইতে পারে? শুনিতেছি, রথহরি বাবুকে হত্যা করিবার চেষ্টা হইবার কিছুদিন পূর্ব্বাবধি একদল বেদে আসিয়া গন্ধগোকুল ও মাষকলাই গ্রামের মধ্যস্থিত ঝিটকীর জঙ্গলে তাঁবু গাড়িয়াছে। উদারচিত্ত কালেক্টার বাহাদুর একবার এ বিষয়ে মনোযোগ না করিলে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন অসম্ভব। ইংরাজের রামরাজত্বে এ সব কি কথা!"

বলা বাহুল্য "মেঘমন্দ্রের" যুক্তিতর্কে তাপিত প্রাণ শীতল হইল। ঐরূপ মন্তব্য পাঠে পুলিশ কর্ম্মচারীর উপর সাধারণ অজ্ঞ পাঠকের কিরূপ ধারণা হইবে তাহা

ভাবিয়া "মেঘমন্দ্র" সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত করিলাম—সে কথা যাক্। "মেঘমন্দ্র" যাহাকে "সামান্য রহস্য" বলিয়াছে তাহার মত জটিল রহস্য আমি কোন'ও গল্পের পুস্তকেও পাঠ করি নাই।

বড় দারোগা বাবু বলিলেন,—রামবিলাস ভায়া একবার না হয় ঐ বেদে বেটাদেরই দেখ না। পুলিস সাহেব বোধ হয় সেই জন্যেই কাগজটাকে কেটে পাঠিয়েছেন।

আমি বলিলাম—মশায় আমাদের বেলায় ত সম্পাদক ভায়া দাঁত খিঁচিয়েছেন আর সাহেবদের ত তোষামোদ করতে ছাড়েন নি। বুঝুন দেখি যদি বেদেরা—

আমার কথায় বাধা দিয়া অম্বিকা বাবু বলিলেন—তা ত ভায়া বুঝলুম। তবু কোথা থেকে কি হয় কে বল্‌তে পারে?

আমি বলিলাম,—বেশ! তাই কর্‌ব। তবে আপনিও যে ও কথা বলছেন সেটা বড় কষ্টের।

তিনি বলিলেন,—ভায়া বোঝ না। সাহেবের যখন মাথায় লেগেছে—

আমি বলিলাম,—আচ্ছা সমস্ত ব্যাপারটা ধরুন। জ্যোৎস্না রাত্রি এগারটা বারটার সময় কাজটা হ'য়েছে। রথহরি বাবু একেলা ঘরে শুয়েছিলেন। ঘরে আলো জলছিল। ঘরের দরজায় খিল দেওয়া ছিল না। ঘরে ঢোকবার দুটো দরজা—একটা বাহির বাড়ীর দিকে—একটা ভিতর বাড়ীর দিকে। দু'টো দরজা খোলা। ঠিক তাঁর শোবার ঘরের নীচে দু'জন চাকর জেগে তাস খেলছিল—বিশ্বাসী চাকর। তারা দুজনে স্পষ্ট শুনেছে বাবুর গলা—"কেরে?" তার উত্তর দু'জনেই শুনেছে—"কেরে পাজি? জান না ইয়ার?" তারা বিস্মিত হ'য়ে কথাটা শুনলে। বাবু কি বললে শুনতে পেলে না। উত্তর হ'ল—"বল কি ইয়ার মদ খেয়েছ?" তার পরেই গুলির আওয়াজ হ'ল। তারা দুজনেই ছুটে ওপরে গেল। বাহিরের দরজাটার উপর মাত্র এক মিনিট তাদের দৃষ্টি ছিল না। উপরে উঠে তারা দেখলে দরজা বন্ধ—খিল দেওয়া ছিল না। ঘরে ঢুকে দেখলে রক্তারক্তি—বাবু অজ্ঞান, ডান হাতের হাড় ভেঙ্গে গুলিটা পাশের খড়খড়ির কাঠে বিঁধে গিয়েছিল।

অম্বিকা বাবু ললাট কুঞ্চিত করিয়া ভাবিতেছিলেন। বাগানের ধারে রথহরি বাবুর তিনটী জানালা। একেবারে লম্বা ভিনিসিয়ন—অর্দ্ধেকটা করিয়া লোহার গরাদে। ইহাদের মধ্যের জানালার একেবারে অপর দিকে একখানি কৌচের উপর রথহরি বাবু শুইয়াছিলেন। তাহার পার্শ্বেই খড়খড়ি। নীচের অর্দ্ধেক

একেবারে বন্ধ, উপরের অর্দ্ধেক খোলা। সেই নীচের অর্দ্ধেকে গুলিটা লাগিয়াছিল। সেই দিকের খড়খড়ি দিয়া কেহ লাফাইয়া পড়িলে ভৃত্য দুইটির সম্মুখে পড়িত। বাগানের দিকে লাফাইলে অবশ্য পলাইতে পারিত কিন্তু সে দিকে কোনও পায়ের দাগ পাই নাই। বাহির মহলের দিকের দরজা দিয়া হত্যাকারী পলাইলে প্রথমতঃ ভৃত্য দুইটির নজরে পড়িবার সম্ভাবনা ছিল—তাহার পর দ্বারবানের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইত। ভিতরের দিকের দরজা দিয়া যে ঘরে প্রবেশ করা যায়, সে ঘরে রথহরি বাবুর গৃহিণী শয়ন করিয়াছিলেন। বন্দুকের শব্দ পাইবা মাত্র তিনি গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তাহার অব্যবহিত পরেই ভৃত্যদ্বয় আসিয়াছিল। গৃহিণী গাঢ় নিদ্রায় মগ্ন ছিলেন বলিয়া বন্দুকের শব্দের পূর্ব্বের কোনও কথা শুনেন নাই। গৃহের কোনও পদার্থ অপহৃত হয় নাই।

অম্বিকা বাবুকে বলিলাম,—দাদা বেদেরা এ কাজ করে না, চুরি করে। আর চুরি করলেও জ্যোৎস্না রাত্রে করে না। আর গোলাগুলি বন্দুক টন্দুকের ধার বেদেরা বড় একটা ধারে না।

বড় দারোগা অম্বিকা বাবুকে অগত্যা বলিতে হইল,—হ্যাঁ তা বটে। আচ্ছা দেখি।

রথহরিবাবুর এজাহারটা আবার পাঠ করিলাম,—"আমার নাম রথহরি রায়—বয়স ৫০ বৎসর, জাতি কায়স্থ, পেশা জমিদারী—নিবাস গন্ধগোকুল। গত ২৭শে ফাল্গুন আমি আমার ঘরে শুইয়াছিলাম। উত্তর দিকের দেওয়ালের কাছে যে কৌচ আছে সেই কৌচে শুইয়াছিলাম, বাম পার্শ্বে ভর দিয়া উত্তর মুখ হইয়া শুইয়াছিলাম। আমি আফিম খাই। শেষ রাত্রে ভাল ঘুম হয়। প্রথম রাত্রে তত ঘুম হয় না। হঠাৎ রাত্রি এগারটার পর কে বলিল,—"রাধাকৃষ্ণ! রাধাকৃষ্ণ"। আমি চম্‌কাইয়া উঠিলাম। মুখ ফিরিয়া চাহিয়া বলিলাম—"কেরে"? উত্তর পাইলাম—"কে রে পাজি? জান না ইয়ার?" আমি রাগে আত্মহারা হইয়া বলিলাম—"কে বদ্‌মাস বেয়াদব?" আবার সেই স্বরে জবাব পাইলাম—"বল কি ইয়ার মদ খেয়েছ?" আমি উঠিতে যাইতেছি, বন্দুকের শব্দ পাইলাম। বেহুঁস হইলাম। যখন জ্ঞান হইল, তখন দেখি আমি অপর ঘরে। শব্দ ঘরের ভিতর অথচ দক্ষিণের জানালার নিকট হইতেছিল, বোধ হয়। জানালার বাহিরে বাগান হইতে কথার শব্দ হইতেছিল না, ইহা আমার খুব বিশ্বাস। কাহার

গলার স্বর তাহা আমি বলিতে পারি না। কথাগুলা মোটা নাকি সুরে হইতেছিল। গুলি মারিবার পর জানালার দিক হইতে কি যেন একটা সাদা উড়িয়া গেল। আমার কোন শত্রু নাই। কাহারও উপর সন্দেহ হয় না। আমি তদন্ত চাহি না।"

রথহরিবাবুর এজাহার আমি নিজের হাতে লিখিয়া লইয়াছিলাম। একটা বিষয় বড় আশ্চর্য্য বোধ হইল। তাঁহার ঘরে যে কথাগুলা শুনা গিয়াছিল, সে কয়টা কথা তাঁহার ও দুইজন ভৃত্যের বর্ণনায় অক্ষরে অক্ষরে মিলিতেছিল। অথচ তিনি ঘরে কোনও লোক দেখেন নাই, এ বড় রহস্যের কথা।

এ তদন্তে রথহরি বাবুর নিকট হইতে কোনও সাহায্য পাইব না, তাহা বুঝিয়াছিলাম। আমার বিশ্বাস হইতেছিল, তাঁহার পরিবারস্থ কোনও অশিষ্ট যুবক মদের নেশায় তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিয়া ঐরূপ আচরণ করিয়াছিল। সে ব্যক্তি অন্দরের দ্বার দিয়া পলাইয়া গিয়াছিল। রথহরিবাবু কলঙ্কের ভয়ে তাহার পরিচয় গোপন করিতেছিলেন। এদিকে "নির্ভীক মুখপত্র" অসার মন্তব্য লিখিয়া আমাদিগকে অপদস্থ করিতে চেষ্টা করিতেছিল। আমাদের এক পুরাতন ইন্‌স্পেক্টার বলিতেন—"ছোট শালীর যেমন ভগ্নাপতির কর্ণমর্দ্দন করিবার স্বত্ব আছে, সংবাদপত্রেরও তেমনি পুলিসকে গালি দিবার স্বত্ব আছে—ইহাতে কোনও পক্ষের কুপিত হইবার কথা নাই।" "সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে"-রূপ হতমানের মলমটাও লাগাইবার চেষ্টা করিলাম, তাহাতেও শান্তি পাইলাম না। বাঙ্গালা সংবাদপত্রের উপর ক্রুদ্ধ হইলাম। যেমন করিয়া হউক এ অসম্ভব ব্যাপারের রহস্য উদ্ঘাটন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলাম।

কেহ নেশার ঝোঁকে অকস্মাৎ এরূপ কার্য্য করিয়াছে, এই ধারণা লইয়া তদন্তে প্রবৃত্ত হইলাম। রথহরি বাবুর একমাত্র পুত্র মদ্য পান করে না। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রদের মধ্যেও কেহ মদ্যপায়ী ছিল না। তাঁহাদের বাটীর পার্শ্বের "ছোট তরফে"র জ্ঞাতিদিগের মধ্যেও কুচরিত্র লোক ছিল না। আমলাদের মধ্যে দুই একজন মদ্য পান করিত। কিন্তু তাহাদের দ্বারা এ কার্য্য হইলে রথহরি বাবু বা তাঁহার স্ত্রী অপরাধীকে বাঁচাইতে চেষ্টা করিতেন না।

রথহরি বাবুর বাড়ীতে দুইটা দুনলা ব্রীচলোডিং ১২ বোর বন্দুক ছিল। যে গুলি দ্বারা রথহরি বাবু আহত হইয়াছিলেন,—সেটাও ১২ বোর বন্দুকের সীসার গুলি। তাঁহার বন্দুক দুইটি তখনি পরীক্ষা করিয়াছিলাম। তাহাতে খালি টোটা ছিল না। আর বন্দুক দুইটি গৃহে বাক্সের মধ্যে বন্ধ ছিল।

তাঁহার বন্দুকে তিনি আহত হন নাই। তবে কাহার বন্দুকে তিনি আহত হইলেন?

ছোট তরফের সুবোধবাবুর একটা বন্দুক ছিল। সেটি পরীক্ষা করিয়াছিলাম। সে বন্দুকটি তাঁহার পুত্র মণীন্দ্র ব্যবহার করিত। ঘটনার পরদিন প্রভাতেই তাহার বন্দুক পরীক্ষা করিয়াছিলাম। সে বন্দুকটী ব্যবহৃত হইত। একটা চোঙে ময়লা। কিন্তু তাহা হইতে কিছু বুঝিলাম না। বড় তরফে ছোট তরফে খুব সম্প্রীতি। মণীন্দ্রকে রথহরি খুব স্নেহ করিত। ঘটনার সময় যেমন অপর সকলে রথহরির কক্ষে আসিয়াছিল, মণিও তেমনি আসিয়াছিল। কিন্তু—প্রথমটা অপ্রতিভ হইবার ভয়ে কথাটা জিজ্ঞাসা করি নাই। শেষে লজ্জার মাথা খাইয়া কর্ত্তব্যবোধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম,—তাহার বন্দুকের মাছিতে সাদা সূতা বাঁধা কেন?

মণীন্দ্রলাল এ প্রশ্নে প্রথমটা একটু থতমত খাইয়াছিল। শেষে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছিল—রাত্রে ব্যবহার হয় ব'লে। এক একদিন রাত্রে শেয়াল মারি তাই।

আমি বলিয়াছিলাম—কাল রাত্রে?

সে বলিয়াছিল—কাল রাত্রে বন্দুক ব্যবহার করি নাই।

আজ কিন্তু সেই কথাটা মনের মধ্যে তোলাপাড়া করিতেছিলাম। শৃগাল মারিতে গিয়া কি মণি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া বৃদ্ধকে গুলি করিয়াছিল? কিন্তু সেই মোটা গলা নাকি সুর গোল বাধাইল। কথাবার্ত্তাটার অর্থ কি? সেটা কাহার কণ্ঠস্বর? মণির কণ্ঠস্বর ভৃত্যদিগের নিকট পরিচিত। কিছু স্থির করিতে পারিলাম না। কিন্তু মণীন্দ্রের বন্দুকের গুলিতে বৃদ্ধ আহত হইয়াছে অন্ততঃ সে বন্দুক পূর্ব্ব রাত্রিতে ব্যবহৃত হইয়াছে সে সন্দেহ মনের মধ্যে গাঢ় হইতেছিল।

আর একটা সন্দেহ মনের মধ্যে উদিত হইতেছিল। বোধ হয় বাগানের ভিতর হইতে কেহ বন্দুক ছুঁড়িয়াছিল। কিন্তু তাহা হইলে ঘরের মধ্যে কথা কহিল কে? তবে কি অপরাধী একাধিক? একাধিক হইলে বাঙ্গালা দেশে অপরাধী ধৃত হইবার সম্ভাবনা। রথহরি কেন তদন্ত চাহেন নাই তাহাও ভাবিবার কথা। তবে কি তাহাদের বাঁচাইতে চাহিতেছেন? তাঁহার সাদা পাখি উড়িয়া যাইবার বর্ণনাটুকু সমস্ত ব্যাপারটাকে উড়াইবার জন্যই বোধ হয় বলিয়াছিলেন। সে কথা সত্য হইলেও তাহার একটা জবাব ছিল। ঠিক তাঁহার জানালার

নীচেই দেওয়ালে কতকগুলা গর্ত্ত ছিল। বোধ হয়, শব্দ শুনিয়া তাহার ভিতর হইতে কোনও পেচক উড়িয়া গিয়াছিল।

আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম,—আপনি তদন্ত চান না এ কথা লিখেছেন কেন?

তিনি বলিলেন,--কি হ'বে? এ রকম ক্ষেত্রে আপনারা কা'কেও ধর্‌তে পারবেন না, হয় ত সন্দেহ ক'রে কতকগুলা নিরীহ লোককে উৎপীড়ন কর্‌বেন।

আমি একটু টোকর দিয়া বলিয়াছিলাম,—মশায় কি কাকেও বাঁচাবার—

তিনি বলিয়াছিলেন,—দোষীকে নয়। আপনাদের সন্দেহের হাত থেকে নিরপরাধীকে বাঁচাবার জন্যে। আসল কথাটা শুন্‌বেন?

আমি খুব আশা করিয়া বলিয়াছিলাম,—আজ্ঞে তা যদি বলেন—

তিনি বলিলেন,—আমার বয়স হয়েছে—বিষয়-কর্ম্ম করি। কোনও শত্রু নেই, কারও অনিষ্ট করিনি। ঘরে মানুষের কণ্ঠস্বর শুনলাম—লোক দেখলাম না। সাদা পাখী উড়ে গেল। বাগানে লোক নেই—আরও কি বল্‌তে হ'বে?

আমি ত কিছু বুঝিলাম না। বলিলাম,—হ্যাঁ আরও খানিকটা বল্‌লে ভাল হয়।

তিনি বলিলেন,—তবে শোন। ব্যাপারটা ভৌতিক।

যে রকম স্বরে এবং যে রকম মুখভঙ্গি করিয়া তিনি বলিলেন,—ব্যাপারটা ভৌতিক, তাহাতে না হাসিয়া থাকিতে পারিলাম না। বুঝিলাম, লোকটা ভীমরথিগ্রস্ত বৃদ্ধ। তিনি একটু কুপিত হইয়া বলিলেন—হাস আর যা কর আমার খুব বিশ্বাস, এটা হাওয়ার খেলা। মোটা গলা অথচ নাকি সুর। মানুষ নেই বন্দুকের আওয়াজ। শেষে পাখীর বেশ ধ'রে পালিয়ে গেল। পুলিশে যা বলে বলুক আমি বল্‌ব—ভৌতিক ব্যাপার।

(৩)

গন্ধগোকুল গ্রামের বাহিরে ঝিটকীর জঙ্গল। এমন বিশেষ জঙ্গল নয়—তবে কতকগুলা বাগান অযত্নে জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে। মাঝে দুইটা খুব বড় দীঘি আছে, তাহাদের পাড়গুলা ছোট খাট পাহাড়ের আকার ধারণ করিয়াছে। একটি পাড়ে এক বৃহৎ অশ্বত্থ বৃক্ষ অবধি জন্মিয়াছে—চারিদিকে বন্য আম, কাঁটাল, খেজুর এবং নোনা আতার গাছ। অজ্ঞাতনাম বন্যবৃক্ষ অসংখ্য। একটা দীঘির ধারে পাড়ের নীচে বড় বড় গর্ত্ত। তাহার ভিতর নাকি

কুমীর লুকাইয়া থাকে—অণ্ড প্রসব করে। সেই দীঘিতে অন্ততঃ একটা খুব বড় কুমীর ছিল তাহাকে সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যাইত। গ্রামের কেহ সেই দীঘির কুমীর মারিত না। প্রবাদ ছিল আটটি সাধু কুম্ভীরাকার গ্রহণ করিয়া সেই দীঘিতে বাস করিত এবং দেশের কল্যাণ সাধন করিত।

অপর দীঘির পাড়ের বাহিরে খানিকটা খালি জমি ছিল। সেই জমির উপর পাঁচটা ছোট ছোট তাম্বু খাটাইয়া ভ্রমণকারীর দল বাস করিতেছিল। সঙ্গে পাঁচ সাতটা ঘোড়া, কতকগুলা গরু, একপাল ছাগল, এক ঝাঁক পাতি হাঁস। তাহারা প্রায় মাসাবধি এস্থলে বাস করিতেছিল। তাহাদের মধ্যে নানা বর্ণের নানা আকৃতির বৃদ্ধ বৃদ্ধা যুবক যুবতী, বালক বালিকা, ছিল। লোকগুলা দিনের বেলা সন্ন্যাসী সাজিয়া ভিক্ষা করিত, গ্রামের মধ্যে টোট্‌কা ঔষধ দিত, কেহ কেহ বিলাতী খেলনা প্রভৃতি বিক্রয় করিত। স্ত্রীলোকগুলাও নানাভাবে আশপাশের গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইত। দুই একটা যুবতী খুব সুন্দরী, অপর কতকগুলা ইতর শ্রেণীর সাধারণ স্ত্রীলোকের মত কুরূপা অথচ সবলকায়।

ঘটনার সাত দিন পরে একটা ব্যাপার দেখিয়া বড় বিস্মিত হইলাম। খুব প্রত্যুষে উঠিয়া ঝিটকীর জঙ্গলে গেলাম। বনের ভিতর উষার আলোক পুলিস দারোগারও প্রাণে মধুর ভাবের লহর তুলিতেছিল। বেদেদের বস্তী তখনও সুপ্ত। অধিক রাত্রি অবধি গোলমাল নৃত্য-গীত করিয়া ইহারা তখনও নিদ্রিত ছিল। আমি দীঘির পাড়ের উপর হইতে তাহাদিগকে লক্ষ্য করিতেছিলাম এবং "মেঘমন্দ্রে"র সম্পাদক ধুরন্ধরের বুদ্ধি-প্রাখর্য্যকে উপহাস করিতেছিলাম। ইহারা কেন দেশের জমিদারকে মারিবে তাহা সহজ বুদ্ধিতে নির্ণয় করা যায় না। আমি একটা ঝোপে বসিয়া এই রকম সাত পাঁচ ভাবিতেছিলাম, স্বভাবের শোভা দেখিতেছিলাম আর প্রভাত-সমীরের শৈত্য অনুভব করিতেছিলাম—হঠাৎ পশ্চিম দিকের বনের ভিতর হইতে একটা বাঁশীর শব্দ হইল। অবশ্য শ্যামের বাঁশী বা কোনও একটা সম্মোহন বাঁশরীধ্বনি নয়—ফুটবলের ম্যাচের সময় রেফারী যেমন বাঁশী বাজায় সেই রকম বাঁশীর শব্দ। কিন্তু সেই ফুটবলের বাঁশী সেই জঙ্গলের মধ্যে বাস্তবিকই শ্যামের বাঁশীর ফল ফলাইল। বাঁশীর শব্দ শুনিয়া একটা তাম্বুর ভিতর হইতে একটি অষ্টাদশী যুবতী বাহির হইল—পরিধানে সুলভ নকল বেনারসী মোটা শাড়ী, গোল হাতে বেনারসী গালার চুড়ী। তাহার সুস্থ সবল দেহে কি কোমলতা, কি কমনীয়তা! কপালে টিক্‌লি টিপ লাবণ্যভরা মুখের উন্মাদক ভাবটাকে বড় বাড়াইয়া তুলিতেছিল। রমণী অভিসারে যাইতেছিল,

তাহার প্রতি অঙ্গভঙ্গিতে প্রত্যেক পদবিক্ষেপে তাহা প্রকাশ পাইতেছিল। বোধ হয়, এই সকল স্ত্রীলোক সম্বন্ধে প্রণয়ের নিয়ম শিথিল করিবার জন্যই শাস্ত্রকারেরা বিধি করিয়াছিলেন—"স্ত্রীরত্নম দুস্কুলাদপি"। যে রসিকের মুরলী ধ্বনি শুনিয়া যুবতী আনমনে ছুটিতেছিল, তাহাকে দেখিবার সাধ হইল। গাছের আড়ালে থাকিয়া পশ্চিমের সেই বাগান অবধি সুন্দরী বেদের মেয়েকে অনুসরণ করিলাম।

আমি যেদিকে যুবতীকে অনুসরণ করিতেছিলাম সেদিকে খুব ঘন জঙ্গল। তাহার উপর প্রায় সর্ব্বত্রই ফণী মনসার গাছ। রমণী যে পথে বাগানের ভিতর যাইতেছিল, সে পথটা অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার। দুই একটা কুঁচের গাছ পদদলিত করিয়া সে অবাধে বনের মধ্যে প্রবেশ করিল। আমি পারিলাম না। আমি পথ খুঁজিতে খুঁজিতে সে আমার দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গেল। আমি অনেকক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরিয়া ফিরিয়া যে পথ পাইলাম তাহা ধরিয়া কিছু দূর চলিয়া দেখিলাম একেবারে বিপরীত দিকে আসিয়াছি। অগত্যা ভগ্ন-মনোরথ হইয়া কুমীরের দীঘির পাড়ে আসিয়া বসিলাম।

প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল বসিবার পর পশ্চাতে শুষ্ক পত্রের মর্ম্মর ধ্বনি শুনিলাম। দেখিলাম, একটা কৃষ্ণকায় অশ্বপৃষ্ঠে মণিলাল। খাকির পোষাক, মাথায় সোলার টুপি, পৃষ্ঠে একটা বন্দুক বাঁধা। মণিলাল নামিয়া একটা পেয়ারা গাছে ঘোড়া বাঁধিল। তাহার পর ধীরে ধীরে আমার কাছে আসিয়া বলিল—রাম বিলাস বাবু যে। এখানে?

আমি বলিলাম—আমাদের ভ্রমণকারীর দলের ওপর পাহারা রাখতে হয়। এক বার দেখতে এলাম বাবুরা কি করছে না করছে।

জলের ধারে কতকগুলি কাদাখোঁচা লম্বা ঠোঁট দিয়া মাটি খুঁড়িতেছিল। মণিলাল বন্দুকে টোটা ভরিতে ভরিতে একটু অন্যমনস্কভাবে বলিল—কি দেখলেন?

আমি তাহার মুখের দিকে দৃঢ়ভাবে চাহিয়া বলিলাম—কেবল একটা বেদের মেয়ে অভিসারে গেল তা বই আর কিছু দেখলাম না।

মণিলাল আমার দিকে যে দৃষ্টিতে চাহিল তাহার অর্থ বুঝিলাম না। তবে সেটা সাধারণ চাহনী নয়। আমি সাহস করিয়া বলিলাম—আপনি কি—

মণিলাল ললাট কুঞ্চিত করিয়া বলিল—আমি কি?

আমি বলিলাম—বাঁশী বাজাচ্ছিলেন?

একটা কাদাখোঁচা উড়িল। মণিলাল নিমেষে বন্দুক তুলিয়া শব্দ করিল। অব্যর্থ সন্ধান। প্রাণহীন পাখীর দেহটা মাটিতে পড়িল। মণিলাল পাখীটাকে তুলিয়া আনিয়া বলিল—যাই। ওদিকে ত একটা বুনো শুয়ার পেতে পারি।

আমি বেদের বস্তির দিকে চলিলাম। সে অশ্বারোহণে অপর দিকে চলিল।

বেদের দলের সরদারের নাম নানকু, ইহারা এক থানার এলাকা ছাড়িয়া দ্বিতীয় থানায় যাইবার সময় আমাদের সহি লইয়া দ্বিতীয় থানায় দারোগার সহিত সাক্ষাৎ করে। ভ্রমণকারীর দলের সহিত বর্ণনাপত্র থাকে। কোন কোন দলের উপর সর্ব্বদা পাহারা দিবার জন্য আমাদিগকে কনেষ্টবল "মোতায়ন" করিতে হয়। আমি গিয়া নানকুকে ডাকিলাম। সে আমায় চিনিত। অনেক-গুলা বেদে ও বেদিয়ানী আসিয়া আমার চতুর্দ্দিকে দাঁড়াইল।

আমি নানকুকে বলিলাম—সর্দ্দার তোমরা যাবে কবে?

সর্দ্দার বলিল—আজ্ঞে ধর্ম্মাবতার আর পাঁচ সাত দিনে যাব। এবার পলাশডাঙ্গার এলাকায় যায়।

আমি বলিলাম—সর্দ্দার সব লোককে ভাগিয়ে দাও একটা কথা বল্‌ব।

সর্দ্দার সকলকে সরাইয়া দিল। আমি তাহাকে বলিলাম—সর্দ্দার ও মেয়েটা কে?

সর্দ্দার একটু হাসিয়া বলিল—বাবু ওটা আমাদেরই আছে। ওর বাপটা মরিয়ে গেছে।

আমি বলিলাম—ওর স্বভাবচরিত্র কেমন? সকালে সেজে গুজে বনের ভেতর কার কাছে গিয়েছিল?

সর্দ্দার হাসিয়া বলিল—ওর বয়সটা কাঁচা আছে আর ওর সে স্বামীটা কেউ নেই বাবু। দুনিয়াদারী কেন কর্‌বে না হুজুর? বেদের মেয়েটা সে সব রকম করে ধর্ম্মাবতার জানেন ত?

তাহার নীতিজ্ঞান এতটা উদার তাহা জানিতাম না। কার্য্যোদ্ধারের জন্য হাসিয়া তাহার দুনিয়াদারী সম্বন্ধে হিতোপদেশের সমর্থন করিলাম। বালিকার প্রণয়াভিলাষী পুরুষটিকে সর্দ্দারকে তাহার অনুসন্ধান করিতে বলিলাম। সর্দ্দার বলিল—বাবু এটা লাজের কথা। আমার মুখ হ'তে বাহার হ'লে কথাটা দোষের হবে। আমি উকে ডাকিয়ে দিচ্ছি হুজুর আপনি জিজ্ঞেস কর।

আমি বলিলাম—তাই হবে।

সর্দ্দার ডাকিল—ফুলুয়া! হো ফুলুয়া! সো কস্তুরী দানোয়া একরা পাশ লাব হো।

যুবতীর নাম বুঝিলাম ফুলুয়া। ফুলুয়া একটা ময়লা তাঁবুর ভিতর হইতে কতকটা মৃগনাভি লইয়া আসিল। আমি হাসি মুখে তাহা গ্রহণ করিলাম। সর্দ্দার তাহাকে আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে বলিয়া হোঃ হোঃ [illegible] করিয়া একটা ছাগলকে শাস্তি দিবার ভাণ করিয়া চলিয়া গেল। ফুলুয়া একটু পাশ ফিরিয়া দাঁড়াইল। বাস্তবিক ফুলুয়া সুন্দরী—কাব্যের সুন্দরী নয় সাদা কথায় যাহাকে সুন্দরী বলে সেই রূপ সুন্দরী। আমি তাহাকে বলিলাম—সকালে কার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলি?

ফুলুয়া জবাব দিল না। নীতিজ্ঞান সম্বন্ধে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নব যুবতী-দিগের মধ্যে বিভিন্ন রকমের ধারণা থাকিতে পারে, কিন্তু লজ্জা ও লজ্জাজনিত একগুঁয়েমি সব জাতীয় যুবতীর মধ্যে সমভাবে বিদ্যমান। অনেক প্রশ্ন করিলাম একটু ভয় দেখাইলাম সে কোন কথার উত্তর দিল না। আমি শেষে বলিলাম—আমি জানি। মণি বাবু না?

যুবতী উত্তর দিল না, কিন্তু আমার দিকে একবার কটাক্ষ করিল। আমার আর সন্দেহ রহিল না। আমি তাহাকে বলিলাম— ফুলুয়া দেখ সেই জমিদার বাবুর গুলিমারার মামলা আমি তদন্ত করছি।

ফুলুয়া এবার আমার দিকে চাহিল—উপেক্ষার চাহনি। আমি বলিলাম—তোমাকে সাক্ষী দিতে হ'বে।

সে উপেক্ষা করিয়া বলিল—আমি কি জানি?

আমি বলিলাম—তুমি জান না। যদি সত্য কথা বল তো তোমরা এ জঙ্গো ছেড়ে যেতে পাবে আর যদি সত্য কথা না বল তো তোমাদের গুষ্টিবর্গকে আটক করব।

ফুলুয়া বলিল—আটক্ করো! আমি গুলি মেরেছি। আমাকে গেরেপ্তার কর।

বৃদ্ধ রণহরিকে ফুলুয়া গুলি মারিয়াছিল কি না জানি না। কিন্তু আমাকে সে যে বাণ মারিল তাহাতে নেহাৎ পুলিসের দারোগা না হইলে আমাকেও মাথা ঘুরিয়া পড়িতে হইত। ফুলুয়া আর কোনও কথা না বলিয়া চলিয়া গেল। আমি তাহাকে ডাকিলাম, সে ফিরিল না।

অপর কেহ ওরূপ ব্যবহার করিলে কি করিতাম বলিতে পারি না। এক্ষণে কিন্তু কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ধীরে ধীরে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলাম।

(৪)

সেই দিন রাত্রি প্রায় নয়টার সময় আবার বেদে বস্তির দিকে গেলাম। যুবতীর গর্ব্ব খর্ব্ব করিতে না পারিলে আমার নিদ্রা হইবে না। নানকু সরদারকে ডাকিয়া বলিলাম—কাগজ কোথায়? হাজরে নব।

নানকু কাগজ আনিল। আমি বলিলাম—কুলুয়া কোথা?

কুলুয়া ছিল না। আমি বলিলাম—আজ যদি রাত্রিতে কোন চুরি হয় কুলুয়াকে কাল গ্রেপ্তার করব।

নানকু আমায় বুঝাইতে চেষ্টা করিল—যুবতী কোথা দুনিয়াদারী করিতে গিয়াছে। আমি বুঝিতে অস্বীকৃত হইলাম। সে নিশ্চয় রাহাজানী করিতে বাহির হইয়াছে আমার এইরূপ ধারণা। সর্দ্দার বলিল—বাবু গোসা কেন হচ্ছেন? আপনিও মিষ্ট কথা বলুন সে আপনারও হুকুম মানিবে।

আমার সর্ব্ব শরীর জ্বলিয়া উঠিল। আমার চরিত্র সম্বন্ধে বৃদ্ধের মনে এ সন্দেহ হইতে পারে এ কথাটা আমার মনেই হয় নাই। সে বুঝিয়াছিল—রূপের মোহে আমি সকাল সন্ধ্যা তাহাদের শিবিরে ঘুরিতেছিলাম। আমি তাহাকে বুঝাইয়া বলিলাম যে আমার দুইবার সে স্থলে আসিবার অন্য উদ্দেশ্য ছিল। সর্দ্দার একটু হাসিল। আমি বলিলাম—শোন স্পষ্ট করে বলি। জমিদার বাবুকে গুলি মেরেছে তা ত জান? কাল সকালে আমি তোমাদের সকলকে গ্রেপ্তার করব।

সরদার বলিল—রাম! রাম! দারোগা বাবু এ সব কাজের মধ্যি আমরা থাকিনি।

আমি বলিলাম—কুলুয়া জানে। যদি কাল বেলা আটটার মধ্যে এ বিষয়ে ঠিক খবর না পাই তা হলে কাল তোমাদের বড় দুর্দ্দশা হবে।

আমি খুব বেগে চলিয়া আসিয়া আমার টাটু ঘোড়ায় চড়িলাম। বন পার হইয়া গ্রামের বড় রাস্তায় আসিয়া দেখিলাম, অশ্বারোহণে মণীন্দ্র পথের উপর অপেক্ষা করিতেছে, পৃষ্ঠে বন্দুক বাঁধা।

আমাকে দেখিয়া সে বলিল—আপনার জন্যে অপেক্ষা করছি।

আমি বলিলাম—আমাকে এতটা সম্মান দেখাবার কারণ?

সে বলিল—আপনি আমাকে যে সম্মান দেখিয়েছেন সেই জন্যে। চলুন যাবেন ত?

উভয়ে ধীরে ধীরে থানার দিকে চলিলাম। মণীন্দ্র বলিল—দেখুন আমরা

জমিদারের ছেলে, আমাদের গোপনীয় কথায় কেউ জ্যেঠামী করতে গেলে আমরা কি করি জানেন? তার নাক বসে দি।

আজ কপালে কেবল অপমানই ছিল। ক্রোধে কথা কহিতে পারিলাম না। সে বলিল—ফুলুয়া আমার কাছে আসে। এ বেদের দল চলে গেলেও সে আমার কাছে থাক্‌বে। এ কথা জেনে তাকে শ্রদ্ধা জানিও, বুঝলে?

আমার এবার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল। আমি বলিলাম—দেখুন আপনি জমিদারের ছেলে, আর আমি রাজার রাজা তস্য রাজা এড্‌ওয়ার্ড রাজার চাকর। কাল সকালে ফুলুয়াকে গ্রেপ্তার করব আর যদি দরকার হয় গুলি মারা মামলায় জমিদারের ছেলেকেও—

কথাটা মুখ দিয়ে বাহির হইতে না হইতেই দুর্বৃত্ত আমাকে লক্ষ্য করিয়া ছিপটি মারিল। আমার গায়ে লাগিল না। আমি খুন খুন করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলাম। সে ঘোড়া ছুটাইয়া চলিয়া গেল।

(৫)

বড় দারোগা বলিলেন—ও সব না। ছুঁড়িটাকে অপমান করেছ বলে ও রকম করেছে।

আমি বলিলাম—তা আমার অপমানটার কি কিছু হবে না?

তিনি বলিলেন—বুঝেছ ত ভায়া? কেহ সাক্ষ্য নেই কিছু না। বড় লোকের ছেলে একজন উকীল দেবে শেষে—

আমি বলিলাম—ঝক্‌মারির চাকরি। সরকারী চাকরদের কি ইজ্জত নেই দাদা?

তিনি বলিলেন—দাদা একটু দেখ না। পাকে প্রকারে এমন করব যে—

আমি বিরক্ত হইয়া বলিলাম—ছাই করবেন।

শেষে ফুলুয়াকে ধরিবার জন্য বাদানুবাদ হইল। বাস্তবিক কোনও চার্জ্জে তাহাকে ধরিবার উপায় ছিল না। আমার কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাস মদ্যপান করিয়া মণীন্দ্র ফুলুয়াকে লইয়া উদ্যানে আমোদ করিতেছিল। বৃদ্ধ রথহরি জানালা দিয়া কিছু বলিয়াছিল—তাই নেশায় মণীন্দ্র তাহাকে গুলি মারিয়াছিল। বংশের কলঙ্ক গোপন করিবার জন্য বৃদ্ধ তাহার নাম করে নাই।

বড় দারোগা হাসিয়া বলিলেন—ভায়া সেটা সম্ভবপর নয়। প্রথমতঃ বুড়ার শরীরের যেখানে গুলি লেগেছে আর জানালার যেখানে গুলি লেগেছে তা দেখে মনে হয় বুড়া শুয়েছিল।

আমি বলিলাম—বেশ। না হয় শুয়ে শুয়েই ধমকেছিল।

তিনি বলিলেন—বেশ কথা কণ্ঠস্বরটা! মোটা নাকি সুর?

আমি বলিলাম—ওঃ কিছু না। বানানো কথা। আর মদ খেলে লোকের কি রকম সুর হয় কে বল্‌তে পারে?

অম্বিকা বাবু হাসিয়া বলিলেন—সে কি ভায়া? গোঁজা মিল দিলে চলবে কেন? আর একটা মস্ত কথা ভুলছ কেন? যদি তারা ওকে গুলি মারার ব্যাপার থেকে বাঁচাতে চায় তা হ'লে কি আবার ওকে ঐ বেদেনীর সঙ্গে হৈঃ হৈঃ করে ঘরে বেড়াতে দেয়। বেদেনীর জন্যই ত অত কাণ্ড। বাড়ীর কর্ত্তার গায়ে গুলি লাগলো—

আমি বলিলাম—তা বলে মশায় আমার অপমানটা বৃথা যাবে?

তিনি পুলিস সাহেবকে একটা মস্ত রিপোর্ট লিখিয়া পাঠাইলেন।

বেলা আটটার সময় নানকু সর্দ্দার আসিয়া বলিয়া গেল যে, ফুলুয়ার নিকট কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। তাহার নিজের বিশ্বাস যে, ফুলুয়া এ বিষয় কিছু জানে না। তবে আমরা মালিক, ইচ্ছা করিলে তাহাদিগকে হইয়া সকল প্রকার নির্য্যাতন করিতে পারি।

আমরা উভয়ে পরামর্শ করিলাম। অম্বিকা বাবু বলিলেন—আচ্ছা আমরা পুলিস সাহেবকে রিপোর্ট করছি। এর মধ্যে তোমরা দেশ ছেড়ে যেও না।

নানকু 'যো হুকুম' বলিয়া চলিয়া গেল।

(৬)

বাল্যকালে আমাদের পাড়ায় এক কবির গান শুনিয়াছিলাম। রাজার বাড়ী চুরি হইয়াছিল—রাজা কোটালকে তিরস্কার করিতেছিলেন। সে কবির কথা আজও আমার মনে আছে—

"গর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া রাজা   রাগে অঙ্গ ভাজা ভাজা
কোটালেরে কহেন রুষিয়া।
পাজি বেটা বদমাস   নিদ্রা যাস বার মাস
চৌকিদারী ভাবনা ভুলিয়া॥"

কোটালের অদৃষ্টের স্রোত সৃষ্টির প্রাক্‌কাল হইতে বোধ হয় একই ভাবে প্রবাহিত। এই গুলি মারা ব্যাপার লইয়া পুলিস সাহেব রুষিয়া আমাদিগকে নানারূপ ভৎসনা করিয়া পত্রাঘাত করিয়াছিলেন এবং লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন

যে, তিনি শীঘ্রই আমাদের থানায় স্বয়ং আসিতেছেন। মণীন্দ্রের সম্বন্ধে কোনও কথা লিখেন নাই।

আমি অপর একটা সিঁদচুরির মোকদ্দমা লইয়া চণ্ডীথালি গ্রামে তদন্ত করিতে গিয়াছিলাম। বিশ্বাস ছিল সেই দিন পুলিশ সাহেব আসিবেন। সুতরাং প্রথম কোপের মুখে থানা হইতে সরিয়া পড়াই ভাল। অম্বিকা বাবু বহুদিন পুলিশে চাকুরি করিতেছিলেন তিনি সাহেবদের মেজাজ বুঝিতেন ভাল।

চণ্ডীথালির বিশ্বাসদের বাড়ী তদন্ত শেষ করিয়া একটু আরাম করিতে-ছিলাম। মতিলাল বিশ্বাস দেশের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতেছিলেন হঠাৎ মোটা নাকি সুরে কে বলিল—"কে রে পাজি জান না ইয়ার"? আমি বিস্মিত হইয়া উঠিয়া বসিলাম। মতিবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"কার কণ্ঠস্বর, কে?

আবার সেই স্বরে বাহির হইতে কে বলিল—"বল কি ইয়ার মদ খেয়েছ?

মোটা নাকি সুর! ঠিক যে কথাগুলি রথহরি বাবু ও তাঁহার ভৃত্যদ্বয় শুনিয়াছিলেন, সেই কথা। আমি প্রায় উন্মত্ত হইয়া আসন ছাড়িয়া উঠিলাম। মতিবাবু বিস্মিত হইয়া বলিলেন—কি ব্যাপার!

আমি বলিলাম—বাহিরে কথা কইছে কে? তাকে এখনি ধরিয়ে দিন! এখনি!

মতিবাবু হাসিয়া বলিলেন—এই কথা! আসুন।

(৭)

আর সাহেবকে ভয় নাই! আর মণীন্দ্রকে ভয় করি না। আজ তাহার অপমানের প্রতিশোধ লইব। আজ সাহেবকে যাহা বলিব তিনি তাহাই শুনিবেন। যদি সাহেব না আসিয়া থাকেন আমি স্বয়ং সদরে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিব। কিন্তু থানায় ফিরিয়াই দেখিলাম হাতার ভিতর তাম্বু! বুঝিলাম সাহেব আসিয়াছেন।

সাহেবকে সেলাম করিয়া সকল কথা বলিলাম। তাঁহাকে আমার আফিস ঘরের বাহিরে বসিবার আসন দিলাম। তাঁহাকে বলিলাম—এইবার শুনবেন?

সাহেব বলিলেন—হ্যাঁ!

আমি বলিলাম—কে রে?

মোটা নাকি সুরে ঘরের ভিতর হইতে শব্দ হইল, "কেরে পাজি, জান না ইয়ার?"

শব্দ হইল—"বল কি ইয়ার মদ খেয়েছ ?"

সাহেব চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া আমার পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন—বাঃ রামবিলাস! কিন্তু তার পর?

আমি বলিলাম—সাহেব তার পর ঠিক হবে। আপনি বুড়া রথহরি বাবু আর তাঁহার চাকর দুটাকে থানায় ডেকে আনান।

রথহরি বাবু সাহেবের হুকুম পাইবার অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে আসিলেন। তিনি বলিলেন—সাহেব আমাদের কথায় বলে, মার চেয়ে যার ভালবাসা তাকে বলে ডান্। আমি যখন নিজে কোন তদন্ত চাচ্ছি না, আপনারা কেন এত কষ্ট পাচ্ছেন?

সাহেব রথহরি বাবুকে জানিতেন এবং শ্রদ্ধাও করিতেন। তিনি বলিলেন—বাবু যদিও গুলি মেরেছে আপনার ওপর, তবু এসব কাজগুলার আইন অনুসারে স্বয়ং বাদসাহ ফরেদী হন। আমার দারোগাদের বিশ্বাস যে—

রথহরি বাবু বলিলেন—যে আমি জানি কে আমায় গুলি করেছে। আর আমি অপরাধীকে বাঁচাবার চেষ্টা করছি। আচ্ছা আপনি তো আমায় জানেন—আমি কখনও কি মিছে কথা কই?

সাহেব বলিলেন—না বাবু আপনি খুব ভদ্রলোক। আপনার কথা—

রথহরি বাবু বলিলেন—সেই কথায় আমার ভগবানের নাম গ্রহণ করে বলছি যে আমি যেটুকু এজাহার দিয়েছি তা বই আর কিছু জানি না।

সাহেব বলিলেন—আমি এ কথা বিশ্বাস করি। আচ্ছা আসুন।

তাঁহাকে এবং ভৃত্যদ্বয়কে আফিসের বারান্দায় বসাইয়া আমি বলিলাম—কে রে?

ভিতর হইতে উত্তর আসিল—"কেরে পাজি জান না ইয়ার?"

তাহারা তিনজনে বিস্মিত হইয়া বলিল—ঠিক্ সেই স্বর! সেই কথা!

তাহার পর ঘরের ভিতর হইতে শব্দ আসিল—"বল কি ইয়ার মদ খেয়েছ?"

রথহরি বাবু ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। ভৃত্যদ্বয় বলিল—ঐ লোক হুজুর ঐ লোক।

রথহরি বাবু বলিলেন—হ্যাঁ এবার আমি সাক্ষ্য দিব। ঐ লোক আমায় গুলি মেরেছে।

সাহেব হাসিয়া বলিলেন—ও লোক আপনাকে গুলি করেনি।

রথহরি বাবু বলিলেন—ও লোক আমার ঘরে ঢুকেছিল।

সাহেব বলিলেন—হ্যাঁ এ কথাটা সত্য।

(৮)

ফুলুয়াকে ধরিয়া আনিলাম। তাহাকে বলিলাম—বাপু সব কথা মণীন্দ্র বাবু বলেছেন। এখন তাকে বাঁচাতে চাও তো—

ফুলুয়া বলিল—কি ঝুট্ মুট্ বল্‌ছ বাবু লজ্জা করে না?

আমি বলিলাম—আচ্ছা দাঁড়াও।

ঘরের ভিতর হইতে মতিবাবুর কাকাতুয়াটাকে আনিয়া ফুলুয়ার সম্মুখে ধরিলাম। ফুলুয়া বিবর্ণ হইল।

আমি কাকাতুয়াটাকে বলিলাম—কে রে?

সেই উত্তর। সেই একঘেয়ে তোতাপাখির বুলি। ফুলুয়ার নিম্নোষ্ঠ কাঁপিতেছিল। আমি বলিলাম—কি রে ছুঁড়ি এবার?

এবার তাহার সাহস আসিল। নিম্নোষ্ঠের স্পন্দন বন্ধ হইল। মুখে রক্ত ফিরিয়া আসিল। চক্ষের চাহনীতে দৃঢ়তার চিহ্ন দেখা দিল। সে বলিল—সাহেব শোন, বাবু শোন। লিখে নাও। আমি আর বাবু বাগানে বেড়াচ্ছিলাম। চাঁদনী রাত। পাখিটা একটা গাছ থেকে উড়ে ঘরের জানালার নীচে বস্‌ল। বাবুর কাছে বন্দুক থাকে—বনবরা মারবার জন্যে শেয়াল মারবার জন্যে। আমি বন্দুক নিয়ে চিড়িয়াকে মারতে গেলাম চিড়িয়া পালাল। বড়া বাবুর জখম লাগল।

তাহারা দুইজনে বাগানে প্রেমালাপ করিবার জন্য ঘুরিবার সময় একার্য্য হইয়াছে, কয়েকদিনের কার্য্যকলাপ দেখিয়া সে ধারণা আমার মনের মধ্যে বদ্ধমূল হইয়াছিল। মণীন্দ্রের বন্দুক রাত্রিতে ব্যবহৃত হয় তাহার মাছিতে সাদা সূতা দেখিয়া আমার বিশ্বাস হইয়াছিল। কিন্তু কি কারণে তাহারা রথহরি বাবুর উপর গুলি চালাইতে পারে তাহা বুঝিতে পারি নাই। মতি বিশ্বাসের বাটীতে কাকাতুয়াটার সন্ধান পাইয়া সকল কথা বুঝিতে পারিলাম। অনুসন্ধানে জানিলাম, রথহরি বাবু আহত হইবার পর দিন বিশ্বাসেরা পাখীটি ধরিয়াছে—কাহার পাখী তাহারা তাহা জানে না। আহত হইবামাত্র রথহরি বাবু একটা সাদা পাখী উড়িতে দেখিয়াছিলেন। ঠিক পাখিটা জানালার নীচে বসিলে বাগান হইতে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুঁড়িলে রথহরি বাবুকে লাগিবার কথা।

কিন্তু রমণীর কথা শুনিয়া মনে হইল যে, সে আপনার প্রণয়ীকে বাঁচাইবার জন্য সমস্ত অপরাধ নিজের ঘাড়ে লইতেছে। মণীন্দ্রই গুলি চালাইয়াছিল।

সাহেবেরও সেই বিশ্বাস। তিনি বলিলেন—মণীন্দ্রকে থানায় ডাকিয়ে পাঠিয়ে গ্রেপ্তার কর।

(৯)

মণীন্দ্র আসিয়া আমাকে বলিল - সাহেব কোথা ?

আমি বড় তৃপ্তিসহকারে একটা পাহারাওয়ালাকে বলিলাম আসামীকো গ্রেপ্তার করো।

একজন বজ্রমুষ্টিতে মণীন্দ্রকে ধরিল। সে ক্রোধে ফুলিতেছিল। আমি বলিলাম—জমিদারের ছেলে! আমি কার চাকর বুঝেছ? এক ঘা চাবুক চালিয়েছিলে এখন দেখ ক বছর পাথর ভাঙ্গতে হয়।

সাহেব জানিতেন সে আমাকে অপমান করিয়াছিল। ইংরাজের গোলামের ঐটুকু মাধুরী। সাহেব তাহাকে বলিলেন—বাবু আপনি আমার দারোগা বাবুকে অপমান করেছিলেন কেন ?

সে রাগে ফুলিতেছিল। বলিল—প্রমাণ ?

সাহেব বলিলেন—তার চেয়ে বড় কারবারের প্রমাণ আছে। এই স্ত্রীলোকটাকে চেনেন ?

আমি ঘৃণা ও বিদ্রূপ-মিশ্রিত স্বরে বলিলাম—জমিদারের ছেলের বেদে সহচরী!

ফুলুয়া আরও দৃঢ়তার সহিত বলিল—বাবু আমি গুলি ছুঁড়েছি। আমাকে ফাঁসি দাও। বাবুর দোষ নাই, আমি একরার কবৃছি।

মণীন্দ্র যেরূপ কাপুরুষের মত দেখিতেছিল তাহাতে নিশ্চয়ই মিথ্যা কথা বলিয়া প্রাণ বাঁচাইবার চেষ্টা করিত। কিন্তু যুবতীটার আত্মবলিদানে তাহার মনুষ্যত্ব আসিল। সে বলিল—সাহেব পাখী মারতে গিয়ে আমি আমার জ্যেঠাকে জখম করেছি। স্ত্রীলোকটা নির্দ্দোষ।

সাহেব বলিল—বেশ।

এবার মণীন্দ্র কাঁদিল। বলিল—সাহেব আমায় ক্ষমা করুন। দৈবদুর্বিপাকে একটা কাজ হয়ে গেছে। আমি আর কিছু ভয় করিনি। দেশে কলঙ্ক হবে, জ্যেঠা মশায় জ্যেঠাই মা কি মনে করবেন। সাহেব আমায় ক্ষমা করুন।

সাহেব আমার দিকে চাহিলেন। মণীন্দ্র আমাকে বলিল—দারোগা বাবু

আপনার কাছে অপরাধ করেছি। আপনার পায়ে ধরে মাপ চাচ্ছি আমায় ক্ষমা করুন।

বাস্তবিক তাহার নামে কোন অভিযোগ হইতে পারে না। সে ভুল করিয়া রথহরি বাবুকে মারিয়াছিল এবং তাহার উপর কোনও প্রমাণ ছিল না। আমার অপমানের যথেষ্ট প্রতিশোধ হইয়াছিল। রথহরি বাবুও থানায় আসিয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার অনুরোধে সাত পাঁচ ভাবিয়া সাহেব মণীন্দ্রের উপর কোনও মোকদ্দমা চালাইলেন না।

ফুলুয়া নানকুর দলের সহিত যায় নাই। সে ঘটনার পর দ্বাদশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। শুনিয়াছি সে এখনও মণীন্দ্রের গন্ধর্ব্বপত্নীরূপে বাস করিতেছে। মণীন্দ্র পাণিগ্রহণ করে নাই। কাকাতুয়াটা মতি বিশ্বাসকে অর্পণ করিয়াছিলাম।

সরোজ।

[লেখক—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।]

শুনিয়াছি, ফারসী সাহিত্যে গোলাপের বড় আদর, ইংরাজী কবির দলও গোলাপফুল লইয়া অনেকটা মাতামাতি করিয়াছে। কিন্তু আমাদের পুরাণ ও সাহিত্যে পদ্মফুলের যেমন আদর এত আদর কোনও ফুল কোনও দেশে পায় নাই। বিষ্ণু স্বয়ং পদ্মনাভ, ব্রহ্মা কমলাসন, শ্রীরামচন্দ্র রাজীবলোচন, সরস্বতী শ্বেতপদ্মাসনা এবং লক্ষ্মী স্বয়ং কমলা। জয়দেবের শ্রীগোবিন্দ পঞ্চসরের ফুলধনুর পরাক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া মানময়ী শ্রীমতীর মনস্তুষ্টির জন্য বলিয়াছিলেন—

সপদি মদনানলো দহতি মম মানসম্
দেহি মুখ কমল মধুপানম।

ভারতবর্ষের সকল কবিই অরবিন্দের মাধুরী বর্ণনা করিয়াছেন। আমাদের প্রেমিক গায়ক নিধুবাবু উপমা দিয়া গাহিয়াছেন—

ভানু থাকে লক্ষান্তরে
মৃণালিনী জলেতে।

আমরা কিন্তু এ প্রবন্ধে সরোজফুল লইয়া কবির মত নাড়াচাড়া করিব না; বৈজ্ঞানিকের চক্ষে কমলের রূপমাধুরী নিরীক্ষণ করিব, মৃণাল লইয়া ব্যবচ্ছেদ করিব, পদ্মপত্রের বিশেষত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিব।

বাস্তবিক সরসী-বক্ষে বড় বড় পাতার মাঝখানে কমল ফুটিয়া আছে— এ দৃশ্য বড় মনোরম। সে শোভা দেখিয়া সৃষ্টিকর্ত্তাকে স্মরণ না করিয়া থাকা যায় না। কিন্তু সেই জলের মাঝে মৃণালের উপর পদ্মপত্র আর পদ্মফুল ফুটাইতে এত বড় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টাকে কত ছোট ছোট বিষয়ে সাবধান হইতে হইয়াছে তাহা ভাসিলে বাস্তবিকই রোমাঞ্চিত হইতে হয়। প্রকৃতির সর্ব্বত্রই একই নিয়ম। সে নিয়মে মোটামুটি দেখিতে পাই যে, গাছের গোড়া জলের মধ্যে থাকিলে পচিয়া যায়। পদ্মের গাছ অর্থাৎ মৃণাল জলের ভিতর থাকে। সলিলেই ইহার জন্ম, সলিলেই ইহার পরিপুষ্টি, ইহার বেশীর ভাগ কল-কব্জা জলেরই ভিতর। অথচ যে সকল উপাদানে সাধারণতঃ উদ্ভিদের দেহ গঠিত এ গাছেরও দেহ সেই সকল উপাদানে গঠিত। ইহার জন্য ভগবানকে আবার কতক বিশেষ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গড়িতে হইয়াছে, উদ্ভিদ দেহে কতকগুলা বিশেষত্বের সৃজন করিতে হইয়াছে।

প্রথমতঃ দেখি মৃণাল বা পদ্মের ডাঁটার সহিত আম গাছ বা খেজুর গাছের সঙ্গে একটা বিশেষ পার্থক্য আছে। পদ্মের ডাঁটা ফাঁপা—নলের মত; আর তার গায়ে বসন্ত রোগীর মত দাগ আছে। পুকুরের তলায় পাঁকের উপর জন্মিয়া পদ্মের ডাঁটা জলের উপরের দিকে বাড়িতে থাকে এবং পাঁকের মধ্যে অপর দিকে শিকড় গাড়িতে থাকে। গাছ যত উপরের দিকে বাড়িতে থাকে, তলার তত শুকাইয়া যায়। কিন্তু পাঁকের মধ্যে শিকড় গাড়িয়া রাখে, তাই জলের স্রোতে পদ্ম গাছ ভাসিয়া যায় না। যখন পুকুরে জল বাড়ে তখন পদ্মের দণ্ড সোজা হইয়া দাঁড়ায়—পাঁকে শিকড় বাঁধা মাথার উপর কবির নয়নরঞ্জন কুসুম আর দৃষ্টি-সুখকর পত্র। পুকুরের জল যেমন কমিতে থাকে মৃণালও বাঁকিতে থাকে। ঠিক জলের উপর ফুল ও পাতা ভাসাইয়া পঙ্কাশ্রয় করিয়া কর্ত্তব্য সাধন করে। স্থলজ পাদপের মত পদ্মের মৃণাল নিরেট ও শক্ত হইলে পদ্মপত্র ও কমলিনী ঠিক সরসী সলিলের উপর ভাসিতে পারিবে না বলিয়াই বিশ্বনিয়ন্তা মৃণালকে ফাঁপা আর নরম করিয়াছেন। মৃণাল যদি এই বেতসীবৃত্তি অবলম্বন করিয়া কমলিনীকে সরসীবক্ষে ভাসাইতে না পারিত, তাহা হইলে কমলিনী কবিপ্রিয়া কি না তাহা বলা সুকঠিন। আর অত বড় পাতা—জলের বুকে না

ভাসিতে পারিলেও তুরন্ত সমীরণ এবং ততোধিক নিষ্ঠুর মাধ্যাকর্ষণের ফলে ঝুলিয়া পড়িত; তাহার ফলে পদ্মগাছের কেন জীবন সংশয় হইত সে কথা পরে বলিব।

মৃণালের দেহ হইতে লম্বা লম্বা ডাঁটা বাহির হয়, তাহার উপর পদ্মপত্র জন্মে। যতক্ষণ এই পত্রের দণ্ড জলের মধ্যে থাকে ততক্ষণ পাতা খুলে না। পাতার তুই দিক গুটাইয়া মুড়িলে যেমন একটা কাঠির মত হয় ঠিক সেই রূপ একটা কাঠি ধীরে ধীরে বাড়িতে থাকে—তবে সর্ব্বদা উর্দ্ধ দৃষ্টি। সেই পাকানো পাতার নীচে মৃণালের গায়ে সরু সরু লোম বা শুঁয়া থাকে। তাই সামুক গুগলি বা মাছের দল তাহার দিকে ঘেঁসে না। একই ক্ষেত্রে খাদ্য-খাদককে বাড়াইতে সৃষ্টিকর্ত্তাকে এটুকু সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইয়াছে। সেই পাকানো পাতা শক্রর ভয়ে জলের ভিতর অত বিনয়ভরে জড়সড় হইয়া বাড়ে বটে, কিন্তু জলের উপরে উঠিয়াই একেবারে বিস্তৃত হইয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা করে। চকচকে তেলা আকারে জাঁকাল হইয়া সূর্য্যের দিকে চাহিয়া বসে হরিত দেহে সূর্য্যের কিরণ মাখিয়া হাসিমুখে সমস্ত দেহের পরিপুষ্টির ব্যবস্থা করে।

গাছের পাতার কাজ তুইটা। প্রথমতঃ ইহারা ছোট ছোট মুখ দিয়া শ্বাসপ্রশ্বাসের কার্য্য করে। গাছের সর্ব্ব অঙ্গে অক্সিজেন পৌছান আবশ্যক। সাদা চোখে গাছের পাতায় মুখ দেখিতে পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু অনুবীক্ষণের সাহায্যে পরীক্ষা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, পাতায় অসংখ্য ছোট ছোট ছিদ্র আছে। সেই ছিদ্রগুলা খুব সরু নলের মুখে অবস্থিত। সেই সকল ছিদ্রের দ্বারা গাছের প্রথমতঃ শ্বাসপ্রশ্বাসের কার্য্য হয়। স্থলজ পাদপের পাতার ছিদ্রগুলা নীচের দিকে অধিক। পাতার যে দিকটা বাহিরে থাকে, সে দিকে মুখ বা ছিদ্র কম। পদ্ম-পত্রের নীচের দিক সর্ব্বদা জলের উপর থাকে তাই পদ্মপত্রের সে দিকে কোনও ছিদ্র নাই। ইহার সকল ছিদ্র উপরের দিকে। এই ছিদ্র দিয়া বায়ু ঢুকিয়া পদ্মের মধ্যে অবস্থিত শিকড় অবধি অক্সিজেন দ্বারা অনুপ্রাণিত করিয়া আসে।

পদ্মপত্রের উপরের তেলা গায়ে অসংখ্য মুখ আছে এ কথা প্রমাণ করা খুব সহজ। বলিয়াছি মৃণাল ফাঁপা নলের মত। সুতরাং একটু ডাঁটা সহিত একখানা পত্র ছিঁড়িয়া তাহা উল্টাইয়া জলের উপর রাখিয়া মৃণালের ভিতর দিয়া, ফুঁ দিলে পাতার নীচে হাওয়ার দানা 'ভুড়ভুড়ি' কাটে। সুতরাং পদ্মপত্রের শ্বাসপ্রশ্বাসকার্য্য উপরের দিক দিয়াই হইয়া থাকে। তাহার সর্ব্বাঙ্গ জলের মধ্যে থাকে বলিয়া পদ্মপত্র আকারে বৃহৎ না হইলে চলে না। তাই পদ্মের পাতা অত বড়।

শ্বাসপ্রশ্বাসের কার্য্য ব্যতীত পাদপের ভোজন ব্যাপারও পাতার ঐ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্রগুলির দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে। জীবজন্তু সাবয়ব পদার্থ না খাইলে বাঁচে না। বায়ুর সঙ্গে যে সকল উপাদান আছে সেই গুলাতেই প্রাণিদেহের পুষ্টি হয়, শরীরের কোষ সৃষ্ট হয়। জীব জন্তু কিন্তু সেইগুলা উদ্ভিদের দেহ না খাইয়া সংগ্রহ করিতে পারে না। উদ্ভিদ কিন্তু এই সকল মুখের দ্বারা হাওয়া হইতে দ্ব্যম্লঙ্গারজান বা Carbonic acid gas নিজ দেহে প্রবিষ্ট করে এবং শিকড় দ্বারা শরীরে জল টানিয়া লয়। বৃক্ষ দেহের হরিত অংশটাকে Chlorophyll বলে। জলে হাইড্রজেন ও অক্সিজেন থাকে এবং কার্ব্বনিক এসিড গ্যাস বা দ্ব্যম্লঙ্গারযানে অঙ্গার জান ও অক্সিজেন থাকে। এই ক্লোরোফিলের একটা বড় শক্তি আছে। এই ক্লোরোফিলের উপর সূর্য্যকিরণ পড়িলেই ইহা এই গুপ্ত শক্তির দ্বারা জলকে ভাঙ্গিয়া তাহার হাইড্রজেন, এবং কার্ব্বনিক এসিড্ গ্যাসকে ব্যবচ্ছেদ করিয়া তাহার কার্ব্বন লইয়া হাইড্রজেন ও কার্ব্বনের একটা সংযোগ সাধন করে। এই সংযুক্ত রাসায়নিক পদার্থের নাম হাইড্রো-কারবন বা উদঙ্গার। এই উদঙ্গারই পাদপের দেহের উপাদান, আমাদের দেহেরও কতকটা উপকরণ। কিন্তু উদ্ভিদের মত জীব জন্তু উদ্ভিদ না খাইয়া নিজ দেহে তাহা নির্ম্মাণ করিতে পারে না। জন্তু ও উদ্ভিদ দেহের এই পার্থক্য।

অপর গাছের পাতার মত পদ্ম পাতাকেও উদঙ্গার সৃষ্টি করিতে হয় অর্থাৎ ঐ সকল মুখ দিয়া এক তো শ্বাসপ্রশ্বাসের কার্য্য করিতে হয় আবার বায়ু হইতে কার্ব্বনিক এসিড লইয়া ক্লোরোফিলের কারখানায় ফেলিতে হয়। তাই ভগবান বিশেষ করিয়া বিধান করিয়াছেন যাহাতে পদ্মের পাতা পরিষ্কার থাকে, তাহার উপর জল পড়িয়া মুখ গুলা বন্ধ হইয়া না যায়। সেই জন্য দেখিতে পাই যে পদ্মপত্রের মাঝখানটা অর্থাৎ যেখানে ডাঁটা শেষ হইয়াছে সেই স্থলটা অপেক্ষাকৃত উঁচু এবং চারিদিক ঢালু। তাই জল পড়িলে পাতার উপর জমিতে পারে না। চারিদিক দিয়া গড়াইয়া পড়ে। পূর্ব্বে বলিয়াছি পাতাগুলা তেলা—যেন মম্-মাখানো। তাই পদ্মপত্রের উপর জলের বড় দুর্দ্দশা। তাহা দেখিয়াই কবিরা অনেক জিনিষ 'পদ্মপত্রমিবাম্ভস'র সহিত তুলনা করিয়াছেন। সাধক শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন—

নলিনীদলগত জলমতি তরলম্
তদ্বদ্ জীবনমতিশয় চপলম্।

বলিয়াছি পদ্মপত্র বিস্তৃত হইয়া না থাকিলে, ইহার ছোট ছোট মুখবিবর

বা নাসা বিবরগুলি না খোলা থাকিলে পদ্মপাদপের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল অসম্ভব। তাই ভগবান পত্রকে ভাসমান রাখিবারও ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহার শরীরের মধ্যে অনেক হাওয়ার ঘর আছে। তাই পদ্মের পাতা সলিল অপেক্ষা লঘু। লঘু পদার্থমাত্রই জলে ভাসে। তাই পদ্মপত্র জলে ভাসে। বড় বড় পাতা-গুলি নিজের ভারে জলমগ্ন হয় বলিয়া পাতার ছিদ্র দিয়া মৃণালের নলের ভিতর দিয়া অম্লজান গিয়া পাঁকের মধ্যে মৃণাল শিকড়কে অনুপ্রাণিত করিয়া আসিতে পারে। বলা বাহুল্য পঙ্কের মধ্যে অম্লজানের বিশেষ অভাব।

পদ্মপত্রের উপরের বর্ণ সবুজ; কিন্তু তলার রং গভীর বেগুনি বর্ণ। এরূপ পার্থক্যেরও একটা কারণ আছে। যে জিনিসের যত কালো রং সেই পদার্থ তত বেশী উষ্ণতা আকর্ষণ করিতে পারে। পদ্মপাতা উপরে সূর্য্যকিরণ ধরিয়া ক্লোরোফিলের দ্বারা উদঙ্গার সৃষ্টি করিয়া দেয় এবং উহার তলদেশের বর্ণের গভীরতা বশতঃ উষ্ণতা সংরক্ষণ করিতে পারে। উষ্ণতাটাকে ধরিয়া না রাখিলে দেহের পরিপুষ্টি হয় না; পদ্মপত্রের রং ফলানোটা ভগবানের একটা খেয়াল নয়—বর্ণে তাঁহার হিতবাসনা প্রতিফলিত।

পদ্মকোরক চারটি বেশ শক্ত সবুজ দলে আবৃত। এই কঠিন দলে আবদ্ধ হইয়া পাকানো পাতার মত পুকুরের মধ্যে অন্ধকারে উর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া পঙ্কজিনী উপরের দিকে অগ্রসর হয়। এই দলগুলা শক্ত বলিয়া জলচরেরা সরোজমুকুলকে উদরসাৎ করিতে পারে না। উপরে উঠিয়া পদ্ম বিকসিত হয়। কবিদের বিকট কমল—অতুলনীয় গৌরব—প্রাণারাম সৌন্দর্য্য।

বিকসিত হইলে বহিঃদল (Sepal) চারিটার ভিতরের বর্ণ অপরাপর দল (Petal) গুলির বর্ণের অনুরূপ। অরবিন্দ ভাসমান থাকিবে বলিয়া প্রত্যেক দলটি নৌকার মত। এক একটা দল ছিঁড়িয়া যাইলে মোচার খোলার মত ভাসে। পদ্মফুলের অনেক দল। বাহিরের গুলা বড়, তাহার পরের থাকের দলগুলা ছোট, তাহার ভিতরের থাক আরও ছোট। ক্রমশঃ ছোট হইয়া থাকের উপর থাক দেখা যায় বলিয়া সরোজ বা গোলাপের এত শোভা।

ভানুর সহিত সরোজিনীর একটা বহুকালের সম্পর্ক আছে। অরুণ কিরণে পদ্ম বিকসিত হয় আবার ভগবান মরীচিমালী অস্তাচলে গমন করিলে নলিনীদল মুদিত হয়। ইহা দেখিয়া কবির দল সূর্য্যদেবকে নলিনীকান্ত, সরোজনাথ প্রভৃতি কতকগুলা নাম দিয়াছেন এবং রবি ও মৃণালিনীর প্রণয় কল্পনা করিয়া ঠারে ঠোরে এবং প্রকাশ্যভাবে সে কথার উল্লেখ করিয়া নানারকম শ্রুতিমধুর

শ্লোক রচনা করিয়াছেন। বেরসিক বৈজ্ঞানিকের দল কিন্তু ভানুর উদয়ে কমলের বিকাশ এবং সূর্য্যাস্তে কমলের সঙ্কোচন সম্বন্ধে অন্য কথা বলিয়া থাকে। তাহারা অত প্রেম পিরীতি বুঝে না। তাহারা বলে পদ্মফুলের বীজ জন্মায় অলির অনুগ্রহে। ফুলের মাঝখানে রেণু আছে, পরাগ থাকে, সেই লোভে মত্ত অলি আসিয়া জুটে। পুকুরের ধারের রজনীর হাওয়া স্যাঁৎসেঁতে। এ অবস্থায় পদ্ম বিকসিত থাকিলে পরাগগুলা নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। তাহা হইলে আর অলিকুল আকুল হইয়া সরোজের বুকে বসিবে না। অঙ্কুর-অভাবে তাহার বংশ লোপ হইবে। প্রেম-প্রণয়ের কথা কবিকল্পনা।

উদ্ভিদবিৎ পণ্ডিতেরা আমাদের ফুল্লারবিন্দের একটা অতি শ্রুতিকঠোর আখ্যা দিয়াছে—Nelumbium Speciosum; তাঁহারা আরও একটা বেয়াদবী দোষে দুষ্ট। তাঁহারা বলেন আমাদের দেশের আতা (Anoma Squamosa) নাকি পদ্মের জ্ঞাতি ভ্রাতা! অবশ্য লালপদ্ম, শ্বেতপদ্ম, নীলপদ্ম প্রভৃতি পদ্মফুলের এক একটি বংশধর। তবে শালুক প্রভৃতিও এই বংশের "ছোট তরফে"র প্রতিনিধি।

বাঁশী।

কোন্ দিন কোন্ যুগে কালা যে বাজাতো বাঁশী
আজো তা শুনিতে চাই, আজো কালা ভালবাসি
কোন্ দূর বৃন্দাবনে কখন্ উঠেছে তান!
এখনো যে মূর্চ্ছনায় ভরিয়া উঠিছে প্রাণ!
যখনি কদম্বশাখে শিহরিয়া ওঠে ফুল,
উছলে যমুনা বালা পাশরিয়া দুই কূল
অমনি কি স্মৃতি জাগে, ভেসে যায় দুনয়ান,
বারেক হেরিতে কালা—হেরিতে প্রাণের প্রাণ।
সেই ত যমুনাবারি, সেই ত এ বৃন্দাবন,
সেইত কদম্বশাখা শিখীর সে আলাপন,
আকুলিত হৃদি মোর কালারে না নিরখিয়া
কোথা কালা, কোথা কৃষ্ণ, পূর্ণ কর শূন্য হিয়া।

শ্রীঅবনীকুমার দে।

মৃত্যু-সাধ।

কাজ নাই, স্তব্ধ হও, ক্ষান্ত হও প্রাণ,
জীবনেরে জড়া'ও না শত পাকে আর;
আজিকে মালতীমালা গলে শোভমান,
কাল শুষ্ক পুষ্পগুচ্ছ ছিন্ন মল্লিকার।
যৌবনের তটপ্লাবী স্রোত উচ্ছ্বসিত;
উদ্দাম চঞ্চল মত্ত খর বহমান;
বুকে শত সাধ আশা সদা তরঙ্গিত,
জরা গ্রীষ্মে, শীর্ণ শুষ্ক সব অবসান।
মিলনের মধু নিশা নিমেষে ফুরায়,
প্রণয়ের পুষ্পশয্যা স্বরগ-স্বপন:
মরমের গ্রন্থি ছিঁড়ে সবি চলে যায়,
প্রীতিপুষ্প জীবনের ছিঁড়িছে মরণ।
তার চেয়ে মরে হই মৃত্যু সর্ব্বগ্রাসী,
সকলে আসিবে বুকে যারে ভালবাসি।

শ্রীবলাই দেবশর্ম্মা।

সাহিত্য-সমাচার।

অভাগী।—শ্রীজলধর সেন প্রণীত। শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে প্রাপ্তব্য। প্রকাশক 'নিবেদনে' বলিয়াছেন,—"য়ুরোপ প্রভৃতি মহাদেশে ছয়-পেনি সংস্করণ—সাত-পেনি সংস্করণ—সিলিং-সংস্করণ প্রভৃতি নানাবিধ সুলভ অথচ সুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত হয়। কিন্তু সে সকল পূর্ব্ব প্রকাশিত অপেক্ষাকৃত অধিক মূল্যের পুস্তকাবলীরই অন্যতম সংস্করণ মাত্র। বাঙ্গালাদেশের লব্ধপ্রতিষ্ঠ গ্রন্থকারবর্গ-রচিত সুখপাঠ্য, অথচ অপূর্ব্ব প্রকাশিত পুস্তকগুলি কি এরূপ সুলভ মূল্যে দেওয়া যায় না? অধুনা দেখিয়া শুনিয়া আমার বিশ্বাস হইয়াছে, যে, যদি কাটতি অধিক হয় এবং মূল্যবান সংস্করণের মতই সুচারুরূপে মুদ্রিত হয়। কারণ, একথা সর্ব্ববাদিসম্মত যে, বাঙ্গালাদেশে পাঠক-সংখ্যা বাড়িয়াছে। এ অবস্থায় "আট আনার গ্রন্থমালা" কেন চলিবে না? সেই দৃঢ় বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই আমরা এই অভিনব চেষ্টা'য় প্রবৃত্ত হইলাম।"—গুরুদাস বাবু যে 'অভিনব চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা এই 'অভাগী' উপন্যাসখানি দেখিয়াই বুঝিয়াছি। বাঙ্গালাদেশে এ উদ্যম এই প্রথম। এমন চমৎকার বাঁধাই, এমন সুন্দর ছাপা ও কাগজের ৩১১ পৃষ্ঠার বহি যে, আট আনা মূল্যে দেওয়া যাইতে পারে, তাহা আমাদের ধারণা ছিল না। গুরুদাস বাবুর চেষ্টা সফল হউক, ইহাই আমাদের কামনা।

আর পুস্তকের লেখা সম্বন্ধে নূতন করিয়া কি বলিব? জলধর বাবুর লেখার সহিত বাঙ্গালী পাঠকের অনেক দিন হইতেই পরিচয় আছে। পরিচিতের নূতন করিয়া পরিচয় দিবার দরকার করে না। শুধু এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, আট আনা খরচ করিয়া এ বহিখানি কিনিলে পাঠকবর্গ ঠকিবেন না।

প্রণয়-প্রলাপ—শ্রীবিজ্ঞানচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। এই পুস্তকখানি বিলাতী কবিম্যাকে লিখিত "Love letter's of a violinist" নামক পুস্তকের বাঙ্গালা কবিতায় অনুবাদ। অনুবাদক নিজেই বলিয়াছেন—বিদেশী ভাব স্বদেশী ভাষায় প্রকাশ করা, বিশেষতঃ এক ভাষার পদ্য, ঠিক ভাব ও সুর বজায় রাখিয়া, অন্য ভাষায় পদ্যে অবিকল অনুবাদ করা বড়ই কঠিন। কথাটা সত্য এবং লেখকের পদ্যানুবাদ পড়িবার সময় এ কথাটা স্মরণ করিয়া রাখিলে প্রতিপদে গ্রন্থকারের সহিত আমাদের কলহ করিতে হইবে না। কবিতাগুলি বড় গভীর প্রেমের—প্রত্যেকটির ভাব মধুর। বিজ্ঞানবাবু প্রত্যেক কবিতার পর টিপ্পনি দিয়াছেন তাহাতে যে সকল বিলাতী আচার-ব্যবহারের কাব্য মধ্যে উল্লেখ হইয়াছে, তাহার ব্যাখ্যা আছে।

বিজ্ঞান বাবুর কবিত্বশক্তি আছে। তাহার অপর গ্রন্থ দেখিবার জন্য আমরা ব্যগ্র রহিলাম। পুস্তকখানির কাগজ বাঁধাই ও মুদ্রাঙ্কন উচ্চদরের, দাম মাত্র ১॥•।

Printed by Upendra N. Roy, at the Carmichael Press,
179, Manicktola Street, Calcutta & Published by Krishnadas
Dhar, Archana Karjalaya 18, Parbutty Ch. Ghose St.

সাহিত্য-প্রসঙ্গ।

[লেখক—শ্রীঅমূল্যচরণ সেন।]

"নব্যভারতে"র গত পৌষ ও ফাল্গুন সংখ্যায় "বঙ্গবাসী"র প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু-লিখিত কতকগুলি পত্র ধারাবাহিকরূপে বাহির হইয়াছে। বাহির করিয়াছেন,—প্রবীণ সাহিত্যিক 'মানব-প্রকৃতি'-প্রণেতা শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ-চন্দ্র রায়-চৌধুরী, এম-এ। চিঠিগুলি যোগেন্দ্রচন্দ্র ক্ষীরোদবাবুকে লিখিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ যোগেন্দ্রচন্দ্রের মৃত্যুর পরে সুবিধামত এক সময়ে চিঠিগুলি বাহির করিবেন, এইরূপ সংকল্প ক্ষীরোদবাবুর ছিল; সেই জন্যই তিনি যোগেন্দ্রচন্দ্রের চিঠিগুলি এখন প্রকাশিত করিয়াছেন। অথবা 'বঙ্গবাসী'র ইতিহাস ও যোগেন্দ্র-জীবনের একাংশ সাধারণের সম্মুখে উপস্থাপিত করাও এ সকল পত্র-প্রকাশের অন্যতম উদ্দেশ্য হইতে পারে। 'বঙ্গবাসী'র প্রথম জীবনে ক্ষীরোদচন্দ্রই যে যোগেন্দ্রচন্দ্রের প্রধান মুরুব্বি ছিলেন,—ইহার পরিচয় পত্রগুলিতে পাওয়া যায়। সুতরাং এই পত্রগুলি প্রকাশিত না হইলে ক্ষীরোদবাবুর মুরুব্বিয়ানার পরিচয়ও আমাদের পাইবার সুযোগ ঘটিত না। 'বঙ্গবাসী'র ইতিহাস যদি এ যুগের বাঙ্গালা সংবাদপত্রের ইতিহাস হয়, তাহা হইলে যোগেন্দ্রচন্দ্রের এ পত্রগুলির মূল্য আছে, কারণ এইগুলিতে 'বঙ্গবাসী'র শৈশব জীবন-সংগ্রামের বিবরণ অনেক আছে। এই জীবন-সংগ্রামে ক্ষীরোদবাবুও যে হাতিয়ার ধরিয়াছিলেন, এ সংবাদে অনেকে বিস্মিত হইতে পারেন বটে; কারণ, 'বঙ্গবাসী' হিন্দুর মুখপত্র বলিয়া ঘোষণা করে এবং ক্ষীরোদবাবু ব্রাহ্ম। হিন্দু-মুখপত্রের শৈশবে কেবল ব্রাহ্ম ক্ষীরোদবাবুই তাহার সেবা-যত্ন করেন, তাহা নহে; ব্রাহ্ম দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীও তাহার পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন। সুতরাং "বঙ্গবাসী"র প্রথম জীবনে উহা যে হিন্দুয়ানীর মুরুব্বি হইয়া উঠে নাই, এবং উহা যে জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে বাঙ্গালীরই কাগজ ছিল, ইহা একরূপ বুঝিতে পারা যায়। আরও একটী জ্ঞাতব্য বিষয় এই যে, এ যুগের বাঙ্গালা সংবাদপত্র-পরিচালনায় হিন্দুর কাগজে ব্রাহ্মেরা হাতেখড়ি দিয়াছিল এবং সেই শিক্ষার ফলেই দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী "বঙ্গবাসী ছাড়িয়া অন্যান্য বন্ধুর সাহায্যে 'সঞ্জীবনী' বাহির" করিয়াছিলেন।

ক্ষীরোদবাবু যোগেন্দ্রবাবুর যে সকল চিঠিপত্র বাহির করিয়াছেন, সেই সকল চিঠির উত্তর যোগেন্দ্রচন্দ্রের উত্তরাধিকারীদিগের নিকট কি নাই? যদি থাকে,

তবে সেগুলি প্রকাশিত করিয়া দিলে মন্দ হয় না। সে সকল চিঠি বাহির হইলে সাধারণে ক্ষীরোদবাবুর কথার মূল্য অনেকটা যাচাই করিয়া লইতে পারে এবং সেই উপলক্ষে অন্যান্য যাঁহাদিগের নিকটে যোগেন্দ্রচন্দ্রের পত্রাদি আছে, সেই-গুলিও বাহির হইয়া যাইতে পারে।

সহযোগী "বাঙ্গালী" লিখিয়াছেন,—

"কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের পৈতৃক ভিটাটুকু এতকাল পরে কুম্ভকারের হস্তগত হইল। বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা গৌরবের বিষয় নহে।

গুপ্ত কবি বাঙ্গালীর নিতান্ত আপনার জন। তিনি খাঁটী বাঙ্গালী কবি। তিনি গত যুগের ভাবের স্বরূপ তাঁহার রচনার ফটোগ্রাফে ধরিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালায় গুপ্ত কবির সাধনার ক্ষেত্রে নব যুগে নূতন ভাবের আবির্ভাব হইয়াছে। তিনি নব্য বাঙ্গালার সাহিত্যগুরু অমর বঙ্কিমচন্দ্রের—রসরাজ করুণাসিন্ধু দীনবন্ধুর গুরু, সুতরাং বাঙ্গালীর গুরুর গুরু।

সে যুগে ঈশ্বর গুপ্ত বাঙ্গালীর দেশাত্মবোধকে কবিতায় যে অভিব্যক্তি দিয়াছিলেন, তাহারই ফলে বাঙ্গালার সুপ্রভাতে নব-জীবনের নূতন স্পন্দন সম্ভব হইয়াছে।

তাঁহার—"মাতৃসম মাতৃভাষা" ও চিরস্মরণীয় অনুশাসন,—

"ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে দেখ দেশবাসিগণে
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া।
কত রূপ স্নেহ করি দেশের কুকুর ধরি'—
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।"

কি ভুলিবার? বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীকে এই কয় ছত্র মুখস্থ করিতে বলিয়া গিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন,—

"আজিকার দিনের অভিনব এবং উন্নতির পথে সমারূঢ় সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট বাঙ্গালা সাহিত্য দেখিয়া অনেক সময়ে বোধ হয়,—হোক সুন্দর, কিন্তু এ বুঝি পরের আমাদের নহে। খাঁটী বাঙ্গালা কথায়, খাঁটী বাঙ্গালীর মনের ভাব খুঁজিয়া পাই না। তাই ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা-সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এখানে সব খাঁটী বাঙ্গালা। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ, শিক্ষিত বাঙ্গালীর কবি—ঈশ্বর গুপ্ত বাঙ্গালার কবি। এখন আর খাঁটী বাঙ্গালী কবি জন্মে না—

জন্মিবার যো নাই—জন্মিয়া কাজ নাই। বাঙ্গালার অবস্থা আবার ফিরিয়া অবনতির পথে না গেলে খাঁটী বাঙ্গালী কবি আর জন্মিতে পারে না। আমরা "বৃত্র-সংহার" পরিত্যাগ করিয়া "পৌষ-পার্ব্বণ" চাই না। কিন্তু তবু বাঙ্গালীর মনে পৌষ-পার্ব্বণে একটী সুখ আছে—বৃত্রসংহারে তাহা নাই। পিঠাপুলিতে যে একটা সুখ আছে, শচীর বিম্বাধর-প্রতিবিম্বিত সুধায় তাহা নাই। সে জিনিষটা একেবারে আমাদের ছাড়িলে চলিবে না; দেশশুদ্ধ জোনস্, গেমিসের তৃতীয় সংস্করণে পরিণত হইলে চলিবে না। বাঙ্গালীনাম রাখিতে হইবে। জননী জন্মভূমিকে ভালবাসিতে হইবে। যাহা মার প্রসাদ, তাহা যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখিতে হইবে। এই দেশী জিনিষগুলি মার প্রসাদ। এই খাঁটী বাঙ্গালাটী, এই খাঁটী দেশী কথাগুলি মার প্রসাদ। মার প্রসাদে পেট না ভরে, বিলাতী বাজার হইতে কিনিয়া খাইতে পারি, কিন্তু মার প্রসাদ ছাড়িব না। এই কবিতাগুলি মার প্রসাদ।"

ঈশ্বর গুপ্তের "প্রভাকর" আজ অস্তমিত, কিন্তু সে সূর্য্যের দীপ্তি, তেজ বাঙ্গালীর সমাজে যে জীবনীশক্তি ঢালিয়া দিয়াছিল, জাতীয় জীবনে তাহার প্রভাব এখনও সুস্পষ্ট।

ঈশ্বর গুপ্ত এক হিসাবে যুগান্তের কবি, অন্য হিসাবে যুগ-প্রবর্ত্তক। ঈশ্বর গুপ্ত বাঙ্গালীর জীবনের প্রত্যক্ষ বিষয়ে জাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালী তাঁহার নিকট ঋণী। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন,—

"মহাত্মা রামমোহন রায়ের কথা ছাড়িয়া দিয়া রামগোপাল ঘোষ ও হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে বাঙ্গালা দেশে দেশবাৎসল্যের প্রধান নেতা বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর গুপ্তের দেশবাৎসল্য তাঁহাদিগেরও কিঞ্চিৎ পূর্ব্বগামী। ঈশ্বর গুপ্তের দেশ-বাৎসল্য তাঁহাদের মত ফলপ্রদ না হইয়াও তাঁহাদের অপেক্ষাও তীব্র ও বিশুদ্ধ। * * * * তখনকার লোকের কথা দূরে থাক, এখনকার কয় জন লোক ইহা বুঝে? এখনকার কয় জন লোক এখানে ঈশ্বর গুপ্তের সমকক্ষ? ঈশ্বর গুপ্তের কথায় যা, কাজেও তাই ছিল। তিনি বিদেশের ঠাকুরদিগের প্রতি ফিরিয়াও চাহিতেন না, দেশের কুকুর লইয়াও আদর করিতেন।"

তাঁহার ভিটাটুকু তাঁহার বংশধরগণের হস্তচ্যুত হইল, দুঃখের বিষয় নয়?— কিন্তু ঈশ্বর গুপ্ত কি কেবল গুপ্ত-পরিবারের কুলপাবন?

আবার বলি, তিনি বাঙ্গালীর অন্তরঙ্গ—স্বজন। তাঁহার ভিটাটুকু বাঙ্গালী কিনিয়া ভবিষ্যদ্বংশের তীর্থ করিয়া রাখুন।

শুনিলাম, দুই তিন শত টাকায় খাঁটী বাঙ্গালী কবি ঈশ্বরচন্দ্রের ভিটা বিক্রীত হইয়াছে। সাহিত্য-পরিষৎ ও সাহিত্য-সভা প্রভৃতি চেষ্টা করিলে ঈশ্বর গুপ্তের ভিটাটুকু কি উদ্ধার করা যায় না ? গুপ্ত কবি "চাঁদিনী যামিনী"কে চিনিতেন না ; 'শুধু সৌরভ' লইয়া কারবার করিতেন না ; ইংরেজীতে লিখিতেন না ; শুধু এই অপরাধে তিনি কি সারস্বত বাঙ্গালার—সাহিত্য-পারিষদগণের পূজা পাইবেন না ?"

* *
*

প্রায় দুই মাস হইল, কেশব-সহচর চিরঞ্জীব শর্ম্মা পরলোক গমন করিয়াছেন।* কিন্তু বাঙ্গালার সাহিত্যে চিরঞ্জীব 'চিরঞ্জীব'ই হইয়া রহিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে 'নববিধান' সমাজের ক্ষতি ত হইয়াছেই, সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা সাহিত্যেরও অল্প ক্ষতি হয় নাই। চিরঞ্জীব শর্ম্মার প্রকৃত নাম—ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল।

তিনি এক সময়ে এই কলিকাতা সহরে কীর্ত্তনের ঢেউ তুলিয়াছিলেন। সঙ্গীত-রচনায় তাঁহার যেমন শক্তি ছিল ; গানও তেমনই সুন্দর গায়িতে পারিতেন। তাঁহাকে সকলে "নববিধানের কোকিল" বলিতেন। তিনি কেশবচন্দ্রের নিত্যসহচর ছিলেন—যেখানে কেশবের বক্তৃতা, সেইখানেই চিরঞ্জীবের গান ; যেন সোণায় সোহাগা।

চিরঞ্জীবের 'ভক্তি-চৈতন্যচন্দ্রিকা'য় শ্রীচৈতন্য দেবের জীবনলীলার পরিচয় আছে। সম্ভবতঃ আধুনিক গদ্যে ইহাই সর্ব্বপ্রথম শ্রীচৈতন্য দেবের জীবনচরিত। স্বর্গীয় শিশিরকুমারের 'অমিয় নিমাইচরিত' ইহার পরে প্রকাশিত হইয়াছে।

জীবন-চরিত-রচনায় তাঁহার ক্ষমতা ছিল। 'কেশবচরিত', 'সাধু অঘোরনাথ', 'ঈশা চরিত' প্রভৃতি তাঁহার নিদর্শন। চিরঞ্জীব 'নববৃন্দাবন' প্রভৃতি কয়েকখানি নাটক রচনা করিয়া গিয়াছেন। 'নববিধান' সমাজে 'নববৃন্দাবনে'র অভিনয় হইত। উহাতে কেশব, প্রতাপ ও বিবেকানন্দ ভূমিকা গ্রহণ করিতেন।

চিরঞ্জীবের কথা মনে পড়িলেই সঙ্গে সঙ্গে বিজয়কৃষ্ণ, অঘোরনাথ, প্রতাপচন্দ্র, গৌরগোবিন্দ, গিরিশচন্দ্র, রামচন্দ্র প্রভৃতির কথাও মনে পড়ে। ইঁহাদের কীর্ত্তন শুনিলে অতি বড় পাষাণও যেন গলিয়া যাইত। একবার নদীর ওপারে এই দলের কীর্ত্তন শুনিয়া ভগবান রামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, ইহারা কেশব সেনের দল, নহিলে এমন উৎসাহে কেহ কীর্ত্তন করিতে পারে না।

---

* জন্ম ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ; মৃত্যু ৩রা ফেব্রুয়ারী, ১৯১৬।

সে দলের ঐহিক বন্ধনের শেষ গ্রন্থি—ত্রৈলোক্যনাথ অন্তর্হিত হইয়া কোন্ নববৃন্দাবন মধুর কণ্ঠে মুখরিত করিতেছেন, কে বলিবে!

'সাহিত্য-পরিষদে'র অক্লান্তকর্ম্মা সেবক, বঙ্গসাহিত্যের একনিষ্ঠ উপাসক ব্যোমকেশ মুস্তফী আর নাই! গত চৈত্র মাসে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।* ব্যোমকেশ স্বর্গীয় নটরাজ অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফীর জ্যেষ্ঠ পুত্র। ব্যোমকেশ অন্যান্য সাহিত্যসেবকগণের মত সাময়িক পত্রাদিতে লিখিতেন; সাহিত্যের সেবা করিয়া আনন্দ লাভ করিতেন। সাহিত্য-সেবায় তাঁহার নিষ্ঠা ছিল। কিন্তু ব্যোমকেশ 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে'র উন্নতি ও স্থায়িত্বকল্পে যে প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি সকলের দৃষ্টি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে-পারিয়াছিলেন; ইহাই তাঁহার বিশেষত্ব। এমন ঐকান্তিক ভাবে ও একলক্ষ্য হইয়া, স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া, সমষ্টির কল্যাণের জন্য যিনি পরিশ্রম করিতে পারেন, তাঁহার প্রশংসা শতমুখেই করিতে হয়। 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' বাঙ্গালীর জাতীয় কীর্ত্তি; এ কীর্ত্তি বজায় রাখিবার জন্য ব্যোমকেশ প্রাণপণ করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি জাতির কল্যাণ-সাধনেই আত্মনিয়োগ করিয়া-ছিলেন। এই কল্যাণের দিকে লক্ষ্য ছিল বলিয়াই তিনি ব্যক্তিত্ব একরূপ ভুলিতে পারিয়াছিলেন। ফলে, সকল সাহিত্য-সেবকের যে পরিণতি হয়, ব্যোমকেশেরও তাহাই হইয়াছিল; তিনি দারিদ্র্যের কশাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া-ছিলেন।

ব্যোমকেশ বহু পরিবারের অভিভাবক ও প্রতিপালক ছিলেন। যাঁহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া তিনি জাতির কল্যাণে অবহিত হইয়াছিলেন, আজ তাঁহা-দিগের প্রতি সমগ্র দেশবাসীর অবহিত হইবার সময় আসিয়াছে। ব্যোম-কেশের পরিজন অন্নাভাবে কষ্ট পাইলে, অর্থাভাবে পীড়িত হইলে তাঁহাদের দীর্ঘ-নিঃশ্বাস বাঙ্গালীর জাতীয় কীর্ত্তি—'সাহিত্য-পরিষদে'র কল্যাণ-প্রসূ হইবে না। যে 'সাহিত্য-পরিষদে'র প্রত্যেক ইষ্টকখণ্ডের সহিত তাঁহার দেহের রক্ত-বিন্দু মিশ্রিত রহিয়াছে, সেই পরিষদের কর্ত্তৃপক্ষ ও সদস্যগণ তাঁহার পরিবার-পালনের ভার গ্রহণ করুন।

* মৃত্যু, ১৯শে চৈত্র, ১৩২২ সাল; শনিবার।

মহাকবি কৃত্তিবাসের স্মৃতি-রক্ষায় বাঙ্গালী অগ্রসর হইয়াছে, ইহাতে আমরা আনন্দিত হইয়াছি। কারণ, আমাদের বিশ্বাস, পরলোকগত মহাপুরুষদিগের স্মৃতি-রক্ষা করিলে জাতির গৌরব ও মর্য্যাদাবোধ বর্দ্ধিত হয়। কৃত্তিবাস বাঙ্গালার কবি, বাঙ্গালীর কবি। তিনি বাল্মীকির চিরমধুর মহাকাব্যকে সুললিত বাঙ্গালা ছন্দে অনুবাদিত করিয়া বাঙ্গালীমাত্রকেই অশেষ কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। কৃত্তিবাস নদীয়া জেলার ফুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই গ্রামে তাঁহার বাস্তুভিটা ছিল। সেই বাস্তুভিটা যেখানে অবস্থিত ছিল, সেইখানে কৃত্তিবাসের স্মৃতিস্তম্ভ বা স্মারক-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইবে। সাহিত্য-তীর্থযাত্রী এখানে আসিয়া কৃত্তিবাসকে স্মরণ করিবে; আর সঙ্গে সঙ্গে অতীত গৌরবে তাঁহার বক্ষঃস্থল স্ফীত হইয়া উঠিবে।

কৃত্তিবাস যখন রামায়ণের অনুবাদ করিয়াছিলেন, তখন এদেশে মুদ্রাযন্ত্রের অস্তিত্ব ছিল না; সুতরাং কৃত্তিবাস যে পুঁথি স্বহস্তে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, সেই পুঁথি হইতেই উৎসাহী রামায়ণ-পাঠার্থীরা নকল করিয়া লইত। এই প্রকারে এবং কথকদিগের মুখে মুখে দেশে কৃত্তিবাসের অনুবাদ প্রচারিত হইয়াছিল; কিন্তু বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে তাহার প্রচার হয় নাই। "যিনি কৃত্তিবাসের রামায়ণ মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে প্রথম মুদ্রিত করিয়া দেশবাসীর গৃহে গৃহে রাখিবার ব্যবস্থা করেন, কৃত্তিবাসের স্মৃতি-পূজার সময়ে তাঁহার কথাও আমাদের মনে পড়িতেছে। তিনি না হইলে কৃত্তিবাসকে এ যুগের বাঙ্গালী হয় ত চিনিতে পারিত না। তাঁহাব নাম স্বর্গীয় জয়গোপাল তর্কালঙ্কার। পণ্ডিত জয়গোপাল কাশীরাম দাসের মহাভারত ও কৃত্তিবাসের রামায়ণ মুদ্রিত করিয়া ইঁহাদের কীর্ত্তি চিরস্থায়িনী করেন। তিনি এরূপ যত্ন, পরিশ্রম ও ব্যয়াদি করিয়া ঐ লুপ্তপ্রায় রত্ন উদ্ধার করিয়াছিলেন বলিয়াই আজ বঙ্গের ঘরে ঘরে রামায়ণ মহাভারত বিদ্যমান।" ১৮৩০ ও ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে মহাভারত ও রামায়ণ মুদ্রিত হইয়াছিল।

তাই বলিতেছি, কৃত্তিবাসের স্মৃতিরক্ষার উদ্যোগ ও আয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিত জয়গোপালের স্মৃতি-পূজার ব্যবস্থা করিলে মন্দ হইত না।†

* *
*

† যাহারা জয়গোপাল সম্বন্ধে অধিক কথা জানিতে চান, তাঁহারা গত মাঘ মাসের "বিজয়া" পত্রিকা পাঠ করুন

গত ফাল্গুনের "মানসী"তে চিত্র-বিভ্রাট ঘটিয়াছে। "তীর্থ ভ্রমণ—জয়পুর"-শীর্ষক প্রবন্ধে "৺সংসারচন্দ্র সেন"-পরিচয়ে যাঁহার প্রতিকৃতি মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা সংসারচন্দ্রের নহে। যুগল-সম্পাদক—মহারাজা এবং ব্যারিষ্টার অবশ্য সর্ব্বজ্ঞ নহেন। এ বিষয়ে সম্পাদক অপেক্ষা লেখকেরই দায়িত্ব অধিক। যিনি জয়পুরের বিবরণ লিখিতেছেন, তিনি সংসারচন্দ্রের ও কান্তিচন্দ্রের চিত্রের স্বাতন্ত্র্য যদি না বুঝিতে পারেন, বা না বুঝিয়া থাকেন, তাহা হইলে জয়পুরের বৃত্তান্ত—বিশেষতঃ সচিত্র বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিতে যাওয়াই তাঁহার উচিত হয় নাই।

চৈত্র মাসের 'ভারতী'তে 'শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী' 'সেকেলে কথা' লিখিয়াছেন। উহার উপসংহারে তিনি বলিয়াছেন,—"যদি স্বামী মেজদাদার সহায়তা না করিতেন তাহা হইলে এত শীঘ্র স্ত্রীজাতির এতদুর উন্নতি হইত কি না সন্দেহ। অন্ততঃ তিনি যে অনেক পরিমাণে এ উন্নতি অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই।"—এখানে স্ত্রীজাতি বলিলে বুঝিব কি?—জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের স্ত্রীজাতি—না সমগ্র বঙ্গের নারীসমাজ? লেখিকা সেটুকু স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই বলিয়াই দু'কথা বলিতে হইল। লেখিকা যাঁহাদিগকে স্ত্রীজাতি বলিয়াছেন এবং যাঁহাদের "এতদূর" উন্নতি দেখিয়া তিনি সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহারা কখনই সমগ্র বঙ্গের নারীসমাজ নহেন। যে শিক্ষা লাভ করিয়া লেখিকা পরিণতি লাভ করিয়াছেন, তিনি স্বয়ং যে শিক্ষার আদর্শ,—তাহা তাঁহাতেই শোভা পাইয়াছে; তাঁহাদের গণ্ডীর বাহিরে যে বিশাল নারীসমাজ রহিয়াছে তাঁহাদের পক্ষে লেখিকার "স্বামী ও মেজদাদার শিক্ষা একবারেই অনাবশ্যক। শিক্ষার এ 'মাখাল ফল' বাঙ্গালার সেই নারীসমাজ চিরদিনই উপেক্ষা করিবে। বিদুষী স্ত্রী ভাল; কিন্তু বিদুষী 'বিবি' মন্দ। ইংরেজী মেয়ের শিক্ষার পদ্ধতি, ইংরেজীয়ানার ষোল আনা অনুকরণে প্রবর্ত্তিত স্ত্রীশিক্ষা-প্রথা এক শ্রেণীর বাঙ্গালী রমণীকে কতদূর উন্নত করিয়াছে, তাহার দৃষ্টান্ত এখন আর কল্পনায় দেখিতে হয় না; এখন তাহা সকলেরই প্রত্যক্ষ হইয়াছে। ইঁহারা বিশ্ববিত্যালয়ের উপাধির শিরোপা পাইয়াছেন, স্বীকার করি; কিন্তু নারীত্বের যেখানে পূর্ণবিকাশ ও প্রয়োজন, সেই সংসারের পরীক্ষায় ইঁহারা উচ্চস্থান অধিকার করিতে পারিয়াছেন কি? এই শ্রেণীর

'স্ত্রীশিক্ষায় উন্নতি'-প্রাপ্তা রমণীগণ সুবৃহৎ সংসারের কর্ত্রী হইতে পারেন কি? একান্নবর্ত্তী বৃহৎ পরিবারে সকল দিক বজায় রাখিয়া, নিজ স্বামীপুত্র ব্যতীত অন্যান্য পরিজনগণের সহিত স্বামীপুত্রের তুল্য ব্যবহার করিয়া, প্রতিবেশীদের সহিত সদ্ভাব রাখিয়া, গৃহস্থালীর সকল প্রকার কাজকর্ম্ম করিয়া, সংসারের জন্য সকল প্রকার স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া ইঁহাদের অনেকেই একদণ্ডও টিঁকিতে পারেন কি? লেখিকা যে আদর্শকে অবলম্বন করিয়া 'স্ত্রীজাতি'র উন্নতি উপলব্ধ করিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালী নারীসমাজের উন্নতির আদর্শ নহে,—ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। সুতরাং ইংরেজীয়ানার নকল ও পর্দ্দার অন্তরাল ভেদ করিতে পারিলেই, বুট ও মোজা পায়ে দিয়া ইংরেজী বা ইংরেজী-বাঙ্গালা-মিশ্রিত বুলি বলিতে পারিলেই যে স্ত্রীজাতির চরম উন্নতি হইল বা হইবে, ইহা আমরা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহি।

চৈত্রের 'ভারতী'র বাহার খুলিয়াছে—"জর্দ্দা পরী" ও "নীল পরী"তে। এমন কবিতা চৌদ্দপুরুষেও পড়ি নাই, কোনও দিন যে পড়িব তাহা কল্পনাও করি নাই। এ কবিতাগুলি যে কোন্ জাতীয় তাহা বুঝিতে পারি নাই এবং কোনও কালে বুঝিতে পারিব এমন ভরসাও রাখি না। তবে কবির জাতি-নির্দ্ধারণ অনেকটা করিতে পারিয়াছি। যে নর বিকৃত ভঙ্গীতে "জর্দ্দা পরী" ও "নীল পরী"র উদ্দেশে লাফ্ মারিতে পারে, তাহার জাতি-নির্ণয় বিশেষ কঠিন নহে। কবিতা দুইটীতে অর্থ বা সঙ্গতি না থাকুক, উপমা এবং শব্দের ডুগ্ডুগি বেশ আছে। এই ডুগ্ডুগির তালে পা ফেলিয়া কবির স-লম্ফ নৃত্য ব্যতীত কবিতা দুইটীতে বস্তু কিছুই নাই। তবে একটী জিনিষ আছে, সেইটী না বলিলে সত্যের অপলাপ হইবে। সেইটী হইতেছে —উপমার "কসাইখানা"। কবিতা দুইটীতে উপমার যে ভাবে 'জবাই' চলিয়াছে, তাহাতে উহাতে কসাইখানার অস্তিত্ব আরোপ করাই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। 'জবাই করা' উপমাগুলি এই—"হিরণ-জরির ওড়না"; "জমাট জরীর বোর্কা"; "দরদ দিয়ে বুঝ্তে জরদ্ গরদ-শুটির দরদ-দায়"; "জোনাক পোকার হার গলে"; "আলেয়া তোর চক্ষে জ্বলে" প্রভৃতি। এই উপমার 'নজর' দিয়া কবি তাঁহার "স্বয়ম্বরের মালা"—"আলোক-লতা" 'জর্দ্দা পরীর' 'গলায়' পরাইয়া দিয়াছেন। এখন, কবির ভাষায় বলি—

"যাই কোথায় ?—
হায় রে হায় !"

"নীল পরী" আরও চমৎকার !—এখানেও 'ডুগডুগি' ও 'জবাই'। এই কবিতায় "চুলের চল্ বিথার" আছে, "আলগা চুমা" আছে, "মরণ নিবিড় আলিঙ্গন" আছে, "স্বপ্ন তোমার শাড়ীর আঁচল" আছে ; আর আছে—

"তন্দ্রা তোমার সুর্ম্মা চোখের, তন্দ্রা তোমার আলতা পা'র।

এই কবিতার অর্থ বাহির করিতে গেলে পাঠক-পাঠিকাকে নীলবর্ণ হইতে হইবে।

এগুলি কি কবিতা ? তবে কবি-মাতৃকা বঙ্গভূমির সারস্বত-আয়তনে এগুলি কি ? ইহাতে ছন্দ আছে, শব্দের ঘটা আছে, সুর আছে, যতি আছে,--কিন্তু অর্থ নাই, প্রাণ নাই। তাহা হইলে এগুলি কি কবিতার কবন্ধ ? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে ওঝার দরকার। কে এই নৈরাশ্যের অমানিশায় "আঘাটার জল" ও 'মুড়া' সম্মার্জ্জনী আনয়ন করিয়া এই সকল কবন্ধের হস্ত হইতে ম্রিয়মাণা মাতৃভাষাকে রক্ষা করিবে !

কীর্ত্তন-কাহিনী।

[লেখক—শ্রীশরৎচন্দ্র সিংহ।]

পুরাণের কুরুক্ষেত্রের পরবর্ত্তী সময় হইতেই, ভারতের চিন্তার ধারা একটী বিরাট সমষ্টির আকারে এক দিক দিয়া বহিয়া গিয়া, যখন বুদ্ধশঙ্করাদির ধর্ম্মের পন্থার শেষ সীমায় দাঁড়াইয়া দেখিল যে, অগ্রসর হইবার পথের মধ্যে যে বাঁধের সংযোগ ছিল, তাহা ধ্বংস হইয়াছে, তখন তাহারই এক ধার দিয়া ছায়াবহুল সমতল পথ দেখিতে পাইয়া, সেই পথ ধরিয়া অনায়াসে ও স্বচ্ছন্দে এমন স্থানে আসিয়া পৌছিল, যেখানে আসিলে আর কোনও রকমে পথ ভুল হইবার আশঙ্কা থাকে না।

ভারতের ভিতর দাঁড়াইয়া অন্য জগতের লোকে অবাক্ হইয়া যখন চাহিয়া থাকে, তখন দেখে যে, এই স্থানের মহাপুরুষদের প্রতিভার উপহারগুলি সার্ব্ব-

জনীন ও সার্ব্বভৌমিক, আর সেই জ্ঞান-গরিমা-বিভূতি তাঁরা স্বেচ্ছায় সাধারণ সম্পত্তি করিয়া দিয়া গিয়াছেন। তারই অবলম্বনে ভবিষ্য বংশধরেরা গন্তব্য পন্থায় পৌছিবার পথ খুঁজিয়া বাহির করে।

যখন বার বার উৎপীড়নের দাপটে দিশেহারা, তখন সুরাসুরের সঙ্গে কতই না নূতন ভাব আর রীতিনীতির ওড়ন-পাড়ন, সামাজিক সংস্কারের নূতন খসড়া হাতে করিয়া তুলিয়া লইয়াছে! এ কথা সকলেই জানেন।

বহু পূর্ব্বে ভারতে বহু প্রকারে সঙ্গীতের চর্চ্চা ও সাধনা হইত। তখন গীত, সুগীত, ছন্দ, প্রবন্ধ, ধুয়া, মাঠার প্রচলন ছিল। কালে সে সকলের এক প্রকার লোপ হইয়া যায়। কিন্তু একেবারে তাহা মুছিয়া যায় নাই, দিকে দিকে বিভাগ হইয়া পড়ে।

সঙ্গীতের দুই ধারা, দেশী ও মার্গী; এই মার্গীর বিলোপ হইয়া যায়। দেশী ধারাটী দেশে দেশে ছড়াইয়া পড়ে। ছন্দ, প্রবন্ধ, ধুয়া, মাঠার শ্রেণীবিভাগ হইয়া যায়। গীত ও সুগীত প্রায় মুছিয়া যায়।

হিন্দু রাজত্বের অবসানে, যখন ধ্রুপদ ও খেয়ালে মল্লযুদ্ধ চলিয়াছে, তখন টপ্পা-ঠুংরীর সৃষ্টি হয় নাই। এ কথা কে না জানেন? ধ্রুপদের গুরুগম্ভীর রাগালাপ ও ছন্দের পরিমাণানুযায়ী তালবিন্যাস যখন সঙ্গীতরাজ্যের সম্রাট, তখন খেয়ালের ক্ষীণ কলেবর সবেমাত্র উঁকি মারিতেছে, তার পর বহুদিন পরে টপ্পা, ঠুংরী ও গজলের সৃষ্টি হয়। তার ধারাবাহিক ইতিহাস আছে।

গান, ছবি ও কবির গাথা শুনিলে, দেখিলে ও পাঠ করিলে, প্রথমেই মনে একটী না একটী ভাব আসিয়া পড়িয়া তাহার ছায়াপাত করে। তাহার পর অনুশীলন আরম্ভ হয়। পরে যখন সমালোচনা হইতে থাকে, তখন অতীতের গৌরব-কাহিনীর যত প্রকার সূচীপত্র সব মনে পড়িয়া যায়।

ধর্ম্ম, সঙ্গীত ও ভাষার আলোচনায়, আমরা দেখিতে পাই, ঐ সকলই তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তীর কাছে কিছু না কিছু ঋণ গ্রহণ করিয়াছে।

সেই সার্দ্ধ চারি শত বৎসর পূর্ব্বের কথা,—সমাজ, আচার, রীতি, নীতি ও ধর্ম্মভাব-পরিপূর্ণ হৃদয় যাবনিক যবনিকার আবরণ ভেদ করিয়া যখন বাঙ্গালা তাহার মুক্তির পন্থা বাছিয়া লইল, তখন দেখিল, তার অন্য গতি নাই। আয়ু হীন, দেহ ক্ষীণ, এ অবস্থায় এক নামসংকীর্ত্তন ব্যতীত তার আর কিছুই নাই। সুদৃঢ় সৌধনির্ম্মাণের জন্য যেমন তার মাল-মস্‌লা আবশ্যক, সেইরূপ কীর্ত্তনাবয়ব-গঠনের জন্য মাল-মস্‌লা সংগ্রহ হইতে লাগিল, তখন আমাদের সেই পুরাতন

গীত, সুগীত, ছন্দ, প্রবন্ধ, ধুয়া ও মাঠার অঙ্গ হইতে ও ধ্রুপদ-খেয়ালের নব কলেবর হইতে, বাছিয়া বাছিয়া যেখানে যাহা দিলে বেশ মানানসই হয়, তাহার আয়োজন হইতে লাগিল।

কালে কীর্ত্তন-বিজ্ঞানের নানা ধারার আবিষ্কার হইয়া, উচ্চ সংকীর্ত্তন, কীর্ত্তন (রেনিটী ও মনোহর সাই ইত্যাদি) ঢপ, তুক্কাদির সাত্ত্বিক ও মধুর মোহনভোগ প্রস্তুত হইল। এইটী বাঙ্গালার নিজস্ব সম্পত্তি। এই শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি আমরা উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করিয়াছি। আর সেই সম্পত্তির একমাত্র অধিকারী ছিলেন আমাদের নদীয়া-নটেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দেব।

সঙ্গীতজ্ঞ ভক্তের ভাবের অভিব্যক্তি তাঁর সুরের ও কথার মধ্য দিয়া আপনিই প্রকাশ হইয়া পড়ে। আর যখন সিদ্ধি বা সফলতা স্বয়ং আসিয়া দয়া করেন, তখন মন্ত্রের শক্তি পৌঁছায়, সে শক্তির মধ্যে সৌন্দর্য্য দল বাঁধিয়া বসিয়া থাকে; কখনও তার পরিবর্ত্তন হয় না। যত প্রকার আপদ-বিপদের ওলট-পালট হোক না কেন, তার অস্তিত্বটা বদলাইতে পারে না। পরিবর্ত্তনের যে একটী বিয়োগান্ত দৃশ্য আছে, সেটা অনুভব হয় না।

চারি জাতি বাদ্যের মধ্যে তত, বিতত, ঘন ও শুষির ছাড়া জগতে আর কোনও বাদ্যযন্ত্রের সৃষ্টি আজও পর্য্যন্ত হয় নাই।

কীর্ত্তন-বিজ্ঞানের অনুশীলনে দেখিতে পাওয়া যায়, তারই মধ্যে তত, বিতত, ঘন ও শুষিরের সাহায্যে ইহা সম্পদশালী। বিততের মধ্য হইতে মৃদঙ্গ বা খোল, ঘনের মধ্য হইতে খরতাল ও শুষিরের মধ্য হইতে রামসিঙ্গা বাছিয়া লওয়া হইয়াছে। ইহাই কীর্ত্তন-বিজ্ঞানের চরম সিদ্ধান্ত। খোল বা মৃদঙ্গ বাদী-সম্বাদী-ক্রমে বাঁধা। শিঙ্গায় বাদী, সম্বাদী, অনুবাদীর বিকাশ। তাই বলিতেছি, কীর্ত্তনের সঙ্গতে এমন সব যন্ত্রের ব্যবহার হয়, তাহার আর পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা হয় না; তবে সৌষ্ঠব-বৃদ্ধির জন্য পরবর্ত্তী সময়ে ততেরও ব্যবহার হইয়া গিয়াছে।

কটাক্ষ।

[লেখক—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।]

(১)

দারুণ শীত—অবশ্য আমি বুঝি নাই, কারণ——যাক্ সে কথা। নীতি-বাগীশেরা শুনিলে শিহরিয়া উঠিবে। আমি প্রমোদোদ্যানের আমোদ-আহ্লাদ

ছাড়িয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে মানস করিয়াছিলাম। বন্ধু-বান্ধব সকলে অনেক টানাটানি করিয়াছিল, এত রাত্রিতে, বিশেষ পদব্রজে, আমার সে অবস্থায় বাগান ছাড়িয়া যাওয়া অবিধেয়। পথে বিপদ হইতে পারে। মাণিকতলায় পথের দুই পার্শ্বে নালা। দেহের সে অবস্থায় লোকে 'থানা'য় পড়ে—ইহা একেবারে প্রবাদ-বচন। এমন কি পাহারাওয়ালা ধরিয়া, রাত্রিতে ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিতে পারে। বন্ধু-বান্ধবদের এই সকল বাক্যে আমার আরও জিদ্ চাপিয়াছিল। তাই গায়ে শাল জড়াইয়া একটা বর্ম্মা চুরুট টানিতে টানিতে সহরতলীর নির্জ্জন পথে একাকী বাহির হইলাম। কি আপদ! আমার তখন নেশার নামমাত্র ছিল না। শরীরটা গরম ছিল বটে, কিন্তু মাদকতা মোটে ছিল না।

মাদকতা মোটে ছিল না—এ কথা এতটা জোর করিয়া বলিবার কারণ আছে। আমি বাগান হইতে বাহিরে আসিয়াই বেশ স্পষ্ট ঘড়ি দেখিয়াছিলাম—বারটা বাজিতে সাত মিনিট। পকেটের টাকার থলি হইতে সমস্ত রজত ও তাম্র মুদ্রা হাতে ঢালিয়া গণিয়াছিলাম—সাত টাকা তের আনা এক পয়সা। আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, আমার চক্ষে সরল দৃষ্টি ছিল—সুরার মাদকতায় দৃষ্টিপথে কোনও কুহেলিকা ছিল না। কিন্তু তবুও পাঁচ সাত জন আমার গল্প শুনিয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়াছিল—বাগানের উদ্দামতা লক্ষ্য করিয়া নীতিশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছিল—হিতোপদেশ দিয়াছিল।

নেশার ঝোঁকে দেখিলে সে দৃশ্য আজীবন আমার মানসপটে অত সুস্পষ্ট রেখায় অঙ্কিত থাকিত না। ঠিক মাণিকতলার পোল পার হইয়াই গড়ান রাস্তায় লোকটা আমার দিকে চাহিয়াছিল। নির্জ্জন পথে সেই চাহনীতে আমি ঘুরিয়া দাঁড়াইলাম। সে কলিকাতার দিক হইতে সহরতলীতে যাইতেছিল; আমি সহরতলী হইতে কলিকাতায় যাইবার জন্য পুলের দিকে অগ্রসর হইতেছিলাম। লোকটা আমার পাশ দিয়া যাইবার সময় আমার মুখের দিকে চাহিল। একখানি বালাপোষ গায়ে জড়ান, মাথার চুলগুলা রুক্ষ আর চোখের সেই চাহনী। আমি একেবারে ঘুরিয়া তাহার পিছনটা দেখিলাম। বালাপোষের ভিতর হইতে দুইটা সাদা ধপ্ধপে পা—গোলগাল নিটোল পদদ্বয় কিন্তু রক্তহীন—স্ত্রীলোকের আল্তামাখান দুইটা পা—তাহার পশ্চাতে ঝুলিতেছিল। আমি শিহরিয়া উঠিলাম—চীৎকার করিতে পারিলাম না, ছুটিয়া পলাইতে পারিলাম না, চক্ষু মুদিত করিলাম না, আবার

ঘুরিয়া গন্তব্যপথে যাইতে পারিলাম না। কেবল নির্ব্বাক হইয়া অচলদৃষ্টিতে সেই পদদ্বয় দেখিতে লাগিলাম—আমার নিকট হইতে পা দুখানা সরিয়া যাইতেছিল। সেই পদদ্বয়ের অধিস্বামিনী লোকটার পৃষ্ঠে, বালাপোষের মধ্যে ঝুলিতেছিল—সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল না। তাহা না হইলে দু'খানা পা কোথা হইতে আসিবে? খুব বেশী, মাত্র আধ মিনিট, সেই রক্তহীন চরণ-যুগলের দিকে বিস্মিত হইয়া তাকাইয়াছিলাম, কিন্তু এখনও সেই আলতামাখা পা দুইখানা আমার চোখের সামনে ঝুলিতেছে, আর জ্বলিতেছে, সে লোকটার বন্য পশুর মত, সেই চক্ষু দুইটা।

বলিয়াছি, আধ মিনিট সেই দিকে তাকাইয়াছিলাম। লোকটা আধ মিনিট চলিয়াই হাত দিয়া দোদুল্যমান পদদ্বয় স্পর্শ করিল। অমনি পিছনে চাহিল। আমাকে দেখিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর আমার দিকে সেই দৃষ্টিতে চাহিল—সে দৃষ্টির বর্ণনা করা মানুষের সাধ্যাতীত, সে দৃষ্টির রং ফলাইতে পারে, এমন চিত্রকর ভুভারতে নাই—সে দৃষ্টির অর্থবোধ করিতে পারে—এমন পণ্ডিত, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি—চারি যুগে জন্মে নাই। সে চাহনীতে আমি আরও শিহরিয়া উঠিলাম—সেই দারুণ শীতের রজনীতে আমার ললাটে স্বেদোদ্গম হইল—পাঁচ সাত সেকেণ্ড একটা ভীষণ মোহ—একটা পর্ব্বত-প্রমাণ জড়তা আসিয়া আমাকে চাপিয়া ধরিল। কিন্তু তখনই রাজসিক ভয় আসিয়া আমার হস্তপদে শক্তিসঞ্চার করিল। এত ক্ষণ তামসিক ভয়ে, আমি সেই স্থলে দাঁড়াইয়াছিলাম; এখন রাজসিক ভয়ে আমি উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিলাম। সেই নির্জ্জন পুলের উপর দিয়া কলিকাতার ভিতর ছুটিলাম। একবারও পশ্চাতে তাকাই নাই। একেবারে হেদুয়ার ধারে আসিয়া দম লইয়াছিলাম। তাহার পর দ্রুতপদ-বিক্ষেপে গৃহাভিমুখে গিয়াছিলাম।

(২)

পরদিন পাঁচ সাত জন বন্ধুকে সে কথা বলিয়াছিলাম। তাহারা আমাকে পরিহাস করিয়াছিল। কিন্তু তৃতীয় দিবসে যখন সংবাদপত্রে সকলে পড়িল, তখন তাহাদিগকেও শিহরিতে হইল। ইংরাজী ও বাঙ্গালা সকল সংবাদ-পত্রে ঘোষিত হইল যে, মাণিকতলায় একটা রমণীর শবদেহ পাওয়া গিয়াছে। একখানি দেশীয় সংবাদপত্রে এইরূপ লেখা ছিল—

"শবদেহ।—মাণিকতলার ধনকুবের * * মহাশয়ের বাগান-বাটীর বড়

পুষ্করিণীতে একটি রমণীর শবদেহ পাওয়া গিয়াছে। গত কল্য প্রভাতে উঠিয়া * * বাবুর উড়িয়া মালী পুষ্করিণীতে মুখ ধুইতে গিয়া দেখিতে পায় যে, একটা কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ জলে ভাসিতেছে। তাহার পর সে বুঝিতে পারে যে, সেগুলা রমণীর কেশদাম। ভীত হইয়া নিশাকর মালী অপর মালীদিগকে ডাকিয়া আনে। তখন প্রকাশ পায় যে, একটি রমণীর শবদেহ জলে ভাসিতেছে। তাহারা তৎক্ষণাৎ মাণিকতলা থানায় সংবাদ প্রেরণ করে। মাণিকতলা থানার সব ইন্‌সপেক্‌টর শবদেহটিকে উঠাইয়া সকল স্থানীয় লোককে সনাক্ত করিবার জন্য ডাকাইয়াছিলেন, কিন্তু কেহ রমণীকে চিনিতে পারে নাই। রমণীর বয়স আন্দাজ ২৪.২৫ বৎসর। সে বেশ সবলকায় ছিল—বর্ণ গৌর, পদদ্বয় অলক্ত-রঞ্জিত। গায়ে কোনও রূপ আঘাতের চিহ্ন নাই। পুলিসের বিশ্বাস যে, রমণী আত্মঘাতিনী হইয়াছে। কিন্তু কোথা হইতে আসিল, কাহার আত্মীয়া, যতদিন এ বিষয় স্থির না হইবে, ততদিন তাহার মৃত্যুর প্রকৃত কারণ প্রকাশ হওয়া সম্ভবপর নহে।"

বলা বাহুল্য, সংবাদটা পাঠ করিয়া আমি বড় বিচলিত হইলাম। লোকটা যে রমণীকে হত্যা করিয়াছে, সে বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ ছিল না। তাহার চক্ষে সে কথা প্রকাশ পাইয়াছিল।

আর তাহা না হইলে সে ওরূপ ভাবে শবদেহটাকে পৃষ্ঠে বহন করিয়া লইয়া যাইবে কেন? কিন্তু আমি যখন দেখিয়াছিলাম তখন রমণী মৃতা না জীবিতা ছিল তাহা ভাবিয়া একটু আত্মগ্লানি হইল। হতভাগিনী যে তখন একেবারে ইহলীলা সম্বরণ করিয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল না। তবু মাঝে মাঝে মনে হইতেছিল, হয় ত তাহাকে কোনও প্রকার বিষপ্রয়োগ করিয়া হত্যা করা হইয়াছিল। তখনও রমণীর দেহে প্রাণের সূত্রটুকু ছিল—চেষ্টা করিলে, চিকিৎসা করিলে বাঁচিতে পারিত। এই শেষ চিন্তাটা আমাকে বড় উৎপীড়িত করিল। নিজের কাপুরুষতা স্মরণ করিয়া বিরক্ত হইলাম। আমি একটু মনুষ্যত্ব দেখাইলেই হত্যাকারী লাস-সহ ধৃত হইত, তাহা নিশ্চিত বলা যাইতে পারে। আমার পরে স্মরণ হইল যে, তখন খালে কতকগুলা বড় বড় মহাজনী কিস্তী বাঁধা ছিল। একটু চীৎকার করিলেই মাঝিমাল্লারা উঠিয়া আসিত। পুলের ঈষৎ উত্তরে মাণিকতলা থানা। সেই দিকে ছুটিয়া গেলে পুলিশের সাহায্য পাইতে পারিতাম; কিন্তু সে সময় মৃতার পদদ্বয় দেখিয়া এবং হত্যাকারীর চক্ষুর কটাক্ষ সহিতে না পারিয়া আমি ভীত হইয়াছিলাম—কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বাঙ্গালীর স্বাভাবিক

বৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া 'চম্পট' দিয়াছিলাম। আমারই কাপুরুষতার জন্য একটা নারীঘাতক আজ সমাজের মধ্যে স্বাধীনভাবে ঘুরিতেছে, হয় ত আমার কথা স্মরণ করিয়া মনে মনে আমাকে উপহাস করিতেছে, হাসিতেছে।

আবার দুই দিন পরে সংবাদপত্রে প্রকাশ হইল——

"কারণ-নির্ণয়।—গত সোমবারে মাণিকতলার পুষ্করিণীতে যে হতভাগিনীর শবদেহ পাওয়া গিয়াছে, তাহার পরীক্ষার ফলে স্থির হইয়াছে যে, রমণীকে কোনও পাষণ্ড হত্যা করিয়াছে—সে নিজে আত্মহত্যা করে নাই। ডাক্তারী পরীক্ষার ফলে প্রকাশ যে, কোনও দুর্ব্বৃত্ত তাহাকে গলা টিপিয়া মারিয়াছে। শ্বাসরোধ হইয়া রমণী ইহলীলা সম্বরণ করিয়াছে। তাহার হত্যাকারীর সন্ধানের জন্য পুলিশ কমিশনর মহাশয় পাঁচ শত টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, রমণীকে কেহ সনাক্ত করিল না। সে কোথায় থাকিত, কাহার পত্নী বা কন্যা তাহা প্রকাশ পায় নাই। পুলিশের বিশ্বাস যে, রমণী বাঙ্গালী হিন্দু।"

দুই একজন বন্ধুবান্ধবকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এ ক্ষেত্রে কি করা কর্ত্তব্য। তাহারা সকলে এক বাক্যে আমাকে "পুলিশ-হাঙ্গামা"র ভিতর থাকিতে নিষেধ করিল। আমি কিন্তু কাহারও নিষেধ মানিলাম না। মাণিকতলার ইন্‌স্পেক্টরের নিকট এজাহার দিয়া আসিলাম। তিনি সমস্ত কথা লিখিয়া লইলেন। অবশেষে বলিয়া দিলেন—"একটু লক্ষ্য রাখ্‌বেন। যদি সে লোকটাকে পথে দেখ্‌তে পান, ধর্‌বেন। কোনও ভয় নেই।"

বন্ধুবান্ধব পরিহাস করিয়া বলিত—"এবার দুমুখো থলে সেলাই কর। পুলিশের পুরস্কারের টাকা পেয়ে তার ভেতর রাখ্‌বে।"

(৩)

তখন বেশ ফাল্গুনের হাওয়া দিয়াছিল। বেলাও একটু বাড়িয়াছিল। লাট সাহেবের বাড়ীর আমগাছগুলাতে খুব আমের মুকুল ফুটিয়াছিল—গন্ধে চারিদিক আমোদ করিতেছিল। লাট সাহেবের বাড়ীর ভিতর একটা কোকিল কৃষ্ণচূড়া ফুলের গাছে বসিয়া ডাকিতেছিল, আর একটা কোকিল ইডন উদ্যানের ভিতর হইতে তাহার সহিত প্রতিযোগিতা করিতেছিল। গোধূলির আলোকে গাছপালাগুলা অতি মনোরম শোভাধারণ করিয়াছিল। আমি অফিস হইতে বাহির হইয়া লাট সাহেবের প্রাসাদের পশ্চিম দিকের ফুটপাথের উপর দিয়া ময়দানের দিকে যাইতেছিলাম। সে দিকে গাড়ি, ঘোড়া,

মোটর গাড়ির ভিড় কম! তবু প্রতি মিনিটে তিন চারিখানি মোটর গাড়ি নানা রূপ বাঁশীর শব্দ করিতে করিতে ছুটাছুটি করিতেছিল; নানা বর্ণের, নানা আকারের ঘোড়ার গাড়ি যাতায়াত করিতেছিল। পথে লোকের ভিড় না থাকিলেও এক চীৎকারে, নিমেষ মধ্যে অন্ততঃ তিন শত লোক ছুটিয়া আসিতে পারিত। তবু কেন চীৎকার করিয়া লোক ডাকি নাই, বলিতেছি।

লাট সাহেবের প্রাসাদের দক্ষিণ পশ্চিমের ফটক পার হইয়া প্রায় দশ হাত দক্ষিণে গিয়াছিলাম। সে ফটকটি সচরাচর বন্ধ থাকে। সম্মুখে গোধূলির আলোকে ময়দানের ম্লান-মূর্ত্তি দৃষ্টিপথে পড়িতেছিল। আমার পশ্চিম দিকের ময়দানটুকুর মূর্ত্তি আরও ম্লান। এখানে নিত্য পাহারাওয়ালাদিগের কুচ-কাওয়াজ হয়। তখন তাহারা চলিয়া গিয়াছিল। ঠিক রাস্তার অপর দিকে সেই মাঠে দেখিলাম,আমারই মত দক্ষিণ দিকে একটা লোক চলিতেছে। বাঙ্গালী ভদ্রলোকের পোষাক—তবে বেশ-ভূষা তেমন পরিপাটী রকমের নহে। আমি প্রথমে তাহার মুখ দেখিতে পাই নাই; কিন্তু হঠাৎ একবার সে আমার মুখের দিকে চাহিল। আমিও তাহার দিকে চাহিলাম! সর্ব্বনাশ! উভয়ে উভয়ের মুখের দিকে চাহিয়া নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। উভয়েই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়——উভয়েই বিস্মিত। আমার সন্দেহ রহিল না। সে মুখ জীবনে কখনও ভুলিতে পারিব না। এ নিশ্চয়, সেই শববাহক—মাণিকতলার সেই লোক।

আমি ভাবিলাম, ছুটিয়া গিয়া লোকটাকে ধরিব,—চীৎকার করিব, পাহারাওয়ালা ডাকিব, সার্জ্জেণ্ট ডাকিব। কত ক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়াছিলাম, বলিতে পারি না। আমাদের দুই জনের মধ্য দিয়া অনেকগুলা মোটর ও ঘোড়ার গাড়ি চলিয়া গিয়াছিল, মনে আছে। প্রথম মোহটা কাটিয়া গেলে যেমনি অগ্রসর হইতে যাইয়াছি, লোকটার চক্ষে সেই চাহনী দেখিলাম। এত ক্ষণ সে সাধারণ ভাবে চাহিতেছিল; কিন্তু এখন সেই চাহনী! আমি শিহরিয়া উঠিলাম। যেরূপ অবস্থায় ছিলাম, স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। কে জানে তাহার চাহনীতে কি শক্তি ছিল, আমি বৃক্ষের মত সেই স্থলে দাঁড়াইয়া রহিলাম—মনে হইল যেন পাতাল অবধি আমার শিকড় নামিয়াছে, আমার পক্ষে নড়িতে চেষ্টা করা বৃথা। শুনিয়াছি, চাহনীতে অহিকুল তাহাদিগের শীকারকে যাদু করে, শার্দ্দূলও নাকি কটাক্ষে হরিণীর ক্ষিপ্র-পদে শিথিলতা সঞ্চার করে। লোকটা আমাকে সেইরূপ যাদু করিল। তাহার পর সে ধীরে ধীরে ফিরিয়া গঙ্গার দিকে চলিতে লাগিল। এবার আমার মোহ-ঘোর

কাটিল। আমি তাহার পশ্চাতে ছুটিলাম। রাস্তা পার হইয়া মাঠের মধ্যে ছুটিলাম। তাহার ঠিক দুই হাতের মধ্যে আসিলাম। এবার আমার কথা ফুটিল। আমি দৃঢ়স্বরে বলিলাম—"দাঁড়ান"। লোকটা দাঁড়াইল। কিন্তু ফিরিয়া দাঁড়াইল। চোখে সেই দৃষ্টি। গল্পে আছে—রাক্ষসী দৃষ্টিশক্তিতে রাজপুত্রকে পাষাণ করিয়া দিয়াছিল। লোকটা দৃষ্টিতে আমাকে পাষাণ করিল। আমি স্থির হইয়া দাঁড়াইলাম। সে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। মাঝে মাঝে ফিরিয়া আমার দিকে চাহিল। আমার এমন শক্তি হইল না যে, তাহাকে ছুটিয়া গিয়া ধরি বা চীৎকার করি। আমাকে চাহনীতে যাদু করিয়া নারীঘাতক দুর্ব্বৃত্ত প্রকাশ্যভাবে রাজপ্রতিনিধির প্রাসাদের নিকট হইতে টাউন-হলের সম্মুখ দিয়া, বিচার-প্রিয় ইংরাজ-জাতি-প্রতিষ্ঠিত দেশের সর্ব্বোচ্চ আদালতের সম্মুখ দিয়া ইংরাজের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপের কেন্দ্রস্থল দিয়া চলিয়া গেল। আমার মোহবশতঃ তাহার পাপের দণ্ড হইল না, অভাগিনীর জীবনটার জন্য প্রতিশোধ লইতে পারিলাম না।

(৪)

গৃহে বসিয়া স্থির হইয়া সেই সম্মোহন কটাক্ষটার অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। প্রথমতঃ সে কটাক্ষে আমার ক্ষতি হইবে, এরূপ কোনও উপাদান ছিল না। তাহাকে ধরিলে, সে আমাকে হত্যা করিবে বা আমার অঙ্গহানি করিবে, সেরূপ ভাব সে কটাক্ষে মোটেই ছিল না। কটাক্ষে একটা বিষম কাতরতা ছিল—অব্যক্ত কাতর ভাব যে কাতরভাবে মানুষের প্রাণে দয়া বা সহানুভূতির উদ্রেক করে সেরূপ কাতরতা সে চাহনীতে ছিল না। যেটুকু কাতরতায় মানুষকে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় করিয়া দেয়—প্রাণের মধ্যে উপস্থিত কর্ত্তব্য-সম্বন্ধে একটা বিরাট সমস্যার সৃষ্টি করিয়া দেয় মাত্র—এ সেই কাতরতা। সে কাতরতার সঙ্গে যেন একটা আত্মবোধের চেষ্টা ছিল। তাহার পর সে দৃষ্টির মধ্যে অব্যবস্থিত চিত্তের ছায়া ছিল। সে নিজে ঠিক বুঝিতে ছিল না,—তাহার কি করা কর্ত্তব্য, কোন পথ গন্তব্য। দৃষ্টির তৃতীয় উপাদান, বিস্ময়—বিষম বিস্ময়। নিজের কার্য্যে বিস্ময়, পৃথিবীর চারিদিকে বিস্ময়, মনের মাঝে বিষম বিস্ময়। আর বোধ হয়, সে চাহনীর সঙ্গে এ সকল উপাদান ভিন্ন একটু আত্মগ্লানি, একটু অনুতাপ মিশ্রিত ছিল। এ বিষয় আমি ঠিক্ বলিতে পারি না। হয় ত সেই কাতরতাটুকু আমার মনে অনুশোচনা বলিয়া বোধ হইতেছিল, কিন্তু আমার বিশ্বাস, লোকটার চক্ষের চাহনী প্রাণের ভিতরের অনুতাপ,

সম্ভবতঃ একটু অনুশোচনা প্রকাশিত করিতেছিল। কিন্তু সে চাহনীতে একটা আতঙ্ক ছিল, তাহা নিঃসন্দেহ। সে আমাকে যে চাহনী দেখাইয়া মোহগ্রস্ত করিতেছিল, সে তাহার মানসপটে সেই রকম একটা চাহনী দেখিতেছিল, অন্ততঃ ছোটখাট রকমের একটা বিভীষিকা তাহাকে শঙ্কিত করিতেছিল—এ কথা তাহার কটাক্ষে দেদীপ্যমান ছিল।

আমি সেই লোকটীকে দেখিবার পর দুই সপ্তাহ সে আমার দৃষ্টিপথে পড়ে নাই। কিন্তু এই দুই সপ্তাহের মধ্যে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, এবার আমার দৃষ্টিপথে পড়িলে, সে আর পলাইতে পারিবে না। এবার তাহাকে ধরিব; অন্ততঃ চীৎকার করিয়া তাহাকে ধরিবার চেষ্টা করিব, এ বিষয় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলাম।

ঠিক পনের দিনের পর কর্ম্মস্থল হইতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বেশ পরিবর্ত্তন করিতেছিলাম। ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল যে, পুলিশ হইতে এক ব্যক্তি আসিয়া আমার অন্বেষণ করিতেছে। আমি একটু উত্তেজিত হইলাম। তাড়াতাড়ি বাহিরে গিয়া দেখিলাম, একটী বাঙ্গালী জমাদার বৈঠকখানায় বসিয়া আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। আমাকে দেখিয়া সে বলিল,—বাবু আপনাকে একটু কষ্ট ক'রে একবার মাণিকতলার থানায় যেতে হবে।

আমি বলিলাম—কেন বল দেখি?

সে বলিল—সেই খুনী লোকটা ধরা পড়েছে, আপনাকে সনাক্ত করতে হবে।

আমি বিশেষ উত্তেজিত হইলাম। তাহাকে ক্রমে ক্রমে অনেক প্রশ্ন করিয়া বিব্রত করিলাম। জমাদার বলিল—বাবু থানায় গেলেই সব কথা প্রকাশ পাবে। লোকটা ধরা পড়েছে, এই অবধি দেখেছি কিন্তু তার বিষয় অপর কোন সংবাদ জানি না।

আমি তাড়াতাড়ি কাপড় ছাড়িয়া জমাদারের সহিত থানায় যাইলাম।

(৫)

সব-ইন্সপেক্টর বাবু বলিলেন—লোকটা একটু পাগলামির ভাণ করছে, চোখ চোখগুলা পাগলের মত ঘোরাচ্চে, কিন্তু আমার তো মনে হয় লোকটা দোষী।

আমি বলিলাম—কই দেখি।

সব-ইন্সপেক্টর বলিলেন—কি জানেন—তার উপর চার্জ্জটা বড় গুরুতর, যদি দোষী সাব্যস্ত হয় তো লোকটার ফাঁসি হ'য়ে যাবে, এ রকম স্থলে একটু সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

আমি কথাটা তত বুঝিলাম না। তিনি বলিলেন—গোটাকতক তার মত আকারের লোক ডাকতে পাঠিয়েছি। আসামীকে তাদের সঙ্গে মিশিয়ে দ'ব। যদি আপনি বেছে বার করতে পারেন তো কারও আর মনে ক্ষোভ থাকবে না।

আমি বলিলাম—মশায় সে লোককে আমি লক্ষ লোকের ভেতর থেকে খুঁজে বার করে দ'ব। জীবনে সে মুখ কখনও ভুল্‌তে পারব এমন মনে হয় না। বিশেষ তার কটাক্ষ।

কিরূপে আসামী ধৃত হইল, সে সম্বন্ধে সব-ইন্‌স্পেক্টরকে প্রশ্ন করিলাম। তিনি বলিলেন যে, অপরাধীদের দস্তুর তাহারা ঘটনাস্থল দেখিতে আসে। বিলাতে যাঁহারা এ বিষয় বিশেষরূপে অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহাদের ইহা অভিমত। বিলাতে অনেক অপরাধী এইরূপে ধৃত হইয়াছে। তাঁহারাও সেই জন্য সেই বাগানের পুষ্করিণীর উপর লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন। লোকটা সেদিন দুপুর বেলা আস্তে আস্তে চোরের মত সেই বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। এদিক ওদিক চাহিয়া সেই পুকুর-ধারে বসিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। যে ব্যক্তি বাগানে অলক্ষ্যে পাহারা দিতেছিল, সে সন্দেহ করিয়া বাহির হইবামাত্র লোকটা ছুটিয়া পলাইতে চেষ্টা করিল। বহুদূর অনুসরণ করিয়া পুলিশের দূত তাহাকে ধরিয়াছে।

আমি বলিলাম—লোকটা কিছু বলেছে? দোষ স্বীকার করেছে।

সব-ইন্সপেক্টর বলিল—তা হ'লে আর আপনাদের কষ্ট দিই? সে কেবল পাগলামির ভাণ করছে। বড় একটা কথার জবাব দিচ্চে না।

কিছুক্ষণ পরে একজন জমাদার আসিয়া খবর দিল যে, সব ঠিক হইয়াছে। আমি উত্তেজিত হইয়া দেখিতে গেলাম। কতকগুলা লোক শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে—সকলেই বাঙ্গালী, তবে নানা প্রকারের আকৃতির। আমি তাড়াতাড়ি সেই সারির এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত অবধি দেখিলাম, দ্বিতীয় বার দেখিলাম, তৃতীয় বার দেখিলাম, সে ব্যক্তি লাইনে নাই। তাহার পর একে একে প্রত্যেক ব্যক্তির মুখ দেখিলাম—সে ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলাম না।

সব-ইন্সপেক্টারকে বলিলাম—মশায় সে লোক এর ভেতর নাই। তিনি কে আবার উত্তমরূপে দেখিতে বলিলেন। আমি বলিলাম—মশায় নিশ্চয় করেছেন। কোন্ হতভাগাকে ধরেছেন ছেড়ে দিন।

সব-ইন্সপেক্টর নবীনবাবু মৃদু হাস্য করিয়া আমাকে বলিলেন—ভুল আমাদের

দু'পক্ষের মধ্যে এক পক্ষের হ'য়েছে। আচ্ছা দেখুন দেখি, এই লোকটা আপনার সেই লোক কিনা।

নবীনবাবু সেই শ্রেণীবদ্ধ লোকেদের মধ্যে একজনকে দেখাইয়া দিলেন। সে লোকটার চাহনী একটু অসাধারণ রকমের ছিল বটে, কিন্তু সে চাহনীর সহিত এ চাহনীর তুলনা হইতে পারে না। ইহার কটাক্ষ পাগলের--আর সে কটাক্ষ তুলনাতীত।

আমি বলিলাম—মশা'য় আমি জগদীশ্বরের নাম নিয়ে বল্‌তে পারি, এ ব্যক্তিকে আমি পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই, তাহার আকৃতি বা প্রকৃতির সঙ্গে এর আকৃতি-প্রকৃতির কোনও সাদৃশ্য নাই। একে ছেড়ে দিন।

সনাক্ত করাইবার জন্য যে সকল বাহিরের লোকগুলিকে আনিয়া শ্রেণীবদ্ধ করিয়া দাঁড় করাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, তাহারা হাসিতে লাগিল। দুই একজন বলিল যে, আসামীকে দেখিয়া বাস্তবিকই পাগল ভিন্ন অপর কিছু বলিয়া মনে হয় না।

'বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা।" শুনিলাম, আইনের মর্য্যাদা রাখিয়া লোকটাকে ছাড়িতে কিছুকাল বিলম্ব হইবে। লোকটা পাগল, তাহাকে কোনও ওয়ারিস ব্যতীত ছাড়িয়া দেওয়া তাহারও পক্ষে অমঙ্গলকর হইবে।

(৬)

সে দিন চড়ক-সংক্রান্তি। ছাতু বাবুর বাজারে লোকে লোকারণ্য। বাজারে যাইবার যতগুলি পথ আছে, প্রত্যেক পথে লোকের ভিড়। হেদুয়ার বাগানে অপেক্ষাকৃত জনতা কম থাকিলেও, বীডন ষ্ট্রীটে সারি দিয়া লোক যাতায়াত করিতেছিল। আমি ভিড়ের ভিতর হইতে বাহিরে আসিয়া হেদুয়ার এক কোণে ঘাসের উপর বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিলাম। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছিল। নবমীর চাঁদের আলো বায়ু সঞ্চারিত জলের ঢেউগুলিকে খেলাইতেছিল। আমি জলের দিকে চাহিয়াছিলাম। পিছন হইতে কে আমার স্কন্ধ স্পর্শ করিল। আমি পিছনে চাহিয়া দেখিলাম—সে!

আমি লাফাইয়া উঠিলাম। তাহার হাত ধরিয়াই চীৎকার করিতে যাইতেছি, তাহার সেই কটাক্ষ দেখিলাম। সেই কটাক্ষ! এত দিনে কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই। আমার বাক্‌রোধ হইল, তাহার হাত ছাড়িয়া দিলাম।

তাহার দৃষ্টি আবার সরল হইল। তাহার পর কাতর হইল।

[illegible] বলিল—বাঁচাও। তুমি ভিন্ন এ কষ্টের শেষ করতে কেহ পারবে না।

তাহার কাতর দৃষ্টি দেখিয়া আমি সাহস পাইলাম। তাহাকে বলিলাম—নারী হত্যা করেছ, কাপুরুষ তোমায় বাঁচাব? তোমার জন্যে নির্দ্দোষ লোকের নিগ্রহ হ'চ্চে।

সে বলিল—সে বাঁচান না। পুলিশে দিয়ে বাঁচাও। উঃ! কি যন্ত্রণা! কি জ্বালা! কি জ্বালা! কি শাস্তি! উঃ—

বলিতে বলিতে তাহার সেই কটাক্ষ ফিরিয়া আসিল। আমি বসিলাম, তাহাকে বসিতে বলিলাম। সে আমার সম্মুখে ঘাসের উপর মাথায় দুই হাত দিয়া বসিল। একবার সাহসে ভর করিয়া তাহার চক্ষের দিকে চাহিলাম। সে দৃষ্টিটা আর নাই।

সে বলিল—উঃ কি জ্বালা! কি যন্ত্রণা! কখনও পাপ করেছ?

আমি জানিতাম, শীকার হাতের মধ্যে। তাহার কথা শুনিতে দোষ কি? আজ একবার চীৎকার করিলে হাজার লোকের সাহায্য পাইব। হেদুয়ার মোড়ে মাণিকতলা থানার জমাদার পাহারা দিতেছিল। আমি বলিলাম—পাপ করেনি এমন লোক কে আছে?

সে বলিল—না! না! সে পাপ না। আমার মত পাপ। জানতো! বোধ হয়, বুঝতে পেরেছিলে! তোমাকে তাকিয়ে থাকতে দেখে হাত দিয়ে দেখেছিলাম। পা বেরিয়েছিল। তুমি জান। আবার ন্যাকামী! আমার মত পাপ।

পাছে উত্তেজিত হইলে আবার তাহার চক্ষে সেই কটাক্ষ ফিরিয়া আসে, সেই ভয়ে তাহাকে নিরস্ত করিবার জন্য বলিলাম—হ্যাঁ! হ্যাঁ! জানি নারীহত্যা!

সে বলিল—হ্যাঁ! নারী হত্যা! বড় যন্ত্রণা! বড় কষ্ট! বড় শাস্তি। বুঝেছ? ধরা পড়লে নয়—ধরা না পড়লে।

আমি বলিলাম—হ্যাঁ কবে ধরা পড়ি, সদাই সেই আশঙ্কা।

সে বলিল—না, না, সে ভয় আমার নেই। আমি উকীলের মুহুরী ছিলাম আইন বুঝি। কেবল তোমার সাক্ষীতে আমার ফাঁসি হ'বে না। জুরিরা 'বেনিফিট অফ ডাউট' দেবে। বিশেষ তুমি তখন 'টিপ্‌সি' ছিলে।

আমি বলিলাম—কে বল্‌লে?

সে বলিল—আমি খুন করেছি, বাঁচবার জন্যে সব কথার তোলাপাড়া করিনি? তোমার চোখ লাল ছিল—দৌড়াবার সময় এঁকে বেঁকে যাচ্ছিলে আর পায়ের দু'প্যাটী মোজা দু' রংয়ের ছিল।

শেষ কথাটা সত্য। ধন্য লোকটার পর্য্যবেক্ষণশক্তি! সে বলিল—ইংরাজের বিচারে আমার কোনও ভয় নেই। সে সব ঠিক করেছি। পনের দিন ভেবে চিন্তে সব দিক্ ঠিক্ ক'রে তবে খুন করেছি। তারপর ভেবে দেখেছি, কোনও প্রমাণ নেই। কেবল পা বেরিয়ে পড়েছিল। খুনের পর বে-এক্তার হ'য়েছিলাম, পাগল হয়েছিলাম। কিন্তু মনের বিচার বড় বিশ্রী। মনের আদালতের শাস্তি বড় ভীষণ! উঃ!

লোকটা বক্ষে হাত দিয়া চক্ষু মুদিয়া মুখের মাংসপেশীগুলার সঙ্কোচন করিল। আমি শূল-বেদনার রোগী দেখিয়াছি, লোককে মৃত্যু-যন্ত্রণায় অধীর হইতে দেখিয়াছি, একবার এক ব্যক্তিকে সর্পাঘাতে মরিতে দেখিয়াছিলাম; কিন্তু এত যন্ত্রণাভোগ করিতে কাহাকেও দেখি নাই। বাস্তবিক আমার দয়া হইল। তাহাকে পাপী বলিয়া আর ঘৃণা করিতে পারিলাম না, তাপী বলিয়া তাহার উপর সহানুভূতি হইল। তাহাকে বলিলাম—তুমি যেখানে ইচ্ছা যাও, তোমায় ধর্‌ব না।

সে বলিল—তা' হবে না। আগে শোন। তার পর পুলিশের হাতে দাও। তোমায় কেন শোনাচ্ছি জান?

আমি অন্যমনে বলিলাম—কেন?

সে বলিল—তুমি যদি আমার সমস্ত ইতিহাসটা বল্‌তে পার জুরিরা তোমায় বিশ্বাস করবে। তোমার কাছে যে দোষ স্বীকার করছি এ কথা তোমার এজাহারকে জোর করবে। যদি তখন হাকিমের কাছে বলি আমি নির্দ্দোষ, আমার আর বাঁচবার, আর পেছোবার উপায় থাকবে না। বুঝলে?

আমি তখন বিশেষ কিছু বুঝি নাই, অন্যমনে বলিলাম—হ্যাঁ।

সে বলিল তবে শোন।

(৭)

"গল্পটা পুরাতন—যেমন নাটক-নভেলে পড়। প্রেমে সন্দেহ করে প্রণয়িণীর গলা টিপে মারা। কিন্তু একটু রকম আছে। আমার পক্ষে পুরাতন গল্প বলার শাস্তি আছে।"

তাহার পর লোকটা তাহার কাহিনী বিবৃত করিল। লোকটা দেশে উকীলের মুহুরী ছিল। আমার মত সময়ে সময়ে একটু আধটু সুরাদেবীর, সেবা করিত। তাহার বাটীর পার্শ্বে একজন জমিদারের নায়েবের সুন্দরী স্ত্রী ছিল। [illegible] তাহার প্রেমে পড়িয়া তাহাকে লইয়া দেশ হইতে কলিকাতায় পলাইয়া

আসে। লোকলজ্জার ভয়ে সুন্দরীর আত্মীয়েরা তাহার কোনও খোঁজ-খবর রাখে নাই। পাঁচ বৎসর সে রমণীটিকে কলিকাতায় পত্নীর মত নানাস্থানে রাখিয়াছিল। সে নিজে এখানে দালালী করিয়া উভয়ের ব্যয়নির্ব্বাহ করিত।

অবশ্য এই অবধি বলিতে তাহার প্রায় এক ঘণ্টা লাগিয়াছিল। প্রথমে সে পরস্ত্রী লইয়া পলায়ন করা পাপ বিবেচনা করিত। কিন্তু তাহার প্রাণে দিন দিন প্রেম বাড়িতেছিল। তখন তাহার বয়স মাত্র তেইশ বছর। তাহার কথা কিছু কিছু মনে আছে। সে বলিয়াছিল—কি করব? মন প্রবোধ মানে না। যত তা'কে ভুলতে চেষ্টা করতাম, তত তার চেহারা তার মধুর মূর্ত্তি তার হাত পা নাক চোক আমার মনের মধ্যে ভেসে উঠত, আমাকে উন্মত্ত করত, আমাকে কর্ত্তব্য ভুলাত, সংসার ভুলাত, সংসারকে স্বর্গ জ্ঞান করাত। দিন দিন তার চক্ষে উৎসাহ পেতাম, সে চোখের ইঙ্গিতে জানাত যে, আমার পূজা নিতে সে অসম্মত নয়। তখন তারে দেখ্‌তে পেলে কি উল্লাস বোধ করতাম, যদি কখনও প্রেমে পড়ে থাক বুঝবে। তার কণ্ঠস্বর শুনলে প্রাণ চম্‌কে উঠ্‌ত। এক দেওয়ালে বাস—তার গহনার আওয়াজে শিহরে উঠতাম. তার নূতন কাপড়ের খস্‌ খস্‌ শব্দ শুন্‌লে প্রাণ নেচে উঠ্‌ত। ওঃ কি সুখ!

এই রকম আবেগের ভাষায় সে তাহার গল্প বলিয়াছিল। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত তাহার কথা শুনিতেছিলাম। এক একবার মনে হইতেছিল, লোকটা পাগল।

সে পাঁচ বৎসর বেশ সুখে কলিকাতায় বাস করিল। শেষে একটা যুবকের উপর তাহার সন্দেহ হইল। সেই পুরাতন গল্প। তাহার পর সে স্বচক্ষে রমণীকে ব্যভিচার করিতে দেখিল।

সেই দিন হইতে সে প্রতিহিংসার কথা ভাবিতে লাগিল। লোকটা ভাব-প্রবণ, ঠিক করিল যে রমণীকে হত্যা করিবে। কিরূপে হত্যা করিলে পুলিশের হাত হইতে রক্ষা পাইবে, সে সেই চেষ্টা করিতে লাগিল। রমণীকে জানাইল না যে, সে তাহার কপটতা বুঝিয়াছে। সে প্রকাশ্যভাবে প্রচার করিল যে দেশে যাইতেছে। রমণীকে লইয়া একটা খালি বাড়িতে আনিয়া গলা টিপিয়া মারিল।

আমি বলিলাম - একটু চেষ্টা করলে তো সেই লোকটা তোমায় ধরাতে পারে।

সে বলিল—অসম্ভব। আমি সত্য সত্য ষ্টেসন অবধি গাড়ি করিয়া গিয়াম! সে লোকটা দূর হইতে দেখেছিল, মোহিনীও তাকে দেখেছিল। পর ষ্টেশন থেকে রাত্রি দশটার সময় মোহিনীকে হাঁটিয়ে সার্কুলার রোডের খালি বাড়ীটাতে এনেছিলাম। সেই খানে তাকে মেরে চার দিন পরে

বাড়ি ফিরে গিয়েছিলাম, সেখানকার লোকের কোনও সন্দেহ হয় নি, দেশের লোক তো খোঁজ খবর রাখে না। এ সব ভেবে ভেবে ঠিক করে রেখেছিলাম!

আমি খানিকক্ষণ স্থির হইয়া রহিলাম। অভাগিনী মোহিনীর কথা ভাবিয়া দুঃখিত হইলাম। লোকটার মুখ দেখিয়াও দুঃখিত হইলাম। লোকটা কষ্টে কাঁপিতেছিল, মুখ বিকৃত করিতেছিল। আমি ভাবিতেছিলাম এইবার শেষ করি।

সে বলিল—কি জান? প্রথম থেকেই অনুতাপ, ভয়, বিস্ময়, মর্ম্মদাহ সব রকম হ'য়েছিল।

তাহার চক্ষু সেই রকম হইল। সে বলিতে লাগিল—প্রথমটা বুঝি নাই। তা'কে মেরে বুঝেছিলাম। যে রমণী তার নিজের স্বামীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল—সে উপপতির কাছে বিশ্বাসঘাতিনী কেন না হবে? আমার কি ক্ষমতা তাকে মারি? কেনই বা মেরেছিলাম? আমি যে পথ দেখিয়েছিলেম, সেই পথে এ গিয়েছিল বলে? হা! হা! হা! গুরুমারা-বিদ্যা! তার জন্যে নারীহত্যা! তার জন্যে এত জ্বালা! এত অগ্নি! এত কষ্ট! উঃ! কি যন্ত্রণা! তখন কেন সুবুদ্ধি হয়নি। এখন কেন দগ্ধ হচ্ছি? ছেড়ে দিয়ে তেড়ে ধরা? উঃ!

লোকটা দাঁতে দাঁতে ঘসিতে লাগিল, কড়্ কড়্ করিয়া শব্দ করিতে লাগিল। তাহার মুখের মাংসপেশীগুলা এক ভীষণ ভাবে মোচড় খাইতে লাগিল। শিরাগুলা ফুলিয়া উঠিল। লোকটা কাঁপিতে লাগিল।

সে বলিতে লাগিল—উঃ! কি শাস্তি! কি যন্ত্রণা! ভগবান্!

পরক্ষণেই তাহার দৃষ্টি সরল হইল। মুখের সাধারণ আকার ফিরিয়া আসিল। লোকটা শান্ত হইল। অন্য মনে বলিল—ভগবান্! হরি! সেই দিনের পর এই নাম প্রথম করলাম। হ্যাঁ খুন ক'রে আবার ভগবান, হরি! যেন একটু শান্তি এল! যেন আগুনের ঝলকার তাত একটু কম্‌ল। হয়ত অনুতাপ করতে করতে—

সে নিজের মনে বকিতেছে, দূরে দেখিলাম স্বয়ং মাণিকতলার সব্-ইন্‌স্‌পেক্টর একটী বন্ধুর সঙ্গে বেড়াইতে বেড়াইতে আমার দিকে আসিতেছে। আমার প্রাণের ভিতর তুমুল ঝড় উঠিল—লোকটাকে কোন্ আদালতের হাতে দেওয়া কর্ত্তব্য—ইংরাজের না বিবেকের? সে নিজের মনে বলিতে লাগিল—বড় জ্বালা বড় কষ্ট! কিন্তু কষ্টে তো ভগবানের নাম আমার মুখ দিয়ে বার হ'ল। আমার মুখে তাঁর নাম! পাপীর মুখে—হ্যাঁ আশ্চর্য্য! না ধরিয়ে দিন।

ঠিক সেই সময় নবীন বাবু আমাদের নিকট দিয়া চলিয়া গেলেন। পাঁচ

হাতের ভিতর দিয়া! আমি হতভম্ব হইলাম। সে বলিল—না শেষ হ'ক চলুন।

সে উঠিল। মন্ত্রমুগ্ধের মত আমিও উঠিলাম। সে বলিল—বেশ শেষ হ'ক। উঃ দিনরাত মিনিটে মিনিটে ফাঁসি। একবার ফাঁসি—কিন্তু—

আমি বলিলাম—কিন্তু কেন?

সে বলিল—প্রাণ তো একটা গেছে। কিন্তু আমি কি লোকের সেবা করে পৃথিবীর উপকার করতে পারব না? প্রায়শ্চিত্ত কি নাই? যদি ভগবান——আবার সেই নাম—একটু যেন শান্তি পাচ্চি। ঠিক করেছি—বাঁচব, জ্বলব, পুড়ব—বাঁচাও।

সে আমার পায়ে পড়িল বলিল—প্রাণ ভিক্ষা দাও। জ্বলতে দাও। যখন খুনীর মুখে তাঁর নাম বেরিয়েছে তখন কি যেন মনে হচ্চে। বাঁচব। প্রাণ ভিক্ষা দাও। জ্বলতে দাও। পুড়্‌তে দাও। অনুতাপ করতে দাও।

আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত বলিলাম—যাও। ভগবানের আদালতে—

লোকটা আমার মুখের দিকে চাহিল না। চলিয়া গেল। ইন্‌স্‌পেক্টরের পাশ দিয়া চলিয়া গেল। আমি খানিকক্ষণ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। তাহার পর বাড়ী গেলাম। কি করিলাম বুঝিলাম না। বাড়ী আসিয়া আধ বোতল হুইস্কি পান করিয়া অকাতরে নিদ্রা গেলাম।

(৮)

আবার সেই বাগান—যে বাগান হইতে ফিরিবার সময় সেই কটাক্ষ দেখিয়াছিলাম। তখন যেমন শীত, এখন তেমনই রৌদ্রের উত্তাপ। সমস্ত দিন ঘরের ভিতর আবদ্ধ ছিলাম। ঘরের ভিতর কিরূপ আমোদ হইতেছিল, তাহা বলিয়া বাঙ্গালী বাবু-সমাজের "আমোদে"র পরিচয় দিতে চাহি না। গান হইতেছিল—কি কণ্ঠে তাহা শুনিয়া কাজ নাই। তৃষ্ণা নিবারণ করিবার সময় কি পান করিতেছিলাম—সে কথাও বলিব না। তখন কিন্তু আমাদের মনে হয় না "আমোদ" বা "স্ফূর্ত্তির"র নামে কিরূপ পাশবিকতার প্রশ্রয় দিই।

সন্ধ্যার সময় সকলে বাহির হইয়া সুবৃহৎ প্রমোদ-উদ্যানের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। কয়েকজন পুষ্করিণীর বাঁধা ঘাটে বসিয়া ছিল, দুই চারিজন গানের লতাবিতানে কোমল বৃত্তির প্রসার করিতেছিল, এক জন উকীল নেশায় জ্ঞানহীন হইয়া মার্ব্বেল বারান্দায় শুইয়াছিল, একজন তাহার কে বরফ ঘসিতেছিল। আমি একেলা ঘাসের উপর শুইয়াছিলাম।

আমার এ জীবন ভাল লাগিত না, অথচ অভ্যাসদোষে ইহাদের সঙ্গ ত্যাগ করিতে পারিতাম না।

দুই জন বন্ধু বাহিরে গিয়াছিল। তাহারা ফিরিবার সময় একটা গেরুয়া বস্ত্রপরিহিত "সাধু" ধরিয়া আনিয়াছিল। ঘাটের ধারে তাহারা তাহাকে লইয়া খুব হাসিতেছিল। সকলেই তাহার সম্মুখে হাত পাতিয়া দিতেছিল, সকলেই তাহাকে ভাগ্যপরীক্ষা করিতে অনুরোধ করিতেছিল। সাধুটী বলিতে-ছিল—আমি ভিখারী মানুষ ও সব জানি না।

একটা নূতন রকম আনন্দ হইতেছে দেখিয়া আমি সে স্থলে উঠিয়া গেলাম। সাধুর চক্ষে আমার চক্ষু মিলিত হইল। সর্ব্বনাশ—সে!

বন্ধুদিগের নিকট হইতে বহু কষ্টে তাহাকে আমার ঘাসের বিছানায় লইয়া আসিলাম। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—এ কি?

সে বলিল—চেষ্টা করছি। জ্বালা কমবার নয়। কিন্তু একটু যেন শান্তি পাই। সে কথা মনে হ'লেই কেবল হরিনাম জপ করি, এতে একটু যেন কমেছে কিন্তু—

লোকটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। আমি ঘাসের উপর বামপার্শ্বে ভর দিয়া শুইয়াছিলাম। সে আমার সম্মুখে বসিয়াছিল। আমি তাহাকে বলিলাম—বেশ ত যদি হরিনাম ক'রে সুখ হয়—

তাহার মুখের দিকে চাহিলাম। সে অন্যমনস্কভাবে আমার পিছনে তাকা-ইয়া ছিল। এবার তাহার চক্ষের আর এক রকম ভাব—যেন সভয়ে একটা বিভীষিকা দেখিতেছে। হঠাৎ সে আমার কাঁধের উপর শুইয়া পড়িয়া পিছনে যেন কাহাকে ধরিল। ইঞ্জিনের বাঁশীর মত একটা শব্দ হইল। আমি সভয়ে পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিলাম। কি সর্ব্বনাশ! লোকটা বজ্রমুষ্টিতে একটা বিষধর গোখুরা সাপের গলা টিপিয়া ধরিয়াছে—সাপটা মুখব্যাদান করিয়া জিহ্বা বাহির করিতেছে আর সমস্ত শরীরটা তাহার হাতে জড়াইতেছে।

ভয়ে আমার অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল। সে বলিল—ভয় নেই। ফণা ধ'রে পিছন দিকে হেলে না প'ড়ে সাপে কামড়ায় না। যখন দেখলাম খুব হেলে জোর নিয়েছে, ঠিক তখন—ফেরবার মুখে ধরে ফেলেছি।

আমি নিমেষে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিলাম। মাথা ঘুরিতেছিল। তাহাকে বলিলাম—আজ আপনি আমার প্রাণ—

সে বলিল—আপনি আমার প্রাণটা রেখেছিলেন বলেই ত। এইটা

নিয়ে তিনটে হ'ল। পোড়া ঘর থেকে একটা ছেলেকে সে দিন টেনে বার করেছিলাম, আর এক দিন একটা বুড়ীকে জল থেকে তুলেছিলাম, আর আজ এইটা। এই হাত দিয়ে তিনি একটা প্রাণ নিয়েছেন, তিনটে বাঁচিয়েছেন—তবু এত শাস্তি, এত যন্ত্রণা—উঃ কি ভীষণ—

আমার বন্ধুবর্গ তাড়াতাড়ি আসিয়া পড়িল। সকলে তাহাকে ঘেরিয়া ধরিল। তখনি চাঁদা তুলিয়া তাহারা তাহাকে পাঁচ শত টাকা দিতে সম্মত হইল। কেহ তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিল, সেই সাপটার জাতি জিজ্ঞাসা করিল। কিন্তু সকলেই তাহার নিকট কৃতজ্ঞ, সকলেই তাহাকে মূর্ত্তিমান্ দেবতা মনে করিল।

সে বলিল—আচ্ছা সব কথার জবাব দ'ব আগে সাপটাকে ফেলে দিয়ে আসি।

অবশ্য সে পলাইল। আর বাগানে ফিরিল না।

আমি কিন্তু অবসর পাইলেই তাহার সেই কথাটা লইয়া আন্দোলন করি—যে হস্তে তিনি একটা প্রাণ লইয়াছেন সেই হস্ত দিয়া তিনটা প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন। কেন? এ কথার উত্তর পাই না। যখন কোনও উত্তর ঠিক করিতে না পারি, তখন মনকে প্রবোধ দিয়া বলি—লীলাময়ের লীলা।

ঢাকার ইতিহাস।*

[সমালোচনা]

[লেখক—শ্রীননীগোপাল মজুমদার।]

বাঙ্গালার অনেক জেলার ইতিহাস লিখিত হইয়াছে। এই সকল প্রাদেশিক ইতিহাসের অধিকাংশই 'গেজেটিয়রে'র চর্ব্বিত-চর্ব্বণ অথবা ভিত্তিহীন, অশ্রদ্ধেয় এবং অবিশ্বাস্য প্রবাদকিম্বদন্তীর সমাবেশমাত্র। ইহাদের গ্রন্থকারগণ ইতিহাস কাহাকে বলে তাহা জানেন না, কি করিয়া ইতিহাসের প্রকৃত উপাদান সংগৃহীত হইতে পারে, তাহা শিক্ষা করেন না এবং কোন্ পদ্ধতি

* দ্বিতীয় খণ্ড। শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায় প্রণীত। মূল্য ২॥০ টাকা মাত্র।

অনুসরণ করিলে এই সকল বিক্ষিপ্ত-উপাদান একত্র সংযোজিত হইয়া অতীতের যথার্থ চিত্রস্বরূপ হইয়া উঠে, তাহাও তাঁহারা অবগত নহেন। বাঙ্গালাদেশের অবৈজ্ঞানিক জনসঙ্ঘের নিকট ইঁহারা প্রকাণ্ড ঐতিহাসিক বলিয়া বিবেচিত হইলেও যথার্থ—ঐতিহাসিকপদবাচ্য ইঁহারা নহেন। অবশ্য সমস্ত প্রাদেশিক ইতিহাসের রচয়িতৃগণ এই শ্রেণীর অন্তর্গত নহেন, তথাপি অধিকাংশই যে, এই শ্রেণীর অন্তর্গত তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় প্রণীত "ঢাকার ইতিহাস" নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ অভিনিবেশসহকারে যিনিই পাঠ করিবেন, তিনিই সর্ব্বপ্রথম লক্ষ্য করিবেন যে, যে শ্রেণীর প্রাদেশিক ইতিহাস সাধারণতঃ বঙ্গীয় লেখকগণ লিখিয়া থাকেন, বর্ত্তমানগ্রন্থ সে শ্রেণীর অন্তর্গত নহে। এরূপ প্রাদেশিক ইতিহাস কখনও পড়ি নাই। কিরূপ শ্রমস্বীকার করিলে বর্ত্তমানগ্রন্থ রচিত হইবার সম্ভাবনা তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। বিন্দু বিন্দু করিয়া প্রাচীন ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করিয়া গৌড়বঙ্গের অতীতযুগকে যিনি আমাদের সমক্ষে উপস্থাপিত করিয়াছেন, তিনি সমগ্র বঙ্গবাসীর কৃতজ্ঞতার পাত্র।

পূর্ব্ববঙ্গের বর্ম্ম-চন্দ্র ও খড়্গ-রাজবংশের কথা আমরা বিস্মৃত হইয়াছি। বাঙ্গালীর সেই গৌরবের যুগ হইতে আমরা চিরদিনের জন্য নির্ব্বাসিত হইয়াছি। যে সকল উপাদান হইতে সেই বিগত যুগের আভাস ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার যথাযথ বর্ণনা "ঢাকার ইতিহাসে" দেখিতে পাওয়া যায়। যে সমতট-রাজ্যের ইতিহাস লইয়া বাঙ্গালাদেশের ঐতিহাসিক সম্প্রদায়ে এত বিসম্বাদ উপস্থিত হইয়াছিল, যে শ্রীবিক্রমপুরের গৌরবশ্রী বাঙ্গালার কোনও কোনও ঐতিহাসিক মুছিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, সেই সমতট এবং তাহার মধ্যমণিরূপ বিক্রমপুরের প্রায় যাবতীয় তথ্য পাঠক আলোচ্য পুস্তকে প্রাপ্ত হইবেন। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ ও শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় যে বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীর অনুসরণ করিয়া 'গৌড়রাজমালা' এবং "বাঙ্গালার ইতিহাস" রচনা করিয়াছেন, 'ঢাকার ইতিহাসে'র সর্ব্বত্র ইতিহাস-রচনার সেই বৈজ্ঞানিক প্রণালী অক্ষুণ্ণ দেখিতে পাই।

লেখক আপনার পূর্ব্বসংস্কার ও মতামত উপেক্ষা করিয়া বিচারবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া যাহা সত্য বলিয়া জ্ঞান করিয়াছেন তাহাই সত্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। অযথা পক্ষপাতিত্ব-দোষে তাঁহার গ্রন্থ কলঙ্কিত নহে। প্রাচীন

কাল হইতে সেনরাজত্ব পর্য্যন্ত ঢাকার ইতিহাসের যত উপাদান আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই "ঢাকার ইতিহাসে" বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। যাঁহারা বাঙ্গালার প্রাদেশিক ইতিহাস রচনা করেন, এ গ্রন্থ ত তাঁহাদের আদর্শ হইবেই, উপরন্তু যাঁহারা সমগ্র বাঙ্গালার ইতিহাস-রচনায় প্রয়াসী, তাঁহারাও এ গ্রন্থ পাঠ করিয়া বিশেষ উপকৃত হইবেন। গ্রন্থমধ্যে অনেক অপ্রকাশিত-পূর্ব্ব চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা হইতে পূর্ব্ববঙ্গের ভাস্কর্য্যশিল্পের স্বরূপ অনেকাংশে উপলব্ধি হইতে পারে।

আলোচ্য গ্রন্থে অধিকাংশ বিষয়ই যোগ্যতার সহিত আলোচিত হইয়াছে, তবে উক্ত গ্রন্থ দোষশূন্য বলিয়া কথিত হইতে পারে না। গ্রন্থের স্থানে স্থানে কয়েকটী ত্রুটী লক্ষ্য করিলাম, তাহার উল্লেখ আবশ্যক। "ঢাকার ইতিহাস"-রচয়িতা লিখিতেছেন. "অশোকাবদান গ্রন্থে লিখিত আছে যে, মৌর্য্যসম্রাট অশোক ৮৪০০০ ধর্ম্মরাজিকো প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছেন। ঢাকা জেলার অন্তর্গত ধামরাই গ্রাম যে উক্ত ধর্ম্মরাজিকার অন্যতম একটী তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। প্রাচীন দলিলাদিতে ধামরাই ধর্ম্মরাজি বলিয়া উক্ত হইয়াছে।" [পৃঃ ২০] কিন্তু এরূপ সিদ্ধান্ত করা সমুচিত নহে। প্রথমতঃ অশোক যে বহুসংখ্যক ধর্ম্মরাজিকার প্রতিষ্ঠা করেন, তাহার প্রমাণ আছে, কিন্তু তাই বলিয়া গ্রামের নাম 'ধর্ম্মরাজিকা' বা 'ধর্ম্মরাজি' হইলেই, উক্ত গ্রামে অশোক ধর্ম্মরাজিকা প্রতিষ্ঠা করেন, ঈদৃশ অনুমান অসঙ্গত, যেহেতু তাঁহার ন্যায় অন্য কোনও বৌদ্ধ নরপতিও সেই গ্রামে 'ধর্ম্মরাজিকা' প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ শব্দের ধ্বনিগত ঐক্যের উপর নির্ভর করিয়া কোনও সিদ্ধান্ত করা বিজ্ঞান-সম্মত নহে; ধর্ম্মরাজি বা ধামরাই 'ধর্ম্মরাজিকা' সমরূপক হইলেও উক্তগ্রাম যে কোনও বৌদ্ধ ধর্ম্মরাজিকার স্মৃতি জাগাইয়া তুলিতেছে, তাহার প্রমাণ নাই। ধামরাই গ্রামের অনতিদূরে শাকাসর নামক স্থানে যে, স্তূপাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা বৌদ্ধযুগের নিদর্শন হইতে পারে; কিন্তু উহা যে মৌর্য্যরাজ অশোকের কীর্ত্তিচিহ্ন তাহা প্রমাণাভাবে স্বীকার করা যায় না।

তৃতীয় অধ্যায়ের এক স্থলে (পৃঃ ৫৩) যতীন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন, "কুমার গুপ্তের পুত্র রাজশ্রী দামোদর গুপ্ত; * * * * তাঁহার পুত্রের নাম মহাসেন গুপ্ত, ইনিও মৌখরিরাজ সুস্থিতবর্ম্মাকে পরাজয় করিয়া জয়শ্রী অর্জ্জন করিয়াছিলেন।" অফসড় গ্রামে আবিষ্কৃত আদিত্যসেনের প্রশস্তিতে *

* Fleet's Gupta Inscriptions, p. 203.

সুস্থিতবর্ম্মার নাম আছে, কিন্তু তিনি যে মৌখরিবংশজাত তাহার উল্লেখ নাই। ফ্লিট অনুমান করিয়াছিলেন যে, সুস্থিতবর্ম্মা মৌখরবংশে জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু নিধানপুরে আবিষ্কৃত ভাস্করবর্ম্মার তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইবার পর জানা গিয়াছে সুস্থিতবর্ম্মা কামরূপের বর্ম্মরাজবংশোদ্ভব †—মৌখরী নহেন। সম্ভবতঃ ফ্লিটের গ্রন্থোক্ত অনুমানের উপর নির্ভর করিয়াই যতীন্দ্র বাবু এই ভুল করিয়াছেন।

"ঢাকার ইতিহাসে" ডবাকরাজ্যের অবস্থিতি-নির্ণয়ের চেষ্টা করা হইয়াছে, কিন্তু এতদ্‌সম্বন্ধে যে মত সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক তাহার উল্লেখ করা হয় নাই। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল জেরিনি (Col. Gerini) দেখাইয়াছেন, ডবাকরাজ্য বর্ত্তমান উত্তর ব্রহ্ম। এই প্রদেশে গুপ্ত সম্বতের ১৬৩ মানাঙ্কযুক্ত একখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ‡

পণ্ডিতবর ফুসে (A. Foucher) সমতট প্রদেশের তিনটি বৌদ্ধমূর্ত্তির চিত্রের বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত "অষ্ট-সাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা" নামক একখানি সহস্রবর্ষের পুরাতন পুঁথিতে উক্ত তিনখানি চিত্র আবিষ্কৃত হইয়াছিল।¶ সমতটের কথা-প্রসঙ্গে যতীনবাবু উল্লিখিত দুইখানি চিত্রের একেবারেই উল্লেখ করেন নাই।

বোধগয়ায় আবিষ্কৃত বীর্য্যেন্দ্রভদ্রের শিলালিপি স্বর্গগত ডাক্তার ব্লক (Theodore Bloch) প্রকাশ করেন। § কিন্তু তিনি উক্ত লিপির তৃতীয় পঙ্‌ক্তিতে উৎকীর্ণ "বীর্য্যেন্দ্রভদ্রস্য" স্থানে কেবল "বীর্য্যেন্দ্রস্য" পাঠ করিয়াছিলেন। ‖ "ঢাকার ইতিহাসে" (পৃঃ ৪৯৭, পাদটীকা) (৩) 'বীর্য্যেন্দ্রস্য' পাঠই রক্ষিত হইয়াছে। কিছু কাল পূর্ব্বে বোধগয়ায় আবিষ্কৃত উক্ত শিলালিপির প্রতিলিপির (Facsimile) সহিত ব্লকের উদ্ধৃত পাঠ মিলাইতে গিয়া তাঁহার

* Ibid. p. 14, Introduction.

† Epigraphica Indica, vol. XII, p. 69.

‡ Researches on Ptolemy's Geography of Eastern Asia, 1909, pp. 55—61.

¶ Etude Sur L' Iconographic Buddhique De L' Inde 1900, pp. 192, 200, 210.

§ Annual Report of the Archælogical Survey of India, 1908-9, pp. 157-8.

‖ Ibid. p. 158.

এই চ্যুতি লক্ষ্য করিয়াছিলাম। এই লিপি-সম্বন্ধে আমার একটি প্রবন্ধ শীঘ্রই "বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা"য় মুদ্রিত হইতেছে। যতীনবাবু বোধগয়ার লিপির প্রতিলিপি দেখিলে কখনই এই ভ্রম করিতেন না। আশা করি, উহা পরবর্ত্তী সংস্করণে সংশোধিত হইবে।

শ্রীযুক্ত যতীনবাবু বিক্রমপুর-সংক্রান্ত প্রায় যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু একটি বিষয়ের উল্লেখ তাঁহার "ঢাকার ইতিহাসে" দৃষ্ট হইল না। স্বর্গীয় ফরাসী পণ্ডিত কর্দ্দেয়ার [P. Cordier] ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে তিব্বতীয় পুঁথিসমূহের যে তালিকা রচনা করেন তাহাতে দেখিতে পাই, অবধূত কুমারচন্দ্র নামে একজন লেখক বঙ্গদেশের বিক্রমপুরবিহারে বসিয়া 'কৃষ্ণযমারিতন্ত্রে'র 'রত্নাবলী' নামে এক পঞ্জিকা লিখিয়াছিলেন। * "ঢাকার ইতিহাসে" ইহার উল্লেখ নাই। বিক্রমপুরের ইতিহাসে ইহা অভিনব বস্তু বলিয়া কথিত হইতে পারে।

"ঢাকার ইতিহাসে"র যে দুই একটি ত্রুটী দেখাইলাম সেরূপ ত্রুটী প্রায় সকল ইতিহাস-গ্রন্থেই অল্পবিস্তর লক্ষিত হয়, তাহা বিশেষ অগৌরবের বিষয় বলিয়া মনে করি না। গ্রন্থের গুণ এত অধিক যে, তাহাতে অভিভূত হইয়া সামান্য দোষ-ত্রুটী ভুলিয়া যাইতে হয়। সেনরাজবংশের ইতিহাস, সমতটবঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তার ও তৎপ্রদেশের শাসনতন্ত্র প্রভৃতির কথা লেখক অতি মনোজ্ঞভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন। এই গ্রন্থের বিশেষত্ব এই যে, লেখক যে যে স্থলে পরস্ব মতের উল্লেখ করিয়াছেন সেই সেই স্থলের পাদটীকায়, যে গ্রন্থ হইতে উহা গৃহীত সেই গ্রন্থের নাম ও পত্রাঙ্ক পর্য্যন্ত উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাতে গ্রন্থের মূল্য যে কি পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। লেখক বহু আয়াস স্বীকার করিয়া এই মূল্যবান্ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, প্রভূত ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ের সহিত তাঁহাকে গ্রন্থের উপাদান সংগ্রহ করিতে হইয়াছে, আশা করি সুধীসমাজে তাঁহার গ্রন্থ যথোচিত সমাদর লাভ করিবে।

* Catalogue Du Fonde Tibetain De La Bibliothique Nationale, Paris, 1908 II. partic——p. 160.

এ মাসের প্রশ্নোত্তর।

'অর্চ্চনা'র কোনও পাঠক আমাদের নিকট দুইটী প্রশ্ন করিয়া পাঠাইয়াছেন। আমরা যথা-সাধ্য তাহার উত্তর দিতে চেষ্টা করিলাম।

প্রশ্ন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যে সকল ইউরোপীয় বাঙ্গালা ভাষায় পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের ও তাঁহাদের রচিত গ্রন্থগুলির নাম কি?

উত্তর।

১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার গিলক্রাইষ্ট ঈসপের গল্প বাঙ্গালায় অনুবাদিত করেন।

১৮১৯ ,, ফেলিক্স কেরী নামক এক ইংরেজ গোল্ডস্মিথ-প্রণীত ইংলণ্ডের ইতিহাস বাঙ্গালায় অনুবাদিত করেন।

১৮২০ খৃষ্টাব্দে ক্যাপ্তেন ষ্টুয়ার্ট "উপদেশ কথা" অর্থাৎ ঐতিহাসিক নাতিশিল্পনামক বাঙ্গালা গ্রন্থের রচনা ও প্রচার করেন।

১৮৩১ খৃষ্টাব্দে মার্শম্যান বাঙ্গালা ভাষায় দুই খণ্ড ভারতের ইতিহাস প্রকাশিত করেন।

১৮৩২ ,, রবিনসন সাহেবের "ঐতিহাসিক ব্যাকরণ" মুদ্রিত হয়।

১৮৩৩ ,, মার্শম্যানের "পুরাবৃত্ত সংক্ষেপ" নামক বাঙ্গালা পুস্তক বাহির হয়।

১৮৩৪ ,, "ঈশপের গল্প" নামক একখানি পুস্তক বাহির হয়; ইহার রচয়িতাও মার্শম্যান।

১৮৩৬ ,, পাদ্রী নর্টনের "দানিয়েল চরিত্র" এবং ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে পাদ্রী পিনকের বাই-বেলের ইতিহাসের বঙ্গানুবাদ—"কালক্রমিক ইতিহাস" রচিত হয়।

মালদহ জেলার নীলকর ইলার্টনের "গুরু শিক্ষা" ও চুঁচুড়ার পিয়ার্‌সনের "বাক্যাবলী" নামক পুস্তক দুইটীও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রচিত হইয়াছিল।

প্রশ্ন।

বিদেশজাত দ্রব্যাদি ব্যবহার-সম্বন্ধে সাহিত্য-গুরু বঙ্কিমচন্দ্র বহিষ্কার-নীতির (*boycott*) সমর্থন করিয়াছিলেন কি না?

উত্তর।

আমার যতদূর স্মরণ হয়, বঙ্কিমচন্দ্র বয়কট বা বহিষ্কার-নীতির পক্ষপাতী ছিলেন; কিন্তু তাহা লইয়া বাড়াবাড়ি করা দেখিতে পারিতেন না। বাঙ্গালার বস্ত্র-শিল্পের শোচনীয় অধঃপতন ও দুরবস্থা দেখিয়া তিনি "বঙ্গদর্শনে" একবার লিখিয়াছিলেন :—"আমরা ম্যাঞ্চেষ্টারের দ্রব্য কিনিব না, ব্যবহার করিব না—এই প্রতিজ্ঞা যদি করি এবং তাহা রক্ষা করি, তাহা হইলে আমাদের আর গবর্ণমেণ্টের নিকট এ বিষয়ে লিখিত দরখাস্ত করিতে হইবে না, মর্ম্মব্যথা পাইতে হইবে না; আপনার ইচ্ছার অধীন থাকিয়া, আপনার প্রতিজ্ঞার অধীন থাকিয়া * * * সুখ লাভ করিতে পারি।"

বঙ্কিমচন্দ্রের অপর কোনও রচনায় এ সম্বন্ধে কোনও অভিমত আমরা দেখিতে পাই নাই; কেহ জানেন ত 'অর্চ্চনা'য় লিখিয়া পাঠাইবেন।

শ্রীঅমূল্যচরণ সেন।

অভ্যাগত।

[লেখক—শ্রীঅপূর্ব্বমণি দত্ত]

(১)

দীর্ঘ কিছুদিনের জন্য একটু অবকাশ পাইলেই কর্ম্মক্লান্ত জীবনের মধ্যে একটু অবসরলাভ করা এবং পুণ্যভূমি ভারতের পুণ্যস্থানাদি দর্শন করিবার জন্য মনটা বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠে। নানা বাধা-বিঘ্নে এবার পূজায় আমার কোথাও যাওয়া হইল না। সুতরাং মামুলীভাবে পূজার দিন ক'টা কাটিতে লাগিল।

সেদিন মহাষ্টমী। বেলা প্রায় ১২টার সময় আহারাদি করিয়া খবরের কাগজটা হাতে করিয়া বাহিরের ঘরে একখানি আরাম কেদারায় অঙ্গভার রাখিয়া একাগ্রচিত্তে Wanted কলমটী পড়িতেছিলাম। যদিও প্রায় ১৭ বৎসর কাল গভর্ণমেণ্ট সার্ভিস করিতেছি, এবং অন্য কোন ভাল চাকুরী জুটিলেও এখন আর তাহা করিবার উপায় নাই, তথাপি Wanted এর কলমটী পড়া যেন যুদ্ধের টেলিগ্রাম পড়া অপেক্ষা অধিক অভ্যাসাধীন হইয়া পড়িয়াছে।

সম্মুখের দরজা খোলা ছিল, তাহা দিয়া দ্বিপ্রহর-রৌদ্র অবাধে গৃহমধ্যে আসিতেছিল। জনপূর্ণ কলিকাতার পথ তখন অনেকটা জনহীন হইয়াছিল।

সহসা সেই রৌদ্রে যেন কাহার ছায়া পড়িল। চমকিত হইয়া চাহিয়া দেখিলাম যে, দ্বার হাত দিয়া প্রায় ত্রিংশৎ বর্ষীয় বয়স্ক একব্যক্তি দণ্ডায়মান, তাহার পরিধানে একখানি আধ ময়লা কাপড়, গায়ে একখানি ফর্‌সা উড়ানি, পদদ্বয় নগ্ন, মস্তকের চুল অবিন্যস্ত।

আমি চাহিতেই লোকটা একটা নমস্কার করিয়া বলিল "বাবু, কাল রাত্তির থেকে কিছু খেতে পাই নি, দু'টী খেতে দেবেন?"

সন্দিগ্ধচিত্তে আবার তাহার দিকে চাহিয়া দেখিলাম। দেখিলাম, বেশ সুগঠিত দেহ, মাংসল ও তেজব্যঞ্জক। চক্ষু দু'টী যেন জ্বলিতেছে। ভয়ও একটু হইল। যেরূপ দিন কাল পড়িয়াছে, কোন ছদ্মবেশী ডাকাত নয় তো! সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম "বাবু তোমার নামটী কি?"

লোকটা খুব মৃদুস্বরে উত্তর করিল—"রামচরণ!"

"তোমরা?"

"কৈবর্ত্ত ! বাবু কৈবর্ত্ত !" বলিয়াই সে বসিয়া পড়িল।

আমার সন্দেহ ঘনীভূত হইতে লাগিল। বলিলাম "কেন বাপু! কিছুই খাওনি কেন ? কল্‌কাতা সহরে তো পয়সা থাকিলে খাবার ভাবনা থাকে না।"

"পয়সা কোথায় পাব বাবু ! খিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে, এখান দিয়ে যাচ্ছিলাম, কেবল আপনারই দরজা খোলা দেখলাম, আপনিও বসে রয়েছেন, কাজেই দুটো ভাত চেয়েছি। আমরা ভিখারী নই বাবু, আমরা ভিখারী নই।"

লোকটীর নয়নকোণে অশ্রু দেখা দিল।

আমার বিস্ময় উত্তরোত্তর বাড়িতেছিল। জিজ্ঞাসা করিলাম "তুমি কি কর।"

"কিছুই না। কি আর করব মশাই। দুনিয়ায় করবার কি আছে। বাবু কি জমিদার ?"

আমি বলিলাম "না বাপু জমিদারী কোথায় পাব, এখানে একটা আফিসে চাকরি বাকরি করে কোনও রকমে সংসারটা চালাই এই মাত্র।"

"তবে দিন বাবু দুটো ভাত দিন। খেয়ে সব কথা বলব। না খেয়ে আর কথা কইতে পাচ্ছিনে।"

আমি ডাকিলাম "ছক্কন।"

"আগ্যে যাচ্ছে" বলিয়া চক্কন সিং প্রবেশ করিল। তাহার সিং উপাধিটী আমারই দত্ত। সে উপাধি যে তাহার সিংহের ন্যায় বিক্রম-দর্শনে দিয়াছিলাম তাহা নহে, সিংহের মতই তাহার শরীরটা সরু এবং কোমলতা বর্জ্জিত। শরীরে শক্তির এক কণামাত্রও ছিল না।"

তাহাকে বলিলাম ভেতরে গিয়ে তোর মাজিকে বল যে একটা আদমি আয়া, তাকে দুটো ভাত দিতে হবে।

সে বলিল "মাজিকা খাওয়া তো আবি হইয়ে গিয়ে হোবে।"

আমি একটু রাগবশতঃ বলিলাম "তুই যা না পাজী।

ছক্কন দাঁড়াইল। সে লোকটা তখন মাথায় হাত দিয়া বসিয়া আছে। তাহার দিকে ফিরিয়া ছক্কন বলিল "কা রে, তু কি চাস্, ভিক্কা ? আগুন হোবে না, হাত জোড়া আসে।"

"এই চুপ" বলিয়া দ্বার খুলিয়া আমিই বাড়ীর ভেতর যাইলাম, দেখি গৃহিণী তখন ঝিকে বাসনের চাকচিক্য বর্দ্ধিত করিবার গুপ্তমন্ত্রগুলি বলিয়া দিতেছিলেন।

আমি যাইয়াই বলিলাম "ওগো আজ মহাষ্টমীর দিন একটা পুণ্য করতে হবে"।

তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন "ও! সে তুমি জান কি না, আমি ঝির সঙ্গে ৮টার সময় ঘোষেদের বাড়ী গিয়ে অঞ্জলি দিয়ে এসেছি!"

"তা বেশ করেছ। একটী অতিথি এসেছে, দুদিন তার খাওয়া হয়নি, দুটি ভাত চায়, দিতে পার?"

এতখানি জিব কাটিয়া শ্রীমতী বলিলেন "একটু আগে বলতে হয়, প্রায় আধ হাঁড়ি ভাত ছিল, এখনও আধ ঘণ্টা হয় নি, তাতে জল দিয়ে এলুম।"

"বেশ বলেছো। আধ ঘণ্টা আগে তো সে আর আমাকে ভাত খাবে বলে টেলিগ্রাম করেনি। তা আচ্ছা, তাই সই, তাই বাড়, আমি বলে আসছি।"

"কে কোথাকার লোক" ইত্যাদি সকল কথা শুনিবার পূর্ব্বেই আমি আবার বহির্ব্বাটীতে আসিলাম। লোকটী তখনও মাথায় হাত দিয়া বসিয়া আছে।

আমি ডাকিলাম "রামচরণ।"

"আজ্ঞে।"

"বাপু আমরাতো জানিনে, ভাতে এইমাত্র জল দেওয়া হয়েছে, তুমি খাবে তো?"

"কেন খাবনা বাবু, আমরা ত জল দেওয়া ভাত খেয়েই মানুষ। বাবু কি ব্রাহ্মণ?"

"হ্যাঁ, আমার নাম শ্রীললিতকুমার মুখোপাধ্যায়।"

লোকটী তখন আমার পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিল। তাহার এইরূপ অতিভক্তি এবং অদ্ভুত হাবভাব দর্শনে বাস্তবিকই আমার সন্দেহ ঘনীভূত হইতেছিল। আবার ভাবিলাম, কোন ছদ্মবেশী ডাকাত নয় তো! এইরূপে কত ভিখারী সাধুসন্ন্যাসীর বেশে আসিয়া গৃহস্থের যথাসর্ব্বস্ব লইয়া পলায়ন করে, এরূপ অনেক ঘটনাই তো শুনিয়াছি।"

ঝি ডাকিল "বাবু ভাত দেওয়া হয়েছে।"

ছক্কন বসিয়া তামাক খাইতেছিল, তাহাকে বলিলাম "যারে ওকে নিয়ে গিয়ে খাইয়ে আন। কলতলার রকে যায়গা করে দিগে যা।"

"ও আপনে যাগা করিয়ে লেবে, চল রে চল, ওঠ ভাত বাড় হয়েছে" বলিয়া ছক্কন তাহাকে লইয়া গেল। আমি লোকটার অদ্ভুত প্রকৃতির কথা ভাবিতে লাগিলাম।

"ললিত আছ হা"

"আছি এসো"

প্রিয়বন্ধু শরৎ আসিল। তাহাকে দেখিয়া একটু সাহস হইল। কি জানি যদি হঠাৎ লোকটা ভোজালি টোজালি বাহির করিয়া বলে, দাও বাক্সের চাবি, নইলে এই ভোজালি—তখন শরৎ ছুটিয়া গিয়া থানায় খবর দিতেও ত পারিবে।

শরৎকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলাম। সমস্ত শুনিয়া সে বলিল, পাগল টাগল নয় তো?

আমি বলিলাম খেপেছো? পাগলের প নেই তার, তবে জোচ্চোর টোচ্চোর হ'তে পারে।

শরৎ বলিল "তা হতেও পারে ওই রকম চাদর গায়ে দেওয়া একটা লোক্ গোয়ালন্দে যাব পয়সা নেই, চাঁদা করে টিকিট কিনে দিন, এই সব বলে একবার শিয়ালদহ ষ্টেশনে আমার কাছ থেকে একটা আধুলি ঠকিয়ে নিয়েছিল। যাক্ খুব সাবধান। একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করিল এমন সময়ে লোকটা আসিয়া বলিল "বাঁচালেন বাবু আমাকে এই কলকাতার সহরে কে কাকে খেতে দেয় বাবু! তার উপর আমি অজানা অচেনা লোক। বাড়বৃদ্ধি হোক বাবু, ভগবান মঙ্গল করুন। ওঃ!"

বলিয়া লোকটা একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল।

শরৎ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়াছিল।

আমি বলিলাম কৈ, তুমি যে বলছিলে খেয়ে এসে আমাকে সব বলবে, কি এইবার বল দেখি শুনি। তোমার চেহারায় চালচলনে যেন বেশ ভাল লোক বলেই বোধ হচ্চে। কোথায় বাড়ী তোমার কলিকাতায় কে আছে?

শরৎ বলিল এখানে কদ্দিন এসেছো?

আমি আবার বলিলাম "এখন কোথায় যাবে মনে করেছো?"

এতগুলি প্রশ্ন যদি এক সঙ্গে আমাকে কেহ জিজ্ঞাসা করিত, তাহা হইলে বোধ হয় আমাকেও একটু বিচলিত হইতে হইত।

(২)

"সবই বলছি বাবু, আমার কথা যে রাবণের চিতে, এতো নিভ্‌বে না!" বলিয়া লোকটা কাঁদিয়া ফেলিল। আমি বলিলাম, কেঁদনা রামচরণ! কেঁদ না, কি বলছিলে বল।

"বাবু কাঁদাবারও যো নেই কাঁদতেও আর পারব না। তবে শুনুন বাবু—বসিরহাট মহকুমার আমার বাড়ী। গাঁয়ের নাম আর বলিব না। আমার সবই ছিল বাবু, আর বছরেও এমনি পূজোর সময় দুই ভায়েতে এসে বেলগেছের

কৃষ্ণমণ্ডলের আড়তে ৭০০৲ টাকার পাট বেচে গিয়েছি। আজ আমি পথের ভিখারী! কেন শুনবেন? আমার বাড়ীর পাশেই আমাদের জমীদারের বাড়ী। চোদ্দ পুরুষের ভিটা আমাদের, জমীদার বাবুর ইচ্ছা যে সেই ভিটা থেকে আমাদের উদ্বাস্ত করে সেখানে তাঁর গোলাবাড়ী করবেন। সব গিয়েছে আমার বাবু! সব গিয়েছে! এতদিনে গোলাবাড়ী হয়েছে, গোলায় ধান উঠেছে বাবু! আর আজ আমি পথের ভিখারী।"

বলিয়া লোকটীর চক্ষু দিয়া দরদরধারে অশ্রু বহিতে লাগিল। তখন ডাকাতের ভয় দূর হইয়া তাহার প্রতি আমার সহানুভূতি আসিয়াছিল। তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলাম—বলতে কষ্ট পাও, তবে না হয় থাক্, আর বলতে হবে না।"

রামচরণ বলিল "না বাবু, বুক ফেটে মরে গেলেও বলব। তবু জানবো যে আমার দুঃখের কথা বলতে বলতেই মরেছি। সেও আমার ভাল বাবু।

দুই ভাই আমরা। আমার লক্ষণের মত ভাই সেও আজ গিয়েছে। বাবুর বাড়ীর পাশেই বাস, কাজেই যখন তখন নিজের কাজ ফেলেও তাঁর ফাই-ফরমাসটা খাটতে হতো। বাবু প্রায়ই আমাদের ভিটেজমীটুকু তাঁকে দেবার জন্য খুবই বলতেন আমরা রাজী হ'তাম না। শেষে ভয় দেখাতে লাগলেন কিন্তু তখনও আমরা ভয় পাইনি বাবু। যদি তখনও জানতাম যে শেষ এই দাঁড়াবে, তা'হ'লে জমীজমা ঘরদোর সব ছেড়ে দিয়ে বনে জঙ্গলেও বাস করতে পারতাম। এখন সব গিয়েছে বাবু, সব গিয়েছে, সবই হারিয়েছি।

সে আর বছর কার্ত্তিক মাসের কথা। সন্ধ্যাবেলা দুই ভায়েতে ঘরের দাওয়ায় বসে আছি, হঠাৎ ২।৩ জন লোক, জমীদার বাবুর পাইক, বরকন্দাজ লাঠী সোটা নিয়ে এসে আমার গোয়াল থেকে গাই গরু লাঙ্গলের গরু, সব খুলে উঠানে নিয়ে এল। আদালতের একজন পেয়াদা সেখানে ছিল, তাকে জিজ্ঞাসা করলাম ব্যাপার কি? সে তো প্রথমে ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দিলে, তার পর বললে যে জমীদারবাবু নাকি আমার নামে মোকদ্দমা করে ৩০০৲ টাকার ডিক্রী পেয়েছেন, সেই ডিক্রী জারি করে আমার গরু বাছুর ক্রোক করতে এসেছে। রাগে সর্ব্বাঙ্গ কাঁপতে লাগল। আমার ভাই অতশত বুঝিত না। সে এক গাছা মোটা লাঠি নিয়ে একজন বরকন্দাজের ঘাড়ে বসিয়ে দিল। তা'তে যা হবার তা হোল। আমার ভাইকে তখনই তারা বেঁধে ফেল্লে। সবই গেল বাবু। কবে নালিস হোল তাও টের পেলাম না, সমনও পেলাম না, কবে ডিক্রী হোল, তাও কিছু জানতে পারলাম না। গরু বাছুর তো গেলই,

তার উপর মারপিটের দায়ে ভাইকে বেঁধে নিয়ে গেল। কাঁদতে কাঁদতে মহকুমায় ছুটলাম। কিন্তু বাবু গরীব চাষার কথা কে শুনবে। ভাল মোক্তারেরা কেউ আমার দিকে ফিরে চাইলে না একটা ছেঁড়া মোক্তার দশটাকা নিয়ে মোকদ্দমা করলে, তাতে হোল কি জানেন মশাই, আমার ভাইয়ের তিনমাস জেল হ'ল।"

শরৎ আমাকে বলিল—"এরকম oppressive জমীদারের againstএ কোনও step নেওয়া হয় না? আশ্চর্য্য!

"তারপর শুনুন বাবু। মাঘমাসে আমার ভাই যখন জেল থেকে ফিরে এলো, তখন তার চেহারা সিকিখানা হয়ে গিয়েছে। দুই ভায়ে অনেকক্ষণ গলা জড়িয়ে কাঁদিলাম। তার প্রায় ৭।৮ দিন পরেই তার বড় জ্বর হোল, ডাক্তার এসে মুখ বেঁকিয়ে বল্লে ব্যারাম শক্ত তিন দিনের দিন বিকারে দাঁড়াইল। তের দিনের দিন আমার অমন ভাই আমাদের ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

রামচরণ আবার কাঁদিতে লাগিল।

"তারপর আরও আছে বাবু শুনুন। বাড়ীতে ক্ষেত্তরের মা বলিয়া একটি স্ত্রীলোক ছিল থাকিত ও কাজকর্ম্ম করিত। আমার একটী ছোট ছেলে আর পরিবার ছিল। আমার পরিবারের রূপ কৈবর্ত্ত ঘরের মেয়ের মত ছিল না। রাজরাণীর মতই ছিল। হাসিবেনা বাবু, যথার্থই তার রূপ রাজরাণীর মত ছিল। একদিন, সে এই ফাল্গুন মাসে, তখনও বেশ শীত আছে, ভোর বেলায় উঠিয়া আমি বসিরহাট গিয়াছিলাম, তার পরদিন ফিরিলাম। ফিরিয়া যাহা দেখিলাম ও শুনিলাম, তাহাতে পাথর তো পাথর, আপনার ঐ জুতো জোড়াটা, এই ঘরের দেওয়াল কড়িকাঠ দরজা সব কাঁপিয়া উঠিবে। সেই জমিদার আমার রাজা, আমার প্রতিপালক, সে নিঃসহায় পাইয়া——কি বলিব বাবু, বলবার কথা পাচ্ছিনে, আমার সর্ব্বনাশ করেছে। সতীসাধ্বী কলঙ্কের ভয়ে ক্ষেত্তরের মার কৌটা থেকে আফিং নিয়ে খেয়েছে। আমি যখন পৌছুলাম, তখন তাঁর প্রায় শেষ অবস্থা, তার মুখ তখন কালি হয়ে গিয়েছে। সতীসাধ্বী আমার দিকে কেবল একবার চেয়ে বল্লে, "কেষ্ট রইল, আমি চললাম।" বাবু! সে কৈবর্ত্তের মেয়ে, সে কৈবর্ত্তের পরিবার। আমার সব গিয়েছে বাবু! ভাই গেল, পরিবার গেল, আমার ৭ বৎসরের ছেলে কেষ্ট, তাকে বুকে করে আরও ৫ মাস সেই ভাঙ্গা কুঁড়েয় পড়ে রইলাম। এইবার কি হোল জানেন বাবু! এবার ভগবানের প্যাঁচ, এবার আর জমিদার নয়, বসিরহাটে ওলাউঠা হোল, তাতে আমার বুকের নাড়ী ছিড়ে ফেল্লে, আমার কেষ্টকে নিয়ে গেল।

সে আজ পনর দিনের কথা বাবু! পনর দিনের কথা! ঘরবাড়ী জমিজমা টাকাকড়ি যা কিছু ছিল সব ছেড়ে দিয়ে জমিদার বাবুকে একবার গিয়ে বল্লাম "বাবু সব খেয়েছেন, এইবার ভিটেটুকুও খান, আপনার পেট ভরুক।" বাবু জমাদারকে হুকুম দিলেন "লাগাও জুতো।"

ছুটে পালিয়ে এলাম। বরাবর হাঁটাপথে কলিকাতায় এসেছি। আজ আপনি দুটী ভাত দিয়ে বাঁচালেন। সব খেয়েও তবুও তো বাবু পোড়া খিদে যায় না! বলিয়া লোকটা বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিল। আমারও মনটা বড়ই খারাপ হইয়া গেল। আমি চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম।

আমি মন্ত্রমুগ্ধবৎ বলিলাম "তার পর রামচরণ?"

রামচরণ বলিল "একবার কালিঘাটে যাব, মাকে দর্শন করে, মায়ের প্রসাদ পেয়ে, পারি তো হাঁটাপথে একবার কাশী যাব। বাবা বিশ্বেশ্বরকে একবার দর্শন করব।"

আমি বলিলাম "না! তুমি দিন কতক আমার এখানেই থাক, তার পর একটু সুস্থ হয়ে কাশী যেও। পথখরচা আমিই দেবো।"

"না বাবু, তা হবে না, আমি যাবোই, আমার যে ডাক পড়েছে।

ভাবিলাম লোকটা যখন নাছোড়বান্দা তখন ইহাকে কিছু সাহায্য করি। এই ভাবিয়া বাড়ীর ভিতর যাইয়া ৫টী টাকা আনিলাম। তাহার হাতে দিয়া বলিলাম "রামচরণ! এই ৫টা টাকা নাও। ৪৷৷৹ টাকা কাশীর রেলভাড়া, আর আনা রইল জলখাবার টলখাবার কিনে খেও। আমরা সামান্য অবস্থার লোক, এর বেশী আর কোথায় পাব বল?"

রামচরণ বলিল "বাবু, আপনি আমার বাপ, এই কলকাতার যে দুয়ারে গিয়াছি সকলেই আমাকে তাড়াইয়াছে। কাঙ্গালের দুঃখের কাহিনী আপনিই কেবল আজ শুনলেন। বাবু! টাকা রাখুন, টাকা আমি চাই না। আমি হাঁটাপথেই যাব। যদি দয়া করে দেন তবে গোটা চারেক পয়সা দিন, যদি আবার পোড়া খিদের জ্বালায় মর্ত্তে হয়।"

আমি অনেক পীড়াপীড়ি করা স্বত্বেও সে টাকা কয়টি লইল না। সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে সে আমাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

ছক্কন বসিয়াছিল, সে বলিল "উ কৌন হ্যায় বাবু, পাগল আছে না ঠগ"।

কি এক অজানিত আকর্ষণ এই অসহায় দরিদ্রের প্রতি আমাকে আকৃষ্ট করিয়াছে জানি না। এখনও সময় পাইলেই নির্জ্জনে বসিয়া সেই রামচরণের কথাই ভাবি।

———

প্রেম-স্পর্শ

বলি নাই যেই কথা এত দিন হায়,
রেখেছিনু লুকাইয়া অন্তর-গুহায়—
মেঘ যথা রাখে বারি ; সেই কথা আর
পারি না চাপিতে, প্রিয়, আজি স্পর্শে কা'র—
বিগলিয়া পড়ে ছের, নাহি লজ্জা মম
নাই সেই বাধা আর, মলিনতা সম—
ধুয়ে গেছে—নাহি চিহ্ন। অয়ি শুচি স্মিতে!
তুমি আমি আছি শুধু, হেথা এ নিভৃতে।
নাহি আর কোন জন—শুনিবে সে কথা,
পরিপূর্ণ হৃদয়ের প্রেমের বারতা।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ সেন।

সাহিত্য-সমাচার।

প্রাথমিক প্রতিবিধান—মূল্য ১৲। দ্বারবঙ্গের সরস্বতী একাডেমীর ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার বি-এ প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান,—বসু লাইব্রেরী, ৫৭নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মানুষের বিপদ পদে পদে ছায়ার ন্যায় অনুসরণ করিতেছে। একটা সামান্য আঘাতে অস্থিভঙ্গ হয়, অঙ্গহানি হয় এবং সময়ে সময়ে জীবন সংশয় হইয়া পড়ে। চিকিৎসক আনিতে যাইবার সময়ের মধ্যে একটা কিছু প্রতিকার করিতে না পারিলে অনেক সময় অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হয়। সেই জন্য নানারূপ আকস্মিক বিপদের প্রতিকারকল্পে প্রাথমিক প্রতিবিধানগুলি ভাল করিয়া জানিয়া রাখা উচিত।

গ্রন্থকার বিশেষ পরিশ্রম করিয়া সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় এই গ্রন্থখানি রচনা করিয়া সাধারণের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। গ্রন্থারম্ভে গ্রন্থকার একটী পূর্ণ নরকঙ্কাল-চিত্রে দেহের স্থানসমূহ চিহ্নিত করিয়া সেগুলির পরিচয় দিয়াছেন এবং তাঁহার প্রত্যেক বক্তব্য চিত্রের সাহায্যে বুঝাইয়াছেন। বলা বাহুল্য, ইহাতে চিকিৎসা-শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ পাঠকের অশেষ উপকার দর্শিবে।

আমরা গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া অনেক নূতন তথ্য শিখিয়াছি। বিষপান, কেরোসিন তৈলে পোড়া, বৈদ্যুতিক আঘাত, সর্পাঘাত, জলে ডোবা প্রভৃতির প্রথম প্রতিবিধানগুলি সকলের ভাল করিয়া জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য। কারণ এই শ্রেণীর দুর্ঘটনাগুলি সমাজের নিত্য সহচর।

গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা পরিতৃপ্ত হইয়াছি। গুণের আদর থাকিলে বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে ইহা গৃহপঞ্জীর ন্যায় বিরাজ করিবে, এ ভরসা আমাদের আছে।

চিকিৎসা-বিদ্যালয় ও সাধারণ বিদ্যালয়সমূহে এই পুস্তকখানি পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলে,

রামনারায়ণ তর্করত্ন।

[লেখক—শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়।]

গত ফাল্গুনের 'নারায়ণে' রামনারায়ণের নাটকের কথা লিখিয়াছি,—তাঁহার জীবনের কথা তখন বিশেষ কিছু বলি নাই। সেই জীবনের কথা যাহা একটু জানি, 'অর্চ্চনা'র মারফতে তাহা প্রকাশ করিতেছি।

প্রথমেই বলিয়া রাখি, রামনারায়ণের কথা যাঁহার যতটুকু জানা আছে, তাহা প্রকাশিত হওয়াই উচিত। তিনি খুব উচ্চদরেব কবি না হইলেও যে প্রতিভাসম্পন্ন কবি, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বাঙ্গালার অপোগণ্ড নাট্য-সাহিত্যের লালনপালন-ভার তিনি স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার 'দক্ষযজ্ঞ' নামক সংস্কৃতকাব্য পাঠে মুগ্ধ হইয়া সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ই, বি, কাউয়েল সাহেব তাঁহাকে 'কবিকেশরী' উপাধি দান করেন। বাঙ্গালা নাট্য-সাহিত্যের শ্রী ফিরাইয়াছিলেন বলিয়া মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর তাঁহাকে সুবর্ণকেয়ূর উপহার দিয়াছিলেন। অতএব এহেন শক্তিশালী পুরুষের প্রসঙ্গ লিপিবদ্ধ করা অনুচিত মনে করি না।

তবে কেহ কেহ আছেন, তাঁহারা কবির 'জীবন-কথা' জিনিষটা আদৌ পছন্দ করেন না। তাঁহারা বলেন, 'কবিও যখন সাধারণ মানুষের মতন ভাল-মন্দ বকেন, স্তুতি-নিন্দায় টলেন, অবশেষে ব্যামো হইয়া বিশেষ তারিখে মরিয়া নিঃশেষিত হইয়া যান, তখন তাঁহার জীবন-কথা জানিয়া লাভ কি?'—লাভ কি, বলিতে পারি না; তবে এটুকু জানি যে, কবির জীবন সাধারণ মানুষের মতন হইলেও তিনি নিজে অসাধারণ বলিয়া জন-সাধারণে তাঁহার জীবন-ঘটনা শুনিতে ভালবাসে। লাভ বলিয়া নহে, জানিবার কৌতূহল হয় বলিয়াই উহা জানিতে চাহে। কালিদাসের কত বড় টিকি ছিল, ভারবির কত বৎসর বয়সে বর্ণপরিচয় হইয়াছিল, মধুসূদন কি রকম ছোট বড় চুল ছাটিতেন, গিরিশচন্দ্র কয় বোতল মদ খাইয়া 'চৈতন্যলীলা' লিখিয়াছিলেন, এ সব খবর জানিয়া লাভ নাই জানি,—তবু জানিতে ইচ্ছা করে। তাই স্বর্গীয় নাট্যকারের সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা 'অর্চ্চনা'র পাঠকবর্গকে উপহার দিতেছি।

বড় লোকের ছেলে বিদ্যা-বুদ্ধিতে বড় হইয়া নূতনের পথ দেখাইতেছেন, এমন দৃষ্টান্ত অতি বিরল। দরিদ্রের কুটীরেই প্রতিভার আবির্ভাব। রামনারায়ণও

অতি দরিদ্রের কুটীরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় রামধন শিরোমণি অতি নিঃস্ব ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন। কলিকাতার দক্ষিণে হরিনাভি গ্রামে তিনি বাস করিতেন। এই গ্রামে ১৭৪৪ শকে রামনারায়ণের জন্ম হয়।

রামনারায়ণ যখন এক বৎসরের শিশু, তখন তাঁহার পিতার ও মাতার মৃত্যু ঘটে। শিশু পিতৃমাতৃহীন হইলেও, সৌভাগ্যের বিষয় যে, পিতামাতার অভাব তিনি শৈশবে বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর স্বর্গীয় প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে পুত্রাধিক স্নেহে লালন-পালন করিয়াছিলেন। রামনারায়ণের মুখ মলিন দেখিলে তিনি বড়ই কাতর হইয়া পড়িতেন। রামনারায়ণের যাহাতে যশ হয়, মান বাড়ে, এই চেষ্টাই সর্ব্বদা করিতেন। কনিষ্ঠের কোথাও প্রশংসা শুনিলে তিনি আনন্দে অধীর হইয়া পড়িতেন। ছোট ভায়ের উপর তাঁহার এই প্রাণঢালা ভালবাসা দেখিয়া অনেকেই সন্দেহ করিতেন যে, রামনারায়ণকে বিখ্যাত করিবার জন্যই তিনি নিজে বই লিখিয়া তাহা রামনারায়ণের নাম দিয়া ছাপাইতেন। এমন কি, এখনও কাহারও কাহারও মুখে শুনিতে পাই যে, 'দক্ষযজ্ঞ' কাব্য ও "কুলীন-কুলসর্ব্বস্ব" নাটক, রামনারায়ণের রচিত নহে;—ঐ দুইখানি গ্রন্থ তাঁহার অগ্রজ প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর মহাশয় লিখিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, এ অনুমান সত্য নহে। কেন না, প্রাণকৃষ্ণের মৃত্যুর পর যে কয়খানি নাটক রামনারায়ণের নাম দিয়া বাহির হইয়াছিল, সেগুলিতেও 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' নাটকের লিখন-ভঙ্গীর ও রস-ব্যবহারের পরিচয় পাওয়া যায়। তা' ছাড়া, রামনারায়ণ নিজেও একজন প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন।—তিনি যে দাদার লেখাকে বিনা বাক্যব্যয়ে বরাবর নিজের লেখা বলিয়া চালাইয়া গেলেন, এ কথাও মনে লাগে না। তবে বিশেষজ্ঞের মুখে ইহা শুনিয়াছি, এবং ইহা স্বাভাবিক বলিয়াও মনে হয় যে, রামনারায়ণ যাহা কিছু লিখিতেন, তাহা তাঁহার অগ্রজকে তিনি একবার দেখাইয়া লইয়া তবে ছাপিতে দিতেন। তাঁহার অগ্রজও তাঁহার লেখার স্থানে স্থানে কাটিয়া ছাঁটিয়া ঠিক করিয়া দিতেন। আসল কথা, সাহিত্যে রামনারায়ণের তিনি প্রকৃত গুরু ছিলেন। বাঙ্গালা লেখায় প্রবৃত্তি, শিক্ষায় সাহায্য ও ভ্রমে সংশোধন তাঁহা হইতেই রামনারায়ণের হইয়াছিল।

রামনারায়ণের আর এক সৌভাগ্য যে, পরম স্নেহময় ভ্রাতার ন্যায় তিনি

পরম স্নেহময়ী ভ্রাতৃজায়াও পাইয়াছিলেন। প্রাণকৃষ্ণের পত্নী এই মাতৃহারা শিশু-দেবরটিকে পুত্র-নির্ব্বিশেষে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছিলেন। এই ভ্রাতৃজায়ায় কথা বলিতে গেলে, বৃদ্ধ বয়সেও রামনারায়ণের চক্ষু দুইটী জলে ভরিয়া আসিত। তিনি প্রায়ই বন্ধু-বান্ধবের নিকট বলিতেন—"বধূ-ঠাকুরাণীর স্নেহ-শীতল কোলে আশ্রয় না পাইলে শৈশবেই আমার অস্তিত্ব লোপ পাইত।"

বাল্যকাল হইতেই তাঁহার পাঠে বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি অল্প বয়সেই নিজগ্রামে হরিনাভি-নিবাসী প্রসিদ্ধ পণ্ডিত স্বর্গীয় মধুসূদন বাচস্পতি মহাশয়ের নিকট ব্যাকরণ, স্মৃতি ও কয়েকখানি সংস্কৃত কাব্য পাঠ করিয়াছিলেন। তার পর পূর্ব্বদেশের পোড়াগ্রামে আসিয়া কিছু দিন ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এই ন্যায়শাস্ত্র পড়িবার সময় তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর কলিকাতার সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপকের পদ প্রাপ্ত হন। এই পদ পাইবামাত্র তিনি অনুজকে আপনার নিকট আনিয়া, সংস্কৃত কলেজেই শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া দেন।

এই সময় তাঁহার সাহিত্য-চর্চ্চায় বিশেষ ঝোঁক হয়। এখন যেমন ছাপার অক্ষরে নিজের নাম দেখিবার জন্য লেখক-সাধারণের সাহিত্য-সেবায় ঝোঁক;—বলা বাহুল্য, রামনারায়ণের সে রকম ঝোঁক হয় নাই। তেমন ঝোঁক হইবার উপায়ও ছিল না। তখন এখনকার মত ঘরে ঘরে ব্যাঙের ছাতার মত মাসিকপত্র গজাইয়া উঠিত না। কাজেই যিনি কিছু তখন লিখিতেন, তিনি প্রাণের টানেই লিখিতেন। নামের টানে লিখিবার তখন সুবিধা ছিল না। সুবিধা ছিল না বলিয়াই তখনকার দিনে সাহিত্য-সেবায় যিনি অগ্রসর হইতেন, তিনি উহাকে ছেলেখেলা বলিয়া মনে করিতেন না। বলা বাহুল্য, রামনারায়ণের সাহিত্যসেবাও এই আরাধনার ধন—সাধনার সামগ্রী ছিল। তিনি আত্ম-পরিতৃপ্তির জন্য বাল্যে অনেক লেখা লিখিতেন, এবং গোপনেই তাহা নষ্ট করিয়া ফেলিতেন। এই সাধনার ফলেই মনে হয়, তিনি স্বর্গীয় কালীচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের প্রদত্ত পারিতোষিক-লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন।

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজে তাঁহার পড়া শেষ হয়। ইহার ঠিক দুই বৎসর পরে, অর্থাৎ ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে আবার সংস্কৃত কলেজেই সাহিত্য ও অলঙ্কার-শাস্ত্রের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করা হয়। সেই পদে অতি যোগ্যতার সহিত কার্য্য করিয়া ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে তিনি পেন্‌সন

গ্রহণ করেন। কিন্তু পেন্‌সন গ্রহণ করিলেও অধ্যাপনাকার্য্য হইতে তিনি অবসর লইতে পারেন নাই। শিক্ষাদান তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। জীবনের শেষাংশটুকুও তিনি এই কার্য্যে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। পেন্‌সন-গ্রহণের পর নিজ জন্মভূমিতে আসিয়া তিনি সেখানকার ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য বালকদিগকে সংস্কৃত শিক্ষা দিবার জন্য ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে সেখানে এক চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহার বড় সাধের চতুষ্পাঠীতে তিনি বেশী দিন অধ্যাপনা-কার্য্য করিতে পারেন নাই। ১১৯২ সালের মাঘ মাসে উদরীরোগে আক্রান্ত হইয়া, প্রায় ছয় মাসকাল ভুগিয়া, তিনি ৬৩ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন।

তর্করত্ন মহাশয় অনেকগুলি গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার 'কুলীনকুল-সর্ব্বস্ব', 'বেণীসংহার', 'রত্নাবলী', 'শকুন্তলা', 'নবনাটক', 'মালতীমাধব', 'রুক্মিণী-হরণ' ও 'স্বপ্নধন' নামে এই আটখানি বাঙ্গালা নাটকের সন্ধান পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া শুনিতে পাই যে, তিনি 'ধর্ম্মবিজয়' 'ধনুর্ভঙ্গ' নামে আর দুইখানি বাঙ্গালা নাটক লিখিয়াছিলেন। 'ধর্ম্ম-বিজয়, তাঁহার জন্মস্থানে, তাঁহারই যত্নে গঠিত বঙ্গনাট্যসমাজের জন্য প্রণীত এবং সেই সমাজের দ্বারাই প্রকাশিত ও অভি-নীত হইয়াছিল। আর 'ধনুর্ভঙ্গ' নাটকখানি অদ্যাবধি প্রকাশিত হয় নাই।

এই বাঙ্গালা নাটক ছাড়া, তিনি 'আর্য্যাশতক' ও 'দক্ষযজ্ঞ' নামে দুই খানি সংস্কৃত কাব্যও রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে স্বর্গীয় দ্বারকা নাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার সম্বন্ধে 'সোমপ্রকাশে' যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া এ রচনা শেষ করিলাম।—

"তর্করত্ন নানা গুণে অলঙ্কৃত ছিলেন। যাঁহারা ইহার সহিত অল্পসময়ের জন্যও আলাপ করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহার রসপূর্ণ মিষ্টালাপ কখন বিস্মৃত হইতে পারিবেন না। বাঙ্গালা নাটকের ইনি এক প্রকার সৃষ্টিকর্ত্তা বলিতে হইবে। তিনি সংস্কৃত ভাষা, কাব্য ও অলঙ্কার বিষয়ে অতি সুপণ্ডিত ছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে তাঁহার ন্যায় সংস্কৃত কবি আর কেহ ছিল না। তাঁহার প্রণীত 'দক্ষযজ্ঞ' ও 'আর্য্যাশতক' সর্ব্বত্র বিশেষ প্রশংসা লাভ করিয়াছে।······বস্তুত সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার কবিত্বশক্তি এত দূর মধুর এবং গাঢ় ছিল যে, তাঁহার নাম না থাকিলে কেহ তাঁহার প্রণীত কাব্যগুলি আধুনিক কবির রচিত বলিয়া অনুমান করিতে পারেন না। তাঁহার সংস্কৃত রচনা এত দূর প্রাঞ্জল এবং অলঙ্কার পূর্ণ যে তাঁহার 'আর্য্যাশতক' সহসা কবিচূড়ামণি কালিদাসের রচিত

বলিয়া ভ্রম হয়। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে অলঙ্কারের পণ্ডিতরূপে বহুকাল পর্য্যন্ত অধ্যাপক-কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া ইনি ছাত্রদিগের নিরতিশয় শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। হিন্দুধর্ম্মের মর্য্যাদা-বৃদ্ধির জন্য, ইঁহার এতদূর যত্ন ছিল যে, একটি হরিসভা প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রতি রবিবার বক্তৃতা ও ধর্ম্মশাস্ত্র-পাঠাদির দ্বারা সভ্যদিগকে উপদেশ দান করিতেন। ... ... তিনি যেমন সুপণ্ডিত ছিলেন, তাদৃশ সুবক্তাও ছিলেন। যে সভায় তিনি উপস্থিত থাকিতেন, তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য সভাস্থ সকলেই ব্যগ্র হইতেন এবং তিনিও তাঁহাদিগকে রসগর্ভ ও উপদেশপূর্ণ বক্তৃতার দ্বারা মুগ্ধ করিতেন। ইঁহার অভাবে আপামরসাধারণ এবং বিশেষতঃ দাক্ষিণাত্য বৈদিক সমাজ যে, বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন, তাহা আর বলিবার অপেক্ষা নাই।"

সহযোগী সাহিত্য।

[লেখক—শ্রীকৃষ্ণদাস চন্দ্র।]

অতীত সময়ের ইতিহাস-প্রণয়ন বাহির হইতে আমরা যতটা সহজসাধ্য মনে করি বস্তুতঃ ততটা নহে। কারণ ঐতিহাসিক হংসবৃত্তি (অর্থাৎ নীর-ত্যাগে ক্ষীরগ্রহণ) অবলম্বন না করিলে এবং তাঁহার সূক্ষ্ম বিচারশক্তি না থাকিলে তাঁহাকে পদে পদে অপদস্থ হইতে হয়। ইতিহাস-রচয়িতা ও পাঠকমাত্রেই এ কথার বিশেষত্ব অবগত আছেন। ঐতিহাসিকের যোগ্যতার অভাবে কত কল্পনা ও আবর্জ্জনা যে ইতিহাসে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। কয়েকজন প্রাচীন লেখকের মতের উপর নির্ভর করিয়া ঐতিহাসিক একটা সত্য নির্দ্ধারণ করিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই হয় ত অন্য এক জন নানা প্রকার অকাট্য প্রমাণের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত লেখকের যুক্তি ফুৎকারে উড়াইয়া দিলেন।

সেই জন্য ঐতিহাসিকের সত্য মিথ্যা বিচার করিবার সূক্ষ্মদর্শিতা একান্ত আবশ্যক। অনেকে বিদ্বেষ, কৌতুক বা পক্ষপাতিত্ব বশতঃ নানা কাল্পনিক উক্তি ইতিহাসে প্রক্ষেপ করিয়া সাহিত্যের প্রভূত অনিষ্টসাধন করিয়াছেন। বীরশ্রেষ্ঠ নেপোলিয়ন ইতিহাসকে Liar বা মিথ্যাবাদী বলিয়া সম্বোধন করিতেন!

সম্প্রতি "হিন্দু পেট্রিয়ট" পত্রের সম্পাদক সম্রাট জাহাঙ্গীর ও বেগম নূর-

জাহান সম্বন্ধে কয়েকটি ক্ষুদ্র গল্প সঙ্কলন করিয়াছেন। তাঁহার রচনায় ভিত্তি কি, কি কি প্রমাণে নির্ভর করিয়া তিনি গল্পগুলি প্রকাশ করিয়াছেন তাহা আমরা জানিতে পারি নাই। তিনি কেবলমাত্র বলিয়াছেন যে, গল্পগুলি মুসলমান ঐতিহাসিকের রচনা। কৌতুকপ্রদ বলিয়া পাঠকের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য নিম্নে সেইগুলির মর্ম্মানুবাদ করিয়া দিলাম। পাঠকগণ ইহা হইতে সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করিয়া লইবেন।

সম্রাট জাহাঙ্গীর বাল্যকালে পায়রা লইয়া খেলা করিতে ভালবাসিতেন। একদিন তিনি মিনা বাজারে মেলায় দুইটি পায়রা ধরেন এবং সে দুটিকে লইয়া যাইতে যাইতে তিনি আর একটি "সিরাজি" পায়রা দেখিলেন। সেটিকে ধরিবার জন্য তাহার বিশেষ আগ্রহ ও লোভ হইল। পায়রা দুইটি নিকটবর্ত্তী এক বালিকার জিম্মায় রাখিয়া তিনি "সিরাজী" পায়রা ধরিতে চলিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া বালিকার হাতে একটা মাত্র পায়রা দেখিয়া যুবরাজ সেলিম্ উৎকণ্ঠিতচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন "আর একটা পায়রা কোথা গেল?"

ভীতি-বিহ্বলকণ্ঠে বালিকা বলিল—"খোদাবন্দ, উড়িয়া গিয়াছে!" বিশেষ অসন্তুষ্ট হইয়া যুবরাজ সেলিম্ জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি করে উড়ে গেল?" বালিকা হস্তস্থিত অন্য পায়রাটিকে ছাড়িয়া দিয়া বলিল—"এইরূপে।" বালিকার অকপট সরলতা দেখিয়া ক্রোধের পরিবর্ত্তে প্রেম-বীজ যুবরাজের হৃদয়ে উপ্ত হইল। তিনি বালিকাকে ভালবাসিয়া ফেলিলেন। যথাসময়ে যুবরাজের এই ব্যবহার সম্রাট আকবরের গোচর হইলে তিনি বিশেষ অসন্তুষ্ট হইলেন এবং অচিরে সের আফগান্ নামক এক ব্যক্তির সহিত বালিকার বিবাহ দিয়া তাহাকে বর্দ্ধমানের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। বালিকা চক্ষুর অন্তরে থাকিলেও যুবরাজ সেলিমের অন্তরের অন্তরে রহিল না। প্রেম-নদী বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় শতগুণ স্ফাত হইয়া উঠিল! পিতার মৃত্যুর পর কি করিয়া তিনি বালিকা মেহের-উন্নিসাকে তাহার পতির অঙ্কচ্যুত করিয়া আনিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাসপাঠকের অবিদিত নাই!

* * *

সম্রাট জাহাঙ্গীরের নিকট নূরজাহান নীতা হইলে, তিনি তাহাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করেন। নূরজাহান সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান্ করিলে সম্রাটের

আদেশে প্রাসাদের এক কক্ষে তাহার নির্জ্জনবাসের ব্যবস্থা হয়। কিছু দিন পরে জাহাঙ্গীরের প্রতি নিজের ব্যবহারে অনুতপ্ত হইয়া, সুচিবিদ্যানিপুণা নূরজাহান একখানি রেশমী রুমালে প্রেম-পত্র লিখিয়া সম্রাটকে উপহার দেন। প্রেমপ্রার্থী সম্রাটের বাসনা পূর্ণ হইল। সেই দিন সন্ধ্যার সময় অন্য কোনও বেগমের মহলে না গিয়া নূরজাহানের কক্ষে মহোল্লাসে সম্রাট গমন করিলেন এবং দেখিলেন, নূরজাহানের দাসীবৃন্দ বহু মূল্যবান উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদে বিভূষিতা এবং নূরজাহান একখানি সামান্য বস্ত্র পরিধান করিয়া অতি দীনার ন্যায় অবস্থান করিতেছে। সম্রাট তাহাকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, চতুরা নূরজাহান উত্তর করিল—"দাসীবৃন্দের প্রভু (নূরজাহান) তাহাদের উপর সদয় সেইজন্য তাহারা মূল্যবান পরিচ্ছদে সজ্জিতা হইয়া আনন্দ করিতেছে এবং আমি আমার প্রভু (জাহাঙ্গীর) কর্তৃক অনাদৃত হইয়া কোন্ প্রাণে বেশভূষার পারিপাট্য করিব ?"

নূরজাহানের সরল উত্তর সম্রাট জাহাঙ্গীরের রুদ্ধ প্রেম-তটিনী উচ্ছ্বসিত করিয়া তুলিল। সম্রাটের হৃদয় এতটা মুগ্ধ হইয়া পড়িল যে, তিনি অনতিবিলম্বে নূরজাহানকে বিবাহ করিলেন।

* * *

সম্রাট জাহাঙ্গীর নূরজাহানের নিকট আত্ম-বিক্রয় করিয়াছিলেন। তিনি প্রায়ই বলিতেন—"এক পেয়ালা মদ ও এক টুকরা কাবাবের জন্য আমার রাজত্ব নূরজাহানকে বিক্রয় করিয়াছি।"

এই অসামান্য প্রতিপত্তির জন্য নূরজাহান অন্যান্য বেগমদিগের চক্ষুঃশূল হইয়া পড়িয়াছিল এবং তাহারা সুবিধা ও সুযোগ পাইলেই নূরজাহানকে অপমানিত বা অপদস্থ করিতে ছাড়িত না। একদা তাহারা একটি প্রীতিভোজের আয়োজন করেন। একাধিকবার বিবাহিত রমণীর তাহাতে যোগদান করা নিষিদ্ধ হইয়াছিল। নূরজাহানকে অবমাননা করিবার জন্যই সে অনুষ্ঠান!

এক দিন সম্রাট জাহাঙ্গীর মদ্যপানে রত ছিলেন এবং নূরজাহান পাত্রহস্তে বসিয়াছিলেন। হঠাৎ একটা ইন্দুরের লম্ফপ্রদান-শব্দে জাহাঙ্গীর চমকিয়া উঠিলেন এবং তাঁহার হস্তস্থিত মদ্যপাত্র পড়িয়া গেল। ইহা দেখিয়া নূরজাহান একটু মৃদুহাস্য করিলেন। সম্রাট কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, নূরজাহান বলিলেন—

"খোদাবন্দ, ইন্দুরের শব্দে আপনি চমকিত হইয়াছেন দেখিয়া আমার পূর্ব্বস্বামীকে মনে পড়িল। তিনি একাকী ব্যাঘ্রের সম্মুখীন হইতে ভীত হইতেন না এবং স্বহস্তে একটি ব্যাঘ্র বধ করিয়াছিলেন!" এই শ্লেষোক্তি-শ্রবণে সম্রাট্ জাহাঙ্গীর হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া নুরজাহানের হস্তদ্বয় কর্ত্তন করিবার জন্য উজীরকে তৎক্ষণাৎ আদেশপ্রদান করিলেন। উজীর উভয় সঙ্কটে পড়িলেন। তিনি সম্রাটের খেয়াল জানিতেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, সম্রাটের আদেশ ক্ষণিক উত্তেজনার কারণ; কিছুক্ষণ পরে তিনি পুনরায় নূরজাহানকে আনিবার জন্য নিশ্চয়ই অনুমতি প্রদান করিবেন। কিন্তু সম্রাটের আদেশ অমান্য করিলে মৃত্যু নিশ্চয় জানিয়া তিনি নুরজাহানকে লইয়া গিয়া একটা অতি তপ্ত লৌহের তারে তাহার হাতের কব্জি বাঁধিয়া দিলেন। উজীরের অনুমান ঠিক হইল। অনতিবিলম্বে জাহাঙ্গীরের ক্রোধ প্রশমিত হইলে তিনি নুরজাহানকে আনিবার আদেশ প্রদান করিলেন। উজীর বলিলেন, "সম্রাট খোদাবন্দের হুকুম মত তাঁহার হাত দু'টি কাটিয়া ফেলা হইয়াছে!"

ক্রোধদীপ্ত সম্রাট বলিলেন, "নুরজাহানের হস্তকর্ত্তন করিবার জন্য তিনি কখনও প্রাণ হইতে হুকুম দেন নাই। হুকুম তামিল হইয়া থাকিলে উজীরের প্রাণদণ্ড হইবে।" উজীর মনে মনে নিজ বুদ্ধির প্রশংসা করিয়া নুর-জাহানকে আনয়ন করিলেন। নুরজাহানের হাতের উপর গোলাকার কাল পোড়া দাগ তাহার সৌন্দর্য্যের হানি করিতেছিল। সম্রাট তৎক্ষণাৎ এক জোড়া নূতন ধরণের হীরক বলয় আনাইয়া নুরজাহানের হস্তের কাল দাগ ঢাকিয়া দিলেন। এখনও উক্তরূপ বলয় পশ্চিমে ব্যবহৃত হয় এবং সম্রাটের নামানুযায়ী উক্ত অলঙ্কারের "জাহাঙ্গীরী" নামকরণ হয়।

নূরজাহান যেমন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুন্দরী গুণেও তদ্রূপ অত্যন্ত গরীয়সী ছিলেন। একদিন রাজোদ্যানে সম্রাট ও নূরজাহান বেড়াইতেছেন এমন সময় নুরজাহানের একজন পরিচারিকা আকাশে একটি ধূমকেতু দেখিয়া উচ্চৈঃ-স্বরে বলিয়া উঠিল—"কি সুন্দর লেজ।" প্রাচ্য দেশীয় লোকের ধারণা, ধূম-কেতুর সমুত্থান অমঙ্গলের নিদর্শন। উর্দ্ধে চাহিয়া ধূমকেতু দেখিয়া সম্রাটের মুখ যেন বিমর্ষভাব ধারণ করিল। বুদ্ধিমতী ও সুচতুরা নূরজাহান সম্রাটের মনের ভাব বিষয়ে বুঝিতে পারিয়া তাঁহার আতঙ্ক দূর করিবার জন্য তৎক্ষণাৎ

পারসীতে একটি কবিতা রচনা করিলেন তাহার মর্ম্মার্থ এই—"তারকার যে লেজ সঞ্চার হইয়াছে তাহা নহে। আমাদের বাদসার মস্তকে চামর-ব্যজন করিবার জন্য আকাশ পালথ বিস্তার করিয়াছে।"

একদিন সম্রাট জাহাঙ্গীর একটা মূল্যবান রেশমী পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া নুরজাহানের নিকট আসিয়াছিলেন। ঐ পোষাকের বোতামগুলিতে বড় বড় চুণি বসান ছিল। নূরজাহান তৎক্ষণাৎ পারসীতে একটি কবিতা রচনা করিলেন, তাহার ভাবার্থ—"পরিচ্ছদের বোতামগুলি চুণি বসান নহে! ঐগুলি আমার হৃদয়ক্ষরিত রক্তবিন্দু সংযুক্ত!"

* *
*

নুরজাহান নিজে অত্যন্ত বিদুষী ছিলেন এবং প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিকে অত্যন্ত সমাদর করিতেন। একদিন তিনি ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া পরিচারিকাবৃন্দ পরিবৃত হইয়া ভ্রমণ করিতেছিলেন। অদূরে একটি ফোয়ারার নিকট বসিয়া একজন পারসীক কবি বিশ্রাম করিতেছিলেন। তিনি চাকুরীর সন্ধানে আসিয়াছিলেন। নুরজাহানকে দেখিয়া তিনি সম্রাজ্ঞী বলিয়া বুঝিতে পারেন নাই। নুরজাহানকে লক্ষ্য করিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ একটি কবিতা রচনাপূর্ব্বক আবৃত্তি করিলেন। তাহার মর্ম্মানুবাদ—'গোলাপের গন্ধটুকু ছাঁকিয়া গ্রহণ করিবার জন্য আপনি ঘোম্‌টা দিয়াছেন। আপনি এত কোমল যে গোলাপের স্বাভাবিক উগ্র গন্ধ সহ্য করিতে অসমর্থা!' বলা বাহুল্য, নুরজাহান তাহার রচনাশক্তি ও স্তুতিগীতিতে অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে অনতিবিলম্বে রাজসরকারে একটি চাকুরী দিয়াছিলেন।

* *
*

কথিত আছে, নুরজাহান সর্ব্বপ্রথম গোলাপী আতর প্রস্তুত করান। তিনিই আমাদের নিত্য-ব্যবহৃত তামাকের আবিষ্কার করেন। পূর্ব্বে তামাকের গুঁড়া সাধারণে ব্যবহার করিত। এক দিন নূরজাহান দেখিলেন যে, তিনি যে তাম্রকূট সেবন করিতেছিলেন তাহাতে একটু নূতন রকমের সুগন্ধ। অনুসন্ধানে তিনি অবগত হইলেন যে, তাঁহার পরিচারিকা তাম্রকূট-রচনা করিবার অনতিপূর্ব্বেই গুড় খাইতেছিল। সে তাম্রকূট-রচনা করিবার আদেশপ্রাপ্তিমাত্র হাত ধুইতে

অবসর না পাইয়া,—গুড়মাখা হাতেই তামাক সাজিয়াছিল। এইরূপে শুষ্ক তাম্রকূটের সহিত ঈষৎ গুড় মিশিয়া উহাতে এতটা স্বাদ ও সুগন্ধ হইয়াছিল। সেই দিন হইতে নূরজাহানের তামাকে গুড় মিশ্রিত হইত।

* *
*

নূরজাহানের আত্মীয়বর্গের মধ্যে সকলেই রাজসরকারে বড় বড় চাকুরী লাভ করিয়াছিল ; কিন্তু সম্রাট জাহাঙ্গীর কাহাকেও প্রজাদের সহিত অযথা ব্যবহার করিতে দিতেন না বা কেহ তাঁহার আদেশপালন না করিলে তাহার নিস্তার রাখিতেন না। নূরজাহানের এক সম্পর্কীয় ভ্রাতা একটী প্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি একদা একজন দরিদ্র প্রজার পত্নীকে বলপ্রয়োগে অপহরণ করিয়া আনেন। দরিদ্র প্রজা উপায়ান্তর না দেখিয়া স্বয়ং আগ্রায় গিয়া সম্রাট জাহাঙ্গীরের নিকট অভিযোগ উপস্থিত করেন। সম্রাট তৎক্ষণাৎ উক্ত শাসনকর্ত্তাকে নিজের কাছে আনাইলেন এবং তাহার ব্যবহারের কৈফিয়ৎ দিতে বলিলেন। রাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা নূরজাহান তাহাকে মুক্তিপ্রদান করাইবেন সেই বিশ্বাসে ও সাহসে উক্ত শাসনকর্ত্তা অকপটে স্বীয় অপরাধ স্বীকার করিল। ক্রোধদীপ্ত সম্রাট জাহাঙ্গীর উক্ত শাসনকর্ত্তার কর্ণে গলিত সীসা ঢালিয়া দিয়া তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ করিলেন। নূরজাহান তাহার আত্মীয়ের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য একটী কথা কহিতেও সাহস করিলেন না। এই ঘটনার কিছু দিন পরে জাহাঙ্গীর নূরজাহানকে বলিয়াছিলেন যে, যদি তুমি তোমার আত্মীয়কে রক্ষা করিবার জন্য তাহার বিচারের সময় কোনও কথা বলিতে, তাহা হইলে তাহার পাপকর্ম্মের সহচরী বলিয়া তোমারও প্রাণদণ্ড হইত এবং তৎপরে আমি আত্মহত্যা করিতাম. কারণ তোমার বিচ্ছেদে আমার জীবনধারণ অসম্ভব।

* *
*

এক দিন পারস্যদেশের এক যুবরাজের সহিত সম্রাট জাহাঙ্গীরের দাবাখেলার বাজী হয়। বাজীর পণ এই যে,—সম্রাট জাহাঙ্গীর খেলায় হারিলে নূরজাহানকে ত্যাগ করিয়া তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিবেন এবং পারস্যের যুবরাজ হারিলে, জাহাঙ্গীর তাঁহার যে কোনও বেগমকে গ্রহণ করিতে পারিবেন। খেলা শেষ হইবার মুখে সম্রাট জাহাঙ্গীর দেখিলেন যে, তাঁহার পরাজয় নিশ্চিত। খেলা ২।১ মুহূর্ত্তের জন্য স্থগিত রাখিয়া সম্রাট কক্ষান্তরে গমন করিয়া নূরজাহানকে খেলার অবস্থা আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিলেন। তাহা শুনিয়া নূরজাহান তৎক্ষণাৎ

একটী কবিতা রচনা করিলেন—'হে সম্রাট প্রিয়জনকে ত্যাগ না করিয়া নিজের নৌকা দুইটী নষ্ট কর; তোমার ঘোড়া ও পদাতিককে (বোড়ে) চালনা কর! তাহার পর রাজা ও গজের গতিরোধ কর, তাহা হইলেই বাজীমাৎ হইবে।'

জাহাঙ্গীর ফিরিয়া আসিয়া উক্তরূপে চতুরঙ্গ-সেনা পরিচালনা করিয়া জয়লাভ করিলেন কিন্তু পারস্য-যুবরাজকে তাহার পণ হইতে অব্যাহতি দিলেন। সেই দিন হইতে বাজী রাখিয়া দাবাখেলা আইনবিরুদ্ধ বলিয়া প্রচারিত হইল।

সংশয়ে।

[লেখক—শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার, বি-এ]

তুমি আছ কেন ভুলি কেন সংশয়ের ধুলি
জীবনের নীল নভঃ ঢাকে অন্ধকারে,
কেন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-ঘোর শ্লথ করে প্রেম-ডোর
কেন মনে হয় সদা হারাই তোমারে!
তুমি ত দিয়েছ সব এ জীবন-বৈভব,
অতুল ঐশ্বর্য্যে ভরা মানবের মন,
তুমি দেছ শত আশা, শত সুখ, ভালবাসা,
তবু কেন অতৃপ্তিতে ভ্রমি অকারণ।
যা দিবার সবি দে'ছ শুধু কিবা নাহি দে'ছ
তারি তরে প্রাণ খালি বুঝি না কি চায়,
তুমি জান ভাল মন্দ আমার সে কেন দ্বন্দ্ব
কেন নিজ-গড়া দুঃখে মরি যাতনায়!
তুমি ছাড়া নই আমি কেন বা বুঝি না স্বামী!
কেন রাখি চিরদিন দূরে আপনায়,
শুধু নিজ পানে চেয়ে স্বার্থের বিচার লয়ে
আপনারে ঘেরি ঘেরি রচিছি আনায়!
এস স্বামী, এস নাথ, বাড়ায়ে দক্ষিণ হাত
চির-সংশয়-জাল ছিন্ন করি দাও;
দিয়ে সুখে দিয়ে দুঃখে তোমারই অভিমুখে
লইতেছ টানি বুকে, বুঝাইয়া দাও!

অলক্ষ্মী।*

[লেখক—শ্রীমন্মথমথন সরকার।]

(১)

হারাণ রায় যখন প্রথমে এ গ্রামে আসে, তখন তাহার না ছিল ধনসম্পদ, না ছিল বন্ধুবান্ধব। নিঃসঙ্গ, কপর্দ্দকহীন হারাণচন্দ্র এক ভাড়াটিয়া ঘরে বাস করিত; আর অক্লান্ত পরিশ্রমের সহিত কাজকর্ম্ম করিয়া যে টাকাকড়ি সে রোজগার করিত, তাহা তাহার নিজের গায়ের রক্ত বলিয়াই বিশ্বাস করিয়া চলিত। কৃপণের ধন হইতে বেশী দেরী কখনও হয় না ;—তাই, বছরের পর বছর, যখন ঘুরিয়া উঠিতে লাগিল, হারাণেরও সিন্দুক রজত ও কাঞ্চন-খণ্ডে ভরিয়া উঠিতে লাগিল। জীবনের যেন এই একটীমাত্র মূলমন্ত্রে সে দীক্ষিত হইয়াছিল যে, যে কোনও উপায়ে হউক দারিদ্র্যের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া কমলার সিংহাসন স্ব-গৃহে প্রতিষ্ঠিত করিতেই হইবে—ধনী হইতেই হইবে! পাছে সংসারে অনাবশ্যক খরচের মাত্রা বাড়িয়া যায়, এই ভয়ে সে বিবাহ করিল না—কখনও করিবে না বলিয়া একটা দৃঢ় সংকল্প মনে আঁটিয়া রাখিল!

হারাণের সেই একাগ্র-সাধনায় বুঝি কমলালয়ায় আসন টলিল। তবে, লক্ষ্মী ঠিক কৃপা করিয়াছিলেন কি না বলিতে পারি না ; কিন্তু হারাণের দালানের পর দালান উঠিতে লাগিল,—তাহার বড় বড় ভাড়াটে বাড়ীতে সহরের প্রায় অর্দ্ধেকাংশ দখল করিয়া বসিল। তবুও তাহার বিলাসের গন্ধমাত্রও ছিল না। রাজপ্রাসাদের ন্যায় সুবৃহৎ অট্টালিকায় হারাণ প্রায় একাকীই বাস করিত। সামান্য দু'একজন ভোজপুরী 'আইরণ চেষ্টে'রই মত আবশ্যক বিবেচনায় দিবারাত্র তাহার আলয়ের এক প্রান্তে স্থান পাইয়াছিল।

এত বড় ধনী হইলে কি হয়, দায়ে না পড়িলে সহজে কেহ তাহার নাম মুখে আনিত না ; আশঙ্কা—পাছে কোনও দৈবদুর্ঘটনা ঘটিয়া যায়!

হারাণের কিন্তু তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। সে একরূপ চৈতন্যহীন হইয়াই সেই একই উদ্দেশ্যে জীবনতরী কর্ম্মস্রোতে অবিরাম ভাসাইয়া চলিতেছিল।

জগতে সকলেরই সঙ্গী জুটে। হারাণেরও জুটিয়াছিল—তাহারই ন্যায় কতকগুলি নিতান্ত কৃপণ ব্যক্তি। এক রাত্রিতে হারাণ তাহার জনৈক কৃপণ

* ইটালীয় গল্প অবলম্বনে।

বন্ধুর বাটী হইতে ফিরিতেছিল। অর্থাগমের নূতন পন্থা আবিষ্কারের গবেষণা করিতে করিতে আজ তাহার অনেক রাত্রি হইয়া গিয়াছিল। একে কৃষ্ণ পক্ষের রাত্রি, তাহাতে আবার তখন আকাশ ঘনমেঘে ঢাকা ছিল। সুতরাং পথ আর দেখা যায় না। এমন সময়ে গ্রহ-বৈগুণ্যে মুষলধারায় ঝড় বৃষ্টি এবং মধ্যে মধ্যে বজ্রঘাত হইতে লাগিল। সঙ্গে দ্বিতীয় ব্যক্তি কেহ নাই। হারাণ একে ধনী, তাহাতে কৃপণ; সুতরাং শত্রুর অভাবও ছিল না। সে বাস্তবিকই অত্যন্ত ভীত হইয়া পথ চলিতেছিল।

হঠাৎ সেই অন্ধকার ভেদ করিয়া একটা ক্ষণিক আলোক ঝলকিয়া গেল; গুড়ুম করিয়া একটা শব্দ হইল, এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে হারাণ বক্ষে বিষম আঘাত পাইয়া পথে উপুড় হইয়া পড়িয়া গেল। ৩।৪ সেকেণ্ড পরে, আহত স্থানে উভয় হস্তে গলার চাদর খানা সজোরে জড়াইয়া ধরিয়া হতভাগ্য ছুটিতে ছুটিতে নিকটস্থ এক কর্ম্মকারের আলয়ে উপস্থিত হইয়া অস্পষ্টস্বরে সাহায্য ভিক্ষা করিল।

নবীন কামার তখন গভীর গবেষণায় ব্যস্ত। তাহার জীবনের একমাত্র প্রতিজ্ঞা ছিল—রসায়ন-বিদ্যাবলে পরশ-পাথর তৈরী করিতে হইবে। অভাগ্য এই মৃগতৃষ্ণিকার পিছনে, আজ ৩০ বৎসর হইতে চলিল, আশায়-নিরাশায় ঘুরিতেছে! তবু তাহার উদ্যমের শেষ নাই—আশার অন্ত নাই!

নবীন ত হারাণের এই আকস্মিক আগমনের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না। সে আগন্তুকের দিকে খানিকক্ষণ অবাক্ হইয়া তাকাইয়া থাকিল। এদিকে হারাণের জীবনীশক্তি দ্রুত কমিয়া আসিতেছিল। সে আর দুই একটা দুর্ব্বোধ্য কথা জড়িতস্বরে উচ্চারণ করিয়া সশব্দে নবীনের হাফরের নিকট পড়িয়া গিয়া প্রাণত্যাগ করিল।

ঘটনাটা ঘটিল কিন্তু চক্ষের নিমিষে। নবীন অনেকক্ষণ কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া বসিয়া রহিল। পরে ধীরে ধীরে হারাণের ভূপতিত দেহের নিকট গিয়া দেখিল—শবের কাষ্ঠবৎ শক্ত হস্তদ্বয় চাদরখানা চাপিয়া বক্ষের উপর দৃঢ়বদ্ধ রহিয়াছে; দেহ স্পন্দহীন ও হতভাগ্যের প্রাণবায়ু বহু পূর্ব্বেই বাহির হইয়া গিয়াছে। সে চিনিতে পারিল, শবদেহ প্রসিদ্ধ ধনী হারাণচন্দ্রের।

(২)

অবস্থা-বিপর্য্যয়ে প্রক্ষিপ্ত মস্তিষ্কটা একটু প্রকৃতিস্থ হইলে. নবীন স্পষ্ট বুঝিতে

পারিল যে, এরূপ ভাবে একটা লাসের পার্শ্বে সকাল পর্য্যন্ত বসিয়া থাকিলে তাহাকেই খুনের দায়ে ফাঁসি কাঠে বুঝিতে হইবে।

তাই সে প্রথমতঃ শবটা পুঁতিয়া ফেলিবার জন্য চিন্তা করিতে লাগিল। ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ তাহার চক্ষু প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। ঐত ঐ হারাণের কাছেই হয়ত তাহার বিপুল ধনভাণ্ডারের চাবিকাটি রহিয়াছে! নবীন যদি চুপি চুপি এখনি ঐ চাবি লইয়া গিয়া হারাণের অর্থসম্পদের কিছু অংশ লইয়া আসে, তবে, তাহারও বিশেষ পাপ হয় না——আর, আত্মীয়-স্বজন-হীন হারাণের অর্থসম্ভারও দশ ভূতে উপভোগ করিতে পায়না! নবীনের আর দেরী সহিল না—সারা জীবন যে, মহা-আবিষ্কারের পিছনে পিছনে সে অন্ধ হইয়া ছুটিতেছিল, সেই মৃগতৃষ্ণিকার নেশা আজ তাহার নিমেষ মধ্যে ছুটিয়া গেল ;—সে ভাবিল, যদি কিছু টাকাকড়িই আজ সে পায়, তবে, তাহার এই মহা ব্যর্থ শ্রমের বিপুল আয়োজনে আর কি প্রয়োজন আছে ?

এইরূপ সাত পাঁচ ভাবিয়া নবীন উঠিয়া দাঁড়াইল। পরে ধীরে ধীরে মৃত দেহের পার্শ্বে গিয়া পুনরায় তাহার বুক, নাক, হাত, পা উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিল এবং আস্তে আস্তে তাহার কটিদেশ হইতে চাবির মস্ত তোড়াটা হস্তগত করিল। একটা দেয়াশেলাইয়ের বাক্স এবং একটা মোমবাতি লইয়া নবীন গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া গেল।

অতিরিক্ত পরিশ্রম না হইলেও, নবীনের সর্ব্বাঙ্গ দিয়া অজস্র ধারায় ঘর্ম্ম ছুটিতেছিল। সে তাহাতে কিছুমাত্র মনোযোগ না দিয়া আস্তে আস্তে পথ বাহিয়া হারাণের বাটীতে উপস্থিত হইল। সৌভাগ্যক্রমে, প্রভুভক্ত ভোজপুরী পালোয়ানদ্বয় রাত্রির আধিক্য এবং দেবতার দুর্যোগ দেখিয়া স্থির করিয়াছিল যে, তাহাদের প্রভু আজ আর ফিরিবেন না; তাই তাহারা প্রভুর বাটীর অনতিদূরে তাহাদের ক্ষুদ্র কুটীরে সুখে নিদ্রা যাইতেছিল। কেহ কোথাও নাই; নিস্তব্ধ রাত্রি; ঘোর অন্ধকার। নবীন দেশালাই দিয়া তাহার বাতিটা জ্বালিয়া লইল এবং এ চাবি সে চাবির পর একটা চাবি দিয়া হারাণের সদর দরজা খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

প্রকোষ্ঠ হইতে প্রকোষ্ঠান্তে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নবীন হারাণচন্দ্রের শয়নকক্ষে আসিয়া দেখিল যে, ৬।৭টা বড় বড় 'আইরণচেষ্ট'! তাহার বুক দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। সর্ব্বাঙ্গে একটা অজ্ঞাত চাঞ্চল্যের ক্ষণিক অনুভূতি প্রবাহিত হইয়া গেল।

সকল সিন্ধুকই খোলা গেল। হাতল টানিয়া এক একটা সিন্ধুকের কপাট যখন সে খুলিয়া ফেলিতেছিল, তখন তাহার চক্ষু ও হৃদয় সিন্ধুক অভ্যন্তরস্থিত হীরামণি জহরৎ ও নানা স্বর্ণ রৌপ্যময় মুদ্রা-দর্শনে বিহ্বল হইয়া পড়িতেছিল। সে ভাবিয়া চিন্তিয়া কেবল বহু মূল্যের হীরকাদি এবং স্বর্ণমুদ্রাগুলি বাহির করিয়া ৪টা বড় বড় থলি ভরিয়া লইল। তৎপরে দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া সে দেখিল যে, 'আইরণচেষ্ট' গুলিতে আর যাহা বাকী থাকিল, তাহা না লইলেও চলিতে পারে। ভাবিবার সময় নাই, তবু নবীনের মনের সম্মুখে আজ চির-দারিদ্র্যের ও চির-সম্পদের ছবি দুইটী ফুটিয়া উঠিতেছিল। কি সুখ! কি সৌভাগ্য! বাস্তবিকই নারিকেলে অম্বু-সম্ভবের ন্যায় লক্ষ্মী কোন পথে কখন আসেন বলা যায় না!

পুনরায় সিন্ধুক প্রভৃতি চাবি বন্ধ করিয়া সদর দরজা পূর্ব্ববৎ রুদ্ধ এবং চাবিবন্ধ করিয়া নবীন যখন সেই চারিটা থলি লইয়া বাটী ফিরিল, তখনও রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতীত হয় নাই। সে দেখিল, হারাণের মৃতদেহ ঠিক তেমনই অবস্থায় পড়িয়া আছে।

রত্নরাজি এক নিভৃত স্থানে রাখিয়া নবীন হারাণের চাবির তোড়া পূর্ব্ববৎ পূর্ব্বস্থানে রাখিয়া দিল। পরে নিকটস্থ একটা ডোবার পার্শ্বে গিয়া কোদাল এবং সাবল দিয়া দুই মানুষ গর্ত্ত খুঁড়িয়া শবটা তাহার মধ্যে নিক্ষেপপূর্ব্বক তাহাতে মাটি চাপা দিয়া ঘাসের চোবড়া বসাইয়া দিল; এবং পরিশেষে, তাহার বাটী হইতে কতকগুলা কয়লা এবং কয়লার গুঁড়া আনিয়া সেই স্থানে এমন ভাবে ছড়াইয়া দিল যে, দেখিলে মনে হয়, সেখানে বুঝি কয়লাই রাখা হইয়া থাকে।

ভাগ্যক্রমে হারাণের লৌহহস্তে ধৃত চাদরখানাই রক্তসিক্ত হইয়া মাটীতে রক্ত পড়িতে দেয় নাই। কোনও স্থানে রক্তের বিন্দুমাত্র চিহ্নও ছিল না।

এই সমস্ত কাজ করিতে রাত্রি তৃতীয় প্রহর অতীত হইয়া গেল। এরূপ পরিশ্রম, কামারের ছেলে হইয়াও, নবীন আর কখনও করে নাই। শ্রান্ত হইয়া সে ক্ষিপ্রহস্তে হস্তপদাদি ধুইয়া ফেলিয়া শয্যাগ্রহণ করিল। তাহার যে, মানসিক অবস্থায় চিন্তার স্থান ছিল না; সে কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল।

(৩)

রজনী প্রভাত হইল। সে প্রভাতে বিশেষত্ব কিছুই ছিল না। প্রহর

থানেক বেলা হইতেই সহরে রাষ্ট্র হইল যে,—প্রসিদ্ধ ধনী হারাণ রাহা নিরুদ্দেশ অবশ্য বন্ধু-বান্ধবদের মহলেই খোঁজটা আগে উঠে; ক্রমে ক্রমে সন্দেহের উদ্ভব হইল। কেহ বলিল—"মফঃস্বলে গিয়াছেন, শীঘ্র ফিরিবেন।" কেহ বা মন্তব্য প্রকাশ করিল—"নিজের দেশে হয়ত গিয়া থাকিবেন।" আবার কোন কোন সন্দিগ্ধচিত্ত ব্যক্তি সাহস করিয়া বলিয়া ফেলিল—"তাঁহাকে কোন দুষ্টলোকে প্রতিশোধ লইতে বা অর্থলোভে হয় ত খুনই করিয়া ফেলিয়াছে।" যাহা হউক, সে দিনের মত কথাটা চাপা পড়িল। সপ্তাহখানেকও কোনও গোলযোগ হইল না। পুলিশ অনুসন্ধান করিয়া কিছু কিনারা করিতে পারিল না। ক্রমে এক মাস অতীত হইলে, গবর্ণমেণ্ট নোটীশ দিলেন যে—"নিরুদ্দিষ্ট হারাণচন্দ্রের সম্পত্তির ন্যায্য দাবীদার যদি কেহ থাকে, তবে সে যেন অচিরে তাহার দাবী সপ্রমাণ করিয়া প্রাপ্য বিষয় সম্পত্ত্যাদি দখল করে, নতুবা ছয় মাস পরে তাহা রাজ-সরকারে বাজেয়াপ্ত করা যাইবে।" ফলতঃ, কার্য্যে কিছুই হইল না। কোনও প্রকার দাবী কেহই করিল না। নবীন এতদিন চুপ করিয়াছিল এবং মধ্যে মধ্যে অন্যান্য পাঁচজনের ন্যায় হারাণ-ঘটিত ব্যাপারে দু'একটা সম্ভব অসম্ভব মত প্রকাশ করিয়া দিনগুলা কাটাইয়া দিতেছিল। বলা বাহুল্য, কেহ ঘুণাক্ষরে ধারণাও করিতে পারে নাই যে, নবীন কামার এ সম্বন্ধে কোনও বিশেষ সংবাদ রাখে।

এইবার লব্ধ-অর্থ উপভোগ করিবার সময় এবং সুযোগ আসিল। তাই নবীন বন্ধুবান্ধবদিগকে বলিল যে, সে এমন একটা অদ্ভুত পদার্থ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তৈয়ারী করিয়াছে যে, তাহার সাহায্যে স্বল্পায়াসেই রূপাকে সোণা করিতে পারা যায়। সে ঐ অপূর্ব্ব দ্রব্যটি ও রূপা হইতে সোণা প্রস্তুত-প্রণালী রাজধানীতে গিয়া তত্রাস্ত কোনও ধনীকে বিক্রয় করিবে।—ইত্যাদি। যাহারা নবীনের মস্তিষ্কবিকৃতির বিষয় অবগত ছিলেন, তাঁহারা তাহার এই নূতন প্রাগলামীতে বিরক্তি বা বিস্ময় কিছুই প্রকাশ করিলেন না। কেবল ২।৪ জন অন্তরঙ্গ বন্ধু দীর্ঘনিঃশ্বাস-সহযোগে এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিলেন যে, হায়! হায়! এতদিনে নবনেটা একটা বদ্ধ-পাগলে পরিণত হ'ল!

নবীন তাহার স্ত্রীকে খুব ভালবাসিত। তথাপি সে এ সম্বন্ধে যথার্থ তথ্য তাহাকে বলে নাই—বলিবে না ভাবিয়াছিল, বিদায়ের পূর্ব্বে তাই সে তাহাকে ও বন্ধুবান্ধবদিগের নিকট যেমন বলিয়াছিল, তেমনি ভাবেই তাহার কল্পিত আবিষ্কার এবং অভিপ্রায়ের কথা বলিল। স্ত্রী ত তাহার কথা শুনিয়া কাঁদিয়াই

আকুল। সে ভাবিল, তাহার স্বামী এবারে একেবারে বদ্ধপাগল হইয়াছে—হয় ত, দূরবিদেশে কোন্ একটা পাগলা-গারদেই শেষ জীবনটা কাটাইতে চলিল। হায়! হায়! অপোগণ্ড শিশুকয়টা ও তাহার জীবন কি বিষময়ই হইল।

সে কোনও প্রকারেই নবীনকে গৃহত্যাগ করিতে দিবে না, স্থির করিল। কিন্তু, নবীনের যাওয়া চাই-ই। কাজেই,—নিতান্ত গরজে পড়িয়া, অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও এক অশুভ মুহূর্ত্তে নবীন তাহার পত্নীকে পারাণ-ঘটিত প্রকৃত ব্যাপার এবং তাহার আকস্মিক সেই বিপুল অর্থ-প্রাপ্তির কথা যথাযথ বলিল। প্রথমে অবশ্য ইহাতে তাহার ভার্য্যার ক্রন্দনের মাত্রা বাড়িয়াই গিয়াছিল;—কিন্তু, নবীন যখন তাহাকে সেই সমস্ত ধনসম্ভার দেখাইল, তখন তাহার বিস্ময় ও আনন্দের সীমা রহিল না। সে এ বিষয় গোপন রাখিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া স্বামীর বিদেশগমন অনুমোদন করিল।

নবীনের গৃহত্যাগের সপ্তাহখানেক পরে নবীন-পত্নী পাড়ার নারীমহলে নবীনের একখানা পত্র পাড়ারই একজন "পড়ুয়া"কে দিয়া পড়াইয়া লইতেছিল। পত্রপাঠে সকলেই শুনিল, নবীন কামারের ভাগ্য এতদিনে সুপ্রসন্ন হইয়াছে। তাহার আবিষ্কারে সন্তুষ্ট হইয়া রাজধানীর এক মস্ত ধনী অনেক টাকা দিয়া তাহার আবিষ্কৃত দ্রব্যাদি এবং রৌপ্য হইতে স্বর্ণপ্রস্তুত-প্রণালী ক্রয় করিয়া লইয়াছেন। আগামী শনিবার নবীন বিপুল অর্থ লইয়া দেশে ফিরিতেছে।

এই শেষের কথা কয়েকটা বিশ্বাস করিল একা নবীন-পত্নী। তাহার এই বিশ্বাস দেখিয়া প্রতিবেশিনীগণ তাহার সৌভাগ্যোদয়ে বিশেষ সুখী হইয়াছেন, মুখে এইরূপ ভাব দেখাইতে লাগিলেন; কিন্তু অনেকেই অন্তরে ভাবিতেছিলেন যে, এত দিন পাগলের সঙ্গে থাকিয়া বুঝি বা নবীনের স্ত্রীরও পাগলামী সুরু হইল!

শনিবার আসিলে নবীন গৃহে ফিরিল। কয়েক মাসের মধ্যেই তাহার শ্রী ফিরিয়া গেল। সুসজ্জিত কক্ষমালা-সমৃদ্ধ উচ্চ উচ্চ হর্ম্ম্যনিকর; মোটর, ফিটন, জুড়ী; দারোয়ান, চাকর, আরদালী—আবার বহুকালের বিস্মৃত বন্ধুবান্ধব ও নিকট আত্মীয়দিগের শুভাগমন এবং পরগাছারূপে অবস্থান—এ সকলের কোনটিই বাকী থাকিল না। সে দিনের নবীন কামার এখন মান্যবর (অনারেবল্) শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র হইলেন!

প্রথম প্রথম বছরখানেক বেশ সুখে স্বচ্ছন্দেই কাটিল। কিন্তু বিধাতার ন এত সুখ বুঝি নবীনের ভোগে হইল না।

(৪)

নবাগত আত্মীয়দিগের মধ্যে নবীনের এক দূরসম্পর্কীয়া মাসীমা তাঁহার চৌদ্দ বছরের অবিবাহিতা এক ভাশুর-ঝিকে লইয়া তাহার বাটীতে বাস করিতেছিলেন। সেই সুন্দরী দরিদ্র-কন্যাকে দর্শনাবধি নবীনের মতিগতি কেমন এক রকমের হইয়া গেল। সে তাহার পত্নীর প্রত্যেক কার্য্যেই দোষ দেখিতে লাগিল, তাহার সহস্র প্রকার আদরের মধ্যেও, কি যেন একটা অসম্পূর্ণতায় তাহার অন্তস্তল বিদ্ধ করিয়া দিতে লাগিল। বলা অনাবশ্যক যে, তাহার পত্নী অগৌণে তাহার এই পরিবর্ত্তন এবং তৎকারণ বুঝিতে পারিল।

ক্রমে যাহা ঘটিল তাহাতে নবীনের সর্ব্বনাশ হইল। সে তাহার মাসীমাকে নানা প্রকারে স্বমতে আনিয়া তাহায় ভাশুর-ঝিকে বিবাহ করিয়া ফেলিল। নবীনের পূর্ব্বপত্নী সপত্নীর উপর খড়্গহস্ত হইয়া তাহার সর্ব্বনাশ করিতে, এবং নবীনের বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ লইতে ভীষণ শপথ করিল।

অভাগিনী আর কোনও উপায় খুঁজিয়া পাইল না—হারাণের অপমৃত্যু, সেই বিস্মৃতপ্রায় রহস্যই অহরহঃ তাহার মনে জাগিতে লাগিল। অবশেষে অন্তর-ব্যথায় অভিভূতা হইয়া এক অশুভ মুহূর্ত্তে হতভাগিনী এক জন প্রথিতনামা বিচারকের নিকট গিয়া, হারাণের অপমৃত্যু, তাহার স্বামীর হঠাৎ ধনপ্রাপ্তি, হত শবদেহ রক্ষা, এবং তাহার রক্ষাস্থানের আমূল বৃত্তান্ত সবিশেষ বর্ণন করিয়া ন্যায়বিচার প্রার্থনা করিল। ঐ বিচারকের স্বগ্রামে নবীনের পত্নীর পিত্রালয়; বাল্যকাল হইতে বিচারক তাহাকে জানিতেন। তিনি স্ত্রীলোকটির কথা শুনিয়া তাহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে মনে করিলেন। কিন্তু তাহার নিতান্ত আগ্রহাতিশয্যে যখন তাহার নির্দ্দিষ্ট স্থান খনন করাইয়া হারাণের অস্থি-কঙ্কাল প্রভৃতি মিলিল, তখন নবীনকেই হত্যাপরাধী বিবেচনা করিয়া গ্রেপ্তার করিলেন, এবং তাহার সমস্ত ধন সম্পত্তি রাজাধিকারভুক্ত করিয়া দিলেন।

বিশেষ প্রমাণ-প্রয়োগের আর প্রয়োজন হইল না। নবীন যখন জানিল যে সে তাহার স্ত্রীকর্ত্তৃক এইরূপে নিগৃহীত হইতেছে, তখন সে স্বহস্তে হারাণকে হত্যা করিয়াছে বলিয়া মিথ্যা এজাহার দিল। জীবনে তাহার এতই বিতৃষ্ণা হইয়াছিল

বিচারক রায়ে লিখিলেন—নবীন হত্যাপরাধী। সে দোষ স্বীকার করিয়াছে। তাহার ফাঁসি হইবে এবং সকলের শিক্ষার জন্য, তাহা জনসাধারণে দেখিতে

পাইবে। কাতারে কাতারে নরনারী বধ্যস্থানে জমা হইল। যথাকালে নবীনের ফাঁসি হইয়া গেল।

(৫)

এই ফাঁসির কথা যখন নবীনের পূর্ব্বপত্নীর কর্ণগোচর হইল, তখন তাহার পূর্ব্বাভাস ফিরিয়া আসিয়াছে। হতভাগিনী দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ আজ যে মহা অনর্থ ঘটাইল, তাহাতে লজ্জায়, ক্ষোভে এবং পরিতাপে তাহার সমস্ত হৃদয় ভরিয়া উঠিল। কিন্তু এখন আর কোনও উপায় নাই। ওঃ কি নিষ্ঠুর কথা! উপায় নাই! সমস্ত প্রাণখানা আলোড়িত করিয়া তীব্র জ্বালাময় নিশ্বাস সেই শোকাচ্ছন্ন গৃহখানা ভেদ করিয়া উঠিতেছিল—কিন্তু তবুও উপায় নাই!

নিজের শিশুগুলি সঙ্গে করিয়া অভাগিনী পাগলিনীর ন্যায় আলুথালুবেশে বধ্যভূমিতে উপস্থিত হইয়া জানাইল—সে একটীবার মাত্র তাহার মৃতস্বামীকে দেখিতে চাহে! প্রহরীর পাষাণ-হৃদয়ও বুঝি সে করুণ ক্রন্দনে গলিয়া গিয়াছিল। সে বিশেষ কোনও আপত্তি করিল না।

সদ্যোবিধবা যখন মৃতদেহের পদতলে গিয়া সেই হিমশীতল পদযুগল পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিতে করিতে কাতরকণ্ঠে বলিতেছিল—স্বামি, দেবতা—না বুঝে হিংসার বিষে তোমায় মেরেছি। প্রভো রক্ষা কর! রক্ষা কর!

পাগলিনীর চক্ষু সহসা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল! উন্মত্তা তাহার বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে একখানি শাণিত ছুরিকা বাহির করিল। বিদ্যুদ্‌গতিতে একে একে তাহার শিশুগুলির বুকে উহা বসাইয়া দিল এবং পলকমধ্যে নিজ বক্ষোদেশে আমূল বিদ্ধ করিয়া দিল! প্রহরী যখন বাধা দিবে বলিয়া ছুটিয়া সেইখানে পৌছিল, তখন তাহার প্রাণশূন্য দেহখানা, শিশুসন্তানদিগের শবের পার্শ্বে, মৃত নবীনের পদতলে চিরনিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিল;—অভাগিনীর করযুগল নবীনের পদদ্বয়ের উপর পড়িয়া যেন ক্ষমা-ভিক্ষার শেষ প্রয়াস করিতেছিল।

সাহিত্য-প্রসঙ্গ।

—০—

[লেখক—শ্রীঅমূল্যচরণ সেন।]

বাঙ্গালা ভাষা প্রাদেশিক ভাষা; বাঙ্গালা সাহিত্যও তাহাই; ইহা যে সমগ্র ভারতের ভাষা বা সাহিত্য নহে, তাহা নিতান্ত বালকেও জানে। বাঙ্গালা ভাষা কোনও দিন অখণ্ড ভারতের ভাষা হইবে কি না, তাহা জানি না। কিন্তু তাই বলিয়া যে দিন দিন উহাকে ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ রাখিতে হইবে, এমন কথা অর্ব্বাচীনেও বলিবে না। বাঙ্গালা ভাষার প্রয়োগ সর্ব্বজনবোধগম্য হউক,—এ কামনা প্রত্যেক বাঙ্গালীই করিয়া থাকে। বাঙ্গালা ভাষা—বাঙ্গালীর ভাষা; বাঙ্গালাদেশের ভাষা। সুতরাং বাঙ্গালীমাত্রেই—বাঙ্গালাদেশের সকল অঞ্চলের লোকেই যাহাতে এ ভাষা বুঝিতে পারে, লেখকমাত্রেরই সে চেষ্টা করা উচিত। আমি বাঙ্গালী—বাঙ্গালাদেশের সকল অঞ্চলের লোকেই আমার আত্মীয়; আমার কথা বুঝিবার দাবী তাঁহাদের আছে। বিদ্যাসাগর হইতে বঙ্কিম-যুগের প্রায় সকল লেখকই এ কথা বুঝিয়াছিলেন। সেই জন্য তাঁহারা যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালাদেশের সকল অঞ্চলের লোকেই বুঝিতে পারে। মেদিনীপুরের লোক যদি মেদিনীপুরের কথিত ভাষায় এবং চট্টগ্রামের লোক যদি চট্টগ্রামী ভাষায় পুস্তক রচনা করেন, তাহা হইলে মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামের লোক তাহা সহজেই বুঝিতে পারে; কিন্তু তাঁহাদের সেই ভাষার অর্থবোধ বাঙ্গালাদেশের অন্যান্য স্থানের লোকের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠে। এই সহজ কথাটা যে বাঙ্গালাভাষার আধুনিক কালাপাহাড়েরা বুঝেন না, এখন ত মনে হয় না! অথচ তাঁহারা কলিকাতার চলিত ভাষা সাহিত্যে চালাইবার চেষ্টা করিতেছেন; সুখের বিষয় সে চেষ্টা ফলবতী হইবার সম্ভাবনা নাই।—'বীরবলে'র বাহু বিকল হইয়া পড়িয়াছে! সবুজ পত্র নীলবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে! খোসখেয়ালের বশে এবং বিলাতী পাণ্ডিত্যের অভিমানটুকু সম্বল করিয়া ভাষার সংস্কার করা যায় না। তাহা সাধনা-সাপেক্ষ, প্রতিভা-সাপেক্ষ; তাহাও আবার যেমন-তেমন সাধনা বা প্রতিভা নহে,—অতি উচ্চদরের সাধনা বা প্রতিভা।

* * *

বাঙ্গালা ভাষাকে ইংরেজীর ছাঁচে ঢালিয়া লেখা অনেকের অভ্যাস হইয়া পড়িয়াছে। ইংরেজী কায়দায়, ইংরেজী ভঙ্গীতে বাঙ্গালা না লিখিলে অনেকে

বোধ হয় হাতের জল শুদ্ধ হইল না বলিয়া মনে করেন। অন্যের কথা পরে; স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত এই কার্য্য করিয়া থাকেন। গত বৈশাখ মাসের "ভারতী"তে 'তখন ও এখন' শীর্ষক প্রবন্ধের এক স্থলে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন :—

"জীবন যে একটা অনিশ্চিতের মুখে রওনা হইয়াছিল তাহার শেষ সীমানায় ঠেকিয়া নিশ্চিতের মুখে যাত্রা করিতে থাকে—তাহা সেই নিশ্চিত পরিণাম, যাহার মধ্যে ব্যক্তিবিশেষ আপন বিশেষত্ব ত্যাগ করিয়া পঞ্চত্ব লাভ করে।"

বাঙ্গালাদেশের অল্পশিক্ষিত ব্যক্তিদিগের কথা ছাড়িয়া দাও, শিক্ষিত লোকের মধ্যে কয়জন রবীন্দ্রনাথের এই ভাষার অর্থ বুঝিতে পারিবেন? ইংরেজী ভঙ্গীতে বাঙ্গালা লিখিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথের মত প্রতিভাশালী লেখকও কিরূপ হাস্যাস্পদ হইয়াছেন, তাহা বোধ করি, কাহাকেও স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতে হইবে না। রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত 'মাতৃসম মাতৃভাষা'র সঙ্গে ইংরেজীয়ানার ছাপ মারিবার জন্য এখনও প্রলুব্ধ হইয়া রহিয়াছেন! কিন্তু এ কার্য্যে সিদ্ধিলাভ হইতে পারে না। বিদেশীয় ভাবকে জীর্ণ করিয়া স্বদেশী ভাষার ছাঁচে ঢালিয়া বাঙ্গালীর বুঝিবার মত বাঙ্গালা ভাষায় লিখিতে না পারিলে সিদ্ধিলাভ অসম্ভব। এই জন্য রবীন্দ্রনাথ ভাবপ্রবণ ইংরেজীনবীশ বাঙ্গালী যুবকগণের প্রশংসার পাত্র হইয়াছেন। তাহাদের বাহিরে যে বিশাল বাঙ্গালী-সমাজ রহিয়াছে, রবীন্দ্রনাথ অদ্যাবধি তাহাদের সহিত পরিচয় স্থাপন করিতে পারেন নাই। কারণ, রবীন্দ্রনাথের ভাষা বড়ই ইংরেজী-ঘেঁসা ও দুর্ব্বোধ।

* * *

'মানসী' মহারাজের 'শ্রুতি-স্মৃতি' সানন্দে বহন করিতেছে! 'শ্রুতি-স্মৃতি' বেশ হইতেছে। যেমন ভাব-সম্পদ্, তেমনই ভাষার সৌন্দর্য্য। তবে স্থানে স্থানে 'বাঁকাইয়া নাক দেখাইবার' চেষ্টা আছে এবং সে চেষ্টা বিলক্ষণই আছে বলিয়া বোধ হয়। 'শ্রুতি-স্মৃতি'তে সত্যগোপনের প্রয়াস দেখিতে পাই না। ইহাই এই জীবন-কাহিনীর প্রধান গুণ। তিনি লিখিতেছেন :—"বাল্য-কাল হইতে বহু দিবস পর্য্যন্ত ইঁহাকেই আমার গর্ভধারিণী বলিয়া ধ্রুব বিশ্বাস ছিল, অল্প বয়সে আমার দিদিদিগের সহিত কলহ হইলে তাঁহারা আমার মনে দুঃখ দিবার জন্য বলিতেন,—'তুমি ত আর এ মার পেটে হও নাই'—তখন এই নির্ম্মম বাক্য-শেলের নিদারুণ আঘাতে আহত মন ও অশ্রু-সিক্ত চক্ষু লইয়া ইঁহারই নিকট "মা মা" বলিয়া নালিশ করিতে গিয়াছি, আজ সেই স্নেহশীলা রাজেন্দ্রাণীকে, নিতান্ত কাঙ্গালের সন্তান আমি, আমার রোগশয্যার

পার্শ্বে বসিয়া অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতে দেখিয়া আমার রোগক্লিষ্ট পঞ্জরাস্থির মধ্যে প্রাণ যেন নিদারুণ আঘাতে একান্ত ব্যথিত হইয়া উঠিল।" নিজে যে পোষ্য পুত্র, এ কথার পরিচয় তিনি তাঁহার এই জীবন-কাহিনীর যত্র-তত্র দিয়াছেন। প্রশংসার কথা, সন্দেহ নাই। কিন্তু মুদ্রাদোষ তাঁহাকে ত্যাগ করে নাই। 'শ্রুতিস্মৃতি'র 'ঝর্ ঝরে্ তর্ তরে' ভাষার মধ্যে এক 'নিয়া' জুটাইয়া 'মহারাজ শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়' সমস্তই মাটি করিয়া দিতেছেন। তাঁহার এরূপ 'নিয়া"-প্রীতি কেন?

* * *

নববর্ষের 'ভারতী' (বৈশাখ, ১৩২৩) দেখিলাম। মন্দ হয় নাই। গত বৈশাখে 'ভারতী' চল্লিশ বৎসরে পড়িয়াছে! বাঙ্গালা মাসিকের ক্ষণভঙ্গুর জীবনে ইহা বিস্ময়কর ব্যাপার সন্দেহ নাই। 'ভারতী' 'রূপার ঝিনুক' মুখে লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, সুতরাং দারিদ্র্যের সহিত তাহাকে কোনও দিনই সংগ্রাম করিতে হয় নাই। 'ভারতী' জীবনের প্রথম কয়েক বৎসর "জোড়াশাঁকোর ঠাকুরবাড়ী"তেই কাটাইয়াছিল। তাহার পর শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী এবং তাঁহার কন্যাগণ সেবা-যত্নে উহাকে 'যমের হাত' হইতে রক্ষা করিয়াছেন; এমন কি, 'যমের বাড়ী' হইতেও কয়েকবার ফিরাইয়া আনিয়াছেন। পুরুষে যাহার 'হাল ছাড়িয়া' দিয়াছিলেন, স্ত্রীলোকে যে তাহাকে 'বানচাল' হইতে দেন নাই, ইহা প্রশংসারই কথা। চল্লিশ বৎসরের 'ভারতী'র কাহিনী বাঙ্গালা মাসিকের ধারাবাহিক জীবন-কথা। ইহাতে জানিবার কথা অনেক আছে।

'ভারতী'র পুরাতন সংখ্যা হইতে মেঘনাদ-বধ কাব্যের 'সমালোচনা' শীর্ষক যে প্রবন্ধ উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহার একাংশে এইরূপ লিখিত আছে।

"আমাদের পাঠকসমাজের রুচি ইংরেজী শিক্ষার ফলে একাংশে যেমন উন্নত হইয়াছে, অপরাংশে তেমনই বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে। ভ্রমর, কোকিল, বসন্ত লইয়া বিরহ বর্ণনা করিতে বসা তাঁহাদের ভাল না লাগুক, কবিতার অন্য সকল দোষ ইংরাজি গিল্‌টিতে আবৃত করিয়া তাঁহাদের চক্ষে ধর তাঁহারা অন্ধ হইয়া যাইবেন। ইঁহারা ভাব-বিহীন মিষ্ট ছন্দের মিলন-সমষ্টি বা শব্দাড়ম্বরের ঘনঘটাচ্ছন্ন শ্লোককে মুখে কবিতা বলিয়া স্বীকার করিতে লজ্জিত হন, কিন্তু কার্য্যে তাহার বিপরীতাচরণ করেন। শব্দের মিষ্টতা অথবা আড়ম্বর তাঁহাদের মনকে এমন আকৃষ্ট করে যে, ভাবের দোষ তাঁহাদের চক্ষে প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। কুশ্রী ব্যক্তিকে মণি-মাণিক্য-জড়িত সুদৃশ্য পরিচ্ছদে আবৃত

করিলে আমাদের চক্ষু পরিচ্ছদের দিকেই আকৃষ্ট হয়, ঐ পরিচ্ছদ সেই কুশ্রী ব্যক্তির কদর্য্যতা কিয়ৎ পরিমাণে প্রচ্ছন্ন করিতেও পারে, কিন্তু তাহা বলিয়া তাহাকে সৌন্দর্য্য অর্পণ করিতে পারে না।"

পুরাতন "ভারতী"র এই নির্দ্দেশ নূতন "ভারতী" গ্রহণ করে নাই। জ্ঞান-বৃদ্ধের উপদেশ নবীনের নিকট উপেক্ষার বিষয়ীভূত হইয়াছে। "ভারতী"র কবিতা-পুঞ্জের যাঁহারা 'চক্ষুষ্মান' পাঠক, তাঁহারা আমাদের এই উক্তির সমর্থন করিবেন। এই যুগটাকে কবিতার হেঁয়ালির যুগ বলা যাইতে পারে। তোমরা যতই কেন ইহাকে "Mysticism এর age" ইত্যাদি নামে অভিহিত করিতে চেষ্টা কর না, সে চেষ্টা বৃথা হইবে। কাণাকে পদ্মলোচন বলিলে লোক শুনিবে কেন? তোমাদের 'মিষ্টিক' কবির আদর্শ ত রবীন্দ্রনাথ! তাঁহার প্রতিভা-নদীতে এখন ভাঁটা পড়িয়াছে। সুতরাং তিনি এখন যাহা লিখিতেছেন, তাহা ঘোলা ভিন্ন আর কি হইবে?—অন্ধ ভক্তেরা তাহা ত মানিবে না।—তাহারা তোষামোদের ব্যজনে, স্তুতির বাহ্বাস্ফোটে কবির মাথা আরও বিগড়াইয়া দিতেছে। তিনি যাহা লিখিতেছেন, তাহাই তাহাদের নিকট পরম উপাদেয় হইতেছে! ছেলে বয়সে টক আমও মিষ্ট বোধ হয়; তোষামোদের পাঠশালার 'চারু-মণি'র দল তেমনই রবীন্দ্রনাথের সকল কবিতাই 'আহা মরি' বলিয়া গ্রহণ করে। কিন্তু তাহাদের স্মরণ রাখা উচিত, বাঙ্গালার সকল পাঠক তাহাদের মত তোষামোদের পাঠশালায় হাতে খড়ি দেয় নাই।

* * *

অমরেন্দ্রনাথ! তুমি চিরজীবী হও। তোমার সোণার দোয়াত-কলম হউক। তোমার চোখা চোখা সমালোচনার বাণে রবীন্দ্রনাথ অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন। আবার সে অস্থিরতা কাঁদুনীর আকারে বৈশাখের 'ভারতী'তে 'তখন ও এখন' শীর্ষক প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধে চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বের বাঙ্গালা সাহিত্যের সহিত আধুনিক সাহিত্যের তুলনা করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ অকারণ রাগ ও অক্ষমতা-প্রকাশ ভিন্ন আর কিছু প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। 'আকাশে থু থু ফেলিলে তাহা নিজের গায়েই পড়ে'—এ সত্য কি 'নোবেল-প্রাইজে'র অভি-মানে কবি ভুলিয়া গিয়াছেন?—চল্লিশ বৎসরের বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনা করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ কটু কথাই সম্বল করিয়াছেন। কারণ, তিনিই বলিয়াছেন:—"যেমন দেখা যায়, তরকারীকে সুস্বাদু করিবার শক্তি যাহাদের নাই তারা সকল

রান্নাতেই খুব করিয়া লঙ্কা-মরিচ প্রয়োগ করে, তেমনি সাহিত্যিক রান্নায় যাদের হাতে আর কোন মশলা নাই, তাদের একমাত্র ভরসা কটু কথা।"

রবীন্দ্রনাথ আরও লিখিয়াছেন,—"বাঙ্গালা সাহিত্যকে কি আমরা পাকা বয়সের সাহিত্য বলিতে পারি? না পারি না।" সুতরাং বাঙ্গালা সাহিত্যের বয়স কাঁচা—বর্ণ সম্ভবতঃ সবুজ। সাহিত্য যখন তাঁহার মতে কাঁচা, ইহার সমালোচকেরা 'পাকা বয়সের' হইবেন, এমন আশা তিনি করিতে পারেন না। সুতরাং কাঁচা সাহিত্য কাঁচা সমালোচকের হাতেই খোঁচা খাইবে,—ইহা অস্বাভাবিক নহে। ইহার জন্য দুঃখ করিলে, রাগ করিলে, গুমরিয়া মরিলে নিজের দুর্ব্বলতাই প্রকট হইয়া পড়ে। 'অন্ধ বাউল' রবীন্দ্রনাথ কবিবর মাইকেল মধুসূদনকে কি ভাবে আক্রমণ করিয়াছিলেন তাহা এখন মনে আছে কি? মনে পড়ে কি চন্দ্রনাথের উপর আক্রমণের কথা? মনে পড়ে কি, কাহার ভাষা দেখিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন মেছোহাটার ভাষা ইহার কাছে হার মানে? তিনি এই প্রবন্ধে বাঙ্গালা সাহিত্যকে কচি ডালপালা ও সমালোচকদিগকে 'গরু ছাগল' বলিয়া মনের ঝাল ভাষায় মিটাইয়া লইয়াছেন মাতৃভাষার পবিত্র প্রাঙ্গণ তাঁহারা 'আগাছা-কুগাছা'য় পূর্ণ করিবেন, আর সমালোচকেরা 'চুপ করিয়া' বসিয়া থাকিবে,—এ মীরজাফরী কাণ্ড যাহারা পারে করুক। অন্ততঃ 'গরু ছাগল' হইয়াও মাতৃভাষার উদ্যান হইতে 'আগাছা-কুগাছা'গুলিকে লণ্ডভণ্ড করিতে পারিলে সমালোচকেরা গৌরব বোধ করিবে।—সুতরাং তাঁহার গালি তাহারা মাথা পাতিয়াই লইবে।

রবীন্দ্রনাথ চাহেন,—তিনি সশিষ্য যাহা লিখিবেন তাহাই বাঙ্গালা সাহিত্য হইবে; মন্দ হইলেও, অসহনীয় হইলেও, তাহার বিরুদ্ধে কেহ কথা কহিতে পারিবে না। এই বিষয়টী মনে সর্ব্বদা তোলাপাড়া করেন বলিয়াই তিনি অতীতের চিত্রে তাঁহার মনের কথা আঁকিয়া দেখাইয়াছেন :—

"সেই চল্লিশ বছর পূর্ব্বে দেশের মনটা ছিল অনেক বেশী কাঁচা। লেখক কাঁচা, পাঠক কাঁচা, সাহিত্য কাঁচা। ঠিক সেই সময়ে আমি যে ষোল বছরে পড়িয়াছিলাম ও আমার ভারি সুবিধা ঘটিয়াছিল।

"তখনকার কাঁচা বুদ্ধিতে যাহা আসিত তাহাই কাঁচা কলমে লিখিতে বসিলাম; মনে ভয়-ডর-মাত্র ছিল না। কোন বড়া লোকের কাছে এ সম্বন্ধে যে বিশেষ একটা জবাবদিহি আছে, এ ভাবটা যেন দেশের কোনখানেই নাই। . . . .

"তখনকার দিনে, পাঠকেরা যে আছে, এটা খুব স্পষ্ট করিয়া যেন দেখা যাইত না, এই জন্য ভয়লজ্জাটা মনে ছিল না। * * *"

রবীন্দ্রনাথ এই সুবিধার মুখে কলম ধরিয়াছিলেন! এজন্য তাঁহার সৌভাগ্যের প্রশংসা আমরা অবশ্যই করিব, কিন্তু তাঁহার সেই কলমের ভিতর হইতে যাহা বাহির হইয়াছে, তাহার ভালগুলিকে ভাল এবং মন্দগুলিকে মন্দ বলিতেই হইবে, নিছক প্রশংসার ভাগী তিনি কেমন করিয়া হইবেন?—একথাটা তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন:—

"তখনকার দিনে পাঠকদিগকে বিশেষ সমীহ করিবার দরকার ছিল না এটা ভাল কি মন্দ সে তর্ক করিব না—আমার বলিবার কথা এই যে, এই সুযোগটুকু না হইলে লিখিবার বদ্-অভ্যাসটা বাল্যকাল হইতে আমাকে পাইয়া বসিত না—অতএব এ সম্বন্ধে আমার যত কিছু অপরাধের জন্য আমি একেলা দায়ী নই।"

কথাটা ঠিক।—তখনকার সমালোচকেরা যদি সমালোচনার শাসনে বালক রবীন্দ্রনাথকে—নব্য লেখনীধারী রবীন্দ্রনাথকে সংযত করিতেন, তাহা হইলে আজ তিনি অগ্নি-শুদ্ধ স্বর্ণের মত আমাদের সাহিত্যক্ষেত্রে বিরাজ করিতেন। তাঁহার অনেক আবর্জ্জনা স্তূপীকৃত হইয়া বাঙ্গালা-সাহিত্যে দুর্গন্ধ ও কীট-পতঙ্গের সৃষ্টি করিত না।

রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে রাগের বশে সমালোচকদিগকে গালিও দিলেন, প্রশংসাও করিলেন! জিজ্ঞাসা করি, তাঁহার কোন্‌টা ঠিক—গালি না প্রশংসা?

মণি।

[লেখক—শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য]।

(১)

কুসীদব্যবসায়ী রামজীবন ঘোষাল মহাশয়কে গ্রাম্য স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক ...লক' আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। আমরা কিন্তু জানি, ইহা ...র সম্পূর্ণ অতিরঞ্জিত কথা, এবং অমূলক নিন্দাবাদ মাত্র! কারণ, ...াল মহাশয় প্রাপ্য টাকার পরিবর্ত্তে কখনও কাহারও বক্ষোমাংস-গ্রহণে ...ছিলেন না, বরং টাকার জন্য তিনি নিজ দেহের মাংস দান করিতে কাতর

হইতেন না! অধিক কি, কখনও কোন দুঃস্থ খাতক যদি সুদের টাকার পরিবর্ত্তে দুগ্ধ, ঘৃত প্রভৃতি দ্রব্য দিতে চাহিত, ঘোষাল মহাশয় সে সকল কিছুতেই গ্রহণ করিতেন না। তিনি বলিতেন, "বাপু, টাকা দিয়াছি টাকা লইব; দুধ ঘি লইয়া পাপের ভাগী হইব কেন?" পাপের ভয়টা ঘোষাল মহাশয়ের এত প্রবল ছিল!

তবে কেহ যদি অর্থের সহিত সম্বন্ধ না রাখিয়া কোনও বস্তু দান করিত, ঘোষাল মহাশয় সন্তুষ্টচিত্তে তাহা গ্রহণ করিতেন। কেন না প্রতিগ্রহ ব্রাহ্মণের অন্যতম ধর্ম্ম; ইহার প্রত্যাখ্যানে প্রত্যবায় আছে।

তোমরা হয় তো বলিবে, ঘোষাল মহাশয় যে মাঝে মাঝে খাতকের ঘরবাড়ী, থাল ঘটী, গরুবাছুর বেচিয়া লইতেন, সেটা কি ভাল কাজ হইত? আমরা কিন্তু এ জন্য ঘোষাল মহাশয়কে দোষ দিতে পারি না, ন্যায়ধর্ম্মের মর্য্যাদারক্ষার অনুরোধেই তিনি এমন কাজ করিতেন। সংসারে লোকগুলা যেমন কূটবুদ্ধি, তেমনই অকৃতজ্ঞ। তাহারা যখন বিপদে পড়িত, তখন টাকার জন্য ঘোষাল মহাশয়ের হাতে পায়ে ধরিত, দিনে সাতবার হাঁটাহাঁটি করিয়া তাঁহাকে বিব্রত করিয়া তুলিত। তার পর খাতায় টিকিট মারিয়াই হউক বা খত লিখিয়া দিয়াই হউক, একবার টাকাটা হস্তগত করিতে পারিলে, সে আর সে পথ দিয়া চলিত না। তাগাদা করিলে, "দিচ্ছি, দেব, অজন্মা, খেতে পাই না," এইরূপ কাঁদুনি গাহি ফাঁকি দিবার চেষ্টা করিত। কিন্তু সকলেই যদি এইরূপে ফাঁকি দিয়া নিস্তা পায়, তাহা হইলে সংসার হইতে ন্যায়ধর্ম্মটা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইবে, পাপের ভ পৃথিবী রসাতলে যাইবে। অগত্যা পৃথিবীর এই অকালমৃত্যু নিবারণের জ ঘোষাল মহাশয়কে মধ্যে মধ্যে আদালতের দ্বারস্থ হইতে হইত।

আদালতে যাওয়া, সেটাও কি কম অধর্ম্মের ভোগ! ঘরের টাকা পরকে দিয়া কে এতটা অধর্ম্মভোগ স্বীকার করে? ঘোষাল মহাশয়কে কিন্তু সে ভোগটা স্বীকার করিতে হইত। কেন না, তাঁহার হৃদয়টা এতই কোমল এবং এমনই দয়াবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত যে, কেহ বিপদে পড়িয়া কাঁদাকাটা করিলে তিনি আর স্থির থাকিতে পারিতেন না। তথাপি সময়ে সময়ে তিনি একটু কঠোর হইতেন, টাকায় দু'পয়সা, তিন পয়সা, কখন বা চারি পয়সা সুদের ভয় দেখাইয়া তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিতেন। কিন্তু নাছোড়বান্দা লোক কিছুতেই ছাড়িত না, টাকায় চারি পয়সা সুদ স্বীকার করিয়াও টাকা লইয়া যাইত!

ইহার পর তিন বৎসর অপেক্ষা করিয়াও যদি সুদ-আসল না পাওয়া যা

এবং খাতক যদি সুদ দিতে অক্ষমতা জানায়, তবে কোন্ ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি এই সকল অকৃতজ্ঞ মিথ্যাবাদী খাতককে ক্ষমা করিতে পারে ?

দুঃখের বিষয় ঘোষাল মহাশয়ের এই কষ্টার্জ্জিত অর্থ ভোগ করিবার উত্তরাধিকারী কেহ ছিল না। উত্তরাধিকারীর আশায় তিনি পর পর দুইটী রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহারা এমনই অকৃতজ্ঞ যে, দশ বৎসর ধরিয়া তাঁহার অন্নধ্বংস করিয়া, তাঁহাকে একটীও সন্তান উপহার না দিয়া, নিশ্চিন্তমনে পরলোকের পথে যাত্রা করিল। একবারও তাঁহার মুখের দিকে ফিরিয়া চাহিল না, তাহারা চলিয়া গেলে যে তাঁহাকে একমুঠা রাঁধিয়া দিবার পর্য্যন্ত লোক থাকিবে না, এ কথাটাও একবার ভাবিয়া দেখিল না। হায় রে অকৃতজ্ঞ নারীজাতি !

ঘোষাল মহাশয় এই অকৃতজ্ঞ জাতিটার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, উত্তরাধিকারী না হয় না হউক, না খাইয়া মরিতে হয় তাহাও স্বীকার, তথাপি নিয়ত অন্নধ্বংসে নিপুণা এই হৃদয়হীনা জাতিকে আর গৃহে স্থান দিবেন না।

এইরূপ কঠোর প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়া, ঘোষাল মহাশয় পুনরায় দারপরিগ্রহে বিরত হইলেন। বাটীতে আর স্ত্রী বা পুরুষ অভিভাবক ছিল না। অগত্যা ঘোষাল মহাশয়কে গৃহস্থালীর সকল কার্য্যই সম্পাদন করিতে হইত, স্বহস্তে রাঁধিয়া খাইতে হইত। ইহাতে যে কষ্ট হইত না এমন নহে, কিন্তু সে কষ্ট তিনি বীরের ন্যায় বুক পাতিয়া লইতেন, তাঁহার স্থিরপ্রতিজ্ঞা কিছুতেই বিচলিত হইত না।

(২)

ঘোষাল মহাশয়ের এই প্রতিজ্ঞাটা ভীষ্মের প্রতিজ্ঞার ন্যায় চিরদিন অচল থাকিত কি না বলা যায় না, কিন্তু প্রতিবেশী যদু চক্রবর্ত্তীর কন্যা মণি দিয়া একটা গোল বাধাইয়া দিয়াছিল। সেই যে কবে ঘোষাল মহাশয় নাতিনী এই দশ বৎসরের মেয়েটীকে ক'নে সম্বোধনে তাহার সহিত আত্মীয়তার সূত্রপাত করিয়াছিলেন, সেই দিন অবধি মণি এই বয়স্ক কল্পিত বরটীর অনুগত হইয়া পড়িয়াছিল। সে সমবয়স্ক সঙ্গী সঙ্গিনীদিগকে ত্যাগ করিয়া পঞ্চাশৎ বর্ষীয় পককেশ ব্যক্তিটীকেই আপনার ক্রীড়া-সঙ্গী করিয়া লইয়াছিল। পরে বিবাহের কথা উত্থাপন করিলেই মণি সেখান হইতে ছুটিয়া পলাইত. ঘোষাল মহাশয় যখন তাহাকে ক'নে বা গিন্নী বলিয়া ডাকিতেন, তখন সে বর বলিয়া সম্বোধন করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইত না।

মণি তাহার কল্পিত বরের গৃহকার্য্যে অনেক সহায়তা করিত। তাহার সাক্ষাতে ঘোষাল মহাশয় কোন গৃহকার্য্য করিতে গেলে, সে তাঁহাকে সরাইয়া দিয়া বলিত, "ছি, ক'নে থাক্‌তে বর বুঝি ঘরকন্নার কাজ করে?" ঘোষাল মহাশয় হাসিতেন, মণি গম্ভীরভাবে আপনার কাজ করিয়া যাইত। ঘোষাল মহাশয় যখন রন্ধন করিতেন, তখন মণি বসিয়া বসিয়া তাঁহাকে রন্ধন-সম্বন্ধে অজস্র উপদেশ দিত। ঝোলে ওই নুণটুকু দাও, অম্বলটা সাঁতলে নিতে হয়, ভাজাগুলা যে পুড়ে যাচ্ছে, এইরূপ উপদেশ দিয়া এই বয়সেই সে আপনাকে গৃহিণীপণার উচ্চপদে অধিষ্ঠিত করিয়া একটা গর্ব্ব অনুভব করিত।

পঞ্চাশৎবর্ষীয় বৃদ্ধের সহিত দশমবর্ষীয়া বালিকার যে প্রণয় জন্মিয়াছিল, এমন কথা বলা যায় না। তবে এই সঙ্গিহীন অসহায় বৃদ্ধের উপর মণির যে একটা সহানুভূতি জন্মিয়াছিল তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

নারীজাতির উপর সম্পূর্ণ বিরূপ হইলেও ঘোষাল মহাশয় কিছুতেই এই বালিকাটীর সংস্রব হইতে আপনাকে দূরে রাখিতে পারিতেন না। বরং এই বালিকাটী যতক্ষণ কাছে থাকিত, ততক্ষণ তিনি দেনা-পাওনা, সুদের হিসাব, মামলা-মোকদ্দমা সকল বিস্মৃত হইয়া, যেন একটা স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করিতেন, সংসারের কঠোরতা যেন অনেকটা কোমল হইয়া আসিত। বিশেষতঃ পীড়ার সময় যখন তিনি একটা সঙ্গীর অভাব বিশেষরূপে অনুভব করিতেন, একটু জলের জন্য ছটফট করিতেন, সেই সময়ে যখন মণি আসিয়া সুশীতল জলপাত্র তাঁহার মুখের কাছে ধরিত, তাঁহার জ্বর-তপ্ত ললাটে আপনার ক্ষুদ্র কোমল হাতখানি বুলাইয়া শান্তির একটা মধুর প্রলেপ দিত, তখন তিনি ভাবিতেন, এই অকৃতজ্ঞ নারীজাতিটার যতই দোষ থাকুক, তা'দের সেবায় বেশ একটা আরাম পাওয়া যায়।

এমনই করিয়া দিন কাটিতে লাগিল। কিন্তু ক্রমে মণি যখন দ্বাদশবর্ষে পদার্পণ করিল, যখন তাহার পরিপুষ্ট দেহলতা একটা নূতন চাঞ্চল্যের আবেগে অচিরাৎ বসন্তের আগমন-সম্ভাবনা জানাইয়া দিল, তখন একটা নূতন আকাঙ্ক্ষা ঘোষাল মহাশয়ের মনের ভিতর মাঝে মাঝে উঁকি দিতে লাগিল।

(৩)

"মণি, ও মনোমোহিনি, ও গিন্নি!"

"কেন গা বরমশায়?"

"বলি আজ যে এ বুড়োটাকে একেবারেই ভুলে গেলে?"

মণি স্বীয় গণ্ডদেশে করতল সংন্যস্ত করিয়া অতিমাত্র বিস্ময়ের স্বরে বলিল, "ও মা, এ কি কথা! তুমি বুড়ো? কে তোমায় বুড়ো বলে?"

"বলে এই পাঁচ শালায়।"

"তাদের কি চোখ নাই?"

"তা থাক্‌লে কি তা'রা এই এক কুড়ি পার না হ'তেই চোখে চশমা আঁটে? আর দেখ না, আমি আড়াই কুড়ি পার হ'য়েও চশমার ধার ধারি না। তবু বলে আমি বুড়ো।" এই বলিয়া ঘোষাল মহাশয় হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিলেন। মণিও হাসিতে হাসিতে তাঁহার সম্মুখে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দুপুরবেলা এত কাগজ পত্তর নিয়ে বসেছ কেন? এ সব কিসের কাগজ?"

ঘোষাল। এগুলা দেনা-পাওনার কাগজ। শিবে ময়রা আজ সুদ দিয়ে গেল, তা'রই জমা খরচ কর্‌চি।

মণি। আর এই ছোট কাগজগুলা?

ঘোষাল। ও গুলা নোট, ওর এক একখানার দাম দশ টাকা।

মণি। ক'খানা নোট আছে দেখি। এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছ'খানা। তা হ'লে কত টাকা হ'লো?

ঘোষাল। ষাট টাকা,—তিন কুড়ি।

মণি বিস্মিত হইয়া বলিল, "ওঃ, তোমার এত টাকা দাদামশায়?"

ঈষৎ হাসিয়া ঘোষাল মহাশয় বলিলেন,—এ আর ক'টা টাকা রে পাগ্‌লি?

মণি। আরও টাকা আছে না কি?

ঘোষাল। আছে বৈ কি। দেখ্‌বি?

মণি আহ্লাদে বলিয়া উঠিল,—দেখ্‌ব।

"তবে আয়" বলিয়া ঘোষাল মহাশয় চাবির গোছাটা লইয়া সিন্দুকের কাছে গেলেন, এবং সিন্দুক খুলিয়া মণিকে ভিতরে দেখিতে বলিলেন। প্রথমটা একটু অন্ধকার বোধ হইল, ক্ষণপরেই মণি দেখিল, ওঃ কত টাকা! থাকে থাকে সাজান কত নোট! সারি সারি তোড়াবন্দী টাকা! মণি তাহার একটা তুলিতে গেল, কিন্তু পারিল না। তখন সে বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে ঘোষাল মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "দাদা মহাশয়, তোমার এত টাকা।"

মৃদু হাসিয়া ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "আবার এদিকে দেখ্‌।"

মণি সবিস্ময়ে সেদিকে চাহিল। দেখিল, একটা বড় বোক্‌নোর মধ্যে সোণা রূপার কত গহনা! সে অলঙ্কার-রাশির ঔজ্জ্বল্যে মণির চক্ষু যেন ঝলসিয়া যাইতে

লাগিল। সে মুগ্ধ-দৃষ্টিতে অলঙ্কার-রাশির দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এত গহনা কার দাদামশায় ?"

ঘোষাল। ও সব বন্ধকী গহনা ; এখন আমারই। আয় তোকে পরিয়ে দিই।

তখন সেই অলঙ্কারের পাত্র বাহির করিয়া ঘোষাল মহাশয় তাহার মধ্য হইতে বাছিয়া বাছিয়া কতকগুলা গহনা মণিকে পরাইয়া দিলেন। স্বর্ণাভরণে ভূষিত হইয়া মণি যেন সত্যই মনোমোহিনী হইয়া দাঁড়াইল। ঘোষাল মহাশয় দেখিলেন, এতদিন সিন্ধুকরূপ অন্ধকারায় অবরুদ্ধ অলঙ্কারগুলার আজ যেন অলঙ্কার জন্ম সার্থক হইল।

তারপর মণি এক এক করিয়া গহনাগুলি খুলিয়া দিল ; ঘোষাল মহাশয় তাহা যথাস্থানে রক্ষা করিয়া সিন্ধুক বন্ধ করিলেন।

মণি জিজ্ঞাসা করিল, "এ সব গহনা কা'কে দেবে দাদামশায় ?"

ঘোষাল মহাশয় সোৎসুক-দৃষ্টিতে মণির মুখের দিকে চাহিলেন। মণি মুখ টিপিয়া একটু হাসিয়া চলিয়া গেল। ঘোষাল মহাশয় ভাবিলেন, "এমন ভাগ্য কি আমার হবে ?"

কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর ঘোষাল মহাশয় দেখিলেন, ভাগ্যটা তাঁহার আয়ত্তের নিতান্ত বাহিরে নয় ; একটু চেষ্টা করিলেই হয় তো তাঁহার আশা-বৃক্ষে সুফল ফলিতে পারে।

ঘোষাল মহাশয় পুনরায় সিন্ধুক খুলিয়া একটা কাগজের দপ্তর বাহির করিলেন, এটা সেটা খুঁজিয়া তাহার ভিতর হইতে একখানা রেজিষ্টারী তমশুক বাহির করিলেন। সেখানা যদুনাথ চক্রবর্ত্তীর প্রদত্ত। যদুনাথ একবার মাতৃ-শ্রাদ্ধের সময় একশত টাকা, এবং আর একবার অজন্মার বৎসরে একশত তের টাকা ঋণ-গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু ঋণ শোধ করিতে না পারায়, কিছুদিন পরে সুদ ও আসল একত্র করিয়া তিনশত তেত্রিশ টাকার একখান তমশুক লিখিয়া দিয়াছিল।

ঘোষাল মহাশয় একখান পৃথক্ কাগজে সন মাস হিসাব করিয়া সুদ কষিয়া দেখিলেন, সুদে আসলে মোট চারিশত পঞ্চান্ন টাকা সাত আনা পাওনা হইয়াছে। একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া তিনি তমশুকখানাকে বাক্সের ভিতরে পৃথক্ করিয়া রাখিয়া দিলেন।

(৪)

ঘরে তের বছরের মেয়ে। সুতরাং যদুনাথের আহার নিদ্রা নাই। আজ

দুই বৎসর ধরিয়া তিনি পাত্রের অনুসন্ধান করিতেছেন, কিন্তু মনোমত পাত্র মিলিতেছে না। পাত্র মিলিলেও অর্থ-সামর্থ্যে কুলাইয়া উঠে না। অগত্যা অল্প ব্যয়ে একটী মনোমত পাত্র খুঁজিতে খুঁজিতে মণি ত্রয়োদশে পদার্পণ করিল। সমাজ ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিল, প্রতিবেশিনীরা ছি-ছি করিতে লাগিল, যদুনাথ পাত্রের অন্বেষণে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ছুটাছুটি করিয়া দুই জোড়া জুতা ছিঁড়িয়া ফেলিলেন, তথাপি পাত্র মিলিল না!

অনেক ছুটাছুটি হাঁটাহাঁটির পর যদুনাথ যে দিন একটী পাত্র স্থির করিয়া আসিলেন, সেই দিন সন্ধ্যার সময় চিন্তামণি-ঘটক আসিয়া ঘোষাল মহাশয়ের পুনরায় দার-পরিগ্রহের ইচ্ছা প্রকাশ করিল, এবং মণিই যে তাঁহার যোগ্যপাত্রী ইহাও সংক্ষেপে জানাইয়া দিল। কিন্তু যদুনাথ এ প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারিলেন না। তখন চিন্তামণি তাঁহাকে বিশেষরূপে বুঝাইতে চেষ্টা করিল যে, এই বিবাহে সকল দিকেই মঙ্গল। ইহাতে সম্মত হইলে তাঁহার এক পয়সাও খরচা হইবে না, অধিকন্তু তিনি ঋণের গুরুভার হইতে মুক্তি পাইবেন। আর মেয়েও সুখে থাকিবে; গ্রামে ঘোষাল মহাশয়ের মত অর্থ আর কাহার আছে? পাত্রীর অভাব কি? হরগঞ্জের জয়রাম গাঙ্গুলীর চৌদ্দ বৎসরের মেয়ে; সে হাত ধোয় না। নিশ্চিন্তপুরের সর্ব্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী পঞ্চাশ টাকা ঘটক-বিদায় দিতে প্রস্তুত। কিন্তু ঘটক মহাশয় যদুদাদার একান্ত শুভানুধ্যায়ী, এই জন্যই তিনি সেই সকল প্রলোভন পরিত্যাগ করিয়া যদুনাথকে অনুরোধ করিতে আসিয়াছেন।

পরে ঘটক মহাশয় যদুনাথের গা টিপিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "দাদা বুঝচ না, ভবিষ্যতে এ সবই তোমার। একবার গিন্নীর সঙ্গে পরামর্শ করে দেখ।"

কিন্তু যদুনাথ পরামর্শের অপেক্ষা করিলেন না। তিনি স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিলেন,—"খুড়ার ভীমরথীর বয়স হয়েছে, কিন্তু আমার এখনও সে বয়স হয় নাই। আর ওরূপ টাকায় আমি——ইত্যাদি।"

ঘটক মহাশয় তখন হতাশচিত্তে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ঘোষাল মহাশয়ের নিকট সকল কথা সালঙ্কারে নিবেদন করিল। শুনিয়া ঘোষাল মহাশয়ের চোখ দু'টা লাল হইয়া উঠিল। ঘটক বলিল, "ঘোষাল মশায়, আপনি ভাববেন না। অনুমতি করুন, কালই অপ্সরীর মত চৌদ্দ বছরের মেয়ে এনে দিচ্ছি। চক্রবর্ত্তী বেটার থোতা মুখ ভোঁতা হয়ে থাক্।"

কিন্তু ঘোষাল মহাশয় তাহাতে রাজি হইলেন না, পরে দেখা যাবে বলিয়া ঘটককে বিদায় দিলেন।

পরদিন অতি প্রত্যুষে ঘোষাল মহাশয় যদুনাথের তমঃসুক ও কয়েকটী টাকা লইয়া মহকুমা যাত্রা করিলেন।

(৫)

"মণি, ও মনমোহিনী, তোর নাকি বিয়ে ?"

"শুনছি ত তাই।"

"কবে ? কোথায় ?"

মণি তর্জ্জনীর অগ্রভাগ দ্বারা গণ্ডদেশ স্পর্শ করিয়া বলিল, "ওমা, তুমি তা জান না ? বলে, যার বিয়ে তার মনে নাই।"

ঘোষাল মহাশয় ঈষৎ বিষাদপূর্ণ স্বরে বলিলেন, "আর দিদি, এখন কি আর এই বুড়োকে মনে ধরবে ?"

মণি যেন অতি মাত্র বিস্মিত হইয়া বলিল, "তুমি তো বেশ লোক দাদামশায় ? এত কাল আশা দিয়ে শেষে সময় কালে পেছিয়ে দাঁড়াও।"

মৃদু হাসিয়া ঘোষাল মহাশয় উত্তর করিলেন, "সাধে কি পেছিয়ে দাঁড়াই ? এই বয়সে এমন রত্ন নিয়ে শেষে কি পাঁচ শালার চক্ষু শূল হয়ে দাঁড়াব ?"

মণি বলিল, "তা তুমি হও হবে, আমার কিন্তু সে ভয় একটু ও থাক্‌বে না।"

ঘোষাল মহাশয় হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। মণি ঝাঁটা গাছটা তুলিয়া লইয়া উঠান ঝাট দিতে প্রবৃত্ত হইল।

মানুষ চিরদিনই মানুষ। সময় বিশেষে স্থান কাল পাত্রভেদে তাহার হৃদয় বজ্র হইতে ও কঠোর হইতে পারে, প্রকৃতি শার্দ্দূল অপেক্ষা ভীষণভাব ধারণ করিতে পারে, কুৎসিত আচরণে পিশাচও তাহার নিকট পরাজিত হয়। কিন্তু সময় বিশেষে স্থান বিশেষে, তাহার সেই কুলিশ-কঠোর হৃদয় কুসুম অপেক্ষা কোমল হইয়া পড়ে, ভীষণ শার্দ্দূল প্রকৃতিতে মমতার স্নিগ্ধস্রোত বহিয়া যায়, পৈশাচিক চরিত্রে অন্ততঃ মুহূর্ত্তের জন্য দেব-ভাব বিকশিত হইয়া উঠে। যত নীচ, যত অধম, যত ঘৃণিত হউক না কেন, মানুষ চিরদিনই মানুষ।

যদুনাথের উপর আন্তরিক ক্রুদ্ধ এবং তাহার সর্ব্বনাশে সমুদ্যত হইলেও ঘোষাল মহাশয় কিন্তু মণির নিকট আপনাকে স্থির রাখিতে পারিতেন না। সেই চঞ্চলা বালিকা অঙ্গে কৈশোরের সম্পূর্ণতা লইয়া, মুখে প্রীতির মোহন রাগ মাখিয়া, স্বরে বসন্তের মধুর আহ্বান জাগাইয়া, যখন তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইত, স্নিগ্ধ মধুর কণ্ঠে ডাকিত, "দাদা মশায়" তখন সে আহ্বান তাঁহার মর্ম্মের প্রতিতন্ত্রীতে গিয়া প্রহত হইত, তাঁহার প্রতিহিংসাপ্রবণ হৃদয় একটা

অজ্ঞাত মোহে মুহূর্ত্তের জন্য অবসন্ন হইয়া পড়িত, তিনি বর্ত্তমানের স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করিতেন।

তারপর মণি চলিয়া গেলে তাঁহার জাগ্রৎ স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যাইত। তিনি ভাবিতেন, "হায়! জীবনের ম্লান অপরাহ্ণে আবার ঊষার আলোক দেখা দেয় কেন? পারঘাটে যাত্রার সময় মণি পাছু হইতে ডাক দিল কেন? যদি ডাকিল, তবে পশ্চাতে ফিরিয়া আর তাহাকে পাইলাম না কেন? অন্ধকারময় জীবন-সন্ধ্যাকে গভীরতর অন্ধকারে ঢাকিয়া দিয়া সে এমন করিয়া পালাইল কেন?"

ভাবিতে ভাবিতে ঘোষাল মহাশয়ের হৃদয় নৈরাশ্যের দারুণ আঘাতে যেন ভাঙ্গিয়া পড়িত, বুকের ভিতর প্রতিহিংসার আগুন ধক্ ধক্ জ্বলিয়া উঠিত। সে আগুনে হতভাগা যদু চক্রবর্ত্তীকে দগ্ধ করিবার জন্য তাঁহার প্রাণ উন্মাদ হইয়া উঠিত।

(৬)

সে দিন মণির বিবাহ। তখন সবে মাত্র প্রভাত হইয়াছে, ঊষার স্বর্ণচ্ছটা বৃক্ষাগ্র রঞ্জিত করিয়া সবে মাত্র উৎসব-প্রাঙ্গণে পতিত হইয়াছে, দ্বারে রোসন-চৌকীর সানাই বিভাষের ললিত তান তুলিয়া মিলনোৎসবের আনন্দবার্ত্তা আকাশে বাতাসে ছড়াইয়া দিতেছে। এমন সময় সহসা দ্বিতীয় রাহুগ্রহের ন্যায় আদালতের পেয়াদা তথায় আবির্ভূত হইয়া উৎসবের আনন্দজ্যোতি ম্লান করিয়া দিল।

ঘোষাল মহাশয় পূর্ব্ব হইতেই মোকদ্দমা এক তরফা ডিক্রী করাইয়া রাখিয়াছিলেন। তারপর সময় বুঝিয়া ডিক্রী জারি করিয়া অস্থাবর সম্পত্তির ক্রোকী পরোয়ানা বাহির করিলেন। পাছে দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধে এই আশঙ্কায় কোর্টে দরখাস্ত করিয়া পুলিশ হইতে একজন কনেষ্টবল লইলেন। পূর্ব্ব নির্দ্দেশ অনুসারে পেয়াদা ও কনেষ্টবল রাত্রিকালে তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হইল। তিনি তাহাদিগকে চর্ব্ব্যচোষ্যরূপে ভোজন করাইয়া এবং ভবিষ্যতে যথাযথ দক্ষিণা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া, প্রভাতেই যদুনাথের বাড়ীতে পাঠাইয়া দিলেন।

চৌকীদার কনেষ্টবল সমভিব্যাহারে অস্থাবর সম্পত্তির ক্রোকী পরোয়ানা হস্তে সহসা পেয়াদার আবির্ভাব দেখিয়া যদুনাথ প্রমাদ গণিল, পুরনারীরা হায় হায় করিয়া উঠিল, সাগরের ললিত তান অন্তরার অর্দ্ধ পথে না যাইতেই থামিয়া গেল।

যদুনাথের এই আকস্মিক বিপদের সংবাদ বিদ্যুৎগতিতে পাড়ায় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। পাড়ার অনেক লোক আসিয়া সমবেত হইল। তাহাদের কেহ

যদুনাথের বিপদে দুঃখ প্রকাশ করিল, কেহ ঘোষাল মহাশয়কে গালি দিল, কেহ বা মুখ টিপিয়া একটু হাসিল। কেহ উপদেশ দিল, "কোর্টে গিয়া ক্রোক রদের দরখাস্ত কর।" কেহ বলিল, "পাঁচ জনে ঘোষাল মশায়কে ধরিয়া নিরস্ত কর।" যাহার দেহে ক্ষমতা আছে, সে বলিল, "মারিয়া তাড়াইয়া দাও।"

যদুনাথ কিন্তু এ সকল উপদেশের একটাও সারবান্ বলিয়া মনে করিতে পারিল না; সে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া বিপদে মধুসূদন স্মরণ করিতে লাগিল।

এ দিকে ঘোষাল মহাশয় পেয়াদাকে পাঠাইয়া দিয়া, স্বয়ং তথায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। প্রাতঃকৃত্য সারিয়া, ঘরে চাবি দিয়া দুর্গাস্মরণপূর্ব্বক তিনি বাহির হইলেন। কয়েক পদ অগ্রসর হইবামাত্র পশ্চাৎ হইতে মণি ডাকিল, "দাদামশায় ?"

"কে, মণি ?" বলিয়া ঘোষাল মহাশয় পশ্চাতে ফিরিলেন। মণির হাস্য-চঞ্চল মুখখানাকে গম্ভীর দেখিয়া তাঁহার বুকটা কেমন করিয়া উঠিল।

"এ সব কি দাদামশায় ?"

"কি মণি !"

বৃদ্ধের মুখের উপর তিরস্কারপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মণি বলিল, "তোমার এমন কাজ ?"

বালিকার সেই তীব্র দৃষ্টির সম্মুখে ঘোষাল মহাশয় যেন এতটুকু হইয়া গেলেন। কি উত্তর করিবেন, স্থির করিতে পারিলেন না।

মণি ডাকিল,—দাদামশায় !

"কেন মণি !"

"তুমি কি বাবাকে রক্ষা করতে পার না ?"

"পারি, যদি আমি যা চাই তাই পাই।"

"তুমি কি চাও ?"

"আমি শুধু তোকে চাই মণি।"

"বেশ, আমায় পাবে।"

বিস্ময়-বিজড়িত কণ্ঠে ঘোষাল মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই আমাকে বিয়ে কর্‌বি মণি ?"

মণি স্থিরস্বরে উত্তর করিল, "হাঁ, বাবাকে বাঁচাবার জন্য তোমায় বিয়ে

"কেবল বাপকে বাঁচাবার জন্য ?"

"হাঁ, কেবল বাবাকে বাঁচাবার জন্য।"

"আমার কত টাকা, কত গহনা আছে দেখেছিস ?"

"দেখেছি। কিন্তু টাকা গহনার ভিতরে কতটুকু সুখ থাকে দাদামশায় ?"

মণির মুখে শ্লেষের হাসি দেখিয়া ঘোষাল মহাশয় মরমে মরিয়া গেলেন। তিনি বলিলেন, "তা হ'লে বাপের জন্য তুই নিজের সুখ ত্যাগ কর্‌বি ?"

"হাঁ।"

"কিন্তু তোর বাপ মত দেবে না।"

"আমি বল্‌লেই মত দেবেন। এখন তোমার মত কি বল।"

"আমার মত ? তোকে পেলে মণি আমি হাতে স্বর্গ পাই। কিন্তু——না, তুই এখন ঘরে যা, আমি একটু ভেবে দেখি।"

মণি চলিয়া গেল। ঘোষাল মহাশয় সেইখানে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলেন। একসঙ্গে অনেকগুলা চিন্তা আসিয়া তাঁহার মনের ভিতর একটা ঝড় তুলিয়া দিল। যে মণির জন্য তিনি উন্মাদ, সেই মণি আজ তাঁহার হস্তগত, অমরার দৃঢ়রুদ্ধ দ্বার আজ তাঁহার সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত। কিন্তু মণি তাঁহাকে একি শিক্ষা দিয়া গেল ? ক্ষুদ্র বালিকা পিতার জন্য জীবনের সমস্ত সুখে জলাঞ্জলি দিতে প্রস্তুত; আর তিনি এই বয়সে আত্মসুখের জন্য একটী বালিকাকে কামনার অনলে ভস্মসাৎ করিতে উদ্যত। তাঁহার অর্থ আছে; কিন্তু অর্থে কি যথার্থই সুখ পাওয়া যায় ? তিনি তো অনেক অর্থ সঞ্চয় করিয়াছেন; কিন্তু সুখ কোথায় ? জীবনের সাফল্য কৈ ? অর্থে সুখ থাকিলে তিনি আবার অন্য উপায়ে সুখ লাভের জন্য এত লালায়িত কেন ? ভগবান্! এ বয়সে আর কেন ? আমাকে সুখের পথ দেখাইয়া দাও, কামনার ধ্বংস করিয়া দাও!

ঘোষাল মহাশয় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং সিন্দুক খুলিয়া একটা ছোট পুঁটুলী হাতে লইয়া বাহিরে আসিলেন।

(৭)

ঘোষাল মহাশয় যখন যদুনাথের বাটীতে উপস্থিত হইলেন, তখন সেখানে অনেক লোক জমিয়াছিল; অনেকেই ঘোষাল মহাশয়ের এই নীতিবিগর্হিত কার্য্যের তীব্র সমালোচনা করিয়া পরলোকে তাঁহার একটা ভয়ানক স্থানে বাসের সম্ভাবনা জানাইতেছিল। কিন্তু বৃদ্ধের উপস্থিতি মাত্রেই সকলে তূষ্ণীম্ভাব ধারণ করিল। কেন না তাহাদের অনেকেই বৃদ্ধের নিকট অল্প-বিস্তর ঋণগ্রস্ত।

ঘোষাল মহাশয় ভিড় ঠেলিয়া পেয়াদার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, কি গো প্যাদা সাহেব, বসে বসে ভাবছ কি ?"

পেয়াদা বলিল, "মশাই, আজ বাড়ীতে বিয়ে।"

ভ্রুকুটী করিয়া ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "ভাগ্যে বাপু কথাটা আমায় শানালে ? বিয়ে বাড়ীতে কিছু জলযোগের ব্যবস্থা হয়েছে কি ?"

পেয়াদা একটু গরম হইয়া বলিল, "মশাই, সরকারী চাকর হলেও আমি মানুষ। আজকের দিনে এমন কাজটা করা কি ভাল ?"

শ্লেষের হাসি হাসিয়া ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "বাপু, তুমি এক কাজ কর, এই ব্যাগ আর চাপরাশ ফেলে একটা টোল খুলে ফেল; বেশ ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা দিতে পারবে।"

যদুনাথ আসিয়া ঘোষাল মহাশয়ের পায়ে পড়িয়া দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল," রক্ষা কর খুড়ো, রক্ষা কর। আজকার দিন বাদে আমার ঘর বাড়ী সব বেচিয়া লও, আমাকে জেলে দাও। কিন্তু আজ রক্ষা কর, আমার জাতি ধর্ম্ম সব যায়।"

পা ছাড়াইয়া লইয়া ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "কিছুই যাবে না বাবাজী কিছুই যাবে না, সব বজায় থাকবে। তোমার মেয়ে আমায় বিয়ে করতে রাজি।"

যদুনাথ সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "এঁ্যা, আমার মেয়ে !"

ঘোষাল মহাশয় সহাস্যে বলিলেন. "হঁা, তোমার মেয়ে—মণি।"

ঘোষাল মহাশয় চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, "মণি, মণি !"

বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা দরজার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। মণিও সেখানে ছিল। ঘোষাল মহাশয়ের আহ্বানে সে ধীরে ধীরে আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল। ঘোষাল মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন মণি, আমাকে বিয়ে করতে তুই রাজি ?"

মণি মুখ নীচু করিয়া ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "ঘাড় নাড়লে হবে না। সোজা কথায় তোর বাপকে শুনিয়ে বল্ রাজি কি না।"

মণি দুই তিনটা ঢোক গিলিয়া বহু কষ্টে জড়িতকণ্ঠে বলিল, "হঁা রাজি।"

সমবেত জনমণ্ডলীর কণ্ঠ হইতে একটা অস্ফুট ধ্বনি নির্গত হইল। ঘোষাল মহাশয় সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া হাতের পুঁটুলীটী খুলিতে খুলিতে বলিলেন,

"তবে মণি, এই গয়নাগুলো পর্। আমার ক'নে কখন আজ এমন খালি গায়ে থাক্‌তে পারে না।"

ঘোষাল মহাশয় স্বহস্তে এক একখানি করিয়া গহনা মণিকে পরাইয়া দিলেন। সেই সকল বহুমূল্য অলঙ্কার দেখিয়া সকলে চমৎকৃত হইল। ঘোষাল মহাশয় প্রসন্ন দৃষ্টিতে মণির স্বর্ণালঙ্কারদীপ্ত মুখখানির দিকে চাহিয়া যদুনাথকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"দেখ দেখি বাবাজি, তোমার পছন্দসই জামায়ের সাত পুরুষে কখনও এমন গয়না চোখে দেখেছে ?"

ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "একটা দোয়াত কলম শিগ্‌গীর একটা দোয়াত কলম দাও। মণি, তুই আর একটু দাঁড়া। তুই চলে গেলে আমার সব গোল-মাল্ হয়ে যাবে।"

এক জন ছুটিয়া গিয়া দোয়াত কলম আনিয়া দিল। ঘোষাল মহাশয় পেয়াদার হাত হইতে ডিক্রীর কাগজখানা লইয়া তাহার পৃষ্ঠে লিখিলেন, "দাবীর সমস্ত টাকা বুঝিয়া পাইলাম।" তাহার নীচে নিজের নাম সহি করিয়া কাগজখানা যদুনাথের হাতে দিলেন। যদুনাথ সেখানা মাটীতে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, "তা' হবে না খুড়ো, প্রাণ থাক্‌তে আমি মণিকে তোমার হাতে দেব না। খুড়ো, আমার সর্ব্বস্ব লও, কিন্তু মণিকে——"

ঘোষাল মহাশয় পা ছিনাইয়া লইয়া ভ্রুকুটী করিয়া বলিলেন, "চুপ কর্ বেয়াদব ; তোর মত নেমকহারামের মেয়েকে রামজীবন ঘোষাল বিয়ে করে না। তুই এখন মণিকে যার হাতে ইচ্ছা দিতে পারিস্। কিন্তু সাবধান, শাঁখের শব্দ যেন আমার কানে না যায়। এস প্যায়দা সাহেব !"

ঘোষাল মহাশয় ভিড় ঠেলিয়া উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়া প্রস্থান করিলেন। স্তব্ধ জনমণ্ডলী বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাঁহার গমনপথের দিকে চাহিয়া রহিল। রুদ্ধকণ্ঠ সানাই আবার নূতন সুরের তরঙ্গ তুলিয়া গাহিয়া উঠিল,—

'আপনা বলিতে যা ছিল হামারি
সব দিনু তুয়া পায়।'

পতি-দেবতা।

(১)

দেবতা আমার—

অনন্ত উদ্যম আশা, প্রাণঢালা ভালবাসা,

জীবনের একমাত্র শান্তি-পারাবার,

করুণা-মাখানো প্রাণ দয়া স্নেহ মূর্ত্তিমান্,

মহিম-ব্যঞ্জক তুমি জ্ঞানের ভাণ্ডার।

(২)

দেবতা আমার—

চাহি না গোলোক স্বর্গ, নাহি চাহি চতুর্ব্বর্গ,

তুমি যে দেবতা মম শত তপস্যার,—

অনন্ত বিহ্বল প্রাণে, চেয়ে চেয়ে তব পানে,

বেঁচে রব—ম'রে যাব, বাসনা আমার।

(৩)

দেবতা আমার—

শান্তি প্রীতি সাধ আশা ঢেলে দেছ ভালবাসা,

আমি যে জানি না দিতে তা'র প্রতিদান,

মাঙ্গলিক মন্ত্র প'ড়ে তুমি মোর করে ধ'রে

সংসারের মাঝে মম বাড়ায়েছে মান।

(৪)

দেবতা আমার—

আমি গো পেয়েছি যাহা ব্রহ্মাণ্ডে মেলে না তাহা,

এমন করুণাপূর্ণ নিঃস্বার্থতা আর,

করিলেও শত দোষ, ক্ষমা কর ভুলে রোষ,

সকল দেবতা হ'তে তুমি মম সার।

(৫)

দেবতা আমার—

কি ফল দেবতা-সেবে' আর কি আমারে দেবে,

যা' দিয়াছ তাহে পূর্ণ হৃদয়-আগার,—

জনম জনম ভরি'— ওই পদ ধ্যান করি—

পাই যেন ওই পদ চির পূজিবার।

(৬)

দেবতা আমার—

শত মরণের(ও) পরে আবার এমনি ক'রে

রহিবে প্রণয়-আশা হৃদে দু'জনার—

এ বিশ্বাস এই আশা, ভক্তি প্রীতি ভালবাসা—

অক্ষয় হউক এই ভিক্ষা অনিবার।*

৺ সরস্বতী দেবী।

---

* লেখিকা চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সের সময়ে স্বামীকে এই কবিতাটী লিখিয়াছিলেন। গত ৯ই বৈশাখ, শোচনীয় ভাবে ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে। ইনি 'অর্চ্চনা'র পাঠক-পাঠিকার পরিচিত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিহর শাস্ত্রী মহাশয়ের পত্নী ছিলেন। ৺'অর্চ্চনা'—সম্পাদক।

সাহিত্য-সমাচার।

শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা—শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু প্রণীত। প্রথম ষটক অর্থাৎ ষষ্ঠ খণ্ড অবধি ৮০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। দ্বিতীয় ষটকের প্রথম খণ্ড অর্থাৎ নবম অধ্যায় অবধি আমরা পাইয়াছি। বোধ হয় অবশিষ্ট অংশ এখনও যন্ত্রস্থ। এই গীতার আয়তন সংস্কৃত ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করিয়া বর্দ্ধিত করা হয় নাই। শ্রীশঙ্করাচার্য্য রামানুজ, মধুসূদন, হনুমান শ্রীধরস্বামী প্রভৃতি ভাষ্যকারদিগের টীকাভাষ্য পর পর বসাইয়া গেলে খুব বৃহদায়তনের গীতা সঙ্কলন করা যাইতে পারে। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রবিজয় বাবু মূল সংস্কৃত শ্লোক ব্যতীত অপর সংস্কৃত ভাষা পুস্তক মধ্যে ব্যবহার করেন নাই। তাহাতে কিরূপে এই গ্রন্থের এত বড় আয়তন হইল তাহা বলিতেছি।

'পন্থা' প্রভৃতি ধর্ম্মবিষয়ক মাসিক পত্রিকার পাঠকদিগের নিকট গ্রন্থকার সুপরিচিত। তিনি এতাবৎকাল নিষ্ঠার সহিত নিঃশ্রেয়স-সিদ্ধির জন্য সাধনা করিতেছিলেন, বিভূতি—অর্জ্জন করিতেছিলেন। এখন জ্ঞানমার্গে অগ্রসর হইয়া সারাজীবনের উপলব্ধি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন বলিয়া আজ বাঙ্গালী শিক্ষিত সমাজকে তাঁহার এই সাধন ফল অর্পণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। দেবেন্দ্রবিজয় বাবু ইংরাজি-নবীশ এম্-এ। এ যুগে ইংরাজিনবীশদিগের শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতার প্রতি শ্রদ্ধা দিন দিন বাড়িতেছে। যুগপ্রবর্ত্তক বিবেকানন্দ ও এই সম্প্রদায় ভুক্ত—তিনিও ইংরাজের কলেজে পাশ্চাত প্রণালীতে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। কেবল টোলে পড়িয়া জ্ঞান অর্জ্জন করিলে পাশ্চাত্য-বিদ্যার বিশ্লেষণী-শক্তি অধিকার হয় না। কিন্তু পাশ্চাত্য প্রণালীতে শাস্ত্রালোচনা করিলে নূতন দিক হইতে তত্ত্বানুসন্ধান করিতে পারা যায়। আমাদিগের আধুনিক শিক্ষা যে বিজ্ঞানের উপর স্থাপিত, ঠিক সেই বিজ্ঞানের সহিত সামঞ্জস্য করিতে পারিলে. শাস্ত্রদীক্ষা ফলবতী হয়। বিবেকানন্দের সাফল্যের ইহা অন্যতম কারণ। দেবেন্দ্রবিজয় বাবুর গীতার ব্যাখ্যা দেখিয়া আমাদিগের সেই কথা মনে হয়। তিনি সুদীর্ঘ ব্যাখ্যা-ভূমিকায় শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতার সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যার মত ভেদের কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া গীতা-ব্যাখ্যার মূলসূত্র ধরিতে যত্নবান হইয়াছেন। সেই মূলসূত্র ধরিয়া তিনি গীতাভাষ্যে নানা মুনির নানা মতের সমাধান করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। মোটের উপর তাঁহার মূলসূত্র শ্রীশঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যে বিদ্যমান। তাঁহার মতে—শ্রীশঙ্কর বাসুদেবাখ্য পরব্রহ্ম তত্ত্ব যেরূপে বিবৃত করিয়াছেন, তাহাতে দ্বৈতবাদী বা ঈশ্বরনিষ্ঠ ভক্ত বৈষ্ণবাচার্য্যগণের বড় মতভেদ থাকিতে পারে না। শঙ্করাচার্য্য অদ্বৈতবাদী সত্য। কিন্তু সেই অদ্বৈতবাদ অনুসারে এ স্থলে তিনি যে অদ্বয় ব্রহ্মতত্ত্ব বিবৃত করিয়াছেন, তাহা রামানুজ প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মতের বিরোধী নহে।" অবশ্য এ সকল কথা আলোচনা করিবার স্থান বা শক্তি আমাদের নাই। গীতার এক অর্থ সকল সম্প্রদায়ের সাধকদিগের পক্ষে সমন্বয় বোধ হয় হইতে পারে না। যাহা ঋষি-কল্প পণ্ডিতগণ পারেন নাই তাহা যে দেবেন্দ্রবিজয় বাবু করিতে পারিবেন এ দুরাশা কেহ পোষণ করেন না। তিনি যে মূলসূত্র ধরিয়া গীতা ব্যাখ্যা করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন--সে সূত্র তিনি হারান নাই। ইহাই তাঁহার কৃতীত্ব, ইহাই তাঁহার পাণ্ডিত্য! শিক্ষিত, অশিক্ষিত সকল পাঠক তাঁহার প্রাঞ্জল ও বিশদ ব্যাখ্যা পাঠ করিয়া চরিতার্থ হইবে, তাঁহার শিষ্যত্বে শান্তি পাইবে তাহা নিঃসন্দেহ।

গ্রন্থকার প্রথমে সংস্কৃত শ্লোকটি দিয়াছেন তাহার পর বাঙ্গালা পদ্যে তাহা অনুদিত করিয়াছেন। তাহার পর তিনি তাঁহার পদ্যে ব্যবহৃত দুর্বোধ শব্দের বাঙ্গালা ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

অবশ্য বাঙ্গালা পদ্যে ব্যবহৃত এই দুরূহ শব্দগুলি প্রায়ই মূল শ্লোকে ব্যবহৃত সংস্কৃত শব্দ। আমাদের মনে হয় এই পদ্যানুবাদ না করিলে লেখক গ্রন্থখানিকে নির্দ্দোষ করিতে পারিতেন। বাঙ্গালা শ্লোকগুলি দুর্ব্বোধ হইয়াছে—এক এক স্থানে 'ছেলে মানুষি' হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না। শীঘ্র কণ্ঠস্থ হইবে বলিয়া তিনি পদ্যানুবাদে রত হইয়াছেন। কিন্তু মূল সংস্কৃত শ্লোক কণ্ঠস্থ করিলে ভগবদ্বাক্য কণ্ঠস্থ হইবে—এ বাঙ্গালা পদ্যে কোন ফল ফলিবে না।

আমরা গ্রন্থের শেষ অংশগুলি দেখিবার জন্য উদগ্রীব রহিলাম। চিরজীবন সাহিত্য-সেবা করিয়া এবং কঠোর সাধনা করিয়া দেবেন্দ্রবিজয়বাবু আজ বাঙ্গালী পাঠককে যে গন্ধমাল্য প্রদান করিলেন তাহাতে তাঁহার পাণ্ডিত্য-সৌরভ চিরদিন তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। তাঁহার ব্যাখ্যায় অনেক হিন্দু পরমপথ দেখিতে পাইবে—ইহা গ্রন্থকারের পক্ষে বিশেষ শ্লাঘার বিষয়।

ব্যথা—মূল্য আট আনা, শ্রীযুক্ত বিশ্বপতি চৌধুরী প্রণীত ও শ্রীযুক্ত জলধর সেনের 'ত্রুটিকথা'-সম্বলিত।

ভূমিকা-লেখক কি কি বলিয়াছেন ও করিয়াছেন আমরা তাহার একটা তালিকা দিতেছি;—(১) লেখক নবীন যুবক, কলেজের ছাত্র:—(২) মাসিক পত্রিকাদিতে তাঁহার কয়েকটী ছোট গল্প প্রকাশিত হইয়াছে; (৩) লোকে সেগুলির সুখ্যাতি করিয়াছে;—(৪) গল্পগুলি কেমন হইয়াছে, তাহা পাঠক ও পাঠিকাগণ বলিবেন, তিনি আগে থাকিতে সে কথা বলিবেন কেন? (৫) নবীন লেখক উৎসাহ লাভের যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়াছেন;—(৬) মানুষের ব্যথার কথাই কয়েকটী গল্পে লিপিবদ্ধ হইয়াছে সুতরাং 'ব্যথা' নামটি বেশ হইয়াছে;—(৭) বেশ দক্ষতার সহিত লিপিবদ্ধ হইয়াছে;—(৮) নবীন লেখকের উন্নতি কামনা।... ইত্যাদি।

উক্ত কয়েক ছত্রে ভূমিকা-লেখক ১০০টী কথায় এক নিঃশ্বাসে সপ্তকাণ্ড রামায়ণ বলার মত সব কথা বলিয়া একখানি 'সার্টিফিকেট' দিয়া ফেলিয়াছেন, উক্ত ৪ নম্বরের সহিত ৭ নম্বরের বক্তব্যের বিরোধ ঘটাইয়াছেন এবং স্বয়ং 'পাণ্ডা'রূপে লেখককে বঙ্গবাণীর মন্দিরে হাজির করিয়াছেন। তাঁহার এই 'চিড়ার ফলারের' ফলে তিনি লেখকের 'কৃতজ্ঞতা ও ভক্তি' অর্জ্জন করিয়াছেন। ভক্তি-প্রধান দেশে এইরূপ আদর্শ (?) ভূমিকা-রচনায় 'তেহাই' মারিয়া বাহবা লাভ এমনই সুলভ!

এই গ্রন্থের গল্পগুলি পাঠ করিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। 'কোল আঁধারী', 'ভৃত্য'—'সংশোধন'—'অকৃতজ্ঞ'—'প্রতীক্ষা'—'ব্যর্থ' প্রভৃতি গল্পগুলি মর্ম্মস্পর্শী। নবীনের অপরিহার্য্য কতকগুলি ত্রুটী থাকিলেও অনেকগুলি গল্পে লেখক প্রবীণের কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। এক একটী গল্পে ছোটগল্প-রচনার বেশ কৌশল (*art*) আছে। গল্পগুলি করুণ-রসাত্মক সুতরাং ইহার 'ব্যথা' নামকরণ সুপ্রয়োগ হইয়াছে। লেখক একনিষ্ঠ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করুন, ইহা আমাদের আন্তরিক কামনা।

সাহিত্য-প্রসঙ্গ।

[লেখক—শ্রীঅমূল্যচরণ সেন]

স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্তকে আধুনিক গদ্য-সাহিত্যের অন্যতম প্রবর্ত্তক বলা যাইতে পারে। কিন্তু সাহিত্য-সাধনার প্রারম্ভে তিনি যে কবিতা লইয়া ভাষা-জননীর মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, এ কথাটা বোধ করি, আজকালকার পনের আনা পাঠক জানেন না। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায় সংকলিত' "কবি-চরিত—প্রথম ভাগে" এ কথার উল্লেখ আছে। তিনি লিখিয়াছেন :—

"শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত পূর্ব্বে কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; কিছুদিন মাত্র চালনা রাখিয়া পরিত্যাগ করেন। তিনি অনঙ্গমোহন কাব্যের প্রণেতা। উক্ত গ্রন্থ এখন আর দেখিতে পাওয়া যায় না; উহা এরূপ দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে যে, আমরা বহু অনুসন্ধানেও একখানি সংগ্রহ করিতে পারিলাম না। আমরা উক্ত গ্রন্থ পাঠ করি নাই, সুতরাং আমরা তাঁহার দোষ গুণ কি প্রকারে বিচার করিতে পারি। আমরা এইমাত্র বলিতে পারি যে, যাঁহারা উক্ত গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা কহেন, উক্ত গ্রন্থে কবিত্ব অপেক্ষা রচনা-কৌশল সমধিক দৃষ্ট হয়।"

এই সংবাদটুকু দিবার উদ্দেশ্য এই যে, কেবল রচনা-কৌশল থাকিলেই কবি হওয়া যায় না। অক্ষয়কুমারের মত শক্তিধর লেখকও চেষ্টা করিয়া কবি হইতে পারেন নাই। অন্যের কথা ছাড়িয়া দাও, স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রের কবিতাও সাহিত্যে চিরস্থায়ী হয় নাই। নূতন 'কবিবরে'র দলেরা এটুকু স্মরণ করিয়া রাখিলে ভাল হয়। কেবল শব্দের ঝঙ্কারে, ছন্দের টঙ্কারে, ভাষার মাধুর্য্যে এবং ভাবের কুহেলিকায় কবি হইতে পারা যায় না। কবিত্বে প্রাণ না থাকিলে, রসের পূর্ণ সমাবেশ না রহিলে, তাহা কখনও সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। লাফাইয়া যেমন বড় হওয়া যায় না, মাসিকপত্রে রাশি রাশি প্রাণহীন কবিতা লিখিয়াও তেমনই কেহ কবি হইতে পারে না। কথাগুলি পুরাতন বটে এবং আধুনিক 'কবিবর'দিগের কর্ণে অপ্রীতিকরও লাগিবে; কিন্তু এইগুলি যে সত্য, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

'সবুজ' ও 'কাঁচার' দলের উচ্ছৃঙ্খলতা ক্রমেই অসহ্য হইয়া পড়িতেছে। তাঁহাদের ভাষার ও ভাবের অনাচার ও অত্যাচারে সাহিত্য-ক্ষেত্র কলুষিত হইয়া উঠিতেছে। এই দলের অগ্রণী রবীন্দ্রনাথ অর্থাৎ তিনিই 'সবুজতন্ত্রে'র পুরোহিত। তাঁহার 'সবুজ-তন্ত্রে' হিন্দুর সমাজ-ধর্ম্মের উপরে ইদানীং যে ভাবে আক্রমণ চলিতেছে, তাহা বাঙ্গালার পাঠকদলের অগোচর নাই। কিন্তু ঘরের ও বাহিরের শত সহস্র আক্রমণ সহ্য করিয়া যে সমাজ আজও মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে, রবীন্দ্রনাথের লেখনীর আক্রমণে তাহার বিন্দুমাত্র ক্ষতি হইবে না। বরং এই সকল নিষ্ফল আক্রমণে তিনি তাঁহার প্রকৃত স্বরূপই সাধারণের সমক্ষে 'জাহির' করিতেছেন।

কথাগুলি যে কেবল আমরাই বলিতেছি বা বলিয়া থাকি তাহা নহে। পরম বৈষ্ণব এবং বঙ্গ-সাহিত্যের অকপট অনুরাগী ও পৃষ্ঠপোষক মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রও সেদিন 'সাহিত্য-সভা'র বার্ষিক অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার 'সবুজ-তন্ত্রকে' লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন :—

"হে নবীন! বিধিনিষেধের উপর তোমার এত বিরাগ কেন? জগৎ একেবারেই প্রবীণ হইয়া উঠে নাই—সেও এক দিন নবীন ছিল, সেও এক দিন কোন বিধিনিষেধ না মানিয়া উচ্ছৃঙ্খলভাবে ছুটাছুটি করিয়াছে। সংযমকে কাপুরুষতার নামান্তর ভাবিয়া পদদলিত করিয়াছে। কিন্তু তাহাতে সুখ পায় নাই—শান্তি পায় নাই। তখন আপনি ইচ্ছা করিয়া বিধিনিষেধের লৌহশৃঙ্খল গঠন করিয়া পায়ে পরিয়াছে। সেই দিনই তাহার উন্নতির ইতিহাসের প্রথম পৃষ্ঠা।

বলিতে পার, বিধিনিষেধের মাত্রা দিন দিন বাড়িয়া উঠিতেছে। কিন্তু তোমাদের অযথা উচ্ছৃঙ্খলতাবৃদ্ধিই ইহার প্রধান কারণ নহে কি? হস্তিপক দুর্ব্বিনীত হস্তীকে প্রয়োজনাতিরিক্ত শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া থাকে। হস্তী বিনীত হইলে বন্ধনেরও প্রয়োজনাভাব হয়। যতই চেষ্টা কর না কেন, সংসারে প্রবীণের অত্যন্তাভাব কখনও ঘটিবে না। এই অকালমৃত্যুর দেশেও তোমাদিগকে প্রবীণের উৎপীড়ন সহ্য করিতে হইতেছে। কালে তোমরাই যে প্রবীণের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবে। তখন যে মুখে "চেঙ্গমুড়ী-কাণী" বলিয়াছ, সেই মুখেই "জয় বিষহরি" বলিবে।

আমি অতিরিক্ত বিধিনিষেধের পক্ষপাতী নহি। এস নবীন প্রবীণ মিলিয়া, একই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া, সমাজের মঙ্গলের পক্ষে কোন্‌টা প্রয়োজনীয়,

কোন্‌টাই বা অপ্রয়োজনীয়, তাহার বিচার করি। দেশকালপাত্রভেদে ব্যবস্থা প্রবীণই ত করিয়াছে। কিন্তু এ কার্য্যে পরস্পরের সহানুভূতি চাই—অসহিষ্ণুতা একেবারে বর্জ্জন করিতে হইবে। তোমরা "টিকি-মঙ্গল" কাব্য লিখিলে আমরা "টেরি-মঙ্গল" লিখিব। তাহাতে কলহ বাড়িবে—কাজ হইবে না। আমরা প্রবীণ স্বভাবতঃ কলহপ্রিয় নহি। যত দূর সম্ভব মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিতে পারিলে আমরা অন্য পথ অবলম্বন করি না। শাস্ত্রে ইহার দৃষ্টান্ত ভূরি ভূরি পাওয়া যায়। শাস্ত্র এক মহান্ উচ্চ আদর্শ সম্মুখে ধরিয়াছেন, বলিয়াছেন, যদি প্রকৃত মনুষ্যপদবাচ্য হইতে চাও, এই আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া উঠিতে থাক। কিন্তু সকলেই সে আদর্শের অনুসরণ করিতে পারিবে না বা চাহিবে না; তাই শাস্ত্র অধিকারিভেদে উন্নতির জন্য বহু পথেরও নির্দ্দেশ করিয়াছেন; কারণ, যে উঠিতে না চায় তাহাকে নিশ্চয়ই পড়িতে হইবে, উন্নতি অবনতির মধ্যবর্ত্তী কোনও পথ নাই। ভূয়োদর্শন ও গভীর চিন্তার ফলে শাস্ত্র দেখিয়াছেন যে—

> ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
> হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥

তাই শাস্ত্র ভোগের মধ্যেও সংযমের শিক্ষা দিয়াছেন। এই শিক্ষা ও নূতন শিক্ষার মধ্যে প্রভেদ আমি একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

সন্দীপচন্দ্র ও বিমল আধুনিক শিক্ষাপ্রণালীতে সুশিক্ষিত। বিমল প্রথমে প্রাচীন পদ্ধতিতেই শিক্ষিতা হইয়াছিল। তাই সে প্রথম প্রথম শ্বশুর বাড়ীতে আসিয়া স্বামী নিখিলেশের পদধূলি লইয়া শয্যাত্যাগ করিত। স্বামী বলিলেন—ছি ছি ও কাজও করে, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে পূজ্য-পূজকের সম্বন্ধ নাই, উভয়েরই যে সমান অধিকার। তিনি স্ত্রীকে বলিলেন,—তোমাকে বাহির হইতে হইবে, কারণ, "তোমাকে বাইরের দরকার থাকতে পারে। এখানে আমাকে দিয়ে তোমার চোখ কান মুখ সমস্ত মুড়ে রাখা হয়েছে,—তুমি যে কাকে চাও তাও জান না, কাকে পেয়েচ তাও জান না।" স্বামীর নিকট এইরূপ শিক্ষা পাইয়া বিমলের চরিত্র গঠিত হইতে লাগিল। এমন সময় স্বামীর বন্ধু সন্দীপচন্দ্রের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ। সন্দীপচন্দ্রের শিক্ষাও আধুনিক—তাহা এইরূপ—"আমি যা চাই তা আমি খুবই চাই। তা আমি দুই হাতে ক'রে চটকাব, দুই পায়ে ক'রে দল্‌ব। সমস্ত গায়ে তা মাখ্‌ব, সমস্ত পেট ভরে তা খাব। চাইতে আমার লজ্জা নেই, পেতে আমার সঙ্কোচ নেই। যারা নীতির উপবাসে শুকিয়ে শুকিয়ে

অনেক কালের পরিত্যক্ত খাটিয়ার ছারপোকার মত একেবারে পাৎলা সাদা হয়ে গেছে তাদের চাঁ চাঁ গলার ভৎর্সনা আমার কানে পৌছবে না।" কি উৎকট ভোগলালসা! নিখিলেশ স্ত্রীর চরিত্ররক্ষার প্রধান সহায় পতিভক্তির মূলে কুঠারাঘাত করিয়া তাহাকে নিতান্ত অবলম্বনহীন করিয়াছিলেন। সন্দীপচন্দ্রের নীতির বালাই একেবারেই ছিল না। তাই পরস্পরের সাক্ষাৎমাত্র উভয়েই মরিল। বন্ধুর স্ত্রীকে দেখিবামাত্র মাংসলোলুপ মার্জ্জারের ন্যায় সন্দীপ লাফাইয়া উঠিল। সে বলিল—"আমি যে স্পষ্ট দেখ্‌ছি ও আমাকে চায়—ওই ত আমার স্বকীয়া। গাছে ফল বোঁটায় ঝুলে আছে—সেই বোঁটার দাবীকেই চিরকালের বলে মান্‌তে হবে না কি? ওর যত রস, যত মাধুর্য্য সে যে আমার হাতে সম্পূর্ণ খসে পড়বার জন্যই —সেই খানেই একেবারে আপনাকে ছেড়ে দেওয়াই ওর সার্থকতা,—সেই ওর ধর্ম্ম, ওর নীতি। আমি সেইখানেই ওকে পেড়ে আনব, ওকে ব্যর্থ হতে দেব না।"

মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র যাহা বলিয়াছেন, আমরা তাহার সকল কথারই সমর্থন করিতেছি। কেবল আমরাই যে সমর্থন করিতেছি, তাহা নহে। গত ১১ই জ্যৈষ্ঠের 'নায়কে' শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ও মহারাজের উক্তির সমর্থন করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন :—

'সবুজ পত্রে' যে কালাপাহাড়ী সাহিত্যের সৃষ্টি হইতেছে আমরা তাহার ঘোর বিরোধী। 'সবুজ পত্রে' যে বাঙ্গালা লেখা হয় তাহা কোনও প্রদেশ-প্রচলিত ভাষা নহে, পাড়াগেঁয়ে ভাষা নহে, খাঁটী বাঙ্গালীর ভাষা নহে, তাহা রবীন্দ্রনাথের মনগড়া একটা অপূর্ব্ব ভাষা। তাহা সরল ও প্রাঞ্জল নহে, কেন না তাহা ইংরেজী বিদ্যাবিহীন বাঙ্গালীর পক্ষে দুর্ব্বোধ্য, অনেক সময়ে অবোধ্য। ব্যক্তিগত রুচি অরুচি অনুসারে ভাষা গড়া যায় না। আজ পর্য্যন্ত দেশে কেহ পারে নাই; স্যর রবীন্দ্রনাথও তাহা পারিবেন না। তাই 'সবুজ পত্রে'র উৎপাত-উপদ্রবে আমরা কখনই বিচলিত হয় নাই। এমন বাঙ্গালা লিখিতে হইবে যাহা সকলেই বুঝিতে পারে; যাহারা ইংরাজী জানে না, তাহারা বুঝিতে ও পড়িতে পারে। 'সবুজ পত্রে'র গদ্য, রবীন্দ্রনাথের আধুনিক গদ্য বাঙ্গালীর পক্ষে পাঠ্যও নহে। খোস মেজাজী জন কয়েক বাবু ঐ ভাষা লইয়া কেবল ধূলাখেলা করিতেছে, দু'দিন পরে এ আবর্জ্জনা দূর হইবে। তথাপি মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রকে আমরা ধন্য ধন্য করিতেছি, কেন না তিনি এ কথাটা তুলিয়াছেন।

বিগত ৯ই জ্যৈষ্ঠের "বরিশাল হিতৈষী"তে "ন[illegible] রবীন্দ্রনাথ" শীর্ষক এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধটীতে রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' নামক নব-প্রকাশিত 'নভেলে' 'স্বদেশী'র সপিণ্ডীকরণ কি ভাবে হইয়াছে, তাহার অনেকটা আভাস পাওয়া যায়। আমরা পাঠকবর্গের অবগতির জন্য প্রবন্ধটী আমূল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

"সেদিন পয্যাপার্শ্বে দুই ভাগে এক খণ্ড "সবুজপত্র" পড়িয়াছিল। নিদ্রাগমের পূর্ব্বে উহা লইয়া নাড়াচাড়া করিতে রবীন্দ্রনাথের "ঘরে বাইরের"প্রতি দৃষ্টি গেল। দু'একটি অধ্যায় পড়িতেই প্রাণে একটা দারুণ উদ্বেগ অনুভব করিতে লাগিলাম—প্রাণপণ বেগে ছত্রের পর ছত্র পত্রের পর পত্র, পড়িতে লাগিলাম। বিমলার চরিত্র কখন রাহুগ্রাস হইতে মুক্ত দেখিব সেই আকাঙ্ক্ষা আমাকে তীব্র কষাঘাত করিতে লাগিল, কিন্তু পারিলাম না। আমার প্রদীপের তেল ফুরাইল, রাত্রিতে ভাল নিদ্রা হইল না। রবীন্দ্রনাথ—স্বদেশীর কবি রবীন্দ্রনাথ একজন স্বদেশী-প্রচারককে নায়ক করিয়া, তাহারই মস্তকে পরস্ত্রীহরণ-প্রচেষ্টার আরোপ করিয়া আপন লেখনী মসীলিপ্ত করিলেন, এ দুঃখ প্রাণে বড় বাজিল। ক্রমে বইখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলাম; কিন্তু সন্তুষ্ট হইতে পারিলাম কৈ? সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল, নভেল মাত্রেই রবীন্দ্রনাথের এই লীলা প্রকট—'নৌকাডুবি,' 'চোখের বালি' সর্ব্বদাই এই পরকীয়া পিরীতির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ। বাখানি সেই চুলচেরা কুশাগ্র লেখনী। কিন্তু একের স্ত্রীর অপরকে লইয়া লীলা খেলা,—এসব নভেলের বিষয় কেন? তাও যাক্, বয়স থাকিতে একরূপ ছিল, আজ বিপত্নীক রবীন্দ্রনাথ, 'শান্তি নিকেতনে'র রবীন্দ্রনাথ উৎকট স্বদেশীর স্কন্ধে পরস্ত্রী চাপাইয়া দিয়া কি বীভৎস রস উপভোগ করিলেন, বুঝিলাম না।

নভেল পড়া সাঙ্গ করিয়া-টীকা টীপ্পনীর দিকে দৃষ্টি গেল—ও হরি! এক জন মহিলা-লেখিকার আপত্তি খণ্ডন করিতে গিয়া একি হেঁয়ালি রচিত হইয়াছে! সাফাই দিতে গিয়া দেশকে জবাই দেওয়া হইয়াছে যে! তিনি লিখিয়াছেন 'আমিও দেশকে ভালোবাসি তা যদি না হত তা'হলে দেশের লোকের কাছে প্রিয় হওয়া আমার পক্ষে কঠিন হত না। সত্য প্রেমের পথ আরামের নয়, সে পথ দুর্গম। সিদ্ধিলাভ সকলের শক্তিতে নাই এবং সকলের ভাগ্যেও ফলে না। কিন্তু দেশের প্রেমে যদি দুঃখ ও অপমান সহ্য করি, তা হলে মনে এই সান্ত্বনা থাকবে যে, কাঁটা বাঁচিয়ে চল্‌বার ভয়ে সাধনায় মিথ্যাচরণ করিনি।" কথাগুলি কেমন লাগে! রবীন্দ্রনাথের সিদ্ধি বাকী কোন্ দিকে? তিনি এখন

পূর্ণ "সার"। অর্থের, সম্মানের অবধি নাই। দেশহিত করিতে যাইয়া তাঁহাকে এক পশুপতিনাথ বসুর বাড়ীর সভায় ব্যতীত অন্য কুত্রাপি হতাশ হইতে হয় নাই! "বিধির বাঁধন" রাখ্‌তে গিয়ে তাঁহাকে জেলে যেতে হয় নাই। এমন কি "বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে দিয়ে" একলাও চল্‌তে হয় নাই। বরং নানা কারণে তিনি 'সারত্ব' প্রাপ্ত হইয়াছেন। তা সে ঋণ শোধ দিতে গিয়ে তিনি ১৩২২ সনে ১৩১২ সনের ঝাল মিটাইলেন কেন? * * * তিনি পরস্ত্রী মজাইবার একটা চিত্র আঁকিয়া দিলেন! "ঘরে বাইরের" উপসংহারে তিনি স্বদেশীয় সর্ব্ব কার্য্যই দোষদুষ্ট বলিয়া বাহবা লইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ এমন সত্য প্রেমের পথকেই দুর্গম মনে করেন। Oh how fallen! আজ বড় দুঃখে বৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথকে দুইটা তীব্র কথা বলিতে হইল।

সাহিত্য-সম্মিলনের বিগত অধিবেশন যে অনেকটা ব্যর্থ হইয়াছে, নানা-জনে একথা বলিতেছেন। সুতরাং সম্মিলনকে সার্থক করিবার জন্য সকলেরই চেষ্টিত হওয়া উচিত। কারণ সার্থক না হইলে কোনও জিনিষই স্থায়িত্বের দাবী করিতে পারে না। এবার সহযোগী "বার্ত্তাবহ" রাণাঘাট হইতে গত ৭ই জ্যৈষ্ঠের সংখ্যায় 'সম্মিলনের সার্থকতা' নামক যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহাতে সম্মিলনকে সার্থক করিবার কয়েকটা সুপরামর্শ আছে। উহার ক্ষত স্থান কোথায়, তাহার সুস্পষ্ট নির্দ্দেশও প্রবন্ধটীতে আছে। আমরা প্রবন্ধটী উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না :—

দেখিতে দেখিতে সাহিত্য-সম্মিলনের নয়টি অধিবেশন হইয়া গেল। এই দীর্ঘ নয় বৎসরের পরীক্ষায় সাহিত্য-সম্মিলনে আমরা কতখানি লাভবান হইয়াছি, বা বাঙ্গালা সাহিত্যের পুষ্টিসাধনে সাহিত্য-সম্মিলন কতটুকু সাহায্য করিয়াছে, তাহার বিচার করিবার সময়, বোধ হয় উপস্থিত হইয়াছে। সভাপতির হ্রস্ব দীর্ঘ অভি-ভাষণ, বিবিধবিষয়ক প্রবন্ধপাঠ, ঐতিহাসিক বা প্রত্নতাত্বিক বাক্‌বিতণ্ডা এবং সম্মিলনের পরিবর্ত্তে সাহিত্যে ভেদসৃষ্টি ও সাহিত্য-কলহ ছাড়া সাহিত্যের কোন অংশের পুষ্টি সাধিত হইয়াছে কি না, তাহা আমরা বহু চেষ্টায়ও আবিষ্কার করিতে পারি নাই। সাহিত্য-সম্মিলনের গাছটি শাখা-প্রশাখায় যে বাড়িয়া উঠিতেছে, তাহা অস্বীকার করিবার যো নাই। কিন্তু বৃক্ষের শাখা-পত্র-বিবৃদ্ধির সঙ্গে ফুল-ফল কই? যে বৃক্ষে ফুল-ফলের সম্ভাবনা নাই, তাহার দেহপুষ্টিতে

আশ্বস্ত হইবার কথা নহে। সাহিত্য-সম্মিলনের অবস্থাও কি ঠিক্ তাহাই নহে?

কেবল হৈ-চৈ, গণ্ডগোল করিয়া বা দল পাকাইয়া সাহিত্য-সম্মিলনের কোনও উপকার আমরা করিতে পারিব না। সাহিত্য-সম্মিলনে যেরূপ প্রবন্ধ, কবিতা প্রভৃতি পঠিত হয়, সেরূপ প্রবন্ধ বা কবিতা মাসিক সাহিত্যের পৃষ্ঠায় দুর্লভ নহে। সুতরাং সেরূপ প্রবন্ধ বা কবিতা-প্রচারের জন্য বা সেরূপ প্রবন্ধ-কবিতার দ্বারা সাহিত্যের পরিপুষ্টিকল্পে সাহিত্য সম্মিলনের আবশ্যকতা নাই। তবে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বা প্রদেশে এরূপ সাহিত্যিক অধিবেশনের তাৎপর্য্য কি? রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য-সম্মিলনগুলিকে নানা-দিগ্‌দেশসঞ্চারী মেঘমালার সঙ্গে তুলনা করিয়া বলিয়াছেন, তাহারা দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করিয়া সাহিত্য-ভূমিকে উর্ব্বর করিয়া তুলিতেছে। এরূপ উপমা কাব্যেই খাটে আর কবির মুখেই শোভা পায়। গত নয়টি অধিবেশনের ফলে প্রাদেশিক সাহিত্য যে কোথায়ও উর্ব্বরতা লাভ করে নাই, সাহিত্য সম্মিলনের শুভ ফল সাহিত্যের কোনও স্তরে যে ফলে নাই, তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি।

দেশ-সাহিত্য হট্টগোলে বা জনসংঘের করতালি-ধ্বনিতে যে গড়িয়া উঠিবে না, একথা বোধ হয় কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। বরং হাততালি হুজুগে সাহিত্যের অপকারেরই সম্ভাবনা। কিন্তু একথা আমরা এই নয় বৎসরের অভিজ্ঞতায়ও বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। তাই আমরা কংগ্রেসী চালে সাহিত্য-সম্মিলনকে চালাইয়া আসিতেছি। আমাদের বুঝা উচিত যে, কংগ্রেস রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের ক্ষেত্র; আর সাহিত্য-সম্মিলন বাণীপূজার সারস্বত মিলন। এই সারস্বত সম্মিলনকে যদি আমরা রাজনৈতিক সভার আদর্শে গড়িয়া তুলি—সাধনার বেদীকে জনসংঘের মাঝখানে স্থাপন করি, তাহা হইলে সাহিত্যের অপমান ও অপমৃত্যু—দুইয়েরই সম্ভাবনা।

আমরা সাহিত্যের আদর করিতে শিখিয়াছি—কিন্তু সাহিত্যিকের আদর করিতে শিখিয়াছি কি? যাঁহাদের হাতে সাহিত্য গড়িয়া উঠিবে—যাঁহাদের প্রাণপাত পরিশ্রমে সাহিত্যের পরিপুষ্টি হইবে, তাঁহাদের সুখ-দুঃখের সহিত যদি আমাদের সম্বন্ধ না থাকে, তবে আমরা কিসের সাহিত্য-ভক্ত—কিসের সাহিত্য-সুহৃদ্? সাহিত্য-সম্মিলনে কোনও সাহিত্যিকের অবস্থা-বৈগুণ্যের কথা উঠিলে, তাহা চাপা পড়িয়া যায়। সে দিন যশোহরের সম্মিলনে এমন একটা গুরুতর কথা আলোচনার অবসরই হইয়া উঠিল না। দোষ কাহার দিব?

দেশের সাহিত্য সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতেছে, তাহার গতিরোধ করে কাহার সাধ্য? ঢাক-ঢোল বাজাইয়া তাহাকে বাড়াইতে হইবে না—দেশবিদেশে সে আপনিই বরণীয় হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু যাঁহাদের হৃদয়-শোণিতে সাহিত্য পুষ্টিলাভ করিতেছে, তাঁহাদের কথা ভাবিবার বা তাঁহাদের অবস্থা-বৈগুণ্যের সহিত সহানুভূতি দেখাইবার দিন কি এখনও আসে নাই? মধুসূদন, রাজকৃষ্ণ, হেমচন্দ্র, রজনীকান্ত প্রভৃতি দুঃখ-দৈন্য-দুর্ব্বিপাকের কণ্টকশয্যায় শেষ-নিমেষপাত করিয়া গিয়াছেন;—আর সম্প্রতি অর্থহীন—গৃহহীন—পূর্ব্ববঙ্গের মনস্বী কবি গোবিন্দদাস কবিভাগ্যের নিষ্ঠুর অভিসম্পাত ভোগ করিতেছেন! ইহার কি কোন প্রতীকার নাই?

সাহিত্যিকদিগের মধ্যে সচ্ছল অবস্থা অনেকেরই নহে। তাহার উপর যাঁহারা সাহিত্যকে জীবনের ব্রত করিয়াছেন, তাঁহাদের পরিণামে ভাগ্যবিপর্য্যয়ই দেখা গিয়াছে। ফলে বাঙ্গালা সাহিত্য আজিও জীবিকারূপে গ্রহণের যোগ্য হইয়া উঠে নাই। এই জন্য দূরদর্শী বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালা সাহিত্যকে জীবনোপায়-স্বরূপ গ্রহণ করিতে সাহিত্যসেবীদিগকে মাথার দিব্য দিয়া নিষেধ করিয়া গিয়াছেন।

বাঙ্গালার ছোট-বড় দুঃস্থ সাহিত্য-সেবীর সংখ্যা কম নহে। তাঁহাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিবার দিন আসিয়াছে। বাঙ্গালার মূল সাহিত্য-পরিষৎ এবং সাহিত্য-সম্মিলনী বাঙ্গালার দুঃস্থ সাহিত্যিক-রক্ষায় যত্নবান হউন। তাঁহাদের সমবেত চেষ্টায় সুফল ফলিবারই সম্ভাবনা। বার্ষিক সাহিত্য-সম্মিলনে রাশি রাশি অর্থ নষ্ট করিয়া আমরা সাহিত্যের কি উপকার করিতেছি, তাহা বিচার করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। আমরা সম্মিলনের উদ্যোগকর্ত্তৃদিগকে এ সম্বন্ধে ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

আপনাকে হারাণ।

[লেখক—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস, এম্-এ, বি-এল।]

(১)

আত্মহারা যুবক।

লোকে টাকা প্রভৃতি হারায়, দুষ্কর্ম্ম করিয়া মান হারায়, কিন্তু নিজের নাম সহিত আপনাকে হারাণ কেহ শুনিয়াছেন কি?

কলিকাতা ভবানীপুরে এক গলির ভিতর হরিশচন্দ্র দত্তের বাটী, রাস্তার উপরে দ্বিতলে বারাণ্ডাওলা বৈঠকখানা। চৈত্র মাস, রাত্রি ৯টা, হাওয়া বন্ধ, বড় গরম, হরিশ বারাণ্ডায় বসিয়া প্রায় শত হস্ত দূরে নিবেশিত এক গ্যাস-ল্যাম্প দ্বারা আলোকিত গলির দিকে অলস ভাবে চাহিয়া আছে; বৈঠকখানার ভিতর তিন প্রতিবাসী বন্ধু বসিয়া ব্রাবুর যোগাড়ে আছে, উহাদের নাম রজনীকান্ত, যদুনাথ, ও মদনগোপাল।

মদন বলিল, উপন্যাস নভেলে আশ্চর্য্য কাণ্ড পড়ে পড়ে অরুচি হয়ে গেল, কই উহাদের এক গুঁড়ও ত এত বয়সে কখন কলিকাতায় দেখ্‌তে পেলুম না। রজনী বলিল, না ভাই, ও কথা বল্‌তে পার না, নভেলের বর্ণনা একেবারে সম্পূর্ণ অসম্ভব হতে পারে না। হরিশ বারাণ্ডা হইতে বিদ্রূপ করিয়া বলিল, তা ঠিক বটে, জলের কলের ভিতর দিয়ে যেমন এক দিন ঠক্ করে হাতের উপর একটা হীরা পড়্‌তে পারে, সেই রকম এই একঘেয়ে কলিকাতাতেও নভেলী ধরণের এক আশ্চর্য্য কাণ্ড কোন এক দিন চোখের উপর পড়্‌তে পারে।

এই সময় রাস্তা হইতে কে যেন অনুচ্চ স্বরে ডাকিল, "হরিশ বাবু, হরিশ বাবু!" হরিশ বলিল, এ ত বড় মজা দেখছি, লোকটার ভদ্রলোকের মত পোষাক, অথচ চাদর নেই, আমার নাম জানে, কিন্তু আমি ত ওকে জানি না, ওকে কখনও দেখিনি, মাতালও বোধ হচ্ছে না।

গোলাপ সিং নামে এক পঞ্জাবী শিখ গবর্ণমেণ্টের সৈনিক ছিল, পেন্‌ষণ পাইয়া এক্ষণে হরিশের বাটীতে দরওয়ানী করিতেছে। রজনী তাহাকে ডাকিয়া আগন্তুককে উপরে লইয়া আসিতে বলিল। হরিশ বাধা দিয়া বলিল, আমি ওর সঙ্গে দেখা কর্‌তে চাই না, ও কে তাই আমি জানি না। রজনী বলিল, ও ত তোমাকে জানে দেখ্‌ছি, তা ওর সঙ্গে দেখা কর্‌তে হানি কি?

আগন্তুক উপস্থিত হইল, বয়স ৩৬ বৎসরের উপর হবে না, দেওয়ালে

ঠেসান দিয়া দাঁড়াইল, সকলের মুখের দিকে ক্রমে ক্রমে চাহিয়া দেখিল। উহার মুখ ও চক্ষুর ভাব দেখিয়া বোধ হইল, যেন কথা কইতে ভয় পাইতেছে, কে যেন ধর্‌তে আস্‌চে। হরিশ বলিল, আপনি আমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে চেয়েছিলেন? আগন্তুক যেন একটু জোরের সহিত মুখ হইতে কথা বাহির করিয়া বলিল, আপনার নাম ত বাবু হরিশচন্দ্র দত্ত? এই বলিয়া ঐ ব্যক্তি দীন চক্ষে হরিশের দিকে চাহিয়া রহিল।

রজনী তাহার হাত ধরিয়া বলিল, আপনি বসুন না? আগন্তুক বসিল, কিন্তু যেন সন্দেহের চক্ষে হরিশ ব্যতীত অপর তিন জনের প্রতি চাহিয়া রহিল। রজনী কোমল স্বরে কহিল, আমরা সকলেই বন্ধু, আমাদের কাছে আপনি নির্ভয়ে যে কোন কথা বল্‌তে পারেন, আপনি যেন কোন ভয়ানক বিপদে পড়ে একেবারে কাতর হইয়া পড়েছেন, আপনি আগে একটু জল খান।

আগন্তুক দুই গ্ল্যাস জল খাইয়া ফেলিল, তখন যেন তাহার দেহে বল আসিল, দুই এক মিনিট পরে চার বন্ধুকে নমস্কার করিয়া বলিল, আমার এ রকম আসার জন্য মাপ চাই, আমি আমার বহু কালের বন্ধু হরিশ বাবুর কাছে কোন কথা বল্‌তে এসেছি। উঃ! আমি এর আগে কয়েক ঘণ্টা কাল কি ভাবে কাটাইয়াছি—এই বলিয়া আগন্তুক কাঁপিয়া উঠিয়া নীরব হইল।

হরিশ। আপনি আমাকে বহু কালের বন্ধু বল্‌ছেন, কোথায় কখন আপনার সহিত আমার দেখা শুনা হয়েছে?

আগন্তুক। কেন, আপনার সঙ্গে প্রেসিডেন্সি কলেজে এক ক্ল্যাসে পড়েছি।

হরিশ অবিশ্বাসসূচকভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, আপনাকে আমার কিছুই মনে পড়্‌ছে না, আপনার নাম কি?

এই নাম জিজ্ঞাসা মাত্র আগন্তুকের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইল. আবার তাহার চক্ষের সম্মুখে যেন কোন বিভীষিকার চিত্র পড়িল, কষ্টের সহিত বলিল, আমার নাম হরিদাস চট্টোপাধ্যায়।

হরিশ। হরিদাসকে আমার খুব মনে পড়ে। সে গোলদীঘীতে চিৎ সাঁতারে সকলকে হারিয়েছিল, কিন্তু আপনি সে হরিদাস কখন হতে পারেন না, আপনি তার মত একটুও নন। সে হরিদাস খুব গৌরবর্ণ ছিল, আর ছেলে বেলায় তার কি ব্যারাম হয়ে তার সব চুল সাদা হয়ে গিয়েছিল। আর আপনার রং ময়লা তামাটে, চুল কুচ্‌কুচে কাল।

আগন্তুক উত্তেজনার সহিত বলিল, ঠিক তাই বটে, ঠিক তাই বটে, আমি

নিজের মত দেখাচ্চি না, আর্শীতে আমি আমাকে চিনিতে পারি না, কিন্তু আমি বাস্তবিক সেই হরিদাস চট্টোপাধ্যায়।

মদন যদুকে মৃদুস্বরে বলিল, লোকটার কোন কারণে আত্ম-বিস্মৃতি হয়েছে, স্মরণ-শক্তি নষ্ট হয়েছে। আগন্তুক কিন্তু উহা শুনিতে পাইয়া বলিল, — না না, আমি কে তা আমি খুব জানি, এত যে বিপদ কাটিয়ে এলুম, তাতেও এই ঘরে ঢোক্‌বার আগে আমি আমাকে ভুলি নাই। কিন্তু অন্যেরা আমাকে একেবারে উড়াইয়া দেয়, আমার কথা বিশ্বাস করে না।

হরিশের দিকে চহিয়া আগন্তুক কহিল, আমি যে হরিদাস চাটুয্যে তা আপনি বিশ্বাস কর্‌তে চান না; তবে আমি কে? তারা বলে আমি ফণিভূষণ মুখুয্যে। সে কে? আমি দেখ্‌ছি, আমি পাগল হয়ে যাব! এই বলিয়া সে আপনার কপালে করাঘাত করিল।

রজনী একান্ত মনে বরাবর আগন্তুকের দিকে চাহিয়াছিল, এবং ভিতরে কোন গূঢ় ব্যাপার আছে কি না ভাবিতেছিল; হঠাৎ বলিল, আপনার মাথার কয়েক গাছা চুল দেবেন কি? উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই পকেট হইতে কাঁচি বাহির করিয়া আগন্তুকের মাথায় মধ্যস্থল হইতে কয়েক গাছা চুল কাটিয়া লইল এবং তাহার কতকগুলি দেশলাই জ্বালিয়া পোড়াইল। তৎক্ষণাৎ ঘরের মধ্যে এক সুগন্ধ বাহির হইল।

রজনী বলিল, যা ভেবেছি তাই ঠিক, কিন্তু এ বিষয়ে গোলাপ সিং পাকা লোক। তাহাকে ডাকাইয়া তাহার হস্তে কয়েক গাছা চুল দিয়া রজনী জিজ্ঞাসা করিল, এ কি রকম চুল?

গোলাপ সিং। এ কলপ দেওয়া চুল।

রজনী। তা আমি বুঝি, কিন্তু কি রকম কলপ তাই বল।

গোলাপ সিং দেশলাই জ্বালিয়া চুল পোড়াইয়া তাহার ধূম নাকে লইল এবং তাহার পর চুলের ভস্ম অঙ্গুলি দ্বারা ঘষিয়া বলিল, আমাদের দেশে এক রকম চুলের কলপ আছে, কেবল তা হইতে এই গন্ধ বার হয়, তার নাম পাঠানী কলপ, রং পাকা কর্‌বার জন্য ওতে মৃগনাভি দেয়।

রজনী। আশ্চর্য্য, পাঠানী কলপ কল্‌কেতাতেও এসেছে! এখন ইনি যে হরিদাস চাটুয্যে, তাতে আর সন্দেহ নাই, যদিও তুমি হরিশ ওকে মনে কর্‌তে পার্‌ছ না। এখন আমাদের অনুরোধ, হরিদাস বাবু তাঁহার কাহিনী আমাদের নিকট বলুন, নিশ্চয় উহা অদ্ভুত হবে।

আগন্তুকের ভয় ভাঙ্গিয়া গেল, তাহার চক্ষু উজ্জ্বল হইল, পুনরায় জল করিয় বসিয়া নিজের কাহিনী আরম্ভ করিল।

(২)

মায়াজালে পতন।

কলেজ হইতে বাহির হইয়া এক চাকরী লইয়া আমি রেঙ্গুণে গিয়াছিলাম দুই বৎসর তথায় থাকিয়া, কিছু টাকা জমাইয়া এবং স্বাধীন ভাবে ব্যবসা করিবার জন্য, চাকরী ছাড়িয়া ব্রহ্মদেশের রাজধানী মাণ্ডালে সহরে যাইলাম তথায় চুণী, পান্না প্রভৃতি মূল্যবান্ পাথর কেনা-বেচা করিতাম। আট বৎসর কার্য্য করিলাম, কয়েক হাজার টাকা সঞ্চয় হইল। আমার দেশ ঢাকা, মা বয়স হয়েছে, তিনি আমাকে আসিতে চিঠি লিখিলেন, দশ বৎসর পরে আমার দেশে ফিরিবার টান পড়িল। রেল ও জাহাজ ভাড়া প্রভৃতির জন্য কিছু নগ টাকা রাখিয়া আমার সঞ্চয়ের টাকায় চুণী-পান্না লইলাম। দশ বৎসরের পর আ দুই দিন হল, অথবা এক দিন হল—আমি ঠিক বল্‌তে পারি না—বাঙ্গালা দে ফিরিয়াছি। আমি মাণ্ডালে সহরে রেলে চড়িয়াছিলাম, পথে এক বন্ধু জুটিয়া ছিল, উভয়ে রেলে এক কামরাতে পরে রেঙ্গুণ হইতে কলিকাতার জাহাজে এক কামরাতে এসেছি। এ ব্যক্তি বলিয়াছিল, তাহার নাম বিহারীলাল ঘোষ পথে উহার সহিত আমার গাঢ় বন্ধুতা হইল। হায়, যদি ওর সহিত না আসিয় স্বতন্ত্র আসিতাম, অথবা ওর সহিত যদি আমার ঘনিষ্ঠতা না হত, তা হলে হয় ত আজ আমার এ দশা হত না!

বিহারী খুব শিক্ষিত লোক, কথায় ও ব্যবহারে অতি ভদ্র, পথে সমস্ত প্রধান স্থানের বর্ণনা আমার নিকট করেছিল। সে অনেক বার ঐ পথ দিয়া যাওয়া আসা করেছিল। সে এক দিন আমার কোমরের গেঁজে দেখিতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করায় আমি তাকে প্রকৃত কথা বলেছিলাম, তাহার প্রতি আমার কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না। আমি তাকে বলেছিলাম, কি করে নগদ অত টাকা সঙ্গে নিয়ে যাই, এই চুণী-পান্না অতি অল্প জায়গায় যায়, তার পর দেশে গিয়ে বেচ্‌লে আবার কিছু লাভ হবে। বিহারী বলিল, ভাই তুমি বেশ সুবুদ্ধির কাজ করেছ।

সকল ঘটনা আমার মনে নাই, এখন সব ধোঁওয়া ধোঁওয়া দেখ্‌ছি। একটা কথা মনে পড়ে, পথ-খরচ প্রভৃতির জন্য নগদ টাকা আমি একটা হাতে ঝুলান ব্যাগে লইয়াছিলাম, তাহার উপর বিহারী নিরাশ্বাসের দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল।

রাত্রি ১০টার সময় জাহাজ হইতে নামিবার পর বিহারী আমায় জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় রাত্রে থাকা স্থির করিয়াছি। বাস্তবিক আমার কিছুই স্থির ছিল না, আর দশ বৎসরের পর আসাতে অনেক ভুলিয়াও গিয়াছিলাম। বিহারীর প্রশ্নে আমি সংশয়ে পড়িলাম। বিহারী তাহা দেখিয়া বলিল, বন্ধু তুমি আমার সঙ্গে এস না কেন, আমি রত্নমন্দির হোটেলে যাচ্ছি, উহা কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের উপর, তেতলা বাড়ী, খুব বড় হোটেল, সহরের মধ্যভাগে অবস্থিত, আমার জানা শুনা জায়গা, থাওয়া ও থাক্‌বার বন্দোবস্ত খুব ভাল অথচ পথ . বেশী নয়, আর তোমার সঙ্গে যখন টাকা আছে, তখন এইরূপ ভাল জায়গায় থাকা উচিত। আমারও তখন মনে হল, কল্‌কেত্তা সহরে যে রকম চোর, জুয়াচোর, গাঁটকাটা আছে, তাতে রাত্রে একটা ভাল জায়গাতেই থাকা উচিত। আমরা দুই জনে রত্নমন্দির হোটেলে যাবার জন্য এক গাড়ী ভাড়া কর্‌লুম। যেমন গাড়ীতে উঠ্‌চি, দেখিলাম এক দীর্ঘকায় ব্যক্তি আস্তে আস্তে আমাদের দিকে আস্‌ছে, জাহাজ হইতে নামিবার সময়ও তাহাকে দেখেছিলাম। সে বিহারীর পাশ দিয়া চলিয়া গেল, এবং বিহারী যেন একটু কিছু বেশী চীৎকার করিয়া গাড়োয়ানকে রত্নমন্দির হোটেলে যাইতে বলিল।

রাত্রি পৌনে ১২টার সময় আমরা রত্নমন্দির হোটেলে (অর্থাৎ রত্নমন্দির বলিয়া এক হোটেলে) পৌঁছিলাম। তখন বিহারীর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর ও বিশ্বাস ছিল, এক প্রকার কোন দিকেই চাহি নাই। এখন বোধ হচ্ছে, গাড়োয়ান হোটেলের যে দোরের দিকে গাড়ী থামাল, তা কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের উপর নহে। যেন রাস্তা সরু, আলোর জোর তখন ছিল না। গাড়ী হতে নামিবার সময় বিহারী যেন মন্ত্রপাঠের ন্যায় আমাকে বলিল, "এই রত্নমন্দির হোটেল", উপরে উঠিবার সিঁড়ি সম্মুখে, পাশে ঐ বিশ্রামের ঘর, ঐখানে বসে তুমি এক গ্লাস হুয়িস্কি এনে খাও, আমি ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করে আমাদের থাক্‌বার ঘর ঠিক করি।

এইখানে আমার এক দোষ স্বীকার করিব, বহুকাল বিদেশে কুসঙ্গে থাকায় আমার একটু পান-দোষ হয়েছিল। তাহার পর জাহাজের ক দিনের ঝাঁকুনীতে গা টলমল করিতেছিল, এই জন্য বিশ্রাম-ঘরের এক কোণে টেবিলের নিকট বসিয়া অল্প অল্প করিয়া এক গ্লাস হুয়িস্কি খাইলাম। একটু পরেই দেখি যে সেই দীর্ঘকায় লোকটা আমার পাশ দিয়া চলিয়া গেল। আমি আশ্চর্য্য হইলাম, খিদিরপুর হইতে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট প্রায় ৫ মাইল দূর আমরা গাড়ীতে আসিয়াছি, ও হাঁটিয়া কিরূপে এত শীঘ্র আসিল।

কয়েক মিনিট পরে বিহারী আসিয়া বলিল, হোটেল ভর্ত্তি থাকিলেও সৌভাগ্যক্রমে তেতলায় সব শেষে দুটী ঘর পেয়েছি, তোমার ঘর আমার ঘরের পাশে। বিহারী আমার পাশে বসিয়া তাহার জন্য আনীত মদের গ্লাস যেমন মুখে দিতে যাইবে, অমনি সেই দীর্ঘকায় ব্যক্তি তাহাকে কি কথা বলিতে গিয়া কিরূপে এক ধাক্কা দিল, বিহারীর গ্লাসের মদ সব পড়িয়া গেল। তখন সে লোকটা অনেক ক্ষমা চাহিয়া পুনরায় হোটেল হইতে আমাদের দুজনের জন্য দুই গ্লাস মদ আনিয়া দিল। আমি বলিলাম, আমি এক গ্লাস খেয়েছি আর খাব না, তা সে শুনিল না। তার ও বিহারীর অনুরোধে আমি এক গ্লাস পেটে পূরিলাম। আমার তখন কেমন স্ফূর্ত্তি হ'ল।

তার পর কি হইল, আমার মনে নাই। বিহারী কথা কহিতে লাগিল, আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, মাথা ভোঁ ভোঁ করিতে লাগিল। আমি কোনরূপে বিহারীকে বলিলাম, আমার বড় অসুখ কর্‌ছে, আমাকে আমার ঘরে নিয়ে চল। বিহারী আমাকে ধরিয়া লইয়া গেল, না ধরিলে আমি পড়ে যেতুম। ইহার পর কি হ'ল আমার মনে নাই।

পরে—কত সময় পরে তাহা আমি বলিতে পারি না—যখন চক্ষু খুলিলাম, তখনও চক্ষু অত্যন্ত ভারী ও মাথা ঠিক হয় নাই, দেখিলাম, এক সোণার চশমা পরা ব্যক্তি আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে ও হাতের নাড়ী দেখিতেছে, এক জন মোটা ঢেঙ্গা লোক আমার শরীর পরীক্ষা করিতেছে, এবং দোরের কাছে এক জন চাকর দাঁড়াইয়া আছে। আমার বেঠিক মাথাতেও আমি ভাবিতেছিলাম, এ সকলের অর্থ কি। বিহারী আমার মাথার দিকে ঝুঁকিয়া বলিল, বন্ধু তোমার বড় ব্যারাম হয়েছিল, সেই জন্য এই ডাক্তার বাবুকে এনেছি, আর ইনি (সেই মোটা মানুষ) এই রত্নমন্দির হোটেলের ম্যানেজার, তোমার অসুখ শুনে ওঁর ভারী ভাবনা হয়েছিল, এবং তোমার জন্য যা কিছু কর্‌তে হয়, তার জন্য ইনি প্রস্তুত আছেন। কিন্তু ডাক্তার বাবু বল্‌ছেন, ভয়ের কোন কারণ নাই, কাল সকালে তুমি খুব ভাল হয়ে উঠবে।

মোটা মানুষটা আমাকে নমস্কার করিয়া চাকরের সহিত চলিয়া গেল। ডাক্তার তার ঔষধের বাক্স হতে কতকগুলা শিশি বার করে একটা মাপের গ্লাসে একটু একটু ঢালিয়া মিশাইয়া আমাকে বলিল, খেয়ে ফেলুন। আমি স্বভাবতঃ ডাক্তারের কথার বশীভূত, ডাক্তারেরা যা খেতে বলেন তা খাই; কিন্তু জানি না কেন, এ ক্ষেত্রে আমি আদেশ পালন করিলাম না। তখন ডাক্তার ব্যস্ত ভাবে ঔষধের

গ্লাস আমার মুখের কাছে ধরিয়া বলিল, ইহা কেবল ঘুমুবার ঔষধ, আপনি যদি না খান, আপনার মাথা আরও খারাপ হবে আর আপনার ভয়ঙ্কর জ্বর হবে। তখন আমি বাধ্য হইয়া ঔষধ গিলিয়া ফেলিলাম, কিন্তু এত মাথা ব্যথা করিতে লাগিল যে তা আর কি বলিব, ভাবিলাম আর কারও এমন ব্যথা হলে সে বাঁচিত না। ঐই অবস্থায় শুন্‌লাম যেন কে কাকে বল্‌ছে, এখন সব ঠিক হয়েছে। আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম, এবং তার পর হইতে আমি আর হরিদাস চট্টোপাধ্যায় রহিলাম না। আর কে এক জন হইয়া গেলাম।

(৩)

জালের দৃঢ় বন্ধন।

যখন পরদিন আমি জাগিলাম, তখন সূর্য্যের আলোক ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে। গত রাত্রের ঘটনাসকল মনে পড়িতে লাগিল। মাথার যন্ত্রণা সম্পূর্ণ ছাড়িয়া গিয়াছে, ইহাতে আমার আহ্লাদ হইল। কিন্তু আমার ভয়ঙ্কর ক্ষুধা হইয়াছিল, সকাল বেলা ত এমন ক্ষুধা আমার কখন পায় না! তাড়াতাড়ি মুখ-হাত ধুইয়া চুল আঁচড়াইতে গিয়া দেখি, ঘরে আয়না নাই। আমার ছোট হাত-ব্যাগের ভিতর ছোট আয়না, ক্ষুর, আমার নাম খোদা ক্রুষ ও অন্যান্য দ্রব্যাদি ছিল। ঘরের ভিতর তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও ঐ হাত-ব্যাগ পাইলাম না। কিন্তু উহার পরিবর্ত্তে দেখি একটা পোর্টম্যাণ্টো রহিয়াছে, তাহার উপর ইংরেজীতে লেখা আছে P. B. Mukerji (ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়) এবং আন্‌লায় ভিন্ন রকমের দুটী কোট ঝুলিতেছে। আমার ওরূপ কোট ছিল না।

তখন আমার বোধ হইল, কাল রাত্রে আমার অসুখের সময় হয় ত তাড়াতাড়ীতে ভুল করে আমাকে এই অন্যের ঘরে এনেছে। বিহারী বলেছিল, তার ঘর আমার ঘরের পাশে; আমি পাশের ঘরে গিয়া দেখি, সে ঘর খালি। আমি নীচে নামিয়া আহারের ঘরে গেলাম, সেখানে এক বুড় ভদ্রলোক চা খাইতে খাইতে 'সময়' পড়িতেছিল। সে আমাকে নমস্কার করায় আমি তাহাকে প্রতি-নমস্কার করিলাম। তখন বেলা ৯৷৷০ টা বাজিয়াছে। হোটেলের এক চাকর বা পাচককে আমার ভাত আন্‌তে বলিলাম।

বুড় ভদ্রলোক যেন কতকালের পরিচিত এইভাবে বলিল, আপনি এই কাগজ চান? আর ৫ মিনিট অপেক্ষা করুন, আমার শেষ হবে। কাল অনেক রাত্রে আপনি এসেছিলেন ও বড় গোল করেছিলেন। এখন দেখ্‌ছি, বেশ ভাল

আছেন। আপনার মাথার উপর কি কেউ নেই? বড় দুঃখের বিষয়, আপনি এমন হয়ে গেছেন।

আমার রাত্রের অমন অসুখকে এইরূপে বর্ণনা করায় যেমন আশ্চর্য্য হইলাম, তেমনই রাগ হইল। আমি জবাব দিতে যাচ্ছি, এমন সময়ে সেই চাকর বা পাচক ভাত আনিল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, বিহারী বাবু কি এর মধ্যে ভাত খেয়ে বেরিয়ে গেছেন? চাকর এরূপ ভাব দেখাইল, যেন আমার প্রশ্ন আদৌ বুঝিতে পারে নাই। খানিক পরে বলিল, বিহারী বাবু বলে কোন লোক ত এখানে ছিল না।

আমি উত্তর করিলাম, তুমি পাগল নাকি, সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে কাল এখানে এসেছি, তিনি তোমাদের পুরাতন খদ্দের। আমার পাশে তিনি ঘর নিয়েছিলেন, অন্ততঃ সেই বন্দোবস্ত ছিল, কিন্তু কি এক ভুলে আমাকে অন্য ঘরে রাখা হয়েছিল। সেখানে যে জিনিস আছে, তা আমার নয়। আমার ঘর দেখিয়ে দাও, আর আমার হাত-ব্যাগ কোথায় আছে, খুঁজে বের কর। "আমি খুঁজছি মশায়, কিন্তু আমার বোধ হয় না—" এই বলে চাকর অন্তর্ধান হইল।

তখন সেই বুড় লোক 'সময়ে'র সংবাদ-স্তম্ভ দেখাইয়া বলিল—ফণি, এই সংবাদটা তুমি মনোযোগের সহিত পড়্‌বে। এক দালাল টাকা ভাঙ্গার অপরাধে পুলিশে দুবছর কয়েদের দণ্ড পেয়েছে। ফণি, তুমি জান, আমি বরাবরই বলে থাকি——

আমি বিরক্ত হইয়া বলিলাম, আপনার সহিত আমার আলাপ পরিচয় নাই, আপনি বুঝ্‌চেন্ না, কি ভুল করে কাকে কি বল্‌ছেন। আপনি আমাকে কে মনে করেছেন?

বৃদ্ধ যেন চমকিয়া এক নিমেষ আমার দিকে চাহিয়া রহিল। তার পর বলিল, আমি পূর্ব্বে তোমাকে যে মনে করেছি, এখনও সেই মনে কর্‌ছি। ওঃ আবার তোমার সেই পুরাণ চালাকী ধরেছ বটে! বৃদ্ধ কাগজ ফেলিয়া ক্রুদ্ধ ভাবে বাহির হইয়া গেল। আমি হতভম্ব হইলাম কেন বুড়টা আমাকে ফণি বলিয়া ডাকে।

এমন সময়ে চাকর আর একজন লোককে লইয়া আসিল. এ ব্যক্তি বেঁটে রোগা ও টাকপড়া মাথা। সে হাস্য বদনে জিজ্ঞাসা করিল, ফণিবাবু, নমস্কার, কেমন আছেন? আমি রেগে বলিলাম, কেন তোমরা আমাকে ফণিবাবু বল্‌ছ, আমার ও নাম নয়, আমার নাম হরিদাস। তুমি কে? সে হাসিয়া বলিল, ফণিবাবু আপনার তামাসা রাখুন।

আমি। তোমাকে এইমাত্র বল্লুম, আমি ফণি নই, তোমাদের ম্যানেজারকে ডেকে দাও। তাহাতে সে উত্তর দিল, আমিই ত এই হোটেলের ম্যানেজার ও সত্বাধিকারী। আমি দেখিলাম আদৌ সে গত রাত্রের মোটা মানুষের মত নহে। বলিলাম, আপনি ত রত্নমন্দিরের ম্যানেজার নন।

সে ব্যক্তি। রত্নমন্দির! কে আপনাকে রত্নমন্দিরের কথা বল্‌ল। যাক্, ফণিবাবু তামাসা ঠাট্টা আর বেশী লম্বা করবেন না। আপনি কোথায় আছেন মনে করিতেছেন?

আমি বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলাম, আমার বন্ধু বিহারী বাবু আমাকে যেখানে এনেছেন আমি সেইখানে—রত্নমন্দির হোটেলে—আছি। সে ব্যক্তি উচ্চ হাস্য করিয়া তাহার চাকরকে বলিল, খুব মজা ত! দেখ্‌ছি কাল রাত্রে ফণিবাবু এত মদ খেয়ে এসেছিলেন যে, আজও নেশা ছোটেনি, ভাব্‌ছেন রত্নমন্দিরে আছেন, তুমি যাও আমাদের একখানা কার্ড নিয়ে এসে ওঁকে দাও। চাকরটা তখনই একখানা কার্ড এনে আমাকে দিল। তাতে লেখা ছিল—

বাঁড়ুয্যে হোটেল, খিদিরপুর।

সত্বাধিকারী—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আমার মাথায় যেন বাজ পড়্‌ল, কোন মতে জড়িত-স্বরে বলিলাম, বাঁড়ুয্যে হোটেল! তবে এ রত্নমন্দির নয়? দেবেন্দ্র বলিল, বিষম ব্যাপার, কাল কি মদ খেয়েই এসেছিলেন!

আমি। তবে, তবে বিহারী বাবু কোথায়?

দেবেন্দ্র। আমি কখন তার নামও শুনিনি।

চাকর তাহার মনিবকে বলিল, ফণিবাবু আমাদের 'বহু কালের' খদ্দের, ওঁর চরিত্র জানা আছে, কিন্তু এবারে ভয়ানক মাত্রা বাড়িয়েছেন, কোথায় আছেন জানেন না, আমাদের চেনেন না, নিজের নামই জানেন না, আমি চলে যাই, হয় ত এর পর আমাকে মেরেই বস্‌বেন।

এখন আমার মনে মহা আশঙ্কা উঠিল, হয় ত আমার উপর কোন ভীষণ ঘটনা হবার উপক্রম হয়েছে। বার বার ফণিবাবু বলা, সকলেরই উহা জোর করিয়া আমার উপর চাপানর চেষ্টা, কলিকাতার উত্তরে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে রত্ন-মন্দির হোটেলে ঘুমাইলাম, ৯ ঘণ্টা পরে জাগিলাম, কলিকাতার দক্ষিণে বাহিরে বাঁড়ুয্যে হোটেলে, বিহারীবাবুর অদৃশ্য হওয়া—এই সকল আমার মনে অবক্তব্য ভীষণ ভয়ের সঞ্চার করিয়া দিল। দৌড়িয়া উপরে আমার ঘরে গিয়া দেখিলাম,

আমার কোমরের গেঁজে আছে কি না, দেখিলাম তাহা আছে, ইহাতে আমি বিশেষ আশ্বাস পাইলাম এবং পরমেশ্বরকে বন্দনা করিলাম যে, আমার একেবারে সর্ব্বনাশ হয় নাই।

তারপর গেঁজে কোমর হতে খুলিয়া আমার কোটের ভিতরে চোরা পকেটের ভিতর রাখিতে গিয়া দেখি, তাহাতে কয়েকটী স্ত্রীলোকের ফটোগ্রাফ ও বাবু ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়, সাং বাঁড়ুয্যে হোটেল, খিদিরপুর, এই শিরোনামা ও ঠিকানা-বিশিষ্ট কয়েকখানা চিঠি রহিয়াছে। তৎক্ষণাৎ আমার মনের শান্তি কোথায় পলাইয়া গেল। আমার কামিজ পরিতে গিয়া দেখি, তাহার গলায় মার্কিং ইঙ্কে (ধোবার কালীতে) লেখা আছে ফণিভূষণ। আমার মাথা ঘুরিয়া গেল, আর তথায় দাঁড়াতে পার্‌লুম না, আমার অন্য কোন জিনিসের সন্ধান না করে কেবল চাদরখানা টেনে নিয়ে রাস্তায় ছিট্‌কে পড়্‌লুম, মনে কর্‌লুম, আমার জিনিষ যাক্‌গে, আমি আর বাঁড়ুয্যে হোটেলের ভিতর পা দেব না, এখন ষ্টীমার অফিসে গিয়ে আমার মালগুলি খালাস করে নেওয়া যাক্, আজ রাত্রের ট্রেণেই দেশে—ঢাকায় চলে যাব।

রাস্তায় বাহির হইবামাত্র একখানা ভাড়াটে গাড়ী সম্মুখে থামিল, আমি উহা ভাড়া করিতে অগ্রসর হওয়া মাত্র উহার ভিতর হইতে এক ব্যক্তি বাহির হইল এবং আমার হাত ধরিয়া বলিল, ফণিবাবু যে। আমি মহা বিরক্ত হইয়া আমার হাত ছিনিয়া লইয়া গাড়ীর ভিতর ঢুকিলাম, এবং গাড়োয়ানকে খিদিরপুর ডকের দিকে যাইতে বলিলাম। সমস্ত পথে আমার মনে আন্দোলন হতে লাগিল, ব্যাপার কি।

(৪)

ঘোর বিপদ।

ষ্টীমার অফিসে গিয়া আমার মাল চাহিলে কেরাণী ষ্টীমারের রসিদ চাহিল, আমি আমার কোট কামিজের সমুদয় পকেট হাত্‌ড়াইয়া রসিদ পাইলাম না। তখন আমি আমার নাম জানাইয়া বলিলাম, রসিদখানা কি রকমে হারিয়ে গেছে, তবে আপনাদের বহিতে ত আমার নামে মাল জমা আছে। এই সময়ে অফিসের আর একজন কর্ম্মচারী আসিল, আমাকে লক্ষ্য করিয়া উহাদের মধ্যে চুপী চুপী কি কথা হইল। দুজনে বাহির হয়ে গেল। কেরাণী ফিরে এসে আমাকে ভিতরে এক ঘরে লইয়া গেল, ঘরের ভিতরে টেবল চেয়ার, এক কর্ত্তাব্যক্তি গোছ

ক প্রধান চেয়ারে উপবিষ্ট, এক পাশে ঐ কর্ম্মচারী, অপর পাশে দুষ্ট চেহারা বিশিষ্ট এক ব্যক্তি বসিয়া। আমি প্রবেশ মাত্র এই ব্যক্তি ঈষৎ মাথা নোওয়াইয়া আমাকে নমস্কার করিল, তাহার নমস্কার আমার ভাল লাগিল না। কেরাণীর কাছে যা বলেছিলুম, কর্ত্তার অনুরোধ মত পুনরায় তা বলিলাম।

কর্ত্তা কর্ম্মচারীকে দেখাইয়া বলিল, আপনি রেঙ্গুণে পূর্ণিমা ষ্টীমারে চড়েছিলেন, তাহাতে ইনি যাত্রীদের মাল লইবার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী ছিলেন। হরিদাস চট্টোপাধ্যায় নামে এক ব্যক্তির নিকট হইতে ইনি যে মাল লইয়াছিলেন, তাহা ওঁর বেশ স্মরণে আছে, আর হরিদাসকে দেখিলে ইনি নিশ্চয় চিনিতে পারিবেন, ইনি বলিতেছেন হরিদাস বাবুর সহিত আপনার কোন সাদৃশ্য নাই। এক জনের মাল আর এক জন লইয়া যাওয়ায় আমাদের অনেক ক্ষতি সহ্য কর্‌তে হয়েছে, এ কারণে পুলিশ থেকে এক জন গোয়েন্দা আনাতে বাধ্য হয়েছি। এই বাবু উল্লা সাহেব এ বিষয়ে অনুসন্ধান কর্‌বেন। মাল লওয়ার কর্ম্মচারী আপনাকে হরিদাস বাবু বলিয়া স্বীকার কর্‌ছেন না, আপনার নিকট জাহাজের প্রদত্ত রসিদও নাই। আপনার দাবীর আর কোন প্রমাণ যদি উপস্থিত কর্‌তে পারেন, তা এই বাবু উল্লা সাহেব দেখ্‌বেন। আমাদের আত্মরক্ষার্থ বাধ্য হয়ে এই কর্‌তে হল।

বাবু উল্লার সহিত আমি সেই ঘর হতে বাহির হইলাম। আমি তখন মনে ভাবিলাম, গোয়েন্দাকেও বলিলাম, আমি যে হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, আর আমার দাবী যে সত্য, তাহা প্রমাণ করা কঠিন হবে না। বাবু উল্লা কোন উত্তর দিল না, কেবল আমার হাতের কব্‌জীর দিকে চাহিল, বোধ হইল যেন তার ইচ্ছা তখনই সে আমার হাতে হাতকড়া লাগাইয়া দেয়।

আমি। ষ্টীমারে চলুন, কাপ্তেন আমাকে চিনিতে পার্‌বেন।

বাবু উল্লা। তা হচ্চে না, পূর্ণিমা ষ্টীমার চলে গেছে।

আমি। এত শীঘ্র চলে গেল! কাল রাত্রে এসেছে, আজ থেকে আগামী কাল যে তার যাবার কথা।

বাবু উল্লা। আপনার কথাতে আপনি ধরা পড়্‌চেন। মঙ্গলবারে জাহাজ এসেছিল।

আমি। সে ত গত কাল।

বাবু উল্লা। আজ তবে কোন্ বার মনে করেন?

আমি। কেন, আজ বুধবার।

বাবু উল্লা। আপনি দুদিন জোড়া লাগিয়ে ঘুমিয়েছেন, অথবা মিথ্যা কথা বল্‌তে গিয়ে ধরা পড়্‌ছেন। আজ বৃহস্পতিবার।

আমি চমকাইয়া গেলাম, প্রথমে ত বৃহস্পতিবার বলিয়া বিশ্বাস হল না, তাহার পর আকাশ পাতাল ভাবতে লাগ্‌লুম।

বাবু উল্লা। কেন আর কষ্ট দিচ্ছেন, নিজেও কষ্ট পাচ্ছেন, দয়া ক'রে স্বীকার করে ফেলুন না যে, আপনি হঠাৎ কুক্ষণে জুয়াচুরীর মতলব করেছিলেন্। আর আমিও আপনাকে আশ্বাস দিচ্ছি, আপনার যাহা'তে ও যত কম দণ্ড হয়, তার জন্য আমি বিশেষ রূপে চেষ্টা কর্‌ব।

আমি খিদিরপুর পৌছান হতে শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিলাম, সেও মনোযোগ দিয়া শুনিল বটে, কিন্তু বলিল, আপনার বেশ কল্পনা বটে, কিন্তু এক্‌খানা গাড়ী করে প্রথমে রত্নমন্দির হোটেলে যাওয়া যাক্।

কখন কোন সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ নিরীহ ব্যক্তি এমন বিপদে পড়িয়াছে কি! কোন মানুষকে এমন বিষম ঘটনাজাল জড়াইয়াছে কি! রত্নমন্দির হোটেলে যাইলে তথায় কেহও আমাকে চিনিতে পারিল না। বিহারীলাল ঘোষ বলে কোন লোককে তারা কখন দেখে নাই, নাম শুনে নাই। পূর্ব্ব রাত্রে বা কোন রাত্রে কোন পীড়িত ব্যক্তিকে আনিয়া শোওয়ান তাহাদের স্মরণ নাই, বহু সপ্তাহ যাবৎ হোটেলের ভিতর কোন ডাক্তার আসে নাই। আর আমি বলিয়াছিলাম, ম্যানেজার খুব মোটা ঢেঙ্গা, কিন্তু যে ব্যক্তি ম্যানেজার-রূপে সম্মুখে আসিয়াছিল, সে রোগা বেঁটে। আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল। বাবু উল্লা আমার দিকে এ ভাবে চাহিল, যেন আমার সমান পাকা জুয়াচোর আর কখন দেখে নাই।

তার পর গাড়ী করিয়া বাঁড়ুয্যে হোটেলে যাওয়া গেল। সেখানে আরও মন্দ ফল হইল। সেখানে সেই দেবেন বাড়ুয্যে হোটেলের কর্ত্তা, সেই বুড় ভদ্রলোক, সেই চাকর; তারা সকলে একবাক্যে বলিল, তারা দুবছর হতে আমাকে জানে, আমি তাদের হোটেলে মাঝে মাঝে এসে থাকি, আমার পেশা দালালী আর আমার নাম যে ফণিভূষণ মুখুয্যে, তাতে তাদের কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তাহার পর বাবু উল্লাকে আমার ঘরে লইয়া গিয়া ফণিভূষণ নাম লেখা পোর্টম্যাণ্টো দেখাইল। হোটেলের চাকরাণীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করা হইল, সে ফণিবাবুকে জানে কি না? সে হাসিতে হাসিতে বলিল, এই যে ফণিবাবু স্বয়ং দাঁড়িয়ে।

সমুদয় আশা-ভরসা পলাইল, চারি দিকে যেন ঘোর অন্ধকার আমাকে ঘিরিয়া ফেলিল। আমার আর কোন কথা বলা বৃথা। প্রত্যেক ব্যক্তি প্রত্যেক ঘটনা

আমার বিপক্ষে সাক্ষ্য দিতেছে, কি ভয়ঙ্কর ঘোর চক্র। বাড়ুয্যে হোটেল হতে বাহির হইলাম। বাবু উল্লার এক হাত আমার কাঁধের উপর কোমল ভাবে পড়িল। আমি উদ্দেশ্য ভাবিয়া শিহরিয়া উঠিলাম।

বাবু উল্লা। আপনার খেলা শেষ হয়ে এল কি? আমাকে আর কত ঘোরাবেন, এখন থানায় যাওয়া যাক্। আমি কষ্টের সহিত মুখ খুলিয়া বলিলাম, আপনি কি আমাকে গ্রেপ্তার কর্‌তে চান? সে উত্তর দিল হাঁ, ষ্টীমার কোম্পানীকে ঠকাইবার চেষ্টা করা অভিযোগে। আমি কাতর স্বরে বলিলাম, আপনি তা কর্‌বেন না, আমি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ। বিহারীলাল ঘোষকে বাহির কর্‌বার জন্য আমাকে সাহায্য করুন। তিনি আমাকে সনাক্ত করিতে পারিবেন।

বাবু উল্লা। আরও গল্প লম্বা করে কি হবে? যথেষ্ট কি হয় নাই? চলে চল।

এই সময়ে দেখিলাম, পূর্ণিমা ষ্টীমারের ডাক্তার সাহেব (তিনি ষ্টীমারে ফেরেন নাই) যাইতেছে। আমি দৌড়িয়া গিয়া তার হাত ধরিয়া বলিলাম, ডাক্তার সাহেব, আপনি আমাকে জানেন, আমি বড় বিপদে পড়েছি। আমাকে সনাক্ত করিতে হবে, আমার নাম হরিদাস চাটুয্যে, আমি পূর্ণিমা ষ্টীমারে ৯ নম্বর কামরায় ছিলাম।

ডাক্তার। হরিদাস চাটুয্যেকে খুব জানি। এই সেদিন পর্য্যন্ত তাকে জাহাজে দেখিছি, কিন্তু আপনি ত তিনি নন। তাঁর রং ফরসা ও চুল সাদা।

ডাক্তার চলিয়া গেল, আমারও যে একটী ক্ষীণ আশার আলোক জ্বলিয়াছিল, তাহা নিবিয়া গেল। গোয়েন্দা বলিল, আপনার আর কিছু মন্ত্র তন্ত্র আছে? আমি জড়িতস্বরে বলিলাম, আমার বর্ণনা ত শুনিলেন, ডাক্তার সাহেব বলিলেন, আমার চুল সাদা, ইহা ঠিক।

ইহার পর আমি যে আঘাত পাইলাম, জীবনে এমন আঘাত আর কখন পাই নাই। গোয়েন্দা নিকটবর্ত্তী এক ডাক্তারখানার ভিতর প্রবেশ করিয়া আমাকে এক বড় আয়নার সম্মুখে দাঁড় করাইল। জাহাজ হইতে নামিয়া এই প্রথম আয়নায় মুখ দেখিলাম, দেখিয়া অবাক্ হইলাম, আমার রং ময়লা, চুল কাল, আমি নিজেকেই নিজে হরিদাস চাটুয্যে বলে চিনিতে পারিলাম না। একদিনের ব্যারামে কি মানুষ এত কাল হয়ে যায়!

গোয়েন্দা। আমি অনেক দিন এই কাজ কর্‌ছি, কিন্তু তোমার জুড়িদার দেখি নাই। নাটক উপন্যাস পড়্‌তে ভাল লাগে বটে, কিন্তু তার অভিনয়ে যোগ দিতে পারি না।

ঘোর বিপদের সময় দুঃসাহসও হয়। আমাদের পূর্ব্বের গাড়ী ছেড়ে দিয়াছিলাম, গোয়েন্দা একখানা চলন্ত ভাড়া গাড়ীকে ডাকিল। সে স্থানটা চৌমাথা, গোয়েন্দা আমার হাত ছেড়ে দিয়া আমাকে গাড়ীর ভিতরে যাইতে বলিল, এবং নিজে ঘোড়ার কাছে গিয়া গাড়োয়ানের সহিত কথা কহিতে লাগিল। তখন সন্ধ্যা হয়েছে, রাস্তায় ট্রাম ও গাড়ীর খুব ভিড়, তাহার উপর সৌভাগ্যক্রমে একখানা খড়ের গাড়ী আমাদের গাড়ীর পাশে আসিয়া আট্‌কাইয়া গেল। আমি গোয়েন্দার বিপরীত দিকে গাড়ী হইতে লাফাইয়া খড়ের গাড়ীর অপর পাশে যাইলাম, তাহার পর গোয়েন্দার জানিবার পূর্ব্বেই লোকের ভিড়ে মিশিয়া গিয়া দৌড়িয়া এক গলির ভিতরে ঢুকিলাম। বোধ হইল, যেন আমার পিছনে কাহার দৌড়িয়া আসিবার শব্দ হইতেছে, কিন্তু খানিক পরেই সে শব্দ মিলিয়া গেল। পলাইবার সময় আমার চাদর হারাইয়াছি, তাহার পর দুই ঘণ্টা কাল অবধি এ গলি সে গলি ঘুরে ঘুরে যখন এই বাড়ীর নিকট আসিলাম, তখন বারাণ্ডায় আমার দশ বৎসর পূর্ব্বের আলাপী হরিশবাবুকে দেখিয়া চিনিলাম।

আমার কাহিনী শেষ হইল। কিন্তু কি চক্রে এই ঘটনা হইয়াছে, তাহা আপনাদিগকে বুঝাইব কি, আমি নিজেই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। তবে আমি শপথ করিয়া বল্‌ছি, আমি যাহা বলেছি তাহার প্রত্যেক কথা সম্পূর্ণ সত্য।

(৫)

সমাধান।

বিশ্বাস-অবিশ্বাস-মিশ্র ভাবে সকলে নিস্তব্ধ রহিল, হরিশ বক্তাকে অন্য রূপে পরীক্ষার্থ উদ্যুক্ত হইল।

হরিশ। বল দেখি, মাণিকলাল বলে কোন ছেলে আমাদের সঙ্গে পড়্‌ত কি না, আর তার কোন খেয়াল ছিল কি না, যার জন্য আমরা সকলে তাহাকে ঠাট্টা করতুম।

বক্তা হাসিয়া। মাণিকলালের কথা আর মনে নাই? তার একটা বিড়াল ছিল, সেটাকে কোলে না রেখে পড়্‌ত না, এতে আমরা বল্‌তুম, এর পর বে হলে বৌকে কোলে না শুইয়ে তোমার পড়া হবে না।

হরিশ। ঠিক হয়েছে, তুমি যথার্থ আমার পূর্ব্ব বন্ধু হরিদাস। এই দশ বৎসর তুমি কেমন ছিলে?

রজনী। আমি বোধ করছি, এ ব্যাপার পরিষ্কার করতে পারব। আচ্ছা

হরিদাসবাবু, বলুন দেখি, আপনার বন্ধু বিহারী এই রকম কি না—মধ্যম আকার, শ্যামবর্ণ, বাম চক্ষের কোণে আঁচিল, মাথায় খুব চুল, উপরের একটা দাঁত উঁচু।

হরিদাস। আপনি ঠিক বর্ণনা করেছেন।

রজনী। হয়েছে, আমি যা ভেবেছিলাম, তাই হয়েছে। বড়বাজারে রামেশ্বর নামে এক ধনী হিন্দুস্থানী আছে। ইহার বাহ্যিক ব্যবসায়স্বরূপ হ্যারিসন রোডে এক বড় দোকান আছে। বড়বাজারে যত গাঁটকাটা, পকেটমারা, ও গুণ্ডা আছে, তার অধিকাংশ এর দলভুক্ত। সমুদয় কার্য্যের পাকা বাধা নিয়ম। নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি যেন কলে চালিত পুতলের মত কায করে। কে কোথায় কবে কি কায করিবে, কে কে তাহার সঙ্গী ও সহায়তাকারী হবে, তাহা বিশেষ বিবেচনার সহিত ঠিক করিয়া দেওয়া হয়। উহারা লুণ্ঠিত টাকা প্রভৃতি কর্ত্তাকে আনিয়া দেয়, এবং তাহার নিয়মিত অংশ পায়, ইহা ছাড়া নির্দ্দিষ্ট বেতনও আছে বিপদে পড়িলে বা মোকদ্দমা বাধিলে রামেশ্বর সম্পূর্ণ সাহায্য করে ও ভাল উকিল ব্যারিষ্টার দেয়, জেলে গেলে পারিবারবর্গের খোরাকী দেয়। প্রয়োজন হইলে খুন পর্য্যন্ত ইহারা করে। ধরা পড়িলে প্রাণ গেলেও কর্ত্তার নাম দূরে থাকুক, সঙ্গীদের নাম পর্য্যন্ত ইহারা বলে না। পূর্ব্বে কেবল কলিকাতায় এই ব্যবসায় চালাইত, এখন বাহিরেও বিস্তৃত করিয়াছে, বাহিরের কার্য্যের ম্যানেজার হরিদাস বাবুর বন্ধু বিহারী, ইহার প্রকৃত নাম রাজারাম। সে মনিবের কার্য্যসূত্রে মাণ্ডালে গিয়াছিল, আসিবার সময় পথে হরিদাস বাবুকে পাইয়া একটা উপরি কায করিয়া লইল।

হরিদাস। আপনার কথা ভাল বুঝিতে পারিতেছি না : তাই যদি হবে, তবে আমার সব কেড়ে নিয়ে ছেড়ে দিত, আমার চেহারা বদ্‌লাতে গেল কেন ?

রজনী। আমাকে বল্‌তে দিন। চেহারা বদ্‌লাইয়া ফেলা এই নূতন নহে, দশ বৎসর পূর্ব্বে এক ঘটনায় এই চেহারা বদ্‌লান কৌশল চালান হয়েছিল, পুলিশ ও গোয়েন্দারা কিছুই করিতে পারে নাই। আমি কি রকমে এ সকল গুপ্ত কথা জানিতে পারিলাম তাহা বলিব না, আপনারা কেবল ঘটনা শুনিয়া যান। সেই অভিজ্ঞতাতে আমি বলিতেছি। যে গাড়োয়ান হরিদাস বাবুকে ষ্টীমার ঘাট হতে হোটেলে লইয়া যায়, যে আপনাকে দ্বিতীয় গ্লাস মদ , হোটেলের কর্ত্তা দেবেন্দ্র বাঁড়ুয্যে ও তাহার চাকর, হোটেলের সেই বুড় ঘুষ এবং রত্নমন্দিরের ম্যানেজার বলিয়া সেই মোটা মানুষ,—ওরা সকলেই

বিহারী ওরফে রাজারামের অধীনে পরিচালিত ও রামেশ্বরের দলভুক্ত”। দ্বিতীয় গ্লাসের মদে কর্ডিয়াল সিডেটিভ নামক ঘুমপাড়ান ঔষধ দেওয়া হইয়াছিল; তাহা উপযুক্ত পরিমাণ হয় নাই, সেজন্য আপনি জেগে উঠেছিলেন; তখনই ডাক্তার ডাকিয়া দেখানর অভিনয় করিয়া পুনরায় উপযুক্ত পরিমাণ মফিয়া খাওয়ান হল, ইহাতে আপনি মঙ্গলবার রাত্রি ও বুধবার দিবা রাত্রি অঘোর ছিলেন। জুয়াচোর দল যথেষ্ট সময় পাইল। ফণির নামে চাঁদ আপনার ঘরে রাখা হল, তাহার নামে চিঠি তৈয়ার করিয়া আপনার পকেটে দেওয়া হল, আপনার কামিজের উপর তার নাম লেখা হল, কে কি বলিবে দলের সকলকে তাহা শেখান হল, তৎসহিত সর্ব্বাপেক্ষা যে বড় কাজ—আপনার চেহারা বদ্‌লান—তাহাও হল। চেহারা বদ্‌লাবার উদ্দেশ্য এই যে, পরে যদি আপনি পুলিশে খবর দেন, আপনি আপনাকে হরিদাস বলিয়া প্রমাণ করিতে পারিবেন না, বরং বিপদে পড়িবেন, যেমন বাস্তবিক পড়িয়াছিলেন, এবং সেই সুযোগে জুয়াচোরের দলের রক্ষা হইবে। রামেশ্বরের দলের লোকেরা খুব পাকা। ভবিষ্যতের জন্য সকল দিক রক্ষা করিয়া কায করে। আপনার চুল পোড়াইয়া যে পাঠানী কলপ ধরিয়াছি, উহা লাগাইয়া শুকাইতে ২০ ঘণ্টা সময় লাগে, তাহার পর এক মাস সাবান না ঘষিলে উহা উঠে না। এই কলপ কেবল আপনার চুলে লাগান হয় নাই, উহা পাতলা করিয়া আপনার মুখে ও সর্ব্বাঙ্গে লাগান হইয়াছে। আপনি জামা ও কাপড় খুলিলে নিশ্চয় দেখিবেন, আপনার শরীরের কোন স্থান বাদ যায় নাই।

হরিদাস। তাই যদি হবে, তা হলে আমার গেঁজে গেল না কেন, উহা ত আমার জামার ভিতর-পকেটে আছে।

রজনী। আপনার গেঁজে বার করুন।

হরিদাস উহা নিশ্চিন্ত মনে বাহির করিয়া বলিল, এত বিপদে পড়িয়াও আমার জীবনের সম্বল গেঁজে যে রক্ষা করতে পেরেছি, তাতেই এখনও আমি বেঁচে আছি।

রজনী গেঁজে হতে কয়েকটী চুণী-পান্না লইয়া যদুনাথকে দেখিতে দিল। যদুনাথ বহুকাল হইতে চুণী-পান্নার দালালী করে। তাহার পকেটে ম্যাগ্নিফাইং গ্লাস ছিল। উহা চক্ষে দিয়া দেখিলে অতি ক্ষুদ্র জিনিষ বড় দেখায়। সে পাশের ঘরে গিয়া প্রথমে উহা দ্বারা অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিল, তাহার পর জিহ্বায় দিয়া আস্বাদ গ্রহণ করিল ফিরিয়া আসিয়া একটা মাত্র কথা বলিল—“ঝুট।”

অ্যাঁ, বলিয়া হরিদাস মূর্চ্ছিত হইল। কিয়ৎক্ষণ শুশ্রূষার পর তাহার চেতনা ইলে সে উঠিয়া একেবারে দৌড়িয়া বাহিরে যাইতে উদ্যত হইল। বলিল— ামি পুলিশে যাচ্ছি।

রঞ্জনী। কি বিহারী ওরফে রাজারামকে ধরাতে? তার সময় আর নাই, এতক্ষণ দিল্লীতে, হয় ত বিক্রীও শেষ করেছে।

হরিদাস পাগলের মত হইল, সকলে তাহাকে সেবা-শুশ্রূষা করিতে লাগিল।

রঞ্জনী। দুঘণ্টা পূর্ব্বে তোমরা না বলেছিলে, কলিকাতার মত সহরে কোন ভেলী কাণ্ড হতে পারে না। এখন দেখ যে কাণ্ড হয়েছে, তাহা নভেলেও খো যায় না—আপনার নিকট আপনার চুরী. জীবিত অবস্থাতেই নিজের নাম অস্তিত্ব হারাণ, এ কখন শুনেছ কি?

বাসি ফুল।*

[লেখক—শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়]

'বাসি ফুল' একখানি গল্পের বহি।—ছোট ছোট আটটি গল্প ইহাতে আছে। ানি ইহা লিখিয়াছেন, তিনি খুব প্রসিদ্ধ না হইলেও প্রবীণ সাহিত্যিক। াম—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু।

বাঙ্গালা গল্পের বহি বা পদ্যের বহি সমালোচনার জন্য হাতে আসিলেই ামাদের ভয় হয়। মনে হয়, গ্রন্থপাঠ—নরক-যন্ত্রণা ত আছেই; তাহার উপর াহার সমালোচনা করিয়া একদল শত্রু-সৃষ্টি করিতে হইবে। বাস্তবিক, াচর যে সব গল্পের ও কবিতার বহি বাহির হয়, তাহার আগাগোড়া া উঠা যে কি কঠিন ব্যাপার, তাহা তিনিই জানেন, যিনি ভুক্ত-। কবিতা পড়িয়া বুঝিতে গেলে মাথা ধরে। আর গল্প পড়িয়া শেষ হইলে মাথা ঘুরে,—হাই উঠে। যাঁহারা কবিতা লিখেন, তাঁহারা কে 'সেলী' মনে করেন। কাজেই তাঁহাদের কবিতায় 'গন্ধ' ছাড়া বুঝিবার পাওয়া যায় না। আর বাঙ্গালার গীদে মোপাশাঁর 'গল্পের ক্ষুদ্র ক্ষেত্রে ন স্থূল লালসারই চাষ করিতেছেন, এবং 'প্রেম' নাম দিয়া তাহাই ভবের বিক্রয় করিতেছেন। সমাজের কোনও উচ্ছ্বাস তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে

* সমালোচনা।

পারে না। দুর্ভিক্ষ, দারিদ্র্য, স্বদেশী, বয়কট, নিগ্রহ ও লাঞ্ছনা প্রভৃতি সামাজিক বিষম বিপ্লব ও দেশব্যাপী উচ্ছ্বাসে তাঁহারা গল্পের বস্তু দেখিতে পান না! তথা-কথিত প্রেমের প্রেত ও লালসার প্রেতিনীই বাঙ্গালা গল্পের নায়ক-নায়িকা।

বলা বাহুল্য, এই সব গ্রন্থের ঠিকমত সমালোচনা করিলেই শত্রু বাড়ে— বন্ধু ও বিগ্‌ড়ে। তবে শুধু রবীন্দ্রনাথের আধুনিক উপদেশ—'যে লেখা ভাল বলিতে পারিব না, তার সম্বন্ধে চুপ করিয়া যাইতে হইবে'—মানিয়া চলিতে পারিলে ঐ বিপদের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

কিন্তু তাহাতে কি সাহিত্য সৃষ্টি হয়?—সত্য যে সাহিত্যের প্রাণ; সত্যকে জবাই করিয়া, ভাবের ঘরে লুকোচুরি খেলিয়া কি সাহিত্য গড়া যায়? অপ্রিয় হইলেও এখানে সত্য বলিতে হইবে। সাহিত্যেরও একটা চরিত্র বলিয়া জিনিষ থাকা দরকার। চরিত্রের নিকটেই মানুষ মাথা নীচু করে। সাহিত্যের যদি চরিত্র না থাকে, সে যদি স্তাবকের আসন গ্রহণ করে, তবে তাহার কথা কে শুনিবে? দেশের ও দশের কাজ সে কতটুকু করিতে পারিবে?

শত্রু-বৃদ্ধি সত্ত্বেও আমরা মন্দকে মন্দ এবং ভালকে ভাল বলিয়া থাকি। তবে অনেক সময় অনেক মন্দ পুস্তকের সমস্ত মন্দ অংশ দেখাইয়া দিতে পারি না।—সংক্ষেপে তাহার শুধু নিন্দা করিয়া যাই। এজন্য অনেক গ্রন্থকার আমাদিগকে গালি দিয়া বলিয়া থাকেন যে, তাঁহাদের গ্রন্থে দোষের অভাব বলিয়াই দোষ দেখাইতে পারি নাই;—শুধু বিদ্বেষবশতঃ নিন্দা করিয়াছি। তাঁহারা বুঝেন না যে, 'কম্বলের লোম বাছিয়া দেখাইবার নহে।'

আসল কথা, দোষ ও গুণের আলোচনা করিতে পারা যায়, এমন বহি খুব কমই বাহির হয়। যাহার কিছু গুণ আছে, তাহারই সবিস্তার দোষকীর্ত্তন করা যায়। মনীষী বিপিনচন্দ্র 'নারায়ণে' প্রকাশিত 'কথা-নাট্যে'র উপর যে সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, সেটা শুধু 'সানকির উপর বজ্রাঘাত' হইয়াছিল।

'বাসি ফুল' ভাল লাগিয়াছে বলিয়াই ঐ কথা কয়টা বলিলাম। ইহার প্রত্যেক গল্পই আমরা সাগ্রহে পাঠ করিয়াছি। গল্পগুলিতে দোষ নাই, এমন কথা বলি না। কিন্তু দোষের তুলনায় গুণের ভাগ অনেক বেশী আছে। দোষ ও গুণ—দুইএর কথাই এই বার বলিতেছি।

প্রথম গুণ।—'বাসি ফুল' টবের গাছের ফুল নহে। নিছক্ অনুচিকীর্ষা-বশে ইহা রচিত হয় নাই। জমির সঙ্গে, দেশের মাটির সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ আছে।

আর কোনও গুণ না থাকিলেও কেবল এই গুণের জন্য পুস্তকখানি আমরা মাথায় করিয়া রাখিতাম। কারণ, আজকালকার সাহিত্য-সৃষ্টিতে সচরাচর ঐ গুণটারই অভাব অনুভব করি।

দ্বিতীয় গুণ—ভাষা ও আন্তরিকতা। বঙ্কিম বলিতেন,—'সকল অলঙ্কারের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার সরলতা।' এই শ্রেষ্ঠ অলঙ্কারে 'বাসিফুলে'র ভাষা অলঙ্কৃতা। উহা যেমন তরুতরে ঝরঝরে, তেমনই স্থানে স্থানে আবেগময়ী। তাহার উপর আন্তরিকতার গুণে রচনা আরও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। লেখক মহাশয় নিজে যাহা অনুভব করিয়াছেন, তাহাই লিখিয়াছেন। টানাবোনা তুলনা বা বড় বড় দার্শনিক মুখস্থ কথার উৎপাতে গ্রন্থের কোনও স্থান তিনি নষ্ট করেন নাই।

তৃতীয় গুণ—গল্পগুলির 'প্লটে' বৈচিত্র্য আছে। 'বওয়াটে ছেলে', 'জাগরণ' ও 'স্বপ্নভঙ্গ' প্রভৃতি গল্পগুলির আখ্যানবস্তু (Plot) সর্ব্বাংশে নূতন। বাঙ্গালা কাগজের অধিকাংশ গল্পেরই গল্পাংশ কপির কপি, তস্য কপি। আনন্দের কথা, 'বাসি ফুলে'র গল্পগুলি এই চর্ব্বিত-চর্ব্বণ হইতে মুক্ত।

চতুর্থ গুণ—চরিত্র-চিত্রণ। ছোট গল্পের ঘটনা যেমন তেমন হইলেও ততটা ক্ষতি নাই, কিন্তু চরিত্র সুচিত্রিত হওয়া চাই। অল্প পরিসরের মধ্যে মানুষের চরিত্র-বিশেষকে ফুটাইয়া তোলাই ছোট গল্পের কাজ। এইটী যিনি পারেন, তাঁহার ছোট গল্প রচনা সার্থক হয়। যিনি উহা পারেন না, তাঁহার গল্পে নানা গুণ থাকা সত্ত্বেও তাহা 'ছোট গল্প' নামের যোগ্য হয় না। দেবেন্দ্র বাবুর চরিত্র-চিত্রণে বিলক্ষণ হাত আছে। কোনও গল্পের প্রায় কোনও চিত্রই তিনি আঁকিতে যাইয়া একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলেন নাই।

পঞ্চম গুণ—গ্রন্থের অনেক স্থানেই গ্রন্থকার মহাশয় রস-অবতারণায় পটুতা দেখাইয়াছেন। সংস্থান ও চরিত্র-চিত্রণের উপরেই রস-অবতারণা অনেকটা নির্ভর করে। চরিত্র-চিত্রণ বিষয়ে দেবেন্দ্রবাবুর ইতিপূর্ব্বেই প্রশংসা করিয়াছি। 'বাসি ফুলে'র গল্পগুলি সুসংস্থানেও পূর্ণ। বঙ্কিম বলেন, 'সংস্থানই রসের আকর। যে সকল অবস্থা-বিশেষে নায়ক-নায়িকাকে সংস্থাপিত করিলে রস-বিশেষের অবতারণা সহজ হয়, তাহাকেই সংস্থান বলে।'—গ্রন্থকারের ইহাতে দক্ষতা আছে।

'বাসি ফুলে' এইরূপ যেমন অনেক গুণ আছে, তেমনি দোষও কিছু কিছু আছে। দুইটি দোষের উল্লেখ করিতেছি। প্রথম দোষের কথা, গ্রন্থের 'ভূমিকা'য় সাহিত্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় মহাশয় নিজেই লিখিয়াছেন।

তিনি বলিয়াছেন—"স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ অতিরঞ্জন আছে বলিয়া মনে হয়।"—গল্পগুলি পড়িবার সময় আমাদেরও ঐ কথা মনে হইয়াছিল। উদাহরণ-স্বরূপ গ্রন্থের প্রথম গল্প 'সাঁজের বাতি'র মিলন-চিত্রটির উল্লেখ করিতে পারি। গল্পের নায়িকা 'কিশোরী' ছদ্মবেশে আসিয়া স্বামীর মুখ হইতে খাবার কাড়িয়া খাইতেছে, স্বামীর নাম মুখে আনিতেছে, রীতিমত জ্যাঠামী করিতেছে, এগুলি অবশ্যই বাড়াবাড়ি। সকল বিষয়েরই একটা সীমা আছে। হিন্দুঘরের বালিকা-বধূ—স্বামীর সহিত যে মেয়ে কখনও মন খুলিয়া মেশামিশি করিবার অবসর পায় নাই, তাহার পক্ষে ঐ কাজগুলা শোভন হয় নাই। 'নীলদর্পণে'র আদুরীর মুখেও আমরা শুনিতে পাই,—'ছি, ভাতারের নাম কর্‌তে আছে!'—সেই স্বামীর নাম আমাদের ঘরের মেয়েরা আনন্দে বা দুঃখে যতই আত্মহারা হউক, মুখে আনিতে পারে না।—এ সংস্কার বাঙ্গালী ঘরের মেয়ের মেদ-মজ্জার সহিত মিশিয়া আছে। 'আনন্দমঠে'র শান্তির মতন ঘোড়ায় চড়া-মেয়েও এই গল্পের নায়িকার মতন এতটা বাড়াবাড়ি করিতে পারে নাই। আর, এই ঘটনার বিকটতা যদি রসের পুষ্টির পক্ষে সহায়তা করিত, তাহা হইলে অবশ্য এ সম্বন্ধে বেশী কিছু বলিতাম না। বঙ্কিমের উপন্যাসে ঘটনার বিকটতা অনেক আছে, কিন্তু তাহা রস-অবতারণায় সাহায্য করিয়াছে বলিয়া লোকের নজরে তেমন পড়ে না। কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থের গল্পগুলির অতিরঞ্জনের অংশগুলি বাদ দিলে রসের উৎকর্ষ বাড়িত বলিয়াই আমাদের মনে হয়।

গল্পগুলির দ্বিতীয় দোষ—স্ফীতিকরণ-পদ্ধতি। কিন্তু ছোট গল্পের একটি প্রধান আর্ট এই যে, উহার রচনা-পদ্ধতি যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত হইবে। উপন্যাসে দুইটা বাজে কথা চলিতে পারে, দুইটা কথা ফেনাইয়া বলিলেও দোষের হয় না, কিন্তু ছোট গল্পে তাহা সৌন্দর্য্য-হানি করে। এখানে প্রত্যেক কথাটি ওজন করিয়া বসাইতে হয়। যে কথা বাদ দিলে গল্পের কোনও ক্ষতি হয় না, সে কথা গল্পে বর্জ্জন করাই একান্ত কর্ত্তব্য। নহিলে রসভঙ্গ হয়। কিন্তু 'বাসি ফুলে'র অধিকাংশ গল্পই স্ফীতিকরণ-দোষে দুষ্ট। গ্রন্থের অনেক স্থল বর্জ্জন করিতে পারিলে গল্পগুলির উপাদেয়তা বাড়িত বৈ কমিত না।

তবে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দোষের তুলনায় পুস্তকের গুণের অংশ অনেক বেশী। ইহার রুচিও খুব মার্জ্জিত। নীতির দিক দিয়া বিচার করিতে গেলেও গল্পগুলির প্রশংসা করিতে হয়। একটি ছাড়া ইহার সকল গল্পই 'কমেডি'। ধর্ম্ম এবং অধর্ম্মের বিরোধেই কাব্য-সংসার রচিত হয়। পাপ যতই বুদ্ধিমত্তার সহিত

সংসাধিত হউক না কেন, কালে তাহার পরাজয় আছেই, ইহাই দেখান কবির কর্ত্তব্য। 'বাসিফুলে' ইহার ব্যতিক্রম দেখিলাম না। সৌন্দর্য্যের সহিত পুণ্যের প্রতিষ্ঠা আঁকাই হিন্দু-লেখকের কর্ত্তব্য। নহিলে, পুস্তকের অধ্যয়ন-ফল ভাল হয় না। হিন্দুর কাব্যের গুণাগুণ অধ্যয়নফলের উপরই বেশী নির্ভর করে। এ হিসাবেও 'বাসি ফুল' সার্থক হইয়াছে। 'বাসি ফুল' মাতা, পুত্র, স্ত্রী ও ভগ্নী সকলের হাতেই নিঃসঙ্কোচে দেওয়া যায়। এই বিকট বাস্তবতার যুগে গ্রন্থের পক্ষে ইহাও একটা কম সুখ্যাতির কথা নহে।

পুস্তকখানির ছাপা ও কাগজ অতি চমৎকার। সিল্কের বাঁধাই। ২৫৬ পৃষ্ঠায় গ্রন্থখানি সমাপ্ত। ইহা দেড় টাকা মূল্যে ক্রয় করিলে পাঠকেরা জিতিবেন বৈ ঠকিবেন না। গ্রন্থখানি আত্মীয়-স্বজনকে উপহার দিবার যোগ্য।

একাদশীর দণ্ড।

[লেখক—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।]

(১)

প্রভাতে উঠিয়াই দেখিলাম—থানার অফিস-গৃহে উপবিষ্ট কুটকচালে গ্রামের একাদশী পোদ্দার। অবশ্য লোকটার পিতৃদত্ত নাম—বাদল পোদ্দার। কিন্তু তাহার মুখ দেখিলে লোকের ভাগ্যে একাদশীর উপবাস ঘটে বলিয়া, দেশের লোক বাদলরাম পোদ্দারকে একাদশী পোদ্দার বলিত।

একাদশীর নাকি ধনের সীমা ছিল না। তাই সাক্ষাতে কেহ তাহাকে অপ্রিয় কথা বলিতে সাহস করিত না। আমিও মনোভাব গোপন করিয়া বলিলাম—কি পোদ্দার মশায়! প্রভাতেই আমাদের এখানে শুভাগমন কেন?

পোদ্দার বলিল—অবশ্য কারণ আছে। সর্ব্বনাশ হ'য়েছে, দারোগাবাবু, সর্ব্বনাশ হ'য়েছে। আমার স্ত্রীর নথ্ চুরি গেছে।

লোকে বলিত—একাদশী যেমন কৃপণ, তেমনি স্ত্রৈণ। সুতরাং এ ক্ষেত্রে বেচারা দ্বিগুণ সাজা পাইয়াছিল। একে ধনহানি তাহার উপর স্ত্রীর মনঃকষ্ট। অবশ্য লোকসমাজে বলিলে কুরুচির পরিচয় দেওয়া হয়—কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সংবাদটায় মনে যেন একটু তৃপ্তি অনুভব করিয়াছিলাম। আমি সহানুভূতির স্বরে বলিলাম—আহাঃ হাঃ বড় দুঃসংবাদ ত! কি ক'রে চুরি গেল?

পোদ্দার বলিল—বড় আশ্চর্য্য চুরি মশায়। ভারি আশ্চর্য্য চুরি। নথের মুক্তাটার দাম হাজার টাকা মশায়! পুরো এক হাজার টাকা!

আমি বলিলাম—বলেন কি? বড় দুঃখের কথা তো।

পোদ্দার বলিল—একে সোণা হারাতে নেই তার ওপর নথ। নথ হারান বড় অলক্ষণ—বেনের ঘরে বড় কুলক্ষণ। আপনারা বামুন বদ্যি এ কথাটা ভাল বুঝবেন না।

আমি বলিলাম—সে কি কথা? বুঝব না! হাজার টাকার একটা জিনিষ গেছে—লোকসানের মাত্রাটা বুঝব না? আর বিশেষ আপনার গিন্নির জিনিস।

"ঠিক্ বলেছেন দারোগাবাবু! আর বিশেষ আমার গিন্নির জিনিস। গিন্নি কেঁদে রসাতল কর্‌ছে মশায় রসাতল তলাতল করছে। আর কি বল্‌ব দারোগা-বাবু! তার শরীর খারাপ। নথের শোকে আরও শরীর খারাপ হ'বে। আবার কবিরাজ ডাক, ওষুধ আন, পয়সা খরচ কর।"

অবশ্য একাদশী পোদ্দারের উচ্ছ্বাসের ভিতর হইতে নথ চুরি সম্বন্ধে সার সত্যটুকু আবিষ্কার করিতে আমার কতকটা সময় লাগিয়াছিল। তাহার গল্প শুনিয়া মনে হইল যে, তাহার স্ত্রীর নূতন দাসীর উপর তাহার ঘোর সন্দেহ জন্মিয়াছে। অবশ্য তাহার কথা সত্য হইলে দাসীটার উপর সন্দেহ হইবারই কথা। পোদ্দার-গৃহিণী ঘরে সিন্দুকের উপর নথটি খুলিয়া রাখিয়া মুখ ধুইতে গিয়াছিলেন! সে সময়ে বাটীতে অপর কেহ ছিল না। বারান্দায় দাসীটা শুইয়াছিল। পোদ্দার-গৃহিণী মুখ ধুইয়া ঘরে ফিরিয়াই দেখিলেন, দাসী কক্ষ হইতে বাহিরে যাইতেছে। তিনি ঘরে নথ খুঁজিয়া পাইলেন না। তখনই তিনি দাসীকে ধরিলেন, তাহার "তল্লাসী" লইলেন। গৃহের সকল স্থল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অন্বেষণ করিলেন, কিন্তু কোথাও নথ খুঁজিয়া পাইলেন না।

সমস্ত কাহিনীটা শুনিয়া আমার মনে হইল যে, দাসীই অলঙ্কারটি বাটীর কোনও স্থলে লুকাইয়া রাখিয়াছে। বাহির করিবার সুবিধা পায় নাই। কিন্তু পোদ্দার বা তাহার গৃহিণী যে অনুসন্ধানে ত্রুটি করিয়াছে তাহা বিশ্বাস হইল না। তাহাতেই ব্যাপারটা রহস্যময় বলিয়া বোধ হইল। আমি পোদ্দার মহাশয়ের সহিত কুট-কচালে গ্রামে যাত্রা করিলাম। অবশ্য যাহার মুখ দেখিয়া যাত্রা করিলাম তাহাতে সাফল্যের আশা মোটে ছিল না—সে কথা বিস্মৃত হইলাম না।

(২)

কটকচালে গ্রামের এক প্রান্তে পোদ্দারের বাটী। বেশ মজবুত পাকা

গাঁথনী, কিন্তু দেওয়ালে বালির উপর চূণকাম করা নাই। সদর দরজা খুব মোটা কাঠের, মাঝে মাঝে লোহার গুল্ বসান। লোহার খিল দেওয়ালের ভিতরের গর্ত্তে অবস্থিত, টানিয়া অপর দিকের দেওয়ালের গর্ত্তের ভিতর প্রবেশ করাইয়া দিলে দরজা ভিতর হইতে বন্ধ হয়। পোদ্দার অপুত্রক। বাটীতে আত্মীয়-স্বজনের স্থান নাই। স্বামী-স্ত্রী একটি মাত্র কক্ষে বসবাস করে। বাকী কক্ষগুলি বন্ধ থাকে। ভৃত্যদিগের মধ্যে একটী মাত্র দাসী বাটীর ভিতরের সকল কার্য্যে গৃহিণীর সহায়তা করে, আর গোবর্দ্ধন নামক একটি গোপনন্দন একাধারে দ্বারবান, খানসামা এবং স্থদ-আদায়ের গোমস্তা। চুরির সময় গোবর্দ্ধন গৃহে ছিল না।

বাদল পোদ্দারের শয্যাগৃহ খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সাজ-সরঞ্জমের মধ্যে একখানা বড় চৌকী আর তিনটা আম কাঠের সিন্দুক। প্রত্যেক সিন্দুকে দুইটা করিয়া তালা। গৃহে দুই একটা টিনের পুরাতন ক্যানেস্তারার মধ্যে নানারূপ পদার্থ ছিল। গৃহের একটী মাত্র জানালা তাহার বাটীর পশ্চাতের গলির উপর অবস্থিত। শুনিলাম নথ হারাইবার পর সমস্ত পদার্থ নাড়িয়া চাড়িয়া দেখা হইয়াছিল।

জানালা দিয়া হাত বাড়াইয়া জিনিসটা কোনও বাহিরের লোককে দিতে পারা যাইত। সম্ভবতঃ দাসীটা তাহাই করিয়াছিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, চুরি যাইবার অব্যবহিত পরে কেহ জানালার অবস্থা দেখিয়াছিল কি না। কথায় বলে কৃপণেরা অধর্ম্ম করে না। পোদ্দার বলিল—ঐ হতভাগা মাগী যে নথটা চুরি করেচে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু সত্যি কথা বল্‌তে আমি ভয় পাব না। গিন্নি তখনই জানালাটা দেখেছিল। জানালাটা বন্ধ ছিল। আর জানালার চাতালে এই বড় বাক্সটা ছিল।

আমি বলিলাম—বাক্সটা সরিয়ে জানালাটা একটু ফাঁক ক'রে তো হাত বাড়িয়ে মালটা পাচাড় করা যায়।

একাদশী বলিল—আজ্ঞে তা' বোধ হয়, হয় নি। এই বাক্সটার কোলে কতকগুলা কুচো কাচা জিনিস ছিল। সব সরাতে অনেকটা সময় যায়। আমার পরিবার মাত্তর এক মিনিট কি দু'মিনিট পাতকো তলায় গিয়েছিল। জিনিস পত্তর সব ঠিক ছিল।

আমি বলিলাম—বাহিরে দেখেছিলেন?

সে বলিল—হাঁ, তখনই বাহিরে তন্ন তন্ন করে খুঁজেছিলাম। কিছু পাইনি।

আমি বড় সমস্যায় পড়িলাম। ঘরে তো চোরাই মাল লুকাইবার কোনও স্থানের সন্ধান পাইলাম না। প্রায় চৌদ্দ ফুট উপরে ঠিক কড়ি কাঠের নীচে একটি কুলঙ্গী ছিল। পোদ্দারকে জিজ্ঞাসা করিলাম—ওটা কি?

সে বলিল—ওটা পায়রার বাসা। ওখানে লুকিয়ে——

আমি বলিলাম—না। সে সন্দেহ না। ঘরে পায়রার বাসা,—তাই বল্‌ছিলাম।

সে বলিল—না ঘরে কোনও উৎপাত নেই। ও গর্ত্তটা বাহিরে অবধি আছে। ওরা বাহির দিয়েই যাতায়াত করে।

আমি বলিলাম—তা হ'লেও একটা জঞ্জাল।

একাদশী পোদ্দার জিব কাটিল, কাণ মলিল, উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া বলিল—ছিঃ ও কথা বল্‌বেন না। ওরা হ'ল লক্ষ্মীর বাহন। ওদের খেতে দিতে হয় না, তবু ওরা বাহন।

বুঝিলাম—আহার জোগাইতে হইলে কমলার দূতের অত আদর থাকিত না।

(৩)

দাসীর নাম ননী। ননী গোয়ালার মেয়ে, বেশ হৃষ্টপুষ্ট, বয়স আন্দাজ পঁচিশ। শুনিলাম সে বিধবা। পায়রানাগায় তাহার মাতা বাস করিত। ননী ছয় মাস পোদ্দারের বাটীতেই কাজ করিতেছিল। অনুসন্ধান করিয়া বুঝিলাম, গ্রামের লোক তাহাকে জাতির বাহির করিয়া দিয়াছে বলিয়া তাহাকে দাসীবৃত্তি লইতে হইয়াছে। বিধবা ননী গোপনে নিতাই গোয়ালার সহিত প্রণয় করিত। গ্রামের লোক তাহা জানিয়া ননীকে পতিতা সাব্যস্ত করিয়াছে—নিতাই গোপের জাতিমর্য্যাদা অটুট আছে—বরং যুবক গোপসমাজে তাহার সম্ভ্রম বাড়িয়াছে। কিন্তু হিন্দুসমাজের কঠোর নিয়মে এ রকম স্থলে স্ত্রীলোকই নিন্দনীয়া। যত শাসন যত শাস্তি তাহাকে ভোগ করিতে হয়। সম্প্রতি এক বেদজ্ঞ বৈদ্যপণ্ডিত মনুকে "মাতা মনু" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার যুক্তির বিরুদ্ধে অপর কারণগুলা ছাড়িয়া দিলেও, এই কারণেই মনুর পুরুষত্ব সপ্রমাণ হয়। মনু স্ত্রীলোক হইলে বিপত্নীকের বিবাহ নিষিদ্ধ হইত, অবৈধ প্রণয়ের জন্য পুরুষ পতিত হইত।

যাহা হউক, পোদ্দারবাটীতে দাসীবৃত্তি গ্রহণ করিয়া অবধি ননীর "স্বভাব-চরিত্র" সম্বন্ধে আর কোনও কুকথা শুনা যায় নাই। কূটকচালে গ্রামের মুদি দুই

একবার তাহাকে দেখিয়া কাসিয়াছিল তবু ননী তাহার দিকে তাকায় নাই। কিন্তু এই ছয় মাসের মধ্যে নিতাই বিনা কারণে কয়েকবার কূটকচালে গ্রামে আসিয়াছিল এবং পোদ্দারগৃহের নিকটে লোকে তাহাকে দেখিয়াছিল। আরও প্রমাণ পাইলাম, যে সময় পোদ্দারগৃহিণীর নথ চুরি যায়—ঠিক তাহার আধ ঘণ্টা পরে নিতাই কূটকচালের বাজারের মধ্যে ঘুরিতেছিল।

বলা বাহুল্য, শেষ খবরটায় আমার সন্দেহ বেশ প্রবল হইল। সিন্ধুকের উপর হইতে তুলিয়া লইয়া সে কোনও প্রকারে নথটা নিতাইয়ের হাতে ফেলিয়া দিয়াছিল। কিন্তু কি প্রকারে সে এ কার্য্য সম্পন্ন করিল তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না। পোদ্দারের স্ত্রী তাহাকে গৃহ হইতে তাড়াতাড়ি বাহির হইতে দেখিয়াছিল। সুতরাং তাহার পূর্ব্বেই সে অলঙ্কারটা তুলিয়া লইয়াছিল। তখনই নথের খোঁজ হইয়াছিল—তাহার তল্লাসী লওয়া হইয়াছিল—তাহার নিকট নথ ছিল না। তাহা হইলে গৃহ হইতে বাহির হইবার পূর্ব্বেই সে নথটা বাহির করিয়া দিয়াছিল। গৃহে লুকাইয়া রাখে নাই তাহা নিঃসন্দেহ। কিন্তু বাহির করিল কোন্ পথে? মুহূর্ত্তের মধ্যে বাক্সটা সরাইয়া জানালার ভিতর দিয়া জিনিসটা বাহিরে প্রণয়ীর হস্তে সমর্পণ করা ওরূপ নায়িকার পক্ষে অসম্ভব না। কিন্তু ঠিক্ সেই অল্প সময়ের আকস্মিক সুযোগে নিতাই আসিল কোথা হইতে?

আমি অনেক ভাবিয়া সেদিন সন্ধ্যার সময় বাদল পোদ্দারকে বলিলাম—মাগীই দোষী। আপনি——

বাদল বলিল—আমি তো সেই কথাই বল্‌ছি—দারোগা বাবু—সেই কথাই বল্‌ছি। মাগীর যদি ভাত খাওয়া দেখেন তো আপনার কোনও সন্দেহ থাক্‌বে না। ঠিক এক কাঠা চালের ভাত খায়, দারোগা বাবু, এক কাঠা চালের ভাত! কেবল গিন্নির খাতিরে কিছু বল্‌তে পারিনি, না হ'লে এতদিনে বেটীকে বিদায় করতুম। অবশ্য একাদশীর সকল বিষয় মাপিবার এক গজকাটি—কাহার জন্য কত ব্যয় হয়। আমি বলিলাম—বেশ তবে চার্জ্জ সহি করুন।

সে বলিল—ওরে বাবা সেটা পারবো না। আপনারা প্রমাণ পান ধরুন। আমার জিনিসটা বেরুলে হ'ল। ও সব চার্জ্জ মার্জ্জ জানিনি।

আমি বলিলাম—তা হলে নিতাইয়ের বাড়ীর খানাতল্লাসী কর্‌তে পারব না।

সে বলিল—তা' পারুন আর নাই পারুন আমি ও সবের ভেতর নেই। আবার মাম্‌লা প্রমাণ না হ'লে বেটী উল্টো কামড় মারবে—ইজ্জতের নালিশ

করবে, হরযুতের দাবী দেবে—বাবারে! উকীলবাড়ী ছোট, উকীলকে পয়সা খাওয়াও—কর্ত্তারা এক একটা রাঘব বোয়াল। উকীলের কামড় কচ্ছপের কামড়—মেঘ না ডাক্‌লে ছাড়ে না।

আমি দেখিলাম এ পথে সুবিধা হইবে না। কৃপণকে লোভ দেখাইতে হইবে। এই চার্জ্জ সহি করিলে তাহার কোনও বিপদ নাই, তাহার সহির জোরে নিতাইয়ের বাড়ী তল্লাসী করিলেই তাহার জিনিষ বাহির হইবে—সে কথা তাহাকে পুনঃ পুনঃ বুঝাইলাম। জিনিসের আশায় সে অবশেষে দস্তখত করিল। কলম ছাড়িয়া আবার বলিল—দেখবেন দারোগা বাবু দোহাই আপনার। শেষে ঢাকের দায়ে মনসা না বিক্রী হয়, ভিক্ষে করতে গিয়ে না ধুচুনী হারিয়ে বসি।

(৪)

নিতাইয়ের বাটী থানাতল্লাসী করিয়া কিছু পাইলাম না। দুই দিন ধরিয়া ননীকে হাজতে রাখিয়াছিলাম। স্ত্রীলোকটা দুই দিন জলস্পর্শ করে নাই, কেবল দিন রাত কাঁদিতেছিল। আর তাহার উপর প্রভাতে উঠিয়াই একাদশীর মুখ মনে পড়িত, তাহার নাম স্মরণ করিতাম। অব্যর্থ নাম—সারাদিন কষ্টে যাইত—স্ত্রীলোকটার আর্ত্তনাদে মর্ম্মে আঘাত পাইতাম অথচ কিছু সিদ্ধান্ত করিতে পারিতাম না। ভাবিলাম, আজিকার দিনটা দেখিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিব। ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হইতে তাহাকে পনের দিন ধরিয়া রাখিবার হুকুম পাইয়াছিলাম। কিন্তু তাহার বিরুদ্ধে নূতন কোনও সাক্ষ্য পাইবার আশা ছিল না।

মধ্যাহ্নে আহারাদি সমাপন করিয়া খাটিয়ায় শুইয়া মামলাটা সম্বন্ধে ভাবিতেছিলাম। ঘরের কার্ণিসের উপর একটা চড়াই-দম্পতী বাসা করিয়াছিল। তাহারা কিচির মিচির করিয়া নানারূপ ক্রীড়া করিতেছিল। আমি অলস ভাবে তাহাদিগকে দেখিতেছিলাম। চড়াইটা আমার টেবিলের উপর নামিল এবং চিড়িক চিড়িক করিয়া দুইবার লেজ নাচাইয়া আমার টেবিলের উপর হইতে খড়কেটা লইয়া উড়িয়া বাসায় গেল। আমি লাফাইয়া উঠিলাম। বন্দিনীর আর্ত্তনাদটা যেন আমাকে আরও উত্তেজিত করিল। আমি তাড়াতাড়ি অশ্বারোহণে কূটকচালে গ্রামে একাদশী পোদ্দারের বাটীতে উপস্থিত হইলাম।

তাহার গৃহের সম্মুখে গিয়া উপরের কুলঙ্গীতে চাহিলাম। আমার আর সন্দেহ রহিল না। কপোতটা বসিয়া গলা ফুলাইয়া গোঁ গোঁ করিতেছিল। এবং কপোতী ডিমে তা দিতেছিল। চড়াইটা আমার চোখ ফুটাইয়া দিয়াছিল। আমি তাড়াতাড়ি বাঁশের সিড়ি আনাইয়া পায়রার বাসায় উঠিলাম। ঠিক্ যাহা

ভাবিয়াছিলাম, তাহা দেখিলাম। বাসা নির্ম্মাণ করিবার জন্য পায়রা-দম্পতী পোদ্দার-গৃহিণীর নথ চুরি করিয়াছিল। তাহাদের বাসার কাঠ-কুটার মধ্যে সোণার নথ—ডিমের পার্শ্বে হাজার টাকা মূল্যের ধপ্ধপে সাদা মুক্তা।

মুক্তা পাইয়া পোদ্দার নাচিতে লাগিল। পোদ্দার-গৃহিণী অবগুণ্ঠনের ভিতর হইতে লোলুপ দৃষ্টিতে অলঙ্কারের দিকে চাহিয়াছিল। পোদ্দার আমার বুদ্ধির প্রশংসা করিতে করিতে আত্মবিস্মৃত হইতেছিল পায়রাদের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিতেছিল।

তাহাদের আনন্দের উচ্ছ্বাসে বাধা দিয়া আমি বলিলাম—এ সব তো হ'ল কিন্তু ননীকে একশত টাকা খেসারত দিতে হ'বে।

এই নিদারুণ শোক-সংবাদে পোদ্দার আমাকে খুব গালি দিয়াছিল। ননী সম্বন্ধে অনেক কুকথা বলিয়াছিল, নানারূপ মুখভঙ্গী করিয়াছিল, অনেক বার শিরে করাঘাত করিয়াছিল। আমি কিন্তু অচল অটল।

পোদ্দারের টাকায় গরু কিনিয়া ননী দুধের ব্যবসা আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু নিতাই তাহার সহিত আর গোপনে দেখাসাক্ষাৎ করিত কি না—সে সংবাদ রাখি নাই।

রম্ভা।

[লেখক—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।]

প্রবাদ আছে, বাঙ্গালা দেশ জয় করিবার পর নারিকেলের জল পান করিয়া, নারিকেলের শাঁস খাইয়া নারিকেলের ছোবড়ার উপকারিতার কথা শুনিয়া বক্তিয়ার খিলিজি বলিয়াছিলেন,—"বুঝেছি কেন বাঙ্গালীরা হীনবল। ভগবান যখন তাদের দেশের একটা ফলের মধ্যে দুখানা রুটী আর এক পেয়ালা জল জুগিয়ে রেখেছেন, তখন তারা বাধ্য হ'য়ে বিলাসী হবে।" বক্তিয়ার খিলিজী সে সময় কলাগাছ দেখিয়াছিলেন কিনা সে সংবাদ তদানীন্তন কালের কোনও লিপিকুশল ইতিহাসলেখক আমাদিগকে প্রদান করেন নাই। কিন্তু নারিকেলের কাহিনীর মূলে সত্য থাকিলে কদলী-বৃক্ষ দেখিয়া আফগান-সেনাপতি বাঙ্গালী জাতির প্রতি আরও সহানুভূতি করিতেন, সন্দেহ নাই। একই গাছে থোড়, মোচা, কাঁচকলা, পাকা কলা,—গাছের পাতা পাতিয়া ভোজনের ব্যবস্থা—তাহা

দেখিলে পরাজিত বঙ্গবাসীর অধঃপতনের কারণটা বোধ হয় আরও উত্তমরূপে উপলব্ধি হইত। যে দেশে প্রকৃতি সন্তানদের অত সহজে আবশ্যক দ্রব্য সরবরাহ করেন না, সেখানে লোককে পরিশ্রম করিতে হয়। পরিশ্রম করিলে মাংসপেশী সবল হয়, দেহের বল বৃদ্ধি হয়। আমরা মায়ের আদুরে ছেলে, অল্প আয়াসেই আমাদের উদরান্ন সংগ্রহ করিতে পারি। সেই সহজ-লব্ধ ধনের মধ্যে রম্ভা আমাদের একটী ভাল সম্পত্তি। বাঙ্গালী কলা না খাইলে কি হইত বলা শক্ত।

উদ্ভিদশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতেরা উদ্ভিদ্‌জগতকে সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করেন —পুষ্পিত ও ফুলহীন উদ্ভিদ্। ইহাদিগকে ইংরাজীতে বলে phanerogamae এবং cryptogamae। আমরা সাধারণতঃ প্রায় সকল বৃক্ষেই ফুল ও ফল দেখিতে পাই। আম, কাঁঠাল, বট, ডুমুর, ঘাস, নারিকেল, কচু, ঘেচু, মায় বাঁশগাছ অবধি—সকল গাছেই এক সময় না এক সময় ফুল ফোটে—তবে সব ফুলের গোলাপ বা বেল জুঁইয়ের মত গন্ধ থাকে না, এবং সর্ব্বত্র ইন্দীবর বা কিংশুকের মত সৌন্দর্য্য আমাদের দৃষ্টিশক্তির অপার আনন্দ সম্পাদন করে না। উদ্ভিদ্-জগতের এই বড় ভাগটা পুষ্পিত। কিন্তু বাবুদের গাছ-ঘরের বা পুকুরের পাড়ের ফার্ণ ও শৈবাল, ব্যাঙের ছাতা (mushroom) প্রভৃতি এক শ্রেণীর উদ্ভিদের ফুল হয় না, ফল ফলে না। তাহাদের জন্ম-প্রণালী সাধারণ জীব ও উদ্ভিদের জন্ম-প্রণালী হইতে স্বতন্ত্র। ইহারা ফুলহীন বা cryptogamae।

অবশ্য বাঙ্গালী-প্রিয়, এ দেশের ইংরাজ-প্রিয় এবং বানর-প্রিয় কদলীর ফুল ফোটে, সুতরাং ইহা পুষ্পিত উদ্ভিদের অন্তর্গত। এই পুষ্পিত উদ্ভিদের আবার দুইটা বড় বড় শ্রেণী আছে। এক-দল বৃক্ষ (monocotyledons) এবং দ্বিদল বৃক্ষ (dicotyledons)। অবশ্য এই দুই বিভাগের পার্থক্যের বৈজ্ঞানিক তালিকা খুব লম্বা। মোটের উপর নারিকেল, তাল, কদলী, তৃণ, কচু, ইক্ষু প্রভৃতি বৃক্ষ এক-দল। আম, কাঁঠাল, শাল, সেগুন, গোলাপ, মল্লিকা, ক্রোটন প্রভৃতি বৃক্ষ দ্বিদল জাতীয়। মোটামুটি দেখা যায়— দ্বিদল বৃক্ষের শাখা প্রশাখা থাকে, কিন্তু এক-দল বৃক্ষ শাখাহীন, তাহার মাঝখান হইতে উপরে উপরে পাতা বাহির হয়। যেমন উপরে পাতা জন্মায় তেমনি নিচের পাতা খসিয়া পড়ে। উভয় জাতির পাতার আরও একটা পার্থক্য সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়। দ্বিদল গাছের একখানা পাতা ছিঁড়িলে দেখা যায় তাহার সর্ব্বাঙ্গ শিরা উপশিরা বেষ্টিত। নারিকেল পাতায় বা কলাপাতায় কেবল সমরেখ শিরা দেখিতে পাওয়া যায়। যখন আমগাছ [illegible] দেখা যায়—বীজ ফাটিয়া সরু ডাঁটায় দুইটী

পাতা জন্মায় কিন্তু নারিকেল বা কচু গাছের বীজের ঠিক্ মধ্যস্থল ভেদ করিয়া একটি সরু ডাটা ঊর্দ্ধমুখে উঠিতে থাকে। শেষে সেই ডাঁটাটির পাক খুলিয়া গেলে দেখা যায়, সেটির শিরে মাত্র একখানি পত্র। এই প্রথম পত্রোদ্গমের বিশেষত্ব হেতুই ইহাদের দ্বিদল ও এক-দল নামকরণ করা হইয়াছে।

কদলী বৃক্ষ একদল শ্রেণীর অন্তর্গত। কদলীর আবার নানা প্রকার শ্রেণী আছে—কাঁঠালী, চাঁপা, মর্ত্তমান, কানাই-বাঁশী, কাবুলী, চীনা প্রভৃতি। অবশ্য এ সকলের মধ্যে সামান্য পার্থক্য আছে। প্রাচীন গ্রন্থে কত প্রকার রম্ভার চাষ হইত তাহা রাজনির্ঘণ্টে পাওয়া যায়,—

মাণিক্যমর্ত্ত্যামৃতচম্পকাদ্যা
ভেদাঃ কদল্যা বহবোঽপি সন্তি।—

আমরা যাহাকে এখন মর্ত্তমান বলি—উহাই বোধ হয় প্রাচীন মর্ত্ত্যকদলী। কাজেই মর্ত্তমান কথাটা মাটাবান হইতে আসিয়াছে—এ ধারণাটা ভুল। অবশ্য ইহাদের পত্র পুষ্প ফুলের আভ্যন্তরীন গঠনের কোন বিশেষ পার্থক্য নাই।

একদল জাতীয় সকল বৃক্ষের পাতার মত কলাপাতাও ঠিক গাছের মধ্যস্থল ভেদ করিয়া উপরে উঠে। তাহার পর পাক খুলিয়া যায়। কচি কলাপাতার বর্ণ বড় মনোরম, খুব ফিকে সবুজ। যে পদার্থের বর্ণ যত কৃষ্ণবর্ণ হয়, সে পদার্থ তত তাপ আকর্ষণ করে। সদ্যোদ্গত কদলী-পত্র অধিক উত্তাপ সহ্য করিতে পারিবে না বলিয়া তাহার বর্ণ গাঢ় হয় না। ক্রমশঃ কলাপাতার বর্ণ গভীর হইতে থাকে, পাতা বিস্তৃত হয়। ঠিক অমনি ভিতরে অপর একখানি পাতা থোড়ের মাঝখান দিয়া ঠেলিয়া অন্ধকারের ভিতর দিয়া ঊর্দ্ধমুখে অগ্রসর হইতে থাকে।

অত বড় পাতা সোজা হইয়া সমস্ত দেহটি খুলিয়া অরুণ কিরণে বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইলে বড় শোভা হয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু কলাগাছ চিরকালই নববধূর মত সঙ্কুচিতা। বাস্তবিক সে জড়সড় লজ্জাশীলা না হইলে অতবড় পাতাগুলা পবনদেবের অত্যাচারে ছিন্নভিন্ন হইবারই কথা। তাহাদের দেহ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্যই বিশ্বনিয়ন্তা কদলীপত্রের ওরূপ গঠন করিয়াছেন—মধ্যে নরম মেরুদণ্ড, দুইপার্শ্বে দুই অংশ—যেন কোন নবশক্তিতে অনুপ্রাণিত, নূতন মন্ত্রে দীক্ষিত নূতন জাতির সবুজ পতাকা। নারিকেল খেজুর প্রভৃতি বৃক্ষের লম্বা পাতাগুলা মেরুদণ্ডের দুইদিকে ছোট ছোট অংশে বিভক্ত, তাই সেই অংশগুলি দৃঢ়রূপে সংবদ্ধ।* তাহাদের ভিতর দিয়া বায়ু বহিতে পারে। কিন্তু কলাপাতা

নরম। কদলীপত্র বায়ুর হিল্লোলে বেতসীবৃত্তি অবলম্বন করিয়া চারিদিকে দুলিতে পারে।

কলাগাছের মাঝের সারটা থোড়। এই থোড়ের সঙ্গে কোনও দ্বিদল গাছের সারের একটা বিশেষ পার্থক্য আছে। আম, কাঁঠাল প্রভৃতি গাছে, প্রথমে মাঝের সারটা জন্মায়, ক্রমশঃ গাছের যত বয়স বৃদ্ধি হয়, সেই মাঝের সারের চারিদিকে তত কাঠ জমিতে থাকে এবং বাহিরে একটা ত্বক বা কর্কের সৃষ্টি হয়। বাহিরে চারিদিকে যত নূতন কাঠ পড়িতে থাকে মাঝের সার তত পুরান হয়, তত শক্ত হয়। তাই দ্বিদল গাছের মাঝ-সার সর্ব্বাপেক্ষা শক্ত। ইহাদের ভিতরের কাঠই সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন। বাহিরে ক্রমশঃ নূতন চক্রের সৃষ্টি হয়। আম্র প্রভৃতি বৃক্ষে প্রতি বৎসর একটা করিয়া কাঠের চক্র জন্মে। আম-কাঠ কাটিলে তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। ত্বকের নিচে কতকটা নরম অংশ থাকে, তাহার ভিতর দিয়াই রসাল বৃক্ষের রস যাতায়াত করে, তাহারই বৃদ্ধি হইয়া পুরাতন অংশটা দারুময় হয়, নূতন অংশটা আবার ঐরূপ কার্য্যকরী হয়। কিন্তু এক-দলী বৃক্ষের বৃদ্ধি-প্রকরণটা অন্য প্রকারের। ইহাদের বৃদ্ধি ঠিক মধ্যস্থলের ভিতর দিয়া। কাজেই নারিকেল, তাল, খর্জ্জুর, কদলী, ধান, ঘাস, প্রভৃতি গাছের ভিতরটা নূতন। বাহিরের অংশটা পুরাতন। কাঠ ঠেলিয়া নূতন পাতার দল ঊর্দ্ধমুখে ধাবিত হয়, পুরাতন অংশটা একেবারে বাহিরের দিকে পড়ে। তাই কলাগাছের বাহিরের পুরাতন অংশটা শক্ত, গবাদি পশুর খাদ্য। ভিতরের থোড় কচি, রসযুক্ত, মানুষ সে অংশটি নিজের আহারের জন্য রাখিয়া দেয়। এই অংশ দিয়াই কদলীবৃক্ষ জল টানিতে থাকে। নারিকেল প্রভৃতি গাছের গায়ে পুরাতন পত্রের দাগ থাকে। নারিকেল গাছ যেমন বাড়িতে থাকে, অমনি তাহার পুরাতন পাতাগুলি খসিয়া পড়ে। তাই নারিকেল গাছ খেজুর গাছ প্রভৃতির গায়ে চাকা চাকা দাগ থাকে। ঠিক কতদিন অন্তর পাতা পড়ে তাহা লক্ষ্য করিলে এই দাগ দেখিয়া এই শ্রেণীর বৃক্ষের বয়সের কথা বলা যায়।

বলা বাহুল্য মোচা কলার ফুল। সংস্কৃত অভিধানে দেখিয়াছি, মোচা অর্থে কদলী। 'অভিধান-চিন্তামণি'তে হেমচন্দ্র বলিয়াছেন—"রম্ভা মোচা কদল্যপি।" কিন্তু আমরা বাঙ্গালা ভাষায় মোচা বলি—কলার ফুলকে, প্রকৃত পক্ষে তাহাদের অক্ষত শরীরে রাখিবার আবরণ অবধি সমস্ত জিনিসটাকে মোচা বলি। মোচা দেখিতে বড় সুন্দর। আবার মোচার খোলার বর্ণ মনোরম। মোচার

খোলার ভিতরের বর্ণ কাঁচা কলাপাতার বর্ণের মত বড় মৃদু বড় উন্মাদক। অবশ্য পাতার রং সবুজ মোচার রং নীল লোহিত ও পীত সংমিশ্রিত। এক একটা খোলার নিচে দুই থাক্ করিয়া ফুল জন্মে। এক এক থাকে আট হইতে ষোলটা অবধি ফুল দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক মোচায় এই রকম খোলা অনেক থাকে। তাই এক এক কাঁদিতে অত অধিক পরিমাণে কলা জন্মে। অবশ্য মোচার সমস্ত থাক পাকিয়া রম্ভায় পরিণত হয় না। উপরের গুলা ছড়া ছড়া কলা হয় কিন্তু নিচের থাক গুলা খোলার সহিত খসিয়া পড়ে। দুই এক থাক খসিয়া পড়িলেই মোচাটা কাটিয়া লইয়া রন্ধনশালায় ব্যবহার করি। এক একটা কলার কাঁদি চার ফুট অবধি হয়। সমস্ত কাঁদিটা ওজনে প্রায় এক মণ অবধি হইতে পারে।

প্রথমে উপরের ফুলগুলা বড় হয়, তাহারা যৌবনলাভ করিলেই খোলাটি পড়িয়া যায়। ফুলের ভিতর হইতে অমৃত (nectar) ক্ষরণ হয়। অমৃতের লোভে অলিকুল আসিয়া কদলী-কুসুমের আশ্রয় গ্রহণ করে। তাহাদের গাত্রে ফুলের রেণু লাগিয়া যায়, সেগুলা তাহাদের দ্বারা স্ত্রীজাতীয় পুষ্পে লাগিয়া যায়। মোচার উপরের থাকের একটা ফুল ছিঁড়িলে দেখা যায় যে, ফুলের ভিতরে একটা লম্বা ডাঁটা থাকে আর তাহার নিম্নে পাঁচটি ছোট ডাঁটা। মাঝের উচু ডাঁটাটির উপর আটা থাকে। ইহা স্ত্রী-পুষ্প। তলার পাঁচটি ডাঁটা পুরুষ। অলিকুল অমৃত চুরি করিতে গিয়া পুরুষ হইতে রেণু লইয়া সেই আটায় লাগাইয়া দেয়। কুসুম-বধু গর্ভবতী হয়েন, ক্রমশঃ আশপাশের দলগুলা ঝরিয়া পড়ে, রম্ভার উৎপত্তি হয়। এক এক থাক ঝরিয়া এইরূপে রম্ভায় পরিণত হয়। মোচার নিচের ফুলগুলা বন্ধ্যা, তাই তাহারা ঝরিয়া পড়ে। ফল ফলে না। প্রথমে 'ঠুঁটে কলার কাঁদি' জন্মায়, ক্রমশঃ "কাঁচকলার" আবির্ভাব, শেষে পক্ক কদলী।

কথায় বলে—"খোদার উপর খোদ্‌কারী চলে না।" কিন্তু মানুষের ভিতর ভগবানের যে অংশ আছে, তাহার বলে মানুষ সৃষ্টির বিপর্য্যয় ঘটায়, তাহা আমরা নিত্য দেখিতে পাই। হয় ত এই বিপর্য্যয় ঘটিবার শক্তিটাই প্রকৃতি। কিন্তু এই প্রকৃতির গুণে এবং মানুষের "একটা নূতন কিছু" করিবার প্রবৃত্তির বলে জীবের শ্রেণীবৃদ্ধি হয়, একথা ডারবিন সপ্রমাণ করিয়াছেন। একটা কাঁঠালীকলা আর একটা মর্ত্ত্যমান কলা লইয়া উদরস্থ করিবার লোভ সম্বরণ করিয়া একটু পরীক্ষা করিলে, মানবের ঐশ-শক্তির বিকাশের একটা উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়। গাছের ফল হয়, বংশবৃদ্ধির জন্য, সে বিষয়ে

সন্দেহ নাই। সকল ফলের মধ্যে বীজ থাকে আর সেই বীজের আহার্য্যের জন্য কতকটা শাঁস থাকে। কদলীর এমন সুমিষ্ট নরম শাঁসগুলা তাহার বীজের পুষ্টিসাধনের জন্য প্রথমে সৃষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু পেটের দায়ে নর বানর বিহঙ্গম প্রভৃতি সেই ফলে পরিতৃপ্ত হইতে লাগিল। তাহাও বোধ হয়, ভগবানের অভিপ্রেত। শেষে মানুষ এই ফলটার চাষ করিবার বাসনা করিল। তখন সে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিল যে, একটা কলাগাছে মাত্র এক কাঁদি কলা জন্মে তাহার পর গাছটা মরিয়া যায়। সেই কলার বীজে অবশ্য গাছ জন্মে। কিন্তু সেই মৃত পাদপের পার্শ্ব হইতে ছোট একটা গাছের মত কি বাহির হয়, গরু ছাগলের কবল হইতে সেটাকে বাঁচাইতে পারিলে তাহা হইতে ঠিক পুরান গাছের মত একটা বৃক্ষের জন্ম হয়। মানুষ তখন সেই তেউড় হইতে কলার চাষ করিতে শিখিল। ফলগুলা অধিক মাত্রায় খাইতে লাগিল। তখন মানুষ বুঝিল যে ফলের সব ভাল, ঐ বীজগুলা বড় জঞ্জাল। তাহারা দেখিল— এক কাঁদির মধ্যে হয় ত একটা কলার বীজ কম, শাঁস বেশী। বাপ মা হইতে পৃথক হইবার স্পৃহা প্রাণী-জগতে স্বাভাবিক। মানুষ এই নিয়মটা বুঝিয়া নির্ব্বাচন করিতে লাগিল। যে গাছের ফলে শাঁস বেশী হইল সেই গাছের তেউড় পুঁতিতে লাগিল, সেই গাছের বীজ গাড়িতে আরম্ভ করিল। যে গাছের ফল বীজপূর্ণ সে গাছগুলা নষ্ট করিতে লাগিল। ক্রমশঃ মর্ত্ত্যমান, চম্পা প্রভৃতির সৃষ্টি হইল—কেবল শাঁস, কিন্তু যাহার জন্য শাঁস সে বীজ নাই। বাস্তবিক ইহা ঐশ-শক্তির পরিচয়—মানুষের খোদার উপর খোদগারী।

বলা বাহুল্য কেবল কলাগাছে যে মানুষ এই শক্তি দেখাইয়াছে তাহা নহে। অনেক ফলে ফুলে এই শক্তির ক্রিয়া প্রতিভাত। কলমের গাছের আমের বীজ ছোট, শাঁস বেশী। আমেরিকায় নাকি চেষ্টা হইতেছে, হাড় থাকিবে না এমন এক জাতীয় মোরগের সৃষ্টি হইবে। এ সকল অনুষ্ঠানে আমাদের জাতীয় বৈরী জার্ম্মাণ-পণ্ডিতেরা যথেষ্ট উৎসাহ দেখাইয়াছিল।

আমাদের দেশের কাঁঠালী কলা অনেকটা আদিম প্রকৃতি অক্ষুন্ন রাখিয়াছে।

কলাগাছের ফলনের শক্তি খুব বেশী—গমের ১৩৩ গুণ এবং আলুর ৪৪ গুণ। আমাদের দেশের অন্নের মত কদলী প্রশান্ত দ্বীপপুঞ্জের অনেক অধিবাসীর প্রধান আহার্য্য। কাঁচা অবস্থায় কদলীতে starch থাকে, পাকিলে সেই starch চিনিতে পরিণত হয়। কাঁচা কলা রৌদ্রে শুষ্ক করিলে তাহা হইতে এক প্রকার ময়দা প্রস্তুত হয়।

তাই বলিয়াছি, প্রকৃতি তাঁহার আদুরে ছেলেদের হস্তে যত সহজ-লব্ধ ধন অর্পণ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে রম্ভা একটি বহুমূল্য সম্পত্তি।

কুমারীপূজা

[লেখক—শ্রীগিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ।]

হিন্দুসমাজে কুমারীপূজা একটি বিশেষ পুণ্যজনক কার্য্য বলিয়া পরিচিত। তন্ত্রশাস্ত্রের অনেক স্থলেই ইহার আবশ্যকতা বিবেচিত হইয়াছে। কিন্তু তন্ত্রে ইহার বহুল প্রচার আছে বলিয়া উহাকে তন্ত্রের নিজস্ব বলিয়া মনে করিলে বড়ই ভুল করা হইবে। কারণ প্রাচীন স্মৃতি-নিবন্ধে ইহার বিধান এবং সমর্থক পৌরাণিক প্রমাণাবলী দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রবন্ধে কেবল স্মৃতি-নিবন্ধ-নিবদ্ধ প্রমাণানুযায়ি পূজার বিবরণই প্রদর্শিত হইবে।

নির্ণয়ামৃত নামক স্মৃতি-নিবন্ধে কথিত হইয়াছে যে, আশ্বিনের শুক্লপক্ষে প্রতিপদ্ হইতে আরম্ভ করিয়া নবমী পর্য্যন্ত প্রত্যেক তিথিতে কুমারীপূজা করিতে হইবে। নিজের বিভবানুসারে এক একটি বৃদ্ধি করিয়া অথবা দ্বিগুণ বৃদ্ধি করিয়া অর্থাৎ প্রথম দিনে একটি দ্বিতীয় দিনে তিনটি অথবা চারিটি এই হারে অথবা প্রতিদিনেই নয়টি করিয়া পূজা করিবে, অনন্তর ভোজন করাইবে। এই বিষয়ের প্রমাণ স্কন্দপুরাণে কথিত হইয়াছে। (১)

একবর্ষবয়স্কা কন্যা গন্ধ পুষ্পফল প্রভৃতির স্বাদগ্রহণ করিতে পারে না; অতএব তাহাকে বাদ দিয়া দ্বিবর্ষা হইতে দশম বর্ষা পর্য্যন্তকে পূজা করিবে। এই কুমারীপূজা সর্ব্বকার্য্যের অঙ্গরূপেই বিধানানুসারে কর্ত্তব্য। বয়সের বিশেষানুসারে ইহাদের পৃথক পৃথক নাম এবং পূজার বিশেষ ফল কথিত হইয়াছে। যথা দ্বিবর্ষা—কুমারিকা, ত্রিবর্ষা—ত্রিমূর্ত্তিনী, চতুর্বর্ষা—কল্যাণী, পঞ্চবর্ষা—রোহিণী, ষড়্ বর্ষা—কালী, সপ্তবর্ষা—চণ্ডিকা, অষ্টবর্ষা—শাম্ভবী, নববর্ষা—দুর্গা এবং দশবর্ষা সুভদ্রা নামে অভিহিতা হইয়াছে। ইহার অতিরিক্ত বয়স হইলে তাহাকে পূজা করিবে না।

---

(১) নবরাত্রে শুক্লাপ্রতিপদমারভ্য নবমী পর্য্যন্তং প্রতিদিনং একৈকাং কুমারীং একোত্তরবৃদ্ধ্যা দ্বিগুণবৃদ্ধ্যা বা প্রতিদিনং নব নবাপিবা বৈভবানুসারেণ সংপূজ্য ভোজয়েৎ। তদুক্তং স্কন্দপুরাণে—

"একৈকাং পূজয়েৎ কন্যা মেকবৃদ্ধ্যা তথৈবচ।
দ্বিগুণং দ্বিগুণং বাপি প্রত্যেকং নবকন্তুবা॥"

দুঃখ-দারিদ্র্যনাশ, শত্রুনাশ, আয়ুর্বৃদ্ধি এবং বলবৃদ্ধির জন্য কুমারীকে পূজা করিবে। এইরূপ প্রত্যেকের পূজারই ফলবিশেষ উক্ত হইয়াছে, অনাবশ্যকবোধে এবং বাহুল্যভয়ে তাহা উপেক্ষিত হইল।

প্রয়োজন-বিশেষ-সম্পাদনার্থ ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় কুমারীর পূজা বিহিত হইয়াছে। এমন কি অন্ত্যজ-জাতীয় কুমারীপূজারও পরিচয় পাওয়া যায়, যথা—সাধারণতঃ সকল কার্য্যেই ব্রাহ্মণকন্যাকে পূজা করিবে। জয়াভিলাষী মানব ক্ষত্রিয়কন্যাকে পূজা করিবে, ধনলাভকামী মানব বৈশ্যকন্যাকে পূজা করিবে, পুত্রকামী মানব শূদ্রবংশজাত কন্যাকে পূজা করিবে, এবং শত্রুর মারণোচ্চাটন প্রভৃতি ক্রূরকর্ম্ম সম্পাদনাভিলাষী মানব অন্ত্য-জাতীয় কন্যাকে পূজা করিবে। (১)

চণ্ডাল, ম্লেচ্ছ প্রভৃতি হীনজাতি শাস্ত্রে অন্ত্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। "অন্তেভবাঃ—অন্ত্যাঃ" অন্তে অর্থাৎ আর্য্যপল্লীর বাহিরে যাহাদের বাস করিবার অধিকার, তাহারাই অন্ত্য শব্দের প্রতিপাদ্য। আর্য্যজাতির সহিত এক গ্রামেও যাহাদের বাস করিবার অধিকার নাই, তাহাদের কন্যাও প্রয়োজনবিশেষে দেবতার ন্যায় পূজনীয়া, এই ব্যাপার আপাততঃ বড়ই বিস্ময়কর বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু শাস্ত্রে এরূপ ব্যাপার নিতান্ত বিরল নহে। সাধারণতঃ দেখা যায়, নাপিত ক্ষৌরকর্ম্ম করিয়াই সাধারণের উপকার-সম্পাদন করিয়া থাকে, কিন্তু হিন্দুর বিবাহকার্য্যে নাপিতকে গৌরবচন পাঠ করিতে হয়, ইহা কুলাচার বা দেশাচার নহে, উহা শাস্ত্রসম্মতব্যবস্থা। চূড়াকরণ সময়ে নাপিত মহাশয়কে সাক্ষাৎ সূর্য্য-দেবরূপে ধ্যান করিতে হয়। সুতরাং হিন্দুধর্ম্মের আনুষ্ঠানিক গভীরতা সাধারণ বুদ্ধির বিষয় নহে।

জানি না ইংরেজী শিক্ষিত প্রত্নতত্ত্ববিৎ প্রদর্শিত কুমারীপূজা ব্যাপারটিকে কোন্ দেশ হইতে আমদানী করা, কোন্ ধর্ম্মের নিজস্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন?

বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম্মের যে সমস্ত ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইতেছে, কুমারীপূজা তাহাতে অন্তর্নির্বিষ্ট হইবে কি না? তাহা প্রত্নতাত্ত্বিক ধুরন্ধরদিগের বিবেচনা-সাপেক্ষ।

এখানে একটা কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, যদিও অদ্যাপি বাঙ্গালা দেশে কুমারীপূজার অনুষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি উহাকে বাঙ্গালার ধর্ম্ম বা

---

(১) ব্রাহ্মণীং সর্ব্বকার্য্যেষু জয়ার্থে নৃপবংশজাম্।
লাভার্থে বৈশ্যবংশোত্থাং সুতার্থে শূদ্রবংশজাম্॥

বাঙ্গালীর নিজস্ব বলিয়া গণ্য করিবার উপায় নাই। কারণ কুমারীপূজায় যে সমস্ত দ্রব্য দানের ব্যবস্থা আছে, তন্মধ্যে কঞ্চুক দানেরও উল্লেখ আছে। (১) কঞ্চুকের সহিত বঙ্গমহিলার পরিচয় ছিল না। অদ্যাপি অনেক সমাজে মহিলার কঞ্চুক-ব্যবহার পাপজনক ব্যাপার বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

যে সকল বসনভূষণ সমাজে ব্যবহার্য্য বলিয়া প্রসিদ্ধ, পূজাকার্য্যেও সেই সমস্তেরই উপকরণতা দেখিতে পাওয়া যায়।

বিশেষতঃ যে নির্ণয়ামৃতে কুমারীপূজার বিস্তৃত বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকে বাঙ্গালার গ্রন্থ বলিয়া দাবী করিবার কোনও হেতু দেখা যায় না।

উক্ত গ্রন্থ কোন্ দেশে রচিত হইয়াছিল, তাহারও কোন নিশ্চায়ক হেতু নাই। কেবল পরবর্ত্তি-নিবন্ধকারদিগের গ্রন্থে উক্ত গ্রন্থের প্রমাণাবলী এবং নাম নির্দ্দেশ দেখিয়া উহার প্রাচীনতা উপলব্ধি করিতে পারা যায়।

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের গ্রন্থে নির্ণয়ামৃতের প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। রঘুনন্দনের পূর্ব্ববর্ত্তী ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মাধবাচার্য্যের "কাল মাধব" গ্রন্থে নির্ণয়ামৃতের অনেক প্রমাণ গৃহীত হইয়াছে, এবং উক্ত গ্রন্থের নামোল্লেখও আছে।

মাধবাচার্য্যের "কাল মাধবে" ও স্মার্ত্তপ্রবর রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের জন্মাষ্টমী-তত্ত্বে যে সকল প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের অধিকাংশই নির্ণয়ামৃত হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। জন্মাষ্টমীর ব্যবস্থা-সম্বন্ধে নির্ণয়ামৃতকে পরবর্ত্তী গ্রন্থাবলীর উপজীব্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

গ্রন্থের উপক্রমোপসংহার পাঠে ইহাই জানা যায় যে, সূর্য্যসেন নৃপতির আদেশানুসারে তদাশ্রিত "বল্লাট" নামা পণ্ডিত "নির্ণয়ামৃত" নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ইনি সিদ্ধ লক্ষ্মণের পুত্র। উপক্রমে আছে—

"শ্রীসূর্য্যসেননৃপতে রাদেশাৎ সিদ্ধলক্ষ্মণতনুজঃ
বল্লাটনাথসূরিঃ সংগ্রহমিহ কাল নির্ণয়ে কৃতবান্।"

উপক্রমে ইহাও লেখা আছে যে,রাজা তাঁহার নিজের নামেই শ্রৌতাদি কর্ম্মের নির্ণায়ক গ্রন্থ রচনা করিবার জন্য পণ্ডিতকে আদেশ করিয়াছিলেন।

"এবং কদাপি সুমতির্নৃপতিঃ স্বনাম্না
শ্রৌতাদিকর্ম্মসু স কাল-বিনির্ণয়ায়
আদিক্ষ দৃক্ষপতি সাম্যযশোনিশাত—
শস্ত্রাহতাহিতশতঃ শতমন্যুকল্পঃ॥

---

(১) কঞ্চুকৈশ্চৈব বস্ত্রৈশ্চ গন্ধপুষ্পাক্ষতাদিভিঃ।
নানাবিধৈর্ভক্ষ্যভোজ্যৈ র্ভোজয়েৎ পায়সাদিভিঃ॥

এই হেতুতেই গ্রন্থের প্রত্যেক প্রকরণ শেষে লেখা আছে—"ইতি শ্রীসূর্য্যসেন মহীমহেন্দ্র বিরচিতে নির্ণয়ামৃতে" ইত্যাদি।

উপসংহারেও দেখিতে পাওয়া যায়, গ্রন্থকার রাজাদেশানুসারে গ্রন্থরচনারই উল্লেখ করিয়াছেন, এবং নিজকেই রচয়িতা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন—

"শ্রীমৎপণ্ডিতসিদ্ধলক্ষ্মণসুতঃ শ্রীসিদ্ধলক্ষ্মীপদ—
দ্বন্দ্বারাধন সুপ্রসিদ্ধ মহিমা যঃ সিদ্ধ সারস্বতঃ।
আদেশাদকৃতৈষ সূর্য-মহসঃ শ্রীসূর্য্যসেনপ্রভো
বৈধেকর্ম্মণি কালনির্ণয় মসৌ বল্লাটনাথঃ সুধীঃ॥

সূর্য্যসেন নৃপতির পূর্ব্বপুরুষাধ্যুষিত রাজধানীর উপকণ্ঠে যমুনা নদী প্রবাহিত ছিল, এমত বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—

"যস্যোপকণ্ঠে শিতিকণ্ঠকণ্ঠ-
স্পর্দ্ধিপ্রভাভানুসুতাবহন্তী
তদুত্থ-বেদধ্বনিসন্নিকর্ষাৎ
অভ্যস্যতীবাখিল পাবনত্বম্॥

যে নগরীর সমীপে মহাদেবের কণ্ঠ-সমানকান্তি যমুনা নদী প্রবাহিত হইয়া নগরী সমুত্থিত বেদধ্বনির সান্নিধ্যবশতঃ যেন সমগ্র পবিত্রতা অভ্যাস করিতেছে।

নির্ণয়ামৃতের রচয়িতা যে সমস্ত মূলগ্রন্থ এবং নিবন্ধ পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, ভূমিকায় তাহার একটী তালিকা দিয়াছেন। তৎপাঠে জানা যায় তিনি মনুস্মৃতি বিষ্ণু পরাশর আপস্তম্ব প্রভৃতির ধর্ম্মসংহিতা মিতাক্ষরা (যাজ্ঞবল্ক্যে সংহিতার বিজ্ঞানেশ্বরকৃত টীকা) অপরার্ক (যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার অতি বিস্তৃত টীকা) পারিজাত (সম্ভবতঃ মদন পারিজাত) স্মৃত্যর্থসার, স্মৃতিচন্দ্রিকা, মৎস্যপুরাণ, কূর্ম্মপুরাণ, বরাহপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, বামনপুরাণ, মার্কণ্ডেয়পুরাণ, ভবিষ্যোত্তর, মহাভারত, পরিশিষ্ট, হেমাদ্রি, অনন্তভট্টীয়, গৃহ্য পরিশিষ্ট, কালাদর্শ, চিন্তামণি, ত্রিদণ্ডীয়, কৃত্যকল্পতরু, পুরাণ সমুচ্চয়, দুর্গোৎসব, রামকৌতুক, সংবৎসর প্রদীপ, ভোজদেবের নিবন্ধ, দিবদাসীয়, রূপনারায়ণীয়, বিদ্যাভট্টকৃত বিস্তৃত পদ্ধতি, মহাদেবীয়, এবং বিশ্বরূপকৃত শুন্তনিবন্ধ দেখিয়া নির্ণয়ামৃত রচনা করিয়াছেন।

"অগাধগ্রন্থপাথোধি মথালোচ্য ধিয়া ময়া
সমুদ্ধৃতং নৃপাদেশাত্তেনেদং নির্ণয়ামৃতম্॥
মনুস্মৃতিং বিষ্ণুপরাশরাপস্তম্বস্মৃতী বীক্ষ্য মিতাক্ষরাঞ্চ
তথাপরার্কার্ণব-পারিজাতান্ স্মৃত্যর্থসারং স্মৃতিচন্দ্রিকাংচ॥

মাৎস্যং কৌর্ম্মং চ বারাহং দৃষ্ট্বা বৈষ্ণব-বামনে
মার্কণ্ডেয় পুরাণং চ ভবিষ্যোত্তর-ভারতে ॥
পরিশিষ্টং হেমাদ্রি মনস্তভট্টীয়-গৃহ্যপরিশিষ্টে
কালাদর্শং চিন্তামণিং ত্রিদণ্ডীং চ কৃত্যকল্পতরুম্ ॥
সকল পুরাণ সমুচ্চয় দুর্গোৎসবরামকৌতুকানিতথা
সংবৎসরপ্রদীপং সভোজরাজীয় দেবদাসীয়ম্ ॥
রূপনারায়ণীয়ং বিদ্যাভট্টপদ্ধতিং বিততাম্
বীক্ষ্য মহাদেবীয়ং শুল্কং নিবন্ধং চ বিশ্বরূপকৃতম্ ॥

উল্লিখিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে স্কন্দপুরাণের নাম দৃষ্ট হয় না। সুতরাং গ্রন্থকার কুমারীপূজার বিধায়ক স্কন্দপুরীয় প্রমাণগুলি পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও নিবন্ধ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়; অতএব বাঙ্গালার ন্যায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশেই কুমারীপূজার অনুষ্ঠান হইত এমত বলা যাইতে পারে। বর্ত্তমান সময়ে ৺কামাখ্যাধামের কুমারীপূজা অতীব প্রসিদ্ধ। তত্রত্য কুমারীগণ পূজা পাইয়া পরিণতবয়স্ক মানবেরও মস্তকে চরণ তুলিয়া দিয়া যখন প্রৌঢ় বনিতার ন্যায় আশীর্ব্বাদ করে, তখন পূজকের এবং দ্রষ্টার মনে যুগপৎ বিস্ময়ের ও ভক্তির উদ্রেক হয়।

অন্তর্ধান।

[লেখক—শ্রীঈশানচন্দ্র মহাপাত্র।]

১

রবি যখন মুখ লুকা'ল অস্তগিরির আড়ে,
বাতাস যখন হতাশ ভাবে ঘুরল বাঁশের ঝাড়ে,
আলো যখন নিভে গেল দিনের দেউল হ'তে
সেই সময় সে চলে গেল চ'ড়ে সোণার রথে।

২

ফুলের হাসি ঢাক্‌ল যবে সাঁজের আঁধার বান,
পুষ্পবনে নীরব হ'ল মৌমাছিদের গান,
রাখাল যখন উতল বাঁশী বাজায় না আর পথে,
সেই সময় সে চলে গেল চ'ড়ে সোণার রথে।

৩

নদীর ঢেউয়ের শিরে যখন নাচে না আর রবি,
ক্ষুণ্ণমনে খেলার ছেলে ফিরল গৃহে সবি,
সকল শোভা লুপ্ত যখন হ'ল আঁখি হ'তে,
সেই সময় সে চলে গেল চ'ড়ে সোণার রথে।

টাকার খনি।

[লেখক—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস, এম্-এ, বি-এল্।]

(১)

কলিকাতা হইতে রেলযোগে প্রায় সাড়ে পাঁচ শত মাইল দূরে বঙ্গোপসাগরের শ্চিম কূলে প্রসিদ্ধ স্বাস্থ্য-নিবাস ও প্রাচীন নগর ভিজাগাপত্তন অবস্থিত। উহাকে দ্ধ ও সংস্কৃত করিয়া, শ্রীকৃষ্ণের নয় সখীর অন্যতমা বিশখার নামে, বিশখাপত্তন া বিশখার স্থান বলা যাইতে পারে।

এই সহরের বিস্তৃত বর্ণনা ওয়ালটেয়ার-ভিজাগাপত্তন পুস্তকে আছে। াহারা তাহা পাঠ করেন নাই, তাঁহাদের জন্য সংক্ষেপে বলি—এই সহরের পূর্ব্বদিকে অকূল সমুদ্র, অপর তিন দিকে পাহাড়, সহরের পার্শ্বে ও মধ্যেও পাহাড় আছে, সর্ব্বত্র নৈসর্গিক বৈচিত্র্যপূর্ণ। দক্ষিণে ব্যাকওয়াটার নামে এক নদী বা খাড়ী, উহা সমুদ্র হইতে পশ্চিম দিকে গিয়াছে। উহা ভিজাগাপত্তনের দক্ষিণ সীমা। ব্যাকওয়াটারের অপর পার্শ্বে পাহাড়, উদ্যান, গ্রাম, লোকের বসতি প্রভৃতি আছে। এই সকল রমণীয় প্রাকৃতিক দৃশ্যের সহযোগে সম্ভূত ভিজাগাপত্তনের সৌন্দর্য্য দেখিয়া নবাগত ব্যক্তিমাত্রই মোহিত হন।

বাঙ্গালা দেশের দুর্গাপূজার ন্যায় এখানে রামনবমী সর্ব্বপ্রধান উৎসব। ১৫ দিন পূর্ব্ব হইতে উহার উদ্যোগ আরম্ভ হয়। প্রথম চিহ্ন রাস্তায় গলিতে যেখানে সেখানে পাতার চালা উঠিতে আরম্ভ, চালা শেষ হইলে তাহাতে রঙ্গিণ কাগজ প্রভৃতি মারিয়া বাহার করা হয়। তাহার পর চালার পার্শ্বস্থ বাটীর বাহিরের ঘরে, ঘর না থাকিলে সেই চালারই ভিতরে, ফ্রেমে ও কাঁচে বাঁধান রাম-সীতার চিত্র স্থাপিত করা হয়। কয়েক স্থলে মাত্র গঠিত মূর্ত্তি দেখিয়াছি। তাহার পর পার্শ্বে ও নিকটে অন্যান্য নানা চিত্র ও মূর্ত্তি রাখিয়া খুব বাহার করা হয়। উৎসবকর্ত্তা দরিদ্র হইলে ছোট চালার নিম্নে রামসীতার এক ছবি স্থাপন ও সামান্য কিছু বাহার করা হয়, কিন্তু সখওলা ধনী হইলে অতীব সুন্দর ও দেখিবার যোগ্য দৃশ্য প্রস্তুত হয়। অনেক দূরদেশ হইতে দেখিবার জন্য এত লোক আসে যে, স্পেশ্যাল ট্রেন দিতে হয়। আমরাও কয় দিন ধরিয়া নানা পুতুলের বাহার, থিয়েটারের মত আঁকা দৃশ্য, ও অন্যান্য বিচিত্র কারুকার্য্য দেখিয়া

আমোদিত হইয়াছিলাম। প্রতিপদ হইতে আরম্ভ হইয়া দশমী পর্য্যন্ত উৎসব চলে। পূজা কিছুই হয় না, তবে কোন কোন স্থলে গীতা রামায়ণ প্রভৃতি পাঠ হয়। এ বৎসর আমার বাটীর নিকটবর্ত্তী এক স্থানে প্রতি রাত্রে কয়েক ঘণ্টা করিয়া কয় দিনে সমস্ত রামায়ণ অভিনীত হইয়াছিল। রীতিমত সাজিয়া অভিনয়, এমন কি সীতার অগ্নি-পরীক্ষা (প্রকৃত অগ্নির উপরে চলান) পর্য্যন্ত হইয়াছিল। উৎসবের কয় দিন রাস্তায় নানা বিচিত্র সং বাহির হইয়া সকলকে আমোদিত করে। রাত্রে শোভা যাত্রা ও ইংরাজি বাজনার শব্দে কোন কোন দিন ঘুমের ব্যাঘাত হয়। রামনবমীর রাত্রে অত্যুজ্জ্বল আলোক, বাদ্য, সং প্রভৃতি সহ সমস্ত ঠাকুর লইয়া সহরের মেন্‌ রোড বা প্রধান বড় রাস্তা পরিক্রমণ করা হয়। এত দর্শক হয়, যে দাঁড়াইবার স্থান পাইতে কষ্ট হয়।

এই আখ্যায়িকার ব্যক্তিগণের বর্ণনা, চলিত গল্পের প্রথানুসারে ক্রমে একটু একটু প্রকাশ না করিয়া, একেবারেই প্রথমে করিব। ইহারা জাতিতে জেলে। এখানকার জেলেরা অতি দরিদ্র, মাছধরা ও নৌকার দাঁড় টানা ইহাদের জীবিকা। বর্ত্তমান ইয়ুরোপীয় যুদ্ধের পূর্ব্বে এখান হইতে নানা মাল—মাঙ্গানীজ ধাতু, গুড়, চাল, প্রভৃতি—বিদেশে রপ্তানী হইত, দুই তিন খানা জাহাজ প্রায়ই উপস্থিত থাকিত, তীরের নিকটে অল্প জল হেতু প্রায় এক মাইল দূরে নঙ্গর করিত। জাহাজে ঐ সকল মাল লইয়া যাইবার জন্য ৪০।৫০ খানা নৌকা খাটিত, ইহাতে জেলেদের বেশ আয় হইত। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে যুদ্ধের কারণে ঐ রপ্তানী-ব্যবসায় প্রায় সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়াছে। ইহাতে জেলেদের প্রধান আয় কমিয়া গিয়াছে, দারিদ্র্য বৃদ্ধি হইয়াছে। মাছ ধরা হইতে আয় এক বা দুই আনার অধিক হয় না, তাহাও সকল দিনে নহে। সহরের মধ্যস্থ সত্যনারায়ণ পাহাড়ের পাদমূলে জেলেদের পল্লী, তাহাদের মাটির দেওয়াল ও তালপাতা ঢাকা কুটিরের চাল এত নীচু যে, মাথা হেঁট না করিলে ভিতরে প্রবেশ করিতে পারা যায় না, তাহার ভিতরে মেঝের উপর তালপাতার চেটাই বিছাইয়া শয়ন হয়। ইহাতে পাঠক জেলেদের অবস্থা ও সম্পত্তির পরিমাণ বুঝুন। আবার মধ্যে মধ্যে অগ্নিদেবের কৃপা হইয়া এক এক পল্লী মাঠ হইয়া যায়; অনেক বার এই দৃশ্য ও তৎসহিত গৃহশূন্য দরিদ্রদের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া চক্ষের জল ফেলিতে হইয়াছে।

চীনাস্বামী ও জগন্নাথ এক নৌকায় দাঁড়ীর কাজ করিত, যুদ্ধের জন্য সে কাজ উঠিয়া যাওয়ায় চীনাস্বামী জাতীয় জেলের ব্যবসায় ধরিয়াছে। সহরের মধ্যে সত্যনারায়ণ পাহাড়ের পূর্ব্ব পাদমূলে জেলে পল্লীতে এক তালপাতার কুটির

তাহার বাটী। জগন্নাথের বাটী সহরের দক্ষিণস্থ ব্যাকওয়াটার খাড়ীর অপর পারে। সে এক্ষণে পাহাড় ও জঙ্গল হইতে জ্বালানী ও কুটির প্রস্তুতের কাঠ সংগ্রহ করিয়া বিক্রয় দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করে। চীনাস্বামী ও জগন্নাথের মধ্যে এক সময়ে পরম বন্ধুতা ছিল, দাঁড়ীর কাজ নষ্ট হওয়ার সময়ে সে বন্ধুতাও একটা ছোট বাগান লইয়া নষ্ট হইয়া যায়, তৎপরিবর্ত্তে উভয়ের মধ্যে এক্ষণে ঘোর শত্রুতা, এমন কি, সুযোগ পাইলে এক জন অপরকে খুন করিতেও প্রস্তুত।

তিন বৎসর হইল, চীনাস্বামীর স্ত্রী একটী পাঁচ বৎসরের কন্যাকে স্বামীর ক্রোড়ে দিয়া পৃথিবী হইতে বিদায় লইয়াছে। মাতৃহীনা কন্যা আপেয়া এক্ষণে পিতার জীবন-সর্ব্বস্ব। উহার মুখ চাহিয়া চীনাস্বামী আর বিবাহ করে নাই।

কোন বঙ্গীয় রমণী ভিজাগাপত্তনে প্রথমে আসিলে পথে ও বাজারে কৃষ্ণবর্ণা বিকট-মুখী নিম্নশ্রেণীর রমণীদিগকে দেখিলে, বোধ হয় নিজ রূপের গর্ব্বে, বলেন, ইহারা রাবণের চেড়ীগণের বংশাবতংশ। কিন্তু ইহার যে ব্যতিক্রম আছে, তাহা এখানে কিছুদিন থাকিলে বুঝিতে পারেন; তখন দেখিতে পান, ভদ্র গৃহস্থ ঘরে অনেক সুরূপা সুশ্রী রমণী আছে এবং নিম্নশ্রেণী মধ্যেও একেবারে উহার অভাব নাই।

আপেয়ার রং তেমন ফরসা না হইলেও, ময়লা নহে। উহার অতি সুন্দর গঠন, লাবণ্যপূর্ণ মুখ, মিষ্ট কথা, শান্ত স্বভাব। যে উহার সংস্রবে আসে, সে উহাকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারে না। চীনাস্বামীর পরিবারে এই পিতা পুত্রী ও একটী বুড় কুকুর, তাহাকে বোকা বলিয়া ডাকে।

(২)

এ প্রদেশে নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুরা মুশলমানের পীর প্রভৃতিকে ভক্তি করে, বিপদ হইলে মানত করে, এবং উদ্ধার পাইলে মানত দেয়। কোন আত্মীয়ের পীড়ায় ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা হইলেও, এদেশে কেন, প্রায় সর্ব্বত্র, রমণী ও অশিক্ষিত শ্রেণীর লোকেরা ঠাকুরের নিকট মানত করে, পরে ভাল হইলে মনে করে, ঠাকুরই ভাল করিয়াছেন, চিকিৎসার ফল যেন কিছুই নহে, এবং বরং চিকিৎসক ও ঔষধের টাকা দিতে ইতস্ততঃ করে, কিন্তু অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম রূপে দেবতার পাওনা অবিলম্বে চুকাইয়া দেয়।

কিছু দিন পূর্ব্বে আপেয়ার ভয়ানক অসুখ হইয়াছিল, চীনাস্বামী তাহাকে সরকারী হাঁসপাতালে রাখিয়াছিল এবং তৎসহিত সহরের দক্ষিণে মুশলমান পাহাড়ের উপরিস্থ পীরের নিকটেও মানত করিয়াছিল। আপেয়া আরোগ্য

হইলে তাহাকে লইয়া এক দিন অতি প্রত্যুষে চীনাস্বামী মুশলমান পাহাড়ে যায় এবং মানত দিয়া কিয়ৎক্ষণ ঐ পাহাড়ের উপর বসিয়া বিশ্রাম করিতে থাকে, তখন পূর্ব্ব গগনে সূর্য্য উঠিতেছে।

এদেশে সমুদ্রের জলের ভিতর হইতে সূর্য্যোদয় এক চমৎকার দৃশ্য। প্রথমে পূর্ব্ব দিকে, সেখানে যেন সমুদ্র শেষ হইয়া আকাশের সহিত মিলিত হইয়াছে, তথায় আকাশের নিম্নে গোলাপী আভা হয়, তাহার পর যেন হঠাৎ একটী অত্যুজ্জ্বল লোহিত গোল রেখা জলের উপর আবির্ভূত হয়, সে রেখা একটু একটু করিয়া স্থূল হইয়া ক্রমে পূর্ণ গোলাকার লোহিত সূর্য্যে পরিণত হয়, যেন জলে স্নান করিয়া সুপরিষ্কার হইয়া সূর্য্যদেব নিজ নিয়মিত দৈনিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন।

আপেয়া পিতার হাত লইয়া পূর্ব্ব দিক লক্ষ্য করিয়া বলিল, বাবা, কেমন সুন্দর দেখ দেখি! যেন একখানা ছবি।

চীনাস্বামী। মা তোমার কপালে যেদিন ঐরূপ লাল বিন্দু উঠ্‌বে, সেদিন তুমিও ঐরূপ সুন্দর দেখাবে আর আমারও ছুটী হ'বে।

(এ প্রদেশে সধবা রমণীরা কপালে সিন্দুর বিন্দু দেয়, সীথিতে দেয় না।)

আপেয়া। বাবা, তুমি কি বল্‌ছ বুঝ্‌তে পার্‌লুম না।

চীনাস্বামী। না মা, তোমার বুঝে কায নেই। ও এক দিকে কেন, আর তিন দিকেও দেখ না, কেমন ছবি। কিন্তু পরমেশ্বর আমাদের জীবনে ও রকম ছবি দেন না, দেন কেবল যত দুঃখ ও যন্ত্রণা।

আপেয়া। বাবা, তবে বুঝি পরমেশ্বর ঐ আকাশের উপর স্বর্গের ভিতর কেমন সুন্দর, তা' দেখাবার জন্য ঐ ছবিগুলি স্বর্গের বাহিরে টাঙ্গিয়ে দেছেন। বাবা, তুমি বলেছ, আমার মা ঐ স্বর্গে আছেন। আমার বোধ হয়, মানুষরা যদি আরও ভাল হত, তবে বোধ হয় পরমেশ্বর আরও ভাল ভাল ছবি দিতেন।

চীনাস্বামী। হাঁ মা, আমারও তাই বোধ হয়।

আপেয়া। তবে কেন বাবা মানুষরা আরও ভাল হয় না?

চীনাস্বামী। মা, চারি দিকেই প্রায় সব খারাপ, তার মধ্যে থেকে আর কে ভাল হতে পারে?

আপেয়া। কিন্তু বাবা তুমিত ভাল, তুমি কি ভাল নও?

চীনাস্বামী। না মা, আমিও তেমন ভাল নই, আর তুমি না থাক্‌লে হয়ত আমি আরও খারাপ হতুম।

বালিকা এই কথায় আশ্চর্য্য হইয়া পিতার মুখের দিকে চাহিয়া একটু পরে বলিল, আমার জন্য তুমি কিসে ভাল হলে বল না বাবা ?

পিতা কন্যাকে কোলের ভিতর টানিয়া তাহার মুখচুম্বন করিয়া বলিল, মা, তুমি যে ভাল ; তুমি ভাল থাক এই আমি চাই, তুমি আমার সর্ব্বস্ব।

চীনাস্বামী কন্যাকে কোলে করিয়া আনিয়া নিজ কুটীরের সম্মুখে নামাইয়া দিল, এবং কুকুরকে বলিল (কুকুর যেন সব কথা বুঝে) বোকা, তুই বেশ পাহারা দিচ্ছিস্। কন্যা দৌড়িয়া গিয়া বোকাকে জড়াইয়া ধরিল।

চীনাস্বামী কুটিরে বসিয়া নানা ভাবনায় পড়িল, সে মনে মনে বলিতে লাগিল, হায় যদি হতভাগা আদালত আমার কাছ থেকে ঐ বাগানটা কেড়ে না নিত, তাকে না দিত, তা হলে আমাদের আজ এত দুঃখ হত না। নারকেল আর তালগাছের পাতা বেচে আমাদের তিনটে প্রাণীর কত সাশ্রয় না হত, দুবেলা দুমুট খুদ সিদ্ধ পেটে যেত। তবে বেটার পিঠে ও মাসে জলার ধারে (ভিজাগাপত্তন ষ্টেষণের পশ্চিম দিকে জলা) যে লাঠী দিয়েছি, তা ও শীঘ্র ভুল্‌বে না ; ও আদালত চালিয়েছে, আমি হাত চালাব। ফের যদি সুবিধা মত ওকে পাই, (উত্তেজনা-বশে দন্ত কড় মড় করিয়া মুখে কথা কহিয়া ফেলিল) ওর গলা মট্‌কে একেবারে সাবাড় কর্‌ব।

আপেয়া চমকাইয়া কহিল, ওকি কথা বল্‌ছ বাবা ! তা কোরোনা, কখন কোরো না। বাবা, তুমি বুঝি জগন্নাথের কথা ভাব্‌ছ ? তোমার মুখ কেন অমন হয়েছে ? তা কোরোনা বাবা, তোমার পায়ে পড়ি।

চীনাস্বামী কন্যাকে কোলে তুলিয়া চুম্বন করিল, কন্যা পিতার মস্তকের বিশৃঙ্খল দীর্ঘ চুলগুলি ভাল করিয়া দিতে লাগিল, উহার দুই এক ফোঁটা চক্ষের জলও পিতার গাত্রে পড়িল। কন্যার সস্নেহ সুকোমল স্পর্শে ও তাহার চক্ষু-জলে চীনাস্বামীর অন্তর দ্রব হইয়া গেল, মুখের কঠোর ভাব ও দুষ্ট চিন্তা সকল কোথায় অন্তর্হিত হইল।

সেই রাত্রে কন্যা যখন ঘুমাইল, অথবা চীনাস্বামী ভাবিল ঘুমাইয়াছে, তখন সে উঠিয়া কুটিরের দরজায় বসিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল, আমরা সকলেই চোর ডাকাত, ঝগড়ায় প্রবৃত্ত হলুম, হার্‌লুম, কি করে শোধ নেব তার উপায় কৌশল ভাব্‌তে লাগ্‌লুম, যত বয়স বাড়্‌তে লাগ্‌ল তত অধিক মন্দ হতে লাগ্‌লুম, ক্রমে বাঘ ভালুকের মত ভীষণ হিংস্র পশু হলুম, শত্রুকে খুন করাও প্রয়োজন মনে কর্‌লুম।

এই সময়ে কুটিরের ভিতর হইতে আপেয়া ডাকিল, বাবা! বাস্তবিক আপেয়া ঘুমায় নাই, প্রাতে পিতার সহিত কথাবার্ত্তা হইতে তাহার কোমল হৃদয়ে যে ঝটিকা আরম্ভ হইয়াছে, তাহার এখনও বিরাম হয় নাই।

চীনাস্বামী ভিতরে গিয়া কন্যার হাত তুলিয়া লইয়া বলিল, কি মা কি হয়েচে?

আপেয়া। বাবা, আজ সকালে পাহাড়ে তুমি বলেছিলে, আমার জন্য তুমি ভাল হয়েচ, আর অন্য সকল মানুষ যদি ভাল হয় তবে তারাও ত সুখী হয়; আমি কি তাদেরও ভাল হওয়ার জন্য কিছু কর্‌তে পারি না বাবা?

চীনাস্বামী। হাঁ মা তুমি পার। ভাল দেখ্‌লে অতি মন্দ মানুষও ভাল হয়। তুমি আমার জন্য যত কর, এত অন্যের জন্য কর্‌তে পার না, তবু তোমাকে সকলে এত ভাল বাসে যে তোমার জন্য প্রাণ দিতে পারে, কিন্তু তা কেবল একজন ছাড়া, সে—।

আপেয়া। সেও আমাকে ভাল বাস্‌বে বাবা। বল বাবা, ভাল বাস্‌বে কি না? আর আমরা যদি দু'জনে ভাল হই, আমাদের দু'জনকেই কি সে ভাল বাস্‌বে না?

পিতা কোন উত্তর না দিয়া বিমনাভাবে অন্য দিকে তাকাইয়া রহিল। কন্যা তাহার হাতে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, বাবা, আমার বড় সাধ হয়েছে এবার আমরা রামনবমী করি, সেখানে রামায়ণ মহাভারত পড়া হবে, যত লোক আস্‌বে তারা তা' শুনে আর তত মন্দ হবে না।

হঠাৎ কন্যার এই অপ্রত্যাশিত প্রস্তাবে চীনাস্বামী আশ্চর্য্য হইল, তাহার মনের গুরুভাব বিগত হইয়া কৌতূহলের ভাব হইল, এবং আমোদের স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, কে মা ওসব বুঝিয়ে ধর্ম্মের কথা বল্‌বে?

আপেয়া। কেন বাবা, তুমি কি পার্‌বে না?

চীনাস্বামী হাসি রাখিতে পারিল না, ভাবিল, মেয়ে আচ্ছা লোক ধরেছে। কিন্তু তাহার নীরবতায় কন্যার মুখ কাঁদ কাঁদ হইতেছে দেখিয়া বলিল, মা তোমার এই বুড় ছেলের কোন বিদ্যা নাই, তা থাক্‌লে সে জেলেগিরি করে মর্‌ত না।

আপেয়া। আচ্ছা বাবা তুমি নাই পার্‌লে, তবু আমাদের রামনবমীর যোগাড় করে দাও।

চীনাস্বামী। তাতেও মা আমার ক্ষমতা খুব, আমরা খেতে পাই না রামনবমী কর্‌তে যাব! ও কর্‌তে গেলে আগে একটা টাকার খনি বার কর্‌তে হয়।

আপেয়া তামাসা বুঝিতে পারিল না, তাহার সরল মনে উহা সত্য বলিয়া বোধ

হইল, আহ্লাদে তাহার মুখ বিকসিত হইল। সে বলিল, হাঁ বাবা তাই কর, তুমি এত জায়গায় ঘোর, আর একটা টাকার খনি খুঁজে বার করতে পার্‌কে না ?

চীনাস্বামী। হাঁ মা তাই চেষ্টা করব। তুমি রোগা মানুষ এখন ঘুমোও, অনেক রাত হয়েচে, নহিলে আবার অসুখ করবে।

আপেয়া তাহার পিতার কথায় বিশ্বাস করিয়া নিশ্চিন্ত হইল ও অবিলম্বে ঘুমাইয়া পড়িল। যখন সে গভীর নিদ্রায় মগ্ন, আর তাহার শীঘ্র নিদ্রাভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা নাই বুঝিল, তখন চীনাস্বামী একটা মতলব স্থির করিল; খোন্তা, কয়েকটা পয়সা ও কুকুরকে সঙ্গে করিয়া বাহির হইল। ক্রমে অনেক স্থান দেখিয়া সে হিন্দু পাহাড়ের দক্ষিণ পাদমূলে উপনীত হইল। হিন্দু পাহাড় সহরের দক্ষিণে, এবং তাহার দক্ষিণ পার্শ্বস্থ রাস্তার অপর পার্শ্বে উপরি বর্ণিত ব্যাকওয়াটার খাড়ী প্রবাহিত।

চীনাস্বামী এক স্থান দেখিয়া পছন্দ করিয়া মনে ভাবিল, এখানটা খুব নরম জায়গা, মেয়েটা সহজে খুঁড়িতে পারিবে। খোন্তা দিয়া একটু খানি খুঁড়িয়া কয়েকটী পয়সা তথায় রাখিয়া বালি চাপা দিল। তাহার পর কুটিরে ফিরিয়া আসিয়া কন্যার পার্শ্বে ঘুমাইল।

(৩)

পরদিন প্রভাতে কন্যাকে বলিল, চল মা তুমিও চল, বোকা চলুক, আমরা তিন জনেই টাকার খনি খুঁজ্‌ব। হিন্দু পাহাড়ের দক্ষিণ পাদমূলে পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইবামাত্র কুকুর তাহার জাতীয় স্বভাবানুসারে সেই স্থানে পা দিয়া আঁচড়াইতে লাগিল।

চীনাস্বামী। বোকা অমন কর্‌চে কেন ? তুমি মা দেখ ত।

বালিগুলা কিছু সরাইতেই পয়সা কটা বাহির হল। ইহাতে আপেয়ার মুখে কি আনন্দের যে ভাব হল, তাহা বর্ণনা করা যায় না; বলিল, বাবা, বুড় বোকাটা তোমার আমার চেয়েও সেয়ানা, একেবারে খনি বাহির করিয়া ফেলিল !

চীনাস্বামী। হাঁ মা তাই ঠিক, আজ বেলা হয়েছে, চল বাড়ী যাওয়া যাক্। কাল সকালে আবার বোকাকে সঙ্গে নিয়ে এস, সেই খনি বার করে দেবে, আমার আস্‌বার দরকার হবে না।

পিতা পুত্রী উৎফুল্ল হৃদয়ে বাটীতে প্রত্যাগত হইল। রাত্রে আপেয়া ঘুমাইলে চীনাস্বামী পূর্ব্ব রাত্রির মত কুকুরকে সঙ্গে লইয়া পূর্ব্ব স্থানে পুনরায় কয়েকটী পয়সা পুতিয়া রাখিয়া আসিল। প্রাতে সে আপন কর্ম্মে গেল এবং কন্যা বোকাকে

লইয়া টাকার খনিতে গেল। সেখানে কুকুরের নির্দ্দেশ মত পয়সাগুলি পাইয়া আপেয়ার যে কি আনন্দ ও উৎসাহ হইল তাহা বলিবার নহে। এইরূপ কয়েক দিন চলিল। আপেয়া পয়সাগুলি রামনবমীর জন্য জমাইতে লাগিল।

যেখানে এই টাকার খনি সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহার নিকটে একটী জলের কল, তাহার পর অদূরে ব্যাকওয়াটার খাড়ী। অপর পার হইতে আসিয়া অনেক লোক ঐ কলে জল খাইত। পাঠক আসিয়া এ স্থান দেখিতে পারেন। অথবা কেবল এই এক স্থান কেন, ভিজাগাপত্তনে আসিয়া এই আখ্যায়িকার সমুদয় স্থানগুলি দেখিলে ভাল হয়।

এক দিন এক ব্যক্তি কলে জল খাইতে আসিয়া মেয়েটীকে দেখিয়া মুগ্ধ হইল, কৌতূহলী হইয়া তাহার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বুড়ী কি কর্‌চিস্‌?

আপেয়া। আমি যে রামনবমী কর্‌ব, তার জন্য ত পয়সা চাই; আমরা গরিব, পয়সা কোথায় পাব? বাবা বলেছে, এই কুকুরটা টাকার খনি দেখিয়ে দেবে, তাই একে নিয়ে পয়সা বের কর্‌তে এসেছি। এই দেখনা আজ তিনটে পয়সা পেয়েছি। তা আমাদের রামনবমী দেখ্‌তে তুমি যাবে বল, আমি তোমাকে নেমন্তন্ন কর্‌চি, সেখানে রামায়ণ পড়া হবে, গান হবে, তোমার যত লোককে নিয়ে তোমাকে যেতেই হবে।

আগন্তুক প্রথমে আপেয়ার রূপে মুগ্ধ হইয়াছিল, এক্ষণে তাহার মিষ্ট কথায় সরলতায় ও অমায়িকতায় একেবারে দ্রব হইয়া গেল, আনন্দঘোরে তাহার নয়ন সজল হইল, তাহার বোধ হইল যেন কোন দেবকন্যা সম্মুখে খেলা করিতেছে। সে একেবারেই উহাকে কোলে তুলিয়া লইল। এ বৎসরে প্রথম জাত বেলফুল সংগ্রহ করিয়া মালা গাঁথিয়া পার্শ্বস্থ হিন্দু পাহাড়ে মহালক্ষ্মী দেবীকে দিবে মনে করিয়া আসিয়াছিল। সে মালা আর দেবীর নিকট গেল না, আপেয়ার কবরীতে জড়াইয়া আগন্তুকের মহা তৃপ্তি হইল। তাহার পর ভাবিল, আমি ত তাড়ী খেয়ে (এদেশের নিম্নশ্রেণীদের তাড়ীই প্রধান নেশা) মামলা করে কত পয়সা উড়্‌াচ্চ, এর বাপ যেমন একটা ভাল কাজের জন্য পয়সা জমাচ্চে, আমিও সেইরূপ করি না কেন?

আপেয়াকে কোল হইতে নামাইয়া আগন্তুক বলিল, বুড়ীমা, আমি মন্ত্র জানি, এইখানে মন্ত্র পোড়ে দেব, কাল থেকে বেশী পয়সা পাবি। তোর নেমন্তন্নে আমি নিশ্চয় যাব, কিন্তু কেবল রামায়ণ শুন্‌লে আমার সাধ মিট্‌বে না, তোকে মা রাম-লীলা দিতে হবে। নহিলে আমার সঙ্গের গাঁয়ের লোকেরা খুসী হবে না।

আপেয়া আনন্দে অধীর হইয়া আগন্তুককে জড়াইয়া ধরিল, বলিল তা হলে ত আমাদের খুব আহ্লাদ হবে। ভাগ্যে তোমার সঙ্গে দেখা হল, তা তোমাকে আমি কি বলে ডাকব ?

আগন্তুক সাশ্রু নয়নে। বুড়ীমা, তুই যদি আমাকে কাকা বলিস্, তা হলেই আমার পরম ভাগ্য। মনে ভাবিল, এমন যার মেয়ে, তার কি সৌভাগ্য !

আগন্তুক চলিয়া গেল, আপেয়াও বাড়ী গেল।

(৪)

ভিজাগাপত্তনে কাঠ বিক্রয় করিয়া ফিরিতে সন্ধ্যা হইল। উপরোক্ত ব্যক্তিকে এক্ষণে বুড়ীর কাকা বলিব। সে নির্দ্দিষ্ট স্থানে কয়েকটা পয়সা রাখিল এবং সঙ্গীদিগকে বলিল, এখানে রোজ সকলকে একটা করে পয়সা দিতে হবে, দেবী উঠ্‌বে। যদি দেবী না বেরোয়, আমি তোমাদের পয়সা নিজে দেব। তাহারা উহার কথায় বিশ্বাস করিয়া হউক অথবা মজা দেখিতে পাইবার লোভে হউক, প্রত্যেকে এক এক পয়সা সেইখানে রাখিল, বুড়ীর কাকা বালি চাপা দিল। সকলে ব্যাকওয়াটার পার হইয়া চলিয়া গেল।

পরদিন প্রভাতে আপেয়া আসিয়া একেবারে ছয় আনা পাইল। ইতিপূর্ব্বে কোন দিন দুই তিন পয়সার অধিক পায় নাই। ইহাতে যেমন তাহার আনন্দ হইল, তেমনই কাকার প্রতি অনুরাগ হইল। এইরূপ কয়েক দিন চলিল।

এক দিন চীনাস্বামী বলিল, দেখি মা কত পয়সা জমেছে। সে যত পয়সা রাখিয়া আসিয়াছে, সব ঠিক আপেয়া আনিয়াছে না কিছু ফেলিয়া আসিয়াছে, ইহা জানিবার জন্য পয়সা দেখিতে চাহিল। আপেয়া একটা ন্যাকড়ার থলে করিয়া তাহাতে পয়সা রাখিয়াছিল। চীনাস্বামী থলের পয়সা ঢালিয়া একেবারে অবাক্ হইল। তাহার হিসাব মত ছয় আনা হওয়া উচিত, তাহার স্থলে একেবারে তিন টাকা হইয়াছে, এ ব্যাপার কি !

টাকার খনির স্থানের নিকটে একটী ঘর পূর্ব্বে রেলওয়ে কোম্পানির কার্য্যে ব্যবহৃত হইত, এখন পড়িয়া আছে। চীনাস্বামী সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে বাহির হইয়া সেই ঘরের পার্শ্বে লুকাইয়া রহিল। ক্রমে অন্ধকার হইল, দেখিল এক ব্যক্তি কলে মুখ হাত ধুইয়া আপেয়ার খনির কাছে গিয়া তাহাতে কি রাখিল। চীনাস্বামী বাহির হইয়া একটু অগ্রসর হইবামাত্র দেখিল, সে শত্রু জগন্নাথ ! উভয়ের হস্তে মোটা লাঠী ছিল, অন্য সময়ে হইলে নিশ্চয় দুই জনের লাঠী চলিত, আজ কিন্তু সেই স্থানে একটী মেয়ের মুখ মনে উঠায় পরস্পরের

প্রতি সক্রোধ দৃষ্টি ভিন্ন লাঠী উঠিল না। দুই জনে বিপরীত দিকে চলিয়া গেল। তৎসহিত পরস্পরের মধ্যে সন্ধির এক সুযোগ চলিয়া গেল। ঘটনা-স্থানের মাহাত্ম্যও ভীষণ শত্রুভাব ঘুচাইতে পারিল না। চীনাস্বামী বাটীতে আসিয়া কন্যাকে কোন কথা বলিল না, গুম হইয়া বসিয়া রহিল।

ইহার কয়েক দিন পরে আপেয়া বলিল, বাবা এদিকের খরচের জন্য ত ৫৲ জমেছে, এখন ঠাকুরের ঘর বাঁধ্‌বার জন্য যে বাঁশ গরাণ চাই, তা তোমাকে যে এনে দিতে হবে।

চীনাস্বামী ভাবিল, টাকার খনি ত করে দিয়েছি, এখন কাঠের উপায় কি করি, তার ত আর খনি হবে না। কন্যাকে সেদিন কোনরূপে গোল-মাল করিয়া বুঝাইয়া চুপ করাইল। কিন্তু ভবী ভোল্‌বার নয়। আপেয়া প্রতি-দিন কাঠের জন্য পিতাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। এক রাত্রি টাকার খনিতে পয়সা রাখিতে গিয়া চীনাস্বামী দেখিল, ব্যাকওয়াটারের ধারে সরল গাছের ডালের এক বাঁধা বোঝা পড়িয়া রহিয়াছে। কাহাকেও নিকটে না দেখিয়া চীনাস্বামী মহানন্দে তাহা মাথায় করিয়া বাড়ীতে আনিল ও পরদিন প্রভাতে কন্যাকে বলিল, দেখ মা জঙ্গলের মধ্যে কেমন কাঠ কুড়িয়ে পেয়েছি।

আপেয়ার আনন্দ ধরে না, সে এক গাল হাসিয়া বলিল, বাবা আমাদের উপর পরমেশ্বরের কত দয়া দেখ, আজ থেকেই বাবা মন্দির তৈয়ার আরম্ভ করতে হবে, তুমি একটু সকাল সকাল ফিরে এস।

(৫)

তিন দিনে মন্দির বা চালা-ঘর নির্ম্মাণ শেষ হইল। আপেয়ার উৎসাহের ও পরিশ্রমের বিরাম নাই, কখন রঙ্গিন কাগজ দিয়া বাঁশ গরাণ ঢাকা দিতেছে, কাগজের ফুল কাটিয়া মারিতেছে, কখন বা নারিকেল ও তালের পাতা দিয়া মন্দিরের বহির্ভাগ সুশোভিত করিতেছে, তাহার মধ্যে মধ্যে ফণি মনসার (এই জঙ্গলী গাছে এই স্থান সমাকীর্ণ) লাল ফুল তাহার মাঝে মাঝে দিতেছে। এইরূপে তিন দিন কাটিল। ভিতরে বেদী নির্ম্মাণ করিয়া তাহার উপর কাঁচ ও ফ্রেমে বাঁধান রামসীতার ছবি স্থাপিত হইল, উহার চতুষ্পার্শ্বে কাগজ ও মাটির প্রস্তুত বানর হনুমান ও অন্যান্য অপরূপ পুতুল সাজান হইল। ঠিক মুরগীর মত দেখিতে একটী পক্ষী বসিল, ইহাকে এখানে কেন গরুড় বলে তা বুঝিলাম না, বরং ইহাকে জটায়ু বলা উচিত, কারণ রামচন্দ্রের আখ্যানের সহিত গরুড়ের কোন সম্বন্ধ নাই।

প্রতিপদের দিন প্রভাতে যথানিয়ম আপেয়া টাকার খনি হইতে পয়সা

আনিতে গেল। উহা লওয়ার পর নিকটস্থ জলের কলে হাত ধুইতে লাগিল। কয়টা ছেলে সেইখানে ছিল, তাহাদের মধ্যে এক জন বলিল, ও আপী, মন্দির কর্‌ছিস চুরি করা কাঠ দিয়ে! তোরা খুব ধর্ম্ম কচ্চিস্ ত?

আপেয়া চমকাইয়া বলিল, কি বল্‌ছিস ভাই বুঝতে পার্‌চি না যে।

বালক। নেকি, যেন কিছু জানেন না।

আপেয়া। না ভাই, সত্যি আমি কিছু জানি না।

বালক। না জানিস্ ত শোন্। জগন্নাথ এক দিন সকালে কাঠ এপারে এনে বাজারে বিক্রী ক[illegible] যাবে, তার কি অসুখ হল, সে কাঠ রেখে বাড়ী [illegible] গেল। তোর বাপ সেই [illegible] নিয়ে যায়। জগন্নাথ সন্ধা[illegible] করে তা জান্‌তে পারে। কাল তোর বাপ সমুদ্রে না [illegible] ই ব্যা[illegible]টারে মাছ ধর্‌তে আসে, জগন্নাথের সঙ্গে দেখা হয়, দু'জনে খুব গালাগালি করে মারামারী কর্‌তে ওঠে, সকলে ছাড়িয়ে দেয়, তোর বাপকে কাঠের দাম দিতে বলে, তা তোর বাপ বলে, মরে গেলেও দেব না।

আপেয়ার চক্ষু ভয়ে ও দুঃখে ছলছল করিতে লাগিল। তার মন্দির কি না চুরীর ধনে প্রস্তুত, পরমেশ্বর কখন এ পূজা গ্রহণ করিবেন না, পাপের দ্বারা কখন ধর্ম্মকার্য্য হতে পারে না। তার কোমল হৃদয়ে যেন কাঁটা বিঁধিতে লাগিল। আপেয়া বাড়ীতে দৌড়াইল; দুই ঘণ্টা তথায় পিতার জন্য অপেক্ষা করিল, আন্তরিক যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল, শেষে আর তার ধৈর্য্য রহিল না, জগন্নাথকে কাঠের দাম দিয়া পাপ ধুইয়া ফেলিবার জন্য সঞ্চিত টাকার থলে লইয়া ব্যাকওয়াটারের দিকে পুনরায় দ্রুতগতি চলিল। বোকা তাহার সঙ্গ ছাড়িল না।

(৬)

ইহার অল্পক্ষণ পরে চীনাস্বামী বাড়ী আসিল। জগন্নাথের সহিত কয়েক দিন পূর্ব্বে ঝগড়ার উত্তেজনা তখনও উহার যায় নাই। কি করিয়া জগন্নাথকে শেষ করিতে পারিবে, তাহা ভাবিতেছিল।

কুটিরে প্রবেশ করিয়া অত বেলাতেও আপেয়াকে না দেখিয়া চমকাইল, তাহার দুষ্ট চিন্তাগুলি তৎক্ষণাৎ কোথায় পলাইল। তখন সে চীৎকার করিয়া কন্যাকে ডাকিল, পল্লীতে প্রতিবাসীদের বাটীতে অনুসন্ধান করিল, কিন্তু কোথাও পাইল না; ইহাতে তাহার মনে ভয়ানক আশঙ্কার উদয় হইল। তাহার মুখ বিবর্ণ হইল; মেয়েটা কোথায় গেল, তাহার কি হইল! চীনাস্বামী তৎক্ষণাৎ

ছুটিয়া বাহির হইল, প্রথমে ব্যাকওয়াটারের দিকে গেল। সমুদ্রের সহিত ব্যাকওয়াটারের সংযোগস্থলে কষ্টম্‌স্ অফিস বা পর্‌মিট্ ঘর। সেইখানে পৌঁছিবা মাত্র বোকা করুণস্বরে ডাকিয়া তাহার কাপড় দাঁতে দিয়া টানিতে লাগিল। কুকুরের ইঙ্গিত বুঝিয়া চীনাস্বামী কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইবামাত্র দেখিল, দূরে পার-ঘাটের তীরে জনতা হইয়াছে। প্রাণের আবেগে দৌড়িয়া জনতা ভেদ করিয়া চীনাস্বামী যাহা দেখিল, তাহাতে সে স্তম্ভিত হইল, জীবন-শূন্য প্রস্তর-মূর্ত্তিবৎ হইল। দেখিল, তাহার মহাশত্রু জগন্নাথ ভিজা কাপড়ে বসিয়া, অতি আত্মীয়ের মত দুই হাতে তাহার গলা জড়াইয়া আপেয়া, কিন্তু চেতনা নাই, চক্ষু মুদিত, কাপড় ভিজা, চুল আলুলায়িত। ঠিক শেষ মুহূর্ত্তে জগন্নাথ আপেয়াকে রক্ষা করিয়াছে, আর একটু বিলম্ব হইলে সব শেষ হইত, ইহা চীনাস্বামীর তৎক্ষণাৎ বুঝিতে বাকি রহিল না। কোন কথা চীনাস্বামীর মুখ দিয়া বাহির হইল না, সে নীরবে কন্যার দিকে চাহিয়া রহিল।

ক্ষণপরে জগন্নাথ ভগ্নস্বরে বলিল, শোন চীনাস্বামী, আমি তোমাকে খুন কর্‌তে আসিতেছিলাম, ওপারে আমি দাঁড়াইয়া, পেরুণী নৌকা এপারে দেখিলাম, আপেয়া তাহাতে উঠিয়া এক ধারে বসিল, আমার মন তাতেই কেমন ভয় হল, আমি একদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলাম, নদীর মাঝামাঝি নৌকা আসিয়াছে, আপেয়া কি রকমে জলে পড়ে গেল, আর ভাঁটার টানে সমুদ্রের দিকে যাইতে লাগিল। আমি তখনই জলে ঝাঁপিয়ে পড়িলাম। তার পর যা, তা তুমি দেখ্‌ছ। দেখ এখনও এর কোমরে টাকার থলে কেমন বাঁধা, আমাকে দিতে আস্‌ছিল, আমার কাঠের দাম দেবার জন্য আস্‌ছিল! এখন একবার ভাব, এ মেয়েটা কি আর তুমি আমি কি রকম লোক!

চীনাস্বামী কন্যাকে কোলে লইল, মুখে হাত দিয়া দেখিল, তখনও মূর্চ্ছিত। কিন্তু নিশ্বাস বহিতেছে, আর তার এই জীবন-সর্ব্বস্বকে তার ঘোর শত্রু জগন্নাথ বাঁচিয়েছে। বলিল, জগন্নাথ, আমি একে আজ মেরেছিলুম, আমার দোষে পাপে আজ একে হারাতে বসেছিলুম।

তাহার পর উভয়ে আপেয়ার শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইল, কারণ তখনও আপেয়া কথা কহে নাই। কতক্ষণ পরে আপেয়া চক্ষু খুলিল, প্রথমে বিস্মিতবৎ সকলের মুখের দিকে চাহিল, তাহার পর নিম্ন স্বরে বলিল, কাকাবাবু, তুমি কাঠের দাম নাওনা, আর আমার বাবার সঙ্গে ভাব কর্‌বে বল। দুই শত্রুর চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। জগন্নাথ বলিল, হাঁ বুড়ীমা, আমি দাম পেয়েছি। চীনাস্বামীর

মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না। আপেয়া বলিল, বাবা কত বেলা হয়ে গেল কখন্ যাবে, আর কাকাবাবু তুমিও আমাদের সঙ্গে চল, তুমি না গেলে আমি যাব না, তোমাকে যেতেই হবে।

(৭)

আপেয়ার ভাল করিয়া সারিতে আর তিন দিন কাটিয়া গেল। কিন্তু এই তিন দিন জেলে-পল্লী নীরব রহিল না। আপেয়ার মন্দিরকে অনেক বৃহৎ করিয়া পুনর্নির্ম্মাণ করা হইল, সাজসজ্জা সৌন্দর্য্য অনেক বেশী করা হইল। প্রথম বারে কেবল পিতাপুত্রী দুই জনে অবসর মত মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিল, এখন তাহার স্থলে বিশ জন দিবারাত্র খাটিতেছে, কে কোথা হইতে যে কোন্ দ্রব্য আনিতেছে, তাহার ঠিক নাই, সর্ব্বাপেক্ষা উদ্যোগী জগন্নাথ। উহাদের কৃত চালা-মন্দির ভিজাগাপত্তনের এক প্রধান দৃশ্য হইল, যত লোক আসিয়া দেখিতে ঝুঁকিয়া পড়িল। আপেয়া কহিল, কাকাবাবু তুমি করেচ কি! এত বড় মন্দির!

জগন্নাথ। এর কমে কি বুড়ীমা রামলীলা হতে পারে, না লোকজনে দেখ্‌তে পাবে?

আপেয়া। টাকা?

জগন্নাথ। মা তোর খনিতে কি টাকার অভাব হতে পারে? আর তোর মনে নাই কি, প্রথম দিনেই তোকে রামলীলা দিতে বলেছিলুম।

জগন্নাথ ও চীনাস্বামীর গ্রামের বিশিষ্ট লোকেরা প্রত্যেকে এক টাকা করিয়া চাঁদা দিয়াছিল।

আপেয়া বেশ সুস্থ হইলে চতুর্থ দিনে রীতিমত উৎসব আরম্ভ হইল। সন্ধ্যার পর হলের মত দীর্ঘ চালাঘরের ভিতর ও বাহির অনেক আলোকে আলোকিত করা হইল। এক প্রান্তে রামসীতার প্রতিমূর্ত্তি ও নানা পুতুল ও সাজসজ্জা বসিয়াছিল, তাহার পর কয়েক হস্ত স্থান খালি রাখা হইয়াছিল, অবশিষ্ট অংশে তালপাতার চেটাই বিছাইয়া দর্শকেরা বসিল। অন্যান্য আমোদ-প্রমোদ হইবার পূর্ব্বে দেবতার সম্মুখে সেই খালি স্থানে আপেয়াকে লইয়া চীনাস্বামী ও জগন্নাথ উপস্থিত হইল। আপেয়া মধ্যে, উহারা দুই পার্শ্বে আপেয়ার দুই হাত ধরিয়া। আপেয়া আজ আনন্দে হাস্যমুখী, আর তাহাকে ফুলে এমন সাজান হইয়াছিল, বোধ হইল যেন নীরস পাহাড় ও বালির ভিতর হইতে এক সুমিষ্ট জ্যোতির্ম্ময়ী দেব-বালিকার আবির্ভাব হইয়াছে। আর উহার সহযাত্রীদ্বয়ের মুখে পূর্ব্বের সে নীরস কর্কশ চোয়াড়ে ভাব নাই। উহাদের অন্তর পরিষ্কার হওয়ায়

বাহিরও পরিষ্কার হইয়াছে, মুখের চেহারা প্রশান্ত কোমল ভাব ধারণ করিয়াছে।

যে চীনাস্বামী এক দিন কন্যার কাছে বলিয়াছিল, তার কোন বিদ্যা বুদ্ধি নাই যে পাঁচ জনের কাছে ধর্ম্ম কথা বল্‌বে, আজ মনের আবেগে তাহার মুখ ফুটিল। সকলে একটু চুপ করিলে সে বলিল—'ভাই সকল, আমি তোমাদের কাছে ধর্ম্মের কোন কথা বল্‌তে উঠিনি। আর ধর্ম্মের কথা যদি বল্‌তে হয়, তা এই আমাদের মত দুজন লোকেরই কাছে বল্‌তে হয়। আমি ক'দিন আগে যা ছিলুম, আজ যদি তাই থাক্‌তুম, তা'হলে তোমাদের সম্মুখে দাঁড়াতে পার্‌তুম না। আমাকে সৎ কর্‌বার জন্য, পাপ হতে মুক্ত কর্‌বার জন্য, আমার এই মেয়ে তার প্রাণ দিতে বসেছিল। এখন আমি পরিবর্ত্তিত হয়েছি, সম্পূর্ণ ভিন্ন লোক হয়েছি—কেবল আমার এই মেয়ের শক্তিতে। আমি যদি কখন তোমাদের কারও কিছু মন্দ করে থাকি, আমি ক্ষমা চাই। আজ আমার মেয়ের রামনবমী, আমাদের সকলের আনন্দের দিন, বিশেষ আমার ও জগন্নাথের আনন্দের দিন।' চীনাস্বামীর মুখে আর কথা বাহির হইল না, তাহার চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল, সে রামসীতার প্রতিমূর্ত্তিকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিল।

সমস্ত দর্শক নীরব। জগন্নাথ বলিল—'দাদা যা বলেছে আমারও সেই কথা। আপেয়া কেবল দাদাকে উদ্ধার করেনি, আমাকেও উদ্ধার করেছে। তবে এখনও আমি দাদার মত হতে পারিনে; যে বাগান নিয়ে দাদাতে আমাতে খুনোখুনী, তা দাদাকে দিতে পার্‌লুম না, আমার এই বুড়ীমাকে দিলুম। আর দাদা কি ছার টাকার খনি বার কর্‌তে গিয়েছিল, তার ঘরে যে এমন অমূল্য শান্তির খনি আছে, তা দাদা বুঝ্‌তে পারেনি। তবু আমি দাদার পা মাথায় করে রাখ্‌ব।' এই বলিয়া জগন্নাথ অগ্রে রামসীতাকে প্রণাম করিয়া পরে চীনাস্বামীর পদে নমস্কার করিল, চীনাস্বামী উহাকে তুলিয়া আলিঙ্গন করিল, উভয়ের চক্ষের জলে উভয়ের বক্ষ সিক্ত হইল। দর্শকদেরও চক্ষু জলশূন্য রহিল না।

পাঠক এই আখ্যায়িকাকে কি গল্প মনে করেন?

বঙ্গে সঙ্গীতচর্চ্চার অভিব্যক্তি

[কস্যচিৎ সঙ্গীতানুরাগিণঃ।]

আমরা বাল্যকাল অবধি শুনিয়া আসিতেছি যে "গানাৎ পরতরং নহি" অর্থাৎ গান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর আর কিছুই নাই। গ্রীসের ইতিহাসে এক সময় গানের শক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। একবার যখন গ্রীক সৈন্য শত্রুপক্ষের সম্মুখে জয়লাভে নিরাশ হইয়া পড়িতেছিল, তখন কেবলমাত্র একটী সঙ্গীতের বলে উৎসাহিত হইয়া তাহারা শত্রুপক্ষ বিধ্বস্ত করত জয়লাভে সমর্থ হইয়াছিল। এখনও সৈন্যদলকে উৎসাহিত করিবার জন্য যন্ত্র-বাদ্যের সাহায্য লইতে হয়। সময়ে সময়ে সৈন্যগণ নিজেরাই মিলিত কণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে গান করিয়া শ্রম দূর করে ও নিজেদের চিত্তবল বহু গুণে বর্দ্ধিত করে।

সঙ্গীতের এইরূপ শক্তির পরিচয় বিভিন্ন দেশের ইতিহাসে প্রাপ্ত হইলেও গান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর আর কিছুই নাই, এরূপ কথা অপর কোন দেশেই শোনা যায় না—একমাত্র ভারতবর্ষেই এই কথার উদ্ভব সম্ভব দেখি। যে দেশে দেবগণের পূজার্চ্চনাতেই গানের উৎপত্তি, যে দেশে আত্মসাধনায় গানের সর্ব্বপ্রথম প্রয়োগ, সেই ভারতবর্ষ ব্যতীত অপর কোন্ দেশে এমন সুন্দর কথার উৎপত্তি সম্ভব? পাশ্চাত্য দেশেও ধর্ম্মসঙ্গীত অনেক আছে বটে, কিন্তু গান হিসাবে সেগুলি অন্যান্য গান অপেক্ষা অনেক নিম্ন স্থান অধিকার করে—সঙ্গীতজ্ঞ কলাবিদেরা সেই গানগুলিকে বড়ই হেয় চক্ষে দেখেন।

আমাদের দেশে ইহার ঠিক বিপরীত। ধর্ম্মসঙ্গীত আমাদের মাথার মণি—আমাদের দেশে সঙ্গীতরাজ্যে ধর্ম্মসঙ্গীতের আসন অনেক উচ্চে। ধর্ম্মসঙ্গীত আমাদের পূজা আকর্ষণ করে। আমাদের দেশে জগন্মান্য চতুর্ব্বেদের অন্যতম সামবেদে সঙ্গীত সর্ব্বপ্রথম অঙ্গাঙ্গীভাবে সংরক্ষিত দেখা যায়। বর্ত্তমানে সামবেদ বিশুদ্ধরূপে গান করিতে পারেন এরকম লোক ভারতে পাওয়া যায় কি না আমরা জানি না। কিন্তু আজ বহু বৎসর পূর্ব্বে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিবার পর যখন একবার কাশী গমন করেন, সেই সময়ে কাশীধামে তিনি কয়েকটী বালকের মুখে সামগান শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার মুখে আমরা শুনিয়াছি যে পরে তিনি অনেক চেষ্টা করিলেও সেরূপ মধুর সামগান আর শুনিতে পান নাই।

সেই প্রাচীন বৈদিককালের পর দুরূহতা ও অন্যান্য নানা কারণে যখন বৈদিকগান জনসাধারণে্য অপ্রচলিত হইয়া গেল, তখন অবধি অবশ্য ক্রমে অন্যান্য রাগরাগিণীর সাহায্যে গান করিবার রীতি প্রচলিত হইতে লাগিল। অনুমান হয় যে সেই সকল রাগরাগিণী-সম্বলিত গান অনেককাল পর্য্যন্ত দেবারাধনা কার্য্যেই বিশেষভাবে প্রযুক্ত হইত। নটনারায়ণ, কল্যাণ, শ্রী প্রভৃতি প্রাচীন রাগরাগিণীর নামেই আমাদের অনুমানের যুক্তিযুক্ততা সমর্থিত হয় বলিয়া বোধ হয়। কেবল তাহাই নহে—যাহা অপর কোন দেশেই সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না, তাহা আমাদের এই ধর্ম্মপ্রাণ দেশে সম্ভবপর হইল। বিভিন্ন রাগরাগিণীর অধিষ্ঠাত্রী দেবদেবী কল্পিত হইল।

মুসলমান রাজত্বের সময়ে সেই সকল রাগরাগিণী শুদ্ধভাবে ও মিশ্রভাবে গীত হইতে লাগিল বটে, কিন্তু তাহা আর মাত্র দেবারাধনাতে নিবদ্ধ থাকিল না। সেগুলি ধীরে ধীরে সম্রাট প্রভৃতির এবং তাহাদের দেখাদেখি অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের চিত্তবিনোদনের উপায় হইয়া দাঁড়াইল। এই সময়েই সম্ভবত পিলু, বারোয়াঁ প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর রাগিণী এবং ঠুংরি, খেমটা প্রভৃতি সরল ও আশু চিত্তবিনোদক তালসমূহের সৃষ্টি হইয়াছিল। পরিণামে সর্ব্বপ্রকার রাগরাগিণী বিলাসী ও বিলাসিনীদের উপভোগ্য বলিয়া পরিগৃহীত হওয়াতে তাহা আদিরস-প্রধান প্রেমসঙ্গীতে প্রযুক্ত হইতে লাগিল। ক্রমে সেই সকল গান দেশকে এতদূর ছাইয়া ফেলিয়াছিল যে, দুর্গাপূজা প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ সময় ব্যতীত দেশ হইতে ধর্ম্মসঙ্গীত গাহিবার অভ্যাস বলিতে গেলে একপ্রকার উঠিয়াই গিয়াছিল। ইহার ফলে এই দাঁড়াইয়াছিল যে, কোনও বালক সঙ্গীতচর্চ্চায় মনোযোগ প্রদান করিলেই সে দুর্ব্বিনীত "বয়াটে" ছেলে এবং ভদ্রসমাজে মিশিবার অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইত।

এ বিষয়ে জনসাধারণেরই বা দোষ দিই কি প্রকারে? বাস্তবিকই এমন এক কাল আসিয়াছিল যখন কোন বালক সঙ্গীত-শিক্ষা করিবার ইচ্ছা করিলেই তাহাকে হয় অগম্যস্থানে যাইয়া অথবা সর্ব্বপ্রকার মাদকদ্রব্যে অভ্যস্ত ওস্তাদদিগের নিকট গিয়া শিখিতে হইত এবং গান শিখিবার সঙ্গে সঙ্গে অপরিণত-বুদ্ধি বালকেরা নানা ঘৃণিত কর্ম্মে একেবারে ডুবিয়া যাইত। কাজেই জনসাধারণ বালকদিগের সঙ্গীতশিক্ষা একটা দোষের কাজ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছিল। বৎসর কুড়ি পূর্ব্বেও আমরা বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে অগম্যস্থানে যাইয়া প্রেমসঙ্গীত শিক্ষা করিবার কারণে গর্ব্ব করিতে শুনিয়াছি। তখন তো ব্রহ্মসঙ্গীতের বহুল

প্রচার হইয়াছিল। কিন্তু ব্রহ্মসঙ্গীত প্রচলনের পূর্ব্বে সঙ্গীত-চর্চ্চার অবস্থা চিন্তা করিলে কূলকিনারা পাওয়া যায় না।

ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে প্রচলিত রাগরাগিণীতে সম্বদ্ধ হইয়া ব্রহ্ম-সঙ্গীত সকল গীত হইবার প্রথা নিয়মিতরূপে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। এই সম্বন্ধে একটী গল্প আছে। সাধারণ উপাসনার দিন স্থির হইবার পূর্ব্বে রামমোহন রায় সমাজে আসিয়া কখনও বা খৃষ্টান বালকগণকে ডাকাইয়া ব্রহ্মপ্রতিপাদক গান করাইতেন, আর কোন দিন বা বিষ্ণুর ওস্তাদ রহিম খাঁর মুখে ঈশ্বর সম্বন্ধীয় পারসী গান শুনিতেন। এইরূপ গান শুনিতে তাঁহার বড়ই ভাল লাগিত। তাঁহার সঙ্গে কয়েকজন সঙ্গী প্রায় সর্ব্বদাই কাছাকাছি থাকিতেন। "যাঁহারা রামমোহন রায়ের সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজে যাইতেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ হয়তো জানিতেন না যে কিসের জন্য তথায় আসিয়াছেন। তাঁহারা রামমোহন রায়ের সন্তোষের জন্য, তাঁহার অনুরোধ রক্ষার জন্যই যেন আসিতেন। একদিন রাম-মোহন রায় বলিলেন যে ভাল ভাল গায়ক সকল সংগ্রহ করিয়া মধ্যে মধ্যে ব্রাহ্ম সমাজে সঙ্গীত দিলে ভাল হয়। অমনি গুণী গায়ক সকল সেখানে একত্রিত হইল এবং নানাভাবের সঙ্গীত চলিল। রামমোহন রায় বলিলেন—ও সব গান কেন, অলখ নিরঞ্জন গাও। সেই অবধি ব্রহ্মসঙ্গীত চলিতে লাগিল। তাঁহার সঙ্গীদিগের মধ্যে এতটুকুও তখন কাহারো বুঝা হয় নাই যে ব্রাহ্মসমাজে সঙ্গীত গাহিতে বলিলে ঈশ্বরের সঙ্গীত গাহিতে হইবে।" আমাদের নিকট এখন ইহা উপকথার মত বোধ হইতে পারে, কিন্তু সে সময়ে সঙ্গীত সম্বন্ধে বাস্তবিকই দেশের এইরূপ দুরবস্থা আসিয়াছিল। রামমোহন রায় তাহা হইতে দেশকে উদ্ধার করি-লেন, আবালবৃদ্ধবনিতার প্রকাশ্যে গান গাহিবার পথ উন্মুক্ত করিয়া দিলেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও এ বিষয়ে দেশের অল্প উপকার করেন নাই। বলা বাহুল্য যে,তাঁহার জীবদ্দশায় যে কোন গুণী কলাবিৎ লোক কলিকাতায় আসুন না কেন, তিনি দেবেন্দ্রনাথের গৃহে নানাবিধ উপায়ে উৎসাহলাভ না করিয়া দেশে ফিরিতে পারিতেন না। ইহা ছাড়া তিনি ব্রাহ্মসমাজে গান করিবার জন্য বিশুদ্ধচরিত্র বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ব্যতীত আরও দুই তিনটী গুণী গায়ক সর্ব্বদাই নিযুক্ত রাখিতেন। সেই সকল গায়কদিগের মধ্যে একটীর নাম উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে—বিষ্ণুপুরের সুপ্রসিদ্ধ যদুভট্ট। গুণীজনের উৎসাহদানে দেবেন্দ্রনাথ বিশেষ মুক্ত-হস্ত ছিলেন। একা যদুভট্টই তাঁহার গৃহে আহারাদি ব্যতীত মাসিক এক শত টাকা বেতন পাইতেন।

সেকালে বঙ্গদেশে সঙ্গীতের চর্চ্চা বিষয়ে উৎসাহদানে দেবেন্দ্রনাথের পরিবার অপেক্ষা অন্য কোন পরিবার অধিকতর অগ্রসর ছিলেন কি না জানি না। দেবেন্দ্রনাথ যেমন একদিকে গুণী গায়কদিগকে গান করিবার জন্য নিযুক্ত করিতেন, অপরদিকে তিনি নিজেও বাঙ্গালা ভাষায় ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করিয়া সেই গায়কদিগের প্রদত্ত সুরে বসাইয়া ব্রাহ্মসমাজে গান করাইতেন, এবং স্বীয় পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রগণকেও সেই কার্য্যে উৎসাহ দিয়া সে বিষয়ে তাঁহাদিগকে সিদ্ধহস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। ব্রহ্মসঙ্গীত রচনার ফলে সঙ্গীত বিষয়ে এবং সঙ্গীতের ভিতর দিয়া দেশের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিসাধনকল্পে যে কি প্রকার মহান্ নীরব বিপ্লব সাধিত হইল, তাহা স্থিরচিত্তে ভাবিয়া না দেখিলে আমরা সহজে বুঝিতে পারিব না। দ্বিজেন্দ্রনাথের সেই "জয় জয় পরব্রহ্ম" "কর তাঁর নাম গান", সত্যেন্দ্রনাথের "কে রচে এমন সুন্দর বিশ্বছবি", গণেন্দ্রনাথের "গাও হে তাঁহার নাম", হেমেন্দ্রনাথের "নাথ, তুমি ব্রহ্ম তুমি বিষ্ণু", জ্যোতিরিন্দ্রনাথের "ধন্য ধন্য ধন্য আজি"— এ সকল গান যাঁহারা একবার শুনিয়াছেন, তাঁহারা আর কি তাহা ভুলিতে পারেন ? এই সকল গান প্রাণের ভিতর গিয়া কথা কহিতে থাকে। এই সকল পুরাতন ব্রহ্মসঙ্গীতের উল্লেখ করিলাম, কারণ স্যর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতের বিষয় এখানে উল্লেখ করা বাহুল্য মনে করি—তাঁহার মধুস্রাবী গীত সকল সমগ্র বঙ্গদেশ আজ নিত্যই উপভোগ করিতেছে এবং তাঁহার রচিত চিত্তবিমোহন গানের সংখ্যা এত অধিক যে তাহা হইতে উল্লেখযোগ্য বলিয়া দু-একটী গান নির্ব্বাচন করা আমার পক্ষে অসম্ভব।

দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁহার পরিবার একদিকে নানা উপায়ে দেশ-বিদেশের গুরু-গম্ভীর হইতে লঘুতম সুরে এবং চৌতাল ধামার প্রভৃতি কঠিনতম তাল হইতে ঠুংরি প্রভৃতি অতি হালকা তালে ব্রহ্মসঙ্গীত বসাইয়া দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের গাহিবার উপযুক্ত গান সকল সঞ্চিত করিয়া ভাণ্ডার পূর্ণ করিতেছিলেন, অপরদিকে পাথুরিয়াঘাটার পূজনীয় রাজা ৺শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর স্বগৃহে গীত-বাদ্যের রীতিমত একটী কেন্দ্র-স্থাপন করিয়া বঙ্গদেশে সঙ্গীতচর্চ্চার বিস্তৃতি বিষয়ে যে প্রকার সাহায্য করিয়াছেন তাহা একমুখে বলিয়া শেষ করা যায় না। সুপ্রসিদ্ধ ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, মির্জা কালীদাস চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি কলাবিৎগণের নিত্য মিলনস্থল ছিল শৌরীন্দ্রমোহনের গৃহ। তাঁহার নিযুক্ত ওস্তাদদিগের নিকটে অনেক ব্যক্তি নিয়মিতরূপে সঙ্গীতশিক্ষা লাভ করিয়া দেশবিদেশে সঙ্গীতচর্চ্চা প্রচারিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। শৌরীন্দ্রমোহনের গৃহে শিক্ষিত হইয়া

অনেকে দেবেন্দ্রনাথের গৃহের মাঘোৎসবের গানে যোগ দিতেন। শৌরীন্দ্র-মোহনের নিকট কিন্তু হিন্দুস্থানী ওস্তাদী গানেরই সমধিক আদর ছিল। গীত-বাদ্যের কেন্দ্রস্থাপন ব্যতীত শৌরীন্দ্রমোহন সঙ্গীতদর্পণ প্রভৃতি সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও ইংরাজী ভাষায় ভারতীয় সঙ্গীত বিষয়ক বিস্তর ভাল ভাল গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করিয়া ভারতীয় সঙ্গীতের বৈজ্ঞানিক আলোচনায় এবং ভারতীয় সঙ্গীতকে আন্তর্জাতিক করিয়া তুলিবার প্রথম সোপান রচনা করিয়া দেন। তাঁহার গৃহে, আমরা বলিতে পারি, সঙ্গীত বিদ্যালয়ের আদিমতম বীজ রোপিত হইয়াছিল। তাঁহার এ বিষয়ে এ প্রকার উৎসাহ ছিল যে, তিনি সংস্কৃত কলেজে সঙ্গীতবিষয়ক সংস্কৃত গ্রন্থ বিশেষভাবে পড়াইবার জন্য ও প্রাচীন সঙ্গীতবিজ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্য একটী স্বতন্ত্র শ্রেণী খুলাইয়াছিলেন এবং তদ্বিষয়ে পারদর্শিতার জন্য বিশেষ পারি-তোষিক প্রদানেরও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁহার পরিবারের শত চেষ্টা এবং শৌরীন্দ্রমোহনের শত চেষ্টা —বঙ্গদেশে জনসাধারণের মধ্যে সঙ্গীতচর্চ্চা প্রসারিত করিবার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইত, যদি না দেবেন্দ্রনাথের অন্যতর পুত্র হেমেন্দ্রনাথ পুরাতন সঙ্কীর্ণ ভাবের সর্ব্ববিধ বাধা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তাঁহার স্ত্রী পুত্র কন্যাদিগকে সঙ্গীতশিক্ষা দিবার বিশেষ ব্যবস্থা করিতেন। এই কার্য্যে তিনি কেবলমাত্র বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্ত্তীকে প্রথমাবধিই নিযুক্ত করিয়া ক্ষান্ত ছিলেন না। আদিব্রাহ্মসমাজের জন্য যখন যে কোন গুণী ব্যক্তি নিযুক্ত হইতেন, তাঁহাকেই তিনি স্বীয় পুত্রকন্যাদিগেরও শিক্ষা-দানের জন্য বিশেষভাবে নিযুক্ত করিতেন। বিষ্ণুচন্দ্রের ন্যায় যদুভট্ট প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ ওস্তাদগণের নিকটে হেমেন্দ্রনাথের সন্তানগণ বিশেষভাবে সঙ্গীতশিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রকন্যাদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী প্রতিভা দেবী ও জ্যেষ্ঠ পুত্র হিতেন্দ্রনাথ সঙ্গীতমূলক সর্ব্ববিধ কলাবিদ্যাতে পারদর্শী হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহাদের পারদর্শিতার প্রধান একটী কারণ এই যে, হেমেন্দ্রনাথ শিক্ষার প্রথমাবধিই সকলকেই গানের সুর ও তাল উভয়েরই প্রতি সমান মনো-যোগ দিতে বাধ্য করিতেন।

হেমেন্দ্রনাথের পুত্রকন্যাগণ যখন কয়েকটী ব্রহ্মসঙ্গীত সুচারুরূপে গান করিতে অভ্যস্ত হইলেন, তখন স্থির হইল যে তাঁহারা পরবর্ত্তী মাঘোৎসবে গান করিবেন। আমাদের বেশ স্মরণ হয় যে, যে বৎসর প্রতিভা দেবী-প্রমুখ হেমেন্দ্রনাথের সন্তানেরা উৎসবোচিত বেশে সুসজ্জিত হইয়া প্রাতঃকালের উৎসবে আদিব্রাহ্ম-সমাজের সঙ্গীতবেদী হইতে এবং সায়ংকালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের গৃহে ব্রহ্মসঙ্গীত

গান করিয়াছিলেন, সে বৎসর সমুপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দ ও বিস্ময়ের তরঙ্গ বহিয়া গিয়াছিল। হেমেন্দ্রনাথের সন্তানদিগের বয়সই বা তখন কত?—পাঁচ হইতে আট নয় বৎসর মাত্র। পাঁচ বৎসর বয়স্ক বালকের মুখে ব্রহ্মসঙ্গীতের ন্যায় কালোয়াতী গান সকল যথাযুক্ত স্বরলয়ে বিশুদ্ধভাবে বাহির হইতেছে, তখনকার দিনে ইহাই তো এক আশ্চর্য্য ব্যাপার বলিয়া মনে হইবার কথা, তাহার উপর আট নয় বৎসরের এক বালিকা সেই কঠিন ব্রহ্মসঙ্গীত সকল সহজে গাহিয়া যাইতেছে—আজ প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য আর কি হইতে পারে? সেই বিস্ময়জড়িত আনন্দের মধ্য দিয়াই কিন্তু জনসাধারণ বুঝিতে আরম্ভ করিল যে গৃহের বালকবালিকাদিগকে ভাল বিষয়ের সঙ্গীতাদি শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে এবং শিক্ষা দিলে গৃহ এক আশ্চর্য্য মঙ্গলশ্রী ধারণ করে। ক্রমে ক্রমে—অতি ধীরে ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রাচীনপন্থী হিন্দুসমাজের ভিতরেও এখন সঙ্গীতশিক্ষা প্রবেশলাভ করিয়া ছেলেমেয়েদের সুশিক্ষার একটী অপরিহার্য্যপ্রায় অঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে।

হেমেন্দ্রনাথ তাঁহার পুত্রকন্যাদিগকে কেবল গান শিখাইবার ব্যবস্থা করিয়াই নিশ্চিন্ত হন নাই। তিনি তাঁহাদিগকে নানাবিধ যন্ত্রবাদ্যও শিক্ষা দিবার বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। প্রতিভা দেবী ও হিতেন্দ্রনাথ একদিকে বিদ্যালয়ে পিয়ানো শিক্ষা করিতে লাগিলেন, অপরদিকে গৃহে সেতার প্রভৃতি দেশীয় যন্ত্রবাদ্যের শিক্ষায় নিযুক্ত থাকিতেন। এদেশে ভদ্রপরিবারের বালকবালিকাদের মধ্যে যন্ত্রবাদ্যশিক্ষার ইহাই প্রথম সূত্রপাত। এই সময়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের গৃহে প্রতি বৎসর বিদ্বজ্জন সমাগম হইত। ঐ সমাগমে কলিকাতার যত বিখ্যাত সুপণ্ডিত ব্যক্তিগণ আহূত হইতেন এবং তাঁহাদের চিত্তবিনোদনের জন্য কোন না কোন প্রকার আমোদের অনুষ্ঠান হইত। বিদ্বজ্জন সমাগমের শেষাবস্থায় কালমৃগয়া, বাল্মীকি-প্রতিভা প্রভৃতি গীতিনাট্যের অভিনয় হইয়াছিল, কিন্তু উহার প্রথমাবস্থায় প্রতিভা দেবীর সেতার প্রভৃতি যন্ত্রবাদ্য ও গান শোনানো হইত। যে বৎসর তাঁহার সেতার বাদ্য প্রথম শোনানো হইয়াছিল, সে বৎসর বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর মধ্যে ধন্য ধন্য পড়িয়া গিয়াছিল। সঙ্গীতরসজ্ঞ আত্মীয়গণের নিকটে প্রতিভা দেবী বহুমূল্য তানপুরা প্রভৃতি পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। এই সময় অবধি সকলেই উপলব্ধি করিতে পারিলেন যে, ভদ্রগৃহের বালিকাগণও নির্দ্দোষভাবে যেমন গান শিক্ষা করিতে পারেন, সেইরূপ যন্ত্রবাদ্যও শিখিতে পারেন—এরূপ শিক্ষার ফলে মঙ্গল ব্যতীত অমঙ্গল আসিতে পারে না। ইহাতে গৃহের

সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৰ্দ্ধিতই হইতে পারে এবং গৃহের বালকবালিকাদের চরিত্র গঠনেও যথেষ্ট সহায়তা হইতে পারে। কোন শিক্ষিত পরিবারেই এখন আর সঙ্গীতশিক্ষা বা যন্ত্রবাদ্য শিক্ষা নিন্দনীয় বলিয়া বিবেচিত হয় না।

যে সকল ঘটনা বর্ত্তমানে সঙ্গীতচর্চ্চাকে জনসাধারণের সাধারণ সম্পত্তি করিয়া তুলিয়াছে, তন্মধ্যে স্বরলিপি প্রবর্ত্তন একটী প্রধান ঘটনা। যে সময়ে বিদ্বজ্জনসমাগমের সূত্রপাত হয়, সে সময়ে সঙ্গীতচর্চ্চার একটা সুবাতাস উঠিয়াছিল। ইহা স্বাভাবিক যে, এই সঙ্গীতচর্চ্চার মধ্যে গানের সুরগুলিকে লিপিবদ্ধ করিয়া স্থায়িত্ব দিবার একটা চেষ্টা আসিবে। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে এই বিষয়ে চেষ্টা করিবার পথপ্রদর্শক বোধ হয় রাজা শৌরীন্দ্রমোহনের বিদ্যালয়ের সঙ্গীতাচার্য্য ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী। কিন্তু তাঁহার স্বরলিপির সাহায্যে সুরগুলি সূক্ষ্মভাবে লিপিবদ্ধ করা যায় কি না সন্দেহ। তাহা ছাড়া এই স্বরলিপির প্রণালী সুখবোধ্যরূপেও পরিব্যক্ত হয় নাই। তাই গোস্বামী মহাশয়ের স্বরলিপি এ বিষয়ে পথপ্রদর্শক এবং বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের সাহায্যে কতক পরিমাণে প্রচলিত হইলেও তাহা সাধারণের নিকট স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে নাই। ক্ষেত্রমোহনের পর বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে গানগুলি স্বরলিপিবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন বোধ হয় কুচবিহারের রাজগীতশিক্ষক কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়। কিন্তু তিনি ইংরাজী স্বরলিপির অনুকরণে এক স্বরলিপি প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া তাহাও এদেশে নিতান্তই অপ্রচলিত হইয়া পড়িল। কুচবেহারের রাজার ছাপাখানায় তাঁহার ইংরাজী স্বরলিপি ছাপিবার সুবিধা ছিল বটে, কিন্তু সে সময়ে বঙ্গদেশে উহা মুদ্রিত করিবার বিশেষ সুবিধা ছিল না। শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের কতকগুলি রাগিণী সংগ্রহের ইংরাজী স্বরলিপি সেকালের ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোম্পানির প্রসিদ্ধ যন্ত্রালয় ষ্টানহোপ প্রেসে প্রস্তরলিপির সাহায্যে অনেক ব্যয়ে মুদ্রিত হইয়াছিল। ইতিমধ্যে ভক্তিভাজন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উর্ব্বর মস্তিষ্ক হইতে শূন্যমাত্রিক এক স্বরলিপি আবিষ্কৃত হইল। এই স্বরলিপি ছাপিবার জন্য বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় নাই, কারণ ইহার বর্ণমালা বঙ্গভাষায় প্রচলিত অক্ষর ব্যতীত অন্য কিছুই ছিল না। ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর সেই স্থূল স্বরলিপি অপেক্ষা দ্বিজেন্দ্রনাথের স্বরলিপি অনেকটা সহজবোধ্য হইয়াছিল। আমাদের যতদূর স্মরণ হয়, এই স্বরলিপি সর্ব্বপ্রথম 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'তে প্রকাশিত হইয়াছিল।

এই স্বরলিপি প্রকাশিত হইবার পর শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী পূজনীয়া শ্রীমতী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সম্পাদনে "বালক" নামে এক মাসিকপত্র

প্রকাশিত হইয়াছিল। সে সময়ে ইহাতে নানাবিধ অপ্রকাশিতপূর্ব্ব বিষয় সকল স্থান পাওয়াতে "বালক" অতি শীঘ্র সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। সেই সকল নূতন বিষয়ের অন্যতর হইতেছে দ্বিজেন্দ্রনাথের সরল স্বরলিপিতে গান প্রকাশ করা। রাগরাগিণীর সুর স্বরলিপিতে প্রকাশ করা বড় কঠিন কার্য্য নহে, কিন্তু তাহার লয় বা তাল ঠিক করিয়া ধরা ও যথাযথ বিভক্ত করিয়া প্রকাশ করাই অত্যন্ত কঠিন। এখন অবশ্য স্বরলিপিকারগণ স্বরলিপি কার্য্যের কাঠিন্য তত উপলব্ধি করিতে পারেন না। কিন্তু যাঁহারা স্বরলিপি প্রকাশের প্রথম অবস্থা জানেন, তাঁহারাই বলিতে পারেন যে, স্বরলিপিতে চৌতাল প্রভৃতি কঠিন তাল সকল যথাযথ প্রকাশ করিবার জন্য পথপ্রদর্শকদিগকে কি প্রকার পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। তখন বলিতে গেলে একমাত্র হিতেন্দ্রসহায় প্রতিভা দেবী ব্যতীত অন্য কেহই একার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার উপযুক্ত লোক ছিলেন না। বালকে প্রতিভা দেবী কর্তৃক লিপিবদ্ধ "চতুরঙ্গ" গানের স্বরলিপি সঙ্গীতরাজ্যে এক নূতন যুগের অবতারণা করিয়াছিল বলিতে হইবে।

দ্বিজেন্দ্রনাথের শূন্যমাত্রিক স্বরলিপি অপেক্ষাকৃত সহজবোধ্য ও সহজ মুদ্রণ-যোগ্য হইলেও ইহাতে আরও অনেক উন্নতি করিবার অবসর ছিল। সেই স্বরলিপিকে সরলতর ও সম্পূর্ণতর করিবার জন্য চেষ্টা করিতে করিতে পূজনীয় শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহারই সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত আকারে আকার-মাত্রিক এক নূতন স্বরলিপির উদ্ভাবন করিলেন। এই স্বরলিপি সরলতর ও পুষ্টতর হইবার কারণে মাসিকপত্রের রাজ্যের চারিদিক হইতে ইহার জন্য আবেদন পড়িতে লাগিল। জ্যোতিরিন্দ্র বাবুও অক্লান্ত পরিশ্রমে নানাবিধ সঙ্গীত এই স্বরলিপিতে লিপিবদ্ধ করিয়া নানা মাসিকপত্রে প্রকাশ করাতে ইহা বহুল প্রচলিত হইয়া পড়িল। প্রকৃতপক্ষে স্বরলিপিযুগের স্থিতির সূত্রপাত হইয়াছে জ্যোতিরিন্দ্র বাবুর আকারমাত্রিক স্বরলিপির প্রকাশ হইতে। এই স্বরলিপির বহুল প্রচারে (তদানীন্তন লালবাজারের মোড়ে অবস্থিত) ডোয়ার্কিন এণ্ড সন কোম্পানী, ৺উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, শ্রীমতী প্রতিভা দেবী, শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী ও শ্রীমতী সরলা দেবী বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। এই স্বরলিপিতে লিপিবদ্ধ গীতপুস্তকাদির সাহায্যে আজ গৃহে গৃহে সঙ্গীতচর্চ্চা হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

এই স্বরলিপির যুগে স্বরলিপিকে সরলতম ও পূর্ণাবয়ব করিবার জন্য প্রতিভা দেবীর ভ্রাতা হিতেন্দ্রনাথও সাংখ্য স্বরলিপি নামে সংখ্যামাত্রিক আর একটী স্বরলিপির উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। উক্ত স্বরলিপিতে লিপিবদ্ধ অনেক ভাল

ভাল সঙ্গীত নানা মাসিকপত্রে আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। সম্ভবতঃ তাঁহার অকালমৃত্যুতে ইহার সম্যক প্রচলন হইতে পারে নাই।

জ্যোতিরিন্দ্রবাবুর স্বরলিপির সাহায্যে যখন গৃহে গৃহে সঙ্গীতচর্চ্চা হইতে লাগিল, তখন সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেরই হৃদয়ে রীতিমত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সঙ্গীতাদি শিক্ষা দিবার জন্য একটী বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করিবার ইচ্ছা জাগরূক হওয়া কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নহে। প্রতিভা দেবীর মনে অনেক দিন অবধি এইরূপ একটী ইচ্ছা অস্ফুট আকারে জাগরূক হইতেছিল, কিন্তু এরূপ বিদ্যালয়ের ছাত্র পাওয়া যাইবে কি না সন্দেহ করিয়া অনেকদিন পর্য্যন্ত তিনি এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস করেন নাই। ক্রমে তিনি যখন তাঁহার স্থাপিত আনন্দ সভার বাৎসরিক অধিবেশনে সমাহূত এবং সঙ্গীত ও যন্ত্রবাদ্য শ্রবণে পরিতৃপ্ত ভদ্রমণ্ডলীর নিকটেও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গীতশিক্ষা দিবার জন্য একটী বিদ্যালয়ের অভাব অনুভবের আভাস পাইলেন, তখন তিনি ঐরূপ একটী বিদ্যালয় সংস্থাপনে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার অব্যক্ত ইচ্ছা ব্যক্ত আকার ধারণ করিয়া সঙ্গীতসঙ্ঘে পরিণত হইল। ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ১০ই আগষ্ট দিবসে রাখি-পূর্ণিমা তিথিতে সঙ্গীতসংঘ প্রথম স্থাপিত হয়।

যে সকল মহান্ উদ্দেশ্য লইয়া সংঘ জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সেই সকল উদ্দেশ্য সাধন বিষয়ে সংঘই সর্ব্বপ্রথম অগ্রসর হইয়াছে। হইতে পারে যে এখানে একটী ক্ষুদ্র বিদ্যালয় কেহ খুলিয়াছেন, অথবা ওখানে কেহ ভারতীয় গীতবিদ্যাবিষয়ক দু'একখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু সকল উদ্দেশ্যকে সম্বদ্ধ করিয়া সম্বদ্ধ ভাবে সকল উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা বিষয়ে সংঘই সর্ব্বপ্রথম।

সংঘের উদ্দেশ্য সমূহের মধ্যে কয়েকটী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—(১) ভারতীয় সর্ব্বপ্রকার গীত ও যন্ত্রবাদ্য জাগ্রত করা ও সাধারণ্যে প্রচার করা, (২) ভারতীয় সঙ্গীতের একটী ইতিহাস প্রণয়ন, (৩) বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, (৪) সর্ব্ববিধ ভারতীয় গীতবিদ্যার জন্য একটী সাধারণ স্বরলিপি নির্দ্দিষ্ট করা, এবং (৫) মধ্যে মধ্যে সাঙ্গীতিক সম্মিলনের ব্যবস্থা করা।

আমাদের স্মরণ হয় যে, প্রতিভা দেবীর সঙ্গীতজ্ঞ ভ্রাতা হিতেন্দ্রনাথ ভারতীয় সঙ্গীত এবং তানসেন প্রভৃতি অনেকগুলি সঙ্গীতজ্ঞ সুপ্রসিদ্ধ মহাপুরুষের ইতিবৃত্ত নানা মাসিকপত্রে প্রকাশ করিতেছিলেন। শ্রীযুক্ত ঋতেন্দ্রনাথ তাঁহার অগ্রজ হিতেন্দ্রনাথের অনেকগুলি কবিতা সংগ্রহ করিয়া "হিতগ্রন্থাবলী" নামে প্রকাশ করিয়া বঙ্গবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। প্রতিভা দেবী অথবা ঋতেন্দ্রনাথ,

ইহাদিগের মধ্যে কেহ কি সেই সকল ইতিবৃত্ত সংকলন করিয়া সংঘের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সংসাধনে সহায়তা করিবেন না? আমরা দেখিতেছি যে, সর্ব্ববিধ ভারতীয় গীতবিদ্যার জন্য একটী সাধারণ স্বরলিপি নির্দ্দিষ্ট করিবার জন্য একটী আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছে। বরোদা নগরে সমাহূত "ভারতীয় মহাসঙ্গীত সভা" যে সকল উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, একটী সাধারণ স্বরলিপি নির্দ্দিষ্ট করা তাহাদিগের অন্যতর বলিয়া স্থির হইয়াছে। আমরা আশা করি যে সংঘ ও মহাসঙ্গীতসভা মিলিত হইয়া উভয়েরই স্থিরীকৃত এই উদ্দেশ্যটী সংসাধিত করিয়া ভারতবাসীর মহান উপকার করিবেন।

সংঘের মহত্তম উদ্দেশ্য হইতেছে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ভারতীয় সঙ্গীত শিক্ষা দিবার জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রতিভা দেবী যেরূপ অদম্য উৎসাহ প্রকাশ করিতেছেন, সত্য সত্যই তাহার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। এখানে পুরুষদিগের হইতে পৃথক দিনে মহিলাদিগের পরিদর্শনে মহিলাদিগকে গান ও যন্ত্রবাদ্য শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়া সংঘের কর্ত্তৃপক্ষ বড়ই ভাল কাজ করিয়াছেন। অর্থের অভাবে বা অন্য কোন কারণে সংঘের পরিপুষ্টির অভাব হইলে অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হইবে সন্দেহ নাই। এই সংঘ হইতে সুভাব সঙ্গীত সকল দেশবিদেশে প্রচারিত হইয়া দেশের মানসিক, নৈতিক প্রভৃতি সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনের কিরূপ সহায় হইবে, তাহা এখন আমরা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না।

প্রতীক্ষায়।

[লেখক—শ্রীঅবনীকুমার দে।]

সে রূপ কোথায় আজি পাই না তাহার দেখা,
সে চাহনি কোথা আজি অমিয়-করুণা-মাখা।
কোথায় প্রাণের সেই সোহাগ-নির্ঝর-ধারা,
সে মূরতি কোথা আজি নিখিল-ভুবন-ছাড়া!
কোথা সে প্রিয়কণ্ঠ মঙ্গল মধুর বাণী,
মানস-তিমির-হরা প্রাণের প্রতিমাখানি।
আমি যে তাহারি আশে একেলা এ নিরালায়,
শূন্য এ মন্দিরে আজি বসে আছি প্রতীক্ষায়।

সাহিত্য-প্রসঙ্গ।

[লেখক—শ্রীঅমূল্যচরণ সেন।]

আষাঢ় মাসের "ভারতী" পড়িলাম। বর্ষার সময়ে মহীলতার দল যেমন মরিবার জন্যই মাটীর ভিতর হইতে বাহির হইয়া পড়ে, চারি দিকে ধিক্কারের ধারাবর্ষণে প্রস্তুত হইয়া স্বেচ্ছাচারী সাহিত্যিক-মহীলতার দলও তেমনই কাঁদিবার জন্যই বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল ও স্বেচ্ছাচারীদের যে ধর্ম্ম স্বাভাবিক তাহা তাহারা ভুলে নাই; অর্থাৎ আত্মগোপনের চেষ্টা করিয়াছে। এখানে আত্মগোপন অর্থে নাম না ছাপান। ছিঃ! এই ভীরুতা লইয়া কি সাহিত্যের মণ্ডপে প্রবেশ করিতে আছে?

* *
*

'স্বেচ্ছাচারী', 'উচ্ছৃঙ্খল' 'কালাপাহাড়ের দল' যে তোমাদিগকে বলি,—ইহা গায়ের জোরে বলি না বা বলিতেও প্রবৃত্তি হয় না। কিন্তু এই বিশেষণগুলি যে তোমরা কড়ায় গণ্ডায় দাবী করিতেছ। আমরা করিব কি? কথাগুলা চোখে আঙ্গুল দিয়াই দেখাইয়া দিতেছি। বাঙ্গালা ভাষার উপর তোমাদের অত্যাচার যে কি ভীষণ হইয়া পড়িতেছে, তাহা দেশের লোকের লক্ষ্যের বিষয়ীভূত হওয়া উচিত। জীববিশেষের কণ্ঠে মুক্তার মালার যে অবস্থা হইয়াছিল বলিয়া শুনা যায়, মাতৃভাষার অবস্থা তোমাদের হাতে পড়িয়া তাহা অপেক্ষা অধিক শোচনীয় হইয়াছে। মাতৃস্বরূপিনী মাতৃভাষাকে তোমরা কি ভাবে লাঞ্ছিত করিতেছ, তাহা আমরা একে একে দেখাইয়া দিতেছি ঃ—

(১) "নাকটী টিকলো; কিন্তু তার দুপাশের গাল এমন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে যে মনে হয় একটা সরল রেখা যেন শূন্যে ঝুলিতেছে।"

ভাষায় ভাব-প্রকাশের দৈন্য হইলে লেখকের বুদ্ধির "রেখা"ও এইরূপ 'শূন্যে ঝুলে।'

(২) "পৃথিবী হইতে একেবারে আল্‌গা!"

ইহা কি 'absolutely aloof from the earth'র অনুবাদ নহে? এই ইংরেজী শব্দ কয়টী যে ভাব প্রকাশ করিতেছে, তাহা উদ্ধৃত বাঙ্গালা বাক্যটীতে প্রকট হইয়াছে কি?

(৩) "সে তখন হাঁটু দেখাইল। সেখানটা কাটিয়া একাকার হইয়াছে।"

হাঁটু 'কাটিয়া একাকার' হয়, বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস, ভারতচন্দ্র-কবিকঙ্কণ, রামমোহন-তারাশঙ্কর, বিদ্যাসাগর অক্ষয় দত্ত, বঙ্কিম-ভূদেব—এমন কি রবীন্দ্রনাথের 'নূতন-কাঁচা' সবুজপত্র পর্য্যন্ত এমন

ভাষা লিখিতে পারেন নাই। তবে মণিলাল লিখিলেন কেমন করিয়া? ইহার উত্তর আছে। অথায় যাহার প্রয়োগ নাই, মানুষের মুখের কথায় যাহা কখনও ব্যক্ত হয় নাই, তাহা লিখিলেই সুনাম না হউক, মোটামুটী একটা নাম অর্জ্জন করা যায়! দুঃসাহস এবং লজ্জার অভাব না হইলে লোকের কলম হইতে এমন উদ্ভট ভাষা বাহির হয় না। ইহা নূতনত্ব না যথেচ্ছাচার?

(৪) "কপালের সেই রাঙা টিপটীর উপর প্রজাপতির মতো ডানা ছড়াইয়া সূর্য্যের রশ্মিরেখা আসিয়া পড়িতেছিল।"

'সূর্য্যের রশ্মিরেখা' 'প্রজাপতির মতো ডানা ছড়াইয়া' 'রাঙা' টিপের উপর 'আসিয়া পড়িতে' কেহ কখনও দেখিয়াছেন বা শুনিয়াছেন কি? মণিলালের ভাষা-প্রতিভা এই নূতন উপমার রাগিণী দেশবাসীকে শুনাইয়া দিয়াছেন। এইটী কি রাগিণীর সপ্তত্রিংশ রূপ?

তার পর শ্রীযুত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তুলির 'পোঁচে' ভাষা-জননী কেমন চূণ-কালী মাখিয়াছেন, তাহা দেখাইতেছি :—

(১) "দিন এখানে আস্‌ছে—উত্তাপহীন অনুজ্জ্বল; রাত আস্‌ছে—অঞ্জনশিলার মত হিম অন্ধকার।"

(২) "আজকের সন্ধ্যাটী শীতাতুর কালো হরিণের মতো পাহাড়ের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালো—অন্ধকারের দিকে মুখ করে। কলঙ্ক-ধরা একখানা কাঁসরের মতো গভীর রাত্রিটাকে কালো ডানার ঝাপটায় বাজিয়ে তুলে মস্ত-একটা বড় আজ মাথার উপরে ক্রমান্বয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে —যেন দিশেহারা পাগল পাখি।"

(৩) "সুদূর গিরি-শিখরে,মেঘলহরীর তীরে,বনের পাখির কণ্ঠে,নিহারের (?) যবনিকা ঠেলে বাহিরে ছুটে এসেছে পর্ব্বতের কলভাষী দুরন্ত শিশু—এই-যে জলধারা এর ঝরে-পড়ার মধ্যে!"

(৪) "সিন্ধবাদের বিকটাকার বুড়োটার মত সে আপনার সঞ্চিত কাজের বাজের মূল্যবান অথচ মূল্যহীন আসবাবের আবর্জ্জনাকে বয়ে চলেছে দেখেছি—বোঝার ভারে নুয়ে পড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে।"

(৫) "বসন্তে ফুলের ভারে এরা নুয়ে পড়েছিল দেখেছি, আর আজ দুদিন পরে বরফের পীড়ন সুদীর্ঘ শীতের দিন-রাত্রিতে বহন করবে এরাই অনায়াসে,—ফুলেরই মতো পাতারই মতো!"

(৬) "বসন্তের বুল্‌ বুল্‌ নয়, তুষারের সাদাপাখি একে ডেকেছে—শূন্যতার ঐ ওপর থেকে।"

এগুলা সাপ কি বেঙ; ছুঁচা কি ইঁদুর; বাঙ্গালা কি উর্দ্দু; লেপ্‌চা কি গারো;—তাহা কেহ আমাদিগকে বলিয়া দিবেন কি?

* *
*

"চল্‌তি ভাষা"র লেখক 'ভারতী'তে প্রকৃত নাম গোপন করিয়াছেন। কেন? ইহা সবুজ-তন্ত্রের একটী অঙ্গ না কি? কিন্তু নামগোপন করিলে কি হয়, 'প্রতিভাবান্‌ সারথি' যে 'গ্রামের মাঝখান' দিয়া রথ চালাইতেছেন।

'চল্‌তি ভাষা'র লেখক প্রথমেই লিখিয়াছেন,—

"বাংলা সাহিত্য চলে এতে অনেকের আপত্তি দেখা যাচ্ছে। অর্থাৎ, তাঁরা বলচেন, সাহিত্যের বাহন ভাষা যেন চল্‌তি না হয়।"

গায়ের জোরে এ কথা বলিলে ত চলিবে না। বাঙ্গালা ভাষা অচল হইয়া স্থাণুবৎ দাঁড়াইয়া থাকিবে, উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে না,—কোনও মাতৃ-ভাষানুরাগী বাঙ্গালী এমন কথা বলিতে পারে না। প্রকৃতির নিয়মেও কোনও জিনিষ এক জায়গায় স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না; হয় তাহাকে অগ্রসর হইতে, নতুবা পাছু হটিতে হইবে। প্রকৃতির নিয়মে, কালধর্ম্মে বাঙ্গালা ভাষাও তেমনই এক স্থানে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না। প্রাকৃতিক নিয়মে ইহা সতত সচল। ভাষার সচলতার বিরুদ্ধে কেহ কোনও দিন আপত্তি উঠাইয়া বলে নাই যে, উহার গতিরোধ কর। সুতরাং 'বাংলা সাহিত্য যে চলে এতে অনেকের আপত্তি দেখা যাচ্ছে',—এ কথাটা নিতান্তই ভিত্তিহীন।

আসল কথা এই,—ভাষার সজীবতা বা সচলতার বিরুদ্ধে, উহার প্রকৃত সংস্কারের বিরুদ্ধে কোনও বুদ্ধিমান ব্যক্তি আপত্তি তুলিতে পারে না। তবে যখন দেখিতে পাওয়া যায় যে, সংস্কারের নামে স্বেচ্ছাচার চলিতেছে, সজীবতার স্থান উচ্ছৃঙ্খলতা অধিকার করিয়াছে, তখন সে যথেচ্ছাচারকে সংযত করিবার প্রয়োজন হয়।

তোমরা ত ভাষার সংস্কার করিতেছ না, তোমরা ভাষার উপর যথেচ্ছাচার আরম্ভ করিয়াছ। সংযমের গণ্ডী ছাড়িয়া, বিধি-নিষেধের এলাকা অতিক্রম করিয়া তোমরা উদ্দাম হইয়া ছুটিয়াছ; তোমাদিগকে প্রশ্রয় দিলে মাতৃভাষার পবিত্র অঙ্গন যে লণ্ডভণ্ড হইয়া যাইবে।

* *
*

তোমরা ত বলিতেছ, আমরা 'চল্‌তি ভাষা'য় সাহিত্য গড়িতেছি। কিন্তু 'চল্‌তি ভাষা' কাহাকে বলে? যে ভাষায় লিখিলে দশ জনে লেখকের বক্তব্য বুঝিতে পারিবে না, তাহাই কি 'চল্‌তি ভাষা'? কেবল ক্রিয়াকে বিকৃত করিলেই কি 'চল্‌তি ভাষা' হয়?

বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন,—"যে দেশের সাহিত্যে সাধারণবোধগম্য ভাষাই সচরাচর ব্যবহৃত হয়, সেই দেশের সাহিত্যই দেশের মঙ্গলকর হয়।" কিন্তু তোমরা যে 'চল্‌তি ভাষা' লিখিতেছ, তাহা সাধারণের বোধগম্য ভাষা নহে। ক্রিয়াগুলিকে অপভ্রংশ করিলে বা 'নূতনে'র স্থলে 'নতুন' লিখিলে ভাষা সাধারণের

বোধগম্য হয় না; বরং উহা প্রাদেশিকতাদোষে দুষ্ট হইয়া সকল জেলার বাঙ্গালীর পক্ষে দুর্ব্বোধ হইয়া উঠে। এ কথাটা বুঝিবার জন্য বেশী দূর যাইতে হয় না। বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রথম যুগের 'পণ্ডিতী' ভাষা ও 'দুলালী' ভাষা এখন সাহিত্যে চলে কি? তারাশঙ্করের ভাষা বা টেকচাঁদের ভাষা—ইহাদের কোনওটী আদর্শ বাঙ্গালা ভাষা হয় নাই। এই দুইটীর কোনওটীতে আধুনিক বাঙ্গালা গদ্যের ছাঁচ তৈয়ারী হয় নাই। দুইটীর সামঞ্জস্যে বাঙ্গালা ভাষার একটী স্বরূপ তৈয়ারী হইয়াছে, একটা ছাঁচ গড়িয়া উঠিয়াছে। এই ছাঁচের উপর কারিগরী করিতে পার, কিন্তু ছাঁচ বদল করা অসম্ভব। 'সবুজতন্ত্রে'র আচার্য্য রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার সহকারী মাতৃভাষার এই ছাঁচ বদল করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন, কিন্তু তাহা অসম্ভব। এ অসম্ভব সম্ভব করিতে গেলে 'প্রতিভার রথ' যতই মজবুত হউক, এবং তাহা ঢাকা-কলিকাতা, মেদিনীপুর-ময়মনসিংহ যেখান দিয়াই চলিতে চেষ্টা করুক, উল্‌টিয়া পড়িবে।

* *
*

"বাংলার প্রাচীন পদাবলী হেঁয়ালির মতো"—'চল্‌তি ভাষা'র লেখক এমন কথা বলিয়াছেন। প্রাচীন পদাবলীর শব্দার্থ আজকাল আমাদের জানা নাই বলিয়া প্রাচীন পদাবলীর অর্থবোধে বিভ্রাট ঘটে। কিন্তু যেই সেই শব্দগুলির অর্থবোধ হয়, তখনই তাহাদের ভাব বুঝিতে আর কষ্ট হয় না। প্রাচীন সাহিত্য সকল দেশেই আধুনিক সাহিত্য হইতে একটু স্বতন্ত্র থাকে। "Old English" কি "Modern English" হইতে একটু স্বতন্ত্র নহে? বাঙ্গালার প্রাচীন পদাবলী সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। পদাবলীর শব্দার্থ জানিতে পারিলে ভাববোধে ব্যাঘাত ঘটে না। কিন্তু আধুনিক 'সবুজতন্ত্রে'র কি গদ্য, কি পদ্য শব্দার্থ জানা থাকিলেও তাহাদের ভাব-বোধ অসাধ্য। কারণ সেগুলিতে যে কেবল 'গন্ধ'! ইঁহাদের রচনা দেখিয়া বঙ্কিমবাবুর ভাষায় বলা চলে,—"ইঁহাদের বিবেচনায় যত অল্প লোকে ইঁহাদিগের ভাষা বুঝিতে পারে, ততই ভাল।"

* *
*

"রোঁদার শিল্পচাতুর্য্য"—যিনি লিখিয়াছেন তিনি নিজে কি বলিতেছেন, কি লিখিতেছেন তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন নাই; পাঠককে বুঝান ত দূরের কথা।

"সৌন্দর্য্যই হচ্চে স্বভাব। প্রকৃতিতে, মানবদেহে যতটা স্বভাব আছে, এমন আর কিছুতে নয়। শক্তি-সৌন্দর্য্যে রমণী-তনু কত সময় কত রকমের ছবির আভাস দেয়।"

বিদ্যালয়ের বালকেও বোধ হয় ইংরেজীর এমন তর্জ্জমা করে না।

এইরূপ জটিল ভাষায় বক্তব্যকে পাঠকের অবোধগম্য করিয়া 'ভারতী'র পৃষ্ঠায় নাম ছাপান চলিতে পারে, লেখনী-ধারণের আসল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যায়। প্রবন্ধটী পড়িয়া মনে হয়, লেখকের শিল্প-সম্বন্ধে আজিও অক্ষর-পরিচয় মাত্র হয় নাই। এই রচনায় একটী নূতন প্রয়োগ আছে,—আধুনিক কিংশুক-জাতীয় কবিগণ তাহার ব্যবহার করিতে পারেন। প্রয়োগটী এই—"অন্তর্গূঢ় প্রদীপ"।

* *
*

রবীন্দ্রনাথের 'সবুজতন্ত্র' ক্রমশই লোকের বিরাগভাজন হইয়া উঠিতেছে। তাঁহার উদ্ভট ভাষা, উদ্ভট কল্পনা ও বিকট হিন্দুবিদ্বেষের জন্য তিনি ইদানীং দেশের লোকের অসম্মান ও অবিশ্বাস অর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। চারি দিকে তাঁহার কার্য্যের তীব্র নিন্দা চলিতেছে।

'নায়কে' সাহিত্যরথী শ্রীযুত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন ঃ—

"বিদ্যাসাগর বাঙ্গালা গদ্যের যে আকার ঠিক করিয়া গিয়াছেন, তাহা আর সহজে বদলাইবে না। বঙ্কিমচন্দ্র ছাঁচের উপর একটু কারিকরী করিয়াছিলেন মাত্র, ছাঁচ বদ্‌লান নাই। রবীন্দ্রনাথ ছাঁচ বদলাইতে চাহিতেছেন, তাহা হইবার নহে। কারণ, বিদ্যাসাগরী ছাঁচ বাঙ্গালার সর্ব্বত্র পঞ্চাশ বৎসরকাল স্কুলে, কলেজে, পাঠশালায় সমানভাবে চলিতেছে, সকল সমাচারপত্র ঐ ছাঁচে লেখা। যেমন বিদ্যাসাগরের টাইপের কেস্ বদলাইবার উপায় নাই, তেমনি ভাষাও বদলাইবে না। উহা যে সর্ব্বজনসমাদৃত এবং ব্যবহৃত। উহার ব্যাপ্তি অত্যধিক, উহার গভীরতা প্রগাঢ়। একা রবীন্দ্রনাথ জনকয়েক চেলাচামুণ্ডার সাহায্যে বাঙ্গালার গদ্যসাহিত্যের ছাঁচ বদ্‌লাইতে পারিবেন না। এইটুকু আমরা স্থির জানি বলিয়াই রৈবী ঢঙ্গকে এত দিন হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছি, পরেও দিব। রবীন্দ্রনাথ যত বড় কবি হউন না, যেমন মেধাবী মনস্বী হউন না, বিশ্বামিত্রের সৃষ্টি করিবার উৎকট সাধনা তাঁহার নাই। তিনি বিদেশের ঠাকুর হইলেও স্বদেশের ছত্রিশ জাতির দেবতা হইতে পারেন নাই; তাঁহার ভাষার ব্যাপ্তি নাই, বিস্তার নাই—হইবেও না। কলিকাতার ছোক্‌রা-মহলে তিনি ঋষি হইতে পারেন, স্বয়ংসিদ্ধ দুই একজন সাহিত্য-সেবীর গাত্র-কণ্ডূতির হেতু তিনি হইতে পারেন, কিন্তু বাঙ্গালার সাধারণ শিক্ষিত সমাজে তাঁহার প্রভাব বড়ই কম। তিনি যত দিন বাঁচিয়া থাকিবেন, তত দিন একটা হুজুগ চলিতে পারে,—চলিবেও। যাহারা দেশের দশ জনকে লইয়া চলে, তাহারা রবির খোস্‌খেয়াল অবহেলা করে। তবে স্বেচ্ছাচারের শাসন হওয়া কর্ত্তব্য।"

* *
*

রবীন্দ্রনাথ-সম্বন্ধে শ্রীযুত অকিঞ্চন দাস "২৪ পরগণা-বার্ত্তাবহ" নামক সাপ্তাহিক পত্রে লিখিয়াছেন ঃ—

ভেল্কী জগতে চিরদিন টিকে না, মানুষের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে তাহার ভেল্কী বাজীও চিরকালের মত অবসান প্রাপ্ত হয়। আমার বিশ্বাস, রবীন্দ্রনাথের প্রভাব শুধু তাঁহার জীবনকাল পর্য্যন্ত। অতঃপর আবার বাঙ্গালা সাহিত্যে নবযুগের উদয় হইবে। আমি সাহিত্যের প্রকৃত শ্রীবৃদ্ধি চাই; তাই দেশের ও দশের দিকেও আমায় চাহিতে হয়। কবিজনোচিত দানের অপেক্ষা ব্যর্থ অনুকরণ লালসাই তাঁহার বেশী।"

* *
*

"রবীন্দ্রনাথের কবিতায় প্রকৃত আন্তরিকতারই প্রধান অভাব। আন্তরিকতা-গুণেই প্রতিভার পরিচয়—সে পরিচয় রবীন্দ্রনাথের ভিতর বড়ই অল্প! রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ কবিতাই বাহ্য-ড়ম্বরময়। তাহা কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশে না। তাহার কারণ কি?—তাহার কারণ অনুকরণ।

"রবীন্দ্রনাথের রূপ বহু; তিনি সাজিতে আসিয়াছিলেন, সাজিয়া যাইবেন। তিনি প্রথম বয়সে Shelly সাজিয়াছিলেন, তাহার পর হুইটম্যান, মৈতরলিঙ্ক এবং এখন সবুজপত্রে ইব্‌সেন সাজিতেছেন—কি গদ্যে, কি পদ্যে, কি যৌবনে, কি প্রৌঢ়ে, তিনি কেবলই সাজিতেছেন। তিনি যাহা নন তাহা সাজিতে গিয়াই ত পদে পদে তাঁহার প্রয়াস ব্যর্থ! অবশ্য তাঁহার আর্থিক সুবিধা আছে বটে, Scottএর ন্যায় যথেষ্ট আয় হইতেছে বটে, কিন্তু আমি বলিতে পারি তাঁহার এই অভাবনীয় উত্থান জীবদ্দশা অবধিই থাকিবে। এখন তিনি ইউরোপ ও আমেরিকার চক্ষে ধাঁধাঁ লাগাইতে পারেন, কিন্তু শেষ রক্ষা হইলে হয়। এখন তিনি মূর্খ বাঙ্গালী জাতির চক্ষে ধুলি দিয়া বাহবা লইতে পারেন বটে, কিন্তু এ সুযোগ চিরকাল রহিবে না। যখন বঙ্গের সাহিত্যসেবী মাত্রেই তিন চারিটী করিয়া পাশ্চাত্য ভাষায় দীক্ষিত হইবে, তখন রবীন্দ্রনাথ যে কত বড় অনুকরণপ্রিয় কবি তাহা ধরা পড়িয়া যাইবে। কবি বলিয়াছেন, Talent is the god of moments whereas Genius is the god of ages. রবীন্দ্রনাথের Talentই বা কতটা এবং Geniusই বা কতটা তাহা এখনও নিরূপণ করিবার সময় আসে নাই। রবীন্দ্র-নাথের নিজস্বই বা কতটা এবং অনুকরণবাহুল্যই বা কিরূপ, সময়ই তাহার মীমাংসা করিবে।

"রবীন্দ্রনাথের ভাব যেমন বিকট, ভাষাও তেমনি উদ্ভট। এ মনগড়া ভাষা কত দিন টিকিবে, তাহাতেও আমাদিগের সন্দেহ আছে। * * * অথচ রবীন্দ্রনাথের মনে মনে একটা অহঙ্কার আছে যে, তিনি তাঁহার প্রাদেশিকতা-দুষ্ট ভাষায় দেশের চাষা-মজুরদের বেশ বুঝাইতেছেন। হায় ভাগ্য, যে ভাষা ব্রজেন্দ্র শীল প্রভৃতি ক্ষণজন্মা পণ্ডিতগণই বুঝিতে পারেন না, সে ভাষা চাষা-মজুরে কেমন করিয়া বুঝিবে? মাননীয় কাশিমবাজারাধিপতি বলিতেছেন—"ঐ ভাষা ও ভাব লেখকের ভাষা ও ভাবদৈন্যের সূচক। অশিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা একটা ভাণ মাত্র।"

"রবীন্দ্রনাথ Genius কি না, তাই ভাষা-দেবীকেও মনগড়া করিয়া লইয়াছেন। সাধারণের ভাষাকে অসাধারণ করিয়া তুলিয়াছেন। দেখুন, একবার চাষা-মজুরদের বুঝাইবার পদ্ধতি। যথা—

"সে যে দেখেছি আমার চিত্তাকাশে ভোর বেলাকার অরুণরাগরেখার মত। আমার জীবনের দিন যে সেই সোনার পাথেয় নিয়ে যাত্রা করে বেরিয়েছিল। তার পরে? পথে কালের মেঘ কি ডাকাতের মত ছুটে এল? সেই আমার আলোর সম্বল কি এক কণাও রাখ্‌ল না? কিন্তু জীবনের ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে সেই যে উষা সতীর দান, দুর্য্যোগে সে ঢাকা পড়ে তবু সে কি নষ্ট হবার?"

"সুধী পাঠকবর্গ কিছু বুঝিতে পারিলেন কি? ইহাই কি সহজবোধ্য ভাষা? আমরা মূর্খ হইলেও ইব্‌সেন বুঝিয়াছি, নীট্‌সে বুঝিয়াছি, হুইটম্যান বুঝিয়াছি, এমন কি রবিবাবুর আদর্শ মৈতরলিঙ্ককেও বুঝিয়াছি, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ রবীন্দ্রনাথের ভাবের ভিতর বহু আয়াস স্বীকার করিয়াও প্রবেশ করিতে পারিতেছি না। তার পর আরও মজা দেখুন। রবীন্দ্রনাথের "ফাল্গুনী" পণ্ডিত ব্রজেন্দ্র শীলের দুর্ব্বোধ্য হইলেও রবিভক্তেরা বেশ বুঝিতে পারে। বাঙ্গালার প্রবীণ দার্শনিকশ্রেষ্ঠ যে রচনার ভিতর তলাইতে পারেন না, বাঙ্গলার নবীন-নবীনাগণ তাহা অনায়াসে বুঝিয়া চলে, ইহার অর্থ কি? ইহা কি ব্রজেন্দ্র শীল প্রভৃতি মনীষিগণের প্রবীণ বয়সের দোষ, না নবীন-নবীনাগণের সবুজ যৌবনের দোষ? বুঝি তাহাদের চশমা বুঝে, চোখ বুঝে না—কাণ বুঝে, মন বুঝে না। ইহাই রবীন্দ্রনাথের বিশেষত্ব।"

সহযোগী "রাণাঘাট বার্ত্তাবহ" হইতে প্রথিতযশাঃ সুকবি শ্রীযুত গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়-রচিত দুইটী প্রবন্ধ আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। একটীর নাম—"সাহিত্যে কালাপাহাড়" ও অপরটীর নাম—"সাহিত্যে স্বেচ্ছাচার।" একটীতে রবীন্দ্রনাথ ও অপরটীতে তাঁহার সেনাপতি শ্রীযুত প্রমথ চৌধুরীর সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধ দুইটীতে লোকমতের অভিব্যক্তি আছে বলিয়া এইগুলি 'অর্চ্চনা'য় প্রকাশিত হইল :—

সাহিত্যে কালাপাহাড়।

ইতিহাসের কালাপাহাড় শক্তিমান্ পুরুষ ছিল—তেজোদপ্তের অবতার ছিল; পরন্তু পাহাড়েরই মত সে দুর্ভেদ্য—পাহাড়েরই মত সে অচল-অটল-দৃঢ়। তাই সে কালাপাহাড়। কালাপাহাড় ব্রাহ্মণবংশে জন্মিয়া—শেষে যবনত্ব প্রাপ্ত হইয়া দেব-দ্বিজ-দ্বেষী হইয়াছিল। মঠ-মন্দির-বিগ্রহ ভাঙ্গিয়া—স্বদেশ-স্বজাতিদ্রোহী হইয়া কু-কীর্ত্তির জন্য অ-খ্যাত হইয়াছিল। যুগে যুগে কালাপাহাড়ের আবির্ভাব আছে, যুগে যুগে কালাপাহাড়ের অত্যাচারে লোকে ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া থাকে। কালাপাহাড়ের অত্যাচার নূতন নহে। কিন্তু সে অত্যাচার স্থায়ী হইতে পারে না। কারণ কালাপাহাড়ের জীবন-শেষের সঙ্গে সঙ্গে অত্যাচার-উৎপীড়নও শেষ হইয়া থাকে।

আজকাল সাহিত্যেও তেমনি কালাপাহাড় দেখা দিয়াছে। ইতিহাসের কালাপাহাড়ের সঙ্গে এই কালাপাহাড়ের অনেক বিষয়েই সাদৃশ্য আছে। ইতিহাসের কালাপাহাড় যেমন দেব-দ্বিজ-দ্বেষী—শাস্ত্রের অমান্যকারী—সমাজের উপর অত্যাচারী, এ কালাপাহাড়ও তেমনি দেব-দ্বিজ-দ্বেষী—শাস্ত্রের অমান্যকারী—সমাজের উপর অত্যাচারী। সম্প্রতি এই সাহিত্যের কালাপাহাড়ের অত্যাচারে আমরা সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছি। ইতিহাসের কালাপাহাড় ভাঙ্গিয়াছিল দেব-মন্দির—দেব-বিগ্রহ; সাহিত্যের কালাপাহাড় ভাঙ্গিতেছে ভাষা-মন্দির—সাহিত্য-বিগ্রহ। যে সাহিত্য-প্রতিমা গঠনে রামমোহন-বিদ্যাসাগর-অক্ষয়কুমার, মধুসূদন-বঙ্কিমচন্দ্র-হেমচন্দ্র প্রাণপাত করিয়া গিয়াছেন, কালাপাহাড়ের হাতে সেই সাহিত্য-প্রতিমার নিগ্রহ দেখিয়া আমরা প্রমাদ গণিতেছি। কে জানিত সাহিত্যের সারস্বত-কুঞ্জে কালাপাহাড় দেখা দিবে—কে জানিত নির্দ্দয়-নির্ম্মম হস্তে তাহার মহিমা নষ্ট হইবে?

দিক্‌চক্রবালে যে প্রতিভার উদয় দেখিয়াছি, তাহারই নবারুণচ্ছটা দেখিয়া এক দিন মুগ্ধ হইয়াছিলাম! এখন ভাবিতেছি, সে মনোহর উদয় দেখিয়া কেন মুগ্ধ হইয়াছিলাম, কেন তাহাতে আশ্বস্ত হইয়াছিলাম!

কালাপাহাড় চিরদিনই 'কালাপাহাড়' ছিল না। ব্রাহ্মণ-সন্তান কালাপাহাড় ব্রাহ্মণেরই মত আচার-নিষ্ঠাপরায়ণ ছিল—দেব-দ্বিজে ভক্তিমান্ ছিল—সর্ব্বাংশেই ব্রাহ্মণ ছিল। সেই ব্রাহ্মণকুমারের এমন মতিচ্ছন্ন হইল কেন? এমন বুদ্ধি-বিপর্য্যয় ঘটিল কেন? কে তাহাকে বিপথ-চালিত করিল? কে তাহাকে বিপরীত বুদ্ধি দিল? আমরা সাহিত্যের কালাপাহাড় সম্বন্ধেও সেই প্রশ্ন করিতেছি। প্রতিভা বিকৃত হইলে—প্রতিভা প্রতীক-পন্থী হইলে কালাপাহাড়ের সম্ভব হইয়া থাকে। সাহিত্যে এক দিন এই কালাপাহাড়েরই ব্রহ্মণ্য-প্রতিভা দেখিয়াছি—হোমাগ্নির মত ব্রহ্মণ্য তেজোদীপ্তি দেখিয়াছি। সেই এক দিন, আর এই এক দিন। আজ তাহার কি অধঃপতন!

ব্রাহ্মণ কালাপাহাড়কে একদিন সৌন্দর্য্যের উপাসক কবিরূপে দেখিয়াছি—সাহিত্য-শিল্পীরূপে দেখিয়াছি—আরও কত কি রূপে দেখিয়াছি। জানি না, কোন্‌রূপে যে তাহাকে দেখি নাই। নব্য বিলাসী বাবুর আদর্শরূপে দেখিয়াছি—নব্য কবিকুলের গুরুরূপে দেখিয়াছি। তখন ত এমন অধঃপতন হয় নাই—তখন ত এমন মতিচ্ছন্ন ঘটে নাই। এই ব্রাহ্মণ কালাপাহাড়ের এক দিন দেবার্চ্চনা দেখিয়াছি—ষোড়শোপচারে বাণীপূজা দেখিয়াছি। সেই পূজা দেখিয়া এক দিন মুগ্ধ হইয়াছিলাম,—সেই পূজা দেখিয়া এক দিন ধন্য ধন্য করিয়াছিলাম। হায় রে সে দিন!

সাহিত্যে স্বেচ্ছাচার।

বঙ্কিমের তীব্র সমালোচনা যে দিন হইতে বন্ধ হইয়াছে, সেই দিন হইতে বাঙ্গালা সাহিত্য নিরঙ্কুশ বলা যাইতে পারে। 'বঙ্গদর্শনে'র পর সাহিত্যের যুগান্তর-প্রবর্ত্তক, শক্তিশালী সাহিত্য-পত্রের আর উদয় হয় নাই। 'বঙ্গদর্শনে'র পরবর্ত্তী 'বান্ধব' বা 'আর্য্যদর্শন', 'নবজীবন' বা 'প্রচার' কেহই তেমন প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে নাই। না করুক্, তাহারা 'বঙ্গদর্শনের' পন্থানুসরণ করিয়া সাহিত্যের ইষ্টসাধনই করিয়াছিল—তখনও কিন্তু বঙ্কিমের লেখনী বিশ্রামলাভ করে নাই। তার পর, উক্ত সাহিত্য-পত্র-চতুষ্টয়ের বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরবাড়ীর সাহিত্যের

অভ্যুদয়। অবশ্য তৎপূর্ব্বে 'ভারতী' ঠাকুর বাড়ীর অন্তঃপুরে অবগুণ্ঠনবতী বধূরূপেই ছিলেন। কচিৎ ঠাকুর বাড়ীর আত্মীয়-অন্তরঙ্গের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকিলেও বাহিরের সঙ্গে বড় একটা পরিচয় ছিল না। সুতরাং সাহিত্যে 'ভারতী'র প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইতে একটু বিলম্ব হইয়াছিল। তার পর, রবীন্দ্রনাথের উদয়ে গদ্য-পদ্যে সাহিত্যের ভঙ্গীর একটু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তাহাই বর্ত্তমানে ঠাকুরবাড়ীর সাহিত্য বলিয়া পরিচিত। সেই নিরঙ্কুশ সাহিত্যের কথাই আমরা বলিব। 'সাধনা'য় রবীন্দ্রনাথ যেরূপে দেখা দিয়াছিলেন, তাহাতে কে ভাবিয়াছিল, কবি-রবীন্দ্রনাথ ঋষি-রবীন্দ্রনাথ হইয়া বিশ্বামিত্রের মত পুরাতন ভাঙ্গিয়া নূতন সাহিত্য-জগৎ গড়িতে বসিবেন। রবীন্দ্রনাথের পুর্ব্বে সাধনা যে নিষ্ফল হইয়াছে, তাহার প্রমাণ তাঁহার বর্ত্তমান রচনা। তিনি 'সবুজ-পত্রে'র স্কন্ধে ভর করিয়া—ব্যারিষ্টার-জামাতা বীরবলকে সাহিত্যের নূতন বিশ্বকর্ম্মারূপে খাড়া করিয়াছেন। বলিতে কি, তাঁহার জামাতৃ-প্রীতির ফলে সাহিত্যের দেবতা অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছেন। যে বীরবলকে একদা আমরা বন্ধুবান্ধবের বৈঠকে, পরিহাসের পরিষদে বাহবা লইতে দেখিয়াছি, সেই বীরবলকে তিনি সাহিত্যের রাজসভায় আহ্বান করিয়াছেন—আসন দিয়াছেন। ইয়ারকির হাল্কা চটুল ভাষা খেয়ালের খাতায় খাপ খাইতে পারে, মজলিসে উত্তম হইতে পারে, কিন্তু রাজসভার একবারেই অযোগ্য। রবীন্দ্রনাথও যে সে কথা বুঝেন না, ইহা সম্ভব নহে। কিন্তু জানি না, কেন তিনি হঠাৎ এই বীরবলী ভাষার পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন। 'সবুজপত্র' বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ সাহিত্যের যে আদর্শ খাড়া করিয়াছেন, তাহা বীরবলের ইংরাজী নবীশ ব্যারিষ্ট্যার-বৈঠকের যোগ্য হইতে পারে, বাঙ্গালার সাহিত্য-মন্দিরের যোগ্য নহে। গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে গদ্য-সাহিত্যের এমত কিম্ভুত-কিমাকার মূর্ত্তি আমরা আর দেখি নাই। তাই বলিতেছি রবীন্দ্রনাথ,—তুমি আর যাহাই কর, সাহিত্যের মাথা খাইও না—সাহিত্যের সুপ্রতিষ্ঠিত উন্নত আদর্শকে খর্ব্ব করিও না। তুমি শক্তিমান্, তাই তোমাকে এত কথা বলিলাম। যদি পার ত 'সাধনার' যুগ আবার ফিরাইয়া আন। আমরা তোমাকে 'সাধনা'র কবি-রূপে আবার দেখিতে চাই, ঋষিরূপে,—বিশ্বামিত্ররূপে নহে।

কল্পনা ও বাস্তব।

[লেখক—শ্রীসতীশচন্দ্র বর্ম্মণ বি-এল।]

১

কল্পনায় সৃজি স্বর্গ কিন্নর অপ্সরা,
ছায়াহীন দেবগণে, অনন্ত প্রভায়,
মোহন নন্দন বন, রূপের পসরা,
অপার আনন্দে কবি স্মিতমুখে চায়।

২

নিম্নে—বহুনিম্নে ফেলি ক্ষীণ নীহারিকা,
ছুটিছে প্রসারি পাখা কবির কল্পনা,
দূরে লুটাইছে ধরা মলিন মৃত্তিকা,
ক্ষুদ্রাদপি তারকায় কে করে গণনা?

৩

অপরূপ রূপ মাঝে, মানস সৃজন,
নিমগ্ন ধরার কবি ধরায় বিস্মরি—
বসন্ত বিভব কোথা বিহগ কুজন,
সুরভিত সারাবন, পুষ্পিত বল্লরী।

৪

কোথায় হেমন্ত ধান্যে শ্যামলা ধরণী,
বরষার মেঘমালা দূরগিরি শিরে,
কলাপীর নৃত্য কলা শুনি মেঘধ্বনি,
পুণ্যতোয়া তরঙ্গিনী দুলে তীরে তীরে!

৫

কোথায় শরত-শোভা, নীল নভঃতল,
কুমুদ কহ্লার স্বচ্ছ সরসীর জলে,
ফুলবন বিথিকায় জ্যোৎস্না বিহ্বল,
উথলি পড়িছে রূপ যেন পলে পলে।

৬

ফিরিয়া না দেখে কবি বসুন্ধরা পানে,
পদতলে লুটাইছে প্রসূন সুন্দর,
নাহি শুনে কলকণ্ঠ পিককুল গানে,
শূন্যে গড়িতেছে স্বর্গ কল্পনা কাতর।

৭

হেথায় ঝরিছে উৎসে প্রেম ভালবাসা,
ধূলায় রয়েছে পড়ি লক্ষ হেম কণা,
সতত ক্ষরিছে মধু, কুহরিছে আশা,
কাননে প্রকৃতি চাহে কুরঙ্গ নয়না!

৮

অবহেলি হেন ধরা আলোক ছায়ার,
সুখ দুখে শোকহর্ষে মানব জীবন,
শিশুর মদির হাসি, মোহিনী মায়ায়
কোন কল্পনার রাজ্য করি আকিঞ্চন?

৯

আমি বরিয়াছি ধরা—বাস্তব জগৎ,
কি লাবণ্যে অভিনব—চির মনোহর।
বিশ্ব মাঝে রহিয়াছে যেন চিত্রবৎ
ঝলকি উঠিছে রূপ—সুন্দর—সুন্দর!

সাহিত্য-সমাচার

সংগ্রাম-সিংহ, বা—"Lion of the War"।—ঐতিহাসিক নাটক, মূল্য ।৹ লেখক বালক—গ্রন্থকারের নিবেদন, তাঁহার চিত্র এবং রচনা-কৌশল হইতে একথা ভাল করিয়াই বুঝা যায়। সাহিত্যে নাটক-রচনা সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন। লোক-চরিত্রের বিশেষ অভিজ্ঞতা, সূক্ষ্মদৃষ্টি ও সর্ব্বোপরি কথার ঘাত-প্রতিঘাতে ঘটনার পরিস্ফুট এবং চরিত্র-চিত্রণ করিতে না পারিলে, নাটক-রচনা ব্যর্থ হয়। গ্রন্থের স্থানে স্থানে বঙ্কিমচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র প্রভৃতির ভাব ও ভাষা বেমালুম আসিয়া পড়িয়াছে। নবীন নাট্যকারের এ সমস্ত ত্রুটী মার্জ্জনীয়। কিন্তু যাহা লিখিব তাহাই ছাপিতে হইবে, এ রীতি মার্জ্জনীয় নহে। গত ১০ম বর্ষের ২য় সংখ্যা অর্চ্চনায়, লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক ও সমালোচক শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ রায় নাটক-সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমতগুলি নানা স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া 'নাটক প্রসঙ্গ' নামক একটী প্রবন্ধ সঙ্কলিত করেন। নবীন বা প্রবীণ সকল নাট্যকারকেই আমরা উক্ত প্রবন্ধটী পাঠ করিতে বিশেষ

অনুরোধ করি। উক্ত প্রবন্ধের একস্থানে আছে—"অন্তঃপ্রকৃতির ঘাত-প্রতিঘাত চিত্র করাই নাটকের প্রধান উদ্দেশ্য। ধারাবাহিক কথোপকথন দ্বারা সুন্দর গল্প রচনা নাটকের অবয়ব হইতে পারে, কিন্তু তাহা নাটকের জীবন নহে। অন্তঃপ্রকৃতি দ্বারা অন্তঃপ্রকৃতি কিরূপ চালিত হয়, এবং কিরূপে চালিত হয়, তাহা প্রদর্শনই নাটক-কারের প্রধান কার্য্য। সেইরূপ বহিঃপ্রকৃতি দ্বারা অন্তঃপ্রকৃতি কিরূপ চালিত হয় তাহা প্রদর্শন করাই নবেল-রচয়িতার প্রধান কার্য্য।" নবীন লেখকের নাটক-রচনার ক্ষীণ শক্তিটুকুর অপপ্রয়োগ না হয় সেইজন্য এই কথাগুলি বলিয়া রাখিলাম।

কুশদহ।—জ্যৈষ্ঠ। জ্যৈষ্ঠ মাসের কুশদহ আমরা সম্প্রতি পাইয়াছি। নিয়মিত মাসিক পত্র প্রকাশের দিনে ইহা গৌরবের বিষয় সন্দেহ কি? যেমন আজকালকার দিনে তৃতীয় বিভাগে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া একটা সম্মানের বিষয়! কভারের উপর বড় বড় অক্ষরে 'সচিত্র' কথাটী মুদ্রিত আছে। বিচিত্র ব্যাপার এই যে, কভারের ১ম পৃষ্ঠায় কুশদহের ব্লক, তৃতীয় পৃষ্ঠায় বেঙ্গল কেমিক্যালের ব্লক ও শেষ পৃষ্ঠায় কেশরঞ্জনের ব্লক ব্যতীত অন্য কিছু চিত্র দেখিলাম না। আমাদের একটা ভুল হইয়াছে; বিজ্ঞাপনীর ।৹ পৃষ্ঠায় মেসার্স এস্, পি, সেন্ কোং'র ব্লক আছে। সুতরাং কুশদহ 'সচিত্র' বৈকি! সমালোচ্য সংখ্যায় "পদার্থ ও শক্তি এবং মানবজীবনের কর্ত্তব্য" শীর্ষক প্রবন্ধটী ক্রমশঃ প্রকাশ্য। "ঘটনা ও কুসংস্কার" শীর্ষক প্রবন্ধটী 'বিজ্ঞান' হইতে উদ্ধৃত এবং "আংটির মূল্য" নামক গল্পটী অপহৃত অর্থাৎ সমাজপতি মহাশয়ের 'বাঘের নখ' নামক বিখ্যাত গল্পটী অবলম্বনে লিখিত! লেখকটী কে আমরা জানিতে পারিলাম না, কারণ "শ্রী—'র অন্তরালে তিনি আত্মগোপন করিয়াছেন। 'বাঘের নখ' গল্পটী সাহিত্যে একটী রত্ন বিশেষ, সুতরাং ইহা পত্রস্থ করিবার পূর্ব্বে শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয়ের চক্ষুরুন্মীলিত হইলেই ভাল হইত। 'কী ভয়ানোক এ মতো পাওা বা চাওা গল্পো না দেখীআ প্রকাশ! ামরা স্তম্ভিত হইয়াছি।"

সম্পাদকীয় কৈফিয়ৎ।

গত আষাঢ় মাসের 'অর্চ্চনা'য় 'আপনাকে হারাণ' শীর্ষক গল্পে 'রামেশ্বর' নামে এক কল্পিত চরিত্রের অবতারণা করা হইয়াছে। সম্প্রতি আমরা জানিয়াছি যে, হ্যারিসন রোডে উক্ত নামে একজন ব্যবসায়ী আছেন, তিনি সচ্চরিত্র এবং সাধু। পাছে তিনি মনে করেন যে, উক্ত গল্পে তাহাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে; তজ্জন্য পাঠকবর্গের অবগতির নিমিত্ত প্রকাশ করিতেছি যে, তাঁহার সহিত গল্পের অন্তর্গত চরিত্রের কোনও সংশ্রব নাই। লেখক বলেন যে, গল্প লিখিবার সময় তিনি জানিতেন না যে, হ্যারিসন্ রোডে প্রকৃতই রামেশ্বরবাবু নামক একজন ব্যবসায়ী আছেন। রামেশ্বরবাবু লেখকের এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটীর জন্য দুঃখিত না হন,—এই আমাদের অনুরোধ।

রত্ন-প্রসঙ্গ।

[লেখক—শ্রীহরিহর শাস্ত্রী।]

বিগত ১৩২১ সালের ৩০শে কার্ত্তিক বঙ্গের গৌরব মহামহোপাধ্যায় ৺রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়, কাশীলাভ করেন। দেখিতে দেখিতে এক বর্ষ অতীত হইয়া গেল। বাঙ্গালার দুর্ভাগ্য, এই মনীষি-চূড়ামণি শতায়ুঃ হইলেন না।

সকল দেশে বা সকল সময়ে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ন্যায় প্রতিভাবতারের আবির্ভাব হয় না। এমন মহাপুরুষ যে দেশে জন্ম পরিগ্রহ করেন, প্রকৃত পক্ষেই সে দেশ ধন্য। আমাদের বড়ই শ্লাঘার বিষয় যে, ন্যায়রত্ন মহাশয় আমাদের বাঙ্গালার মাটি অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। এই মহাপণ্ডিতের আংশিক জীবন-কথা ইতিপূর্ব্বে "সাহিত্য", "বিজয়া", "অর্চ্চনা" প্রভৃতি মাসিকপত্রে প্রকাশ করিয়াছি;—আজ পুনর্ব্বার "অর্চ্চনা"র পাঠক পাঠিকার নিকটে পূজ্যপাদ ৺ন্যায়রত্ন মহাশয়ের জীবনের দুই একটী ঘটনার ইতিবৃত্ত উপস্থাপিত করিব।

ন্যায়রত্ন মহাশয় যে ন্যায়শাস্ত্রের একজন অদ্বিতীয় অধ্যাপক ছিলেন, ইহা সকলেরই সুবিদিত। যখন নবদ্বীপে ভুবন বিদ্যারত্ন, কোঁড়কদীতে রামধন তর্কপঞ্চানন, কোন্নগরে দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন, বর্দ্ধমানে ব্রজ বিদ্যারত্ন, বেলপুকুরে প্রসন্ন ন্যায়রত্ন প্রভৃতি মূর্ত্তিমান্ গৌতম কণাদের ন্যায় নৈয়ায়িকগণ জীবিত ছিলেন, ন্যায়রত্ন মহাশয় সেই পুরাতন যুগের অন্যতম প্রধান তার্কিক। এই পণ্ডিতচক্রের মধ্যে কে সর্ব্বপ্রধান, তদ্‌বিষয়ে দেশবাসীদিগের মধ্যে একটা মতদ্বৈধের প্রচার ছিল। ভুবন বিদ্যারত্ন প্রধান, না রাখালদাস ন্যায়রত্ন প্রধান, না দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন প্রধান—ন্যায়শাস্ত্রের সূক্ষ্মরহস্য-বেত্তা ব্যতীত ইহার নির্ণয় করাও সুকঠিন। কিন্তু পূজ্যপাদ রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়ের শাস্ত্রীয় প্রতিভার এমনই একটু বৈশিষ্ট্য ছিল যে, সে বিষয়ে তাঁহার সমকক্ষ কেহই ছিলেন না। একবার কোন্নগরের দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন মহাশয় ও ভট্টপল্লীর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় কোনও কার্য্যোপলক্ষে ঢাকার স্বনামধন্য ৺কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহোদয়ের নিকট গমন করেন। সে স্থানে নানা কথাবার্ত্তার পর কালীপ্রসন্ন বাবু, দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করেন,—"আজকাল আপনাদের মধ্যে

প্রধান নৈয়ায়িক কে ?" অসাধারণ নৈয়ায়িক দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন মহাশয় অম্লান বদনে উত্তর করিলেন,—"সত্য কথা বলিতে হইলে ভাটপাড়ার রাখালদাস ন্যায়রত্নই বর্ত্তমান সময়ে সর্ব্বপ্রধান নৈয়ায়িক, ইঁহার পরেই নবদ্বীপের ভুবন-মোহন বিদ্যারত্নের নাম নির্দ্দেশ করিতে হয়।"

ন্যায়রত্ন মহাশয়ের উপর স্বর্গীয় দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন মহাশয়ের এইরূপ প্রগাঢ় বিশ্বাস অকারণ জন্মে নাই। পরম পূজনীয় মহামহোপাধ্যায় কবিসম্রাট্ পণ্ডিত-রাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি,—একবার পূর্ব্ববঙ্গের কোনও স্থানে নিমন্ত্রিত হইয়া রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয় ও দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন মহাশয় পৃথক্ পৃথক্ নৌকায় যাইতেছিলেন। দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন মহাশয়, নব্য ন্যায়ের কোনও গ্রন্থের একটী জটিল পূর্ব্বপক্ষের উত্থাপন করিয়া রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়কে বলেন,—"দেখ ন্যায়রত্ন, এই স্থানটা নিজেও কোনওরূপে সংলগ্ন করিতে পারি নাই, অনেককে জিজ্ঞাসা করিয়াও বিশেষ সদুত্তর পাই নাই; তুমি একবার ভাবিয়া দেখ ত।" রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয় বলিলেন, "তোমার সঙ্গে পুঁথি আছে?" দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সঙ্গে নৌকাতেই পুঁথি ছিল, তিনি পুঁথি বাহির করিয়া রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়কে দিলেন। কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়াই রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়, গ্রন্থের সেই স্থানটী বেশ সংলগ্ন করিলেন। দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন মহাশয়, তাঁহার এই অদ্ভুত পাণ্ডিত্য-প্রতিভা অনুভব করিয়া অতিমাত্র মুগ্ধ হইলেন। সেই অবধি রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়ের উপর তাঁহার অগাধ বিশ্বাসের সৃষ্টি হইল।

আমাদের ন্যায়রত্ন মহাশয়, গুরুর কাছে বেশী পড়েন নাই। চিন্তাশীলতার প্রভাবেই ন্যায়রত্ন মহাশয় ঈদৃশ অনন্যসামান্য পাণ্ডিত্য-প্রতিভা লাভ করিয়া-ছিলেন। শুনিয়াছি, তিনি গুরুর কাছে ন্যায়শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'অনুমিতি' পর্য্যন্ত পড়েন নাই। কেবল নিজের বুদ্ধিবৈভবে তিনি তর্ক-জগতের সাম্রাজ্য লাভ করিয়া বিশ্ববিখ্যাত হইয়াছিলেন। ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁহাদের শিষ্যবংশীয়, সংস্কৃত কলেজের প্রধান অধ্যাপক, পরমব্যুৎপন্ন নৈয়ায়িক ৺জয়নারায়ণ তর্ক-পঞ্চানন মহাশয়ের নিকটে মাসখানেক পড়িয়াছিলেন, এবং তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের কাছে, উদয়নাচার্য্যকৃত "আত্মতত্ত্ববিবেক" (বৌদ্ধাধিকার) নামক অত্যন্ত কঠিন গ্রন্থের কিছুদূর ও "শব্দশক্তিপ্রকাশিকা"র কিয়দংশ অধ্যয়ন করিয়া-ছিলেন। ইহার পরে তর্কপঞ্চানন মহাশয়, তাঁহাকে বলেন, "আপনার আর এখন কষ্ট করিয়া বিদেশে থাকিয়া পড়িবার প্রয়োজন দেখি না;—আপনি

বাড়ী গিয়া পড়াইতে আরম্ভ করুন। আপনার যেরূপ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, ন্যায়শাস্ত্রের কোনও গ্রন্থই আপনার নিকট অসংলগ্ন থাকিবে না।"

এই মনীষিশ্রেষ্ঠের উপদেশে ন্যায়রত্ন মহাশয়, ন্যায়শাস্ত্রের প্রচলিত সমস্ত গ্রন্থ পড়া না হইলেও সাহসে নির্ভর করিয়া অধ্যাপনা আরম্ভ করিলেন। কিন্তু সেই অবধি মৃত্যুর পূর্ব্বপর্য্যন্ত তিনি শাস্ত্রীয় বিচারে কোথায়ও অপ্রতিভ হইয়াছেন, এরূপ শুনা যায় নাই।

দার্শনিকদিগের মধ্যে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের তুল্য চিন্তাশীল পণ্ডিত, অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ন্যায়রত্ন মহাশয় প্রথম বয়সে কি করিয়াছেন, জানি না,—তাঁহার শেষ বয়সে দেখিয়াছি, তিনি কখনও পুঁথি খুলিয়া বসিয়া ভাবিতেন না। ছাত্রগণকে পড়াইলেন, তা'র পর সেই অধ্যাপিত গ্রন্থাংশের দোষ গুণ চিন্তা করিতেন। তাঁহার এই মার্জ্জিত চিন্তার ফলে, যে গ্রন্থ শতবার পড়াইয়াছেন তাহা হইতেও কিছু নূতন রহস্য আবিষ্কৃত হইত। নব্য ন্যায়ের "ব্যধিকরণ-ধর্ম্মাবচ্ছিন্নাভাব" গ্রন্থ, ন্যায়রত্ন মহাশয় যে কতবার আলোচনা করিয়াছেন, তাহার বোধ হয় ইয়ত্তা নাই। কিন্তু তাঁহার শেষ ছাত্র এই অধম প্রবন্ধ-লেখককে যখন "ব্যধিকরণ" পড়ান, সেই সময়ে তিনি উক্ত গ্রন্থসংক্রান্ত এক বিস্ময়াবহ বিচারের আবিষ্কার করেন। এ পর্য্যন্ত কোনও নৈয়ায়িক যাহা করিতে পারেন নাই, সেই সর্ব্বজ্ঞপ্রায় রঘুনাথ শিরোমণির ভ্রম প্রদর্শন করিয়া ন্যায়রত্ন মহাশয় দার্শনিক জগতে চিরস্থায়ী যশঃ অর্জ্জন করিলেন। এই সময়েই তিনি "ব্যধিকরণে"র 'প্রমাঘটিত লক্ষণ' ও 'সাজাত্য লক্ষণে'র বিচারপ্রসঙ্গে রঘুনাথের দুরপনেয় ভ্রান্তি দেখাইয়া "দীধিতিকৃন্ন্যূনতাবাদঃ" নামক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। আজ পর্য্যন্ত কোনও নৈয়ায়িকই 'দীধিতি'কার রঘুনাথ শিরোমণির এই ন্যূনতার পরিহার করিতে পারেন নাই *।

* মহামহোপাধ্যায় কবিসম্রাট্ পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় একবার কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রধান নৈয়ায়িক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাশয়কে বলিয়াছিলেন, "আপনারা জীবিত রহিয়াছেন, আর ন্যায়রত্ন মহাশয়ের দর্শিত, তর্কশাস্ত্রের সর্ব্বপ্রধান গ্রন্থকার রঘুনাথ শিরোমণির ন্যূনতাবাদের কোনও উদ্ধার কি হইবে না?" তর্কবাগীশ মহাশয় উত্তর করেন, "বৃদ্ধ ন্যায়রত্ন মহাশয় আমাদের গুরুকল্প, তাঁহার গ্রন্থের খণ্ডন করিলে তিনি যদি অসন্তুষ্ট হন, এই ভয়েই আমি ও বিষয়ে হস্তার্পণ করি নাই।" তর্কবাগীশ মহাশয়কে আমরা এখন "দীধিতিকৃন্ন্যূনতাবাদঃ" ও "গদাধরন্যূনতাবাদঃ" এই উভয় গ্রন্থের খণ্ডন করিতে সবিশেষ অনুরোধ করিতেছি। আর ত ন্যায়রত্ন মহাশয় ইহলোকে নাই!

"অদ্বৈতবাদখণ্ডন" গ্রন্থও ন্যায়রত্ন মহাশয়ের এক মহাকীর্ত্তি। হাতুয়ার স্বর্গীয় মহারাজ কৃষ্ণপ্রতাপ সাহী বাহাদুর ৬০০৲ শত টাকা বার্ষিক বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া ন্যায়রত্ন মহাশয়কে কাশীবাস করাইয়াছিলেন। ন্যায়রত্ন মহাশয়কে কাশীতে আনিয়া তাঁহার সম্মানার্থ মহারাজ বাহাদুর কাশীর গণ্যমান্য পণ্ডিত-গণকে আহ্বান করিয়া তাঁহার কাশীস্থ প্রাসাদে এক মহতী সভার আয়োজন করেন। মহারাজ বাহাদুর, ন্যায়রত্ন মহাশয় ও কাশীস্থ পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে পরস্পর পরিচয় করাইয়া দেন। সভায় নানাশাস্ত্রের বিচার হয়। কাশীর একাধিক প্রধান পণ্ডিত, শঙ্করাচার্য্যের উদ্ভাবিত অদ্বৈতবাদ অবলম্বন করিয়া ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হন। ন্যায়রত্ন মহাশয় অনেক নূতন যুক্তিতর্ক দেখাইয়া তাঁহাদের পক্ষ খণ্ডন করেন। এই বিচারপ্রসঙ্গ হইতেই "অদ্বৈতবাদখণ্ডন" গ্রন্থের সূচনা। ন্যায়রত্ন মহাশয়, প্রথমতঃ সংক্ষেপে "অদ্বৈত-বাদখণ্ডন" লিপিবদ্ধ করিয়া কাশীর তাৎকালিক সর্ব্বজনপূজ্য পণ্ডিত, পরমহংস শ্রীমদ্ বিশুদ্ধানন্দ স্বামীজীকে প্রদর্শন করেন। স্বামীজী অতি গুণগ্রাহী ছিলেন, তিনি উক্ত সন্দর্ভের বিশেষ কোনও দোষ না পাইয়া ন্যায়রত্ন মহাশয়কে বলেন যে, "আচ্ছা, তুমি যে অবিদ্যা খণ্ডন করিতেছ, তোমায় মতে "অজ্ঞোঽহং" ইত্যাকারক অনুব্যবসায় কেমন করিয়া হইবে?" ন্যায়রত্ন মহাশয় তাহার উত্তরে বিনীতভাবে বলেন যে, "অজ্ঞোঽহং" এখানে সামান্যতঃ 'জ্ঞানাভাববান্' এরূপ অর্থ নহে, শাস্ত্রজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান এইরূপ বিশেষ জ্ঞানের অভাব বিশিষ্টই 'অজ্ঞ' শব্দের অর্থ। তাহা হইলেই নৈয়ায়িকমতে কোনও অনুপপত্তি হয় না।"

অসাধারণ তেজস্বিতা ও অলৌকিক পাণ্ডিত্যের জন্য স্বামী বিশুদ্ধানন্দ, ন্যায়রত্ন মহাশয়কে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। স্বামীজীর উপরেও ন্যায়রত্ন মহাশয়ের প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। সর্ব্বপ্রথম হাতুয়ার মহারাজ বাহাদুরই স্বামীজীর কাছে ন্যায়রত্ন মহাশয়কে লইয়া গিয়াছিলেন। সেই সময়ে ন্যায়রত্ন মহাশয়, স্বামীজীর চরণধূলি গ্রহণ পূর্ব্বক নিম্নলিখিত শ্লোকটী রচনা করিয়া আবৃত্তি করেন :—

"যদানন্দাবাপ্ত্যৈ বপুরপচয়ে রাজহৃদয়ে
কৃপারাশিঃ কাশীস্থিতিমনিশমাদাদয়তি মাম্।
অহো ভাগ্যং যস্মাদ্ ভগবদবলোকং কৃতবতো
বিশুদ্ধানন্দোঽসৌ বিশতি ধৃতমূর্ত্তির্মম দৃশৌ॥"

অর্থাৎ দেহত্যাগের পর বিশুদ্ধ আনন্দ লাভ করিব বলিয়া সদয়হৃদয় মহারাজ

আমাকে কাশীবাস করাইলেন। আমার সৌভাগ্য, আজ সেই বিশুদ্ধানন্দ, সশরীরে আমার নয়নের সম্মুখে বিরাজমান।

স্বামীজীর মৃত্যুর বহুদিন পরে ন্যায়রত্ন মহাশয়কৃত "অদ্বৈতবাদখণ্ডন" গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়া সাধারণ্যে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ প্রচারিত হইলে কাশীর বৈদান্তিক সমাজের মধ্যে এক মহা হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল। বৈদান্তিকদিগের মুখপাত্ররূপে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী মহাশয়, বিচারপ্রার্থী হইয়া এক বিজ্ঞাপন-পত্র মুদ্রিত করিয়াছিলেন। এই বিজ্ঞাপনে লিখিত হয় যে, কাশীনরেশ ও কোচিনের মহারাজ এবং মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত শিবকুমার শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ প্রমুখ ৫।৬ জন পণ্ডিতকে মধ্যস্থ রাখিয়া দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদের বিচার করা হইবে। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পক্ষ সমর্থন পুর্ব্বক অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে তাদৃশ নিয়মে বিচার করিতে সম্মত হইয়া মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ কবিসম্রাট্ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়, সেই বিজ্ঞাপন-পত্রের উত্তর দিয়াছিলেন। উভয় পক্ষ হইতেই এইরূপ বিজ্ঞাপন-পত্র ৪।৫ বার মুদ্রিত হইয়াছিল, কিন্তু বিচারের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হয় নাই। তবে পণ্ডিতরাজ তর্করত্ন মহাশয়, ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নবোদ্ভাবিত শ্রুতিব্যাখ্যা অবলম্বন করিয়া সেই সময়ে কাশীর "ব্রাহ্মণ-সভায়" এক দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এই বক্তৃতার জন্যও এক গোলযোগের সৃষ্টি হইয়াছিল। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী মহাশয়, "ব্রাহ্মণ-সভা"র আচার্য্য ছিলেন; তিনি এই বক্তৃতার পর আচার্য্য-পদ পরিত্যাগ করিয়া পত্র লেখেন। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের "অদ্বৈতবাদখণ্ডন" প্রচারিত হইলে বহুদিন পর্য্যন্ত এই ভাবে নানা আন্দোলন ও আলোচনা হইয়াছে। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী মহাশয়, ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ছাত্রের ছাত্র হইলেও এই অদ্বৈতবাদখণ্ডন-প্রসঙ্গে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সহিত তাঁহার বিচ্ছেদ সঙ্ঘটিত হইয়াছিল। বহুকাল উভয়ের দেখা সাক্ষাৎ ছিল না। ন্যায়রত্ন মহাশয় যেবার তাঁহার বাটীতে সভা করিয়া পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত তর্করত্ন মহাশয়কে "কবিসম্রাট্" উপাধি দেন, সেই সভায় সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী আসিলে ন্যায়রত্ন মহাশয়, তাঁহাকে বলেন, "শাস্ত্রী, এত দিন আমার সঙ্গে দেখা কর নাই কেন?" শাস্ত্রীজী বিনীতভাবে উত্তর করেন যে, "আমি আপনার কাছে না আসিলেও আমার মন সর্ব্বদা আপনার চরণে থাকিত।"

এই সভাতেই ন্যায়রত্ন মহাশয় শেষ সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। ইহার

পর তিনি আর কোনও সভাতেই যোগদান করেন নাই। এমন কি, ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পরম স্নেহভাজন, বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ বাহাদুরের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধেও মহারাজের প্রতিষ্ঠাপিত "বিদ্বৎসভা"র সভাপতিত্ব গ্রহণ করিতে সম্মত হন নাই। বঙ্গের প্রায় সমস্ত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত, এই সভায় সদস্যরূপে বার্ষিক ৫০৲ টাকা বৃত্তি পাইয়া থাকেন। মহারাজ বাহাদুর, ন্যায়রত্ন মহাশয়কে বার্ষিক ৩০০৲ শত টাকা বৃত্তি দিতে চাহিয়াছিলেন। "বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সভা"র পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, ন্যায়রত্ন মহাশয়কে সভাপতি হইতে অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিলে সে পদও তিনি প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। জীবনের শেষ দশায় ন্যায়রত্ন মহাশয়, এক অধ্যাপনা ব্যতীত আর সমস্ত ব্যাপার হইতেই একটু বিচ্ছিন্নভাবে থাকিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। নিজের সমুদায় বিষয়-সম্পত্তির ভারও উপযুক্ত ট্রষ্টীদিগের হস্তে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে শান্তি উপভোগ করিতেছিলেন। কিন্তু করুণাময় শঙ্কর, তাঁহাকে পরম শান্তি দিবেন বলিয়া অনতিকাল মধ্যেই নিজের কাছে ডাকিয়া লইলেন।

"মুক্তের্জহ্নুকুমারিকা প্রজনিকা মুক্তিপ্রদা কাশিকা
যুক্তং রাজতি তদ্দ্বয়ং মৃতচয়ং কাশ্যাং স্মরারিঃ স্বয়ম্।
মোক্ষে দীক্ষয়িতা স্থিতা গিরিসুতা দীনান্নদানব্রতা
কিং লব্ধ্বং বিপদাস্পদেঽপরপদে ভ্রান্তংমনো ভ্রাম্যসি॥"

এই শ্লোক লিখিয়া নিঃশ্রেয়সের আশায় বড় আকুলহৃদয়ে ন্যায়রত্ন মহাশয় কাশীবাস করিয়াছিলেন। ভূতভাবন তাঁহার চিরপোষিত আশা পূর্ণ করিলেন,—ভক্ত ন্যায়রত্ন মহাশয়, তিন রাত্রি কেদারঘাটে গঙ্গাগর্ভে বাস করিয়া পরমধামে চলিয়া গেলেন। আজ জ্ঞান-গগনের মার্ত্তণ্ড অস্তমিত, তাঁহার অভাব কেহ কি পূর্ণ করিতে পারিবে ?

"দিশি দিশি বিলসন্তি ক্ষুদ্রখদ্যোতপোতাঃ
সবিতরি পরিভূতে কিং ন লোকৈর্ব্যলোকি।"

রথহরি।

[লেখক—শ্রীকৃষ্ণদাস চন্দ্র।]

"বা! রথহরি, তুমি এখানে বসে বেশ নিশ্চিন্ত মনে চা খাচ্ছ, আর আমরা সারা পৃথিবীটা তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছি। আচ্ছা গুণধর ছেলে জন্মেছিলে যা হো'ক্, উঠে এস।"

কলেজ ষ্ট্রীটে একটী চায়ের দোকানের সম্মুখে একখানি ঘরের গাড়ী হইতে একটী কান্তিবিশিষ্ট ভদ্রলোক অবতরণ করিয়া ১০।১৫ জন চা-পায়ীর মধ্যে একটী দ্বাবিংশ বয়স্ক যুবককে সম্বোধন করিয়া এই কথাগুলি বলিলেন।

চা-পানে রত অন্যান্য ভদ্রলোকগুলি পরস্পর মুখ চাহিতে লাগিল, ব্যাপারটা কি জানিবার জন্য সকলের মনে একটা কৌতূহলের উদ্রেক হইল। যুবক নির্ব্বাক, হতভম্ব হইয়া আগন্তুক ভদ্রলোকটীর মুখের পানে চাহিল। ভদ্রলোকটীর চক্ষুতে কি যাদুমন্ত্র ছিল। যুবকটীকে বা অন্য কাহাকে কোনও উত্তর দিবার অবকাশ না দিয়া পুনরায় গম্ভীরস্বরে বলিলেন "এস শীগ্‌গীর নেমে এস!" এই বলিয়া তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া গাড়ীতে উঠিলেন।

দোকানের অন্যান্য লোকগুলির কৌতূহল তৃপ্তি হইল না। তাহারা ঠিক করিয়া লইল, যুবকটী বাড়ী হইতে কোন কারণে পলায়ন করিয়া আসিয়াছে, আগন্তুক ভদ্রলোকটী তাঁহার একজন আত্মীয়।

গাড়ীর ভিতরে বসিয়া অল্পভাষী গম্ভীর প্রকৃতি কীর্ত্তিবাস বাবু গভীর চিন্তা-মগ্ন। মাঝে মাঝে তাহার হর্ষোৎফুল্ল নয়নযুগলে ভবিষ্যতের সুখচ্ছবির প্রতিবিম্ব পড়িতেছিল।

নির্ব্বাক যুবক ভাবিতেছিল, এতো মন্দ রহস্য নহে! ত্রিকুলে যা'র আপনার বলিবার কেহ নাই তাকে খুঁজে বেড়ায়, স্নেহের ভৎর্সনায় তাহার প্রাণে অমৃত-সিঞ্চন করে, এ ভদ্রলোকটী কে? নিশ্চয়ই ইনি একটা বিষম ভুলের মধ্যে পড়িয়া অজানা এক পথের ভিখারীকে কোলে তুলিয়াছেন। তাহার পর যখন ভুল ভাঙ্গিবে তখন ত মিষ্ট কথায় ও ভোজ্যপেয় দানে এই অনশনক্লিষ্ট দরিদ্রকে এক দিনের জন্যও পরিতৃপ্ত করিতে হইবে। ব্যাপারটা ভাল করিয়া বুঝিবার জন্য যুবক উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতে লাগিল।

(২)

হারানিধিকে পাইলে সকলের মনে যেমন একটা মহোল্লাস হয়, এই যুবকটী আসিতে, বাড়ীতে যেন তেমনি একটা উৎসব পড়িয়া গেল। পরিচারকবৃন্দের কেহ আসিয়া তাহার পা ধুইয়া দিতে লাগিল, কেহ আসিয়া তাহার বেশ বিন্যাসে মনঃসংযোগ করিল। অন্দরের ভিতর হইতে জল খাইবার জন্য ডাকের উপর ডাক আসিতে লাগিল। যুবক ভাবিতে লাগিল, সে জাগ্রত না স্বপ্নাবিষ্ট! সে ঘটনা-স্রোতে গা ভাসাইয়া দিল, কাহারও নিকট আত্মপ্রকাশ করা সমীচীন বোধ করিল না। জামাই-আদরে অন্দরের মধ্যে যখন সে রসনার তৃপ্তিসাধন করিতেছিল তখন বাটীর গৃহিণী পাশে বসিয়া তাহাকে আদরের সহিত খাওয়াইতে লাগিলেন এবং নয়নপ্রান্তে অঞ্চল মুছিতে মুছিতে বলিলেন—"এত দিন কোথা ছিলি বাবা! স্ত্রী-পুরুষে এমন খুঁটি নাঁটি কত হয়, তা' বলে কে আর বাড়ী ছেড়ে চলে যায় বাবা! হতচ্ছাড়া আবেগের বেটী, নচ্ছার বউটাও তেমনি। দু'দিন অপেক্ষা না করে কেরোসিন তেলে পুড়ে ম'রল।"

যুবক কোনও উত্তর দিল না। যে কয়দিন জাল 'রথহরি'র ভূমিকা সে অভিনয় করিতে পারে, সেই কয় দিনই তাহার পক্ষে মঙ্গল। তবুও গৃহিণীর কথায় এবং আসল রথহরির বালিকা-বধূর আত্মহত্যায় তাহার প্রাণে কষ্ট হইল। তাহার নয়ন-প্রান্তে অশ্রু দেখা দিল।

গৃহিণীও অঞ্চল প্রান্তে চক্ষু মুছিতে মুছিতে যুবককে যথেষ্ট সান্ত্বনা দান করিলেন এবং শীঘ্রই যে একটী সম্ভ্রান্ত সদ্বংশে তাহার বিবাহ দিবেন, এ সাধু সঙ্কল্পটী জানাইবার এ শুভ সুযোগ ছাড়িলেন না। লজ্জায় যুবক মুখ ফিরাইয়া লইল।

(৩)

কতদিন অনশন অর্দ্ধাশনের পর আজ যুবক স্নেহরসে সিঞ্চিত হইয়া পরিতৃপ্তি সহকারে ভোজনান্তে বৈঠকখানায় বসিয়া স্বীয় অদৃষ্ট-চিন্তা করিতেছে!

সে এই জাল রথহরির অংশটী সুন্দর অভিনয় করিতে পারিয়াছে বলিয়া মনে মনে একটা আত্মপ্রসাদ লাভ করিল। কিন্তু প্রতিক্ষণেই সে প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিল যে তাহার এই আকস্মিক ভাগ্য-বিবর্ত্তনের মূলে, একটা বিষম ভুল রহিয়াছে। কিন্তু খেলার ছলে ফকিরী হইতে আমিরীতে উঠিয়া—এক-দিনের জন্য আবুহোসেনত্ব লাভ করিয়া—সে আত্মবিস্মৃত হইবার চেষ্টা করিতে-ছিল। যেমন একটা সুখস্বপ্ন দেখিলে, যাহাতে ঘুম না ভাঙ্গে এরূপ একটা প্রবল

ইচ্ছা হয়; ঘুম ভাঙ্গিলেও ঘুমঘোরে নয়ন মুদিয়া আত্ম-বিস্মৃতি আনিতে ইচ্ছা হয়, যুবকেরও ঠিক তাহাই হইতেছিল।

কি করিয়া সে সকলের নিকট প্রকৃত রথহরি এ ধারণাটা বদ্ধমূল করিয়া দিবে সেই চিন্তাই তাহার প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল; সেই জন্য একাকী বৈঠকখানায় বসিয়া রথহরির পত্রগুচ্ছ,পুস্তকাদি তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিতেছিল যাহাতে এই জাল অভিনয়ে সে লোকের সন্দেহভাজন না হয়। এমন সময়ে কক্ষের দ্বার ঈষৎ উদ্‌ঘাটন করিয়া পরিচারক আসিয়া খবর দিল, 'যোগেন্ বাবু আপনার সঙ্গে দেখা কর্‌তে এসেছেন।'

যুবক—কোন্ যোগেন বাবু?

পরিচারক মৃদু হাস্য করিয়া কহিল, সেই যে বাবু, যে বাবু আপনার সঙ্গে স্কুলে পড়্‌তেন।

পরিচারকের হাসি সন্দিগ্ধচিত্ত যুবকের হৃদয়ে বিদ্ধ হইল, কিন্তু তাহাকে কোনও কথা না বলিয়া সে যোগেন বাবুকে ভিতরে আনিতে আদেশ প্রদান করিল। যুবক প্রতি পলেই শঙ্কিত হইতেছিল, তাহার বুক দুরু দুরু কাঁপিয়া উঠিতেছিল। কিন্তু যোগেন্দ্র কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র, দক্ষ অভিনেতার মত সে নিজকে সামলাইয়া লইয়া বলিল—"কি হে যোগেন্ যে, এস এস।"

যোগেন্দ্রের মুখে চোখে হাসি ফুটিয়া উঠিল, সে বলিল "কিহে রথহরি, এত দিন কোথা ছিলে? দেখ দেখি সামান্য একটা কারণে গৃহত্যাগ করে একটী সাধ্বী বালিকার মৃত্যুর কারণ হ'লে!"

যুবক—কি কর্‌বো বল। অদৃষ্ট ত আর আমার হাত ধরা নয় ভাই। লঙ্ঘন করি তোমার আমার সে সাধ্য কোথা?

যোগেন্দ্র—তাই ত হে, ক' দিনে যে তুমি ঘোর Fatalist (অদৃষ্টবাদী) হয়ে পড়েছ।

যুবক—তা' না হলে আর উপায় কি! অদৃষ্টবাদী হওয়াই হচ্ছে শান্তির মূল।

যোগেন্দ্র—তুমি ক'দিন বৈরাগ্যে অনেক কথা শিখেছ, আর পারবার যো'টি নাই। একটু তামাক আনাও দেখি।

যুবক গম্ভীরস্বরে পরিচারককে চা ও তামাকের ব্যবস্থা করিতে হুকুম করিল। অতঃপর অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল রসালাপের পর মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে যোগেন্দ্র বিদায় গ্রহণ করিল।

আজকার এই অভিনয়টি সুন্দর হইয়াছে বলিয়া যুবকও হাসিল।

এই দুই জনের হাসির মূল্য নির্দ্ধারণ করিবার বিষয়।

(৪)

এই রূপে পাঁচ সাত দিন অতিবাহিত হইল। চুম্বক-সংশ্রবে লৌহের যেমন চুম্বকত্ব প্রাপ্তি হয়,যুবকও তেমনি দিন দিন ‘রথহরি’ হইয়া পড়িতেছিল। একদিন-কীর্ত্তিবাস বাবু আসিয়া যুবককে বলিলেন—“তিন বৎসর হইল তোমার পিতার মৃত্যু হইয়াছে। এটর্নী রট্‌ল্যাণ্ড্ কোম্পানী তোমার পিতার বিষয়ের ট্রাষ্টি **(Trustee).** তুমি ত এখন সাবালক হয়েছ,এইবার একদিন আমার সঙ্গে সেখানে চল, তোমার বিষয় আদায় ক’রে দি। কথায় বলে, পরহস্ত গতং ধনং। দাদা আমার আর লোক পেলেন না, এটর্নী-বন্ধুকে বিশ্বাস করিয়া ট্রাষ্টি করে গেছেন !”

যুবক এত দিন পরে বুঝিল, কীর্ত্তিবাস তাহার খুড়া। কিন্তু এটর্নী-বাড়ী যাইতে হইবে শুনিয়া তাহার মুখ শুকাইয়া গেল। যদি জেরার মুখে সে ধরা পড়ে তা হইলেত তাহার শৃগাল-মূর্ত্তি বাহির হইয়া পড়িবে! ভয়ে সে আড়ষ্ট হইল। তাহার এই ভাব চতুরচূড়ামণি কীর্ত্তিবাসের চক্ষু এড়াইল না। যুবককে অভয় দিয়া বলিলেন—“তাতে ভয় কি! বাপের বিষয় দাবী কর্‌বে, এতেত আর জুয়াচুরি নাই। তোমার বিষয় আদায় করে তোমার হাতে সমর্পণ কর্‌তে পারলেই আমি নিশ্চিন্ত হই।”

মানুষ কি এত ভ্রান্ত হয়! ভাবিতে ভাবিতে যুবকের ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক আলোড়িত হইয়া উঠিল। সে ভাবিল, না আর জাল মানুষ সেজে কাজ নাই, কীর্ত্তিবাসকে স্বীয় যথার্থ পরিচয় দিই, কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই ঐশ্বর্য্যের মাধুর্য্য তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল! মলিন বদনে সে বলিল—“খুড়া মহাশয়, আপনি যা’ করেন তা’তে আর কথা কি!”

অল্পভাষী কীর্ত্তিবাস বাবু সানন্দে কক্ষান্তরে গমন করিলেন। যুবক চিন্তাসমুদ্রে পড়িয়া কূল হারাইতে বসিল। একদিকে জেল, অন্য দিকে অতুল ঐশ্বর্য্য!

(৫)

নানা চিন্তার মধ্যে যুবক স্বীয় কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইল। অবিলম্বে গৃহ-ত্যাগ করিয়া, সুবর্ণ-শৃঙ্খল দূরে ফেলিয়া, বনের পাখি বনে যাওয়াই সে ঠিক করিল। বাটীর সকলের দৃষ্টির অন্তরালে রাত্রি ১২টার সময় সে শয্যাত্যাগ করিল। তখন পরিচারকবৃন্দ সুপ্ত। জুতাজোড়াটী হাতে লইয়া খালি পায়ে সে সিঁড়ি হইতে নামিতে নামিতে শুনিতে পাইল পার্শ্বের কক্ষে মৃদু হাস্যধ্বনি উঠিতেছে এবং একটা ক্ষীণ আলোক-রেখা গবাক্ষের ছিদ্র দিয়া ছাদের উপর পড়িয়া রজনীর মুক্ত রাজ্যে স্বীয় অধিকার বিস্তৃত করিবার প্রয়াস পাইতেছে।

কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া সে গবাক্ষের ছিদ্র দিয়া দেখিল কীর্ত্তিবাস ও যোগেন্দ্র কথাবার্ত্তা কহিতেছে ও মাঝে মাঝে উল্লসিত হইয়া উঠিতেছে। সে উৎকণ্ঠিত হইয়া শুনিতে লাগিল, যোগেন্দ্র বলিতেছে 'আপনার এই চালটা বুঝিলাম না। ছোকরাটাকে যে আপনি 'রথহরি' বানিয়ে দিলেন, এ শিক্ষা ত একবারও তা'কে দেন নাই।'

হাসিয়া কীর্ত্তিবাস কহিল—'এ সহজ কথাটা আর বুঝলে না! তা হ'লে যে সব ফেঁসে যায়। টাকার জোরে সব সম্ভব হয় বটে কিন্তু সাধ করে আর কে জাল মানুষ সাজ্‌তে যায়। এ বরঞ্চ হচ্ছে ভাল। সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি।'

যোগেন্দ্র—তা' আর বল্‌তে দাদা। সে দিন তা'র সঙ্গে কথা ক'য়ে দেখ্‌লুম্‌, কি সপ্রতিভ ভাব! সে যে রথহরি ছাড়া অন্য কেউ নয়, এ কথাটা কোনও রকমেই বুঝ্‌তে দিলে না। আমাদের মত লোকের চোখে ধূলা দেবার চেষ্টা দেখে আমার হাসি এসেছিল।

কীর্ত্তিবাস। খবরদার, খুব সাবধান! ও যেন ঘুণাক্ষরেও জান্‌তে না পারে যে আমরা সব কথা জানি। আদালতের অনেক উকিল যেমন নিজের মক্কেলকে Leading question জিজ্ঞাসা করেন, আমিও তেমনি ওর সঙ্গে কথায় সেইরূপ ইসারা দিয়ে যাই। সে দিন বল্লুম—'দাদা আমার আর লোক পেলেন না, এটর্নীকে ট্রষ্টী করে গেছেন' ছোক্‌রাটা ঝাঁ করে আমার ইসারা বুঝে নিয়ে আমায় 'খুড়া' বলে সম্বোধন কর্‌লে।

যোগেন্দ্র। ছোঁড়াটা খুব চালাক।

কীর্ত্তিবাস। তা'তে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। ও কিন্তু আমাদের বিষম বোকা ঠাউরে যাচ্ছে।

যোগেন্দ্র। তা'তে আর আমাদের কি! কোনওরূপে কার্য্যসিদ্ধি। যাক্‌— এখন বলুন দেখি, এই ছোকরাটীকে কোথায় পেলেন? এর চেহারা রথহরির সঙ্গে একটুও তফাৎ নেই। সে দিন ঘণ্টাখানেক কথাবার্ত্তায় ওর চাল-চলন দেখে আমার মনে হচ্ছিল যে প্রকৃত রথহরি জলে ডুবে ফিরে এসেছে।

কীর্ত্তিবাস। আশ্চর্য্য সাদৃশ্য! মানুষে মানুষে চেহারায় এমন মেলে না। আসল রথহরির নাকের উপর একটা তিল ছিল, তাই আমি বুঝতে পারি, নইলে ধরে কার সাধ্য! যমজ ভাই হলেও এত সাদৃশ্য বোধ হয় পাওয়া যায় না।

যোগীন্দ্র। একে পেলেন কি করে?

একদিন কলেজ ষ্ট্রীট দিয়ে যাবার সময় একটা চায়ের দোকানে এই ছোক-

রাকে দেখি। দেখেই আমার মনে হয়, রথহরি জলে ডুবে কোনও রকমে বেঁচে এসেছে। এই মনে করেই আমি আত্মীয়তা দেখাবার জন্য ওকে ডেকে এনে গাড়ীতে তুলেছিলাম।

যোগেন্দ্র। তারপর ?

কীর্ত্তিবাস। ও ছোকরা যখন হ্যাঁ-না কোনও কথাই বল্লে না, তখনও আমার ধারণা ও রথহরি। কিসে নিকেশ্ কর্ত্তে পারি, এই ভাব্ছি এমন সময় দেখি রথহরির নাকের উপর একটা 'তিল' ছিল, এর তা নেই।

যোগেন্দ্র। জলে ডুবে ধুয়ে যায়নিত ?

কীর্ত্তিবাস। নে ঠাট্টা রাখ। এখন শোন, একে নিয়ে বিষয় হস্তগত কর্তে পারলেই, তোর আর আমার—

যোগেন্দ্র। এ যদি বিষয় পেয়ে ফাঁকি দেয় ?

কীর্ত্তিবাস। সাধ্য কি ? ওত আর আসল রথহরি নয়! যখন বিষয় নেবে তখন সব ভেঙ্গে চুরে বলে কিছু গুছিয়ে নেব, তার পর আমাদেরই ত হাতে সব, এক দিন বিষয়-প্রাপ্তির উৎসবে খাবারের সঙ্গে বিষ দিয়ে—

যোগেন্দ্র। এটাকেও তুমি সাবাড় কর্তে চাও নাকি ?

কীর্ত্তিবাস। না তা কেন! একটা পথের ভিখিরীকে ধরে এনে রাজা করে দিই আর আমরা বেটারা আমড়ার আঁটি চুষি।

যোগেন্দ্র। তবে আসল রথহরিটাকে জলে ডুবিয়ে মার্লে কেন ? সে বিষয় নিলে তাকে মার্লেও ত এই ফল হ'ত। দুটো লোক হত্যা হ'ত না।

কীর্ত্তিবাস। তা'কে মেরেই তো আমি বিপদে পড়েছি। একদিন রট্ল্যাণ্ড্ কোম্পানীর সঙ্গে পরামর্শ করে জান্লুম যে যদি রথহরি মরে, আমার বিষয়প্রাপ্তির কোনও সম্ভাবনা নেই, বিষয়টা একটা দাতব্য কার্য্যে যাবে, উইলে এইরূপ আছে।

যোগেন্দ্র। উইলটা না জেনে এমন কুকর্ম্ম কর্লে কেন ?

কীর্ত্তিবাস। লোভটা এমন ভয়ানক যে পেছন ফিরে দেখ্তে দেয় না, ভাববার অবকাশ দেয় না।

ইহাদের পরামর্শ শুনিয়া যুবক শিহরিয়া উঠিল, সে ভীত ও কম্পিত পদে অতি ব্যস্ততার সহিত বাটী ত্যাগ করিল।

(৬)

সেই রাত্রিতে যুবক ভবানীপুর হইতে বরাবর কালীঘাটে গিয়া মা কালীর মন্দিরের পাশে রাত্রিটা অতিবাহিত করে এবং প্রাতে সন্ধান করিয়া রট্ল্যাণ্ড্

কোম্পানীর অংশীদার কালীপদ বাবুর বাটীতে গমন করিল। তখন বেলা ৯টা। কালীপদ বাবু মক্কেলবৃন্দের কাজ সারিয়া স্নানাহার করিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে যুবককে দেখিয়াই তিনি বলিয়া উঠিলেন—"কি রথহরি, তুমি আমায় না বলে হঠাৎ চলে এলে যে?"

যুবক নমস্কার করিয়া দৃঢ়কণ্ঠে বলিল—'মশাই আমি আসল রথহরি নই, জাল রথহরি'।

'জাল রথহরি! ব্যাপার কি!'—কালীপদ বাবু প্রশ্ন করিলেন। যুবক তখন সমস্ত ঘটনাগুলি আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিল।

ক্রোধে কালীপদ বাবুর চক্ষু আরক্তিম হইয়া উঠিল, তিনি বলিলেন—"ব্যাটা-দের জেল খাটিয়ে ছাড়্‌বো, তুমি আমার সঙ্গে অফিসে চল, সেই খানেই সমস্ত পরামর্শ কর্‌বো।"

যুবক কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"এরা সত্যই তবে রথহরিকে—"

কালীপদ। হ্যাঁ তাকে মেরে ফেলবার জন্য জলে নৌকা ডুবিয়ে দেয়, কিন্তু সে মরে নি। একদিন কোনও লোক তাকে শিবপুরের ঘাটে অচৈতন্য অবস্থায় পায় এবং হাঁসপাতালে পাঠায়। আমিও ঘটনাক্রমে একজন মুমূর্ষু সাহেবের একটা উইল করবার জন্য হাঁসপাতালে যাই এবং রথহরিকে দেখ্‌তে পেয়ে তাহার জ্ঞাতি-খুড়ার সমস্ত কীর্ত্তি জানিতে পারি এবং পাছে তার জীবনের কোনও অনিষ্ট হয় এই ভয়ে তা'কে আমার বাগানে লুকিয়ে রেখেছি।

যুবক। বড় সর্ব্বনেশে লোক ত!

কালীপদ। লোকটা ভারি ধড়ীবাজ। আমার কাছে একদিন রথহরির পিতার উইল দেখ্‌তে চেয়েছিল। আমি দেখাই নাই, কেবল বলেছিলাম রথহরিকে তুমি হাজির করে দাও, আমি যা করবার কর্‌বো। তাই তোমাকে সে কোনও রকমে যোগাড় করেছে। হ্যাঁ হে ছোকরা, তোমার নাম কি, কি কর, সে পরিচয় ত দাও নাই?

যুবক বলিল, আমি অতি দরিদ্রের সন্তান। বাল্যকালে পিতার মৃত্যু হয়, সেই অবধি এক দাসী আমায় প্রতিপালন করে। সম্প্রতি আমি এক ছাপাখানায় কম্পোজিটারের কাজ করি।

কালীপদ। তোমার নাম কি?

যুবক। ছেলেবেলা থেকে আমার নাম ছিল এককড়ি। আমাদের

দাসীর মৃত্যুর সময় সে আমায় বলে গেছে তুমি নিজেকে 'রাথহরি' বলে পরিচয় দিও, ভবিষ্যতে তোমার ভাল হ'বে। তাই এখন আমার নাম,শ্রীরাথহরি মিত্র।

কালীপদ চমকিত হইয়া বলিলেন—'বটে, বটে, চেহারায় ও নামে অদ্ভুত সাদৃশ্য!'

(৭)

পরদিন রট্‌ল্যাণ্ড্ কোম্পানীর অফিসে রাথহরি বসিয়া আছে, কালীপদ বাবু কাগজ পত্র দেখিতেছেন, এমন সময়ে রথহরি কক্ষে প্রবেশ করিল। হঠাৎ রাথহরির মুখের দিকে চাহিয়া সে বিস্মিত হইল। রথহরি কথা কহিতেছে না, দাঁড়াইয়া আছে, অথচ কালীপদ বাবুর সম্মুখে তাহার প্রতিবিম্বটী উপবিষ্ট আছে ও কথা কহিতেছে! তাহার নয়নদ্বয় ঘরের দেওয়ালে কোনও দর্পণ আলম্বিত আছে কি না অনুসন্ধান করিতে লাগিল!

কালীপদ বাবু রথহরির ভাব লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"রথহরি, তুমি বোধ হয় এঁকে দেখে নিশ্চয়ই খুব আশ্চর্য্যান্বিত হচ্ছ। এই যুবকের নাম রাথহরি, ইনি তোমার যমজ ভ্রাতা।"

রাথহরি লাফাইয়া উঠিয়া বলিল—"সে কি কথা মশাই, আমার যে পৃথিবীতে কেউ নাই! আমার সহিত রহস্য করিবেন না, আমি রথহরি বাবুকে চিরদিনই ভায়ের মত ভালবাস্‌বো—অগ্রজের মত ভক্তি কর্‌বো।"

রথহরি নির্ব্বাক হইয়া রহিল।

"সময় সময় মন্দ ঘটনা হইতে ভালর সূচনা হয়, এ ক্ষেত্রে তাই ঘটিল।" এই বলিয়া তিনি রথহরিকে রাথহরি-সম্বন্ধীয় সমস্ত ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলেন; এবং বলিলেন, "উইলে লেখা আছে রাথহরির চার বৎসর বয়সে গহনার লোভে তাহার দাসী তাহাকে চুরি করিয়া লইয়া যায়। তাহার দক্ষিণ হস্তে ইংরাজীতে R অক্ষরটী লেখা আছে। যদি তাহাকে কখনও পাওয়া যায় তাহা হইলে সে অর্দ্ধেক বিষয়ের অংশীদার হইবে!"

আনন্দে রাথহরি কাঁদিয়া ফেলিল, রথহরি কাঁদিল, কালীপদ বাবু চক্ষু মুছিতে মুছিতে উভয়কে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

*

কু-চক্রান্তে সুফল ফলিয়াছে বলিয়া রথহরি ও রাথহরি উভয়ে কীর্ত্তিবাস ও যোগেন্দ্রকে মার্জ্জনা করিল।

প্রতিজ্ঞা।

[লেখক—শ্রীহেমচন্দ্র সেন।]

১

তব বিশ্ব মাঝে   সেজে নানা সাজে
কত খেলি দিনরাত ;
তুমি শুধু আছ   নীরবে চাহিয়া
কত দূরে বিশ্বনাথ!

২

তোমারি দেওয়া   তোমারি নেওয়া
তোমারি করুণা দানে ;
ক্ষণেকের সুখে   ক্ষণেকের দুখে
বাঁচিয়া আছি যে প্রাণে।

৩

অনন্ত আশায়   শোক নিরাশায়
আনন্দ-হিল্লোল বায় ;
কভু প্রেম-রঙ্গে   কভু আশা-ভঙ্গে
জীবন চলিয়া যায়।

৪

কি কাজে আমারে   পাঠালে সংসারে
কি কাজে দিন যে গেল ;
করিব বলিয়া   রাখিনু ফেলিয়া
কভু নাহি করা হ'ল।

৫

কত জন্মান্তর   এই ভাবে মোর
গেছে চলে কত বার ;
প্রতিজ্ঞা লইয়া   আশিস্ মাগিয়া
গেছি ফিরে কোটী বার।

৬

(পুনঃ) সংসারে পশিয়া   সকলি ভুলিনু,
বিস্মৃতি-সাগর আসি
ঢেকে দিল মোর   স্মৃতির কাহিনী
অনন্ত পিয়াসা পশি।

৭

ফেলিয়া রাখিনু   দূরে সরাইয়া
বিশ্বের প্রথম বাণী।
(যথা) জ্বলন্ত অনলে   পুড়িছে মক্ষিকা
আপন মরণ জানি।

৮

লভি যদি পুনঃ   মানব জীবন
সংসার-পাথারে আমি ;
যেন নাহি ভুলি   আদেশ তোমার
হে মম অন্তর যামী!

সাহিত্য-প্রসঙ্গ।

[লেখক—শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়।]

'ঋষি' রবীন্দ্রনাথ—

জ্যৈষ্ঠ মাসের 'সাহিত্য' পত্রে "ঋষি রবীন্দ্রনাথ" নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধটি সুলিখিত। যাঁহারা কথায়-কথায় যাহাকে-তাহাকে "ঋষি" শব্দের খয়রাৎ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে এ প্রবন্ধ পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

মনে পড়ে সে আজ প্রায় বার বৎসরের কথা, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'আত্ম-

জীবনী'তে বিশ্ব-শক্তির (Inspiration) দাবী করিয়া যখন নিজের কবিতাবলীর সমালোচনা করেন, দ্বিজেন্দ্রলাল তখন তাহা নীরবে সহ্য করিতে পারেন নাই ;—তাহার এক অতি তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথকে ঋষি করিবার যে চেষ্টা চলিতেছে, দ্বিজেন্দ্রলালের ঐ প্রতিবাদই তাহার মূল কারণ। তাঁহার প্রতিবাদটি প্রকাশিত হইলে, রবীন্দ্রবাবুর ভক্তগণ অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠেন, এবং রবীন্দ্রবাবু যে ঋষি, এই কথাটা তখন হইতেই তাঁহারা খুব জোরের সহিত প্রচার করিতেও আরম্ভ করিয়া দেন। সে প্রচার-কার্য্য এখনও বন্ধ হয় নাই। কিছুদিন পূর্ব্বেও, 'সাহিত্য' কাগজে একজন লেখক রবীন্দ্রনাথকে ঋষি প্রতিপন্ন করিবার জন্য অনেক গবেষণা করিয়াছেন।—এই রচনাটি তাহারই প্রতিবাদ। রবীন্দ্রনাথকে ঋষি বলিলে যে তাঁহাকে বিদ্রূপ করা হয়, এই কথাটাই আলোচ্য প্রবন্ধে বেশ ভাল করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

বাস্তবিক, যে দেশে বশিষ্ঠ, কাশ্যপ, ভৃগু, গৌতম, বিশ্বামিত্র ও নারদ প্রভৃতি ঋষি বলিয়া পরিচিত, সে দেশে রবীন্দ্রনাথের নামের পূর্ব্বে 'ঋষি' কথাটা বসিতে দেখিলে শুধু লজ্জা হয় না,—হাসিও আসে। এদেশে ভাল ভাল কবিতা ত অনেকেই লিখিয়াছেন, কিন্তু কৈ, কাহারও কপালে 'ঋষি' খেতাব ত কখনও জুটে নাই! তবে রবীন্দ্রনাথের কবিত্ব সমালোচনা করিতে যাইয়া এ প্রহসনের সৃষ্টি কেন? আর, 'বিশ্ব-শক্তি' (Inspiration) কথাটারও অর্থ আজ পর্য্যন্ত ভাল বুঝিতে পারিলাম না। রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বে এদেশের কোন কবিকেই বিশ্বশক্তির দাবী করিতে দেখি নাই। কাজেই ঐ কথাটা শুনিয়া একটু 'হতভম্ব' হইতে হয়।—কবির ভক্তগণকে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করে যে, রবীন্দ্রনাথ বিশ্ব-শক্তি লাভ করিয়াছেন, একথা তাঁহারা কেমন করিয়া জানিলেন? তিনি কি এমন কোনও জিনিষ লিখিয়াছেন, যে বিষয়ে পূর্ব্বে তাঁহার কোনও অভিজ্ঞতা বা ধারণাই ছিল না? যদি তাহাই হয়, তবে তিনি কেমন করিয়াই বা জানিলেন, যে, বিশ্ব-শক্তিই তাঁহাকে উহা শিখাইয়াছে? আর যদি বা তাহাও জানিয়া থাকেন, তাহা হইলে মানুষকে তাহা বিশ্বাস করাইবেন কিসের বলে?—তাই মনে হয়, 'বিশ্বশক্তি' কথাটার ধূয়া ধরিয়া রবীন্দ্রনাথকে 'ঋষি' প্রমাণ করিবার চেষ্টা করা নিতান্তই ছেলেমানুষী। 'সাহিত্যে'র লেখক একথাটা ধরিয়া একটু আলোচনা করিলে ভাল করিতেন। তাঁহার প্রবন্ধমধ্যে এইটা বাদ পড়িয়া গিয়াছে।

* * *

ছোট গল্প—

বিগত আষাঢ় মাসের 'ভারতবর্ষ' পত্রে "বিধবা" নাম দিয়া যে একটি গল্প বাহির হইয়াছিল, শ্রাবণ মাসের 'ভারতী' কাগজে তাহার নিন্দা হইয়াছে। অবশ্য, নিন্দার বিরুদ্ধে আমাদের কিছু না বলাই ভাল। তবে যে যুক্তিকে সম্বল করিয়া 'ভারতী'র লেখক গল্পটির নিন্দা করিয়াছেন, সে যুক্তিটা যে নিতান্ত অসার, তাহা পাঠকবর্গকে বুঝাইয়া দেওয়া দরকার।

গল্পটি শ্রদ্ধাস্পদ জলধর বাবুর লেখা।—গল্পে আছে যে, এক সতী রমণী তাঁহার মৃত স্বামীকে ভগবান-বিশ্বাসে নিজের কাতর প্রার্থনা জানাইলে, স্বামী তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া অন্তর্হিত হন। গল্পের শেষে এই ঘটনাটুকু আছে বলিয়া 'ভারতী'র লেখক আধ-আধ ভাষায় লিখিয়াছেন,—"কেবল দৈবের উপরে যাঁহারা চরিত্র বিকাশের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন, তাঁহারা কখনই উঁচুদরের লেখক নন।"—এ কথার উত্তরে সাহিত্য-গুরু বঙ্কিমবাবুর ভাষাতেই বলি,—"অর্থাৎ তুমি (Miracle) মান না। আমি তোমাদের মত ঈশ্বরের শক্তিকে সীমাবদ্ধ করিতে সম্মত নহি। একটি নৈসর্গিক নিয়মের দ্বারা ঈশ্বরানুকম্পায় নিয়মান্তরের অদৃষ্টপূর্ব্ব প্রতিষেধ যে ঘটিতে পারে না, এমত কথা তুমি বলিতে পার না। উপন্যাসে নৈসর্গিক বা অনৈসর্গিক কথা আছে, তাহাতে কি আসিয়া যায়? উপন্যাসে অনৈসর্গিক কথা থাকিলে ক্ষতি কি? অর্থাৎ যেখানে উপন্যাসকারের উদ্দেশ্য মানস ব্যাপারের বিবরণ, জড়ের গুণ ব্যাখ্যা নহে, তখন জড়ের অপ্রকৃত ব্যাখ্যা থাকিলে মানস ব্যাপারের ব্যাখ্যা অস্পষ্ট হয় না। বরং অনেক সময়ে অধিকতর স্পষ্ট হয়, এই জন্য জগতে শ্রেষ্ঠ কবির মধ্যে অনেকেই অতিপ্রকৃতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন।"

লেখক আর একস্থানে বলিতেছেন,—"সতী ডাকিলেই যে মৃত পতি শিকড় হাতে ফিরিয়া আসিবেন, এ রূপকথায় সাজে।···দৈব ঔষধ, দৈব মাদুলী যখন পঞ্জিকার বিজ্ঞাপনে বাহির হয়, তখন তা মানায় ভাল; কিন্তু গল্প সাহিত্যের মধ্যে তাহা জাহির করিলে লেখককে হাস্যাস্পদ হইতে হয়।"—কেন! যে দেশের লোকে বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছে যে, সতীর প্রার্থনায় ধর্ম্মরাজ তাঁহার মৃত স্বামীর প্রাণ ফিরাইয়া দিয়াছিলেন, সে দেশের লোকে ওরূপ গল্প শুনিয়া চমকাইবে কেন? যে দেশে এখনও তারকেশ্বরের মন্দিরে শত শত ব্যক্তি প্রত্যহ হত্যা দিতেছে, শিকড় পাইতেছে, সে দেশের লোক গল্পে উহার আমদানী দেখিয়া হাসিবে কেন? এ দেশের লোকে দৈব ঔষধে বিশ্বাস করে

বলিয়াই ত উহা বিজ্ঞাপিত হয়! অতএব, গল্পে উহা লিখিলে হাস্যাস্পদ হইতে হইবে কেন? সাহিত্য কি তবে সমাজ ছাড়া? সাহিত্যিকেরা কি তবে কেবল অসামাজিক সামগ্রীর ফেরী করিবেন? দেশের কথা ছাড়িয়া দিয়া বিলাতী গল্পের চর্ব্বিত চর্ব্বণ করিলেই কি তবে আর্টের চরম হইবে?

'ভারতী' কাগজে এই রকম 'ছেলেমানুষী' আজকাল খুবই ছাপা হইতেছে। দ্বিজেন্দ্রনাথের হাতে যাহা সৃষ্ট, রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীমতী স্বর্ণকুমারীর সেবায় যাহা পুষ্ট, সেই কাগজ আজ চ্যাংড়ামির লীলাভূমি হইতেছে দেখিয়া দুঃখ হয়!

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ—

বৎসরে বৎসরে যোগেন্দ্রচন্দ্রের কত ঘটা করিয়া স্মৃতি-সভা হইতেছে, সেই সভায় আসিয়া কত বড় লোকে কত বক্তৃতা দিতেছেন, অথচ এই ভাদ্র মাসেই বাঙ্গালা কাগজের আর একজন শ্রেষ্ঠ সম্পাদকের মৃত্যু ঘটিয়াছিল,—তাঁহার নাম আজ আমরা কেহই ভুলিয়াও মুখে আনি না!

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণকে আমরা সত্যই ভুলিয়াছি। বাঙ্গালা সংবাদপত্রকে তিনি কিরূপ পঙ্ক হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন, সে সংবাদ এখনকার আমরা কয়জনে জানি! কয়জনে বলিতে পারি, তাঁহার 'সোমপ্রকাশ' পত্র বাঙ্গালার কি উপকার সাধন করিয়া গিয়াছে?

'সোমপ্রকাশ' হইতেই এ দেশের বাঙ্গালা কাগজে রীতিমত রাজনীতির আলোচনার সূত্রপাত হয়। ঈশ্বর গুপ্ত যখন 'সংবাদ প্রভাকর' নাম দিয়া বাঙ্গালা দেশে প্রথম প্রাত্যহিক প্রকাশ করেন, তখন তাহাতে লিখিয়াছিলেন,—"আমরা সম্পাদকীয় ব্রতে ব্রতী হইয়া সুখ-সম্পত্তির প্রার্থনা করি না; পাঠকবর্গের অনুরাগই আমাদিগের সম্পত্তি, এবং সুখ্যাতিই আমাদিগের সুখ, তাহার নিকট অর্থ-সুখ সুখ নহে; তবে কার্য্য সম্পাদনার্থ যে যৎকিঞ্চিৎ প্রয়োজনীয় তাহা হইলেই পরম সৌভাগ্য স্বীকার করি। যাহাতে বঙ্গভাষায় লিপি-বিদ্যার পুরাতন রীতি পরিবর্ত্তন হইয়া উত্তমরূপে ভাব প্রকাশ হয়, আমরা তদর্থে যত্ন করি। নীতি, ইতিহাস, বিজ্ঞান, কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প, চিকিৎসা, পদার্থ-নির্ণায়ক, ধর্ম্ম এবং রাজকীয় প্রভৃতি বহুবিধ বিষয়ের আলোচনা করিয়া থাকি, দেশের কুরীতি সংশোধন জন্য বিস্তর অনুরাগ প্রকাশ করিতেছি।"—সাহিত্য-গুরুর এই মন্ত্রে বিদ্যাভূষণ মহাশয়ই প্রথম প্রকৃত দীক্ষিত হইয়াছিলেন। বলিতে কি, এ বিষয়ে

গুরুকেও তিনি ছাড়াইয়া উঠিয়াছিলেন। ফলে, তাঁহার 'সোমপ্রকাশে'র প্রভাব চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। শাস্ত্রী শিবনাথ বলিয়াছেন, "সোমবার আসিলেই লোকে 'সোমপ্রকাশ' দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া থাকিত। যেমন ভাষার বিশুদ্ধতা ও লালিত্য, তেমনি মতের উদারতা ও যুক্তি-যুক্ততা, তেমনি নীতির উৎকর্ষ। চিত্তের একাগ্রতাই 'সোমপ্রকাশে'র প্রভাবের মূলে ছিল। তিনি 'সোমপ্রকাশে' যাহা লিখিতেন, তাহার এক পংক্তিও কাহারও তুষ্টিসাধনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া লিখিতেন না। লোকসমাজে আদৃত হইবার লোভে লোকের রুচি বা সংস্কারের অনুরূপ করিয়া কিছু বলিতেন না। যাহা নিজে সমগ্র হৃদয়ের সহিত বিশ্বাস করিতেন, তাহা হৃদয় নিঃসৃত অকপট ভাষাতে ব্যক্ত করিতেন। তাহাই ছিল 'সোমপ্রকাশে'র সর্ব্বপ্রধান আকর্ষণ।" আসল কথা, সম্পাদক লোকটা যে দেশের ও দশের শিক্ষক, দ্বারকানাথই বাঙ্গালীকে ভাল করিয়া প্রথম বুঝাইয়া দেন। বুঝাইয়া দেন যে, শক্তির সহিত আন্তরিক ইচ্ছা থাকিলে পাঠকের রুচি পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন করিতে পারা যায়।

আজ দ্বারকানাথের কথা বলিতে বলিতে আর একজনের কথা মনে পড়িয়া দুঃখ হইতেছে। তিনি ৺দুর্গাচরণ রায়। দুর্গাচরণের "দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন" পড়েন নাই, এমন বাঙ্গালী পাঠক খুব কম আছেন বলিয়াই মনে হয়। অথচ এই দুর্গাচরণ সম্বন্ধেও এদেশের সাহিত্য-সেবীরা নির্ব্বাক—নীরব। দুর্গাচরণকে দ্বারকানাথ সহোদরাধিক ভালবাসিতেন। তাঁহারই স্নেহের শীতল ছায়ায় থাকিয়া দুর্গাচরণ সাহিত্য-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারই উৎসাহে তিনি 'দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন,' 'দুঃখ নিশি অবসান,' 'পাশকরা ছেলে,' 'চিনির বলদ' 'আগমনী' প্রভৃতি রসপূর্ণ রচনা লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এ সকল সংবাদ কখনও কাহাকেও লিখিতে দেখি না। যশের হিসাবে দুই বন্ধুরই অদৃষ্ট প্রায় তুল্য-মূল্য। দুর্গাচরণের সমস্ত রচনা আমরা পাইয়াছি। তাঁহার জীবন-কথাও অল্প বিস্তর সংগ্রহ করিয়াছি। ইচ্ছা আছে, তাহা প্রকাশ করিব।

দ্বারকানাথ ও দুর্গাচরণ, এই দুইজন শক্তিশালী লেখকেরই দ্বারা বঙ্গসাহিত্য পুষ্ট হইয়াছে। অতএব, এই দুইজনই আমাদের পরম কৃতজ্ঞতার পাত্র। কিন্তু এই দুই জনকেই আমরা ভুলিয়া আছি!—আমরা এমনই কৃতজ্ঞ!

বিস্মৃত স্মৃতি।

[লেখক—শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার, বি-এ।]

গঙ্গার ধারে দ্বিতল সেই বাড়ীখানি। কত যুগ কত শতাব্দী ধরিয়া বোসেরা পুরুষ-পরম্পরা-ক্রমে সেখানে বাস করিয়া আসিতেছিল, তারা নিজেরাই জানিত না। তবে জনশ্রুতি, কলিকাতা আক্রমণের সময় সিরাজের সৈন্যেরা নাকি সেখানে আসিয়া ছাউনি করিয়াছিল।

গঠন-সৌন্দর্য্য তার কিছু ছিল না। জীর্ণ প্রাচীর বেষ্টিত ততোধিক জীর্ণ গবাক্ষ বহুল সে ইষ্টক স্তূপকে বাসভবন বলিয়া মনে হইত না। যেন অতীতের সাক্ষ্য ক্রমশঃ কালের কোলে লুকাইতেছে। তবু তার প্রতি আমার কেমন একটা আকর্ষণ জন্মাইয়াছিল। কত সন্ধ্যায় তার পাশের ঘাটে আসিয়া বসিতাম; জাহ্নবীর কুলুকুলু স্বর এবং ওপারে সালিখার কলকারখানার স্তিমিত আলোক কি যেন এক স্বপ্নকুহক সৃজন করিত।

সেখানে এক বর্ষার সন্ধ্যায় তার সহিত আমার প্রথম পরিচয়। সমস্ত দিন অবিশ্রাম বারিবর্ষণের পর ক্লান্ত পর্জ্জন্যদেব কিয়ৎক্ষণের জন্য বিশ্রাম-সুখ লাভ করিতেছিলেন। কতক্ষণ ঘাটে বসিয়া বসিয়া বাড়ী ফিরিব বলিয়া উঠিতেই দেখি, কে একজন পশ্চাতে দাঁড়াইয়া।

"চমৎকার রাত্রি! নয়?"

আমি চকিতে লোকটির মুখের দিকে চাহিলাম, কি উত্তর দিব ভাবিয়া পাইলাম না। তাহাকে ইতিপূর্ব্বে কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়িল না। মৃদু হাসিয়া সে বলিল—"ভয় নেই। আমিও আপনার মত একজন নিশাচর। আপনাকে অনেক দিন আমি এখানে দেখেছি। রাত্রিটা সত্যি বড় চমৎকার।"

দূর গ্যাসের ক্ষীণালোকে লোকটিকে আর একবার ভাল করিয়া দেখিয়া উত্তর করিলাম—"সেটা অনুভূতি ও মনের গতির উপর নির্ভর করে।"

"তা সত্য। কিন্তু এ রাত্রি বড় মর্ম্মস্পর্শী। আকাশ যেন পৃথিবীর চিতার ওপর শান্তির জল ঢাল্‌ছে; আর জাহ্নবী পৃথিবীর মলামাটি জঞ্জাল বুকে করে বয়ে নিয়ে সমুদ্রের পায়ে ঢাল্‌তে চলেছে! কত ঐশ্বর্য্য, আবার কত মৃতদেহও এ টানের মুখে ছুটে চলেছে!"

লোকটিকে কোথায় যেন দেখিয়াছি ঠিক ধরিতে পারিতেছিলাম না। বলিলাম—"আপনি জীবনের অন্ধকার দিকটাই ধর্‌ছেন।"

"কতকটা তাই বটে। তবে বর্ষার এই গুরু গম্ভীর ভাবটা আপনা থেকেই মন উদাস করে দেয়।" বলিয়া লোকটি ফিরিল। দুই এক পদ অগ্রসর হইয়া সেই বাড়ীর দিকে চাহিয়া বলিল—"শুনছি নাকি বোসেদের বাড়ীখানা এতদিনে দৌহিত্র বংশে গেছে, তারা বিক্রী করবে? কি জানি বাড়ীখানার উপর আমার —যাক্।" বলিয়া লোকটা হঠাৎ থামিয়া চলিয়া গেল। আমি, যতক্ষণ দেখা গেল, কৌতূহলী দৃষ্টিতে তার প্রতি চাহিয়া রহিলাম।

মাসখানেকের পর পুনরায় একদিন তাহার সহিত সেই ঘাটে দেখা। কথায় কথায় সে বলিল—"আমার ওপর বাড়ীখানার কি যেন একটা আকর্ষণী শক্তি আছে। যেন সুদীর্ঘ প্রবাস-বাসের পর স্বদেশে ফেরার মত ভাব মনে হয়। অথচ কখনও আমি ও বাড়ীর মধ্যে যাইনি, ওর ছায়াও মাড়াই নি। কি জানি কেন? মানুষের মনের গতি এমনই দুর্ব্বোধ বটে! জন্ম মৃত্যু সবই যেন ছায়ার মত বলে মনে হয়! সম্মুখের ওই জাহ্নবী—একটানা ছুটে চলেছে; এমন কিছুই নয়। কিন্তু ওই জলের দিকে চেয়ে চেয়ে আমার কত ভাবনা আসে, জন্ম-জন্মান্তরের কত ছবি আবছায়ার মত যেন চোখের সামনে ভেসে ওঠে, স্মৃতির 'ছড়ে'র টানে কত বিস্মৃত সুর যেন ঝঙ্কার দিয়ে উঠে।"

বিস্মিত হইয়া লোকটির মুখের দিকে চাহিলাম। কি করুণ উদাস দৃষ্টিতে সে চাহিয়াছিল!

ইহার কয়েকদিন পরে লোকপরম্পরায় শুনিলাম, বাড়ীখানি বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। ক্রেতা—সেই ভদ্রলোকটি, জহুরী রায় কোম্পানীর মালিক অনিলচন্দ্র রায়।

(২)

তারপর প্রায় এক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, সুযোগ পাইলেই সন্ধ্যার পর সেই বাঁধাঘাটে আসিয়া বসি; মাঝে মাঝে সেই লোকটির কথা যখন মনে হয়—বাড়ীটার দিকে চাহিয়া থাকি। তেমনই জীর্ণ ইষ্টক স্তূপ, ভগ্ন প্রাচীর-বেষ্টিত প্রাঙ্গণে তেমনই গাছ আগাছার সারি আলো অন্ধকারে দাঁড়াইয়া আছে;—নূতন মালিকের তত্ত্বাবধানে কোন পরিবর্ত্তনই তাহাতে ঘটে নাই। শুনিয়াছিলাম বাটী ক্রয় করার পর অনিল বাবু কারবার বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। কেন, জানি নাই।

তাঁরই কথা ভাবিতে ভাবিতে আনমনে সন্ধ্যার পর বাড়ী ফিরিতেছিলাম, বিডন বাগানের সম্মুখে একখানা মোটর গাড়ী চাপা পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া গেলাম। কর্দ্দমলিপ্ত ছিন্ন বস্ত্রাদি সংবৃত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই দেখি সম্মুখে—অনিল বাবু। মোটরখানা তাঁরই। তিনি বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিয়া আমাকে বাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিতে চাহিলেন, আমি ধন্যবাদ জানাইয়া পাশ কাটাইলাম। এই সে-ই? প্রথমটা আমি চিনিতেই পারি নাই। সেই অকালবার্দ্ধক্যছায়াগ্রস্ত করুণ উদাস মূর্ত্তি, আর এই বিলাসী উৎসাহ-চঞ্চল তারুণ্যের ছবি—দু'য়ে কত প্রভেদ! কিসে এ পরিবর্ত্তন ঘটিল তাই ভাবিতে লাগিলাম।

মাস কতক পরে আর একদিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ। বাড়ীতে একটা চুরি উপলক্ষে রাত্রিতে জোড়াবাগান থানায় গিয়া ডায়েরী লিখাইতেছিলাম, এমন সময় টলিতে টলিতে কে একজন সেই কক্ষে আসিয়া প্রবেশ করিল। চাহিয়া দেখি—অনিল বাবু! কর্ম্মচারিটীর সহিত বোধ হয় তাঁর পরিচয় ছিল; সবিস্ময়ে তিনি বলিয়া উঠিলেন—"সে কি, অনিল বাবু! এ অবস্থায়—এত রাত্রে এখানে?"

"আমি ধরা দিতে এসেছি।"

"কেন?"

"হত্যাপরাধে।"

আমি শিহরিয়া উঠিলাম। কর্ম্মচারিটী হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন—"অনিল বাবু—খুনী ডাকাত নিয়েই আমাদের কারবার। আপনার চেহারায় খুনীর 'খ' পর্য্যন্ত নেই। আর, আপনাকে আমি খুব ভাল রকমই জানি, এক বছর ধরে 'রিহার্সাল' দিলেও আপনার দ্বারা খুন হতে পারে না। মাত্রাটা বোধ হয় আজ বাড়িয়ে ফেলেছেন—লোক দিয়ে বাড়ী পৌঁছে দেবো?"

"না রসময় বাবু। আমি মদ খাইনি। সত্যই খুন করেছি। আসুন আমার সঙ্গে, আমি লাস দেখাবো। গরম—টক্‌টকে লাল—থান থান রক্ত—এখনও তার বুক থেকে ঝরছে দেখ্‌বেন, আমার সঙ্গে আসুন।"

আমার শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। রসময়ের মুখভাবে বুঝিলাম যেন তিনি কতকটা বিচলিত হইয়াছেন। অকস্মাৎ রসময় বাবু চকিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—"অনিল বাবু—ও কি? ও কার ছায়া আপনার মুখে, কার চাউনি আপনার চোখে?—সে কি? অসম্ভব! অসম্ভব! বোসেদের রামবাবু

সে দিন যিনি মারা—কই না, আর ত কিছু নেই! কিন্তু কি আশ্চর্য্য! অনিল বাবু আপনি দেখ্‌ছি একজন যাদুকর। কিম্বা হয় ত এটা এক বাড়ীতে বাস করার ফল।”

অনিল বাবু শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়াছিলেন, রসময় বাবু তাঁহাকে নিজের কাছে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“আচ্ছা, কাকে খুন করেছেন, বলুন” বলিয়া একটা খসড়া কাগজ টানিয়া লইলেন।

“কাকে? কাকে—আমার ঠিক স্মরণ নেই। কিন্তু তাকে আমি জান্‌তাম। আচ্ছা বলছি—বলছি—দোহারা ফর্সা ফর্সা এক ছোকরা, অল্প অল্প গোঁফের রেখা উঠেছে,—গায়ে একটা মির্‌জাই—চোখে সুর্ম্মা—”

“তা হলে মুসলমান?”

“না, হিন্দু। তার বাঁ কপালে একটা কিসের দাগ। ওই যে সে চোখের সামনে শুয়ে পড়ে রয়েছে। ওকে আমি খুন করেছি—গলা টিপে মেরেছি—তার পর বুকে একখানা ছোরা বসিয়ে দিয়েছি। এই দেখুন হাতময় তারই রক্ত মাখা। কই না, রক্তের দাগ ত নেই; কিন্তু আমি খুন করেছি—এ ঠিক কথা। আসুন আপনারা আমার সঙ্গে, আমি লাস দেখাবো।”

“আসল ঘটনাটা কি? কোন স্ত্রীলোক ঘটিত—?

“হাঁ, কিন্তু কে সে, তা বল্‌ব না।”

“বেশ, এখন না বলেন পরে বল্‌বেন। এখন, লাসটা কোথায়?”

“আমি পুতে ফেলেছি। একাই তাকে বয়ে নিয়ে গিয়ে গঙ্গার ধারে বাগানের পশ্চিম কোণে গোর দিয়েছি। যখন মাটি চাপা দিই, চাঁদের আলোতে সে মুখখানা একবার ভাল করে দেখেছিলাম। ফুটফুটে মুখ—টানা টানা চোখ; যাক্, সে চোখ চিরদিনের মত বুজে গেছে, আর কোন স্ত্রীলোকের পানে অনুরাগ ভরা চাউনিতে চাইবে না।”

“কিন্তু এটা যে কৃষ্ণপক্ষ—চতুর্দ্দশী”।

“সত্যই ত! কিন্তু কি আশ্চর্য্য! এ যেন কতকালের ঘটনা, আবার মনে হচ্ছে যেন এই কতক্ষণ আগেকার। কিন্তু আর আমি চেপে রাখ্‌তে পারছি না। চোখের সামনে সেই ছবি—সেই ঘুমন্ত চোখের ওপর চাঁদের আলো রাতদিন ভেসে বেড়াচ্ছে। দূরে রাখবার উপায় নেই—তাই আজ ধরা দিতে এসেছি—আমায় ফাঁসী দিন, দ্বীপান্তর দিন,—এ স্মৃতি-প্রেতের হাত থেকে রক্ষা করুন।”

“অনিল বাবু, আমাদের ‘আইনে সন্দেহের ‘জড়’ রাখতে নেই। চলুন।

কিন্তু সঙ্গে একজন ডাক্তার চাই।" তারপর আমার দিকে চাহিয়া "আপনিও আসুন মশায়—সাক্ষী হবেন।"

(৩)

রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহরের পর আমরা কয়জনে যন্ত্রপাতি লইয়া সেই বাটীতে প্রবেশ করিলাম। অনিল বাবু পথ দেখাইয়া লইয়া চলিলেন। অযত্নরক্ষিত বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ—মাঝে মাঝে আগাছার স্তূপ অন্ধকার আরও জমাট করিয়া রাখিয়াছে। পশ্চিম প্রাচীরের কাছে আসিয়া অনিল বাবু এক সুবৃহৎ আম্র বৃক্ষের তলদেশে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন। বহুকাল পূর্ব্বেও সে স্থান খনিত হইয়াছিল বলিয়া কোন প্রমাণ ছিল না—গুল্ম লতা তৃণে সে স্থান সমাচ্ছন্ন হইয়া ছিল। তবু রসময় বাবুর ইঙ্গিতে সমভিব্যহারী কনেষ্টবলদ্বয় খনন করিতে আরম্ভ করিল। অনিল বাবুর দিকে একবার চাহিয়া দেখিলাম—তাঁর দৃষ্টি সেই গুল্ম লতার উপর নিবদ্ধ। কিন্তু কি সে দৃষ্টি! প্রতিহিংসা করুণা ক্রোধ মমতা যুগপৎ তাহাতে জাগিতেছিল!

অর্দ্ধ ঘণ্টা পরিশ্রমের পরও যখন কোন মৃতদেহের অস্তিত্ব পাওয়া গেল না, তখন রসময় বাবু প্রস্থানোদ্যত হইয়া বলিলেন—

"অনিল বাবু, আমি এ জান্‌তাম—আগেই বলেছিলাম।"

অনিল বাবু প্রত্যুত্তর না দিয়া কনেষ্টবলের হাত হইতে কোদালিটা ছিনাইয়া লইয়া গর্ত্তের মধ্যে নামিয়া পড়িয়া প্রচণ্ড বিক্রমে খনন করিতে লাগিয়া গেলেন। আমরা কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাঁর কার্য্যকলাপ দেখিতে লাগিলাম। অর্দ্ধদণ্ড পরে কি একটা কঠিন দ্রব্যে কোদালির আঘাত লাগিল। লণ্ঠনের আলোকে বুঝিলাম সেটা সম্ভবতঃ অস্থিখণ্ড। তারপর সাবধানে খনন করার পর ক্রমে ক্রমে একটা সম্পূর্ণ নরকঙ্কাল বাহির হইয়া পড়িল!

ডাক্তার বাবু অনেকক্ষণ ধরিয়া কঙ্কালটি পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—"আশ্চর্য্য! হৃৎপিণ্ডের পাশের পাঁজরটি পর্য্যন্ত ভাঙ্গা। অনিল বাবু, আপনি যে খুনী তার প্রমাণ পেলাম। কিন্তু এ খুন আপনি আজ বা কাল করেন নি। অন্ততঃ দু'শ বছর আগে এ পাপ করেছেন।"

রসময় বাবু বলিলেন—"এক্ষেত্রে অনিল বাবু, আপনাকে আমি গ্রেপ্তার করতে পারিনে। কিন্তু ব্যাপারটা বড়ই অদ্ভুত!"

"বড়ই আশ্চর্য্য! ঘটনাটা যেন সেদিনের বলে মনে হচ্ছে।"

"যাক্ আর কথায় কাজ নেই, এখন ফেরা যাক্। কিন্তু এ কথা আর মনে

রাখবেন না। অবশ্য এ বিষয়ে আমাকে একটা রিপোর্ট দিতে হবে, কিন্তু তাতে আপনার কোন ক্ষতি হবে না।"

বিমূঢ় অনিল বাবুকে বাটীর মধ্যে পৌঁছাইয়া দিয়া আমরা নিঃশব্দে ফিরিয়া আসিলাম।

আসল ঘটনাটা এই। থিয়যফিষ্ট পাঠক ইহার তত্ত্ব বিচার করিবেন।

অনিল বাবু কিন্তু সে ঘটনার পর সে বাটী ত্যাগ করেন নাই। আজ আর তিনি ইহলোকে নাই—তাই এ কাহিনী এতদিন পর জনসাধারণে প্রকাশ করিল্যাম। তারপর ৩।৪ বার সাক্ষাৎ কালে এ সম্বন্ধে তাঁহার সহিত আমার আলোচনা হইয়াছিল। কখনও তিনি তাঁহার ধারণার অসারতা বুঝিতেন, কখনও বা অর্থহীন নেত্রে শূন্যপানে চাহিয়া থাকিতেন। তিনি যে প্রকৃত হত্যাকারী সে ধারণা সম্পূর্ণরূপে তাঁহার মন হইতে দূরীভূত হইত না। হয়ত তিনিই ভাল বুঝিতেন। এক এক সময় আমারও মনে হয়, হয় ত বা 'মনোহি জন্মান্তরস্মৃতিজ্ঞম্'।

স্বপনে।

[লেখক—শ্রীঅবনীকুমার দে।]

স্বপন-ঘোরে ছিল আমার বিভোর বড় মন,
নিশার শেষে সেদিন তোমার পেলাম দরশন।
মাথায় ছিল উজল মুকুট প্রেমের কিরণ-ভরা,
চ'খের কোণে সোহাগ-দিঠি প্রীতির কাজল-পরা।
গলায় ছিল বকুলমালা, হাতে মোহন বাঁশী,
নূপুর পায়ে নেচেছিলে, স্বপন-ঘোরে আসি।
নূপুর তোমার বেজেছিল হিয়ার তালে তালে,
প্রাণবঁধুয়া এসেছিলে সেই সে নিশার কালে।
আজ্‌কে কেন পাই না দেখা, ওগো স্বপন-চোর!
পরাণ যেগো কেঁদে ওঠে দেখে নিশার ভোর।

রুসীয় সাহিত্য।

[লেখক—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দে।]

রুসীয় সাহিত্যের আলোচনা করিতে হইলে তাহাকে দুইটী বিশেষ ভাগে বিভক্ত করিতে হয়, কিন্তু দুইটী বিভাগ এমন ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ যে, একটীকে বাদ দিয়া অপরটীর আলোচনা করা চলে না, কারণ উভয়েই পরস্পরের উপর নির্ভর-পর। প্রাচীন ও নব্য-সাহিত্যের সম্মিলনজনিত যে সাহিত্য তাহাই এক্ষণে রুসীয় সাহিত্য।

রুসিয়ার প্রাচীন সাহিত্য ছড়া, গল্প, হেঁয়ালি, রূপকথা প্রভৃতি দ্বারা পূর্ণ; কিন্তু তৎসমুদায় প্রাচীনকাল হইতে পুরুষানুক্রমে মুখে মুখে প্রচারিত হইয়াছে এবং স্মৃতিপটেই রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে। উক্ত মৌখিক বা স্মৃতি-সাহিত্য যে অকিঞ্চিৎকর তাহা নহে। সেই সকল ছড়া ও কবিতাদি অমূল্য রত্নসম্ভারপূর্ণ। সে কালের রূপকথাদিও এতই সুন্দর, এতই মনোরম যে, আজও তাহা অমূল্য রত্নরূপে রুসীয় সাহিত্যে বিরাজ করিতেছে। সৌন্দর্য্য, মৌলিকতা ও কৃতিত্ব দ্বারা তাহার সর্ব্বাঙ্গ পরিশোভিত। সে কালের কাব্যময় সঙ্গীত ও বীরগাথা সকল শুনিলে রুস-জাতির মধ্যযুগ—দশম হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর অবস্থা স্পষ্টই উপলব্ধি হয়। তৎপরবর্ত্তী যুগে রুসীয় সাহিত্যের নব জাগরণের দিনে ডানিলেভ্ (Danilev), রিব্‌ণীকভ্ (Rybnikov), সাখারভ (Sakharov), ও অপরাপর মনীষীর সাহায্যে প্রাচীন বিক্ষিপ্ত সাহিত্য সংগৃহীত হইয়া লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উক্ত সাহিত্য হইতে কেবল যে রুসিয়ার ঐতিহাসিক তত্ত্ব জ্ঞাত হইতে পারা যায় তাহা নহে। তৎসমুদায় এতই উচ্চ ও গভীর ভাবপূর্ণ যে, আধুনিক যুগের শিক্ষিত সমাজে তাহা অতীব আগ্রহসহকারে পঠিত ও আলোচিত হইয়া থাকে। সেই প্রাচীন রুসীয় সাহিত্য কবিত্বে, ভাবের উচ্চতায়, ও রচনা-কৌশলে আজও এত উচ্চ বলিয়া পরিগণিত যে, ইউরোপের অপরাপর জাতির সাহিত্য অপেক্ষা কোন অংশেই হীন নহে।

মধ্যযুগের তিন শত বৎসর মধ্যে কতকগুলি উৎকৃষ্ট কাব্য ও ইতিহাস রচিত হইয়াছিল, কিন্তু ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মোগলদিগের দ্বারা দক্ষিণ রুসিয়া বারম্বার বিধ্বস্ত হয়; সেইজন্য রুস-সাহিত্যের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল। সুতরাং অনেক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ পৃথিবীর বিরাট সাহিত্যক্ষেত্র হইতে চিরদিনের মতন অন্তর্হিত হই-

য়াছে। সৌভাগ্যক্রমে অল্পসংখ্যক গ্রন্থ কোনও ক্রমে রক্ষা পাইয়াছিল। তাহার মধ্যে 'The Raid of Prince Igor' নামক গ্রন্থখানি কেবল যে উল্লেখযোগ্য তাহা নহে, উহার বিষয়-বৈভব ও রচনাকৌশল অতুলনীয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ফরাসী সাহিত্যে 'Chansen de Roland' পুস্তক যেরূপ উচ্চাঙ্গের, রুস সাহিত্যের 'The Raid of Prince Igor' তাহাপেক্ষা কোনও অংশে ন্যূন নহে। শেষোক্ত গ্রন্থ ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে পুনরাবিষ্কৃত হইয়া কেবল রুসিয়ার নহে, সমগ্র সভ্য জগতে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, এতাদৃশ উচ্চাঙ্গের গ্রন্থ বঙ্গভাষায় স্থান পায় নাই। তাতারীদিগের উপদ্রবে রুস সাহিত্য বিলুপ্তপ্রায় হইয়া থাকিলেও কিছুদিন পরে রুস-জাতির অন্তস্তল-নিহিত দেশাত্মবোধ পুনরায় জাগরিত হইয়া উঠে, রুস-জাতি পুনরায় নবোৎসাহে অপরাপর বিষয়ের সহিত সাহিত্যচর্চ্চায় মনোযোগী হয়।

ইতিপূর্ব্বে রুস-সাহিত্যের বিশেষ কোনও ধারা বা নিয়ম ছিল না, কিন্তু পরে যখন আধুনিক সাহিত্যের আবির্ভাব হয়,তখন হইতেই বর্ত্তমান সাহিত্যের প্রারম্ভ-কাল বলিতে হইবে। বর্ত্তমান বা আধুনিক সাহিত্যের বয়ঃক্রম অধিক নহে, অল্পাধিক এক শতাব্দী মাত্র। এই সময়ে রুসিয়ায় পাশ্চাত্য-শিক্ষার সূত্রপাত হয়, সেই সঙ্গে স্বদেশের প্রাচীন সাহিত্যের প্রতি তাহাদের দৃষ্টি পড়ে। পূর্ব্বে রুসিয়া বহির্জ্জগতের সহিত কোনও সম্বন্ধ রাখিত না, সুতরাং পশ্চিম ইউরোপে তখন কি হইতেছিল তাহার কোনও সংবাদ জানিত না। ইউরোপ তখন রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা, শিল্প প্রভৃতি সকল বিষয়ে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতেছিল, রুসিয়া এ সংবাদ রাখিত না। বহির্দ্দেশের বায়ু দেশ মধ্যে প্রবেশ লাভ করিতে না পারিলে দেশের অবস্থা, দেশের অঙ্গহীনতা দৃষ্টিপথে পতিত হয় না। সম্রাট পিটার-দি-গ্রেট্ তাহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং সেই জন্য রুসিয়ার পশ্চিম দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া বহির্জ্জগতের সহিত রুসিয়ার সম্বন্ধ স্থাপন করেন। সেই অবধি রুসিয়ার নবযুগের আবির্ভাব হয়। পিটারের বিদ্যমানকাল খৃষ্টীয় ১৬৭২ হইতে ১৭২৫ অব্দ।

উনবিংশ শতাব্দীতে সম্রাট আলেকজন্দারের শাসন-সময়কে বর্ত্তমান রুস সাহিত্যের অরুণোদয়-কাল বলা যাইতে পারে; কারণ সেই সময় হইতে প্রকৃত ও ধারাবাহিক সাহিত্য প্রচারিত হইতে থাকে। তৎপূর্ব্বকালের সাহিত্যকে রুসিয়ার সাহিত্য না বলিয়া রুসিয়ার ইতিহাসরূপে গণনা করাই সঙ্গত। শত শত বৎসর পূর্ব্বে যে বীজ রোপিত হইয়াছিল, উনবিংশ শতাব্দীতে তাহা অঙ্কুরিত হইয়া উদ্ভিদের

আকার ধারণ করে। দেশের রাজনীতিক অবস্থা পূর্ব্বে এতই সঙ্কটাপন্ন ছিল যে, প্রত্যেক বিপ্লবকালে দেশের আভ্যন্তরিক অবস্থা—রাজনীতি,সমাজনীতি, ব্যবসায়, বাণিজ্য, ধর্ম্মচর্চ্চা—এ সকলই বিপর্য্যস্ত হইয়াছিল, ফলতঃ সাহিত্যও অতল সলিলে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছিল; কিন্তু সম্রাট প্রথম আলেকজন্দারের রাজত্বকাল হইতে রুসিয়ায় নানাবিষয়ক সংস্কারের সূচনা হয়। সেই সুযোগে লুপ্তপ্রায় সাহিত্য ও তদানীন্তন মনীষিগণের চেষ্টায় নববেশ ধারণ করিয়া সভ্যজগতে আবির্ভূত হইল। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে যে ইগর-কাহিনী রচিত হইয়াছিল, তাহা প্রাচীন রুস-ভাষা ও রুস-সাহিত্যের আদর্শ গ্রন্থ। এই গ্রন্থ মৌলিকতা,ঐতিহাসিক তত্ত্ব, বর্ণনার বিশেষত্ব প্রভৃতির জন্য সমগ্র ইউরোপে আজিও যথেষ্টরূপে সমাদৃত। বহুদিন যাবৎ এই গ্রন্থের কোনও সন্ধান পাওয়া যায় নাই,কিন্তু পরে ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে কাউণ্ট-মুসিন-পুস্কিন (Count Mushin-Pushkin) দ্বারা উহা পুনরাবিষ্কৃত হইয়া ১৮০০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। অতঃপর সেই মহাকাব্য ইংরাজি, ফরাসী ও জর্ম্মাণ ভাষায় অনূদিত ও প্রকাশিত হয়।

দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত রুস-জাতি উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া আত্মগৌরব বিস্তার করিতেছিল। তখন কীভ-ই তাহাদিগের উন্নতির কেন্দ্রস্বরূপ হইয়াছিল, কিন্তু ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তাতারীদিগের আক্রমণে রুস-জাতি তিন শত বৎসরের জন্য পশ্চাতে হটিয়া গেল, উন্নতির স্রোত মন্থর ভাব ধারণ করিল, অধিক কি, ১২৪০ খৃষ্টাব্দের সভ্যতার কেন্দ্রস্থল কীভ সহরও বিধ্বস্ত হইয়া গেল। তাতারী-দিগের অত্যাচারে রুসগণ দক্ষিণাংশ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। এই সূত্রে পোলণ্ড ও লিথুয়ালিয়া রুসিয়া হইতে পৃথক হইয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিল, কীভের যাজক মস্কো সহরে আসিয়া আপনার কেন্দ্র স্থাপন করিলেন, দেশের সামন্তরাজগণ মস্কো সহরকে অবলম্বন করিয়া দিনপাত করিতে বাধ্য হইলেন। এক কথায় রুসিয়ার সভ্যতা ও সাহিত্য নিতান্ত ক্ষীণপ্রভ হইয়া পড়িল, কেবল ধর্ম্মসমাজ স্বকীয় স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল। যে কনস্তান্তিনোপল ইতিপূর্ব্বে ধর্ম্মবিষয়ে রোমকে পরাস্ত করিয়া আপন প্রাধান্য স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিল, এক্ষণে তাহারও প্রাধান্য বিনষ্ট হইল। এই সুযোগে—১৩২৮ খৃষ্টাব্দের অল্লাধিক পরে, মস্কো সহর তৃতীয় রোমের স্থান অধিকার করিল। এই সময়ে রুসিয়া ও পাশ্চাত্য সভ্যতার মধ্যে সুদৃঢ় ব্যবধান সংঘটিত হইল।

চতুর্দ্দশ শতাব্দী হইতে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ অবধি ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে

সাহিত্যাদির বহু উন্নতি হইতেছিল, কিন্তু রুসিয়া আর অগ্রসর হইতে না পারিয়া দিন দিন পশ্চাৎপদ হইয়া পড়িতেছিল। এইরূপে পাশ্চাত্য ইউরোপ ও রুসিয়া মধ্যে যে দুর্ভেদ্য প্রাচীর প্রতিষ্ঠিত হইল, তাহাতে রুসিয়ার যথেষ্ট ক্ষতি হইতেছিল। কিন্তু তদানীন্তনকালের সম্রাট তৃতীয় ইভানের সহিত বৈজাণ্টাইন সম্রাটদিগের ভ্রাতুষ্পুত্রী সোফিয়া পালিওলোগর বিবাহ হইলে নব সাম্রাজ্ঞী স্বীয় মাতৃভূমি হইতে কতকগুলি স্থাপত্য-ব্যবসায়ী ও অপরাপর বিদেশীয় শিল্পীকে রুসিয়ায় আনয়ন করেন। এই সঙ্গে সম্রাট পিটার-দি-গ্রেট্‌ রুসিয়ার পশ্চিম দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া ইউরোপে যাতায়াতের পথ খুলিয়া দিলেন।

দুর্দ্ধর্ষ ইভানের রাজত্বকালে (১৫৬৬ খৃঃ অব্দে) রুসিয়ায় সর্ব্বপ্রথম মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত এবং প্রথম পুস্তক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। তখন রুস-সাহিত্য ধর্ম্ম-সমাজের দ্বারা পরিচালিত হইত, ধর্ম্মসমাজের অনুমোদন ভিন্ন অপর সাধারণে কোনও পুস্তক বা পত্রিকার প্রচার করিতে পারিত না। যাহা হউক, আভ্যন্তরীণ নানা দুর্ব্বিপাকবশতঃ ধর্ম্মসম্প্রদায়ের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছিল, ফলতঃ ধর্ম্মসমাজের অর্থ ও শাসনশক্তি যেরূপ বিপর্য্যস্ত হইয়াছিল, সাহিত্যের অবস্থাও সেইরূপ দুর্দ্দশা-গ্রস্ত হইয়াছিল। রুসিয়ার ইতিহাসের সঙ্গে তদানীন্তন কালের সাহিত্যের বিক্ষিপ্ত ও সংক্ষিপ্ত সংবাদ পাওয়া যায় মাত্র, সুতরাং তাহাকে প্রকৃত সাহিত্য বা নিয়মিত সাহিত্য নামে অভিহিত করিতে পারা যায় না। যাহা হউক, রুসীয় সাহিত্যের ইতিহাস লিখিতে হইলে খৃষ্টীয় ৭ম ও ৮ম শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিতে হয়। সেই সময়ে শ্লাভজাতি নিপার নদের উপকূলবর্ত্তী স্থানে বাস করিত এবং তথা হইতে ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া সমৃদ্ধশালী হইতে থাকে, পরে ক্রমে কীভ (Keiv), স্মোলেংক্স (Smolenks) ও নবোগোরোদ (Novgorod) নামক কয়টী স্থানে বাণিজ্যকেন্দ্র ও সহর প্রতিষ্ঠিত হয়। নিপারকূলবর্ত্তী কীভ সহরই রুস-সাহিত্যের উৎস-স্থান। মস্কো ও সেণ্টপিটার্সবর্গ (আধুনিক পিট্রোগ্রাড) কীভ-জনিত সাহিত্যের বিকাশ স্থান মাত্র।

অতঃপর নবম শতাব্দীতে রুসিয়ায় স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ানদিগের আবির্ভাব হইলে রুস-সাহিত্যে একটা পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। স্ক্যাণ্ডিনেভীয়গণ নূতন দেশে বণিকরূপে আসিয়া ক্রমে প্রতিপত্তিশালী হইয়া উঠে। তাহাদিগের ভাষা রুসদিগের সাহিত্যে যথেষ্ট স্থান লাভ করিয়াছে। কোনও দেশে বিদেশীয়-দিগের আধিপত্য হইলে বিজিত দেশের সাহিত্যে অনেক নূতন ভাব, শব্দ প্রভৃতি স্বতঃই স্থান পাইয়া থাকে। ভারতীয় বিভিন্ন ভাষাতেও তাহার যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়।

মুক্তি-পত্র। *

[লেখক—শ্রীমন্মথমথন সরকার।]

বৃদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক সকারিণ প্রত্নতত্ত্বালোচনায় জীবনের শেষ কয়টা দিন কাটাইয়া দিতে সংকল্প করিয়াছিলেন। সযত্নে সংগৃহীত নানা দেশের অতীতের স্মারক চিহ্নগুলি লইয়া গবেষণা করিতে তিনি যৌবনাবধিই ভালবাসিতেন। আজকাল দীর্ঘ অবকাশ পাইয়া ইহাই তাঁহার একমাত্র কাজ হইয়া পড়িয়াছিল।

এক দিন এক জন বন্ধুকে তাঁহার পুরাবস্তুর ভাণ্ডাররক্ষিত রত্নরাজি দেখাইতে দেখাইতে বৃদ্ধ গবাক্ষের নিম্নদেশ হইতে একটি মাটীর রেকাবী তুলিয়া লইলেন। ঐ পাত্রটিতে মিশর দেশের চিত্রলিপি মুদ্রিত ছিল।

পাত্রটির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া সকারিণ বলিতেছিলেন—"দেখুন, রেকাবীটিতে যে চিত্রলিপি অঙ্কিত হইয়াছিল, তাহা এখনও বেশ অবিকৃত এবং সহজপাঠ্য আছে। কিন্তু উহা এখানে রাখিবার আরও কারণ আছে।"

এই বলিয়া তিনি অভ্যাসমত তাঁহার চশমাখানি নাসার উপরে একটু তুলিয়া দিয়া বন্ধুর দিকে চাহিয়া একটু অন্যমনস্কভাবে বলিতে লাগিলেন—

"আর জানেন, এমন অনেক প্রত্নতাত্ত্বিক আছেন, যাঁহারা পুরাবস্তুর বাজার দর বুঝিয়া আদর করেন। আমার কিন্তু অন্য ভাব। সুদূর অতীতের সম্বন্ধে যে পুরাবস্তুটি যত বেশী ভাব এবং কল্পনার উন্মেষ আমার মনের মধ্যে করিয়া দেয়, আমি সেইটিকে তত বেশী ভালবাসি। আমার অধিকারে যে জিনিষ কয়টি আছে, আমার একমাত্র সাধ—অতীতের সম্বন্ধে তাহাদের সহিত সুদীর্ঘকাল ধরিয়া কথাবার্ত্তা কহা। প্রাচীন কালের একটি খেলনা, সামান্য একটি পাত্র, ক্ষুদ্র একটি মুদ্রা, আমাকে কল্পনাপথে তাহাদের সমসাময়িক সভ্যতার মধ্যে লইয়া যায়; রাত্রির পর রাত্রি, আমি আমার এই কৌতুকাগারে একটি মাত্র পুরাবস্তু লইয়া বেশ সুখে কাল কাটাইয়া দিতে পারি; যে কালের স্মৃতি আজও সে বহন করিয়া আসিতেছে, আমি ঠিক্ সেই কালের অধিকার রাজ্যে চলিয়া যাই—বর্ত্তমান ভুলিয়া যাই, ভবিষ্যৎ বিস্মৃত হইয়া পড়ি—বিস্মৃতপ্রায় অতীতের রহস্যময় সাম্রাজ্যের অংশ হইতে অংশান্তরে কেমন উন্মত্ত হইয়া উধাও হইয়া

* ফরাসী গল্পের ভাবাবলম্বনে।

ঘুরিয়া বেড়াই! কখন আমার মনে হয়, আমি একজন পারস্য দেশবাসী বহু শতাব্দী পূর্ব্বেকার পৃথিবীতে বাস করিতেছি; কখন বা ভাবি, আমি একজন প্রাচীন গ্রীক্, প্রাচীন যুগের স্বপ্ন-রাজ্যের বাসিন্দা; আবার কখন কখন নিজেকে একজন অ্যাসিরিয়ান বলিয়া কল্পনা করিয়া বিস্ময়ে পুলকে বিহ্বল হইয়া পড়ি। ওঃ কি সুখময় সে স্বপ্নরাজ্য! কি পুলকভরা সে ভাবস্রোত! কি অনির্ব্বচনীয় সে আনন্দ! আমার ত মনে হয়, এই সব ব্যাপার এক একটা মহা মহা আবিষ্কার।

এই সময়ে তাঁহার বন্ধু বলিলেন—"কিন্তু, ঐ রেকাবীটার বিষয়ে ত কিছু বলিলেন না?"

"ও রেকাবিখানা? সে ত নিজের কাহিনী নিজেই বলিয়া আসিতেছে! প্রায় ৪০০০ বৎসর পূর্ব্বের এক টলেমির রাজত্বকালের এক অপূর্ব্ব উপন্যাস উহার গাত্রে খোদিত রহিয়াছে। ঐ চিত্রলিপিগুলি একটু পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন, যে সেগুলি কাল্পনিক বা আজগুবী নহে। ঐ লেখাতে একটা চুক্তির কথা খোদিত রহিয়াছে—খুব তাড়াতাড়িতে লেখা!"

"কি বলিলেন, চুক্তি?"

"হাঁ, চুক্তিই বটে,—মুক্তিপত্র,—এক আজীবন ক্রীতদাসীর মুক্তির সনন্দ! দেখিতেছেন ত রেকাবটা ভাঙ্গিয়া দুইখানা হইয়া গিয়াছিল। আর, উহা হালে সারানো হয় নাই। ভাঙ্গিয়া যাইবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এই ভগ্ন সংস্কার করা হইয়াছে। এই নিদর্শনটুকু হইতে আমি একটি যেন সুন্দর লুপ্তপ্রায় ইতিবৃত্তের পুনরুদ্ধার করিতে পারিয়াছি। মিশরের যে সমস্ত চিত্রলিপি আমরা আজ কাল পাই, তাহা হইতে আমরা কেবল এই একমাত্র সিদ্ধান্ত করিয়া বসি, যে,—প্রাচীন মিশরবাসিগণ গম্ভীরপ্রকৃতি, হৃদয়হীন, প্রেমস্পর্শবিহীন এক অপরূপ জাতি ছিল। আমাদের যুগের বহু পূর্ব্বে যাহারা এই পৃথিবীতে বসবাস করিত, তাহাদের রীতিনীতি, আচারব্যবহার আমাদের হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ছিল সত্য, কিন্তু, তাহাদের অস্তিত্বের শেষ স্মৃতি ঐ কঠিন, নির্ম্মম সমাধি-স্তম্ভগুলি দেখিয়া ইহা ধারণা করা বড় ভুল যে তাহারাও কঠিন হৃদয়, নির্ম্মম ছিল। বস্তুতঃ, তাহারাও আমাদেরই মত, ভাবপ্রবণ, হৃদয়বান্ দোষগুণসমন্বিত মানুষ ছিল। আমার এই ধারণার ভিত্তি—ঐ রেকাবীতে এবং অন্যত্র অঙ্কিত চিত্রলিপিগুলি; এবং বহু পুরাতত্ত্ববিদ্ ব্যক্তিগণও আমার এই ধারণা বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু, রেকাবীর কাহিনীটা আগে শুনুন।

"রাজকর্ম্মচারী মহামান্য অনসিরি আজিকার রাত্রি তাঁহার জীবনের শেষ রজনী মনে করিতেছিলেন। আর বাঁচিবার তাঁহার সাধ নাই—মৃত্যুকে বরণ করিতেও তাঁহার সাহস হইতেছে না! হায়! হায়! এত বড় উচ্চপদ যাঁহার, এত মর্য্যাদার যিনি অধিকারী, আজ কি না তাঁহাকেই একজন সামান্য পদানতের ন্যায় অপমানিত হইয়া মরিতে হইবে! ইহা কল্পনা করাও যে অতি ভয়ানক! নিঃসন্দেহ, আজ তাঁহার কোনও উচ্চাশায় তিনি নিরাশ হইয়াছেন, অথবা কোনও প্রকারে তাঁহার দর্প চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। এত বড় মানীর এত বড় অপমান! সে যে মৃত্যু সমান! বুঝি মৃত্যু অপেক্ষাও অধিক! তাই আজ বিলাসে সামগ্রীনিচয় বিষবোধে ত্যাগ করিয়া—সংসারের কোলাহল হইতে দূরে থাকিবার অভিপ্রায়ে,রাজোদ্যানের কৃত্রিম হ্রদটির মধ্যস্থিত ক্ষুদ্র একটি দ্বীপনিবাসের নির্জ্জনতার মধ্যে আপনাকে নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু, আত্মগোপনের শত প্রয়াস আজ ব্যর্থ হইয়া যাইতেছিল—মানুষের সকল শত্রুর চেয়ে যে শত্রু বড়, সেই মনকে তিনি বশ করিতে পারেন নাই। যে সময়ে তিনি কল্পনা করিতেছিলেন, বুঝি বা, বরাভয় হস্তদ্বয় অনসিরির তপ্ত শিরে সস্নেহে বুলাইয়া দিয়া, তাহার এই অসহ্য যন্ত্রণার চির-উপশম করিতে শান্তিদেবী নিঃশব্দ পদসঞ্চারে এই নির্জ্জন দ্বীপের নিভৃত কক্ষে ধীরে ধীরে নামিয়া আসিতেছেন;—ঠিক্ সেই সময়েই নিষ্ঠুর মনটা ভয়ানক বিশ্বাসঘাতকতা করিতেছিল! শান্তির শত কল্পনা নিমেষ মধ্যে কোথায় উড়িয়া যাইতেছিল,—ক্ষোভে এবং দুঃখে, ঘৃণায় এবং লজ্জায় তাঁহার সমস্ত হৃদয় ভরিয়া উঠিতেছিল!

মনকে দমন করিবার জন্য, অন্যমনস্ক থাকিবার জন্য, অনসিরি তাঁহার ক্রীত-দাসী মধুকণ্ঠী নেফটিসকে ডাকাইলেন। সে গোটাকতক মধুর গান শুনাইয়া তাঁহার দুর্বৃত্ত মনটা যদি থামাইয়া রাখিতে পারে! দাসী প্রভুর আদেশ পালন করিল। সূক্ষ্ম একখানি রেশমী বসনে দেহ-লতাখানি আবৃত করিয়া, পুষ্প-মুকুট-শোভিত-শিরে, বীণারঞ্জিত হস্তে ক্ষীণকটি তন্বী দাসী, গজেন্দ্র-গমনে আসিয়া প্রভুর সম্মুখে দাঁড়াইল; এবং দক্ষিণ করে লীলাভরে জানু স্পর্শ করিয়া পবিত্র শপথগ্রহণ পূর্ব্বক সেই সনাতন-পদ্ধতি অনুসারে একবার সসম্ভ্রমে কুর্ণিশ করিল। তাহার পরে, ধীর-পাদবিক্ষেপে প্রভুর সম্মুখস্থ টেবিলটির পার্শ্বে গিয়া একখানি স্থবর্ণ পাত্র মদিরাপূর্ণ করিয়া অনসিরিকে প্রদান করিল; এবং সন্তর্পণে উপবেশন করিয়া প্রভুর আদেশ প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। অনসিরি সুরাপাত্র নিঃশেষ করিয়া একটু নাড়িয়া চাড়িয়া সহজভাবে বসিলেন;

—পরচুলাখানা খুলিয়া, তিনি গলদেশ আবৃত করিয়া, ধীরহস্তে দীর্ঘ শ্মশ্রুর মধ্যে অঙ্গুলি-চালনা করিতে করিতে নেফটীশকে গায়িতে আদেশ করিলেন।

দাসী সে আজ্ঞা পালন করিল। যৌবনের আবেশ-ভরা, আবেগময় স্বরে নেফটীশ একটি মধুর নূতন সঙ্গীত গায়িল।

অনসিরি হাই তুলিতে তুলিতে বলিলেন,—"গানটা ভারি গম্ভীর ভাবের, ইহাতে আমার মনের কিছুমাত্রও শান্তি হইল না!"

নেফটীশ বীণাখানি ভূমিতলে রাখিয়া—যে অদ্ভুত বাজীকর এক মুহূর্ত্তে একটি সুবৃহৎ এবং সুগভীর হ্রদ বারিশূন্য করিয়া স্বর্ণ মৎস্য ধরিয়াছিল, তাহার সেই উপকথাটি অতি মধুর স্বরে ধীরে ধীরে বলিল।

তাহা শুনিয়া অনসিরি কহিলেন—"এই সমস্ত গল্পও আর আমার ভাল লাগে না। যাও! দাবা খেলার ছক্‌টা একবার নিয়ে এস।" নেফটীশ এবারেও প্রভুর আদেশ পালন করিল। যখন নেফটীশ ছক্ লইয়া তাঁহার অতি নিকটে আসিল, তখন অনসিরি তাহার পূর্ণ যৌবনের মদির গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া একবার চকিতে শিহরিয়া উঠিলেন। অন্যমনস্ক ভাবে দাবা খেলিতে বসিয়া যখন তাহাতেও মন বসিল না, তখন বিরক্ত হইয়া খেলা বন্ধ করিয়া দিয়া, এই সুশ্রী ক্রীতদাসীর দিকে তিনি তৃষ্ণার্ত্তনয়নে চাহিয়া রহিলেন। সে আজ কয়েক বৎসরের কথা, আসিয়াদেশীয় একজন বণিকের নিকট হইতে ঐ নেফটীশকে তিনি ক্রয় করিয়াছিলেন। তাহার পরে, এত দিন ধরিয়া তিনি তাহাকে শিক্ষিতা করিয়াছেন; সঙ্গীতবিদ্যায় পারদর্শিনী করিয়া তুলিয়াছেন; নৃত্যেও সে অদ্বিতীয়া হইয়া উঠিয়াছে!

অনসিরি হঠাৎ বলিয়া ফেলিলেন—"জান, নেফটীশ, তুমি অতিশয় সুন্দরী! আমি এত দিন তোমাকে এত কাছ হইতে দেখি নাই; ওঃ তুমি কি সুন্দরী!"

নেফটীশ তাহা জানিত। কক্ষের ভিত্তিসংলগ্ন দর্পণ, তাহার সেই আয়ত সুন্দর নেত্রদ্বয়, সেই সুশ্রী আননখানি, এবং তাহার তন্বী দেহের সমস্ত সৌন্দর্য্যরেখা স্পষ্ট প্রতিফলিত করিয়া অনেক বারই তাহাকে সেই কথা, সেই সত্য বলিয়াছে। তাই, আজ প্রভুর মুখে সর্ব্বপ্রথম তাহার সৌন্দর্য্যের প্রশংসা শুনিয়া নেফটীশ মৃদু হাস্য করিল। সমস্ত কক্ষে যেন বিদ্যুৎ চম্‌কাইয়া গেল; গৃহময় যেন মধু ছড়াইয়া পড়িল। অনসিরি ক্ষণিকের জন্য মনের অশান্তি বিস্মৃত হইলেন। তাঁহার নয়ন ক্রীতদাসীর সুন্দর মুখখানি হইতে আর ফিরিতে চাহিতেছিল না; অজ্ঞাতে তাঁহার হৃদয়ে একটা আগুন ধিকি ধিকি জ্বলিয়া উঠিল।

"আর জান, সুন্দরী, আমি তোমার উপর খুবই সন্তুষ্ট।"

নেফটীশ ধীরভাবে বলিল—"বলেন কি প্রভু? আপনি আপনার যৌবন হইতেই আপনাদের অভিজাত সম্প্রদায়ে রূপে গুণে অদ্বিতীয়। আপনার প্রশংসমান দৃষ্টি আমার ন্যায় একজন সামান্যা ক্রীতদাসীর উপরে পতিত হইবে ইহাও কি সম্ভব?"

এই বলিয়া সে ধীরে ধীরে অনসিরির প্রসারিত বাহুদ্বয় হইতে পশ্চাতে সরিয়া গেল। এই সময় তাহার সেই অপরূপ সৌন্দর্য্য এক দিব্যশ্রী-বিমণ্ডিত হইয়া উঠিল! "প্রভু, একজন ক্রীতদাসী আপনার অযোগ্যা—সম্পূর্ণরূপে অযোগ্যা।"

কিন্তু অনসিরি তখন তাহার রূপ-মদিরাপানে উন্মত্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার ধমনীতে ধমনীতে লালসার আগুন তীব্রতেজে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে। তিনি প্রভুর ন্যায় আদেশ করিলেন, বন্ধুর ন্যায় অনুরোধ করিলেন, প্রেমিকের ন্যায় বহুমূল্য উপহারের প্রতিশ্রুতি করিলেন; তথাপি, সুন্দরীর মন টলিল না। তাহার সেই এক কথা—"আপনি একজন সামান্যা ক্রীতদাসীর প্রেম-ভিখারী, ইহা যে আপনার অগৌরবের কথা, প্রভু!"

"আর যদি তুমি আমার ইচ্ছানুসারে আর ক্রীতদাসী না থাক? তবে?"—অনসিরি আবেগভরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

সুন্দরী কহিল—"কি? আমায় মুক্তি দেবেন?" "নেফটীশ, বাস্তবিকই আমি তোমায় খুব ভালবাসি; আজই আমি তোমাকে মুক্তি দিব।"

হর্ষের এক আকস্মিক জ্যোতিতে নেফটীশের নয়নযুগল প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে ধীর স্বরে কহিল—"প্রভু, ক্রীতদাসী তাহার প্রভুর কথামত কার্য্য করিতে বাধ্য; কিন্তু, স্বাধীনা রমণী তাহার হৃদয়-বাণীরই অনুবর্ত্তিনী হইবে।"

ছলনাময়ীর এই বাক্যের অর্থ ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম না করিয়াই, অনসিরি বলিয়া উঠিলেন—"তবে, তোমাকে একবার কেন, হাজার বার, আমি দাসত্ব-বন্ধন হইতে মুক্তি দিব।" এই বলিয়া তিনি গাঢ় আলিঙ্গনে বালিকাকে ধরিবার জন্য পুনরায় কর প্রসারিত করিলেন, বালিকা আবার মহনীয়ভাবে লীলাভরে তাঁহাকে নিরস্ত করিল।

"প্রভু, যদি তাহাই আপনার অভিপ্রায় হয়, তবে, লিখিয়া দিন যে আপনি আমায় স্বাধীনতা দিলেন।"

অনসিরি—"কিন্তু এখানে ত কোনও কেরাণী নাই, যে আমার আদেশ

লিখিয়া লইবে; আর কাগজ কলমই বা কৈ?" 'তাহাতে কিছু আসে যায় না, যে কোনও জায়গাতে লিখিতে পারেন। কেন? এই রেকাবীটাতেও লেখা চলিতে পারে ত? সমস্ত কথাই ইহাতে কুলাইয়া যাইবে।" এই বলিয়া একরূপ ছুটিয়াই সে কক্ষান্তর হইতে কালী কলম লইয়া সেখানে ফিরিল। অনসিরি মন্ত্রমুগ্ধবৎ খস্ খস্ করিয়া মুক্তিপত্র লিখিয়া দিলেন।

সুন্দরী সহর্ষে দেখিল—ঐ কয়েকটি পংক্তিতে তাহার ভাগ্যপরিবর্ত্তনও খোদিত হইয়া গেল!

কলমটা ছুঁড়িয়া দিয়া অনসিরি একরূপ বিজয়-গর্ব্বেই সুন্দরীর দিকে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু হায়! ক্ষিপ্রহস্তে রেকাবখানা তুলিয়া লইয়া নেফটীশ চিন্তার ন্যায় দ্রুতবেগে কক্ষত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল।

অনসিরি ভাবিলেন—ইহা রমণী-সুলভ একটা রহস্যমাত্র! বলিলেন, "তোমার মৎলবখানা কি, সুন্দরী!"

নেফটীশ হাসিল। তাহার সে হাসি অতি সুন্দর, আবার অতি নিষ্ঠুর। রমণী কহিল—"স্বাধীনা রমণী তাহার নিজের মতামত অনুসারেই কাজ করে। আমি আপনার বাগানের মালী হলাহোনিকে ভালবাসি, আমি কেবল তাহারই!"

এইরূপ অপ্রত্যাশিতভাবে প্রতারিত হইয়া অনসিরির ক্রোধাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল; তাঁহার দুর্ব্বলতার একমাত্র সাক্ষী সেই রেকাবিখানা ছিনাইয়া লইতে প্রয়াস পাইলেন। এই কাড়াকাড়িতে রেকাবখানা পড়িয়া গিয়া ভাঙ্গিয়া দুইখানা হইয়া গেল। কিন্তু নেফটীশ ক্ষিপ্রহস্তে খণ্ডদ্বয় কুড়াইয়া লইয়া নক্ষত্র-বেগে কক্ষ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

অনসিরি রাগে, ক্ষোভে এবং লজ্জায় জ্বলিয়া উঠিলেন; কিন্তু আর উপায় নাই। তাঁহার হৃদয়ের অশান্তি সহস্র গুণে বাড়িয়া উঠিল। তিনি কক্ষমধ্যে অস্থিরভাবে পদচারণা করিতে লাগিলেন।"

*   *   *   *

বৃদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক পরম যত্নের সহিত অতীতের সেই রেকাবখানি সযত্নে পূর্ব্ব স্থানে রাখিয়া দিলেন।

পরিশেষে তিনি বলিলেন—"সেই রজনীর পর চারি সহস্র বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে; আমাদের পৃথিবীও বহুবার পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে; কিন্তু মানব-হৃদয়ের কিছুমাত্রও পরিবর্ত্তন হইয়াছে কি?"

সাহিত্য-সমাচার।

নৈবেদ্য।—১ম সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩২২। শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র প্রধান, বি-এ, সম্পাদিত ও ৫।১এ মুর মহাম্মদ সরকার লেন হইতে প্রকাশিত।

সম্প্রতি আমরা এই নব প্রকাশিত মাসিকপত্রের কয় সংখ্যা পাইয়াছি। প্রথমে ত্রিবর্ণে মুদ্রিত বীণাপাণির চিত্র, তাহার পর সম্পাদকের 'প্রার্থনা' (কবিতা)—'আবাহন' (উচ্ছ্বাস) ও 'আমাদের কথা' (মাসিকপত্র প্রকাশের মামুলী 'কৈফিয়ৎ') প্রকাশিত হইয়াছে। শেষোক্ত প্রবন্ধটীর স্থানে স্থানে উদ্ধৃত হইল—(১) "বর্ত্তমান মাসিককুলের অবস্থা দেখিয়া কি বোধ হয়? বাণীর পবিত্র সেবাব্রতে দীক্ষিতা হইয়া আজি তাঁহারা সাধারণের মনোহরণের জন্য নর্ত্তকীর সজ্জায় সজ্জিতা। তাঁহাদের আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য্য আজি কৃত্রিমতার আবরণে দৃষ্টিবহির্ভূত। তাঁহাদের অঙ্গে, স্থানে অস্থানে—প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে চিত্রাবলীর বিচিত্র সমাবেশ। তাঁহাদের নিকটে বিদ্যাবত্তার অপেক্ষা দীর্ঘ-উপাধি-মণ্ডনের সমধিক আদর।"

(২) "দেশের এ দুর্দ্দিনেও দু'একখানি 'মাসিক' যে আদর্শ ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদের অযোগ্য সহযোগীরা স্বার্থের মলিন আবর্জ্জনা প্রক্ষেপে তাহার দীপ্তি ঢাকিয়া দিতেছেন।"

(৩) "সুলিখিত প্রবন্ধমাত্রেই আমরা সাদরে গ্রহণ করিব; লেখকের উপাধি, ঐশ্বর্য্য বা পদমর্য্যাদা আমরা বিচার করিব না।"

(ক) 'মাসিককুল' না বলিয়া 'অধিকাংশ মাসিক' বলিলেই ভাল হইত।

(খ) 'আগুন কখনও ছাই ঢাকা থাকে না' এই সাধারণ প্রবচনটী মনে থাকিলে সম্পাদক মহাশয় বোধ হয় এ মত প্রকাশ করিতেন না। প্রমাণ, মাসিকশ্রেষ্ঠ 'সাহিত্য'।

(গ) ব্যবসাদারী-কথা, মূল্যহীন। প্রমাণের অপেক্ষা করিতে বা অধিক দূর অগ্রসর হইতে হইবে না। পর পৃষ্ঠায় স্বর্গীয় কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এম-এ রচিত 'মুন্সেফ' শীর্ষক কবিতা পাঠে আমাদের কথার যাথার্থ্য উপলব্ধি হইবে। সম্পাদক বলেন যে, এই ব্যঙ্গ কবিতাটী স্বর্গীয় কবিবর তাঁহার কোনও বন্ধুর অনুরোধে লিখেন। মনে হয়, কবিতাটী কোন কোনও স্থানে নীতি-বিরুদ্ধ এবং কোন অংশেই ইহা কবিবরের অন্যান্য ব্যঙ্গ কবিতা বা হাসির গানের পার্শ্বে স্থান পাইতে পারে না। সম্ভবতঃ এই সব নানা কারণেই কবিতাটী এতাবৎকাল অপ্রকাশিত ছিল। সম্পাদক কি শুধু তাঁহার 'উপাধি, ঐশ্বর্য্য বা পদমর্য্যাদা'য় আকৃষ্ট হইয়া ইহা প্রকাশ করেন নাই? তাই বলিতেছিলাম, ৩নং উক্তি ভূয়া কথা মাত্র।

'প্রতারিত' গল্পটী বিশেষত্বহীন ও চর্ব্বিত চর্ব্বণ—'বিয়ে পাগলা বুড়া'র রূপান্তর মাত্র। 'সমাজ ও সমাজ-ধর্ম্ম'—সুলিখিত প্রবন্ধ। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত লিখিত 'শ্রীচৈতন্যের শিক্ষা' শিক্ষাপ্রদ নিবন্ধ। লেখক বলিতেছেন, 'যেখানে ভাষা আসিয়া ভাবের পাদমূলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে, অপরূপ উন্মাদনা আসিয়া দেহের সমস্ত ইন্দ্রিয়কে বিকল করিয়া দেয়'—ইত্যাদি। আমরা বলি, এই রচনায় 'ভাব' আসিয়া 'ভাষা'র পাদমূলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছে!

'ভুল' গল্পটী অসম্পূর্ণ। রমেশের যে 'কি সাংঘাতিক ভুল' হইয়াছিল একমাত্র লেখক ভিন্ন অন্যের তাহা বুঝিবার শক্তি নাই। এখানে 'অশ্বডিম্বে'র মত পদার্থ 'আর্টের' দোহাই দিলে হয়ত সাহিত্য-বিচারক লেখককে নিষ্কৃতি দিতে পারেন, পাঠক তাহাতে সন্তুষ্ট হইবেন কি? 'অযোধ্যা' ভ্রমণবৃত্তান্ত। পাঠকবর্গ দয়া করিয়া একবার অযোধ্যা পরিভ্রমণ করিয়া আসুন। বোধ হয়, সে ব্যয়টা এ প্রবন্ধ পাঠের অনুপাতে সহজসাধ্য হইবে।

কেবলমাত্র চাল ও কদলীতে পূর্ণ না করিয়া সম্পাদক মহাশয় মনোমত করিয়া বাগ্দেবীর চরণে একবার 'নৈবেদ্যে'র ডালি সাজাইয়া দিন, আমরা তাঁহার 'কথা'র সার্থকতা উপলব্ধি করি।

হিন্দুর দেবতত্ত্ব।

গণপতি।

[লেখক—শ্রীগিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ।]

বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র, হিন্দুর সর্ব্ব শাস্ত্রেই গণপতির মাহাত্ম্য সমভাবে বর্ণিত হইয়াছে। অন্য দেবতার পূজা করিতে হইলে অগ্রে গণপতির অর্চ্চনা করিতে হয়, গৃহ্যোক্ত সংস্কারাদির পূর্ব্বে গণেশ্বরের পূজা আবশ্যক, শ্রাদ্ধ শান্তি নিত্য নৈমিত্তিক যাহা কিছু হিন্দুর বৈধ অনুষ্ঠান, তাহার প্রত্যেকের সহিতই গণপতির অর্চ্চনা সম্বদ্ধ রহিয়াছে। সুতরাং আনুষ্ঠানিক হিন্দুর নিকট গণপতি সুপরিচিত।

বাঙ্গালায় গণপতির গজেন্দ্র বদন লম্বোদর এক দন্ত রক্তবর্ণ চতুর্ভুজ মূর্ত্তিই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তন্ত্র শাস্ত্রে এই দেবতায় অনেক প্রকার মূর্ত্তি-ভেদের পরিচয় পাওয়া যায়। তন্মধ্যে শারদাতিলকে যে সকল মূর্ত্তির বিবরণ কথিত হইয়াছে, তৎ সম্বন্ধে সম্প্রদায়ভেদেও কতক পার্থক্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ভিন্ন ভিন্ন সাম্প্রদায়িক টীকাকারগণ আবার স্ব স্ব সম্প্রদায়ানুযায়ী ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহার ফলে, মূলের অভিপ্রায় অত্যন্ত জটিল হইয়া পড়িয়াছে। প্রকৃত রহস্য যে কি, তাহা স্থির করাই অনেক স্থলে নিতান্ত কঠিন হইয়াছে। আমরা ক্রমে সেই সমস্ত স্থলের আলোচনা করিব।

শারদাতিলকে কথিত গণপতির ধ্যান, এই প্রকার,—

> "সিন্দূরাভং ত্রিনেত্রং পৃথুতর জঠরং হস্তপদ্মৈর্দ্দধানম্।
> দন্তং পাশাঙ্কুশেষ্টান্যুরু-কর-বিলস-দ্বীজপুরাভিরাম্।
> বালেন্দুদ্যোতি-মৌলিং করিপতি বদনং দান-পুরাদ্র্গণ্ডং।
> ভোগীন্দ্রাবদ্ধ ভূষং ভজত গণপতিং রক্ত-বস্ত্রাঙ্গরাগম্॥

এই পদ্যের অর্থ হইতে সাধারণতঃ বুঝা যায়, যিনি সিন্দুরের সমান বর্ণ, অর্থাৎ গাঢ় রক্তবর্ণ, যাঁহার চক্ষু তিনটি, যাঁহার উদর স্থূলতর, যিনি পদ্মসদৃশ হস্তের দ্বারা দন্ত, পাশ, অঙ্কুশ এবং বরদ মুদ্রা ধারণ করিতেছেন, বিপুল শুণ্ডদণ্ড ধৃত শোভমান মাতুলঙ্গ ফলের দ্বারা যিনি শোভা সম্পন্ন, চন্দ্রকলার দ্বারা যাঁহার

মস্তক দীপ্তিমান্, যিনি গজেন্দ্র বদন, অর্থাৎ হস্তিরাজের মুখ যাঁহার মুখস্থানে নিহিত, যাঁহার গণ্ডস্থল প্রভূত মদ জলের দ্বারা আর্দ্র, মহাসর্প যাঁহার ভূষণাকারে নিবদ্ধ রহিয়াছে, রক্ত বস্ত্রধারী এবং রক্তানুলেপন লিপ্ত সেই গণপতিকে ভজনা কর।

এই শ্লোকার্থের দ্বারা চারি হস্তে চারি প্রকার আয়ুধের অবস্থান মাত্র বুঝা যায়। কিন্তু কোন্ হস্তে কোন্ আয়ুধ তাহার নিশ্চয় হয় না। টীকাকার রাঘব ভট্ট বলেন, গণপতির ঊর্দ্ধস্থিত বাম দক্ষিণ হস্তে ক্রমে অঙ্কুশ এবং পাশ, অধঃস্থিত হস্তদ্বয়ে নিজের দন্ত এবং বরদ মুদ্রা চিন্তা করিবে। সমস্ত গণপতিকেই এক দন্ত রূপে ধ্যান করিতে হইবে। ইহাঁর মূর্ত্তি দক্ষিণ পার্শ্বে সদন্ত, অর্থাৎ যে একটি দাঁত মুখে আছে, তাহা ডানদিকে স্থিত বলিয়া ধ্যান করিতে হইবে। এই ধ্যানে গণপতির সর্পভূষণের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু বঙ্গদেশে সাধারণতঃ যে ধ্যানানুসারে গণপতির পূজা এবং প্রতিমা নির্ম্মাণ হইয়া থাকে, তাহাতে সর্পালঙ্কারের কোনও উল্লেখ নাই, এবং হস্ত সংখ্যার এবং আয়ুধেরও উল্লেখ নাই। তাহাতে কেবল খর্ব্বাকৃতি লম্বোদর সুন্দর গজানন মূর্ত্তির গণ্ডস্থলে ক্ষরিত মদ গন্ধ-লুব্ধ ভ্রমরের ব্যাপ্তি অর্থাৎ অধিষ্ঠান এবং দন্তাঘাত বিদারিত শত্রুর শরীর নিঃসৃত রক্তের দ্বারা নিজ দেহে সিন্দূর শোভা বর্ণিত হইয়াছে। (১)

রাঘব ভট্ট বিসর্গান্ত মন্ত্রের (গঃ) যে ধ্যান উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে হস্তে বরদ মুদ্রার পরিবর্ত্তে ভক্ষ্য ধারণের পরিচয় পাওয়া যায়। যথা—

"ধ্যায়ে দৈক্যেন দেবং বৃহদুদর তনুং তং চতুর্বাহুমেক
দন্তং পাসাঙ্কুশাঢ্যং গজমুখ-মরুণং দন্তভক্ষ্যে দধানম্।"

ঔকার যুক্ত মন্ত্রের ধ্যানে গণপতির হস্তে রক্তবর্ণ জপমালা ধারণের উল্লেখ আছে।

যথা—"রক্তাক্ষমালাং পরশুঞ্চ দন্তম্
ভক্ষ্যং স্বদোর্ভিঃ পরিতো দধানম্
হেমাবদাতং ত্রিদশং গজাস্যম্
লম্বোদরং হেকরদং নমামি ॥

---

(১) খর্ব্বং স্থূলতনুং গজেন্দ্র-বদনং লম্বোদরং সুন্দরং।
প্রস্যন্দন্মদ-গন্ধ-লুব্ধ-মধুপব্যালোল-গণ্ডস্থলম্ ॥
দন্তাঘাত-বিদারিতারি-রুধিরৈঃ সিন্দূর-শোভাকরং।
বন্দে শৈল-সুতা-সুতং গণপতিং সিদ্ধিপ্রদং কর্ম্মসু ॥

অধিকন্তু ইহাতে রক্ত বর্ণের পরিবর্ত্তে স্বর্ণের মত গৌরবর্ণের উল্লেখ দেখা যায়।

হ্রীংবীজ সমন্বিত ঔকারান্ত মন্ত্রের ধ্যানে গণপতির যুগল মূর্ত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এই মূর্ত্তি দ্বিভুজ, ইহাঁর হস্তদ্বয়ে পাশ ও অঙ্কুশ ধৃত হইয়া থাকে। ইহাঁর বর্ণ জবাকুসুমের মত গাঢ় রক্ত, ইনি বাম পার্শ্বস্থিত সুনয়না যোগিনী দেবীকে আলিঙ্গন করিতেছেন। দেবী বাম হস্তে মদ্য পূর্ণ সুবর্ণচষক (পান পাত্র) ধারণ করিয়া নিরন্তর মদ্যপানে বিভোর হইয়া দক্ষিণ হস্তের দ্বারা মদমত্ত রক্ত নেত্র বিঘ্নেশ্বরকে আলিঙ্গন করিতেছেন। দেবী নিজেও রক্তবর্ণা এবং সুমধ্যমা। ইহাঁর পারিষদ্‌বর্গও প্রভুর মত শক্তির সহিত পরস্পর আলিঙ্গন-নিরত। পূর্ব্বাদি-দিক্ ক্রমে ইহাঁদের অবস্থান চিন্তা করিবে। (১)

মহাগণপতি।

মহা গণপতি নামে অভিহিত গণেশের ধ্যানগম্য রূপ যে পদ্যের দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে, সেই পদ্যের ব্যাখ্যায় টীকাকারদিগের অতীব মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা ক্রমে প্রদর্শিত হইতেছে,—

হস্তীন্দ্রানন মিন্দুচূড় মরুণচ্ছায়ং ত্রিনেত্রং রসা
দাশ্লিষ্টং প্রিয়য়া সপদ্ম-করয়া স্বাঙ্কস্থয়া সন্ততম্
বীজাপূর-গদা-ধনু-স্ত্রিশিখ-যুক্ চক্রাব্জ পাশোৎপল-
ব্রীহ্যগ্র-স্ববিষাণ-রত্ন কলসান্ হস্তৈ র্বহন্তং ভজে॥

ইহার অর্থ ; যিনি গজরাজ মুখ, চন্দ্র যাঁহার মস্তক ভূষণ, যিনি রক্তবর্ণ এবং ত্রিনেত্র, যিনি নিজ ক্রোড়স্থিত পদ্মহস্তা প্রিয়া কর্ত্তৃক অনুরাগ বশতঃ নিরন্তর আলিঙ্গিত, যিনি হস্তের দ্বারা বীজপূর, (মাতুলঙ্গনেবু) গদা, ধনু, ত্রিশূল, চক্র, পদ্ম, পাশ, উৎপল, ধান্যাগ্র, নিজের দন্ত, এবং মণি-নির্ম্মিত কলস ধারণ করিতেছেন, সেই মহাগণপতি দেবকে ভজন করি।

(১) অমৃতাম্ভোধি-মধ্যেতু বারিজে কুঙ্কুমপ্রভে।
ঋতু-সংখ্য-দলোপেতে চিন্তয়েদ্‌গণনায়কম্॥
পাশাঙ্কুশধরং দেবং জবাকুসুম-সন্নিভম্।
বাম পার্শ্বস্থিতাং দেবী মালিঙ্গন্তং সুলোচনাম্॥
সুবর্ণ-চষকং শুভ্রং মধুনা পূরিতং সদা।
পিবন্তীং বাম হস্তেন যোগিনীং মদমোহিতাম্
রক্তবর্ণাং মহাদেবী মালিঙ্গন্তীং সুমধ্যমাম্।
বাহুনৈকেন বিঘ্নেশং মত্তং রক্ত বিলোচনম্॥
তত্র পান্ চিন্তয়ে দ্বিদ্বান্ গণান্ পূর্ব্বোদিতঃ ক্রমাৎ॥

যথাশ্রুত এই অক্ষরার্থ হইতে মহাগণপতির কোন্ হস্তে কোন্ আয়ুধ তাহা বুঝা যায় না, এবং হস্তের সংখ্যাও নিশ্চিত হয় না। রাঘব ভট্টের মতে এই দেবতার দশ হস্ত, তন্মধ্যে বাম ভাগস্থ অধঃস্থিত হস্ত হইতে দক্ষিণ ভাগে অধঃস্থিত হস্ত পর্য্যন্ত ক্রমে উক্ত দশটী আয়ুধ চিন্তা করিতে হইবে।

রাঘব ভট্ট কর্ত্তৃক প্রদর্শিত দ্রাবিড় সম্প্রদায়ের মতে অধোভাগে বাম হস্তে এবং দক্ষিণ হস্তে ক্রমে প্রথমোক্ত আয়ুধদ্বয় বীজপূর এবং গদা, তদূর্দ্ধ হস্তদ্বয়ে ধনু ও ত্রিশূল, তদূর্দ্ধ হস্তদ্বয়ে চক্র এবং পদ্ম, তদূর্দ্ধ হস্তদ্বয়ে পাশ এবং উৎপল, তদূর্দ্ধ হস্তদ্বয়ে ব্রীহির অগ্র এবং গজদন্ত বর্ত্তমান। এই মতের সমর্থক প্রমাণ গণেশ্বর বিমর্ষিণী হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

"দক্ষাধঃ করমারভ্য বামাধঃস্থকরান্তিকম্
গদাশূলাব্জ কহ্লার বিষাণং দক্ষিণৈঃ করৈঃ॥
শাল্যগ্র পাশ-চক্রেক্ষু-চাপ-সদ্বীজ পূরকম্
বামৈর্দ্দধানং মঞ্জীর-বিলসচ্চরণাম্বুজম্
লীলয়া রত্ন-কলসং পুষ্করাগ্রে নিধায় চ॥

দক্ষিণ দিকের অধঃস্থিত হস্ত অবধি করিয়া বাম দিকের অধঃস্থিত হস্ত পর্য্যন্ত আয়ুধগুলি চিন্তনীয়। দক্ষিণ ভাগস্থ পঞ্চ হস্তের দ্বারা ক্রমে গদা শূল পদ্ম উৎপল এবং দন্ত ধারণ করিতেছেন, এবং বাম ভাগস্থিত পঞ্চ হস্তের দ্বারা শাল্যগ্র পাশ চক্র ইক্ষুময় ধনু এবং মনোরম বীজ পূরফল ধারণ করিতেছেন। ইহাঁর পাদ-পদ্ম নূপুরের দ্বারা শোভমান, ইনি লীলা বশতঃ শুণ্ডাগ্রে মণিময় কলস ধারণ করিয়া অবস্থান করিতেছেন।

রাঘব ভট্ট এবং দ্রাবিড় সম্প্রদায় এতদুভয়ের মতেই রত্ন কলস শুণ্ডাগ্রে অবস্থিত; সুতরাং হস্ত শব্দে হাত এবং শুণ্ড এই উভয়ই অভিপ্রেত হইয়াছে। রাঘব ভট্ট স্বমত সমর্থনের জন্য গ্রন্থান্তর হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

"তদুক্তং, বামোর্দ্ধাদি ক্রমেণ—
চক্রপ্রাস রসাল কার্ম্মুক-গদা-সদ্বীজ পূর-দ্বিজ-
ব্রীহ্যগ্রোৎ পল-পাশ-পঙ্কজকরং শুণ্ডাগ্রজাগ্রদ্ ঘটম্॥

এই প্রমাণের প্রতি লক্ষ্য করিলে স্পষ্টই বুঝা যায়, বাম দিকের উর্দ্ধ করে চক্র, তৎপরবর্ত্তি নিম্ন করে প্রাস, তন্নিম্ন করে রসাল কার্ম্মুক (ইক্ষুধনু) গদা এবং উৎকৃষ্ট বীজ পূর ফল।

দক্ষিণ দিকের উর্দ্ধ করে দন্ত, তন্নিম্নে ব্রীহ্যগ্র, তন্নিম্নে উৎপল, তন্নিম্নে পাশ এবং তন্নিম্নে পদ্ম বর্ত্তমান।

গণেশ্বর বিমর্ষিণীর প্রদর্শিত প্রমাণানুসারে, দক্ষিণ করে গদা, শূল, পদ্ম, কহ্লার (উৎপল বিশেষ, সৌগন্ধিক শুন্ধাই ইতি ভাষা) এবং দন্ত বর্ত্তমান। বাম হস্তে শাল্যগ্র, পাশ, চক্র, ইক্ষুধনু এবং বীজপুর বর্ত্তমান। সুতরাং উভয় মতের সামঞ্জস্য হইতেছে না।

তন্ত্র প্রদীপ টীকার মতে মহাগণপতির দ্বাদশ ভুজ। "ত্রিশিখ যুক্" এই পদের দ্বারা দুইটি ত্রিশূল গৃহীত হইয়াছে, এবং ধনুর দ্বারাই অনুক্ত বাণেরও গ্রহণ হইয়াছে; সুতরাং দ্বাদশ হস্তে দ্বাদশায়ুধ বর্ত্তমান। এই মতটি টীকাকার আংশিক অপ্রমাণ করিয়া ত্রিশূলদ্বয়ের পরিবর্ত্তে বাণ ও রত্ন কলস, এতদুভয়ের দ্বারা দ্বাদশায়ুধ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। ইহাঁর মতে প্রমাণান্তরে শুণ্ডাগ্রে যে রত্ন কলসের উল্লেখ আছে, সেই কলস স্বতন্ত্র; আয়ুধের সহিত তাহার কোনও সম্বন্ধ নাই। উক্ত টীকাকার মহাগণপতির দশ হস্ত, এই মতটি অন্যের অভিমত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। দেবতার কোন্ হস্তে কোন্ আয়ুধ থাকিবে, তৎ সম্বন্ধে তিনি কিছুই বলেন নাই।

রাঘব ভট্টের মতে মহাগণপতি-প্রিয়ার বাম হস্তে পদ্ম বর্ত্তমান থাকিবে এবং দক্ষিণ হস্তের দ্বারা তিনি আলিঙ্গননিরতা থাকিবেন।

ক্রমশঃ।

দেওয়ানা। *

[লেখক—শ্রীঅবনীকুমার দে।]

কাশ্মীরের শৈলমূলে এক দেওয়ানা বালক সর্ব্বদাই পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইত, আর সেই শৈলপ্রদেশের নিকটস্থ কোন পল্লীতে এক দীর্ঘ বিরাট শ্মশ্রু বৃদ্ধ পাঠান কৃষক বাস করিত। প্রতিদিন অস্তমিতপ্রায় সূর্য্যের আলোকে, গোধূলি সময়ে, যখন সে আপনার মনে গৃহে ফিরিত তখন প্রায়ই পথিমধ্যে ঐ দেওয়ানা বালককে দেখিতে পাইত। বালক কখন অন্যমনস্ক হইয়া কোনও অজানা পাখীর ডাকে কাণ পাতিয়া বসিয়া থাকিত, কখনও বা নীল আকাশের খণ্ড খণ্ড মেঘচ্ছটার গতিনিরূপণ করিবার জন্য উর্দ্ধদিকে চাহিয়া থাকিত। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময়

* কাশ্মীর কথা-সাহিত্য।

গৃহপথে ঐ দেওয়ানাকে দেখিয়া বৃদ্ধের অভ্যস্ত হৃদয়টা ক্রমশঃ এমন হইয়া উঠিল যে, ক্বচিৎ দেওয়ানাকে না দেখিতে পাইলে তাহার 'মন-কেমন' করিত।

তাহার কি রূপ! কি উজ্জ্বল আঁখিতারা! বালক যখনই বৃদ্ধের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিত তখনি তাহার মনে হইত যেন কি এক অদ্ভুত যাদুমন্ত্রবলে সে তাহার হৃদয়-কেন্দ্রের অতি গুহ্যতম স্থলটি পর্য্যন্ত আবিষ্কার করিয়া লইতেছে। যেন তাহার অন্তরের অন্তরতম কক্ষটিও এই দেওয়ানা বালকের নিকট কত প্রস্ফুটভাবে অভিব্যক্ত।

এই পাঠান অত্যন্ত সরল প্রকৃতির লোক ছিল। সেদিন কার্য্যশেষে গুণ গুণ গান করিতে করিতে গৃহে ফিরিবার পথে দেওয়ানাকে দেখিতে পাইয়া তাহার হৃদয়টা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া উঠিল। পরস্পর অভিবাদনাদির পব কথায় কথায় বৃদ্ধ একটু সহানুভূতিস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা দোস্ত্! বল্‌তে পার তুমি কোন্ দুঃখে দেওয়ানা?"

কৃষকের প্রশ্নে দেওয়ানার মন ছিল না। কারণ তখন অতি গাঢ়কৃষ্ণবর্ণ একখণ্ড মেঘ ভেদ করিয়া সবে পাহাড়তলীতে চাঁদ ফুটিয়া উঠিয়াছিল। বালক সেইদিকে চাহিয়াছিল।

বৃদ্ধ পাঠানও এক দৃষ্টিতে বালকের চন্দ্রিকা-স্নাত মুখখানি দেখিতেছিল। বালক ফিরিয়া দেখিল, পাঠান-কৃষক তাহারই দিকে চাহিয়া আছে। তখন সে একটু রসিকতা করিয়া বলিল, "কি বুড়া মিঞা?"

বৃ। বল্‌ছিলাম দোস্ত তুমি কেন দেওয়ানা?

দে। দেওয়ানী ক'রে।

বৃ। ঐ ভাই তোমার কি এক হেঁয়ালীপানা কথা,—তার মাথা মুণ্ডু নেই।

দে। আচ্ছা সত্যি শুন্‌তে চাও আমি কেন দেওয়ানা হয়েচি?

বৃ। যদি মেহেরবাণী ক'রে শোনাও।

দে। আমার কথার দাম কি দেবে?

বৃ। আমি গরীব চাষাভূষো লোক—আমি তোমার কি কর্‌তে পারি?

দে। তুমি আমায় কাঁধে কর্‌তে পার?

বৃ। আমি বুড়া মানুষ, তোমার ভার সইতে পার্‌ব কেন?

দে। তবে তুমি আমার কাঁধে ওঠ।

বৃ। কি আহাম্মক্! তুমি জোয়ান ছেলে আর আমি এত বৃদ্ধ হয়ে তোমার কাঁধে চাপ্‌ব?

দে। তবে আর শুনে কাজ নাই—অমনি চল, বাজে কথা রেখে দাও।

উভয়ে চলিতে লাগিল। তখনও পথের ধারে সমতলক্ষেত্রে কতগুলা কৃষক ধান কাটিতেছিল। দেওয়ানা তাহাদিগকে দেখাইয়া বলিল, "ওরা কি আজ কিছু খাবে দাবে না ?"

বৃ। ওরা ত দুপুর বেলা একবার খেয়েছে।

দে। কি রকম ? এই ত সবে তা'রা ধান কাট্‌তে সুরু করেছে,—এরই মধ্যে খাওয়া হ'ল কোথা থেকে ?

বৃ। কি জানি বাপু, অতো বাজে বক্‌তে পারি না।

(২)

তাহারা নিঃশব্দে আরও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে দেখিতে পাইল কতকগুলা লোক একটা মৃতদেহ বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে। দেওয়ানা জিজ্ঞাসা করিল, "সত্যি কি লোকটা মরে গেছে না এখনও জীবিত আছে ?"

দেওয়ানার এইরূপ কথা শুনিয়া বৃদ্ধ পাঠান একেবারে বিস্মিত হইয়া গেল এবং পরক্ষণেই একটু রাগিয়া উত্তর করিল, "কি আর বল্‌বো ! তোমার মত বোকা ছেলে আমি ত আর দেখি নাই ! দেখতেই পাচ্ছ সম্মুখে মৃতদেহ কবরে নিয়ে যাচ্ছে, তবু বলচো মরেছে কি না ! তোমার বুদ্ধি-শুদ্ধি নেই দেখ্‌ছি !

তাহারা পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিল এবং চলিতে চলিতে এক ক্ষুদ্র নির্ঝরিণীর কূলে উপনীত হইল। ছোটখাট একটী পাহাড়ে নদী, সকলেই হাঁটিয়া পার হইয়া থাকে। তাহার ওপারেই পাঠানের গৃহ। দেওয়ানা বলিল, "বন্দেগী দোস্ত্‌ ! আজ তবে আমি আসি।"

সরলচিত্ত কৃষক উত্তর করিল, "দোস্ত ! যদি এতটাই আসিলে তবে মেহের-বাণী করে আজ আমার ঘরে মোসাফের হও।"

দে। তোমার ঘরের কড়িকাঠ বেশ মজবুদ্‌ আছে ত,—আমার ভার সইতে পারবে ?

কপটতা-বিহীন পাঠান এবার বাস্তবিকই রাগিয়া গেল ; কিন্তু পরক্ষণেই বালকের সরল মুখ দেখিয়া আত্মসম্বরণ করিল এবং মৃদু হাসিয়া বলিল,—"চল না হয় তোমার যত ইচ্ছা নাচিয়া দেখিবে"।

পাঠান তখন তাহার শততালীযুক্ত জীর্ণ পাদুকা উন্মোচন পূর্ব্বক হাতে করিয়া নদী পার হইতে চলিল, কিন্তু দেওয়ানা তাহার মূল্যবান পাদুকা খুলিল না। এবার বাস্তবিকই বৃদ্ধ অত্যন্ত চটিয়া উঠিল। বলিল "তুমি মানুষ না আর

কিছু যে, তোমার এতটুকু কাণ্ডজ্ঞানও নেই? আমার এই ছিন্নভিন্ন ধূলি ধূসরিত জুতা তাও আমি এত যত্নে হাতে করে নিয়ে যাচ্ছি, আর তুমি কি না এত মূল্যবান জুতা জোড়াটা অক্লেশে জলে ডুবাইলে?"

দেওয়ানা বৃদ্ধের ক্রোধ দেখিয়া মনে মনে কৌতুক অনুভব করিতেছিল। এবার তাহাকে আরও রাগাইয়া দিবার জন্য ততোধিক উচ্চস্বরে বলিল,—"তুমি এর মর্ম্ম কি বুঝ্‌বে? বুড়ো বয়েসে তোমায় বাহাত্তুরে ধরেছে।" বৃদ্ধ খুব রাগিয়াছিল; আর কোনও উত্তর করিল না।

তাহারা গৃহদ্বারে উপনীত হইল। দেওয়ানা পুনরায় কহিল,—"কি দোস্ত্‌! আমার ভর সইবে ত?" বৃদ্ধ ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল এবং তৎক্ষণাৎ কাঠের সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়াই ক্রমান্বয়ে কয়েকবার উচ্চ উল্লম্ফন করিয়া বলিল,—"এই দেখ না তোমার ভর সইবে কি না!"

দেওয়ানা হাসিয়া বৃদ্ধকে ধরিয়া বসাইল।

উপরে দুম্‌দাম্‌ ও উচ্চ হাস্যধ্বনি শুনিতে পাইয়া বৃদ্ধের একমাত্র কন্যা তাহার পিতাকে নীচে ডাকিয়া বলিলেন—"কি হয়েছে বাবা, কে এসেছে?"

পি। মোসাফের।

ক। তবে এত শব্দ হচ্চিল কিসের?

পি। লাফমারার।

ক। কি? কিসের?

পি। লাফমারার রে বেটী, লাফমারার। ঐ ছোক্‌রাকে আজ আমাদের ঘরে আস্‌তে বলায় আমাকে বল্লে কি না 'তোমার কড়িকাঠে বেশ জোর আছে ত, আমার ভার সইতে পারবে?' তাই আমি সহ্য কর্‌তে না পেরে লাফিয়ে উঠেছিলাম। দুষ্ট ছোঁড়াটা সারা রাস্তাটা আমায় ভারী জ্বালাতন করে মেরেছে।

(৩)

কৃষককন্যা যুবতী।—তাহার উপর সুন্দরী ও বুদ্ধিমতী। সে পিতার মুখে একে একে সমস্ত কথা শুনিল। শুনিয়া তাহার কিছুই বুঝিতে বাকী রহিল না। অবশেষে সরলচিত্ত পিতাকে বুঝাইয়া বলিল,—"বাবা, তুমি ভুল বুঝেছ। মোসাফের তোমার ঘরের কড়িকাঠ মজবুদ্‌ আছে কি না জান্‌তে চান্‌ নাই। তিনি তোমার আসল কড়ি কতদূর মজবুদ্‌ আছে প্রকারান্তরে তাহাই জান্‌তে চেয়েছিলেন। কারণ তুমি যে তাঁকে নিমন্ত্রণ করেছ, তাঁর উপযুক্ত মর্য্যাদা রক্ষা কর্‌তে পার্‌বে কি না তা' তিনি কেমন ক'রে জান্‌বেন? বাবা! উনি নিশ্চয়ই কোনও মহৎ ব্যক্তি।

পি। দূর্ বেটী, আজ দেখ্‌ছি তুইও খেপেছিস্। আহাম্মক্ ছেলেটা একের নম্বর বোকারাম,বলে কি না "হয় তুমি আমায় কাঁধে কর, নয় আমার কাঁধে উঠ। বলত দেখি একে পাগল ছাড়া আর কি বল্‌তে হয় ?"

ক। বাবা! আমার বোধ হয় এর মানে হচ্ছে—হয় তুমি তাঁকে আশ্রয় দাও, নয় তুমি তাঁর আশ্রিত হও।

পি। বাঃ কি পণ্ডিত রে! বলি চাষারা দুপুরে খেয়ে দেয়ে এসে ধান কাট্‌চে তবু বল্‌ছে "এরা খাবে কখন ?" বলি এটাও কি আক্কেলের কথা হ'ল ?

ক। বাবা, বেশ বুঝে দেখ্‌লে এটাও একটা আক্কেলের কথা। বলি ওরা আজ যে ধানটা কাট্‌ছে তার মজুরীটাত এখনও পায়নি, তবে আজ তাদের খাওয়া হ'ল কি করে ?

পি। বটে!

কৃষক একমনে কিছুক্ষণ কি ভাবিতে লাগিল। পিতাকে নিরুত্তর দেখিয়া কন্যা শেষে নিজেই বলিল,—"আর কি কি বলেছেন বাবা ?"

পি। কি আর বল্‌বেন—পাগ্‌লামি। পথে একটা মড়া নিয়ে যাচ্ছিল, তাই দেখে বল্লে—"সত্যই মরেছে না বেঁচে আছে ?" বল্‌ত দেখি এর কি উত্তর ?

ক। এর জবাব ত খুব সোজা। লোক মরে যায়, কীর্ত্তি থাকে। শুধু কীর্ত্তিই মানুষকে অমর করে রাখে; নহিলে সকলেই জ্যান্তে-মরা হয়ে থাকৃত। কাজেই তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "সত্যই লোকটা মরেছে না বেঁচে আছে", অর্থাৎ লোকটার কোনও কীর্ত্তি আছে কি ?

পি। আচ্ছা বুঝ্‌লাম সবই ঠিক; কিন্তু কোন্ আক্কেলে জুতো পায় দিয়ে নদীটা পেরুতে গেল ?

ক। জানইত জলে অনেক পাথর কুচা, কাঁটা খোঁচা পায়ে ফুটবার ভয় আছে, কাজেই যতটা সম্ভব সাবধান হয়ে চল্‌তে হয়। আমি ঠিক বুঝেছি ইনি ছদ্মবেশী, কোনও বাদ্‌শার ছেলে হবেন; নইলে এমন ধারা কখনও হতে পারত না। বাবা! তাঁকে অতি সমাদরে অভ্যর্থনা করে বসাও। আমি নিজে রান্না কর্‌ব; আজ খুব যত্ন ক'রে মোসাফেরের সেবা ক'রো।

(৪)

কৃষক-কন্যা টাট্‌কা ডিম দিয়া উৎকৃষ্ট রুটি ও অতি উপাদেয় ডাল প্রস্তুত করিল। অবশেষে সহস্তে উত্তম রূপে গৃহ পরিষ্কার করিয়া, আসনাদি পাতিয়া মোসাফেরকে ডাকিয়া আনিবার জন্য পিতাকে বলিল।

মোসাফের আসিয়া পার্শ্বের কক্ষে উপবেশন করিল। কৃষক-কন্যা একটি পরিষ্কার রৌপ্যপাত্রে বারোখানা পরিপাটী রুটি ও একবাটি ডাল দাসীর হস্তে দিয়া তাহাকে শিখাইয়া দিলেন, "রুটির নাম বল্‌বি 'বারো মাসের পূর্ণ চাঁদ', আর ডালের নাম বলবি 'ভরাগাঙ্গ'।"

এদিকে উৎকৃষ্ট খাদ্যের গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া পরিচারিকা লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না ; লুকাইয়া একটুক্‌রা রুটি ও একটু ডাল খাইয়া ফেলিল। তার পর ঘরে আসিয়া রুটি ও ডাল মোসাফেরের সম্মুখে রাখিয়া দিয়া একে একে তাহাদের নাম জ্ঞাপন করিল। দেওয়ানা-মোসাফের সম্মুখে অপূর্ণ ডালপাত্র ও একাংশ ছিন্ন রুটি দেখিতে পাইয়া সহাস্য বদনে পরিচারিকাকে বলিল,—"তোমার মনিবকে ব'লো যে, তাঁর পূর্ণিমার চাঁদে গ্রহণ লেগেছে এবং তাঁর ভরাগাঙ্গে ভাঁটা পড়েছে।"

কৃষক-কন্যা আড়ি পাতিয়া বসিয়াছিল। মোসাফেরের কথা শুনিবামাত্র দাসীকে ডাকাইয়া ধমক দিতেই তাহার সমস্ত কীর্ত্তি প্রকাশ হইয়া পড়িল। কন্যা তখন তাহার পিতাকে ডাকিয়া বলিল,—"বাবা! আজ আমি স্বহস্তে মোসা-ফেরকে পরিবেশন করিব।"

ভূদেব প্রসঙ্গ।

[লেখক—শ্রীঅনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্‌-এ, বি-এল্‌।]

বঙ্গবাসী স্কুলের ইংরাজী শিক্ষক শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়ের পিতা স্বর্গীয় চণ্ডীচরণ মজুমদার মহাশয় ভূদেব বাবুর খুব আন্তরিক সঙ্গী ছিলেন। দুজনে একসঙ্গে আহার করিতেন, বেড়াইতেন ও শয়ন করিতেন। মজুমদার মহাশয় প্রথম Deputy Inspector of schools ছিলেন। পরে বঙ্গীয় সরকারী দপ্তরে কার্য্য করিতেন। তিনি Ripon Collegiate School স্থাপন করিয়াছিলেন এবং পরে মাননীয় সুরেন্দ্র বাবুকে উহা হস্তান্তরিত করেন। তিনি সুন্দর ইংরাজী গদ্য ও পদ্য রচনা করিতে পারিতেন এবং Indian Mirror নামক সংবাদ পত্রের নিয়মিত লেখক ছিলেন। আজ দশ বৎসর হইল তাঁর কাল হইয়াছে। মৃত্যুর সময় তাঁহার বয়স ৭৭ বৎসর পূর্ণ হইয়াছিল। তিনি তাঁহার পুত্রের নিকট ভূদেব বাবু সম্বন্ধে নানা গল্প করিতেন। নরেন বাবুর মুখেই

ভূদেব বাবু সম্বন্ধে আমি এই কথাগুলি শুনি। এগুলি যে সম্পূর্ণ সত্য, তাহা নরেন বাবুর প্রখর স্মৃতিশক্তি, সত্যবাদিতা ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি দেখিয়া আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি। তবে পূর্ব্বে এগুলি কেহ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন কি না বলিতে পারি না।

সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটে স্বর্গীয় ধর্ম্মদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ী ছিল। ভূদেব বাবু সেখানে প্রায়ই আসিতেন। পাশেই মজুমদার মহাশয়ের বাটী। সেই সময় হইতেই ভূদেব বাবুর সহিত মজুমদার মহাশয়ের পরিচয় আরম্ভ হয়। তিনি ভূদেব বাবুকে তদবধি তাঁহার জীবনের আদর্শ করিয়া রাখিয়াছিলেন।

ভূদেব বাবু বিদ্যালয় সমূহের ইন্সপেক্টর ছিলেন। সে সময় শিক্ষাবিভাগের পরিচালক (Director of Public Instruction) ছিলেন Atkinson সাহেব। একদিন সাহেব ভূদেব বাবুদের বাড়ীতে শিক্ষাসম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিবার জন্য উপস্থিত হন। সেদিন ভূদেব বাবুর বাড়ীতে সাহেবের মধ্যাহ্ন ভোজনের কথা ছিল। সাহেব আসিতেই বাড়ীর ভিতর মহিলারা শঙ্খধ্বনি করিলেন। পরে একজন রেকাবে ধান ও দূর্ব্বা লইয়া বৈঠকখানা ঘরে হাজির হইল। সাহেব ধান দূর্ব্বা আনিবার উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করিলেন। ভূদেব বাবু হাস্যমুখে উত্তর করিলেন, "Paddy is the emblem of prosperity and green leaf is the emblem of longevity. We wish you both longevity and prosperity." অর্থাৎ ধান্য ও দূর্ব্বা লক্ষ্মীশ্রী এবং দীর্ঘায়ু লাভের নিদর্শন। আপনার দীর্ঘায়ু ও শ্রীবৃদ্ধিলাভ হউক ইহা আমাদের কামনা। প্রয়োজনীয় কথাবার্ত্তা শেষ হইবার পর সাহেব মধ্যাহ্ন ভোজনে বসিলেন। তিনি ভূদেব বাবুকেও তাঁহার সহিত একসঙ্গে আহারে বসিতে বলিলেন। ভূদেব বাবু ভদ্রতা সহকারে তাহাতে অস্বীকৃত হইয়া বলিলেন, "সাহেব, আমাদের ত সবই গিয়াছে কেবল যা হিন্দুয়ানিটুকু আছে, তাও নষ্ট করিতে চাই না।" সাহেব এরূপ উত্তরের আশা করেন নাই। কিন্তু অধীনস্থ কর্ম্মচারীর এই নির্ভীক অথচ যুক্তিসঙ্গত উত্তরে তিনি আদৌ বিরক্ত বা অসন্তুষ্ট হন নাই।

* *
*

ভূদেব বাবুর সময় মহামান্য Temple সাহেব কিছুকাল বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি ভূদেব বাবুর গুণের বড়ই প্রশংসা করিতেন এবং একদিন তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,—"Come to me now and then ; I will be glad to talk with you on matters of administration." অর্থাৎ সময় পাইলেই আমার নিকট আসিবেন ; আমি আপনার সহিত শাসন সম্বন্ধীয় কথাবার্ত্তা কহিব।

ইংরাজ-মহলে তাঁহার খুব প্রতিপত্তি ছিল। এট্‌কিন্‌সন্ সাহেব তাঁহার খুব প্রশংসা করিতেন। তাঁহার প্রেরিত কার্য্যের রিপোর্ট দেখিয়া সাহেব, উডরো, মার্টিন প্রভৃতি তৎকালীন বিখ্যাত ইংরাজ ইন্‌সপেক্টরদের বলিতেন,—"Write your reports on the line of Bhudeb's report." ভূদেবের কার্য্যবিবরণ অবলম্বনে কার্য্যবিবরণ লিখুন। আর একবার ইনিই ভূদেববাবুর রিপোর্ট সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন,—"This report will do honour to any English Inspector." এইরূপ কার্য্যবিবরণী যে কোনও ইংরাজ পরিদর্শক লিখিতে পারিলে গৌরবান্বিত হয়!

* *
*

ভূদেববাবু ইংরাজী, সংস্কৃত ও বাঙ্গালা তিন সাহিত্যেই বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। একদিন তাঁহার কোন বন্ধুকে বলিয়াছিলেন,—"দেখ, এত চেষ্টা করি, ইংরেজীর Geniusএর সঙ্গে বাঙ্গালার Genius কিছুতেই খাপ খাওয়াতে পারি না। দুটোর মধ্যে কি যে বিশ্রী সম্বন্ধ!"

* *
*

সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমবাবু একবার কোন লোককে বলিয়াছিলেন,—"ওপারে এমন একজন আছেন, যাঁহার কাছে যত শক্ত প্রশ্নই করা যাক না কেন, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার সমাধান করিতে পারেন।" অবশ্য কাঁটালপাড়া নিবাসী বঙ্কিমবাবু নদীর অপর তীরবর্ত্তী চুঁচুড়াবাসী ভূদেব বাবুকে লক্ষ্য করিয়াই যে কথাগুলি বলিয়াছিলেন, তাহা উল্লেখ করাই নিষ্প্রয়োজন।

* *
*

যখন Age of consent Billএর তুমুল আন্দোলন সমস্ত বাঙ্গালাকে কাঁপাইয়া তুলিয়াছিল, তখন দেশের গণ্যমান্য সকল ব্যক্তির মতামত লওয়া হয়। এড্গার সাহেব এই বিলের একজন প্রধান সমর্থনকারী ছিলেন। এড্গার সাহেবের সহিত ভূদেব বাবুর বিশেষ সদ্ভাব ছিল। সাহেব ভাবিয়াছিলেন, ভূদেব বাবু এই আইন পাশের পক্ষেই মত দিবেন, কিন্তু তিনি ইহার সম্পূর্ণ বিপক্ষেই বলিয়াছিলেন।

ভূদেব বাবু ও তাঁহার বন্ধুরা intellectual আমোদ-প্রমোদ করিতে বড়ই ভাল বাসিতেন। মধ্যে মধ্যে নৌকায় চড়িয়া নদীবক্ষে ভাসিতে ভাসিতে Dante, Shelley প্রভৃতি বিখ্যাত লেখকগণের রচনার দোষগুণ আলোচনা করিতেন। মধ্যে মধ্যে রসিকতাও চলিত। শ্রীপতি বাবু বলিয়া একজন কৃষ্ণকায় Deputy Inspector ছিলেন। একদিন লুকোচুরি খেলিতে খেলিতে ভূদেব বাবু বলিয়াছিলেন,—"যেখানে গাঢ় অন্ধকার সেখানে শ্রীপতিকে অন্বেষণ কর।"

বটবৃক্ষ।

[লেখক—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত, এম্-এ, বি-এল্।]

(১)

যেমন রোগ তেমনি ঔষধ—এ ব্যবস্থাটা প্রকৃতির সর্ব্বত্র। যত শীতের প্রকোপ বাড়ে, পশুর গায়ের লোম তত বৃদ্ধি পায়। নিদাঘে মত্ত মার্ত্তণ্ডের প্রখরতার কবল হইতে সৃষ্টি রক্ষা করিবার জন্য বিধাতার বিধান অনুসারে ঝরণার ও কূপের জল অত শীতল। দারুণ গ্রীষ্মে অভাগা ভারতবাসীকে পথ চলিয়া দেশ হইতে দেশান্তরে যাইতে হইবে বলিয়াই বোধ হয় এ দেশে ভগবান বট-বৃক্ষের সৃষ্টি করিয়াছেন। কি ছায়া-শীতল বৃক্ষতল! পথশ্রান্ত পথিকের শ্রম অপনোদনের কি মনোরম আয়োজন! আমাদের বিশাল-দেহ বটবৃক্ষ, বাস্তবিকই

"সহস্র পাখীর গৃহ, পান্থের বিশ্রাম,
তপ্ত ধরণীর ছায়া, মেঘের বান্ধব,
ঝটিকার প্রতিদ্বন্দ্বী, লতার আশ্রয়।"

তাই হিন্দু শাস্ত্রকার বটবৃক্ষ ছেদন মহাপাতক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, বৃক্ষছেদকের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন। অপর পক্ষে অশ্বত্থ-বট-প্রতিষ্ঠার অক্ষয় পুণ্যের উল্লেখ করিয়াছেন।

বৈজ্ঞানিকের মতে অশ্বত্থ, বট, ডুম্বুর প্রভৃতি এক পরিবারভুক্ত এবং স্কন্দ-ফল, তুঁত ও গাঁজা ইহাদেরই বংশের অপর শাখা। এই বংশগত সাদৃশ্য কি তাহা পরে বলিব। অশ্বত্থ, বটের পরিবারকে ডুম্বুর পরিবার বা Ficus বলা হয়। ইহাদের মধ্যে বট "বাঙ্গালা ডুম্বুর" (Ficus Bengalensis) অশ্বত্থ "ধর্ম্মের ডুম্বুর" (Ficus Religiosa) এবং আমাদের দেশী "ভক্ষ্য ডুমুরে"র বৈজ্ঞানিক নাম (Ficus Glomerta)। অশ্বত্থ বৃক্ষের তলায় বসিয়া সিদ্ধার্থ বোধিসত্ত্ব হইয়াছিলেন—তাই বোধি বৃক্ষের জাতীয় নাম বোধ হয় Ficus Religiosa হইয়াছে।

(২)

বট বৃক্ষের প্রধান বিশেষত্ব—ইহার শিকড়ে। এত মোটা বিস্তৃত শিকড় কোন গাছের নাই। আমের শিকড় বহুদূর বিস্তৃত হয় বটে কিন্তু বটগাছের শিকড়ের ব্যাপকতার তুলনা নাই। বটের শিকড় কেবল অধিকাংশ বৃক্ষের মূলের মত ভূমির নীচে অন্ধকার পথে ধীরে ধীরে রস আহরণ করিয়া ক্ষান্ত হয় না। বটের মোটা শাখা হইতে "ঝুড়ি" নামে, শেষে সেই ঝুড়ি ভূমিস্পর্শ করিয়া পাতালের দিকে অগ্রসর হয়, ভূমির রস আকর্ষণ করে এবং সমগ্র পাদপের পুষ্টিসাধন করে। ক্রমশঃ এই বায়বীয় শিকড় (aerial roots) গুলি মোটা হইয়া গাছের গুঁড়ির মত দেখিতে হয়। এবং ইহাদের উপর ভর দিয়া বটের বিশাল শাখাগুলিও বেশ অগ্রসর হইতে পারে। মাঝে মাঝে এই রকম শিকড়ের খুঁটির উপর নির্ভর করিতে না পারিলে বটবৃক্ষ অতদূর বিস্তৃত হইয়া শ্রান্ত পথিকের আশ্রয়-স্থল হইতে পারিত না। মানুষ ঘর বাঁধিবার সময় ঠিক যে সকল উপায় অবলম্বন করে, প্রকৃতি যেন ঠিক সেই রকম ব্যবস্থা করিয়াই ধরণীর দেহ শ্যামল বর্ণে শোভিত করেন। একে একে অনেকগুলি বায়বীয় শিকড় গজাইলে সমস্ত পাদপটি স্তম্ভ-সুশোভিত একটি বৃহৎ অট্টালিকার আকার ধারণ করে—উপরে সবুজ ছাদ, শীতল সমীরে পাতাগুলি দুলিতে থাকে, তলায় ঘাসের আস্তরণ, মোটা গুঁড়ি ও শিকড়ের থাম। প্রকৃতির নিজের হাতে-গড়া প্রাসাদ! গ্রীষ্মের উত্তাপে রাজ্যের পাখী আসিয়া পাতার ঝোপে আশ্রয় গ্রহণ করে আর তাহাদের ছায়াশীতল বিশ্রাম-স্থল হইতে নানা সুরের, নানা তানের লহর তুলিতে থাকে।

বটের পাতার উপরিভাগ শক্ত, নীচের দিকের বর্ণ একটু ফিকে এবং খুব সূক্ষ্ম সুঁয়ায় পূর্ণ। ডুমুরের পাতায় সুঁয়া বেশী। যখন নূতন পাতার কুঁড়ি গজায় তখন পুরাণ পাতার উপপত্র (stipule) সেটিকে ঢাকা দিয়া রক্ষা করে। এ ব্যবস্থা শীতপ্রধান দেশেই সাধারণতঃ দৃষ্ট হয়। তরুণ-পত্র-মুকুলকে শীতের প্রকোপ হইতে বাঁচাইবার জন্যই বিধাতার এই নিয়ম। বোধ হয় উচ্চ বট-বৃক্ষের পত্র-মুকুলকে উষ্ণদেশের ঝলসান রৌদ্র-তাপ হইতে রক্ষা করিবার জন্য পুরাণ পত্রের উপপত্র নিজের দেহ দ্বারা তরুণ মুকুলকে আচ্ছাদন করিয়া রাখে। বটের নবীন পাতা নবীন আমপাতার মত বেশী রৌদ্র তাপ সহ্য করিতে পারে না, তাহার প্রমাণ তাহাদের লাল বর্ণ। যে পদার্থের বর্ণ যত কৃষ্ণ হয়, সে তত তাপ রশ্মি আকর্ষণ করে। লোহিত বর্ণের নবীন পত্র তত বেশী গরম হয় না। অন্যান্য প্রবন্ধে পূর্ব্বে বলিয়াছি যে পাতার সবুজ বর্ণ chlorophyll নামক পদার্থের জন্য। এই chlorophyll সূর্য্যরশ্মি আকর্ষণ করিয়া উদ্ভিদের পুষ্টির জন্য উদঙ্গার নির্ম্মাণ করে। বটগাছে পাতার অভাব নাই। ন্যগ্রোধ শিশুর দ্বারা উপার্জ্জন করাইয়া শিশুলব্ধ অন্নে বিশাল দেহের পুষ্টি সাধনের জন্য ততটা ব্যগ্র নয়। তাই নবীন পাতার দেহের ভিতর উদঙ্গার নির্ম্মাণ করিবার রাসায়নিক কারখানা নাই। যখন এই সকল বৃহৎ মহীরুহের পত্রোদ্গম হয় তখন তাহাদের শ্বাস-ক্রিয়ার অধিক প্রয়োজন হয়। এই সকল লাল পাতা অসংখ্য ছোট ছোট বায়ু রন্ধ্রের ভিতর দিয়া শ্বাস গ্রহণ করে। বায়ুর অক্সিজেন দেহের কারবণ বা কয়লাকে * পুরাইয়া দেয় এবং শরীরে তাপের সৃষ্টি করে। নবোদ্গত পত্রের পক্ষে এই রাসায়নিক তাপ টুকু পুষ্টিকর।

(৩)

বট গাছের এবং আমগাছ প্রভৃতি বড় গাছের পত্র বিন্যাস বুঝিবার ও দেখিবার। অন্যান্য প্রবন্ধে বলিয়াছি যে, গাছের পাতার ছোট ছোট রন্ধ্রগুলি বন্ধ হইয়া গেলে গাছের দম আটকাইবার কথা। তাই বৃক্ষ মাত্রেই পত্র হইতে জল গড়াইয়া পড়িবার সুব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। আবার প্রত্যেক পত্রটি সূর্য্যরশ্মি ধরিতে না পারিলে বৃক্ষের পরিপাক ক্রিয়া (assimilation) সুসম্পন্ন হয় না। সুতরাং প্রত্যেক পাতাখানি গায়ের জল ফেলিবার এবং সবুজ দেহটি

* আমি 'কারবণ' শব্দের বাঙ্গালায় অঙ্গার শব্দ লিখিতাম। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর বাবু ব্যবহৃত "কয়লা" শব্দ আরও সরল বলিয়া উহা গ্রহণ করিলাম।

তপন দেবের সম্মুখে ধরিবার চেষ্টা করে। যে শরীরির এক অঙ্গ স্বার্থপর ভাবে খুব বেশী বাড়িয়া দেহযন্ত্রের অপর অঙ্গের পুষ্টির প্রত্যবায় হয় তাহার দেহযন্ত্র বেশী দিন সজীব থাকে না। প্রত্যেক অঙ্গ পরস্পরকে সাহায্য না করিলে organism উদ্দেশ্য-ভ্রষ্ট হয়। গাছের এক স্তরের পাতা যদি অপর স্তরের পাতাকে অংশু-কিরণ হইতে বঞ্চিত করে তাহা হইলে বৃক্ষ বলবান হইতে পারে না। মানবের রচিত ছাদ বা রাজপথ যেমন গড়ানে হয় সমস্ত গাছের পত্র-বিন্যাস মনোযোগের সহিত দেখিলে বোধ হয় উহার উদ্দেশ্য সমস্ত আবরণটাকে গড়ানে করা। উপরের পাতার জল গড়াইয়া তাহার নিচের স্তরের পাতায় পড়ে, এই রকম যথা সম্ভব জলের স্রোত থাকে থাকে নামিয়া ভূমিস্পর্শ করে ও বৃক্ষপত্র শুষ্ক রাখে। পত্রগুলি ঐরূপ ভাবে সন্নিবিষ্ট বলিয়াই প্রত্যেক পাতা রৌদ্র পায় আর তাহারা থাকে থাকে রৌদ্র পায় বলিয়াই বৃক্ষের তলায় শ্রান্ত পথিক ছায়া পায়। সমস্ত বৃক্ষটি খুব বড় ছত্রের কার্য্য করে।

গাছের পাতা ক্রমশঃ বাহিরের দিকে শাখা সহ অগ্রসর হয় বলিয়াই বট গাছের ঝুড়ি নামার আবশ্যক হয়। গাছ যেমন প্রশস্ত হয় উহাকে ভূমিতে বাঁধিবার জন্য কেবল মূলার মত নীচের দিকে শিকড় থাকিলে চলে না। গাছের পাতাগুলি দল বাঁধিয়া পত্রের সৃষ্টি করে বলিয়া বট প্রভৃতি গাছের ঠিক মূলে জল পড়ে না। কাজেই জলের সন্ধানে শিকড়গুলিকেও ভূগর্ভে অন্ধকারের ভিতর দিয়া পাতার বিস্তৃতির সহিত পাল্লা দিয়া ছুটিতে হয়। উপরে যেখানে পাতার ছায়া শেষ হইয়াছে শিকড়গুলি সে প্রদেশ ছাড়াইয়া রস আহরণ করিতে ছুটিতে থাকে। তাই অশ্বথ, বট প্রভৃতির শিকড়ের এত ব্যাপকতা। গাছের আওতায় ছোট গাছ জন্মে না দুই কারণে—প্রথমতঃ তথায় রৌদ্রাভাব, দ্বিতীয়তঃ সে প্রদেশে বিষম জলকষ্ট। পথিকের কিন্তু শাপে বর। বট গাছের ছায়ায় আগাছার উপদ্রব নাই, সে স্তম্ভ-শোভিত হল-ঘরে মানুষেরই একাধিপত্য।

যখন বট গাছের নিম্নস্তরের পাতার কার্য্য শেষ হয় অর্থাৎ যখন তাহার বাহিরের স্তরে নবীন পাতা উদ্গত হয় তখন তাহার বোঁটার চারিদিকে কর্ক জন্মায়। গাছ আর সে পাতাকে আহার্য্য দেয় না,তাহাকে 'পেন্সন' দিবার নোটিশ দেয়। বেচারা অনাহারে হরিদ্রা বর্ণ ধারণ করে। এ অবস্থায় বোধ হয় সে ডাক্তার জগদীশ চন্দ্রের তাড়িত যন্ত্রে রেখা কাটিয়া জীবনের সুখ দুঃখের কাহিনী বলিতে পারে না। ক্রমশঃ তাহার লিপি ক্ষীণ হয়, দেহ হরিদ্রা বর্ণ হয়। শেষে পবনদেব আসিয়া তাহাকে বৃন্তচ্যুত করে। পরহিতকর কার্য্য শেষ করিয়া,

পথিককে ছায়া দান করিয়া বেচারা ঝরিয়া পড়ে। কিন্তু উদার-হৃদয় বটগাছ তাহাকে ভুলে না। তাহার স্মৃতির জন্য নিজের অঙ্গে দাগ রাখিয়া দেয়। সেই ক্ষত স্থলে কর্ক জন্মে কিন্তু বহুদিন ক্ষতচিহ্ন থাকে। এইরূপ ক্ষত-চিহ্ন বটগাছের নবীন শাখায় অনেক দেখিতে পাওয়া যায়।

(৪)

বিরহ-কাতর রসিক গায়ক নিধুগুপ্ত গাইয়াছিলেন—

"তুমি ডুমুরের ফুল হয়েছ বুঝি
তোমার দেখা পাওয়া কঠিন কথা"।

সাধারণ ভাষায় বলে— ডুমুরের ফুল দেখিলে রাজা হয়। বাস্তবিক গোলাপ, টগর, মল্লিকা, মালতী বা চ্যুত মুকুল কি লেবু ফুলের মত "সৌরভে ও গৌরবে" বট, অশ্বত্থ বা ডুম্বুরের ফুল ফুটে না। প্রায় সকল পুষ্পিত (phanerogame) বৃক্ষের আগে ফুল ফোটে তাহার পর ফল উদ্গত হয়। কিন্তু এই ডুম্বুর বংশের ধারা সৃষ্টিছাড়া। এবংশের বৃক্ষরাজিতে একেবারে গোল গোল ফল ধরে।

প্রকৃত পক্ষে ডুম্বুর বা বটের যে গুলাকে আমরা ফল বলি তাহারা ফল নয়। সূর্য্যমুখী ফুলে যেমন এক সঙ্গে অনেক ছোট ছোট ফুল থাকে কিন্তু পুষ্প-কোষ ও দলগুলি যৌথ, ডুম্বুর প্রভৃতিরও অবস্থা তদনুরূপ। বট ফল কাটিলে অসংখ্য ছোট ছোট ফুল দেখিতে পাওয়া যায়। সূর্য্যমুখী ফুলের পুষ্পকোষ ও দলগুলা যদি মুড়িয়া সকল মুখ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে তাহার বাহিরের দিকটা দেখিতে অনেকটা ডুমুরের মত হইবে, ভিতরে ফুল গুলা বন্ধ হইয়া যাইবে। অবশ্য ডুমুরের বাহিরের আবরণটা খুব মোটা এবং শাঁসাল, সূর্য্যমুখী ফুলের পুষ্পকোষ পাতলা। বটের ফল লাল—গাছের ডালে জোড়া জোড়া কখনও তিন চারিটা করিয়া লাগিয়া থাকে। ইহারা আকারে ফলের মত বটে কিন্তু ইহারা ফল নহে, আবরিত ফুলগুচ্ছ মাত্র। অবশ্য ভিতরের ফুলগুলি যখন ফলে পরিণত হয় তখন ডুমুর বা বটের ফল বাস্তবিক ফলের আধার, কিন্তু প্রথমাবস্থায় ইহারা ফুলের আধার মাত্র।

বলিয়াছি ডুমুর বা বট ফল কাটিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, শাঁসাল আবরণের মধ্যে অনেক ছোট ছোট ফুল থাকে। ইহাদের মধ্যে পুরুষ জাতীয় পুষ্প-গুলা উপরে থাকে, স্ত্রীজাতীয় পুষ্পগুলা নিম্ন স্তরে অবস্থিত। একটা ডুমুর বা বট ফল কাটিয়া দেখিলে সহজেই এতদুভয় জাতীয় ফুলের পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়।

সাধারণতঃ ফুলের পুংকেশরের রেণু স্ত্রীকেশরের সহিত সম্মিলন, বায়ু এবং কীটের সাহায্যে হইয়া থাকে। কীটকে আকৃষ্ট করিবার জন্য ফুলের অত রূপ, অত সৌরভ, অত সৌষ্ঠব। কীটের জন্য কুসুম বুকের মধ্যে মধু সঞ্চিত করিয়া রাখে— মধু খুঁজিবার জন্য ফুলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া এক ফুলের পুংকেশরের রেণু লইয়া ষটপদ অপর স্ত্রীকেশরীক পুষ্পের রেণুর আধারে লাগাইয়া দেয়।

বট ও ডুমুরের ফুল নবাবের বেগমের মত প্রাচীর-ঘেরা প্রাসাদের মধ্যে থাকে, তাহাদের পক্ষে অলিকুলকে বর্ণ বিন্যাস বা মধুর সুবাস দ্বারা আকুল করা সম্ভবপর নয়। বায়ুও তাহার ভিতর প্রবেশ করিতে পারে না। তবে কিরূপে ইহাদের ফল জন্মে তাহা ভাবিবার কথা।

একটা ডুমুর বা বটফল লইয়া পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহার উপরে খুব ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে। সেই ছিদ্রের ভিতর দিয়া এক শ্রেণীর বোলতা ডুম্বুরের ভিতর প্রবেশ করিয়া ডিম পাড়িয়া আসে। ক্রমে ডুমুর যত বড় হয় ডিম ফুটিয়া বোলতার লার্ভা শিশু * বাহির হয়, তাহারা উহারই ভিতর বর্দ্ধিত হইয়া এক ফুলের রেণু লইয়া অপর ফুলে প্রদান করে। এইরূপ ভাবে বট, অশ্বত্থ বা ডুম্বুর ফুল ফলে পরিণত হয়।

ডুম্বুর ও বট ফলের ভিতর কীট থাকে, সে সন্ধান কীটভোজী পক্ষীরা বিশেষ রূপ অবগত। আমি সে দিন কতকগুলা বট ফল কাটিয়া ফুল ও বোলতার শাবক প্রভৃতি পরীক্ষা করিতেছিলাম। পরীক্ষান্তে সেগুলি পাখীর খাঁচার মধ্যে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। সে খাঁচায় পাউই, শালিক, বক প্রভৃতি কীট-ভোজী পক্ষী ছিল। তাহারা খুব উৎসাহের সহিত নামিয়া সেই কীটগুলিকে উদরসাৎ করিতে লাগিল। সেই অবধি আমি মাঝে মাঝে তাহাদের বট ও ডুম্বুর দিই। একটু মুখটা কাটিয়া না দিলে তাহারা ভিতরের পোকাগুলিকে ধরিতে পারে না। তবে খুব পাকা বটফল তাহারা চঞ্চু দ্বারা ভাঙ্গিয়া লইতে পারে। কিন্তু সে অবস্থায় তাহার ভিতর পোকা থাকে না। পাকা বটফল ফল-ভোজী বসন্তগৌরী, বুলবুলি, কোকিল, দোয়েল প্রভৃতি ভোজন করে। অবশ্য কলিকাতার সর্ব্বভুক্ বায়সগণ বটের পোকা এবং ফল কিছুই পরিত্যাগ করে না।

অনেকে বলেন, বট বৃক্ষের বীজ পক্ষীর উদরের ভিতর দিয়া বাহির না হইলে গাছ জন্মে না। এ কথা সম্পূর্ণ সত্য কি না তাহা আমি বলিতে পারি

* অর্চ্চনা ১২শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যায় সন্নিবিত 'ষটপদ' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

না। তবে বিহঙ্গম-কুল বটাদি ফল ভক্ষণ করিয়া ইহাদের বীজ নানা স্থলে বিকীর্ণ করে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায়, বট গাছ অপর একটি বৃক্ষের উপর জন্মিয়া আশ্রয়দাতার প্রাণনাশ করিয়া ভূমি স্পর্শ করে। তাহার পর নিজদেহ মধ্যে লুক্কায়িত আসুরিক শক্তি বিকাশ করিয়া বর্দ্ধিত হয়।

(৫)

বলা বাহুল্য, বট ও অশ্বত্থ বৃক্ষ বহুকাল জীবিত থাকে। লঙ্কা দ্বীপের অনু রাধাপুরের একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের বয়স দ্বাবিংশ শত (২২০০) বৎসর। নর্ম্মদা তীরে একটি বট-বৃক্ষ আছে, আলেক্জাণ্ডারের সেনাপতি নিয়ারকস তাহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এক সময় ইহার ছায়ায় সাত হাজার লোক বিশ্রাম করিতে পারিত। নর্ম্মদার স্রোতে ইহার এখন অনেক অঙ্গহানি হইয়াছে—তবু ইহার পরিধি দুই সহস্র ফুট। ইহার তিন হাজার শাখা প্রশাখা আছে।

সংস্কৃত ভাষায় বটের নাম—"ন্যগ্রোধস্তু বহুপাৎ স্যাদ্বটো বৈশ্রবণালয়ঃ।" বায়বীয় শিকড়ের জন্য বট বৃক্ষকে বহুপাৎ বলা হয়। অশ্বত্থ বৃক্ষের নাম— "পিপ্পলোঽশ্বত্থ শ্রীবৃক্ষঃ কুঞ্জরাসন কৃষ্ণবাসো বোধিতরুঃ" এবং ডুম্বর সম্বন্ধে হেমচন্দ্র বলিয়াছেন—"উদুম্বরো জন্তুফলো মশকী হেমদুগ্ধকঃ।" অবশ্য ইহাদের কাহার কি গুণ সে কথা আয়ুর্ব্বেদে বর্ণিত আছে। আমরা এ স্থলে সে কথার আলোচনা করিব না।

জালিয়াত

[লেখক—শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

এফ-এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইলেও উপযুক্ত সহায় সম্পত্তির অভাবে শশিভূষণকে শেষে ১৫৲ টাকা বেতনের পোষ্টমাষ্টারী করিতে হইল। তাহাও কোন সদর পোষ্টাফিসে নয়, কাঁকড়াহাটীর মত একটী ক্ষুদ্র পোষ্টাফিস তাহার কর্ম্মের উপযুক্ত স্থল বলিয়া বিবেচিত হইল। শশিভূষণেরও ইহাতে বিশেষ কোন আপত্তি ছিল না; সে কাঁকড়াহাটীর খড়ো ঘরের ক্ষুদ্র আফিসটীতেই

দীর্ঘ চারিটী বৎসর কাটাইয়া দিল। ইহার মধ্যে অন্যত্র বদলীর বা বেতন বৃদ্ধির জন্য একবারও দরখাস্ত করিল না।

কাঁকড়াহাটী গ্রামখানি নিতান্ত ছোট না হইলেও পোষ্টাফিসটী বড় ছিল না। খড়ের ছাওয়া একখানি ছোট মেটেঘরে আফিস। আফিসঘরের পিছনে চালা বাড়ান একটু রান্নাঘর। শশিভূষণ সেখানে রাঁধিয়া খাইত, আর আফিসঘরেই একখানি খাটিয়া পাতিয়া শুইয়া থাকিত।

বেন্দা হরকরা এবং তিনকড়ি ও ছিদাম পিয়ন ছাড়া আর কাহারও সহিত শশিভূষণের আলাপ ছিল না। সে গ্রামের কাহারও বাড়ীতে বেড়াইতে যাইত না, বা তাসপাশার দলে মিশিত না। চিঠীর তাড়া, রসিদের খাতা, হিসাব বহি, এই সকল লইয়াই শশিভূষণ দিন কাটাইয়া দিত। তাহার নামে একখানা বাঙ্গালা সাপ্তাহিক পত্র আসিত। অপর একখানার আগমন পর্য্যন্ত সেই খানাই তাহার এক সপ্তাহের সঙ্গী হইত।

সকালে তিনকড়ি ও ছিদামকে চিঠী, মনিঅর্ডার, পার্শ্বেল প্রভৃতি বুঝাইয়া দিয়া শশিভূষণ কাজে বসিত। সন্ধ্যা সাতটার সময় বেন্দা হরকরা ঝমর্ ঝমর্ শব্দে ছুটিয়া আসিয়া ডাক নামাইয়া দিত, এবং সেখানকার বাঁধা ডাক কাঁধে ফেলিয়া ঝম্ ঝম্ শব্দে চলিয়া যাইত। শশিভূষণের দৈনিক কার্য্য শেষ হইত। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, ঝড়, বৃষ্টি, রৌদ্র, কিছুতেই এই নিয়মের একটুও ব্যতিক্রম হইত না।

এরূপ একটানা জীবন-স্রোত অনেকের নিকট দুঃসহ হইলেও শশিভূষণ বেশ ধীরভাবেই ইহা সহ্য করিয়া যাইত। স্রোতের পরিবর্ত্তনের জন্য তাহার বিশেষ কোন আগ্রহ দেখা যাইত না। তাহার বিরামবিহীন কর্ম্মজীবনের সম্মুখ দিয়া শীত গ্রীষ্ম বর্ষা অবিরাম ভাবে চলিয়া যাইত, শশিভূষণ তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করিত না। শীতের পর বসন্ত আসিত; আফিসঘরের দক্ষিণের মুক্ত গবাক্ষপথ দিয়া মলয় সমীর চাঁপা ফুলের গন্ধের সঙ্গে কত সুখের স্মৃতি বহিয়া আনিত; সম্মুখে প্রাচীন কদমগাছের পল্লববিহীন শাখায় বসিয়া কোকিল কত সুখের গান গাহিয়া যাইত, কিন্তু শশিভূষণের কর্ম্মনিরত হৃদয় তাহাতে সাড়া দিত না। গ্রীষ্মাবসানে মেঘের গুরুগম্ভীর গর্জ্জনে দিগন্ত কাঁপিয়া উঠিত; কেয়া ফুলের মিষ্ট গন্ধে পথ ঘাট ভরিয়া যাইত; ফুলের ভারে কদম্বের প্রাচীন শাখাগুলা নত হইয়া পড়িত; গ্রামের ছেলের দল আসিয়া সেখানে হাট বসাইত; কিন্তু শশিভূষণ সেদিকে ফিরিয়া চাহিত না। পূজার সময় কত

প্রবাসী তাহার সম্মুখের পথ ধরিয়া হাসিমুখে ঘরে ফিরিত; শশিভূষণ বসিয়া আপন মনে চিঠীর তাড়া খুলিত, বাঁধিত। ইহা ছাড়া যেন তাহার জীবনের আর কোনও উদ্দেশ্য ছিল না।

দুই বৎসর পূর্ব্বে পত্নীর মৃত্যু ও একমাত্র কন্যার অসুখের সংবাদ পাইয়া শশিভূষণ ছুটীর জন্য দরখাস্ত করিয়াছিল। একমাস পরে সে দরখাস্তের উত্তর আসিল, তাহার ছুটী মঞ্জুর হইয়াছে। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ যথাসময়ে তাহার বদলী লোক পাঠাইতে না পারায় শশিভূষণ ছুটী পাইল না। তার পর আর সে কখনও ছুটীর জন্য দরখাস্ত করে নাই।

২

"মাষ্টার মশাই!"

শশিভূষণ তখন মনিঅর্ডারের নম্বর মিলাইতে ব্যস্ত ছিল, সুতরাং সম্বোধনটা তাহার কাণে গেল না। যে ডাকিয়াছিল, সে একটু অপেক্ষা করিয়া আবার ডাকিল, "মাষ্টার মশাই!"

শশিভূষণ মনিঅর্ডারের নম্বর হইতে দৃষ্টি সরাইয়া মুখ তুলিয়া চাহিল। দেখিল, একটী দিব্য ফুটফুটে নয় দশ বৎসরের বালিকা আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে।

শশিভূষণকে চাহিতে দেখিয়া বালিকা মুখ নামাইয়া মৃদুস্বরে বলিল, "বাবার চিঠী আছে মাষ্টার মশাই?"

শশিভূষণ জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার বাবার নাম?"

বালিকা বলিল, "বিজয়বল্লভ রায়।"

শশিভূষণ সম্মুখে পতিত চিঠীগুলার উপর একবার দ্রুত চক্ষু বুলাইয়া বলিল, "না, এ নামের কোন চিঠী নাই।"

বালিকা একটু সঙ্কুচিতভাবে বলিল, "চিঠী বাবার নামে আস্‌বে না; বাবার চিঠী আমার নামে আস্‌বে।"

শশিভূষণ ঈষৎ বিরক্তির স্বরে বলিল, "তা আগে বল্‌তে হয়? তোমার নাম?"

বালিকা মাটির দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "শ্রীমতী নীরবালা দাসী।"

শশিভূষণ চিঠিগুলা উল্টাইতে লাগিল; বালিকা সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে সেদিকে চাহিয়া রহিল। কয়েকখান চিঠী উল্টাইয়া পাল্টাইয়া শশিভূষণ স্বভাবসিদ্ধ গম্ভীর স্বরে বলিল, "নাই।"

বালিকার আশাপ্রফুল্ল মুখের উপর হতাশার কালিমা আসিয়া পড়িল। কিন্তু শশিভূষণ তাহা লক্ষ্য করিল না, সে পুনরায় আপন কার্য্যে মনোনিবেশ করিল। বালিকা নতবদনে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া শেষে ধীরে ধীরে সে স্থান ত্যাগ করিল।

দুই তিন দিন পরে আবার একদিন সকালে নীরু আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমার চিঠী এসেছে মাষ্টার মশাই ?"

শশিভূষণ হিসাবের বহি হইতে চক্ষু না তুলিয়াই বলিল, "তোমার নাম ?"

মৃদু হাসিয়া নীরু বলিল, "ভুলে গেছেন ? আমার নাম নীরু—নীরবালা।"

"ওঃ বটে" বলিয়া শশিভূষণ চিঠীর তাড়ার দিকে দৃষ্টিপাত করিল; এবং একটু পরেই দৃষ্টি ফিরাইয়া বলিল, "কৈ, নাই।"

নীরুর মুখের হাসি মুহূর্ত্তে নিবিয়া গেল। শশিভূষণ তাহা লক্ষ্য করিল। সে চোখের চশমাটী খুলিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার বাবা কি তোমায় চিঠী লিখেন ?"

নীরু বলিল, "লিখেন নি, এবার লিখ্‌বেন বলেছেন।"

শশি। তা তোমার এখানে আসবার দরকার কি ? চিঠী এলে পিয়ন তোমাদের বাড়ীতে দিয়ে আস্‌বে।

নীর। বাড়ীতে গেলে আমায় চিঠী দেবে না।

শশি। কে দেবে না ?

নীর একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "নতূন মা।"

শশি। নতূন মা কে ?

এ কথার উত্তর নীর সহজে দিতে পারিল না; সে নতমুখে দাঁড়াইয়া আপনার ক্ষুদ্র অঙ্গুলিতে কাপড়ের পাড় জড়াইতে জড়াইতে বলিল, "সে—সে নতূন মা।"

তাহার ভাব দেখিয়া শশিভূষণ অনুমানে কতকটা বুঝিয়া লইল; লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার মা নাই ?"

নীর ভাসা ভাসা জলভরা চোখ দু'টী তুলিয়া শশিভূষণের দিকে চাহিল; তার পর একটু ধরা গলায় উত্তর দিল, "না।"

শশিভূষণের চোখ দুইটাও সম্পূর্ণ শুষ্ক রহিল না। তাহার অন্তস্তল ভেদ করিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইল। নীর আর দাঁড়াইল না, সে আঁচলে একবার চোখ দু'টা মুছিয়া ধীরপদে চলিয়া গেল। শশিভূষণ হাতের কাজ

ফেলিয়া সজল দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। তখন তাহার মনে হইতেছিল, তাহার ঘরেও এমনই একটী মাতৃহীনা বালিকা আছে। আসিবার সময় শশিভূষণ তাহাকে পাঁচ বৎসরের শিশু দেখিয়া আসিয়াছিল। এত দিনে হয়তো সেও ঠিক এত বড় হইয়াছে; হয়তো সেই পরাশ্রিতা বালিকাও পিতার পত্রের প্রত্যাশায় গ্রামের ডাকঘরে গিয়া প্রত্যহ এমনই করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে, "বাবার চিঠী আছে মাষ্টার মশাই?" আবার পরক্ষণেই হতাশ হৃদয়ে সজল নয়নে এমনই করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে। শশিভূষণের বুকটা কাঁপাইয়া একটা নিশ্বাস বড় জোরে বাহির হইল।

সেদিন আর শশিভূষণ কাজে মন দিতে পারিল না।

৩

দুই চারিদিনের যাতায়াতে নীরুর সহিত শশিভূষণের আলাপটা বেশ জমিয়া উঠিল। শশিভূষণের নিঃসঙ্গ হৃদয় সহসা এই ক্ষুদ্র সঙ্গীটীকে পাইয়া যেন আপনার সমস্ত আকাঙ্ক্ষা দিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল; তাহার রুদ্ধবেগ স্নেহস্রোত সহসা একটা নূতন পথ পাইয়া যেন উদ্দামবেগে ছুটিয়া চলিল। নীরুর সহিত গল্প করিয়া, তাহার বাল্যসুলভ হাসিতে হাসিয়া, দুঃখে সহানুভূতির অশ্রু ফেলিয়া শশিভূষণ আপনার কর্ম্মকঠোর নীরস দিনগুলাকে অনেকটা সহজ করিয়া আনিল। নীরুও তাহার এই বয়স্ক সঙ্গীর নিকট আপনার ক্ষুদ্র জীবনের সুখ দুঃখের কথা, পিতার কথা, বিমাতার কথা, সংসারের প্রত্যেক খুঁটিনাটির কথা কিছুই বলিতে বাকী রাখিল না।

নীরুর বাপ বিজয়বাবু একজন অবস্থাপন্ন গৃহস্থ। তিনি কলিকাতায় গবর্ণমেণ্ট আফিসে চাকরী করেন। মাহিনা বেশ মোটা। দেশে তাঁহার বাড়ী, বাগান, পুকুর, ধানের জমি, তরকারীর ক্ষেত সবই আছে। সুতরাং মোটা মাহিনা হইলেও দেশের মায়া ত্যাগ করিয়া তিনি সপরিবারে কলিকাতাবাসী হইতে পারেন নাই।

প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে বিজয়বাবু বিপত্নীক হন। তিনি পত্নীশোকে একান্ত কাতর হইয়া সেই নিদারুণ শোক বিস্মরণের অভিপ্রায়ে, এবং বালিকা কন্যা নীরুকে স্নেহ যত্নে মানুষ করাইবার উদ্দেশ্যে কয়েক মাস পরেই পঞ্চদশবর্ষীয়া চপলা সুন্দরীকে গৃহিণীপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। বেথুন কলেজের দ্বারে পদার্পণ না করিলেও চপলা অশিক্ষিতা নহে। নব্য শিক্ষার সমুজ্জ্বল রশ্মি তাহার হৃদয় কন্দরকে কতকটা আলোকিত করিয়া দিয়াছিল। সুতরাং এই শিক্ষা-মার্জ্জিত-

হৃদয়া সৌন্দর্য্যশালিনী পত্নীর মার্জ্জিত প্রণয়ের বিশুদ্ধ আস্বাদ লাভ করিয়া বিজয়বাবু অচিরাৎ মৃত পত্নীর শোক সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইলেন ; এমন কি তাহার ক্ষীণ স্মৃতিটুকু পর্য্যন্ত চপলার চপলাবৎ দীপ্ত সৌন্দর্য্যালোক মধ্যে, সমুজ্জ্বল তাড়িতালোক সমক্ষে ক্ষুদ্র দীপশিখার ন্যায় বিলীন হইয়া গেল। বিজয়বাবুর প্রথম উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। দ্বিতীয় উদ্দেশ্যের সিদ্ধি সম্বন্ধেও তাঁহার কোন সংশয় না থাকিলেও, তিনি ছাড়া আর সকলেরই একটা দারুণ সন্দেহ জন্মিয়াছিল। কিন্তু বিজয়বাবু এই সকল সন্দিগ্ধমনা হীনপ্রকৃতি লোকের কথায় কাণ দিতেন না।

একমাত্র কন্যা বলিয়া নীরু পূর্ব্বে পিতার নিকট যে আদর যত্ন পাইয়া আসিয়াছে, মাতার অবর্ত্তমানেও সে সেই আদর যত্নের দাবী ছাড়িল না। বিজয়বাবুও তাহার প্রাপ্য তাহাকে দিতে নারাজ ছিলেন না, কিন্তু বুদ্ধিমতী চপলাসুন্দরী যখন তাঁহাকে বুঝাইয়া দিল যে, অত্যধিক আদরে মেয়েটার পরকাল নষ্ট হইয়া যাইতেছে, তাহার ভবিষ্যৎ জীবন কণ্টকময় হইতেছে, তখন বিজয়বাবু গুরু মহাশয়ের বেত্রাঘাতে সচেতন সুবোধ বালকের ন্যায় সে কথাটা না মানিয়া চলিতে পারিলেন না। নীরুর ভবিষ্যৎ জীবন-পথটাকে সুগম করিয়া দিবার জন্য তিনি আপনার স্নেহ মমতার কণ্টকগুলা একটু একটু করিয়া সরাইয়া দিতে লাগিলেন।

কিন্তু সেবারে কলিকাতা যাত্রার সময় নীরু যখন ধরিয়া বসিল যে, সে এখন চিঠি পড়িতে ও লিখিতে শিখিয়াছে, সুতরাং তাহাকে অন্ততঃ সপ্তাহেও একখানা করিয়া পত্র দিতে হইবে, তখন বিজয়বাবু কিছুতেই 'না' বলিতে পারিলেন না। সম্মতি দিয়া তিনি শেষে হৃদয়ের এই দুর্ব্বলতার জন্য চপলার নিকট একটু লজ্জা অনুভব করিলেন। তবে কলিকাতায় গিয়া তিনি এই দুর্ব্বলতা টুকু সংশোধন করিয়া লইলেন। তাঁহার যাইবার পর এক মাস অতীত হইলেও নীরু একখানা পত্রও পাইল না।

নীরু প্রত্যহ পিতার পত্রের প্রত্যাশা করিত, কিন্তু পত্র আসিত না। নতূন মার নিকট প্রত্যহ পত্র আসে, কিন্তু তাহার পত্র সাতদিন পরে—পনর দিন পরেও আসে না! বালিকা আর কিছু চায় না, শুধু একখানা পত্র, "নীরু, তুমি কেমন আছ?" শুধু এই কয়টা কথা! নীরু তাহাও পাইল না। সে মাঝে মাঝে নতূন মাকে জিজ্ঞাসা করে, তাহার পত্র আসিয়াছে কি না। কিন্তু নতূন মার কাছে কোনও সদুত্তর পায় না, পায় শুধু দুই একটা ধমক।

একদিন তিন চারিখানা পত্র আসিল। নীরু ভাবিল, আজ নিশ্চয়ই তাহার পত্র আসিয়াছে। সে ছুটিয়া তাড়াতাড়ি পত্রগুলা দেখিতে গেল। চপলা তাহাকে ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া চিঠীগুলি লইয়া চলিয়া গেলেন। নীরু হতাশ-ভাবে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল।

সেইদিন নীরুর ধারণা হইল, তাহার পত্র আসে, কিন্তু নতুন মা তাহাকে তাহা দেয় না। নীরু স্থির করিল, এখন হইতে সে নিজে ডাকঘরে গিয়া আপনার পত্র লইয়া আসিবে, নতুন মার হাতে পত্র আসিয়া পড়িলে সে তাহা পাইবে না।

ইহার পরদিন হইতে নীরু পোষ্টাফিসে গিয়া পোষ্টমাষ্টারের নিকট পত্রের তাগাদা আরম্ভ করিল।

সেদিন সকালে নীরু পত্রের অন্বেষণে আসিতেই শশিভূষণ তাহার হাতে একখান পত্র দিল। পিতার পত্র পাইয়া নীরু আনন্দে যেন নাচিয়া উঠিল, পত্রখান পড়িতে পড়িতে তাহার মুখমণ্ডল হাসিতে ভরিয়া আসিল। পাঠ শেষ হইলে সে হাস্যোজ্জ্বল দৃষ্টিতে শশিভূষণের দিকে চাহিয়া বলিল, "দেখ্‌লেন মাষ্টার মশাই, বাবা কত আদর ক'রে চিঠী লিখেছেন ?"

শশিভূষণ বলিল, "তোমার মত মেয়েটীকে কে না আদর করে নীরু ?"

লজ্জার হাসি হাসিয়া নীরু বলিল, "দূর, তা নয়; বাবা আমাকে খুব ভালবাসেন।"

পত্রখান আর একবার পড়িয়া নীরু সেখানি আঁচলে বাঁধিয়া চলিয়া গেল। পিতার পত্রপ্রাপ্তি জনিত আনন্দে আজি তাহার গতিটা কিছু অধীর হইল।

আমরা কিন্তু জানি, এ পত্রখানি তাহার পিতার লিখিত নহে, শশিভূষণের লেখা। আর তাহাতে কলিকাতার পোষ্টাফিসের ছাপ ছিল না, কেবল কাঁকড়াহাটীর মোহর ছিল। নীরু কিন্তু এতটা বুঝিল না। সে পিতার হস্তাক্ষরও ভাল চিনিত না; কারণ তাহার এই প্রথম পিতার পত্রপ্রাপ্তি।

প্রত্যহ নীরুর নৈরাশ্যপূর্ণ কাতর দৃষ্টিটুকু শশিভূষণের হৃদয়ে বড় জোরে আঘাত করিত, কিন্তু সে এই মাতৃহীনা পিতৃস্নেহবঞ্চিতা বালিকাকে প্রবোধ দিবার কোন উপায়ই খুঁজিয়া পাইত না। সে যে পিতৃস্নেহ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে একথা মুখ ফুটিয়া বলিয়া তাহার কোমল হৃদয়ের সরল বিশ্বাসে আঘাত করিতে পারিল না। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে শশিভূষণ নিজেই তাহার পিতার নামের জাল পত্র লিখিতে মনস্থ করিল। পত্রখানি লিখিবার সময়

একবার ভাবিয়াছিল, কাজটা ভাল হইবে কি ? কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিল, "দোষ কি ? আমি তো কাহাকেও ঠকাইবার জন্য জাল করিতেছি না, একটী ক্ষুদ্র বালিকার ব্যথিত হৃদয়ে শান্তির প্রলেপ দিতেছি মাত্র।"

তারপর পত্র পড়িবার সময় নীরুর বিষাদমলিন মুখখানা যখন হাসিতে ভরিয়া উঠিল, তখন শশিভূষণ ভাবিল, "এরূপ জাল সহস্রবার করিলেও কোন দোষ নাই।"

পরদিন নীরু আসিয়া একখান পোষ্টকার্ড চাহিলে, শশিভূষণ তাহাকে একখান কার্ড দিল। নীরু বলিল, "কিন্তু মাষ্টার মশাই, আমার কাছে তো পয়সা নাই ?"

ঈষৎ হাসিয়া শশিভূষণ বলিল, "তোমাকে পয়সা দিতে হবে না।"

নীরু কিন্তু মাষ্টার মহাশয়ের এই দান লইতে একটু সঙ্কুচিত হইল। বলিল, "আমি বাবাকে একটা টাকা পাঠাতে লিখে দেব। টাকা এলে আপনার পয়সা শোধ ক'রব।"

"তাই হবে" বলিয়া শশিভূষণ তাহাকে একটা দোয়াত কলম দিল। নীরু অনেকক্ষণ ধরিয়া, মোটা মোটা আঁকা বাঁকা অক্ষরে পত্রখানা লিখিয়া শেষ করিল। পত্রের শেষে পিতাকে একটী টাকা পাঠাইবার কথা লিখিয়া দিল।

শশিভূষণের হাতে পত্র দিয়া নীরু চলিয়া গেল। শশিভূষণ বসিয়া বসিয়া পত্রখানি পড়িতে লাগিল।

পত্রের উত্তরের প্রত্যাশায় নীরু প্রায় প্রত্যহই আসিত। একদিন শশিভূষণ বলিল, "নীরু, তোমার চিঠী আর টাকা এসেছে।"

নীরু সাহ্লাদে বলিয়া উঠিল, "টাকা এসেছে ?"

শশিভূষণ তাহার হাতে একখান পত্র আর একটী টাকা দিল। নীরু বলিল, "টাকা দিলেন, সই নিলেন না ?"

সে বাড়ীতে দেখিত, মনিঅর্ডারে টাকা আসিলে সই দিয়া টাকা লইতে হয়।

নীরুর প্রশ্নে শশিভূষণ একটু অপ্রতিভ হইল। একটু ইতস্ততঃ করিয়া, কাগজগুলাকে নাড়িয়া চাড়িয়া বলিল, "তা বটে। ফরম্‌খানা খুঁজে পাচ্ছি না। তবে আজ থাক, কাল এসে সই দিয়ে টাকা নিয়ে যাবে।"

নীরু টাকাটা ফেরত দিয়া কেবল পত্রখানা লইয়া চলিয়া গেল। শশিভূষণ একখান মনিঅর্ডারের ফরম পূরণ করিয়া, তাহাতে আফিসের মোহর দিয়া রাখিল। পরদিন নীরু আসিয়া তাহাতে সই দিয়া টাকা লইয়া গেল। টাকার সঙ্গে গ্রাহকের প্রাপ্য রসিদটুকু লইতে ভুলিল না।

ইহার পর হইতে নীরু প্রায়ই পিতার পত্র পাইত, মাঝে মাঝে টাকাও আসিত। সেও নিয়মিতরূপে পত্রের উত্তর দিত। বলা বাহুল্য, তাহার সে সকল পত্র ডাকের ব্যাগের পরিবর্ত্তে শশিভূষণের বাক্সে উঠিত। শশিভূষণ মাঝে মাঝে সেই পত্রগুলি বাহির করিয়া পড়িত; পড়িতে পড়িতে একটা অনাস্বাদিতপূর্ব্ব আনন্দের আবেশে বিভোর হইয়া পড়িত; সেই মোটা মোটা আঁকা বাঁকা লেখার ভিতর হইতে বহুদূরস্থিতা একটী বালিকার পিতৃস্নেহের স্নিগ্ধ মধুর ধারা নিঃসৃত হইয়া তাহার স্নেহসম্পর্কশূন্য শুষ্ক হৃদয়খানিকে সিক্ত করিয়া তুলিত।

৫

নীরু জানালার ধারে বসিয়া পিতার পত্রখানি পড়িতেছিল। সহসা পদশব্দে চমকিত হইয়া সে ফিরিয়া চাহিল; দেখিল পশ্চাতে নতুন মা। নীরু তাড়াতাড়ি পত্রখানা লুকাইতে গেল, কিন্তু পারিল না। চপলাসুন্দরী কর্কশকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও কার চিঠী?"

নীরু ভয়ে ভয়ে উত্তর দিল, "বাবার চিঠী।"

"কবে এসেছে?"

"দেখি।"

নীরু কম্পিতহস্তে বিমাতার হাতে পত্রখানি দিয়া ভীতি ব্যাকুলনেত্রে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সভ্য নীতিবিগর্হিত হইলেও চপলা নীরুর চিঠী পড়িতে লাগিলেন। পড়িতে পড়িতে তাঁহার সুগৌর গণ্ডদেশে ক্রোধের রক্তিম আভা ফুটিয়া উঠিল। পত্রের একস্থানে লেখা ছিল, "তোমার নতুন মা যদি তোমায় বকেন বা মারেন, তুমি কিছু বলিও না। তুমি আমার লক্ষ্মী মেয়েটি। আমি বাড়ী গিয়া তোমার নতুন মাকে শাসন করিব।"

কি? এত অবিশ্বাস! এত অবমাননা! একটা ক্ষুদ্র বালিকার কাছে তাহাকে এত ছোট করা? বাহিরে সততা দেখাইয়া ভিতরে ভিতরে মেয়েকে এতদূর প্রশ্রয় দান! চপলা চিঠিখানা মেঝের উপর ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। পরক্ষণেই কি ভাবিয়া সেখানা কুড়াইয়া লইলেন, এবং নীরুর উপর একটা জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া পদশব্দে কক্ষতল কম্পিত করিতে করিতে বাহির হইয়া গেলেন। নীরু শুষ্কমুখে সজল নয়নে বসিয়া রহিল।

পরদিনই বিজয়বাবু পত্নীর একখানা পত্র পাইলেন। পত্রে লেখা ছিল,

"আমার সহিত প্রতারণা করিয়া তোমার কোন লাভ নাই। আমি তোমার মৌখিক ভালবাসা বা অন্নবস্ত্রের ভিখারিণী নহি। তুমি আমাকে ঘৃণা বা অবিশ্বাস করিলেও একটা ক্ষুদ্র বালিকার নিকট আমাকে অবমানিত ও হৃদয়হীন প্রতিপন্ন করা তোমার উচিত হইয়াছে কি না জানিতে চাই। জানিয়া যাহা হয় ব্যবস্থা করিব। পারি যদি, তোমাকে এই দুর্ব্বহ গলগ্রহের ভার হইতে মুক্তি দিব।"

পত্র পড়িয়া বিজয়বাবু ব্যাপারটা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। কেবল এ টুকু বুঝিলেন, কোন অজানিত কারণে তিনি চপলের কোমল হৃদয়ে আঘাত করিয়া তাহার তীব্র অভিমানের হেতু হইয়াছেন। কারণটা কি জানিবার জন্য তিনি ছুটী লইয়া পরদিনই বাটী রওনা হইলেন।

বাড়ীতে আসিয়া অনেক সাধ্যসাধনার পর যথারীতি তর্জ্জন গর্জ্জন ও বর্ষণের অবসানে বিজয়বাবু যখন তাঁহার অপরাধের মূলীভূত পত্রখানা হাতে পাইলেন, তখন তিনি সেখানা আদ্যন্ত পড়িয়া পত্নীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "এরূপ লেখায় তোমার রাগ হ'বারই কথা। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় চপল, তুমি আমার হস্তাক্ষরটাও ভুলে গিয়েছ!"

চপলা বলিলেন, "স্বীকার করি, এ হস্তাক্ষর তোমার নয়। কিন্তু তুমি বি বলিতে চাও যে, অপর কোন লোক তোমার নাম ক'রে তোমার মেয়েকে পত্র লিখেছে?"

বিজয়। আমি কিন্তু ঠিক তাই বলি।

চপলা। তাতে তার লাভ?

বিজয়। লাভ—আমাদের গৃহবিচ্ছেদ বাধান। এটা যে আমার কোন শত্রুর কাজ, তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

বিজয়বাবু পত্রখানা উল্‌টাইয়া পাল্‌টাইয়া দেখিয়া সহাস্যে বলিলেন,"এ পত্রের লেখা যে আমার হস্তাক্ষর নয় তার প্রমাণ পেয়েছ। এখন এ পত্র যে কলিকাতা হ'তে আসে নি, এখান হ'তেই এসেছে, তারও প্রমাণ দেখ।"

এই বলিয়া বিজয়বাবু পত্নীকে দেখাইলেন যে, পত্রে কলিকাতার পোষ্টাফিসের মোহর নাই, কেবল কাঁকড়াহাটীর মোহর আছে। সুতরাং এ পত্র এখানকার কোন লোকের লেখা, আর সে লোকের উদ্দেশ্য শত্রুতা সাধন করা।

চপলা সমস্ত বুঝিয়া স্বামীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

বিজয়বাবু চপলাকে ক্ষমা করিয়া নীরুকে ডাকিলেন, এবং সে কোথা হইতে কিরূপে পত্র পাইয়াছে তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। নীরু ভীতিকম্পিতবক্ষে জড়িত

কণ্ঠে সকল কথা খুলিয়া বলিল, এবং তাহার নিকট আরও যে কয়খান পত্র ছিল, তাহা আনিয়া দিল। বিজয়বাবু দেখিলেন, দশ বার খানা পত্র, তাহার সঙ্গে আবার তিন চারিখান মণিঅর্ডারের রসিদ। বিজয়বাবু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ রসিদগুলা আবার কিসের?"

নীরু সভয়ে উত্তর করিল, "তুমি যে টাকা পাঠাতে বাবা,—"

একটা অপ্রত্যাশিত ধমক খাইয়া নীরু চুপ করিল। বিজয়বাবু পত্নীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "এটাও সেই জালিয়াতের কাণ্ড। কিন্তু পকেটের পয়সা খরচ ক'রে, এমন জালিয়াত কে? যেই হো'ক চপল, আশা করি, আমি শীঘ্রই এই জালিয়াতকে ধরিতে পারিব, এবং সে তাহার অবশ্য প্রাপ্য শাস্তি হইতে কখনই অব্যাহতি পাইবে না।"

পত্র ও রসিদগুলা পকেটে ফেলিয়া বিজয়বাবু বাহির হইয়া গেলেন। নীরু বিস্ময় বিমুগ্ধচিত্তে নীরবে সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল।

৬

বাড়ী হইতে বাহির হইয়া বিজয়বাবু একবারে পোষ্টাফিসে উপস্থিত হইলেন এবং আপনার পরিচয় গোপন রাখিয়া মিষ্টকথায় শশিভূষণের সহিত আলাপ আরম্ভ করিলেন। এরূপ আলাপে অনভ্যস্ত হইলেও শশিভূষণ এই মিষ্টভাষী ভদ্রলোকটীর কথাবার্ত্তায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিতে বাধ্য হইল।

কতকগুলা সাংসারিক ও বৈষয়িক কথাবার্ত্তার পর বিজয়বাবু বলিলেন, "আপনার কাছে একটু উপকারের আশায় এসেছি। যদি অনুগ্রহ ক'রে—"

বাধা দিয়া শশিভূষণ বলিল, "বলুন, কি কর্‌তে হবে।"

বিজয়। নূরপাড়া পোষ্টাফিষটা কোন্ জেলায় যদি দেখে দেন।

"এ তো সামান্য কথা" বলিয়া শশিভূষণ পোষ্ট্যাল্ গাইডের পাতা উল্‌টাইয়া বলিল, "নূরপাড়া, পাবনা জেলা, ভায়া মামুদপুর।"

বিজয়। যদি দয়া ক'রে ঐ টুকু লিখে দেন।

শশিভূষণ এক টুকরা কাগজ লইয়া লিখিতে গেল। বিজয়বাবু বলিলেন, "ইংরেজীতে নয়, বাঙ্গালায় লিখুন।"

শশিভূষণ বাঙ্গালাতেই লিখিয়া কাগজখণ্ড বিজয়বাবুর হাতে দিল। বিজয়বাবু পকেট হইতে একখানা পত্র বাহির করিয়া একবার সেই পত্রের দিকে আর বার কাগজখানার দিকে দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে সহসা তাঁহার মূর্ত্তি পরিবর্ত্তিত হইল; সেই শান্তশিষ্ট ভদ্রলোকটীর হাস্যময় মুখমণ্ডলে ক্রোধের গম্ভীর ছায়া ভাসিয়া উঠিল। তিনি বজ্রগম্ভীরকণ্ঠে ডাকিলেন, "মাষ্টার মশায়!"

সে কণ্ঠস্বরে চমকিত হইয়া শশিভূষণ বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে বিজয়বাবুর দিকে চাহিল। বিজয়বাবু হাতের চিঠীখানা শশিভূষণের সম্মুখে ছুড়িয়া দিয়া বলিলেন, "দেখ দেখি, এ চিঠীখানা কার হাতের লেখা।"

এ কি? এ যে নীরুর পত্র, শশিভূষণেরই লেখা। শশিভূষণ কি উত্তর করিবে খুঁজিয়া পাইল না, সে নীরবে নতনেত্রে পত্রখানার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহাকে নিরুত্তর দেখিয়া বিজয়বাবু রোষদীপ্ত কণ্ঠে বলিলেন, "এ চিঠী তোমারই লেখা, এ কথা বোধ হয় স্বীকার ক'রবে?"

শশিভূষণ উত্তর করিল, "হাঁ।"

বিজয়। বেশ, আমি এখন এগুলা আদালতের হাতে দিতে পারি?

শশিভূষণের বুক কাঁপিয়া উঠিল; সে অপরাধীর ন্যায় করুণনেত্রে বিজয়বাবুর দিকে চাহিয়া শুষ্ককণ্ঠে বলিল, "আমাকে ক্ষমা করুন।"

শ্লেষের হাসি হাসিয়া বিজয়বাবু বলিলেন, "জালিয়াতকে ক্ষমা, নূতন কথা বটে।"

শশি। আমার কোন মন্দ উদ্দেশ্য ছিল না।

বিজয়। একজন ভদ্রলোকের সাংসারিক বিষয় লইয়া আলোচনা, একজন কুলবধূর কুৎসা রটনা, উত্তম সদুদ্দেশ্য বটে!

শশিভূষণ নিরুত্তর। বিজয়বাবু নিক্ষিপ্ত পত্রখানা কুড়াইয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন; শ্লেষপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, "তোমার এই সাধু উদ্দেশ্যের পুরস্কার দিতে আমি অক্ষম। শীঘ্রই আদালত হ'তে এর উপযুক্ত পুরস্কার পাবে।"

মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে শশিভূষণ বলিল, "রক্ষা করুন, আমার চাকরীটুকু পর্য্যন্ত যাবে।"

বিজয়। তোমার মত জালিয়াতের এমন দায়িত্বপূর্ণ চাকরী যাওয়াই মঙ্গল।

শশি। আমি জালিয়াত নই। কেবল মাতৃহীনা বালিকাকে ভুলাবার জন্যই—

বিজয়। বালিকাকে ভুলাবার জন্যই আমার নাম জাল করেছ, আমার উচ্চহৃদয়া পত্নীকে অবমানিত করেছ, আমাদের গৃহবিচ্ছেদের সূত্রপাত ক'রেছ; পনর টাকার কেরাণী তুমি, আমার মেয়েকে অনুগ্রহ ক'রে টাকা দিয়ে আমার মর্য্যাদায় হস্তক্ষেপ করেছ।

এতক্ষণে শশিভূষণ আপনার অপরাধের গুরুত্ব অনুভব করিতে পারিল। সে তখন এযাত্রা রক্ষার জন্য বিজয়বাবুকে অনেক কাকুতি মিনতি করিতে লাগিল।

এতক্ষণে শশিভূষণ আপনার অপরাধের গুরুত্ব অনুভব করিতে পারিল। সত্যই তো, ১৫৲ টাকা বেতনের সামান্য কেরাণী সে, তাহার কি বিজয়বাবুর মত বড় লোকের মেয়ের উপর এতটা স্নেহ মমতা প্রদর্শন ভাল হইয়াছে? বড় লোকের মেয়েকে সাহায্য করিতে গিয়া সে যে তাঁহার গর্ব্বোন্নত মস্তকটাকে একেবারে ভূলুণ্ঠিত করিয়া দিয়াছে, তাহা শশিভূষণ এতক্ষণে বুঝিল, বুঝিয়া সে বিজয়বাবুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল।

বিজয়বাবু কিন্তু সহজে ক্ষমা করিতে পারিলেন না। অনেক অনুনয় বিনয়ে বাধ্য হইয়া শেষে এইটুকু দয়া করিলেন যে, শশিভূষণ যদি এক মাসের মধ্যে এখান হইতে বদলী হইয়া যাইতে পারে, তবেই তিনি ক্ষমা করিবেন। অগত্যা শশিভূষণ ইহাতেই সম্মত হইল।

সেই দিনই শশিভূষণ একখানা দরখাস্ত লিখিয়া কর্ত্তৃপক্ষের নিকট পাঠাইয়া দিল। তাহাতে সে বদলী হওয়ার প্রার্থনা করিল না, একেবারে পদত্যাগের প্রার্থনা জানাইল।

নিষ্কৃতিলাভের জন্য চাকরীর মায়া ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল, এবং সেই দিনই কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণের প্রার্থনা করিয়া কর্ত্তৃপক্ষের নিকট দরখাস্ত করিল।

প্রায় একমাস পরে দরখাস্তের উত্তর আসিল, তাহার প্রার্থনা মঞ্জুর হইয়াছে, সাত দিনের মধ্যে নব নিযুক্ত কর্ম্মচারীকে চার্জ্জ বুঝাইয়া দিয়া বিদায় লইতে পারিবে।

যথাসময়ে নবাগত পোষ্টমাষ্টারকে চার্জ্জ বুঝাইয়া দিয়া শশিভূষণ কাঁকড়াহাটীর নিকট চিরবিদায় গ্রহণ করিল!

তখন চারিদিকে পূজার বাজনা বাজিয়া উঠিয়াছে; দলে দলে লোক হাস্য-কোলাহলে পল্লীপথ মুখরিত করিয়া ঠাকুর দেখিতে চলিয়াছে। সেই শারদ ষষ্ঠীর প্রফুল্ল প্রভাতে মুটের মাথায় আপনার ক্ষুদ্র ট্রাঙ্কটী চাপাইয়া দিয়া, বিষাদের গুরুভার হৃদয়ে চাপিয়া, শশিভূষণ যখন ধীর মন্থর পদে বিজয়বাবুর বাটীর সম্মুখের পথ দিয়া চলিয়াছিল, তখন বিজয়বাবু গবাক্ষসম্মুখে দাঁড়াইয়া, পত্নীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ঐ দেখ, সেই হতভাগা জালিয়াতটা।"

চপলা ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া লইল।

কমলাকান্তের চিঠি।

[লেখক—শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়।]

প্রসন্ন গোয়ালিনী দুধ যোগাইতে বাহির হইয়াছে,—আমি তাহার দাওয়ায় বসিয়া হুঁকা হাতে ঝিমাইতেছিলাম। সুখের কথায় বাঙ্গালীর অধিকার নাই,—তাই দুঃখের কথাই ভাবিতেছিলাম। এমন সময় দূরাগত সঙ্গীতের এই কলিটী কাণের ভিতর প্রবেশ করিল,—

"মানুষ আমরা, নহি ত মেষ।"

চক্ষু মেলিলাম—কিছু বুঝিতে পারিলাম না। আমি শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী—চিরদিনই বাঙ্গালীর পশুত্ববাদী। বঙ্কিমের 'বঙ্গদর্শন' যখন বাহির হয়, তখন হইতেই ঐ মত প্রচার করিয়া আসিতেছি। 'বঙ্গদর্শনে' লিখিয়াছিলাম—"যেমন ক্ষীরোদ-সাগর মন্থন করিলে চন্দ্র উঠিয়া জগৎ আলো করিয়াছিল,—তেমনি পশু-চরিত্র-সাগর মন্থন করিয়া এই অনিন্দনীয় বাঙ্গালী-চাঁদ উঠিয়া বাঙ্গালাদেশ আলো করিতেছেন।" কিন্তু আজ সহসা একি শুনি—"মানুষ আমরা নহি ত মেষ"! একটু হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম। একবার মনে হইল, ইহার ভিতর বুঝি একটু ব্যঙ্গ আছে! কিন্তু গানের আগা-গোড়া শুনিয়া সে ধারণা দূর হইল। বুঝিলাম, গানের প্রতি ছত্র আমারই কথার প্রতিবাদ করিয়াছে।

চল্লিশ বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালী-চরিত্রের এই অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তনের কথা শুনিয়া মনে একটু আনন্দ হইল; একবার তাহা ভাল করিয়া দেখিবার সাধও হইল। আফিমের মাত্রা চড়াইলাম,—অমনি জ্ঞান-নেত্র ফুটিল; সম্মুখে বায়স্কোপের ছবির মত বাঙ্গালী-চরিত্রের নানা ছবি একে একে দেখা দিতে লাগিল। বুড়া হইয়াছি,—সব ছবির কথা মনে নাই। তবে যে দুই-চারিটির কথা মনে আছে, তোমাদের উপঢৌকন দিতেছি।

প্রথমেই যে চিত্র দেখিলাম, তাহাতেই আক্কেল-গুড়ুম হইয়া গেল। দেখিলাম—আমারই অঙ্কিত এক পুরাতন চিত্র বর্দ্ধিতাকারে প্রকাশ পাইতেছে। দেখিলাম, সহস্র সহস্র বাঙ্গালী বাবু চাকরী-লাঙ্গল কাঁধে লইয়া জীবন-ক্ষেত্র কর্ষণ-পূর্ব্বক কেবল কাঁটার ফসলের যোগাড় করিতেছে। ইউরোপে যুদ্ধ—জার্ম্মণীর বিরাট পণ্য-প্রবাহের পথ আজ রুদ্ধ। সম্মুখে স্বদেশী-শিল্পের বিস্তৃত ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে। তথাপি ইহারা সেদিকে অগ্রসর না হইয়া বিস্তার ছালা পিঠে করিয়া,

কলেজ হইতে আফিস কাছারিতে আনিয়া ফেলিয়া, চিনির বলদের মান রাখিতেছে। এ ছবি দেখিয়া পৃথিবীর বলদ-জাতিকেই মনে পড়িল—'মানুষে'র কথা একেবারে মনেই আসিল না।

তার পর যে ছবি দেখিলাম, তাহাও নূতন নহে। পুরাতনের উপর একটু চড়িয়াছে মাত্র। দেখিলাম, দলে দলে লোক বড়লোকের বাড়ীর দুয়ারে দুয়ারে মেও মেও করিয়া ঘুরিয়া ফিরিতেছে। বুঝিলাম, ইহারাও আকৃতিতে মানুষ হইলেও, প্রকৃতিতে মানুষও নহে, মেষও নহে—মার্জ্জার-জাতীয়। কাঁটাটা, গুঁড়াটা, মাছটার লোভে বড়লোকের পায়ে ইহারা লুটাইয়া পড়ে। লাথি-ঝাঁটায় ইহাদের অরুচি নাই। থোলের মধ্যে পূরিয়া, চাকরের মাথায় দিয়া বিড়ালকে দেশছাড়া করিয়া দিলেও, সে যেমন দুই দিন পরে গৃহমধ্যে দেখা দেয়, ইহারাও তেমনি শত গঞ্জনা দিয়া তাড়াইয়া দিলেও, বিড়ালের মত দুই দিন পরে শুষ্কমুখে একটু ভয়ে, একটু আহ্লাদে, ধনীর বৈঠকখানায় উঁকি মারিয়া থাকে! বাঙ্গালার সর্ব্বত্রই এই জীব দেখিতে পাওয়া যায়। এ জীবেরও আবার জাতিভেদ আছে। কেহ সাহিত্যিক-বিড়াল, কেহ উকীল-বিড়াল, কেহ বা বক্তা-বিড়াল। তবে তাহার মধ্যে সাহিত্যিক-বিড়ালের সংখ্যাই সব চেয়ে বেশী। রাজা-মহারাজা দেখিলেই ইহারা তাঁহাদের পা চাটিতে আরম্ভ করে। রাজা-মহারাজারা, দয়া করিয়া এক টুকরা মাছের কাঁটা দিলেই ইহারা বর্ত্তাইয়া যায়। ব্রিফ্‌লেশ ব্যারিষ্টার, হা'ঘরে প্রফেসর এই কাঁটাটুকুর লোভে চারিদিক হইতে ছুটিয়া আসিয়া এখানে জুটে! জুতা ও কাঁটা এক সঙ্গে ইহাদের আহার চলে!

তার পর আর এক শ্রেণীর জীবের ছবি দেখিলাম—বাঙ্গালা দেশে তাহাদের সংখ্যাও গণিয়া শেষ করা যায় না। ইহারাও সাহিত্যিক বটে, তবে বিড়াল-জাতীয় নহে। তাহাদের মাথায় বুদ্ধি নাই, পেটে বিদ্যা নাই; অথচ তাহারা বাঙ্গালার সাহিত্য-ক্ষেত্র চষিয়া ফেলিবার উপক্রম করিতেছে। তাহাদের সম্বল শুধু—অপক্ক কদলী। সময় নাই, অসময় নাই, তাহারা সকলকেই আঁচড়াইবার কামড়াইবার চেষ্টা করে। যদি দয়া করিয়া ইহাদের কেহ ঝাঁটা না মারে, তাহা হইলে ইহাদের লেজ দশহাত ফুলিয়া উঠে—লম্ফপ্রদানের শক্তিও সঙ্গে সঙ্গে একটু বাড়ে। তখন মনে করে, সমগ্র দেশ তাহাদের শক্তি দেখিয়া অবাক্ হইয়া চাহিয়া আছে। তাহাদের লম্ফঝম্ফ যে কৌতুকের জিনিষ বলিয়া লোকে দেখে, তাহা তাহারা বুঝিতে পারে না। শাখামৃগের যত কিছু গুণ, সে

সমস্তই ইহাদের সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত। ইহাদের 'মানুষ' বলিলে, মর্কটজাতির প্রতি উপেক্ষা করা হয়।

এইরূপ পৃষ্ঠপ্রদর্শনকুশল দেশহিতৈষী, বক্তা প্রভৃতি বাঙ্গালী-জন্তুর নানা রকম ছবি দেখিতে দেখিতে 'মানুষ আমরা নহি ত মেষ' গানটির উপর ক্রমশঃই ভক্তি চটিতে লাগিল। মনে হইল, ইহাও দ্বিজেন্দ্রলালের একটা হাসির গান! তন্ময় হইয়া ইহা ভাবিতেছি, এমন সময় এক টুকরা কাগজ বাতাসে উড়িয়া আমার গায়ে আসিয়া পড়িল। চাহিয়া দেখিলাম—এক সাময়িক পত্রেরই তাহা এক টুকরা। তাহাতে লেখা রহিয়াছে,—

"In other words human lives went so cheap as three for a rupee and the same is going on this year in the district—the land of Sir S. P. Sinha and Sir R. N. Tagore and the home of the Hetampur Rajkumars."

—এইটুকু পড়া শেষ করিয়া মুখ তুলিয়া দেখিলাম—প্রসন্ন তখনও আসে নাই। হুঁকা হাতে নিমীলিতলোচনে আবার ভাবিতে লাগিলাম, বিধাতা কি পাষাণ দিয়া বাঙ্গালীর হৃদয় গড়িয়াছিলেন!—মানুষ মানুষের জন্য হইয়াছে, এ কথা কি বাঙ্গালী কখনও জীবনে উপলব্ধি করিবে না?

এমন সময় সহসা 'হরিধ্বনি'তে চমক ভাঙ্গিল। চাহিয়া দেখিলাম—পথ দিয়া শববাহীরা শব ঘাড়ে করিয়া চলিয়াছে। শুনিলাম, ইহা এক বাঙ্গালী ঘরের কুমারী কন্যার শবদেহ। কন্যার পিতাকে কন্যার বিবাহের জন্য ভিটা বেচিতে হইবে শুনিয়া এই বালিকা নাকি কেরোসিন মাখিয়া আগুনে পুড়িয়া মরিয়াছে। শব এখনও চক্ষুর অন্তরাল হয় নাই, আবার সুদূর হইতে কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিল—"মানুষ আমরা, নহি ত মেষ"—যেন তীব্র সায়ক কর্ণে আসিয়া বিঁধিল। প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে, বাঙ্গালীর পশুত্ববাদ প্রচার করিয়াছিলাম। ভাবিলাম, এখন যদি আবার দপ্তর লিখিতে হয়, তাহা হইলে মতের পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। বাঙ্গালী,—মানুষ ত নহে, মেষও নহে। আটাশ হাজার কৃষ্ণের জীব পটোল তুলিলেও যাহারা কড়ে আঙ্গুলটি তুলিয়া সাহায্য করে না, কিন্তু কথায় কথায় দেশকে বড় করিতে চায়; যাহারা দেব-গৌরবের গর্ব্ব করে, কিন্তু কুমারী কন্যার কেরোসিনের অনলে আত্মবিসর্জ্জন দেখিয়াও গম্ভীরবেদী হইয়া থাকে, তাহারা কি? ভীষ্মদেব খোসনবীশ স্বর্গে গিয়াছেন, কাহাকে জিজ্ঞাসা করিব?

সাহিত্য-প্রসঙ্গ।

[লেখক—শ্রীঅমূল্যচরণ সেন।)

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—ভাদ্র। গত ১লা ভাদ্র 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র বয়স ৭৩ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। 'তত্ত্ববোধিনী' ৭৪ বৎসরে পদার্পণ করিল। বাঙ্গালা দেশের মাসিক পত্র প্রায় যেরূপ স্বল্পায়ু, তাহাতে 'তত্ত্ববোধিনী'র এই সুদীর্ঘ পরমায়ু দেখিয়া প্রত্যেক সাহিত্যানুরাগীরই আনন্দ প্রকাশ করা উচিত। আমরা এই সুপ্রাচীন পত্রিকাকে সাদরে ও সসম্ভ্রমে অভিনন্দিত করিতেছি।

বাঙ্গালা ১২৫০ সালে 'তত্ত্ববোধিনী'র জন্ম হয়। সে আজ কত দিনের কথা! ভাদ্রের 'তত্ত্ববোধিনী'তে শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় 'তত্ত্ববোধিনী'র ইতিবৃত্ত লিখিয়াছেন। এ ইতিবৃত্তের সহিত বাঙ্গালী পাঠকের পরিচয় থাকা উচিত। এজন্য 'অর্চ্চনা'র পাঠক-পাঠিকাগণকে আমরা উহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া উপহার দিলাম—

"আজ ১লা ভাদ্র। ৭৩ বৎসর পূর্ব্বে ঠিক এই দিনে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ইহার প্রতিষ্ঠাতা। পরবর্ত্তী সময়ে অক্ষয়কুমার দত্ত ইহার প্রতিপোষক। স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এক সময়ে ইহার তত্ত্বাবধান করিতেন। কত সুলেখকের কত সুচিন্তিত প্রস্তাব ইহাতে স্থান পাইয়াছে তাহার ইয়ত্তা করা বড় কঠিন। এ দেশে দর্শনশাস্ত্র প্রকাশের প্রথম সময়ে ৺কালীবর বেদান্তবাগীশ তাঁহার অনুবাদ সহ সাংখ্য দর্শন, পাতঞ্জল দর্শন এই পত্রিকায় প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের প্রথম খণ্ড ইহাতে প্রথম প্রকাশিত হয়। শ্রদ্ধেয় কেশবচন্দ্র সেন ও সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রথম বক্তৃতা ইহাতে স্থান পাইয়াছে। শ্রদ্ধেয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার এক সময়ে ইহার সম্পাদক ছিলেন। মহর্ষিদেবের রচনা ও ব্যাখ্যান ইহাতে স্থান পাইয়াছে। ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৺হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৺গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি সুধী-বর্গের সুচিন্তিত বিবিধ প্রবন্ধ ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছে। বঙ্গভাষায় তাড়িত বিজ্ঞান প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে এই বিষয়ে ৺সীতানাথ বসু ইহাতে লেখনী সঞ্চালন করিয়াছিলেন। পণ্ডিতবর আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ, হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন, বেচারাম চট্টোপাধ্যায়ের অনেক লেখা পত্রিকার কলেবর বিভূষিত করিয়াছে। এই সেদিন শ্রদ্ধেয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইহার সম্পাদনভার গ্রহণ করিয়া ইহাকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। কত মাসিক পত্র তত্ত্ববোধিনীর আদর্শে বাহির হইয়া লীলাসাঙ্গ করিয়াছে। কিন্তু তত্ত্ববোধিনী আজও সজীব। যে সময়ে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয় তখন মাসিক পত্রিকার অসদ্ভাব ছিল। লোকে সোৎকণ্ঠে পত্রিকার প্রকাশকাল অপেক্ষা করিত। বলা বাহুল্য তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বঙ্গভাষাকে গড়িয়া তুলিয়াছে, বঙ্গভাষার প্রতি সাধারণের শ্রদ্ধা আকৃষ্ট করিয়াছে, লোকের রুচিকে সুপথে পরিচালিত করিয়াছে, স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার ভাবকে জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছে।

এই পত্রিকায় ঋক্ বেদের প্রথম অংশ ভারতবর্ষে প্রথম বাহির হয়। মনীষী মোক্ষমূলার তাঁহার পুস্তকে পত্রিকায় প্রকাশিত ঋক্‌বেদের ও তাহার অনুবাদের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। ইহাতে মহর্ষিদেব ভাষ্যসহিত কয়েকখানি উপনিষদ প্রকাশিত করেন। রামমোহন রায়ের লুপ্তপ্রায় গ্রন্থাবলীর অনেক অংশ ইহাতে প্রকাশিত হয়।

ব্রাহ্মধর্ম্ম যে বিপুল বিক্রমে প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, তাহার অনেক কাহিনী ইহাতে প্রকাশিত হয়। ভক্ত বিজয়কৃষ্ণের প্রচার-বিবরণ ইহাতে বাহির হইয়াছিল। বঙ্গভাষায় স্বদেশীয়ের প্রথম হিমালয়ভ্রমণ ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছিল। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে ব্রাহ্ম-সমাজের ইতিহাস ও তাহার অভিব্যক্তির বিরবণ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। ভাবী বংশীয়গণের নিকটে তত্ত্ববোধিনী অমূল্য হইয়া থাকিবে।

এখনও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বাহির হইতেছে। ইহাতে আধ্যাত্মিক, সামাজিক, প্রাচীন ইতিহাস, বিভিন্ন ধর্ম্মের সমালোচনা ও তাহার ধারা স্থান পাইতেছে। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা একদিকে আদিব্রাহ্মসমাজের ভেরী হইলেও নানা বিষয়ের গবেষণা ইহাতে প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে।"

চিন্তামণি বাবু 'তত্ত্ববোধিনী'র সকল কথাই লিখিয়াছেন; একটী কথা তিনি লিখেন নাই। 'তত্ত্ববোধিনী' যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন বহু দেশীয় ব্যক্তি খৃষ্টান ধর্ম্মের উপর অনুরাগ প্রকাশ করিতেন; কেহ কেহ খৃষ্টান ধর্ম্মে দীক্ষিতও হইতেন। খৃষ্টান ধর্ম্মে অভিষেক তখনকার দিনে গৌরবের বস্তু ছিল। যিনি খৃষ্টান হইতেন, তিনি বুক ফুলাইয়া, মাথা উঁচু করিয়া পথ চলিতেন। স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পরধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার চক্ষুলজ্জা হইত না। 'তত্ত্ববোধিনী' দেশীয়দের এই ভাবে খৃষ্টধর্ম্ম-গ্রহণের বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করিতে আরম্ভ করেন। তৃতীয় বর্ষের 'তত্ত্ববোধিনী' পাঠ করিলেই আমাদের এ কথার যাথার্থ্য বুঝিতে পারিবেন। দেশীয়ের খৃষ্টান ধর্ম্মে অভিষেকের বিরুদ্ধে সাহিত্যের ভিতর দিয়া যে তীব্র আন্দোলন তখন চলিয়াছিল, 'তত্ত্ববোধিনী'কে তাহার অধিনায়িকা বলা যাইতে পারে। এখনও সে জ্বালাময়ী ভাষা পাঠ করিলে যেন চক্ষু ফাটিয়া রক্ত বাহির হয়। 'তত্ত্ব-বোধিনী'র এই আন্দোলন যে অনেক বিকৃতমস্তিষ্ক দেশবাসীর জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত করিয়াছিল, সে পক্ষে সন্দেহের কোনও কারণ নাই। 'তত্ত্ববোধিনী' যে দেশের এত বড় একটী কাজ করিয়াছিল, আলোচ্য জীবনেতিহাসে তাহার বিবরণ থাকা উচিত ছিল বলিয়াই এই কয়েকটী কথা বলিলাম।

রবিয়ানা—শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত। অমরেন্দ্রনাথ 'অর্চ্চনা'র লেখক। কেবল লেখক বলিলে ঠিক হইবে না; যে কয়েকটী স্তম্ভকে অবলম্বন

করিয়া 'অর্চ্চনা' আজ পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া আছে, তিনি তাঁহাদের অন্যতম। কেবল তাহাই নহে; অমরেন্দ্রনাথ আমাদের পরম স্নেহভাজন অন্তরঙ্গ। সুতরাং তাঁহার নবপ্রকাশিত গ্রন্থ 'রবিয়ানা' সম্বন্ধে আমাদের কোনও কথা বলা সঙ্গত হইবে না। 'রবিয়ানা'র প্রথম সূত্রপাত এই 'অর্চ্চনা'তেই হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ রাজনীতিক্ষেত্রে অতি শীঘ্র যে মত পরিবর্ত্তন করিয়া নিজ সুবিধাবাদিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, অমরেন্দ্রনাথ প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে তাহা শিক্ষিত সমাজকে দেখাইয়া দিয়াছিলেন। তার পর রবীন্দ্রনাথের মত-বদলের কতক কতক কথা অমরেন্দ্রনাথ 'অর্চ্চনা'য় লিখিয়াছেন। সুতরাং 'অর্চ্চনা'য় 'রবিয়ানা'র প্রবন্ধাদির উল্লেখ হয় ত কতকটা পুনরুক্তি হইতে পারে। তবে একটা কথা জোর গলায় বলিয়া রাখিব যে, রবীন্দ্রনাথের মত-পরিবর্ত্তনের কথা অমরেন্দ্রনাথই বাঙ্গালী পাঠককে প্রথম শুনাইয়াছেন; এ সম্বন্ধে তিনি মৌলিকত্বের দাবী করিতে পারেন। রবীন্দ্রনাথকে তিনি যে ভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অধ্যয়ন করিয়াছেন, সে কথা রবীন্দ্রনাথের অন্ধ উপাসকবৃন্দেরও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অমরেন্দ্রনাথ রবীন্দ্র-বিরোধী নহেন, তাঁহার রচনার নিরপেক্ষ সমালোচক মাত্র। 'রবিয়ানা' বাহির হওয়াতে এইবার রবীন্দ্রের অতি-ভক্তের দলও তাহা জানিবে।

রবীন্দ্রনাথ কবি। কাব্যের গণ্ডীর মধ্যে তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশ সহা যায়, উপেক্ষাও করা যায়, কারণ তাহা কাব্য। কিন্তু সমাজ ও রাজনীতিক্ষেত্রে তিনি আজ এক কথা বলিবেন, কাল এক কথা বলিবেন,—ইহা ত'সহ্য করা যায় না। রবীন্দ্রনাথ স্বদেশীতন্ত্রের পুরোহিত হইবার সাধ মনে পোষণ করিতে পারেন, জন-নায়ক হইবার কল্পনাও তাঁহার থাকিতে পারে, কিন্তু এই দুই মহোচ্চ পদ লাভ করিতে হইলে কথা ও কার্য্যের সামঞ্জস্য—অন্ততঃ মতের সামঞ্জস্য রক্ষা করা যে অত্যাবশ্যক, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আন্তরিকতা না থাকিলে মত-পরিবর্ত্তন হইবেই। বড় কাজ করিতে গেলে আন্তরিকতা থাকা চাই। সুবিধাবাদীর জন্য এ কাজ নহে। কাজেই রবীন্দ্রনাথ এই দুই ব্যাপারে নিষ্ফল হইয়াছেন; কেবল তাহাই নহে,—আত্মপ্রবঞ্চনাও করিয়াছেন। অমরেন্দ্রনাথের বাহাদুরী এই যে, তিনি রবীন্দ্রনাথের এই আত্মপ্রবঞ্চনাটুকু ধরিয়া ফেলিয়াছেন।

জনৈক 'রবি-ভক্ত'ও প্রকারান্তরে এই কথা স্বীকার করিয়াছেন। 'রবিয়ানা' পাঠ করিয়া অন্ততঃ একজন 'রবি-ভক্তে'র চক্ষু খুলিয়াছে বলিয়া আমরা আনন্দিত। অতএব অমরেন্দ্রের 'রবিয়ানা'-প্রকাশ যে সার্থক হইয়াছে, ইহাতে সন্দেহ নাই।

রবীন্দ্রনাথের জনৈক ভক্ত 'রবিয়ানা' পাঠ করিয়া কিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আমরা পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থাপিত করিলাম। কারণ এ সম্বন্ধে ভক্তের কথার মূল্য আছে। যেহেতু তাঁহারা যে দৃষ্টিতে 'রবিয়ানা'কে দেখিয়াছেন, সে দৃষ্টি হইতে আমরা বঞ্চিত। মূল্যাদির সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহার উল্লেখ এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক।

রবিয়ানা।

(লেখক—জনৈক রবীন্দ্র ভক্ত।) *

অনেক দিন ধরিয়া যেখানে সেখানে অমরেন্দ্রবাবুর রবীন্দ্রনাথের প্রতি আক্রমণ অতি আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়া আসিতেছি। রবীন্দ্রনাথের পুরাতন অনেক লেখা আমাকে অতিমাত্রায় সুখ দিলেও তাঁহার বর্ত্তমান লেখার আমি সম্পূর্ণ বিরোধী। তাই যখন 'ভারতবর্ষে'র সাহিত্য-সংবাদে পাঠ করিলাম অমরেন্দ্রবাবুর 'রবিয়ানা'র মুন্সীয়ানা শীঘ্রই আমাদের দিতে আসিতেছে, তখন হইতেই আগ্রহান্বিত হইয়া রহিয়াছি। তাহার পর যখন বিজ্ঞাপনে পড়িলাম ৮০ বার আনা পয়সা খরচ করিলেই সুখ ভাগ্যে ঘটে, তখন আর স্থির থাকিতে না পারিয়া গুরুদাসবাবুর দোকানে অর্ডার দিলাম।

* * * * *

বইখানি পাইয়াই পড়িয়া ফেলিয়াছি। প্রবন্ধগুলি পূর্ব্বে একবার পড়া ছিল, তবুও খুব আগ্রহের সহিত পড়িলাম। যথার্থই এই প্রবন্ধগুলি পড়িতে খুব আমোদ পাওয়া যায়। অমরেন্দ্রবাবু রবীন্দ্রনাথকে ঠিক মত ভাবেই পাকড়াও করিয়াছেন। সমালোচনা করিতে বা দোষগুণ দেখাইয়া দিতে হইলে, লেখকের সমস্ত লেখার সহিত পরিচয় থাকা দরকার। বিশেষ ভাবে পরিচয় না থাকিলে লেখকের দোষ বা গুণ দেখাইতে যাওয়া পাগলামি—না, মূর্খতা, গাধামি। কিন্তু বড়ই দুর্ভাগ্যের বিষয়, এইরূপ সমালোচক বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রে অনেক জুটিয়া গিয়াছেন ; তাহাদের কেহ কেহ কিছু না পাঠ করিয়াই প্রশংসা করিতে থাকেন, আর কেহ বা গালি দিলেই বড় সমালোচক হওয়া যায় মনে করিয়া, জানা থাকুক্ বা না থাকুক্ গালি দিতে লাগেন। সুখের বিষয়, অমরেন্দ্রবাবুর বিষয়ে এরূপ কিছু বলা যায় না। তিনি যে রবীন্দ্রনাথের সব লেখাগুলি খুব মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার এই পুস্তক পাঠেই মালুম্ হইবে। আমার বিশ্বাস, কবিবরের অনেক গোঁড়া ভক্তও এমন করিয়া তাঁহার লেখা পাঠ করেন নাই।

অমরেন্দ্রবাবুর সহিত আমার প্রায় সর্ব্বত্রই মতের মিল আছে। তাঁহার এই পুস্তকপাঠে আমার ধারণা হইয়াছে যে, ইতঃপূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ সত্যে মিথ্যায় মিশাইয়া খুব ভালই লিখিতেন, এখন তিনি শুধু মিথ্যার অবতার হইয়াছেন। কোনও কোনও রবীন্দ্র-বিরোধী মহাপণ্ডিত অহঙ্কার-সর্ব্বস্বের প্রবন্ধ পড়িলে পাঠকের মনে যেমন রবীন্দ্রনাথকে সর্ব্বৈব মন্দ এবং কবিত্বহীন কৈতবাচারী বলিয়া মনে হয়, অমরেন্দ্রবাবু তাঁহার পুস্তকে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এরূপ ধারণা পাঠকের মনে বদ্ধমূল করিতে চেষ্টা করেন নাই ; তাহা সুখের বিষয়—তাঁহার জ্ঞান এবং সত্যবাদিতার পরিচায়কও বটে। মিথ্যাচারী বলিয়া রবীন্দ্রবিরোধী অনেকের প্রতিই আমার অশ্রদ্ধা আছে। সুখের বিষয়, রবীন্দ্রবিরোধী হইলেও অমরেন্দ্রবাবু তাহাদের এক জন নহেন বলিয়া মনে করি। তিনি রবীন্দ্রনাথের যে স্থানে গলদ সেই স্থানটাই দেখাইয়া দিয়া সাধারণের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

* * * * *

যাহা হউক, আশা করি. রবীন্দ্রনাথের লেখা সম্বন্ধে যাঁহাদের বিন্দুমাত্রও কৌতূহল আছে, তাঁহারা সকলেই পুস্তকখানি পাঠ করিবেন এবং নিতান্ত অন্ধ না হইলে সুখীও হইবেন।

---

* ইঁহার নাম ও ঠিকানা—শ্রীপদ্মকান্ত দাস ; দেবীপুর ; নৈহাটী-শ্রীরামপুর ; খুলনা।

সাহিত্য-সমাচার

কুশদহ—আষাঢ়, ১৩২৩। গত শ্রাবণ মাসের অর্চ্চনায় প্রকাশিত কুশদহের সমালোচনা-প্রসঙ্গে উক্ত পত্রের সম্পাদক দাস-কুণ্ডু মহাশয় সমালোচনার প্রতিবাদ বা মুণ্ডপাত করিবার প্রয়াসে বলিতেছেন—"আমরা জানি কুশদহের প্রতি সহযোগী একটু বিরূপ আছেন। কারণ 'মতো' 'কোনো' 'কী'র তিনি বা তাঁহারা বড় বিরোধী। তাই দেখিতেছি তাঁহারা যেন 'ঘায়ের মাছি'র মত হইয়া পড়িয়াছেন। বিদ্বেষ বুদ্ধিটাই ভালো না। তাহাতে ভ্রমে পড়িতে হয়। তাই সাফ্ বলিয়াছেন 'আংটির মূল্য গল্পটি অপহৃত অর্থাৎ সমাজপতি মহাশয়ের 'বাঘের নখ' নামক বিখ্যাত গল্পটি অবলম্বনে লিখিত।' অপহৃত মানেই অবলম্বনে লিখিত। সমালোচক যদি ধৈর্য্য সহকারে গল্পটি সমস্ত পড়িতেন তাহা হইলে তাঁহার এ ভ্রম হইত না। গল্পের শেষ ভাগে হাজার টাকা পুরস্কার একটা কথা আছে, বাঘের নখ গল্পের মধ্যেও একটা পুরস্কারের কথা আছে; ইহাতেই তিনি মনে করিয়াছেন অপহৃত। অথচ উভয় গল্পের প্লট্ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বিশেষ না দেখিয়া শুনিয়া এরূপ সিদ্ধান্ত করা এবং সহসা 'অপহৃত' বলা অতি অন্যায় ও ভদ্রতা বিরুদ্ধ। সহযোগী এ ভ্রম স্বীকার করিবেন কি?"

মানবের স্বভাবই এই যে কাণাকে কাণা বলিলে, খোঁড়াকে খোঁড়া বলিলে তাহাদের মনে কষ্ট হয়। এই কষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। কারণ কাণা বা খোঁড়া হইবার মূলে তাহাদের কোনও হাত থাকে না। কিন্তু অপহর্ত্তাকে অপহারক বলা সে নিয়মে আসিতে পারে না। কারণ অপহরণ করার মূলে তাহার যথেষ্ট হাত থাকে; সে ত অপহরণ না করিলেই পারে।

অপ্রিয় সত্যের অবতারণা করিতে গিয়া, 'আংটির মূল্য' নামক কুশদহে প্রকাশিত গল্প 'বাঘের নখ' হইতে 'অপহৃত' বলিয়া অর্চ্চনার সমালোচক কুশদহ-সম্পাদকের কিরূপ অপ্রীতিভাজন হইয়াছেন তাহা পাঠক দেখিলেন। রাজবর্ত্মে মলত্যাগ করিয়া তিনি চক্ষু কিরূপ আরক্তবর্ণ করিয়াছেন, শাক দিয়া কিরূপে মাছ ঢাকিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, পাঠকবর্গ উভয় গল্পের 'প্লট্' পাঠে তাহার পরিচয় গ্রহণ করুন—

'আংটির মূল্য' গল্পের ১ম ছত্র 'মালতী—নামটি তোমার কেমন লাগে'। 'বাঘের নখে'র ১ম ছত্র 'সরলা! নামটি তোমার কেমন লাগে।'

'আংটির মূল্যে'র গল্পাংশ—"মালতী ও নিখিল উভয়ে ছেলেবেলায় একত্র খেলা করিত। মালতী নিখিলকে 'নিখিল দা' বলিয়া ডাকিত। ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সহিত উভয়ের হৃদয়ে প্রেম অঙ্কুরিত হয়। কিন্তু মালতীর মাতা কুল-কৌলিন্যের জন্য নিখিলকে কন্যাদানে অমত করেন। নিখিল মালতীর বিবাহে উপস্থিত ছিল এবং নিখিলের বিদায়-গ্রহণের সময় মালতী তাহার নিকট আসিল এবং বলিল "দাদা তুমি কাঁদচ?" নিখিল কাঁদিল, মালতীকে কাঁদাইল! মালতী নিখিলের আংটিটি লইয়া নাড়াচাড়া করিয়া বলিল "দাদা এটা আমায় দেবে? মালতীকে অদেয় আমার (নিখিলের) কি ছিল? তখনি আমি (নিখিল) সেই আংটিটি মালতীর * * অঙ্গুলিতে পরাইয়া দিলাম।

নিখিল বি-এল্ পাশ করিয়া ওকালতি আরম্ভ করিয়াছিল। একদিন 'হঠাৎ একটি বিজ্ঞাপন দেখিয়া সে শিহরিয়া উঠিল। সেটি এই—'হাজার টাকা পুরস্কার। পুরুলিয়ার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত নির্ম্মলকান্তি মুখোপাধ্যায়ের পত্নী শ্রীমতী মালতী দেবীর একটি আংটি হারাইয়াছে। তাহার উপরিভাগে N. C. B. এই তিনটি অক্ষর খোদিত আছে। যিনি ঐ আংটির সন্ধান করিয়া দিতে পারিবেন, তিনি এক হাজার টাকা পারিতোষিক পাইবেন'। আমারই (নিখিলের) সেই তুচ্ছ আংটির জন্য হাজার টাকা পুরস্কার! দুই বিন্দু অশ্রু অলক্ষ্যে সেই কাগজখানির উপর গড়াইয়া পড়িল।"

'বাঘের নখে'র গল্পাংশ—"সরলা ও উপেন্দ্র বাল্যকালে উভয়ে একত্র খেলা করিত। সরলা উপেনকে 'উপেন দা' বলিয়া ডাকিত। ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সহিত উভয়ের হৃদয়ে প্রেম অঙ্কুরিত হয়। কিন্তু সরলার মাতা কাঞ্চন-কৌলিন্তে মৌলিক উপেনকে কন্যাদানে অমত করেন। উপেন্দ্র যখন সরলাকে ছাড়িয়া যাইতেছে তখন সরলা আসিয়া উপেনকে জিজ্ঞাসা করিল—'উপেন দা' বিয়ে কত্তে যাচ্ছ?" * * * তাহার পর "সরিয়া আসিয়া উপেন্দ্রের বুকের চেনটি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে লাগিল। সরলা বলিল, "তোমার চেনে ওটা কি? বাঘের নখ?" উপেন্দ্র বলিল 'কেন সরলা?" সরলা আমার (উপেন্দ্রের) মুখে দৃষ্টি সংযত করিয়া বলিল—"বাঘের নখটা আমায় দাও; দেবে?" তুচ্ছ বাঘের নখ, সরলাকে অদেয় আমার কি ছিল? তখনই সোণা বাঁধান বাঘের নখটি সরলার হাতে দিলাম।

উপেন্দ্র ইঞ্জিনিয়ার হইয়াছে। একদিন একখানি দৈনিক কাগজে সে দেখিল—"হাজার টাকা পুরস্কার! জালালপুরের সুপ্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার চৌধুরীর সহধর্ম্মিণী একটি সোনা বাঁধান 'বাঘের নখ' হারাইয়াছেন। যে কেহ ঐ বাঘের নখটি আমাদের নিকট উপস্থিত করিতে পারিবেন, তাঁহাকে হাজা'র টাকা পুরস্কার দেওয়া যাইবে। বাঘের নখটির মূল্য ১০।১৫, টাকার অধিক হইবে না—* * বাঘের নখের উপর সোনার পাতে U. L. M. এই তিনটি ইংরাজী হরফ খোদা আছে।" * * এক ফোঁটা চোখের জল কাগজের উপর পড়িল।

পাঠক দেখিলেন, "উভয় গল্পের 'প্লট' কিরূপ স্বতন্ত্র। আমরা পূর্ব্বে সমালোচনায় ভাষা-চুরির অভিযোগ করি নাই। এখন বাধ্য হইয়া তাহাও করিতে হইল। পাঠকবর্গ উপরের চিহ্নিত অংশগুলি মিলাইয়া পাঠ করিলে তাহা বুঝিতে পারিবেন।

'বাঘের নখে'র নায়ক নায়িকার বিবাহে উপস্থিত ছিল না, এবং 'আংটির মূল্যে'র নায়ক নায়িকার বিবাহে উপস্থিত ছিলেন অধিকন্তু গান গাহিতে জানিত, এইজন্যই বুঝি 'উভয় 'গল্পের প্লট স্বতন্ত্র'!

সামান্য মূল্যের সামগ্রীর পুনঃপ্রাপ্তির জন্য ১০০০, টাকা পুরস্কার ঘোষণা করায় 'বাঘের নখে'র সৌন্দর্য্য বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। 'আংটির মূল্যে'র লেখকের মস্তিষ্কে পুরস্কারের ১০০০, টাকাটা কমাইবার বা বাড়াইবার মৌলিকতাটুকু অবধি নাই অথচ তাঁহাকে অপহরণ করার অভিযোগ করায় কুশদহ-সম্পাদকের মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে। 'বিশেষ না দেখিয়া শুনিয়া' কিরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছি এবং অর্চ্চনার সমালোচকের বিদ্বেষ বুদ্ধিটা 'কীরূপ' সাধু সম্পাদক 'ভালো' করিয়া দেখিলেন ত?

কুশদহ-সম্পাদক বলিতেছেন—"কোনো এক সংখ্যায় ছবি না থাকিলেই কি সচিত্র নামের অযোগ্য হইয়া যায়? যার জন্য এত বিদ্রূপ! কভারের উপর ব্লকখানিও কি একেবারে ধর্ত্তব্য নহে?" 'কভারের বলক ধর্ত্তব্য বৈকী! আষাঢ় ও শ্রাবণের বলক একই, তাহাতে দোষ কী! আমরা সে কথাত বোলিছি! বীজ্ঞাপোনের বলক্ কী দোষ করীলো!' জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ও শ্রাবণ সংখ্যাতেই আমরা কোনও চিত্র দেখি নাই অথচ তালপুকুরের মত কুশদহ 'সচিত্র' নাম বহন করিতেছে ইহা 'কী'? অতঃপর বিশেষ গাত্র-প্রদাহের জ্বালায় তিনি গালি দিতেছেন—'মতভেদের কথা যাহা তাহা বলো কিন্তু গালাগালি কর কেন? যাহাদের প্রতি কটু কথা বলিতে আমাদের ভদ্র রসনায় বাধে না, কিন্তু তাহাতে ভদ্র-লোকে তোমাদিগকে কি মনে করেন ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? অহং বুদ্ধিটা একটু খর্ব্ব আর রসনাকে একটু সংযত করিলে ভাল হয় না কি?"

গালির উত্তর গালি দেওয়া; কিন্তু ভদ্রলোকের তাহা পরিহার্য্য। সুতরাং আমরা নিরস্ত হইলাম।

হেরম্ব গণেশ।

[লেখক—শ্রীগিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ।]

এই দেবতার পাঁচখানা মুখ, মুখগুলি হস্তীর মুখের মত, ইহাদের বর্ণ যথাক্রমে মুক্তা, স্বর্ণ, নীল, কুন্দপুষ্প ও কুঙ্কুম এই পাঁচ প্রকার বস্তুর সমান, ঊর্দ্ধদিক হইতে মুখ বিন্যাসের ক্রম অর্থাৎ ঊর্দ্ধস্থিত মুখ মুক্তার মত বর্ণ, অগ্রবর্ত্তী মুখ স্বর্ণবর্ণ (দেবতা পশ্চিমাস্য সুতরাং পশ্চিমদিকের মুখ স্বর্ণবর্ণ) উত্তরদিকের মুখ নীলবর্ণ, পূর্ব্বদিকের মুখ কুন্দের মত গাঢ় শ্বেতবর্ণ, এবং দক্ষিণ দিকের মুখ কুঙ্কুমের মত রক্তবর্ণ, প্রত্যেক মুখেই তিনটি চক্ষু আছে। ইহার বাহন সিংহ, কপালে চন্দ্র এবং বর্ণ সূর্য্যের মত গাঢ় রক্ত। ইনি দশ হস্তের দ্বারা দশপ্রকার আয়ুধ ধারণ করিতেছেন, তন্মধ্যে রাঘব ভট্টের মতে,—অধঃস্থিত দক্ষিণ হস্তে এবং বামহস্তে যথাক্রমে বরদ ও অভয় মুদ্রা, তদূর্দ্ধ হস্তদ্বয়ে, মোদক ও দন্ত, তদূর্দ্ধ হস্তদ্বয়ে পরশু ও কপাল, (শিরোহস্থিখণ্ড) তদূর্দ্ধ হস্তদ্বয়ে মালা ও মুদ্গর, তদূর্দ্ধ হস্তদ্বয়ে অঙ্কুশ ও ত্রিশূল ধৃত হইয়াছে।

রাঘব ভট্ট মূল শ্লোকের পাঠান্তর প্রদর্শন করিয়া তৎসমর্থনের জন্য ধ্যানান্তর উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা হইতে এই দেবতার হস্তে মুদ্গরের পরিবর্ত্তে সর্পের অবস্থান বুঝা যায়, এবং দেবতার শুণ্ডাগ্রের দ্বারা স্বর্ণকুম্ভ ধারণের পরিচয় পাওয়া যায়।

মতান্তরোক্ত ধ্যানের অর্থ—"যিনি হস্তের দ্বারা জপমালা রুজেশ (ত্রিশূল) অঙ্কুশ, মোদক, অভয়-মুদ্রা, টঙ্ক (কুঠার) উদ্গতকপাল (শিরোহস্থিখণ্ড) সর্প, বরদমুদ্রা এবং দন্তধারণ করিতেছেন, যাঁহার শুণ্ড স্বর্ণকুম্ভযুক্ত, যিনি সিংহস্থিত, যাঁহার মুখ পাঁচখানা এবং নয়ন তিনটি, যিনি রক্তবর্ণ, যিনি দিব্যবস্ত্রধারী এবং উৎকৃষ্ট ভূষণালঙ্কৃত, সমগ্র স্বার্থদান সমর্থ হেরম্ব নামক সেই মহাগণপতিকে আমি বন্দনা করি, এবং তাঁহার নিকট অভীষ্ট প্রার্থনা করি। রাঘব ভট্ট হেরম্ব ঠাকুরের দশহস্তে যে ভাবে আয়ুধ বিন্যাসের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে কোনও প্রমাণ প্রদর্শন করেন নাই, ইহা হইতে বোধ হয়, তিনি নিজের চক্ষে এই মূর্ত্তি কোথাও দেখিয়াছিলেন অথবা গুরু পরম্পরায় উপদেশ পাইয়াছিলেন। কারণ অনেক স্থলেই দেখা যায় যে, ধ্যান বলিয়া পরিচিত শ্লোকার্থের দ্বারা ধ্যেয় দেবতার সমগ্ররূপ বর্ণিত হয় না, সেইজন্য গ্রন্থান্তরের সাহায্য আবশ্যক হয়। তারা দেবীর

ধ্যান-ব্যাখ্যান প্রসঙ্গে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বিবিধ শ্রুতি হইতে ধ্যেয়রূপ প্রকাশক প্রমাণাবলী উদ্ধৃত করিয়া রূপের সম্পূর্ণতা দেখাইয়াছেন। বিশেষতঃ মূর্ত্তি নির্ম্মাণোপযোগী শিল্প শাস্ত্রে অনেক অতিরিক্ত বিষয় দেখিতে পাওয়া যায়, তদনুসারেও সন্দিগ্ধ বিষয়ের নির্ণয় হইয়া থাকে।

গূঢ়ার্থদীপিকা নামক রাঘব ভট্টেরও পূর্ব্ববর্ত্তী টীকার মতে হেরম্ব ঠাকুরের হস্তস্থিত মালা শিরের দ্বারা গ্রথিত; সুতরাং হস্তে মুণ্ডমালা থাকিবে। উক্ত টীকায় সমগ্র রূপের ব্যাখ্যা নাই, কেবল "শিরোভিগ্র'থিতাং মালাং" এইমাত্র কথিত হইয়াছে; অতএব উক্ত টীকা সম্মত মূলের পাঠ যে কিরূপ তাহা বুঝিবার উপায় নাই।

বিরিগণপতি।

গণেশ ঠাকুরের বিরি নামে পরিচিত আর একপ্রকার মূর্ত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। সারদা তিলকের মূলে এবং রাঘব ভট্ট কৃত উক্ত গ্রন্থের টীকায় বিরি ঠাকুরের ভিন্ন ভিন্ন ধ্যান দেখিতে পাওয়া যায়, দেব চরিত্র প্রাকৃত মানব অস্মদাদির বোধগম্য নহে; সুতরাং বিরি ঠাকুরের মূর্ত্তির সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ করিতে পারিলাম না, পাঠক কেবল সংস্কৃত শ্লোকেই সম্পূর্ণ লীলার পরিচয় পাইবেন।

ইনি হস্তিমুখ সিন্দূরবর্ণ ত্রিনেত্র এবং চতুর্ভুজ। দক্ষিদিকের ঊর্দ্ধহস্তে পাশ অধোহস্তে মধু (মদ্য) যুক্ত কপাল (মদ্যপান পাত্র) বামদিকে ঊর্দ্ধহস্তে অঙ্কুশ, অধোহস্ত·········ইহার মস্তকে অর্দ্ধচন্দ্র, ইনি নিজস্ত্রী পুষ্টিকর্তৃক আলিঙ্গিত, পুষ্টিদেবীও চতুর্ভুজা, ইহার হাতে পদ্ম আছে। সম্প্রদায় বিশেষের মতে ইনি দ্বিভুজা। এই মতে পুষ্টি নিকটে আছেন মাত্র আলিঙ্গন করেন নাই। বিরি ঠাকুরের শুণ্ডাগ্রে ধনপূর্ণ ভাণ্ড আছে।

টীকোক্ত একটি ধ্যানে ইহার দশ হস্তের বর্ণনা দেখা যায়। তন্মধ্যে ইনি দক্ষিণদিকের পঞ্চ হস্তে যথাক্রমে বীজপূর, গদা, ধনু, শক্র এবং মালা, বামদিকের হস্তে বাণ, পাশ, উৎপল, দণ্ড এবং রত্নপূর্ণ কুম্ভ ধারণ করিতেছেন। অন্যান্য সমস্ত লক্ষণ মূলোক্ত ধ্যানেরই অনুরূপ।

শক্তিগণপতি।

ইহার অনেকাংশই বিরি ঠাকুরের মত, কেবল বর্ণ মুক্তার মত, তিন হস্তে পদ্ম অঙ্কুশ ও রত্নকুম্ভ, অপরহস্ত···মস্তকে রত্নাভরণ ধারণ করিয়াছেন। পুষ্টি-দেবীর বর্ণ পদ্মের মত। ইহারই অপর একটি মূর্ত্তির বর্ণনাও উক্ত ধ্যানেরই প্রায় অনুরূপ, চতুর্ভুজে ইক্ষুদণ্ড, বরদমুদ্রা, পাশ ও অঙ্কুশ ধারণ, বর্ণ জবার মত রক্ত এবং পুষ্টির বর্ণ শ্যাম এই মাত্রই বিশেষ দেখা যায়।

হেরম্ব।

মুক্তাকাঞ্চননীলকুন্দ-ঘুসৃণচ্ছায়ৈ স্ত্রিনেত্রান্বিতৈ
নাগাস্যৈ র্হরিবাহনং শশিধরং হেরম্ব মর্ক প্রভম্
দৃপ্তং দান মভীতি-মোদক-রদান্ টঙ্কং শিরোঽক্ষাত্মিকাম্
মালাং মুদ্গর মঙ্কুশং ত্রিশিখকং দোর্ভির্দধানং ভজে॥

টীকোক্ত ধ্যানান্তর।

বন্দে দোর্ভি র্দধানং জপবলয়রুজেশাঙ্কুশং মোদকাভী-
টঙ্কামুগ্রং কপালং ভুজগবররদান্ স্বর্ণকুম্ভাঢ্য-শুণ্ডম্
সিংহস্থং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনয়ন মরুণং দিব্যবস্ত্রোরুভূষম্-
হেরম্বাখ্যং মহান্তং গণপতি মখিল স্বার্থদং প্রার্থয়েঽহম্॥

বিরিগণপতি।

সিন্দূরাভ মিভাননং ত্রিনয়নং হস্তেষুপাশাঙ্কুশৌ
বিভ্রাণং মধুমৎ কপাল মনিশং সার্দ্ধেন্দুমৌলিং ভজেৎ
পুষ্ট্যা শ্লিষ্টতনুং ধ্বজাগ্রকরয়া পদ্মোল্লসদ্ধস্তয়া
তদ্‌যন্যাহিত-পাণি মাত্তবসুমৎ পাত্রোল্লসৎ পুষ্করম্॥

টীকোক্ত ধ্যান।

বীজাপূরগদে শরাসন মরিং মালাঞ্চ দক্ষৈঃ করৈ
র্বামৈ র্বাণ-সপাশকোৎ পলরদান্ রত্নাঢ্য-কুম্ভং দধৎ
সিন্দূরারুণ বিগ্রহ স্ত্রিনয়নো যোন্যস্তশুণ্ডোগণঃ
সল্লিঙ্গাহিত পাণি মম্বুজ করাং পুষ্টিং বহন্ বোঽবতাৎ॥

শক্তিগণপতি।

মুক্তাগৌরং মদগজমুখং চন্দ্রচূড়ং ত্রিনেত্রম্
হস্তৈ স্বীয়ৈর্দধত মরবিন্দাঙ্কুশৌ রত্নকুম্ভম্
অঙ্কস্থায়াঃ সরসিজরুচে স্তদঙ্গজালম্বিপাণে
র্দেব্যাযোনৌ বিনিহিত করং রত্নমৌলিং ভজামঃ॥

ধ্যানান্তর।

হস্তৈ র্বিভ্রত মিক্ষুদণ্ডবরদৌ পাশাঙ্কুশৌ পুষ্কর-
স্পৃষ্ট-স্বপ্রমদাবরাঙ্গ মনয়াশ্লিষ্টং ধ্বজাগ্রস্পৃশা
শ্যামাঙ্গ্যা বিধৃতাব্জয়া ত্রিনয়নং চন্দ্রার্দ্ধচূড়ং জবা-
রক্তং হস্তিমুখং স্মরামি সততং ভোগাতিলোলং বিভুম্॥

বিচিত্র-প্রসঙ্গ।

[লেখক—শ্রীসুহাসচন্দ্র রায়, বি-এ।]

আনন্দ করুন, উৎসব করুন!—আজ আমরা বঙ্গীয় পাঠকগণকে একটী পরম সুসমাচার দিতে আসিয়াছি। বাঙ্গালার বড় সাধের শিলালিপি, তাম্রশাসন ও কুলশাস্ত্র যাহা করিতে পারে নাই, আজ ভগবানের কৃপায় (ও আমার প্রাণপণ চেষ্টায়) তাহা সম্ভব হইল। অনেক অনুসন্ধান করিয়া, অনেক পার্ক, অনেক গলিঘুঁজি, অনেক হাঁসপাতাল তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া এক অতিবৃদ্ধ জরাজীর্ণ লোকের সাক্ষাৎ পাইয়াছি। বিগত শতাব্দীর বঙ্গের সামাজিক, রাজনীতিক, সাহিত্যিক, থিয়েটারিক—সমস্ত ঘটনাই ইনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন ও স্বকর্ণে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। আর কোনও ভাবনা নাই! ঐতিহাসিক নিশ্চিন্ত হউন—এত দিনে বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিবার উচিতমত মালমস্‌লা সংগৃহীত হইল।

আমার আবিষ্কৃত এই নিধিরাম বাবু যে বঙ্গের বৃদ্ধতম ব্যক্তি, তাহাতে কোনও সন্দেহই থাকিতে পারে না। সাধারণের অবগতির জন্য, আমি বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিয়াছি যে, উক্ত মহোদয়ের দাড়ীতে তিনগাছি ও মস্তকে ছয়গাছি (তাহার একটী আবার গত শনিবারে চুল আঁচড়াইতে গিয়া আধখানি ছিঁড়িয়া গিয়াছে)—একুনে সর্ব্বশুদ্ধ মাত্র সাড়ে আটগাছি কাঁচা চুল আছে। নিধিরাম বাবু ছাতি ও লাঠি দুই-ই সমভাবে ব্যবহার করেন, অধিকন্তু, তিনি প্রত্যহ দুই বেলা হাতে ও পায়ে তার্পিন তৈল মালিস করিয়া থাকেন। ইহাতেও যদি কোনও মূঢ় পাঠক তাঁহার বৃদ্ধত্বের 'আইডিয়া' করিতে না পারেন, তাহা হইলে বলিব, নিধিরাম বাবু, ঈশ্বর গুপ্ত, টেকচাঁদ ঠাকুর প্রভৃতিরও পূর্ব্বেকার আমলের লোক। আমি তাঁহার **birth-register** দেখিয়া আসিয়াছি। অনুমান ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে তিনি এই ধরাধামে অবতীর্ণ হন!

সে যাহা হউক, অনেক সাধ্যসাধনার পর নিধিরাম বাবু সে দিন আমাকে বলিলেন—"দেখ, তুমি আমায় নিতান্ত ধরিয়া বসিয়াছ বলিয়াই আমি আজ অনেক পুরাতন কথা বলিতে রাজী হইলাম। আমি এক জন কোণঠেসা লোক, লুকাইয়া থাকিতেই ভালবাসি। আমার মতন লোককে পাঁচজনের

কটুমটায়িত চোখের সম্মুখে আনিয়া বিব্রত করিয়া তুলিলে, দেখিতেছি। যাহা হউক, অনেক পুরাতন স্মৃতি আমার এই শিথিল উদরের মধ্যে গজ্‌গজ্‌ করিতেছে—আজ কতকটা তোমার ও কতকটা ইতিহাসের খাতিরে, যতদূর সম্ভব, আত্মগোপন করিয়া তাহার কতকটা খালি করিয়া দিব।

আমার ছেলেবেলাকার ঘটনা বিশেষ কিছু মনে নাই। তবে আমাদের সময়েই যে ইংরেজী শিক্ষা প্রথম এদেশে প্রচলিত হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। তখন খুব কম ছেলেই ইস্কুলে পড়িত। আমার মনে আছে, এণ্ট্রান্সের সময় আমাদের ক্লাসে মোটে তিনটী ছাত্র ছিল। সেবার Testএ বড় শক্ত question পড়িয়াছিল, সে সমস্ত তোমাদের আজকালকার এম্, এ, পাস ছেলেরাও উত্তর করিতে পারিবে না। যাহা হউক, সেবার Testএ শুধু আমি একাই পাশ করিয়াছিলাম ও প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলাম। মেধাবী ছাত্র বলিয়া আমার একটু খ্যাতি ছিল। কলেজে এডুইন্ সাহেব (আমি খুব সস্তায় তাঁহার পাঁউরুটী কিনিয়া দিতাম) বলিতেন, যে আমার মত ইংরাজী স্বয়ং লালবিহারী দেও লিখিতে পারিতেন না।

এডুইন্ সাহেব আমাকে নিজ পুত্রের মত ভালবাসিতেন। আমি প্রায়ই তাঁহার বাড়ীতে যাইতাম, তাঁহার মেমও আমায় ভাইয়ের মত ভালবাসিত। এডুইন্ সাহেবের বড় ইচ্ছা ছিল, আমি তাঁহার সহিত বিলাতে যাই। তিনি আমার মাতার নিকট আসিয়া নিজমুখে বলেন, "মা, তোমার ছেলেকে আমার সহিত পাঠাইয়া দাও, দেখিও সে সোণার ঘড়ায় করিয়া মোহর লইয়া দেশে ফিরিবে।" তাহার উত্তরে আমার মা বলেন, "না বাবা, বিদেশে যাবার দরকার নাই, এই ছেলেই আমার মোহরের ঘড়া"।

কিন্তু এডুইন্ সাহেব ছাড়িবার পাত্র নহেন, তিনি আমায় ডেপুটী হইবার জন্য সাধাসাধি করিতে লাগিলেন। তাহাতেও আমি অসম্মত হওয়াতে শেষে আমাকে হেড কন্‌ষ্টেবল্ করিয়া দিতে চাহেন। এবার আমি (অনেক ভাবিয়া) রাজীও হইয়াছিলাম, কিন্তু হনলুলুতে যাইতে হইবে শুনিয়া পিছাইয়া পড়িলাম।

* বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মাতার নামেও এরূপ একটা গল্প প্রচলিত আছে। তাহার দুইটী কারণ থাকিতে পারে। (১) ঐ গল্প বিদ্যাসাগর-জননী কোনও উপায়ে শুনিতে পাইয়া নিজের উপরে প্রয়োগ করেন; (২) কিংবা গল্পটী যুৎসই দেখিয়া বিদ্যাসাগরের কোনও অন্ধ ভক্ত তাঁহার নামে চালাইয়া দেন। দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটীই আমাদের অধিকতর সম্ভব বলিয়া মনে হয়।

মিউটিনির সময়কার কথা আমার বেশ মনে আছে। বারাকপুরের পথ আগ্‌লাইবার জন্য তখন জনকতক ইংরাজ সৈন্য কাশীপুরের কাছে পাহারা দিত। আমরা ইস্কুল পলাইয়া লুকাইয়া লুকাইয়া তাহাদিগকে দেখিতে যাইতাম। একদিন কাশীপুরের বাজারে দেখি, একজন চতুর দোকানী "Indian fruits" বলিয়া দুইটী গোরাকে একটা আস্ত নারিকেল গছাইয়া দিয়াছে। তাহারা পালা করিয়া সেই নারিকেলের ছোবড়াগুলা দাঁতে কাটিয়া চিবাইতেছে ও very sweet, very sweet বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেছে। তবু তখনও তাহারা শাঁস অবধি পৌঁছিতে পারে নাই। হায় রে সেকাল! তখনকার দিনে সাহেব বাঙ্গালীতে এত সম্প্রীতি ভাব ছিল!

এইবার আমার পরিণত বয়সের দু'একটী ঘটনা বলি, শোন। সমাজ ও সাহিত্যের সহিত আমার খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। ইচ্ছা করিলে আমি অনেক অজ্ঞাত জটিল সমস্যা খোলসা করিয়া দিতে পারি। কিন্তু ভয় হয়, পাছে নিন্দুক সমালোচকেরা মনে করে, আমি এই সুযোগে নিজের নামটা বড় করিয়া লইতেছি। কিন্তু আর ভয় করিব না—দেশের জন্য, সত্যের জন্য লজ্জা, মান, ভয় সমস্ত ত্যাগ করিব। আমি মুখ না ফুটাইলে দেশের ইতিহাস যে অসম্পূর্ণ হইয়া থাকিবে! দেখ, আমরা আর্য্যজাতিটা তো বড় কম ছিলাম না। কিন্তু একটা ভাল রকম ইতিহাসের অভাবে কিছুই প্রমাণ করিয়া উঠিতে পারি না। এমন যে ত্রিকালদর্শী ঋষিরা—তাঁহারাও বিশেষ কোন record রাখিয়া যান নাই বলিয়া, দেশী বিদেশী সকল মুরুব্বির কাছেই গালি খাইয়া মরিতেছেন। দেখিয়া শুনিয়া আর আমি চুপ করিয়া থাকিব না—চণ্ডীদাসের ভাষায় বলিব—'আমি আমার অপমান সইতে পারি, 'ইতিহাসে'র তো নাহি সহে অপমান!' তাই আজ গুটিকতক অপ্রিয় সত্য বলিব।

তোমরা শুনিয়াছ, বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে একজন সন্ন্যাসী যাতায়াত করিতেন। কিন্তু কেহই তাঁহার সন্ধান পাও নাই। আজ আমি সে রহস্য ভেদ করিয়া দিব। সত্যের খাতিরে এতদিন পরে আমায় বলিতে হইতেছে, সে সন্ন্যাসী আর কেহই নহে, সে সন্ন্যাসী আমিই। তোমরা আজকালকার ছেলে হয় তো বিশ্বাস করিবে না, আমিই ঐরূপ ছদ্মবেশ ধরিয়া বঙ্কিমের কাছে যাওয়া আসা করিতাম। কারণ, বঙ্কিম আমার ঐ রূপ বড় পছন্দ করিত।

বঙ্কিমের উপর আমার অসামান্য প্রভাব ছিল। নবীন সেন লিখিয়া গিয়াছেন —"আমি বঙ্কিমবাবুকে বলিয়াছিলাম আপনি শুধু প্রেমিক-প্রেমিকার সৃষ্টি

করিতেছেন, তাহাতে দেশের ছেলে মেয়েরা বিগ্‌ড়াইয়া যাইতেছে।” কিন্তু তাহা ভুল। আমিই প্রথম বঙ্কিমকে ঐ কথা বলি, ও তাহার ফলেই, সে অনুশীলন ও কৃষ্ণচরিত্র নামে দুইখানি উৎকৃষ্ট শিক্ষাপূর্ণ উপন্যাস লেখে। এখন কুন্দ ও ভবানন্দের আদর্শে ঘরে ঘরে উৎকৃষ্ট ছেলে মেয়ে তৈয়ারী হইতেছে। ভগবান যে এ অধমকে দিয়ে দেশের এই উপকার করিয়াছেন, তাহাতে আমি কৃতজ্ঞ।

“আর একটী বিষয়ে তোমাদের উড়োতর্ক দেখে আমার বড় হাসি আসে। আজ আমি তার মীমাংসা করিয়া দিব। বঙ্কিম একবার প্রকাশ্য সভাস্থলে রবি বাবুর গলায় মালা পরাইয়া দিয়াছিল—রবি-বিদ্বেষী অনেকে বলে, সে শুধু আদর করিয়া, তাহাতে কোনও উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু তাহা ঠিক্ নহে। আমি গোপনে বঙ্কিমকে এ কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। সে বলিয়াছিল, ‘ইহার অর্থ এই যে আমি এই সূত্রে রবিকে আমার সাহিত্য-সম্রাট্ পদটী খোস্ মেজাজে ও বাহালতবীয়তে ভোগদখল করিবার অধিকার দিয়া গেলাম। যদি কেহ ইহার পর এ বিষয়ে আপত্তি করে, তাহা হইলে সে পাষণ্ড ও বেল্লিক।’ আর এক কথা, বঙ্কিম এ সম্বন্ধে আগের দিনে একটা স্বপ্নও দেখিয়াছিল। বঙ্কিম খুব স্বপ্নে বিশ্বাস করিত, তাহার প্রমাণ তোমার ‘আনন্দমঠে’র ‘ছায়া পূর্ব্বগামিনী’ নামক অধ্যায়ে পাইয়াছ। সে যাহা হউক, এত দিনে যে একটা কঠিন সমস্যার মীমাংসা করিতে পারিলাম, তাহাতে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিতেছি। ইহার পর এ বিষয়ে তোমরা আর যেন লাঠালাঠি করিও না। আর যদি কোনও বীরবল বা গোপাল ভাঁড় এ সম্বন্ধে অধিক কিছু জানিতে চাহেন, আমার কাছে পাঠাইয়া দিও।”

গল্প করিতে করিতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। চাকর আসিয়া নিধিরাম বাবুর ঘরে আলো জ্বালিয়া দিল এবং এক কাপ্ চা রাখিয়া গেল। নিধিরাম বাবু চুক্ চুক্ করিয়া চা পান করিতে লাগিলেন ও খানিকটা প্লেটে ঢালিয়া আমার দিকে আগাইয়া দিলেন। এইখানে বলিয়া রাখা ভাল, নিধিরাম বাবু একটু অধিক চিনি ও অল্প দুগ্ধ দিয়া চা পান করিতে ভাল বাসেন। সঙ্গে সঙ্গে ভিজা ছোলাও খাইতেছিলেন। জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন—‘Fruits খাইতেছি’।

নিধিরাম বাবু বলিলেন—“দেখ, সত্যই যখন বলিতে আরম্ভ করিয়াছি, তখন তোমাদের অনেকগুলি ভ্রান্ত ধারণা ভাঙ্গিয়া দিয়া যাইব। তোমাদের একটা ধারণা আছে, বিদ্যাসাগর বড় দয়ালু ছিলেন। আমার বিশ্বাস, মাইকেলের একটা ছোট পদ্য না প্রবন্ধই এই ধারণার মূল। (সে রচনারও একটা গুপ্ত রহস্য আছে, তাহা পরে বলিব)। কিন্তু উহা মস্ত ভুল। আমি যত দূর জানি—এবং

আমি ভাল রকমই জানি—তাঁহার মত নিষ্ঠুর হৃদয়হীন লোক এদেশে জন্মায় নি। তাঁর ছবি দেখনি? ও রকম রুক্ষ কাটখোট্টা চেহারায় কখনও দয়ামায়া থাকিতে পারে? বেশ ঢেউ-খেলানো লম্বা দাড়ী থাকিবে, চেহারাটা একটু ঢল ঢল হইবে, মুখ দিয়ে কবিত্বের (প্রেমের) আভা বেরুবে, তবে তো বলি হৃদয়-বান্। তোমায় একটা গল্প বলি শোন। একবার কি কারণে চটিয়া গিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় মেট্রোপলিটান স্কুলের Second classএর সমস্ত ছেলেকে তাড়াইয়া দেন। তার পর দিন তাহারা সদলবলে বিদ্যাসাগরের বাড়ী-চড়াও করিয়া অনেক অনুনয়ের সহিত ক্ষমা ভিক্ষা করে। এদিকে বেলা প্রায় দুপুর হইয়া গেল। তার পর তাহারা যখন সিঁড়ি দিয়ে নামিয়া আসিতেছে, তখন একটি ছেলে বলিল "দেখ্লি, কি নিষ্ঠুর লোক, এত বেলা হ'ল, তবু একটু জল খেতে বল্লে না!" বিদ্যাসাগর তখন উপরে দাঁড়াইয়া ছিলেন, শুনিতে পাইয়াই তাহা-দিগকে তাড়াতাড়ি ডাকিয়া লইয়া উত্তমরূপে খাওয়াইয়া ছাড়িয়া দিলেন। এখন ঐ বালকটীর উক্তি হইতে কি প্রমাণ হয়? প্রমাণ হয় নাকি যে, বিদ্যাসাগরের সময়ের সমস্ত লোক, মায় দুগ্ধপোষ্য বালক পর্য্যন্ত তাঁকে নিষ্ঠুর বলিয়া জানিত? এমন লোক কি করিয়া যে হঠাৎ দয়ার সাগর হইয়া উঠিলেন তাহা বুঝা কঠিন। আমি আরও অনেক দৃষ্টান্ত দিতে পারিতাম, কিন্তু আপাততঃ চাপিয়া গেলাম, পাছে লোকে মনে করে আমি বিদ্যাসাগরের হিংসা করিতেছি।

আর একটা বিষম ভুল আজ হাটের মাঝে ভাঙ্গিয়া দিব। তোমাদের বিশ্বাস, মাইকেলই বাঙ্গালায় প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দ রচনা করেন। অবশ্য এজন্য যদি বাঙ্গালা সাহিত্যের ভবিষ্য ইতিহাসে মাইকেল কিছু অধিক বাহবা পাইয়া থাকেন, তাহাতে আমার কিছু মাত্র দুঃখ বা আপত্তি নাই। কিন্তু সত্যই আমার আশ্রয়। সত্যের খাতিরে বলিতে হইতেছে, যে উক্ত ছন্দ আমিই প্রথম পদ্যে ব্যবহার করি। তোমরা জান না, আমি আগে খুব পদ্য লিখিতাম। তাহার কতক কতক শেষে হেমবাবুর নামে চালাইয়া দিই। সকলেই জানেন, রবিবাবু ও বড়াল কবি বিহারী চক্রবর্ত্তীর শিষ্য, কিন্তু বিহারী কাহার শিষ্য তাহা ত তোমরা জান না! এ কথা অবশ্য জানিবে যে, বিহারী তো আর ভুঁইফোড় হয়ে জন্মাননি—তাঁহার কবিতার হাতেখড়ি হইয়াছিল আমার কাছে। যাহা হউক, আমার অতি বাল্য-কালে (৭ বৎসর বয়সে) লিখিত এই পদ্যটী পড়িয়া দেখ *

---

* উদ্ধৃত পদ্যের স্বভাববর্ণনা অতি সুন্দর। নিধিরাম বাবু কিছুতেই মানিবেন না, অবশেষে অনেক ধর-পাকড় করিয়া তাঁহার মুখ হইতে বাহির করাইয়াছিলাম, বাঙ্গালা সাহিত্যে স্বভাব বর্ণনা তিনিই প্রথম আনয়ন করেন।

'পুকুরের চারি ধারে কত শত বৃক্ষ—
কালো জলে হয় বুঝি ছায়া তার দৃষ্ট;
উপরে খেলিছে দেখ মনোরম হংস,
কমলের দলগুলি করি খণ্ড খণ্ড—
দূরে বাজাইছে শ্যাম তার কালো বাঁশী
বাঁশী ধরিয়াছে সে যে ফেলিয়াই চুষী'—ইত্যাদি।

এই পদ্য প্রকাশিত হইলে পর, ঈশ্বর গুপ্ত আমায় গালি দিয়া লেখে 'কি নিরেট্ গ্রন্থকার,সামান্য পয়ার ছন্দেও দুইটী ভাল মিল করিতে পারে নাই।" আমি তাহার উত্তরে লিখিলাম—"ঈশ্বর গুপ্ত আমার চেয়েও নিরেট, ও অধিকন্তু কালা (কিম্বা অন্ধ) এ কবিতায় আদৌ মিলের দরকার নাই, কারণ ইহা অমিত্রাক্ষর, ইংরাজীতে যাহাকে বলে blank verse। মধুসূদন এই আদর্শ লইয়াই অমিত্রাক্ষর ছন্দ লিখিতে আরম্ভ করিয়া দেন, কিন্তু আমার পরম শত্রু ঈশ্বর গুপ্তও স্বীকার করিয়াছিল যে, মাইকেলের অমিত্রাক্ষর আমার মত মধুর হয় নাই। (১৮৪২ সালের ৭ই আষাঢ়ের 'সংবাদ প্রভাকর' দ্রষ্টব্য)।

বাঙ্গালার রঙ্গালয়ের ইতিহাস অনেক আবর্জ্জনার মধ্যে পড়িয়া আছে। এবার তুমি যে দিন আসিবে, আমি সে সমস্ত সাফ করিয়া দিব। আপাততঃ, সাধারণের জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, রঙ্গালয়-স্থাপনে আমার সাহায্য নেহাৎ অল্প ছিল না। আমি জানি অনেক ধর্ম্মদ্ধর তাহা মানিবেন না। তাঁহারা নিজের কথাই পাঁচকাহন করিয়া বসিয়া আছেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, প্রথম যে পাব্লিক থিয়েটার হয়, তাহার সিন্‌গুলি কে রঙ্গমঞ্চে বহিয়া আনিয়াছিল, ষ্টেজ বাঁধিবার সময়ই বা দূর হইতে কে তাহা দেখিতেছিল? এ সকল বিষয়ের উত্তর কে দিবে? এখানে তাঁহারা মূক! চুলোয় যাক্, তোমায় আগেই বলিয়াছি আমি নিজের কথা বলিতে ভালবাসি না, কিন্তু দেশের আচরণ দেখিয়া মাঝে মাঝে পিত্ত চটিয়া যায়।

সে যাহা হউক, অভিনয়ে আমার একটু নাম ছিল। Female partএ আমায় বড় সুন্দর মানাইত। আমি যখন গোঁপ কামাইয়া ও কস্তাপেড়ে সাড়ী পরিয়া ষ্টেজে নামিতাম, তখন সকলে হায় হায় করিয়া উঠিত। শুম্ভ-নিশুম্ভ-বধের পালায় মহাদেবের বুকের উপর দাঁড়াইয়া কালীর speech দেওয়ার একটা সিন্ আছে। আমার বেশ মনে আছে, আমি যখন কালী সাজিতাম, তখন, মহাদেব সাজিবার জন্য থিয়েটারের লোকদের মধ্যে হুড়াহুড়ী পড়িয়া যাইত।

এমন কি, অনেক রাজা মহারাজাও নাকি আমার পায়ে লুটাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন! আমি জানি একবার একটা কেস্ পুলিশ্ কোর্ট অবধি গড়াইয়াছিল। আর একবার এক জনের মাথা ফাটিয়া যাওয়ায় তাহাকে মেও হাঁসপাতালে লইয়া যাইতে হইয়াছিল। *

তোমরা শুনিয়াছ, গিরিশ ঘোষকে প্রথম প্রথম গানের জন্য অনেক লোকের কাছে খোসামোদ করিতে হইয়াছিল। সে অনেক আর কেহই নহে, সে এই নিধিরাম চক্রবর্ত্তী। গিরিশের প্রথম প্রথম নাটকগুলি আমিই দেখিয়া দিয়াছিলাম। 'রাবণবধ' নামক সুপ্রসিদ্ধ সামাজিক নাটকখানির প্লট্ আমিই গিরিশকে বলিয়া দিয়াছিলাম, কিন্তু বাঙ্গালার লেখককুল এরূপ অকৃতজ্ঞ যে, গিরিশ তাহার বইয়ের মলাট, কিম্বা ভূমিকায় এমন কি নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের মধ্যেও সে ঋণ স্বীকার করিয়া যায় নাই। সেই অবধি মনের দুঃখে আমি রঙ্গালয়ের সহিত সকল সম্পর্ক ত্যাগ করিয়াছি।"

এই অবধি বলিয়াই নিধিরাম বাবু একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া হাঁপাইয়া পড়িলেন। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া আমার বড় দুঃখ হইল। আমি দেখিলাম, আমার সম্মুখে এক জগৎজোড়া প্রতিভার ধ্বংসাবশেষ—ইচ্ছা করিলে ইনি কি না হইতে পারিতেন! শুধু বাঙ্গালার জনসাধারণের উপর কৃপা করিয়াই ইনি প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র হইতে সরিয়া গিয়াছেন। খানিকক্ষণ পরে, নিধিরাম বাবু বলিলেন, "আর কিছু বলিতে হইবে কি?" আমি কহিলাম, "না বলিলেও চলে, ইহাতেই আমাদের ৭।৮ পাতা ভরিয়া যাইবে।" নিধিরাম বাবু বলিলেন, "তবে এখন এসো; আবার যখন লেখার অভাব পড়িবে, আমার কাছে আসিও। আমি তোমার জন্য অনেক বিচিত্র কথা বানাইয়া রাখিব।" আমি তখন তাঁহাকে ভূরি ভূরি ধন্যবাদ দিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম।

* নিধিরাম বাবু থিয়েটার ছাড়িয়া দিবার পরই, উপযুক্ত পুরুষের অভাবে স্ত্রীলোক ষ্টেজে নামাইবার ব্যবস্থা হয়। সুতরাং নিধিরাম বাবু যে উক্ত অভিনব পন্থার একজন প্রধান প্রবর্ত্তক, তাহাতে সন্দেহই থাকিতে পারে না।

রাধা।

[লেখক—শ্রীসতীশচন্দ্র বর্ম্মণ, বি-এল্।]

১

পথ পানে চেয়ে চেয়ে হেমন্তের নিশি গেল,
অদ্ভুত রাধার কুঞ্জে রাধানাথ নাহি এল ;
সারারাতি ঝরিয়াছে রাধার নয়নজল—
প্রভাতে শিশির বিন্দু তৃণ 'পরে ঢল ঢল ;
কুহেলি দিয়াছে ছেয়ে ধরণীর আশ পাশ—
এ যে শুধু ঘনীভূত শ্রীমতির দীর্ঘশ্বাস ;
হেমন্ত হইল অন্ত, বিরহের নাহি শেষ,
মলিন রাধার মুখ, আলুথালু দীর্ঘ কেশ !

২

শীত এল নাহি শ্যাম, মুরলী না বাজে আর,
রাধা তেয়াগিল তার কেয়ূর কঙ্কণ হার,
কাননে ফুটে না ফুল, কে গাঁথবে ফুলমালা,
বিহগ গাহে না গান, লুটে ভূমে ব্রজবালা ;
হিমে অঙ্গ জর জর—খসিয়া পড়িছে মূলে
মাধবটা, তমালেতে কেবা তারে দেয় তুলে !
নয়নে নাহিক লোর, কণ্ঠে নাহি ফুটে স্বর,
অভিমানে মানিনীর হৃদি কাঁপে থর থর।

৩

শীতান্তে বসন্ত এল বুঝি অই বাজে বাঁশী,
মুকুলিত ফুলবনে কৃষ্ণের মোহন হাসি ;
কূলে কূলে দুলে দুলে কালিন্দী বহিয়া গেল,
এতদিনে প্রিয়া পাশে মাধব ফিরিয়া এল ;
টুটিয়াছে অভিমান, রাধিকা রসিকা সাজে,
লালে লাল ফাগুয়ার নববৃন্দাবন মাঝে ;
গাহে পিক, রাসরঙ্গে কিশোর কিশোরী দুলে,
কে যেন মাধবিটীরে দিয়াছে তমালে তুলে !

৪

শ্যামে না ছাড়িবে কভু পাইয়াছে বাঞ্ছরায়,
ভাবিতে ভাবিতে সুখে বসন্ত চলিয়া যায় ;
আসি কৃষ্ণ অতি ধীরে বিনয়ে দয়িতা পাশ,
মাগিল বিদায়, শুনি রাধা ত্যজে দীর্ঘশ্বাস্।
বৈশাখের নব ঘন শ্রীমুখেতে দিল দেখা,
নয়নে চমকি উঠে মানের বিজলী-রেখা,
বক্ষ জুড়ি বহে ঝড়, বজ্র মর্ম্ম ভেদি ধায়,
ব্যাকুলা পড়িল রাধা মুরছি শ্যামের পায় ;
তবু কৃষ্ণ গেল চলি কি তীব্র অনলে দহি,
হৃদয় শতধা হ'ল যাতনা কাহারে কহি ;
রোষে ভাঙ্গে পুষ্পবন, ছিন্ন করে ফুলমালা,
মাধবীরে দলে পায়, যদি তায় যায় জ্বালা !
বিন্দু বিন্দু ঝরে ঘাম, আছাড়িয়া পরে ভূমে,
কৃতার্থ হইল ধূলা রাধার শ্রীঅঙ্গ চুমে !

৫

গেছে কৃষ্ণ ; রাধিকার নয়নে বরষে জল,
বরষার ধারা সম দিবানিশি অবিরল,
আঁখি রাঙা, সিক্ত বাস, এলায়ে কুন্তলদাম,
ঢুঁরে ঢুঁরে ফিরে রাধা কোথা শ্যাম কোথা শ্যাম !
প্রবল বিরহ-বন্যা প্রেমে নামিয়াছে আজ,
কদম্ব পড়িছে ঝরি নাহি হেরি রসরাজ ;
শিখিনী নাচিতে গিয়া কাটিয়া ফেলিছে তাল,
বাঁচে কি না বাঁচে রাধা কৃষ্ণ আজি হ'ল কাল।

৬

দিন আসে দিন যায়, বিরহ নূতন নয়,
রাধার কোমল হৃদে কত না যাতনা সয় ;
ধীরে চিদাকাশ হ'তে সরে গেল মেঘভার,
দিনে দিনে অপনীত আকুলতা রাধিকার ;
মদনমোহন-মূর্ত্তি অন্তর-মন্দিরে গড়ি,
নিমগ্ন প্রগাঢ় প্রেমে দেখিছে নয়নভরি ;
শরতের শশী সম মুখকান্তি সমুজ্জ্বল,
আঁখি দু'টি সরসীর যেন ফুল্ল শতদল—
প্রেমমুগ্ধা রাধিকার বাসনার নাহি লেশ,
ধ্যানমৌন গোপী আজ, শ্রীঅঙ্গে যোগিনী বেশ !

পুরাতনী।

[লেখক—শ্রীননীগোপাল মজুমদার।]

বাঙ্গালাসাহিত্যের পুরাণ কাগজপত্রের কথা আমরা ক্রমশঃ ভুলিয়া যাইতেছি—ইহা প্রশংসার কথা নহে। সেকালের কাগজপত্রের কীটদষ্ট জীর্ণবক্ষে বাঙ্গালাসাহিত্যের এবং বাঙ্গালী সাহিত্যিকের অনেক খবর লুকাইয়া আছে, এই জন্য সে সকল উপেক্ষনীয় বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। পুরাতন "প্রভাকরে"র ফাইল নাড়াচাড়া করিতে যাইয়া কয়েকটি সংবাদ পাইলাম, "অর্চ্চনা"র মারফৎ প্রকাশ করিতেছি। হয়ত এগুলি সাহিত্যরসিকগণের কাজে আসিতে পারে।

"হুতোম প্যাঁচার নক্সা"-প্রণেতা স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় "সাবিত্রী সত্যবান্" নামে একখানি বাঙ্গালা নাটক রচনা করেন। উহা ১২৬৫ সালের জ্যৈষ্ঠমাসে 'বিদ্যোৎসাহিনী' রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়। এই উপলক্ষে ঐ মাসের ২৩শে জ্যৈষ্ঠ তারিখের "প্রভাকরে" লিখিত হয়—"আগামী শনিবার ৭টার সময় বিদ্যোৎসাহিনী সভার রঙ্গভূমিতে শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ-প্রণীত সাবিত্রী সত্যবান্ নাটকের অভিনায়ক পাঠ হইবেক। এরূপ প্রথা বঙ্গবাসিগণের মধ্যে প্রচলিত নাই, তবে ইংরাজী সেক্‌সপিয়র, প্রভৃতি নাটক যেরূপ পঠিত হইয়া থাকে ইহাও সেইরূপে পঠিত হইবেক, অধিকন্তু ইহাতে বিস্তর গীত সংযোজিত হইবায় তাহা যন্ত্রের সহিত মিলাইয়া গান করা যাইবেক।"

* *
*

১২৬৫ সালের ৮ই আষাঢ় তারিখের প্রভাকরে, কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় সংস্কৃত গ্রন্থাদির অনুবাদকার্য্য সম্পাদিত করিবার জন্য দশজন পণ্ডিত নিযুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন।

"বিদ্যোৎসাহিনী সভার

বিজ্ঞাপন।

"বিদ্যোৎসাহিনী সভাতে কোনো সংস্কৃত পুস্তকের অনুবাদ কারণ ১০ দশজন পণ্ডিতের প্রয়োজন আছে, বেতন ১০, ১২, ১৬ টাকা, বেলা ১০টা হইতে তিনটা পর্য্যন্ত সভাগারে উপস্থিত থাকিতে হইবেক, এবং দেবনাগর অক্ষরও জানা আবশ্যক হইতেছে, যাহারা উক্ত পদগ্রহণেচ্ছুক হন আমার নিকট আসিলেই সবিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ।"

* *
*

কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাভারতের অনুবাদকার্য্য সম্পাদিত করেন ইহা অবশ্য সকলেই অবগত আছেন, কিন্তু তিনি যে রামায়ণের অনুবাদ করিতেও কৃতসঙ্কল্প ছিলেন তাহা সাধারণে অবগত নহেন। ১২৬৫ সালের ২৬শে আষাঢ়ের 'প্রভাকরে' এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইয়াছিল।

"বিজ্ঞাপন।

মহাভারত ও রামায়ণ অনুবাদক পণ্ডিত মহাশয়েরা ১লা শ্রাবণ বিদ্যোৎসাহিনী সভায় উপস্থিত হইবেন, ঐদিনে রামায়ণ ও মহাভারত অনুবাদারম্ভ হইবে।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ।"

পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্নের রচিত "কুলীনকুলসর্ব্বস্ব নাটক" ১২৬৫ সালের ২০শে আষাঢ়, শনিবার চুঁচুড়ানিবাসী শ্রীনাথ পাল মহাশয়ের ভবনে অভিনীত হয়। ঐ তারিখের "প্রভাকরে" লিখিত হইয়াছে—"আমরা সানন্দচিত্তে প্রকাশ করিতেছি, অদ্য রাত্রি ৯ ঘটিকাকালে চুঁচুড়ানগরে ৺নরোত্তম পালের বাটীতে 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব নাটকে'র অভিনয় প্রদর্শিত হইবে। অতএব বিদ্যোৎসাহী নাট্যপ্রিয় সুরসিক দর্শকগণ উক্ত স্থানে নিয়মিত সময়ে উপস্থিত হইয়া কথিত কুলীনকুলসর্ব্বস্ব নাটকের অভিনয় প্রদর্শন করত নাট্যরসে আমোদী হইবেন।"

অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় যে তরুণ বয়সে এককালে কবিতা লিখিয়াছিলেন তাহা কেহই সহজে বিশ্বাস করিতে চাহিবেন না। কিন্তু দুই ব্যক্তির লেখায় তাহার প্রমাণ আছে। হরিমোহন মুখোপাধ্যায়-রচিত "কবিচরিত" নামক গ্রন্থে তাঁহার কবিতা-রচনার উল্লেখ আছে। সম্প্রতি 'অর্চ্চনা'য় শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ সেন মহাশয় উক্ত গ্রন্থের ঐ অংশ উদ্ধৃত করিয়া পাঠকগণের দৃষ্টি এ বিষয়ে আকৃষ্ট করিয়াছেন। ৺রামগতি ন্যায়রত্নের "বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাবে"ও লিখিত আছে—"এই সময়ে বাঙ্গালায় পদ্যরচনারই অধিক প্রাদুর্ভাব ছিল, এই জন্য তিনিও প্রথমে পদ্যরচনা করিতেই আরম্ভ করিয়াছিলেন। অনন্তর 'প্রভাকর' সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সহিত আলাপ ও আত্মীয়তা হইলে তাঁহার অনুরোধে গদ্যরচনায় প্রবৃত্ত হন। * * *" অক্ষয়কুমার গুপ্তকবির 'প্রভাকরে' একটি কবিতা পাঠাইয়াছিলেন এবং

উহা উক্ত পত্রে মুদ্রিত হইয়াছিল। 'প্রভাকরে'র পৃষ্ঠা হইতে অক্ষয়কুমারের পত্র ও কবিতা অবিকল উদ্ধৃত হইল।

"মান্যবর শ্রীযুত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

সম্পাদক মহাশয়! অনুগ্রহপূর্ব্বক মৎরচিত এই পদ্যটি আপনার প্রভাকরে স্থান দান করিয়া এই নবীন লেখকের উৎসাহবর্দ্ধন পূর্ব্বক চিরবাধিত করিবেন।

পদ্য।

ওহে তাত জগন্নাথ! রহিলে কোথায়।
কর দৃষ্টি যায় সৃষ্টি, হায় হায় হায়॥
অবোধ সিপাহি যত, নাহি মানে মানা।
তাদের পালের গোদা, হইয়াছে নানা॥
স্থানে স্থানে তাহারা, করিছে অত্যাচার।
কর কর কর নাথ, উপায় তাহার॥
তোমা বিনা আমাদের, গতি আর নাই।
দোহাই দোহাই নাথ, দোহাই দোহাই॥
যত লোক হাহাকার, করিতেছে অতি।
যায় প্রাণ কর ত্রাণ, ত্রিলোকের পতি॥
কৃপা কর কৃপাদৃষ্টি, কর একবার।
রক্ষা কর রক্ষা কর বাঁচিনেকো আর॥
দিল্লী লক্ষ্ণৌ আদি যত, বড় বড় দেশ।
তার, নাহি কিছু লেশ॥
কত বংশ হোয়ে ধ্বংস, কাঁদিয়া বেড়ায়।
কত সতী পতি বিনা করে হায় হায়॥
অক্ষয়কুমার দত্ত করে নিবেদন।
বিপদ ভঞ্জন কর, বিপদভঞ্জন॥

[সংবাদপ্রভাকর,
২১শে আশ্বিন, ১২৬৪ সাল]

রূপ।

ঢাল সুরা—আরো ঢাল—উঠুক উচ্ছ্বসি'—
দীপ্ত এ আলোক মাঝে, দাঁড়াও রূপসি!
এই সুরা, এতে শুধু—আমিই উন্মাদ—
রূপে ওই ঘটায়েছে দোঁহারি প্রমাদ!

রূপদর্শন।

প্রখর এ আলোরাশি ধাঁধিছে নয়ন!
চল সখি চল মুক্ত গগনের তলে—
এ মুখ জ্যোস্নায় ভাল আধেক দর্শন—
অর্দ্ধেক দেখিব শুধু কল্পনার বলে!

শ্রীফণীন্দ্রনাথ রায়।

দ্বৈতবাদ ও দুর্গাপূজা।

[লেখক—শ্রীহরিহর শাস্ত্রী।]

আবার এক বৎসর পরে বাঙ্গালায় দুর্গোৎসবের আনন্দ-দুন্দুভি বাজিয়া উঠিয়াছে। শোকতাপ-দগ্ধ বাঙ্গালী, সকল জ্বালা-যন্ত্রণা ভুলিয়া মাতৃচরণে পুষ্পাঞ্জলি দিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে। ভক্ত সাধক ঋণ করিয়াও বার্ষিক দুর্গোৎসব-প্রথার রক্ষার্থ মাতৃপূজার আয়োজন করে। উপাস্য দেবতার অর্চ্চনার জন্য উপাসকের এই একাগ্রতাপূর্ণ আকুলতা কি মধুর!

অদ্বৈতবাদী দার্শনিকেরা উপাস্য-উপাসকের পরস্পর ভেদ স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, "অহং ব্রহ্মাস্মি"—আমিই ব্রহ্ম। পরমার্থতঃ জীব ও ব্রহ্মের কোনও প্রভেদ নাই, মোহবশতঃ ব্রহ্মই জীবরূপে অনুভূত হইয়া থাকেন। প্রকৃত পক্ষে উপাস্য ও উপাসকের ঐক্য প্রতিপাদিত হইলেও ব্যবহার-দশায় তাহাদের ভেদ স্বীকার করিয়া উপাসনাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইবে। কিন্তু ঈদৃশ সিদ্ধান্ত ভক্তের নিকট আদরণীয় হইতে পারে না। যদি যথার্থই উপাস্য-উপাসকের কোনও ভেদ না থাকে, যদি উপাসক অপেক্ষা উপাস্যের উৎকর্ষ অলীক হয়, তবে উপাসক, উপাস্যের উদ্দেশে প্রাণ-মন সমর্পণ করিবে কেন? ভক্ত সাধক নিজের অপেক্ষা উপাস্যের কোটিগুণ ঐশ্বর্য্য আছে বলিয়াই তাঁহার নিকটে দাসত্ব প্রার্থনা করে। ভক্ত কখনও অদ্বৈতবাদে তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না। সে চিরদিন নিজেকে উপাস্য অপেক্ষা একান্ত হীন মনে করিয়াই সন্তুষ্ট থাকে। তাই ভক্ত বলিয়াছেন,—

> "ত্বমেব দেবি বরদে ত্রিজগৎপ্রভুস্ত্বং
> দাসা বয়ন্তু ভবদঙ্ঘ্রিযুগস্য নিত্যম্।
> ইত্থংচিরাবগতিখণ্ডনপণ্ডিতানাং
> নাদ্বৈতবাদসরণিং শরণং ব্রজামঃ॥"

দেবি, তুমি ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্রী, আমরা তোমার শ্রীপাদপদ্মের দাস মাত্র। আমাদের এই চিরভেদবুদ্ধি তিরোহিত করিয়া যাঁহারা অদ্বৈতবাদরূপ কণ্টকাঢ্য মার্গ প্রস্তুত করিয়াছেন, আমরা কদাপি সে পথের পথিক হইব না।

অদ্বৈতবাদী দার্শনিকেরা জীবের সহিত ব্রহ্মের অভেদ প্রতিপাদন করিবার জন্য 'অবিদ্যা' নামক একটী 'পদার্থান্তর কল্পনা করেন। তাঁহাদের মতে এই

অবিদ্যা-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া ব্রহ্মই জীবরূপে প্রতীত হইয়া থাকেন। অদ্বৈতবাদীরা কেবল জীবকেই ব্রহ্মের স্বরূপ বলিয়া নিরস্ত হন নাই,—ঘট, পট, এমন কি, বিবিধ অমেধ্য বস্তুকে পর্য্যন্ত ব্রহ্ম বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। অবিদ্যার আবরণের প্রভাবে ব্রহ্ম এইরূপ দুরবস্থাপন্ন হইয়া বিরাজ করিতেছেন। এ সিদ্ধান্তে সাধকের হৃদয়ে বড়ই আঘাত লাগে। সামান্য দস্যু, তস্করের ন্যায় ব্রহ্মও মোহরূপ বন্ধনের বিড়ম্বনা ভোগ করিতেছেন,—ইহা কল্পনা করিতেও ভক্ত-হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠে। তাই ভক্ত কবি বলিয়াছেন,—

"নিরন্তরং লৌহজশৃঙ্খলাদিনা,
নিবদ্ধদেহস্য যথা বিড়ম্বনা।
তথা পরেশস্য তু মোহবন্ধনা
দিয়ং ন কিং মূঢ়তমস্য কল্পনা॥"

নিরন্তর লৌহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ ব্যক্তির মত, পরমেশ্বর মোহ-বন্ধনের অশেষ বিড়ম্বনা ভোগ করিতেছেন,—এরূপ অসাধু কল্পনা, পণ্ডিতেরা করিতে পারেন না।

অদ্বৈতবাদীরা অবিদ্যা সিদ্ধির উদ্দেশে যে অনুমানরূপ প্রমাণ দেখাইয়া থাকেন, তাহা বিশুদ্ধ নহে। নৈয়ায়িক প্রভৃতি দ্বৈতবাদী দার্শনিকেরা 'প্রাগভাব' নামক একটী পদার্থ স্বীকার করেন। ঘট উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে ঘটের উপাদান কারণ কপালে ঘটের যে অভাব অনুভূত হয়, তাহারই নাম প্রাগভাব। উৎপত্তিশীল বস্তু মাত্রের প্রতি এই প্রাগভাব একটী কারণ। প্রাগভাবের কারণতা স্বীকার না করিলে উৎপন্ন ঘটাদি পদার্থের পরক্ষণে পুনরুৎপত্তির আপত্তি হয়; কেন না, তখন পর্য্যন্ত দণ্ড, চক্রাদি ঘটের সমস্ত কারণই বর্ত্তমান আছে। প্রাগভাবের কারণত্ব অঙ্গীকার করিলে আর ঈদৃশ আপত্তির উত্থাপন হয় না। কারণকূটের অসদ্ভাব ঘটিলে কার্য্য উৎপন্ন হইতে পারে না। ঘটোৎপত্তির পরক্ষণে দণ্ড, চক্রাদি অন্যান্য কারণ বর্ত্তমান থাকিলেও প্রাগভাব রূপ কারণের অভাব বশতঃই সেই ঘটের পুনরুৎপত্তির আপত্তি হয় না। প্রাগভাব বিনাশী পদার্থ। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ঘট উৎপন্ন না হয়, ততক্ষণই তাহার প্রাগভাব থাকে;—ঘট উৎপন্ন হইলেই সেই প্রাগভাবের বিনাশ হইয়া যায়।

অদ্বৈতবাদীরা এই প্রাগভাবের উপর নির্ভর করিয়া বলেন যে,—"ঘটোঽয়ং এতদ্‌ঘটপ্রাগভাবাতিরিক্তবিনাশ্যনাদিজন্যঃ, জন্যত্বাৎ, এতদ্‌ঘটাতিরিক্তযাবজ্জন্যবৎ"—এইরূপ অনুমানের দ্বারা অবিদ্যা সিদ্ধ হয়। কেন না, হেতু 'জন্যত্ব' যে

সকল পদার্থে বর্ত্তমান, তাহার প্রত্যেকেই 'সাধ্য' আছে ; 'পক্ষ' এতদ্‌ঘট ব্যতীত যাবতীয় হেত্বধিকরণই তত্তৎপদার্থের প্রাগভাব জন্য,—সুতরাং তাহাতে সাধ্যের সদ্ভাব থাকায় 'হেতু' ব্যভিচারী হইল না। এখন এই অনুমাণরূপ প্রমাণ-বলে এতদ্‌ঘটরূপ 'পক্ষে' অনাদি ও বিনাশশীল যে অবিদ্যা, তজ্জন্যত্ব সিদ্ধ হইয়া পড়িতেছে (১)। নৈয়ায়িক প্রভৃতি দ্বৈতবাদীরা এ অনুমানকে নির্দ্দোষ বলেন না। এইরূপ অনুমান করিলে এক তদ্‌ঘটেই সহস্র সহস্র অবিদ্যার জন্যত্ব সিদ্ধ হইতে পারে এবং তাহা হইলে অদ্বৈতবাদীর স্বসিদ্ধান্তের ব্যাঘাত হয়। তুমি যেমন এতদ্‌ঘটে এতদ্‌ঘট প্রাগভাবভিন্ন অনাদি বিনাশী পদার্থের জন্যত্ব সিদ্ধ করিতেছ, আমিও সেইরূপ একটা ঘটে তোমার অনুমান-সিদ্ধ সেই অবিদ্যা ভিন্ন অনাদি বিনাশী অবিদ্যান্তর-জন্যত্ব সিদ্ধ করিতে পারি। তার পর 'প্রাগভাব' স্বীকার না করিলে তোমার সাধ্যাপ্রসিদ্ধি হয়। প্রাগভাব স্বীকার না করিলেও যে উৎপন্ন ঘটের পুনরুৎপত্তি প্রভৃতি আপত্তি হয় না, ইহা নব্য নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি "সামান্যলক্ষণা" প্রকরণে প্রদর্শন করিয়াছেন। সুতরাং যুক্তিপূর্ব্বক যে পদার্থ খণ্ডিত হইয়াছে, তাহার উপর নির্ভর করিয়া 'সাধ্য' হইতে পারে না। ইহা ভিন্ন এই অনুমানে আরও অনেক দোষ প্রদর্শিত হইয়াছে। জিজ্ঞাসু পাঠকেরা মহামহোপাধ্যায় ৺রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়ের প্রণীত "অদ্বৈতবাদখণ্ডন" ও "মায়াবাদনিরাস" আলোচনা করিলে এ সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য জানিতে পারিবেন।

'অবিদ্যা' সিদ্ধ করিতে না পারিলে জীব-সমুদায়কে আর ব্রহ্মের স্বরূপ বলা যায় না। সমস্ত জীবকে ব্রহ্মের স্বরূপ বলিলে আরও এক দোষ হয় যে,—

"একেন মরণান্তাখ্যপ্রায়শ্চিত্তে কৃতে সতি।
অশেষং কল্মষং তস্মান্নশ্যেৎ সর্ব্ববপুষ্মতাম্॥"

একজন মরণান্তরূপ গুরুতর প্রায়শ্চিত্ত করিলে জগতের সমস্ত মানবের সর্ব্বপাপ-ক্ষয়ের আপত্তি হয়। কেন না, সামান্যতঃ পাপনাশের প্রতি সমবায় সম্বন্ধে প্রায়শ্চিত্ত কারণ।

---

(১) হেতু, পক্ষ, সাধ্য প্রভৃতি দার্শনিক সংজ্ঞা। যে পদার্থের দ্বারা যে স্থানে যাহার অনুমিতি হয়, তাহাদিগকে ক্রমিকভাবে হেতু, পক্ষ ও সাধ্য বলা হয়। "পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ"—এখানে ধূম দেখিয়া পর্ব্বতে বহ্নির অনুমিতি হয়, এইজন্য ধূম, হেতু, পর্ব্বত পক্ষ ও বহ্নি সাধ্য। যাঁহারা এ সম্বন্ধে অধিক জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা "শাশ্বতী" জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১ সংখ্যা দৃষ্টি করিবেন।

এখন শঙ্কা হইতে পারে, জগতের সহিত যদি ব্রহ্মের পারমার্থিক ভেদ থাকে, তাহা হইলে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" "বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি" "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো", "অহং ব্রহ্মাস্মি"—ইত্যাদি মহাবাক্যের উপপত্তি কিরূপে হইবে? প্রদর্শিত মহাবাক্যসমূহের সর্ব্বসামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া দ্বৈতবাদীরা যেরূপ সদ্ব্যাখ্যা করিয়াছেন, অদ্বৈতবাদীরা তেমন করিতে পারেন নাই। দ্বৈতবাদী নৈয়ায়িকেরা বলেন, চিত্তশুদ্ধির জন্য—সাংসারিক সুখ-দুঃখের দুর্দ্দম আঘাতে স্বীয় স্থৈর্য্য রক্ষা করিবার উদ্দেশে নিজেকে ব্রহ্ম বলিয়া ভাবনা করিবে এবং বাহ্য পূজার সময়ে পূজোপকরণাদির পবিত্রতার জন্য তত্তৎ প্রত্যেক বস্তুতেই ব্রহ্মের অভেদ চিন্তা করিবে। যেমন সামান্য কূপোদকে পূজা করিবার সময়েও

"গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥"

বলিয়া সেই জলের পবিত্রতার জন্য গঙ্গাদি তীর্থ-তটিনীর সান্নিধ্য কল্পনা করা হয়, তেমনই আস্তিক সাধক নিজেকে এবং সমস্ত পূজোপকরণকে ব্রহ্মের স্বরূপ বলিয়া মনে করিবে। ভ্রমাত্মক হইলেও ঈদৃশ অভেদ-ভাবনা, সাধককে ক্রমশঃ কল্যাণ মার্গে অগ্রসর করিয়া দেয়। সেইজন্য ভক্ত সাধকের উদ্দেশে শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

"নাদেবো দেবমর্চ্চয়েৎ"
"দেবো ভূত্বা যজেদ্দেবম্"
"অহং দেবোঽথ নৈবেদ্যং পুষ্পগন্ধাদিকঞ্চ যৎ।
দেবাধারো হ্যহং দেবো দেবং দেবায় যোজয়েৎ॥"

নিজের এবং পূজোপকরণাদির সহিত এইরূপ শাস্ত্রবিধিপ্রাপ্ত ব্রহ্মের স্বারূপ্য-ভাবনা করিতে করিতে সাধক ভগবানের উপর ক্রমশঃ চিত্তৈকাগ্রতা ও পরমভক্তি লাভ করে। সুতরাং এই অভেদ-ভাবনা ভ্রমাত্মক হইলেও তাহার ফল অসাধারণ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, ভগবদ্গীতায় এই কথাই বলিয়াছেন,—

"ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥"

মানব ক্রমশঃ সেই সুখ-দুঃখের অতীত ব্রহ্মের সহিত আত্মার অভেদ-চিন্তা করিতে করিতে নিজেকে ব্রহ্মের সদৃশ বোধ করে। তখন সে এতই আত্ম-প্রসাদ প্রাপ্ত হয় যে, আর সে প্রাণাধিক প্রিয়তম স্ত্রী-পুত্রের বিয়োগেও শোকার্ত্ত হয় না, এবং নানাবিধ অফুরন্ত আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেলিত হইয়া আত্মাকে আরও মোহাক্রান্ত করিয়া তুলে না। হিংসা-দ্বেষ ভুলিয়া তখন সে সর্ব্বভূতের প্রতি সমভাবাপন্ন হয়। ভগবান্ বলিতেছেন, এই অবস্থায় পর, সাধক "মদ্ভক্তিং

লভতে পরাম্”—আমার উপর পরম ভক্তি প্রাপ্ত হয়। এই ভগবদ্‌ভক্তি লাভ করিতে পারিলেই সাধক নিঃশ্রেয়স-রাজ্যের অধিকারী হয়, এবং তাহা হইলেই সাংসারিক দুঃসহ দুঃখের ঘাত-প্রতিঘাতের অতীত হইয়া অনন্ত কালের জন্য পরম নির্বৃতি লাভ করে। মানব এই নিঃশ্রেয়স-দশা প্রাপ্ত হইলেও ব্রহ্মের স্বরূপ হইতে পারে না, তবে সুখ, দুঃখ ও অদৃষ্টের দৃঢ় বন্ধন হইতে মুক্ত হয় বলিয়া ব্রহ্মের সাদৃশ্য লাভ করে। তাই গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ॥"

ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভের পর বিদ্বান্ সাধক যখন শুভাশুভ অদৃষ্টের বন্ধন উচ্ছেদ করিয়া দুঃখ-সম্পর্কশূন্য মোক্ষমার্গে আরোহণ করে, তখন সে যে ব্রহ্মের সমান হয়—কিন্তু স্বরূপ হইতে পারে না, ইহা শ্রুতিও স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন,—

"যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং
কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয়
নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥"

স্থিরভাবে এইরূপ শাস্ত্র ও যুক্তির অনুশীলন করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, আমরা অতি সামান্য জীব, কখনও সেই সর্ব্ববন্ধনমুক্ত ব্রহ্মের স্বরূপ হইতে পারি না। তিনি আমাদের উপাস্য দেবতা, আমরা তাঁহার সেবা করিবার অধিকারী মাত্র। তিনি ঐশ্বর্য্যে মহান্, আমরা তাঁহার কৃপার ভিখারী।

আজ এস ভক্ত সাধক, আমরা সেই ব্রহ্মময়ী পরা দেবতা দুর্গাদেবীর উদ্দেশে বলি,—

"আম্নায়েষ্বতি ভীত ভীত ইব তে ব্রহ্মা যশো গীতবান্
শীর্ষেণাপি তবাঙ্ঘ্রিপঙ্কজযুগস্পর্শে হরিঃ শঙ্কতে।
মাতস্ত্বং জনয়স্যহো কতি দিশামীশান্ দৃশোরিঙ্গিতৈ
র্মূঢ়ঃ প্রাকৃতমানুষঃ কথমিব ত্বাং স্তোতুমর্হাম্যহম্ ॥"

না জানি কি ত্রুটি হইল—ইহা মনে করিয়া পিতামহ ব্রহ্মা চতুর্ব্বেদে অতি ভয়ে ভয়ে তোমার যশোগান করিয়াছেন, বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণ, তোমার কোমল চরণ-কমল মস্তকে স্পর্শ করিতেও শঙ্কা মনে করেন, মা, তুমি অপাঙ্গের ইঙ্গিত-মাত্রে ইন্দ্রাদি কত দিক্‌পালের সৃষ্টি কর, আমরা সামান্য মানব, কেমন করিয়া তোমার স্তব করিতে পারিব ?

তবে এক সাহস, তুমি মা। মা, "কুপুত্রো জায়েত ক্বচিদপি কুমাতা ন

ভবতি”—কুপুত্র অনেক জন্মিতে পারে, কিন্তু মা কখনও নিষ্ঠুর হইতে পারেন না। তাই বলি মা, যদিও আমরা সহস্র অপরাধী, কিন্তু তুমি আমাদের মা। তুমি জগৎপাবনের জন্য সর্ব্বস্বরূপা, সৃষ্টিস্থিতি-কার্য্যে সর্ব্বেশ্বরী—সর্ব্বশক্তিময়ী, আমাদিগকে সকল ভয় হইতে রক্ষা কর মা,—তোমাকে নমস্কার করি।

"সর্ব্বস্বরূপে সর্ব্বেশে সর্ব্বশক্তিসমন্বিতে।
ভয়েভ্যস্ত্রাহি নো দেবি দুর্গে দেবি নমোঽস্তু তে॥"

ভক্ত সাধক, উচ্চকণ্ঠে আবার বল,—

"নমস্তে শরণ্যে শিবে সানুকম্পে
নমস্তে জগদ্ব্যাপিকে বিশ্বরূপে।
নমস্তে জগদ্বন্দ্যপাদারবিন্দে
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥"

আকাঙ্ক্ষা।

কিবা হতভাগ্য সেই যেজন কৃপণ—
সঞ্চয়েতে শুধু তার চিত্ত সমর্পণ!
তীব্র আকাঙ্ক্ষিত প্রাণ কবির যেমন,
যশ—যশ, আরো যশ—শয়ন স্বপন!

শ্রীফণীন্দ্রনাথ রায়।

কর্ম্মফল।

[লেখক—শ্রীউমাচরণ ধর।]

হৃদে ছিল সুরভিত নন্দন-কানন,
প্রিয়জন ভালবাসা-পুষ্প অতুলন,
সম্মুখে ভবিষ্য ছিল উজল আলোকে
উদ্যম আশার সনে পূরিত পুলকে।
সহসা হারানু আমি প্রেম ভালবাসা,—
জীবন উদ্যমহীন তিরোহিত আশা,
আঁধার চৌদিক বেড়ি শুধু হাহাকার—
বিক্ষুব্ধ অশান্ত হৃদি দুঃখ পারাবার!
এ সাগরে কূল নাই—ডুবিব কি তবে?
ভাঙ্গা বুকে দীর্ঘশ্বাসে এই মৃত্যু হবে?
বৈতরণী-কূলে আজি একি দেববাণী!
'সকলি কর্ম্মের ফল, বুঝরে বাছনি!
ভোগ-অন্তে আকিঞ্চনে মিলিবে আবার
ধর হৃদে এ বিশ্বাস শান্তির আগার!'

মাছের হাসি।*

[লেখক—শ্রীঅবনীকুমার দে।]

একদিন একজন ধীবর একটা রোহিত মৎস্য লইয়া নবাব বেয়াকুব শাহের প্রাসাদে উপস্থিত হইলে অন্দরমহল পর্য্যন্ত বেশ একটা 'সরগোল' পড়িয়া গেল।

ঘটনাক্রমে অনেক পরিজনবর্গের মধ্যে ষোল বৎসরের উজীর পুত্র ইয়াকুবও সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিল। নিম্নতলে কোলাহল শুনিয়া নবাব-বেগম খাস্-কামরার খোলা জানালার পথে মৎস্যটি দেখিতে আসিলে দুর্ভাগ্যবশতঃ ইয়াকুবের নজরটা তাঁহার উপর নিপতিত হইয়াছিল। ইয়াকুব ছেলে মানুষ, পিতার একমাত্র সন্তান, চিরকালের আদর-আব্দারে বর্দ্ধিত,—কি জানি কি এক খেয়ালে বেগমকে দেখিয়া সে হাসিয়া ফেলিল! একেত বেগম সাহেবার 'তবি-য়ৎ'টা সেদিন মোটেই ভাল ছিল না, তার উপর এত বড় একটা অপমান, সুতরাং তৎক্ষণাৎ 'শয়তানের টাটু' আসিয়া তাঁহার 'গর্দ্দানা'টা চাপিয়া বসিল। "কি বে-আদব্!"

'কুর্ত্তি'র ভেতর রাগে গস্ গস্ করিতে করিতে বেগম নবাবের নিকট দরবার করিতে চলিলেন। নবাব তখন অর্দ্ধ নিমীলিত নেত্রে নিজ কক্ষের আরাম-কেদারায় বসিয়া আল্‌বোলার মুখনলে বাশোরার সুগন্ধ নির্য্যাস তাম্রকূটের সদ্ব্যবহার করিতেছিলেন। সহসা ত্রস্ত পদশব্দে চম্‌কাইয়া উঠিয়া দেখিলেন, সম্মুখে বেগম। তাঁহার মুখশ্রী ক্রোধে রক্তবর্ণ—বর্ষাপ্লাবিত দেহলতা উত্তেজনা ভরে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে। বেগম নবাবকে কুর্নিশ করিয়াই এক নিঃশ্বাসে নালিশ রুজু করিলেন "জাহাঁপনা! আজ জেলে একটা মদ্দা মাছ নিয়ে অন্দর-মহলে ঢুকেছে, আর ঐ মাছটা আমায় দেখেই মুচ্‌কি হেসেছে। জাঁহাপনাকে এ বদ্মায়েস মাছের মৎলবটা একটু ইন্‌সান্ করিতেই হইবে। ভারী বেয়াদব্ নর-মছ্‌লি।"

নবাব। তাইত, তাইত কি তাজ্জব্-কি-বাৎ,—কি বে-ইজ্জত্-কি-বাৎ! আচ্ছা—রহো। মছ্‌লিকো আব্ বি জাহান্নাম্‌মে দেগা। এস্তা বড়া কলিজা ওস্কো? উজীর! উজীর! কোই হ্যায়—বোলাও উজীর্‌কো!

বেগম চলিয়া গেলেন। তখন ধীরে ধীরে দীর্ঘপক্ক শ্মশ্রুবিলম্বিত ধনুক বক্রবৎ কম্পিত কুঞ্চিত কলেবর উজীর কুর্নিশ করিতে করিতে কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

"আচ্ছা উজীর! তুমি শুনেছ, মছ্‌লি কভ্‌ভি হাসে—আঁখ্‌খি ঠাঁরে?"

* কাশ্মীর কথা-সাহিত্য।

উজীর নবাব বেয়াকুব শাহের প্রশ্নে আজ একেবারে প্রমাদ গণিলেন। মছ্‌লি হাসে কি কাঁদে তিনি কেমন করিয়া জানিবেন! ভাল মুস্কিল!

উজীরকে নিরুত্তর দেখিয়া নবাব পুনরায় বলিলেন "শোন উজীর! আজ অন্দরমহলে জেলে একটা মদ্দা মাছ এনেছিল। দুষমন্‌ মাছ্‌টা বেগমকে দেখে হেসেছে, আর চ'খে ইসারা করেছে। বুঝেচ?"

উ। হুজুর—

ন। রাখো হুজুর। তোমাকে আজই এর মৎলব বে'র করা চাই। যদি না পার ত এক্‌দম কোতল।—জানো—শুনেচ?

তখন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় নতজানু বৃদ্ধ উজীর উভয় করতল একত্র মার্জ্জিত করিতে করিতে আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিলেন "আজ্ঞে—জাঁহাপনা.....হুজুর ......মেহেরবাণ্‌......তবে একটু ভাবতে সময় দিন।—বল্‌চি।"

তখন বজ্রনিনাদকণ্ঠে নবাব আজ্ঞা দিলেন—"যাও ভাবো।"

(২)

বড়ই গম্ভীর পাদবিক্ষেপে উজীর বাড়ী আসিলেন। তাঁহার তবিয়ৎটা আজ যেন এক্‌দম ভারী দমিয়া গিয়াছে। প্রগাঢ় চিন্তায় তাঁহার চ'খের কোণে সুরমা বসিয়াছে, নাসিকার প্রান্তে মেধি-পাতার রস ছাপিয়া উঠিয়াছে। তিনি একা বসিয়া আছেন, তাঁহার মুখমণ্ডল প্রশান্ত এবং গম্ভীর—ললাটস্থল কুঞ্চিত।

এমন সময় বাঁকা টেরির উপর ফুল্কো লুচির মত জরির কাম্‌দার রেশমী টুপি পরিয়া পুত্র ইয়াকুব আসিয়া পিতার পার্শ্বে দাঁড়াইল। তার মুখে এক গাল পান, নখের কোণে মেধি আর চ'খের কোণে কাজল। পশমী লুঙ্গির উপর গায়ে পাঁচ রঙ্গা মেরজাই—পকেটে জাফ্‌রাণের রং করা একখানা পাত্‌লা ফিন্‌ফিনে রুমাল ঝোলা। পায়ে টিকিওয়ালা নাগ্রা জুতা।

ইয়াকুব পিতাকে চিন্তাযুক্ত দেখিয়া বলিল "কি বাপ্‌জী! আজ যে বড় বে-মর্জ্জি?"

উজীর তখন দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া শুধু একবার মাত্র পুত্রের দিকে চাহিলেন—মুখে বাক্য সরিল না। পুত্র পুনরায় বলিল "কেন বাপ্‌জী—কি হয়েছে? আজ যে তোমার দিল্‌টা ভারী বেমালুম বে-আড়া দেখ্‌চি? আমায় বলো না কি হয়েছে?"

উজীর তখন ধীরে ধীরে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা পুত্রের নিকট বিবৃত

করিলেন। তাঁহার কথা শুনিয়া ইয়াকুব বলিল—"তাইতে বাপ্‌জী তোমার এত ডর? ভালোরে—ভাল! আমি আরও সম্‌জেছিলাম একটা খুব কিছু বা বহুৎ রকমের হ'বে, আর তা না হ'য়ে কি না একটা সামান্য তুচ্ছ কথার চোটেই তোমার গায়ের যত লৌ মগজে গিয়ে জমাট বাঁধলো? তুমি কিচ্ছু ঘাব্‌ড়িও না বাপ্‌জী। আমিই না হয় এর একটা জবাব দেবো।"

উ। না—না……না বাপ্‌ তোমার যে'য়ে দরকার নেই। নিষ্ঠুর নবাব তোমাকে—

পু। কেন বাপ্‌জী তুমি এত ভয় পা'চ্ছো? আমার একটা কথা শোন। তুমি শুধু নবাবকে আরও আট্‌টা দিনের ফুরসুৎ দিতে বলো। আমি এর জবাব নিশ্চয়ই দিতে পারব। তবে ভাবনার নাম করে এই আট্‌টা দিন ঘরে বসে বাপ্‌-বেটায় মিলে বেশ করে কোপ্তা খাওয়া যা'ক্। তুমি এক্‌দম কুচ্‌-পরওয়া ক'রো না বাপ্‌জী।

তখন একান্ত না-ছোড়-বান্দা পুত্রের জেদে পড়িয়া উজীর যাইয়া দিনকত সময়ের প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলে নবাব তাহা মঞ্জুর করিলেন।

(৩)

আটদিন পরে সাজিয়া গুজিয়া ইয়াকুব নতমস্তকে দরবারস্থলে নবাবকে কুর্ণিশ করিয়া দাঁড়াইল। বালকের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া নবাব জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি মাঙ্গো?"

ই। জাঁহাপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে পিতা উজীরের তরফ্‌ হতে বান্দা হাজির।

ন। সাজা জানো?

ই। জানি মেহেরবাণ্‌।

ন। বহুৎ আচ্ছা! কি জবাব এনেছো বল।

ই। জাঁহাপনা! এর জবাব কিছুই নাই। শুধু আমি যা কর্‌বো তা'তে কেউ বাধা দিবে না কিম্বা তা'র জন্য অগ্রে কোন কৈফিয়ৎ চাইতে পারবেন না।

ন। তোমার কি মৎলব?

ই। সন্দেহ করবেন না জনাব—আমার কোন বদ্‌ মৎলব নাই।

ন। কিন্তু আমি ঠিক্‌ ঠিক্‌ জবাব চাই।

ই। বহুত্‌-আচ্ছা জাঁহাপনা।

তখন নবাবের অনুমতিক্রমে ইয়াকুব অন্দরমহলে প্রবেশ করিল এবং

অঙ্গনের মধ্যে একটা আটহাত পরিমাণ সমচতুষ্কোণ ভূমি খনন করাইয়া তাহাতে জল পূর্ণ করিয়া রাখিল। অবশেষে নবাবকে বলিল "জাঁহাপনার মহলে কি যুবতী, কি বৃদ্ধা যত বাঁদী ও খেজমৎওয়ালী আছে, তাহাদের সকলকেই আসিতে হুকুম করুন। যেন একজনও বাকি না থাকে।

নবাবের আজ্ঞায় তখনই সকলে আসিয়া উপস্থিত হইল। ইয়াকুব তাহা-দিগকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"তোমাদের মধ্যে যে যে ঐ গর্ত্তটা এক লাফে পার হইতে পারিবে তাহাদের প্রত্যেককে পাঁচ পাঁচ আস্‌রফি ইনাম মিলিবে। আর যদি না পার ত পাঁচ পাঁচ চাবুক।"

এই কথা শুনিবামাত্র বাঁদী মহলে প্রথমে ভারী একটা ঢলাঢলি পড়িয়া গেল। একজন মুখরা বাঁদী বলিল—"আমরা ত আর তোমার মত বাঁদর নই যে লাফ্ দিতে পারবো? দেখ্‌তে পাচ্ছ না আমরা সব মেয়েমানুষ? মেয়ে মানুষ কি এত বড় গর্ত্ত এক লাফে পার হ'তে পারে?"

ইয়াকুব তখন যোড়হস্তে নবাবকে বলিল "দেখুন নবাব, তাহ'লে আমি নাচার। ওরা যদি আমার কথা অমান্য করে তবে আমি জবাব দিতে নারাজ।"

ন। কে তোমার কথা অমান্য করে? যে তোমার হুকুমে নারাজ হ'বে তাকেই তোমার সহিত কোতল করব।

নবাবের আজ্ঞা শুনিয়া বাঁদী মহলে একটা আতঙ্কের রোল পড়িয়া গেল। তখন তাহারা ঠিক ভাল মানুষটির মত যে যা'র পথে আসিল। তার পর ইয়াকুবের আজ্ঞামত একে একে সকলেই যথাসাধ্য লম্ফ দিয়া গর্ত্তটা পার হইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু ফলে কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। সকলেই গর্ত্তে পড়িয়া গেল। কেবল সকলের শেষে খোদ্‌বেগম-পরিচারিকা অতি সহজে তাহা এক লম্ফে পার হইয়া গেল, আর অমনই ইয়াকুব চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল "ঐসাহি মছ্‌লি হাসে জনাব—ঐসাহি আঁখ্‌থি ঠাঁরে।"

নবাব বেয়াকুব শাহ এই রহস্যের কিছুই বুঝিতে না পারিয়া আরও আহাম্মক বনিয়া গেলেন। তখন ইয়াকুব তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিল "জাঁহাপনা পরীক্ষা করিয়া দেখুন আপনার মহলে যত বাঁদী আছে সকলেই আওড়ৎ, খালি ঐ দুষমন খেজমৎওয়ালীটা মর্দ্দানা-আওড়ৎ। ঐ হি বে-আদব নর্-মছ্‌লি হাসে, ঐ হি আঁখ্‌থি ঠাঁরে।"

চোর ধরা পড়িল। ইয়াকুব তখন নবাবকে মাছের হাসির সমস্ত তাৎপর্য্যটা বুঝাইয়া দিল। নবাব তাহাকে স্বীয় শিরতাজ ও যথেষ্ট পুরস্কার প্রদান করিলেন।

সাহিত্যে স্বলিখিত ও অপরলিখিত জীবন-চরিতের স্থান।

[লেখক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাশ গুপ্ত, এম্-এ, বি-এল্।]

মানুষ 'আপনাকে' আপনি সম্পূর্ণভাবে ব্যক্ত বা প্রকাশ করিতে পারে কি না এবং ঠিক্ আপনার অন্তরের ও ভিতরকার ছবিটি লেখনী-মুখে আঁকিয়া তুলিতে পারে কি না,—এই প্রশ্নটি আলোচিত হওয়া আবশ্যক। অনেক স্বরচিত 'জীবনচরিত' 'আত্মকাহিনী' 'আত্মকথা' 'জীবনস্মৃতি' 'বাল্যস্মৃতি' 'আমার জীবন' প্রভৃতি পাঠে এই প্রশ্নটি স্বতঃই মনে জাগরূক হয়। কোনও কোনও প্রখ্যাতনামা শিল্পী মুকুরে স্বীয় দেহের প্রতিবিম্ব দেখিয়া নিজের ছবি আঁকিয়াছেন বা প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছেন। বিখ্যাত মহারাষ্ট্র শিল্পী ক্ষাত্রকে এই প্রকার স্বীয় প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে দেখিয়াছি। যে-সে শিল্পী এই প্রকার ছবি-অঙ্কনে কি প্রতিমূর্ত্তি-নির্ম্মাণে কৃতকার্য্য হইতে পারেন না, ইহা নিশ্চিত। এত গেল বাহ্য প্রকৃতি বা দেহের প্রতিকৃতি অঙ্কন বা নির্ম্মাণের কথা, কিন্তু আন্তর-প্রতিকৃতি এই প্রকার অঙ্কন কি বর্ণন-সাধ্য কি না এইটিই সমস্যা। সুধু অন্তর্দ্দৃষ্টিপরায়ণ হইলেই যে, এই ক্ষমতা পরিস্ফুট হইবে তাহা নহে। কেবল বর্ণন-চাতুর্য্যে, রংয়ের উপরে রং ফলাইলেই যে, মানুষ তাহার অন্তরের ছবি আঁকিতে সমর্থ হইবে তাহা নহে। 'ভিতর'টাকে 'বাহির' করা অনেক সময়ে মনুষ্যের সাধ্যাতীত বলিয়াই প্রতীত হইবে, কারণ মনুষ্য-স্বভাব বা মানব-প্রকৃতিই এই প্রকার আত্ম-প্রকাশের প্রধান অন্তরায়। জগদ্বিখ্যাত চরিতাখ্যায়ক বস্‌ওয়েল্, জন্‌সনের জীবন-চরিতের প্রারম্ভে জন্‌সনের একটি উক্তি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন "Every man's life may be best written by himself" তিনি বলেন—"প্রত্যেকে স্বীয় জীবনচরিত নিজেই যত উৎকৃষ্টরূপে লিখিতে পারে, অপরে সে প্রকার পারে না"। এ কথাটি কত দূর সত্য, তাহাও বিবেচনা করিতে হয়।

নানা দেশের মনস্বীগণ লিখিত 'আত্ম-জীবনচরিত' পাঠ করিলে, দেখা যাইবে যে, সে সমস্ত মনস্বীগণ হয় দেবতা, না হয়, তাঁহারা পশুত্ব হইতে ক্রমশঃ দেবত্বের সোপানে আরোহণ করিতেছিলেন। আবার কেহ কেহ কেবল তাঁহাদের প্রতিভার ক্রমোন্মেষের একটি বাহ্যিক চিত্রই দিয়াছেন। ইংরেজীতে জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের ও হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের "আত্মজীবনী" বিশ্বসাহিত্যে অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়া আছে। মিলের 'জীবন-চরিতে' তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা ও

মনীষার অত্যাশ্চর্য্য বিকাশের কাহিনী-পাঠে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইতে হয়; কিন্তু পরেই মনে এই প্রশ্নটি জাগিয়া উঠে কৈ? ইহাতে ত তাঁহার আশা ও আকাঙ্ক্ষা, সুখ ও দুঃখ, আনন্দ ও বেদনা, রিপুকুলের তাড়না ও বিড়ম্বনা, ইন্দ্রিয়-সমূহের ঝঞ্ঝাবাত, গৃহে ও সমাজে শত্রুতা ও মৈত্রী, ঈর্ষা ও দ্বেষ, প্রভৃতির বিবরণ পাইলাম না? দেহ-ধারী জীব, সংসার-সাগরে, রিপু-তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাতে, যে প্রকারে 'হাবুডাবু' খায়, তাহার ইতিহাস কৈ? এই ঘাত-প্রতিঘাত, এই সংগ্রামই ত মানবের জীবন ও চরিত্র। যাহাতে ইহার বিবরণ নাই, তাহাকে জীবনের প্রতিকৃতি বলিয়া কি প্রকারে গ্রহণ করিব?

হার্ব্বার্ট পেন্সারের 'আত্ম-জীবনী' যদিও মিলের 'আত্ম-জীবনী' অপেক্ষা পূর্ণতর, তথাপি তাহা পাঠ করিয়া মনে হয়, মানব-'পেন্সারে'র অন্তর্জ্জীবনের কিছুই বুঝিতে ও জানিতে পারিলাম না; কেবল তাঁহার মনীষাবিকাশের ক্রমই দেখিতে পাইলাম। ডাক্তার জন্‌সনের পূর্ব্বোদ্ধৃত মতেরই আলোচনা করা যাক। আপাত দৃষ্টিতে মনে হইবে যে, অপরে মানুষের কি জানিতে পারে? তাঁহার বাহ্য ক্রিয়া-কলাপ, পরিবার ও সমাজের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ, তাঁহার চিন্তা ও প্রতিভা যত দূর, তৎপ্রণীত গ্রন্থাদিতে, বাক্যে ও কার্য্যকলাপে, অভিব্যক্ত, তদতিরিক্ত আর কিছু জানিবার সাধ্য নাই। তাঁহার ভিতরকার কথা, তাঁহার অন্তর্জ্জীবনের কথা, কিছুই জানিবার উপায় নাই। সুতরাং যদি সেই ব্যক্তি নিজে তাঁহার আভ্যন্তরিক জীবনের ছবি ফুটাইয়া তোলেন, তবেই না তাঁহার প্রকৃত ছবি দেখিতে পাই! কিন্তু কথাটা কি ঠিক্? মানুষ বরং অপ-রের কাছে ধরা পড়ে, কিন্তু আপনার কাছে প্রায়শঃই ধরা পড়ে না। আত্ম-প্রতারণাই (স্বেচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত) মানব-চরিত্রের একটি বিশেষত্ব। রুশোও বলিয়াছেন যে, পূর্ণভাবে নিরহঙ্কার, স্তুতি-নিন্দার অতীত যে হইতে না পারে, যে প্রকৃতপক্ষে সত্যবাদী হইতে না পারে, সে যেন 'আত্মজীবন'-কথা লিখিতে উদ্যত না হয়।

আমরা সর্ব্বদাই আপনার কাছে আপনাকে গোপন করিয়া থাকি, আপনার কাছে আপনাকে আপনি প্রতারিত করিতেছি। এই আত্মপ্রতারণা বা আত্মগুপ্তির মূল, মানবপ্রকৃতিতেই অন্তর্নিহিত। অস্মদ্দেশীয় দার্শনিক প্রবরেরাও মানবকে 'কর্ত্তৃত্বাভিমানী' বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমিই 'কর্ত্তা', আমিই 'ভোক্তা' ইত্যাদি জ্ঞান যদিও অধ্যাসমূলক, তথাপি ব্যাবহারিক জীবনে এই অভিমান অপরিহার্য্য। আমাদের আলোচ্য বিষয়ও এই ব্যাবহারিক

জীবন লইয়া। পরমার্থতত্ত্বের কথা স্বতন্ত্র। ব্যাবহারিক জীবনে কদাপি আমরা এই অভিমান-পরিশূন্য হইতে পারি না। এই অভিমান সুধু 'অহং' বুদ্ধিতেই পরিসমাপ্ত নহে। জীবনের প্রত্যেক কার্য্যে, চিন্তনে, মননেও এই অভিমান। আর এই অভিমান হইতেই আত্ম-প্রীতি (Self-love) ও রূপান্তরিত পূর্ব্বকথিত আত্মপ্রতারণা (Self-delusion)। এক দিকে যেমন এই আত্মপ্রীতি আমাদিগকে দোষ ও ত্রুটি সম্বন্ধে 'অন্ধ' করিয়া ফেলে, অপর দিকে এই 'আত্ম-'প্রীতি'র অভাব হইলে জীবন একেবারে দুর্ব্বিষহ হইয়া পড়ে। কখন কখন স্বীয় ত্রুটি, অভাব ও পাপ-অবলোকনে, অনুতাপানলে দগ্ধীভূত হইতে পারি, কিন্তু সর্ব্বদা সেই অনুতাপ বা অনুশোচনার বহ্নি প্রজ্বলিত থাকিলে, মানবের 'মানবত্ব'টুকু পর্য্যন্ত ভস্মীভূত হইয়া যায়। আত্মপ্রীতি-সলিলেই এই অনুতাপানল কথঞ্চিৎ প্রশমিত বা নির্ব্বাপিত থাকে। এই আত্মপ্রীতি বা অভিমান বাষ্পেই স্ফীত হইয়া, আমরা নিম্নভূমি ছাড়িয়া 'ঊর্দ্ধে' বিচরণ করি ; নচেৎ চিরদিনই ধূল্যবলুণ্ঠিত থাকিতাম।

আর এই অভিমান, আত্ম-প্রীতিই বা অহঙ্কারই স্বীয় জীবনের যথাযথ চিত্র-অঙ্কনের বিশেষ পরিপন্থী। এই অভিমানের সঙ্গে 'লজ্জা' ও 'ভয়' সংমিশ্রিত থাকে, কেহই স্বীয় পাশব ভাব বা প্রবৃত্তির খেলা লোকচক্ষুর গোচরীভূত করিতে সমর্থ বা প্রস্তুত নহেন, এবং করিলে কি করিতে পারিলে তাহাতে সমাজের অনিষ্ট বই ইষ্ট নাই। অথচ এই পশু প্রবৃত্তির খেলাই মানবজীবননাট্যের বহু অঙ্ক ও গর্ভাঙ্ক অধিকার করিয়া থাকে। কথায় বলে যে "দর্শকেরা ক্রীড়ার যত টুকু দেখিতে পান, খেলোয়াড়েরা বস্তুতঃ তাহা দেখিতে পান না"। মানবজীবনের খেলা সম্বন্ধেও সে কথা বোধ হয় খাটে। সকল নিয়মেরই ব্যত্যয় ঘটে, সকল বিধি-ব্যবস্থারই বর্জ্জিত বিধি আছে। কোনও কোনও মহাপুরুষ, 'স্বরচিত জীবন-চরিতে' এই সমস্ত রিপুলাঞ্ছিত, পশুভাবানুপ্রাণিত অঙ্ক বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ফরাসী 'রুসো', রুশিয়ার 'টলষ্টয়' ইহার দৃষ্টান্তস্থল। পৃথিবীর প্রায় সর্ব্ব দেশেই ধর্ম্মপ্রাণ মহাত্মারা তাঁহাদের নিজ নিজ জীবনে 'অসত্য' 'অধর্ম্ম' ও 'পাপের' সহিত সংগ্রাম ; অবশেষে পুণ্যের, সত্যের ও ধর্ম্মের জয় ও প্রতিষ্ঠা ; এবং 'অসত্য' 'অধর্ম্ম' ও 'পাপে'র পরাজয়ের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। 'ভক্তমাল' গ্রন্থের, বহু ভক্ত, সাধক ও বৈরাগীর জীবন-কাহিনী এই শ্রেণীর। বহু খৃষ্টীয় সাধুর জীবনীও এই শ্রেণীর। ইংলণ্ডে জন্ বানিয়ান্ যদিও ঠিক্ 'আত্মকাহিনী' বলিয়া কিছু লিখিয়া যান নাই,

কিন্তু তাঁহার 'তীর্থযাত্রা' (Pilgrim's progress) গ্রন্থখানিকে অনেকেই Auto-biographical, তাঁহার ধর্ম্ম-জীবনের কাহিনী বলিয়া মনে করেন। পাপী ছল্, যিনি পরে সাধু পল্ হইয়াছিলেন, তিনিও স্বীয় জীবনের এই সুরাসুর-দ্বন্দ্ব লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। সাধু আগষ্টিন্‌ও তাঁহার পদবীর অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু এই সমস্ত মহাপুরুষদিগের 'আত্ম-জীবনী'তেও কি আমরা সেই মৌলিক 'অহঙ্কার' বা 'আত্ম-প্রীতি'র ছাপ্ দেখিতে পাই না? তাঁহাদের সেই সরল, সুস্পষ্ট আধ্যাত্মিক সংগ্রামের বিবরণের মধ্যেও 'লুক্কাইত' 'অহঙ্কারে'র চিহ্ন দেদীপ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়। নীতি ও ধর্ম্মানুমোদিত জীবনেও সেই অভিমান অল্পাধিকপরিমাণে দৃষ্ট হয়। মহা 'বিনয়ী'র বিনয়প্রকাশেও অহঙ্কার, ঘোর পাপী, যখন অনুতপ্তহৃদয়ে নিজের পাপ স্বীকার করে, তখন সেই পাপ-স্বীকৃতির মধ্যেও অনেক স্থলে "আমি এইবার পাপের বোঝা নামাইতেছি বা নামাইতে সমর্থ হইতেছি",—এই ভাবটুকু প্রচ্ছন্ন থাকে। সুতরাং মানবের পক্ষে সোজাসুজি অর্থাৎ বুদ্ধিপূর্ব্বক 'আত্ম-প্রকাশ' এক প্রকার অসম্ভব। তবে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, তাহা হইলে আর এক জন অপর জনকে জানিবে কি প্রকারে? অর্থাৎ আমিই যদি 'আমাকে' প্রকাশ না করি, তবে আর অপরেব 'আমাকে' জানিবার সাধ্য কি? মানুষ বিবেচনাপূর্ব্বক আপনাকে প্রকাশ করে না। বা করিতে পারে না বটে, কিন্তু অজ্ঞাতসারে কার্য্যে ও বাক্যে আত্ম-প্রকাশ না করিয়া পারে না। মানুষের সমস্ত কার্য্য ও বাক্য অহঙ্কারসমাচ্ছন্ন বা আত্ম-প্রীতি দ্বারা নিয়মিত হইতে পারে না। বিশেষতঃ মানুষের চৈতন্যোপহিত অস্তিত্বই (Conscious self) এই অহঙ্কার-সমাচ্ছন্ন বটে, কিন্তু চৈতন্যের বাহিরে যে অস্তিত্ব (Unconscious self), তাহা অহঙ্কার বা আত্ম-প্রতারণার অধিকার-বহির্ভূত। 'চরিত্র' বলিয়া একটা কোনও মানসিক বৃত্তি বা ভাব নাই; আমরা যাহাকে 'চরিত্র' বলি, তাহা বস্তুতঃ কতকগুলি অভ্যাস জন্য ক্রিয়ার সমষ্টি বৈ আর কিছুই নয়।

একবার, দুইবার, দশবার, শতবার সত্য কথা বলি, তাই আমি সত্যবাদী ও সত্যসন্ধ। একবার, দুইবার, দশবার, শতবার মিথ্যা কথা বলি, তাই আমি মিথ্যাবাদী, মিথ্যুক ও অনৃতপরায়ণ। একবার, দুইবার, দশবার, শতবার আমি কামাতুর হই, তাই আমি কামুক। একবার, দুইবার, দশবার, শতবার, কামকে জয় করিয়াছি বলিয়াই আমি জিতেন্দ্রিয়; নচেৎ দেহধারী কেহই জন্মাবধি রিপু-নিসূদন নহেন।

যথাযথভাবে মানবের চরিত্রটী আঁকিয়া তুলিতে পারিলেই 'জীবন-চরিত' লেখা হইল। অত্যন্ত কদাকার ব্যক্তিও আপনার 'কুরূপ' দেখিয়া সর্ব্বদা বিষণ্ণ ও ম্রিয়মাণ থাকে না; দর্পণে মুখ দেখিয়া আপনাকে ধিক্কার দেয় না, পরন্তু স্বীয় রূপটিকে প্রোজ্জ্বল করিবার জন্য নানা প্রকার বেশভূষা করিয়া থাকে, কেশ প্রসাধন করে, দেহ মার্জ্জনা করে। আপনার ছেলেটিকে যেমন কেহ কুৎসিত দেখে না, আপনাকে আপনিও কেহ কুৎসিত দেখে না, তবে মানুষ কি কেবল দেহ-সম্বন্ধেই এই প্রকার অভিমানী? না মানবের সমগ্র 'অহং'-সম্বন্ধেও ঠিক সেই একই ভাব?

'রাজা' ও 'সম্রাট'দিগের জন্ম, মৃত্যু, যুদ্ধবিগ্রহাদির কালনির্ণয়বিবরণই যেমন ইতিহাস নয়, কাহারও জীবনের সুধু ঘটনাবলীর উল্লেখ ও পারম্পর্য্য-প্রদর্শনও তেমনই জীবনচরিত নয়। ইতিহাসও যেমন সমাজ-জীবনের ছবি, জীবনচরিত তেমনই ব্যক্তিবিশেষের জীবনের ছবি। 'জীবন' বলিতে আমরা কি বুঝি? সুধু আধ্যাত্মিকতা, সুধু জ্ঞান, সুধু পাশবিকতা, সুধু দৈহিক জন্ম, বৃদ্ধি ও মৃত্যু? ইহা কিছুই নয়। জীবন বলিতে আমরা 'সমগ্র' জীবনই বুঝি, অর্থাৎ ইহাতে দেবত্ব, পাশবিকতা ও মানবত্ব সমস্তই থাকিবে। মানবত্বের শ্রেষ্ঠাংশের অর্থাৎ যাহাকে আমরা 'দেবত্ব' বলি, কেবল তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিলেই তাহা 'জীবন-চরিত' আখ্যায় আখ্যাত হইতে পারে না। জীবনচরিত সর্ব্বতোভাবে 'জৈবিক' (Organic) হওয়া চাই। আর এই 'জীবন-চরিত' মানব স্বয়ং স্বীয় বুদ্ধি, স্মৃতি ও অভিমানসহকারে কখনও ঠিক লিপিবদ্ধ করিতে পারে না।

যাঁহারা বসওয়েলের লিখিত ডাক্তার জন্সনের জীবনচরিত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে, ডাক্তার জন্সন, স্বয়ং 'আত্ম-জীবনী' লিখিলে কখনও বস্ওয়েল্-লিখিত আদর্শ জীবনচরিতানুরূপ কোনও 'জীবনচরিত' বিশ্ব-সাহিত্য অলঙ্কৃত করিত না। এখন দেখা যাউক, বসওয়েল, জীবনচরিতঅঙ্কনে এত দূর কৃতিত্ব-লাভের মূল কারণ কি? বস্ওয়েল জন্সনের ভক্ত বন্ধু ও সমসাময়িক ব্যক্তি, তিনি ছায়ার ন্যায় জন্সনের অনুসরণ করিতেন। চরিতাখ্যায়কের এই কয়েকটি গুণ থাকা আবশ্যক। যাঁহার জীবনী লিখিত হইবে, তাঁহার প্রতি অপরিসীম সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা, মানবচরিত্রাভিজ্ঞান, সূক্ষ্ম-দৃষ্টি, অন্তর্দৃষ্টিপরায়ণতা, সমালোচকযোগ্য বিচারক্ষমতা, ও উপাদানসংগ্রহে তৎপরতা আর চরিতাখ্যায়কের সাহিত্যিক শিল্পনৈপুণ্যও যথেষ্ট থাকা আবশ্যক। কবি, উপন্যাস ও

নাটক-লেখকের মানবচরিত্রঅঙ্কনে যতটুকু কল্পনা ও মানবচরিত্রাভিজ্ঞানের প্রয়োজন, জীবনী-লেখকেরও ঐ সমস্ত গুণের সমাবেশ একান্ত আবশ্যক। কারণ যদিও কাব্য, উপন্যাস ও নাটকের চরিত্র (Characters) কল্পিত বা সৃষ্ট, আর চরিতাখ্যায়কের লিখিত জীবনী বাস্তব জীবনেরই প্রতিকৃতি, তথাপি যে সমস্ত সংগৃহীত উপাদানে 'জীবন-চরিত' লিখিত হইতে পারে, তাহার সমাবেশে, সমন্বয়ে ও গ্রন্থনে সামান্য কল্পনা ও সৃষ্টি-নৈপুণ্যের প্রয়োজন হয় না, বরং কবি, ঔপন্যাসিক ও নাট্যকারের কল্পনা উদ্দাম ও অসংযত, কিন্তু 'জীবনী'-লেখকের কল্পনা, ঐতিহাসিকের অনুরূপ,সংহত ও সংযত হওয়া চাই। পরন্তু সংযত গতি, স্বৈর গতির ন্যায় সহজ নয়। মানব কখনই সমগ্র ভাবে 'আপনাকে' দেখিতে পারে না, ক্ষীয়মানা স্মৃতির সাহায্যে অতীত জীবনের সামান্য অংশই দেখিতে পায়। বর্ত্তমান জীবন ক্ষণিক ও অহঙ্কার-বিজৃম্ভিত এবং ভবিষ্যৎ-জীবনের কল্পনাও তদ্রূপ অহঙ্কার ও দুরাশানুপ্রাণিত। যাঁহার জীবনচরিত লিখিত হইবে, তিনি যদি যথাযথভাবে দৈনন্দিন লিপি (Diary) রাখিয়া যান, সেই লিপি চরিতাখ্যায়কের পক্ষে অতি শ্রেষ্ঠ ও উপাদেয় উপাদান বটে, কিন্তু সে দৈনন্দিন লিপি কখনও প্রকৃত জীবনচরিতের স্থান অধিকার করিতে পারে না। স্বরচিত জীবনচরিতে, প্রায়শঃ, জীবনের কোনও অংশ, হয় অযথা বর্দ্ধিত ও অত্যুক্তিবহুল, আবার কোনও অংশ হয় ত খর্ব্বাকৃত, তমসাচ্ছন্ন ও অস্পষ্টীকৃত হইবেই।

তবে ভক্ত চরিতাখ্যায়ক-সম্বন্ধে এই আপত্তি হইতে পারে যে, ভক্তও প্রায়শঃই অন্ধ। ভক্তিভাজনের অভাব ও ত্রুটি দেখিতে পায় না, বা উপেক্ষা করে। কিন্তু যে স্থলে 'ভক্তি' ও 'সহানুভূতি'র কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, সে স্থলে ঠিক অন্ধভক্তি বা সহানুভূতির কথা বলা হয় নাই। আর ভক্ত যদিও কোনও স্থলে অন্ধ হয়, তথাপি সর্ব্বত্র সে প্রকার হওয়া সম্ভবপর নয়, তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ আত্ম-প্রতারণা ও অহঙ্কারের সুযোগ নাই। কোনও স্থলে সহৃদয়তার অভাব হইলেও, আত্মপ্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা নাই। বস্তুতন্ত্র কাব্য ও উপন্যাসাপেক্ষা প্রকৃত জীবন-চরিতের মূল্য কেবল সাহিত্য-কলার হিসাবেও কম নয়; আর সমাজের হিতো-পধায়িকতার হিসাবেও অনেক বেশী; লেখকের যশঃ ও খ্যাতি থাকিলে স্বরচিত 'জীবনচরিত' আমাদের কৌতূহল উদ্দীপিত করে বটে, এবং তাহাতে জীবন-চরিতের অতি প্রয়োজনীয় উপাদানও থাকিতে পারে; কিন্তু 'আত্মজীবনী' ঠিক জীবনচরিত নয়, সাহিত্যে তাহার স্থান অতি নিম্নে।

মানুষ-ভূত।

[লেখক—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।]

(১)

আমাদের যুগে বাঙ্গালী পল্টন ছিল না, বাঙ্গালী-জননী আশীর্ব্বাদ করিয়া বীরতনয়কে রণক্ষেত্রে পাঠাইত না। যাহাদের খুব বীরত্বের খ্যাতি ছিল তাহারা অনেক স্তবস্তুতি তোষামোদ করিয়া কালেক্টার সাহেবের নিকট হইতে গাদা বন্দুকের পাশ সংগ্রহ করিতে পারিত। সেই গাদা-বন্দুকের সঙ্গে বারুদ ছিটে ক্যাপ কাঁধে করিয়া বন-জঙ্গলে, নদীর ধারে, হোরেল, ঘুঘু, কাদাখোঁচা—কদাচ কখনও এক আধটা জলপেপী বা বালহাঁস মারিয়া তাহারা বীরত্বের গর্ব্ব করিত। কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, বন্দুক হাতে থাকিলেও স্থলবিশেষে সহজাত বুক্-ঢিপ্-ঢিপটা বন্ধ হইত না। বিশেষ, কিম্বদন্তী যে সকল স্থলকে ভয়াবহ বলিয়া নির্দ্দেশ করিত, সে সকল স্থলে ঐ সহজাত সংস্কারটা একটু সবেগে আত্মপরিচয় দিত।

সে আজ ত্রিশ বৎসরের কথা। আমার এক বন্ধুর দেশে শীকার করিতে গিয়াছিলাম। অতি প্রত্যূষে দোয়েলের গান শুনিতে শুনিতে নদীর উপকূলে বালির উপর দিয়া একাকী উত্তর মুখে চলিতেছিলাম। সে দিনের প্রভাত মলয়ের তিনটি গুণই ছিল। সে মন্দ-মন্দ-প্রবাহিত মলয়-হিল্লোল প্রকৃতই

"সুভগসলিলাবগাহাঃ
পাটলসংসর্গসুরভিবনবাতাঃ।"—

যদি পাটল অর্থে গোলাপ ফুল হয়। কারণ সে দিকে জমিদার বাবুদের একটা গোলাপের বাগান ছিল। ক্রমশঃ দোয়েলের গান শুনিতে শুনিতে নখায়ুধ পক্ষীর প্রভাতী কঁ-কোঁড়-কোঁ-শব্দ-মুখরিত মুসলমানপাড়ায় আসিয়া পড়িলাম। কিন্তু আরও একটু অগ্রসর হইয়া বুঝিলাম—সমাধি-স্থলে আসিয়া পড়িয়াছি।

আপনারা এখন যাহাই বলুন, আমার মত অবস্থায় পড়িলে কি ভাবিতেন তাহা উপলব্ধি করিতেছি। অপরিচিত গ্রামের নির্জ্জন সমাধিস্থল—অন্ততঃ পঞ্চাশটা কবরের উপর এক একটা ঢিপি। চারিদিকে গাছের ঝোঁপ, নির্জ্জন নদী সৈকত নীরব নিস্তব্ধ। ঠিক এই দৃশ্যে আমার ভয় হইয়াছিল তাহা নয়। একটা শৃগাল কোন হতভাগ্য দরিদ্র কৃষকের নূতন কবর খুঁড়িয়া তাহার পরিত্যক্ত দেহটাকে কতক টানিয়া বাহির করিয়াছিল। সেই নর-মাংসের জন্য দুইটা শকুনির সহিত তাহার বিষম কলহ হইতেছিল। অপর একটা শৃগাল লোভলোলুপ দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়াছিল, আর কতকগুলা

দাঁড়কাক ধীরে ধীরে শবদেহের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। তাই আমি সেই দৃশ্য দেখিয়া নির্ব্বাক হইয়া পড়িলাম। মনের মধ্যে কি হইতেছিল, সে কথায় কাজ নাই।

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বিস্মিত হইলাম যখন পাশের ঝোঁপে প্রথমে একটা খস্ খস্ শব্দ হইল, তাহার পর একটা কালো কচ্‌কচে দাড়ি, তাহার পর একটা রক্তহীন মুখ বাহির হইল। দৃষ্টিটা স্থির কিন্তু খুব তীক্ষ্ণ। বুকের পাঁজরার উপর হৃদপিণ্ড 'হাথুড়ি'র আঘাত করিতে লাগিল আর কম্পিত হস্তে গাদা-বন্দুক রেলের গার্ড সাহেবের হাতের নিশানের মত কাঁপিতে লাগিল। রাম-নাম করিতে করিতে সেই মুখখানা দেখিতে লাগিলাম—না দেখিলে রক্ষা নাই। তাহার পর একটা হাত বাহির হইল। বেশ হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ মনিবন্ধ। ফ্যাকাসে মুখের এমন হাত! একটু যেন বিসদৃশ বোধ হইল। কিন্তু প্রেতযোনির—

এবার সেই হাত আমাকে নিকটে যাইতে সঙ্কেত করিল। মনে জোর আসিল—নিশ্চয় মানুষ—ভূতেদের হাতগুলা উল্টা হয়। কিন্তু হাত পা মনের অবাধ্য হইল। ভূত বা মানুষ আবার ডাকিল। আমি কিংকর্ত্তব্য হইয়া বসিয়া পড়িলাম। ভূত-মানুষ ঝোঁপের বাহির হইল—শৃগাল শকুনি ও দাঁড়কাকগুলা সসম্ভ্রমে একটু সরিয়া গেল। সে সটান আমার দিকে আসিল—সঙ্গে সঙ্গে আমার ললাটে কলসীখানেক স্বেদবারিরও শুভাগমন হইল। ভূত-মানুষ—খুব সম্ভব মানুষ-ভূত—কারণ সে মনুষ্যজাতির মত বস্ত্রাচ্ছাদিত—একেবারে আসিয়া বালুকার উপর বসিল। রাম রাম বলিলাম। হিন্দু-ভূত হইলে কি হইত বলা যায় না, লোকটা মুসলমান—ছিল কিম্বা আছে—রাম নামে তাহাকে কায়দা করিতে পারা গেল না। বসিয়া সে খানিকক্ষণ আমার দিকে চাহিল। বুঝিলাম, ভূতেদের দৃষ্টি অনেকটা পাগলের মত।

আমি রাম-নাম ও গাদা-বন্দুকের মহিমা স্মরণ করিয়া খুব দুঃসাহসে তাহাকে সেলাম করিলাম। যদিও স্যর রবীন্দ্রনাথ আপাততঃ বলেন যে হিন্দুরা মুসলমানদিগের নিকট হইতে অভিবাদন করিতে শিখিয়াছে, আমার তখন বিশ্বাস হইয়াছিল যে জীবন্ত মুসলমানের আদব-কায়দা যাহাই হউক, ফৌতি মোস্‌লেম বড় বে-আদব। সে প্রতিসেলাম না করিয়া বরং অতি কর্কশভাবে আমার দিকে চাহিল। আমি আর একবার সেলাম করিলাম। সে একটু ভ্রূকুটি করিয়া বলিল—শুন্‌বে?

সে কণ্ঠস্বর কিসের সহিত তুলনা করিব? যদি শ্যামাপূজার রাত্রে হাঁড়ির

ভিতর ধানিপটকায় আগুন দিয়া, হাঁড়ির মুখ বন্ধ করিয়া দিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহার কণ্ঠস্বরের অনুরূপ শব্দ শুনিয়াছেন। আমি যেন মন্ত্রমুগ্ধের মত বলিলাম—হ্যাঁ, শুনব।

সে বলিল—কি শুন্‌বে? হ্যাঁ! কি শুন্‌বে?

আমি আজিও ভাবিয়া ঠিক করিতে পারি না যে, কেমন করিয়া তাহাকে বলিয়াছিলাম—"আঁজ্ঞে এই মানে হ'চ্চে মশায় মানুষ না ওর নাম কি?"

আমি তখন আত্মবিস্মৃত অবস্থায় ছিলাম, তাই অজ্ঞাতে প্রাণের কথাটা মুখ দিয়া বাহির হইয়াছিল। সে বলিল—মানুষ কি ভূত? হ্যাঁ! ভূতও বটে মানুষও বটে, জ্যান্তও বটে মরাও বটে।

আমি সে পদার্থটা কি তাহা ঠিক বুঝিতে না পারিয়া বলিলাম—তা বটে।

সে বলিল—কেন, শুনবে?

না শুনিলে ছাড়ে কে? কি জানি অসম্মতির কি পরিণাম হইবে! অগত্যা আমি ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি দিলাম।

(২)

"কখনও কোন পরস্ত্রীকে ভালবেসেছ?"

নারায়ণ! এমন গর্হিত কাজ জীবনে করি নাই। একবার গাদা-বন্দুকটার দিকে চাহিলাম। তবু "না" বলিতে সাহস হইল না। তাহার চোখ দেখিয়া বেশ বোধ হইতেছিল যে, সে শুনিতে চাহে—"হ্যাঁ"। আমি মাথা চুলকাইয়া বলিলাম—হ্যাঁ। মানে হ'চ্চে দু'একবার মনে হ'য়েছে যে ওর নাম কি—

মানুষ-ভূত বলিল—না না ওসব না। ভালবাসা—কামড়ান ভালবাসা?

কামড়ান ভালবাসা! না এমন ভালবাসার সন্ধান জানিতাম না। অতি সবিনয়ে তাহার নিকট দীন মনোভাব ব্যক্ত করিলাম।

সে বলিল—হ্যাঁ, কামড়ান ভালবাসা। সে ভালবাসা কামড়ে ধরে, তাড়ালে যায় না, ভোলালে ভোলে না।

আমি বলিলাম—আজ্ঞে হ্যাঁ বুঝেছি। নাটক নভেলে কতকটা পড়েছি। কিন্তু আজ অবধি নিজস্ত্রীর বা পরস্ত্রীর ভালবাসা আমায় কামড়ায় নি।

সে বলিল—আমার কিন্তু সেই রকম প্রেমসঞ্চার হ'য়েছিল—নিজের স্ত্রীর ওপর নয়, বুঝলে—

আমি বলিলাম—রামচন্দ্র! পরের স্ত্রীর উপর! তা বুঝেছি।

সে বলিল—যাকে কবিরা পরকীয়া বলে—

আমি বলিলাম—হ্যাঁ, প্রাচীন কবিরা। তা'রা একটু সত্যকথা বেশী বল্‌ত। এখনকার বাবুরা মুখে বলেন বটে বস্তুতন্ত্রতা—

মানুষ-ভূত একটু বিরক্ত হইয়া বলিল—যাক্ অত বড় কথা—

আমি সামলাইয়া লইয়া বলিলাম—আজ্ঞে অপরাধ হ'য়েছে, আমি ছোট্ট ছোট 'স্ল্যাঙ্গ' কথারই চিরদিন পক্ষপাতী।

সে বলিল—শুনুন। করিম আমার এক রকম চাচেরা ভাই—বাপের চাচেরা ভেয়ের ছেলে। আমরা সম্ভ্রান্ত গাঁতিদার—একেবারে মুখ্‌খু নই, পেটে একটু বাঙ্গালা ইংরাজী ফার্সী বিদ্যাও ছিল। করিমের সঙ্গে কল্‌কাতায় বেড়াতে গিয়েছিলেম। কল্‌কাতায় করিমের দোকান ছিল। প্রায় সারাদিন সে বাহিরে থাকত, আমার কাজ কর্ম্ম ছিল না, করিমের বিবিকে দেখ্‌তাম, তার হাতের তৈরী খানা খেতাম, দিন রাত তার গলার মিঠা আওয়াজ শুনতাম, তার চোখের চাহনী—

আমি ভয় ভুলিয়া একটু রহস্য করিয়া বলিলাম—তার মরাল গমন—

সে বলিল—হ্যাঁ, মরাল গমন—এই সবগুলা মিলেমিশে একটু একটু ক'রে আমাকে দেওয়ানা করে দিলে—ওঃ!

বুঝিলাম প্রেত-যোনিতে দীর্ঘনিঃশ্বাসের রেওয়াজ আছে। সে নিজের মনে বলিতে লাগিল—প্রথমে মনকে কত প্রবোধ দিয়েছি, পাপপুণ্যের কথা ভেবেছি, হজরতের নাম স্মরণ ক'রে মনকে শক্ত করতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু কিছুতে মনটা বাগ মানেনি। আর তার প্রধান কারণটা কি জান?

আমি এবার আর ভরসা করিয়া "হ্যাঁ" কিম্বা "না" বলিতে পারিলাম না।

সে বলিল—শালিকানও যেন আমার সঙ্গে সঙ্গে ডুবছিল। খসমের খুব খিদ্‌মৎ করত, কিন্তু আমার দিকে এক একবার এমন ভাবে চাইত যাতে বেশ মালুম হ'ত যে যুবতী ডুব্‌ছে। বাল্‌তির আওয়াজ পেলে ভুখা ঘোড়া যেমন কান খাড়া করে, তার আওয়াজ পেলে আমিও তেমনি চমকে উঠ্‌তাম। আর সেও আমার আওয়াজে—

আবার দুর্ব্বুদ্ধি! আমি আবার অতর্কিতে বলিয়া ফেলিলাম—এই বাজখাঁই আওয়াজে!

সে বলিল—যতদিন বেঁচেছিলাম, আমার এমন আওয়াজ ছিল না। এখন ভূতের চেহারা, ভূতুড়ে আওয়াজ। যখন বেঁচেছিলাম, তখন লোকে আমার চেহারার তারিফ্ করত, গলার স্বরকে খুব মিষ্টি বল্‌ত।

আমি বলিলাম—মশায় কি সত্যই ওর নাম কি ?

সে বলিল—কেন, সন্দেহ আছে ? আমাকে কি মানুষ বলে ভ্রম হয় ?

আমি তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিলাম। বাস্তবিক সে সুপুরুষ, কিন্তু মুখটা একেবারে ভূতুড়ে। দেহটা মানুষের, মুখটা ভূতের। আমি বলিলাম —যাক্ সে কথা। মশায় বল্‌ছিলেন যে আপনার মিঠা আওয়াজ শুন্‌লে শালিকান বিবি—

সে বলিল—কান খাড়া ক'রে শুন্‌ত। পরদা ছিল, পরস্পরের সাক্ষাৎ কথা ছিল না। কিন্তু হৃদয়ে হৃদয়ে কথা ছিল। সে যে মাটির ওপর দিয়ে হাঁটত, মনে হত সে মাটিটায় গড়াগড়ি দি, তার সাড়ি জামা এমন কি চটির জুতা জোড়া দেখ্‌লে প্রাণে পুলক অনুভব করতাম। মনে হ'ত, আহা এ রত্ন যদি আমার হ'ত ? আবার করিম ভাইয়ের কথা মনে হ'ত। তাকে ভালবাসতাম। মনকে শত শত ভৎর্সনা করতাম, মনকে বল্‌তাম—'দিল্ তুই কাফের, তুই শয়তান, তুই কমিনা, তুই বদ্-বখ্‌ত্'। এই রকম করে দু'মাস মনের সঙ্গে দিনরাত লাঠালাঠি করেছি। একদিকে গভীর ভালবাসা, অপর দিকে ইমানদারী, তমীজ—

আমি আবার আত্মবিস্মৃত হইয়া বলিলাম - কি বল্‌লেন ? কানিজ ?

সে বলিল—তমীজ, আপনারা যাকে বলেন বিবেক। কিন্তু এই লড়াইটা কখন ভীষণ হ'ত জানেন ?

আমি সকল দিক বজায় রাখিবার জন্য বলিলাম—হুঁ !

সে বলিল—যখন মনে হ'ত ধর্ম্মাধর্ম্ম মিছে ; প্রকাশ্যে প্রেম জানাই, ওকে গোপনে নিয়ে পালাই। তখন মনের মধ্যে তুমুল লড়াই হ'ত। কিন্তু ধর্ম্ম-ভাব জয়ী হ'ত। মনে মনে স্থির করতাম—নিজের কষ্ট নিজে ভোগ করব। ওসব বেইমানী কর্‌ব না। পরস্ত্রীকে মনে মনে ভালবেসে নিজে মজেছি, জাহান্নমে যাবার নিজের রাস্তা সাফ্ ক'রে রেখেছি। যাকে ভালবাসি তাকে যদি হাত ধরে সেই পথে নিয়ে গেলাম ত ভালবাসা হল কৈ ? সে-টা শত্রুর কাজ— প্রেমিকের কাজ নয়।

আমি বলিলাম—সেটা ঠিক কথা। আপনি মহতের মতই কাজ করেছিলেন। প্রেমে পড়া মানুষের হাত না, কিন্তু চিত্তদমন—

সে বলিল—মাথামুণ্ডু চিত্তদমন। জলের বেগ একদিক দিয়ে চাপতে গেলে চাপা জল যেমন অপর দিকে ছুটে বেরোবার চেষ্টা করে, আমার তাই হ'ত।

প্রেমের একটা প্রধান দোষ কি জানেন—আশা। প্রেমিকের প্রাণে 'আশার লম্প' দিনরাত মিটিমিটি জ্বলছেই জ্বলছে!

'আশার লম্প'! যাক্ ভূতেদের ব্যাকরণ নিয়ে আর গোলযোগ কেন? আমি আবার ভালমানুষের মত বলিলাম—হুঁ।

সে বলিল—প্রেমিক যখন নিজেকে হতাশ প্রেমিক মনে করে তখনই বোধ হয় তার প্রাণে 'আশার লম্প' বেশী উজ্জ্বল ভাবে জ্বলে। সেই আশা যে পথ দেখিয়ে দিত সেই পথই আমার কাল হ'ল। আশা বলত—বেশ্ ত। মানুষের জীবন ত আর কারও হাত-ধরা নয়। এই ধরনা কাল্ তুমিই মরতে পার—আর না হয় ধরনা—অবশ্য খোদা না করুন, কিন্তু বলা ত যায় না। এই ধরনা—যদি করিম ভাই—

মানুষ-ভূত লজ্জায় আর বলিতে পারিল না। আমি বুঝিলাম যে তিনি ট্যাঁক্ করিতেন করিম ভাই কবে কবরে যাইবেন। ভীষণ "কামড়ান" ভালবাসা আর অপূর্ব্ব "আশার লম্প!" অনেক প্রেমিকের কথা নভেলে পড়িয়াছিলাম, কিন্তু এ বেটার মত পাষণ্ড প্রেমিক—

অপদেবতাটি অন্তর্য্যামী। সে বলিল—ভাবছেন বেটা পাষণ্ড ছিল। মন থেকে ভাবনাটাকে যত ঠেল্তাম ভাবনাটা যেন চেপে ধরত। করিম ভাই যখন উদার প্রাণে আমাকে সন্তুষ্ট করবার চেষ্টা করত, তখন বড় আত্মগ্লানি হ'ত। আহা বেচারা কত ভাল, আমি কত মন্দ। মনে মনে খোদার কাছে দোয়া চাইতাম—খোদা আমার করিম ভাইকে শতজীবী করুন। কিন্তু অসাক্ষাতে আবার সেই চিন্তা! সর্ব্বনাশী চিন্তা! শেষে ঠিক করলাম—কল্কাতা ছেড়ে দেশে যাব। আর করিম ভাইয়ের বাসায় থাকব না।

মানুষ-ভূত একটু স্থির হইল। ভূতেরাও ভূত দেখে! যেন ভূত দেখিতে দেখিতে গদগদস্বরে সে বলিল—আহা! সেই বিদায়ের দিন! আজও চোখের সামনে যেন জ্বলছে। করিম ভাই দোকানে ছিল। আমি আঙ্গিনায় দাঁড়িয়ে লজ্জার মাথা খেয়ে বল্লাম—'আজ বাড়ী যাব, কিন্তু চিরদিন এ যত্ন ভুলব না। করিম ভাই বাদসাজাদী পেয়েছে'। সে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল। গৃহে জন-প্রাণী ছিল না। সে আঁচল দিয়ে চোখ মুছছিল, আমিও খুব কাঁদলাম। শেষে বল্লাম—'এ জন্মে উপায় নেই, যদি খোদা'—কথাটা মুখে বাধল। সে ঘরের মধ্যে চলে গেল। ঘরে দাই ফিরে এল, আর দেখা হ'ল না। সে কেন কাঁদছিল সেটা জানা হ'ল না। আমার মত ভালবেসে না নারীস্বভাবে? আজও জানি না—ঠিক্ তার মনের ভাবটা কি? আমি বাড়ি এলেম কিন্তু—

আমি বলিলাম—মনটা সেইখানে রেখে এলেন ?

সে বলিল—তুমি বালক। সে খানটা মনের মধ্যে তুলে নিয়ে এলেম। সারাক্ষণই খেয়াল দেখতাম—এখন সে খানা পাকাচ্চে, এখন সে গোসল করছে, এখন সে কোঁকড়া চুলের রাশিটা মুখের উপর দিয়ে ঝুলিয়ে দিয়ে রোদ পোহাচ্চে—আহা! সেই কান্না! সেই হাসি! যখন কোন রসের কথা বল্‌তাম, রসের কথা শুন্‌তাম তখন ভাবতাম সে যদি কাছে থাকৃত। যখন মনে হত পোষাকটা বেশ হ'য়েছে, চেহারাটা বেশ দেখাচ্চে, তখনই একটি মাত্র দর্শকের অভাব বোধ করতাম।

আমি বুঝিলাম, ইহার নাম ভালবাসার কামড়। তাহার ভৌতিক বদন-গুলে যেন একটু মানুষিক ভাব বিকসিত হইতেছিল। সে নিজের মনে বলিতে লাগিল—এক একবার মনে হ'ত, হা আল্লা! করিম ভাই তো সুখে আছে ? অসুখ বিসুখ ত করে নি ? অমনি মনকে ধমক্ দিতাম।

মানুষ-ভূত একটু ক্ষান্ত হইল। আমি এবার আর কিছু বলিলাম না। সে বলিল—দু'মাস পরে পত্র এল যে করিম ভায়ার অসুখ করেছে। কষ্ট হ'ল কিন্তু ফাঁক পেলেই সেই চিন্তাটা উঁকি মারত। ব্যারাম সারবে ত? খবরের কাগজে যখন পড়তাম—কেউ জলে ডুবেছে, কেউ রেলে কাটা পড়েছে, কারও উপর ট্রাম গাড়ির তার ছিঁড়ে পড়েছে, তখন মনে হ'ত—'আহা! সে আমার করিম ভাই নয় ত?' কিন্তু সেই "আহা"র ভেতর শয়তানি থাকত, বুঝেছ ?

আমি বলিলাম—জলের মত।

সে বলিল—যাক মনের কথা। কিছুদিন পরে করিম ভাই ঘরে এল—শালিকান এল। কিন্তু আমাদের দু'জনেরই বাড়িতে অনেক ছেলেমেয়ে—তার দেখা পেতাম না, খবর পেতাম। করিম ভাইয়ের বাড়িটাকে মসজিদের মত পবিত্র মনে করতাম। পাকে প্রকারে করিম ভায়ের মুখে তার কথা শুনতাম। হাফিজের মুখে কোরাণ অত মিষ্ট লাগত না। কল্পনায় সে দিনরাত ভাসত—হুরীর মত। কখনও সুখ হ'ত কখনও গুমরে মরতাম। কিন্তু শেষে—

মানুষ-ভূত দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। সে একটু চুপ করিল। পূর্ব্বদিকে সোণার থালার মত অরুণদেব উঠিয়াছিলেন তবু ভূত পলাইল না। অন্ধকারের ভূতকে পার আছে, কিন্তু আলোর ভূতের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া দায়। তাহার "কামড়ান ভালবাসা"র মত তাহার "কামড়ান" আত্মকাহিনীর শেষটা না শুনিয়াও নড়িবার শক্তি ছিল না। সে আবার আরম্ভ করিল—একদিন বৈকালে করিম ভাইকে নিয়ে ঐ দিকের বাগানটায় গল্প করছিলাম। নানা কথা! মাঝে মাঝে

খুব ঘুরিয়ে এক আধটা তার কথা। হঠাৎ দেখলাম করিম ভায়ার পিছনে একটা গোখ্‌রো সাপ। হয়ত তাড়া দিলে সাপটা পালাত, হয়ত করিম ভাইকে ইসারা দিলে সে সাবধান হত। আমার মনে করিম ভায়ের জন্যে কষ্ট হ'ল। কিন্তু ধরে নিলাম সে সাপ্‌টা তাকে কাট্‌বে। সেই পাপ চিন্তাগুলা মনের ভয়টাকে ভোঁতা ক'রে দিয়েছিল, তার মৃত্যুটাও যেন পরিচিত ক'রে দিয়েছিল। মনে মনে আহা! আহা! বলিলাম, কিন্তু সাপটাকে তাড়াতে পারা যায় সে চিন্তা মনের মধ্যে এলই না। হা আল্লা! মানুষকে দিয়ে মানুষ খুন করাতে হয়। আমার চোখের সামনে সাপটা তাকে ছোবলালে—হা আল্লা!

আমি শিহরিয়া উঠিলাম। সে শিরে করাঘাত করিতে লাগিল। আমি বলিলাম—যদি তাকে বাঁচাবার কথা মনে হ'ত আর আপনি তাকে বাঁচাবার চেষ্টা না করতেন, তা'হ'লে কথা ছিল। ভগবানের ইচ্ছা সফল হ'য়েছে, এতে আত্মগ্লানি কি আছে?

সে বলিল—আত্মগ্লানি মুখস্থ করাটায়, অভ্যাস করাটায়, সে সর্ব্বনেশে কথাটাকে মনে আসতে দেওয়ায়। হায়! হায়! স্বার্থপর, কামুক, লোভী শয়তান অবাধে দেখলাম সরল ইমানদার ভাইকে সাপে কাট্‌লে, তার সাদাসিদে প্রাণটাকে ফারদৌসের পথে পাঠিয়ে দিলে, আর আমার জন্যে জাহান্নমের ফটক খুলে দিলে। আহা, ভাইরে! করিম। ছিঃ! ছিঃ!

এবার সে কাঁদিতে লাগিল। এবার তার আর ভূতুড়ে ভাবটা রহিল না। হাসি ও কান্না মানুষের মনুষ্যত্ব। তার অনুতাপের রোদনে আমার চোখে জল এল।

সে বলিল—বেল্লিক, বেকুব, ভালবেসেছিলাম! লোকের জান নিয়ে ভালবাসা! লোকের প্রাণ বাঁচাতে ভুল ক'রে তার বিবিকে নিকে করা! আহা, ভাইরে! খোদা! কি করলে খোদা!

লোকটা কাঁদিতেছিল, কাঁপিতেছিল। আমি তাহাকে বিরক্ত করিলাম না। সে আমার হাত ধরিল—মনে হইল তপ্ত হাত-কড়ি পরিলাম। সে বলিল—ঐ কবর, ঐ থানে আমার স্বর্গের ভাই আছে, আর আমি বেঁচে!

সে আমায় টানিয়া লইয়া গেল। শৃগাল শকুনি গৃধিনী পলাইয়া গেল। করিমের গোরের কাছে লইয়া গিয়া বলিল—তিন দিন হ'ল ভাই আমার এর মধ্যে শুয়েছে। ভাইরে!

সে নতজানু হইয়া কবরের পার্শ্বে বসিল। বলিল—খোদা কি তুচ্ছ রমণীর লোভ দেখিয়ে আমার প্রাণে সাপের বিষ চেলে দিলে আল্লা?

তাহার পর সে আরবী ভাষায় মন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিল। আমি ধীরে ধীরে নদীর চরের উপর দিয়া ফিরিলাম। পরদিন গ্রামে হুলস্থূল পড়িয়া গেল—তাহার সমস্ত বিষয় করিমের বিধবা পত্নীর নামে দান করিয়া—তারিফ খাঁ দেশত্যাগী হইয়াছে।

সাহিত্য-প্রসঙ্গ।

ভারতী, ভাদ্র। এ মাসের 'ভারতী'তে 'অভিভাষণ না অতিভাষণ' নামক একটী রচনা বাহির হইয়াছে। লেখকের নাম—'শ্রীনবকুমার কবিরত্ন'। রচনাটীর আরম্ভ এইরূপ :—

"সম্প্রতি বাঙ্গালা দেশের খেতাবী রাজা-মহারাজেরা একটু-আধটু কেতাবী কস্‌রৎ শুরু করেছেন। এ খুবই আহ্লাদের কথা। বর্ত্তমান যুগে কুলি-মজুরেরাও যখন আত্ম-প্রকাশের জন্যে ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছে, তখন হুজুরেরা যে হবেন তার আর বিচিত্র কি?"

মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র 'সাহিত্য-সভা'য় যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাতে কালাপাহাড়ী ভাষার দোষ দেখাইয়াছিলেন; এ ভাষা সাহিত্যের অমঙ্গলজনক এরূপ ভাবের কথা বলিয়াছিলেন। তাহাতেই নবকুমার মহারাজের উপর অভদ্র ভাবে গালিবর্ষণ করিয়াছেন। উপরে উদ্ধৃত আরম্ভটুকু দেখিয়াই পাঠক ইহা বুঝিতে পারিয়াছেন। আশা করি, মহারাজ নবকুমারের এই গালির আঁচড়কে উপেক্ষা করিবেন।

এই লেখক প্রবন্ধের স্থানে স্থানে মহারাজকে লক্ষ্য করিয়া যেরূপ ইতর ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা ভদ্রসমাজে যে কোনও দিন কেহ বলিতে পারে, এমন ধারণা আমাদের একেবারেই ছিল না। মণিলাল ও সৌরীন্দ্রের 'ভারতী'তে ভদ্র-ভাষার এই নমুনা দেখিয়া মেছোহাটাকেও লজ্জায় মাথা হেঁট করিতে হইবে। শুনিয়াছি, কলিকাতার ঠাকুর-পরিবার শিষ্টাচারের আদর্শ। 'ভারতী' সেই পরিবারের কাগজ। দুঃখের বিষয়, 'ভারতী' এত দিন পরে এই আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইয়াছে। 'ভারতী'তে এখনও ঠাকুর-পরিবারের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ লিখিয়া থাকেন। এদিকে সম্পাদক মণিলালও ঠাকুর-বাড়ীর ঘর-জামাই। অথচ জামাইয়ের হাতে পড়িয়া 'ভারতী'র যে দুর্দ্দশা হইতেছে, তাহাতে উহা যে শীঘ্রই ভদ্র-লোকের অপাঠ্য হইয়া উঠিবে, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

প্রবন্ধে ইতরামির চূড়ান্ত কেমন হইয়াছে, তাহার একটু নমুনা দিলাম :—

"গ্যালো-ব'শেখের 'সাহিত্য-সংহিতা'য় কাশিমবাজারের খেতাবী মহারাজের স্বাক্ষরে বে-কায়দা চিত্ত-বিক্ষেপের একটু অপূর্ব্ব নমুনা ছাপা হয়েছে। রচনাটীর নাম "সভাপতির অভিভাষণ"। তা' না হয়ে আনাড়ির অতিভাষণ হলেই ঠিক হত।"

যে বাঙ্গালী লেখক মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্রকে আনাড়ি বলিতে পারে, তাহার মস্তিষ্ক ও বুদ্ধির সহজ অবস্থা সম্বন্ধে দারুণ সন্দেহ হয়। ইহাতে আনাড়ি কে তাহা লোকে সহজেই বুঝিতে পারিবে। শুধু ইহাই নহে, বৈষ্ণব ধর্ম্মের উপরও কটাক্ষ আছে। মহারাজের বৈষ্ণব-প্রীতিরও নিন্দা করা হইয়াছে। এ সকল ইতর কথার আমরা কোনও জবাব দিব না। লেখক যদি ব্রাহ্ম হন, বা সে ধর্ম্মের উপরে যদি তাঁহার পুরুষানুক্রমিক অনুরাগ থাকে তাহা হইলে সেই ধর্ম্ম ধরিয়া ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিলে তাঁহার ও তাঁহার ব্রাহ্ম পৃষ্ঠপোষকদের কেমন লাগে? বৈষ্ণবের উপর কটাক্ষ কেন? মাসিক সাহিত্যকেও কি শেষে 'প্রেস-আইনে'র এলাকায় আনিতে চাও?

লেখক নবকুমার আর একস্থলে লিখিয়াছেন ঃ—

"মহারাজের উষ্মার প্রথম চোট্‌টা পড়েছে কল্‌কেতার একদল লেখকের উপর। এই লেখকেরা অকথ্য ভাষা ত্যাগ ক'রে কথ্য ভাষার বই লিখ্‌তে সুরু করেছেন—এই তাঁদের অপরাধ। তাঁদের ভাষা চল্‌তি ভাষা,—অচল নয়। যা আপনার তেজে চল্‌ছে এবং কোটি কোটি লোককে চালাচ্চে সেই চল্‌তি ভাষা। যে ভাষা পরমহংসের মানস-যজ্ঞের চরু ঘরে ঘরে বিতরণ করছে, যে ভাষা বিবেকানন্দের বীরবাণী শমীশাখার মতন আপনার বুকে অনায়াসে ধারণ করতে পেরেছে, যে ভাষা রবীন্দ্রনাথের স্পর্শে পারিজাতের ফুল ফুটিয়ে বিশ্বদেবতার চরণ বন্দনা করেছে, এ সেই চল্‌তি ভাষা। এই ভাষায় গিরিশচন্দ্র প্রমুখ নাট্যকারেরা শত শত নাটক রচনা করেছেন, আর সেই সকল নাটক পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর বঙ্গের জেলায়-জেলায় নগরে-নগরে গ্রামে-গ্রামে আজ অভিনয় হোচ্চে; কই কারো তো বুঝ্‌তে অসুবিধা হচ্চে না; বেশ মসগুল হয়েই সব শুন্‌ছে। এ ভাষা হাস্‌তে জানে হাসাতে জানে, তার সাক্ষী "হুতোম," তার সাক্ষী "বুড়ো শালিক," তার সাক্ষী "সধবার একাদশী"। এ ভাষা রং ফলাতে জানে, তার সাক্ষী "রাজকাহিনী," "ক্ষীরের পুতুল" "নালক"। এ ভাষা মন-গলাতে জানে তার সাক্ষী এক দিকে "ভাঙ্গা বাগান জোগান দেওয়া ভার" অন্য দিকে "মন হারালি কাজের গোড়া" "নাম রেখেছি হরিবোলা।" ইত্যাদি।

আত্ম-সমর্থনের কোনও উপায় না থাকিলে লোকে শেষে পরের সাহায্য লইতে ছুটে। এই নিরুপায় লেখকেরও দেখিতেছি সেইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে। কালাপাহাড়ী 'কথ্য' ভাষার লেখকদের দলে ইনি বাঙ্গালার নমস্য ব্যক্তিগণকে টানিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু গায়ের জোরে ত এ সব কাজ হয় না; যুক্তি চাই। আশ্চর্য্যের বিষয়, তাঁহার পূর্ব্বোদ্ধৃত রচনায় যুক্তির নাম-গন্ধ নাই।

ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সাহিত্যের জন্য তাঁহার উপদেশমালা রচনা করিয়া যান নাই। তিনি মুখে মুখে সহজ সরল ভাষায় কথোপকথন-উপলক্ষে শিষ্যদিগকে যে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, তাহাই ঠিক তাঁহার কথার আকারেই তাঁহার শিষ্যেরা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করিয়াছেন। বঙ্গবাসীমাত্রেই তাঁহার এ উপদেশ বুঝিতে পারেন। কারণ, ইহা সাধকের মুখ-নিঃসৃত বাণী। ধর্ম্মপ্রাণ বাঙ্গালীর প্রাণের কথা। যে হিসাবে রামপ্রসাদের গান সমগ্র বাঙ্গালীর নিজস্ব সামগ্রী, সেই হিসাবে ভগবান রামকৃষ্ণের উক্তিও সমগ্র বাঙ্গালী জাতির সনাতন সম্পত্তি। বিবেকানন্দের "বীরবাণী" 'কথ্য' ভাষায় লিখিত নহে। তবে তাঁহার অনেক বক্তৃতা ও পত্রাদি 'কথ্য' ভাষায় লিখিত বটে। কিন্তু 'কথ্য' হইলেও তাহা কালাপাহাড়ী 'কথ্য' ভাষার মত 'পেঁচালো' ইংরেজী বোট্‌কা গন্ধযুক্ত নহে। বিবেকানন্দের ভাষা—খাঁটী বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর ভাষা। ইহা সহজ, সরল ও সতেজ; এরূপ সহজ সরল ভাষা বাঙ্গালা দেশের সকল স্থানের লোকেই বুঝিয়া থাকে এবং এ পর্য্যন্ত তাঁহার ভাষার বিরুদ্ধে কেহ কোনও দিন কোনও রূপ প্রতিবাদ করে নাই।

রবীন্দ্রনাথের স্পর্শে 'কথ্য' ভাষা—কালাপাহাড়ী 'কথ্য' ভাষা 'পারিজাতের ফুল' ফুটাইয়াছে,—লেখক নবকুমার এই কথা বলিয়াছেন। কিন্তু সে ফুল কি 'পারিজাতে'র ?—যাঁহারা বাঙ্গালা সাহিত্যের গতি-প্রকৃতির আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা এ কথা একেবারেই স্বীকার করিবেন না। তাঁহারা

বরং 'উল্টা'ই বলিবেন। রবীন্দ্রনাথই ত এই কালাপাহাড়ী 'কথ্য' ভাষার সৃষ্টিকর্ত্তা। ইহা বাঙ্গালার সাহিত্য-কুঞ্জ 'ঘেঁটু' ফুলে পূর্ণ করিয়াছে। অতি-ভক্তিতে লোকের দৃষ্টি বিভ্রম হয়; সেই জন্য ভক্তাধিক ভক্ত লেখক ঘেঁটু-বনকে পারিজাত বলিয়াছেন।

নাটকের ভাষা পাত্র-পাত্রীভেদে রূপান্তরিত হয়। সেই জন্য নাটকে পূর্ব্ববঙ্গের কৃষকের ভাষাও যেমন থাকে, মেদিনীপুরের মাঝির ভাষাও তেমনই থাকে। আবার সাধকের কথা, পণ্ডিতের সমাস-বহুল ভাষা, ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত নাগরিকদিগের উচ্চাঙ্গের ভাষাও নাটকে থাকে। কাজেই নাটকের অভিনয় প্রায় সকল লোকেই বুঝিতে পারে। গিরিশচন্দ্র বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ নাট্যকার। সুতরাং তাঁহার নাটকে এ গুণ যথেষ্ট পরিমাণেই আছে। তাঁহার নাটক বাঙ্গালার গৌরব, বাঙ্গালীর গৌরব, বঙ্গভাষার গৌরব। কাজেই বাঙ্গালা দেশের উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব্ব-পশ্চিম সকল অংশেই তাঁহার নাটক অভিনীত হয়, এবং লোকে তাহা বুঝিতে পারে। ইহার সহিত কালাপাহাড়ী ফিরিঙ্গী 'কথ্য' ভাষার তুলনা করা ঘোর মূর্খতা।

'হুতোম হাস্‌তে জানে, হাসাতে জানে' বটে; কিন্তু 'হুতোমে'র ভাষা খাস কলিকাতার ভাষা। কলিকাতার বাহিরে 'হুতোমী' ও 'আলালী' ভাষার প্রভাব নাই। অথচ কালাপাহাড়ী 'কথ্য' ভাষা অপেক্ষা 'হুতোমে'র ভাষা অনেক সরল ও সহজ। সেই 'হুতোমী' ভাষারই প্রভাব যখন নষ্ট হইয়াছে, তখন 'কথ্য' ভাষার গতি কি হইবে, তাহা অনুমানেই বুঝা যায়।

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কথ্য' ভাষা কেমন, তাহার নমুনা একবার 'অর্চ্চনা'র পাঠকবর্গকে দিয়াছি। তাঁহার 'রাজকাহিনী' 'ক্ষীরের পুতুল' ও 'নালকে'র ভাষা সেই নমুনাকেও অতিক্রম করিয়াছে। লেখক নবকুমার বলিতেছেন,—'এ ভাষা রং ফলাইতে জানে'—কালাপাহাড়ী মতে জানিতে পারে; কিন্তু বড় 'ধ্যাব্‌ড়া'। আমরা শপথ করিয়া বলিতে পারি, বাঙ্গালার জনসাধারণ ও বহু শিক্ষিত ব্যক্তি অবনীন্দ্রনাথের এ রং-ফলান ভাষা বুঝিতে পারেন না।

কালাপাহাড়ী দলের গুরু ও শিষ্যদল যে 'কথ্য' ভাষায় আজিকালি মনের ভাব প্রকাশ করিতেছেন, তাহার অক্ষরগুলি বাঙ্গালা বটে; কিন্তু ভাব-প্রকাশের প্রণালী বাঙ্গালা নহে। উহাতে পৌনে ষোল আনারও বেশী ইংরেজীর ছাপ আছে। উহার ছাঁচ ইংরেজী, ধাঁচ ইংরেজী, আদব-কায়দা ইংরেজী, উহার সর্ব্বাঙ্গে ইংরেজীয়ানার ছাপ। ইংরেজী কায়দার অনুকরণ ভিন্ন এ ভাষা আর কিছু জানে না, ইংরেজীই ইহার—'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। যে রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বেকার ভাষা বাঙ্গালা সাহিত্যের অঙ্গে কৌস্তভমণির মত বিরাজ করিতেছে, যে ভাষা অল্প দিনেই বাঙ্গালার সাহিত্যরসিকগণের আদরের বস্তু হইয়াছিল, যাহার প্রশংসা করিতে তাঁহার অতি-বড় শত্রুও পঞ্চমুখ, প্রতিভার বরপুত্র সেই রবীন্দ্রনাথের আধুনিক কালাপাহাড়ী ভাষা এত দিনেও

বাঙ্গালী পাঠক-সাধারণের মনোরঞ্জন করিতে পারিল না! রবীন্দ্রনাথ হুঙ্কার করিলেও যাহারা সৌরভে দিগন্ত আমোদিত হইতে দেখে, তিনি হাই তুলিলে যাহারা তালে বেতালে তুড়ি দেয়, তাঁহার ভাল-মন্দ সকল রচনারই যাহারা প্রশংসা করিয়া থাকে, তাহারাই কেবল রবীন্দ্রনাথের কালাপাহাড়ী 'কথ্য' ভাষার সমর্থক। ইহাতেই এ ভাষার নিষ্ফলতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়।

সাহিত্য-সমাচার।

বঙ্গীয় খৃষ্টিয় সমাজ-সম্মিলনীর মাসিক পত্রিকা 'সম্মিলনী'র আশ্বিন সংখ্যায় শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের "প্রাচীন ভারতের স্মৃতি" শীর্ষক প্রবন্ধটি অতি মনোরম ও শিক্ষাপ্রদ হইয়াছে। ঘোষ মহাশয় নিষ্ঠাবান সাহিত্য সেবক, মাতৃভাষা ও জন্মভূমির ভক্ত উপাসক। তাঁহার প্রবন্ধটি এত কৌতূহলোদ্দীপক যে, আমরা এস্থলে তাহার কতক অংশ উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। উদ্ধৃত অংশটুকু বড় উপাদেয়।

"বোধ হয় অনেকে অবগত আছেন, কয়েক শত বর্ষ হইল ইতালীয় পণ্ডিত কোপরনিকস্ এবং তাঁহার পথাবলম্বী গেলিলিয়ো পৃথিবীর বর্ত্তুলত্ব এবং তাহার গতিশীলতা আবিষ্কার করিয়া পাশ্চাত্য জগতের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া রোমীয় ধর্ম্মযাজকদের দ্বারা নিগৃহীত হইয়াছিলেন। অনেকে মনে করেন, আমরা পাশ্চাত্যদিগের অনুগ্রহেই এই বৈজ্ঞানিক সত্যটি অবগত হইয়াছি; কিন্তু তাহা ভ্রম। ভারতে কোন বিদেশী আগমন করিবার বহু পূর্ব্বে, পৃথিবী যে গোল ও তাহা চলৎ ভারতবাসীরা অবগত ছিলেন; যথা জ্যোতিষী সূর্য্যসিদ্ধান্ত ভূগোলাধ্যায়ে লিখিয়াছেন :—

ব্রহ্মাণ্ডমেতৎ সুষিরং তত্রেদং ভূর্ভুবাদিকম্
কটাহদ্বিতয়স্যেব সম্পুটং গোলকাকৃতি।

অর্থাৎ দুইটা কড়া উপর উপর রাখিলে যেমন হয়, পৃথিবী তদ্রূপ গোল, এবং ইহার পৃষ্ঠে ভূ ভূবঃ এবং স্বঃ প্রভৃতি চতুর্দ্দশ ভুবন অবস্থিত। প্রাচীন ভারতীয়েরা পৃথিবীকে চতুর্দ্দশ ভুবন বা দেশে বিভক্ত করিতেন; সাতটি এক দিকে এবং অপর সাতটি তাহার অন্যদিকে পাতালে অর্থাৎ আমেরিকার দিকে। আবার সূর্য্যসিদ্ধান্ত বলিয়াছেন :—

সর্ব্বতঃ পর্ব্বতারাম গ্রাম চৈত্য চয়ৈশ্চিতঃ
কদম্ব কেশর গ্রন্থি কেশর প্রসরৈরিব।

অর্থাৎ যেমন কদম্ব পুষ্প কেশর সমূহে বেষ্টিত, পৃথিবীও তদ্রূপ তাহার উপর পর্ব্বত, গ্রাম, নদ, নদী, বৃক্ষাদি দ্বারা বেষ্টিত। এই দৃষ্টান্তের সহিত পাশ্চাত্যদের কমলা লেবুর তুলনা করিয়া দেখুন, কোনটি পৃথিবীর আকারাদির উৎকৃষ্ট পরিচায়ক।

আবার নক্ষত্রকল্পে লিখিত আছে :—

কপিত্থ ফলবদ্বিশং দক্ষিণোত্তরয়োসমং।

অর্থাৎ পৃথিবী কৎ বেলের ন্যায় গোল এবং তাহা উত্তর ও দক্ষিণে চাপা। কেবল ইহা নহে, যাহাতে শিক্ষার্থী সম্যক্ বুঝিতে পারিবে, তাহার সৌকর্য্যার্থে লিখিত আছে :—

অভীষ্টং পৃথিবী গোলং কারয়িত্বা তু দারবং
তদ্বং খগোলকং কৃত্বা গুরু শিষ্যান্ প্রবোধয়েৎ।

অর্থাৎ গুরু কাষ্ঠের গোলা নির্ম্মাণ করিয়া, পৃথিবী এবং আকাশমণ্ডল শিষ্যকে বুঝাইয়া দিবেন। ইহা হইতে পাঠকের প্রতীত হইবে যে, আমরা এখন বিদ্যালয়ে যে গোলক বা globe দেখিতে পাই, পৃথিবীর গোলত্ব বুঝাইবার জন্য তাহা প্রাচীন হিন্দুরা নির্ম্মাণ করিতেন। আবার পৃথিবী যে স্থির নহে এবং তাহা গতিশীল, যাহা পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা সে দিন অবগত হইয়াছেন এবং যৎসম্বন্ধে অনেকে মনে করেন, আমরা তাহা ইয়ুরোপীয়নদের হইতেই জানিয়াছি, তাহাও ভ্রম। ইতালীয় জ্যোতিষী কোপরনিকস্ কেন, গ্রীক জ্যোতিষীরা জন্মাইবার পূর্ব্বেও ভারতের জ্যোতিষী আর্য্যভট্ট লিখিয়াছিলেন, যথা :—

চলা পৃথ্বী স্থিরা ভাতি।

অর্থাৎ পৃথিবী স্থির মনে হইলেও তাহা ভ্রমণশীল। আবার পৃথিবীর যে, কোন আধার বা অবলম্বন নাই, শূন্যে অবস্থিত এবং তাহা আপনার শক্তিতেই তদ্রূপ অবস্থান করিতেছে, তাহাও প্রাচীন হিন্দুদের অভিজ্ঞাত ছিল, যথা আর্য্যভট্ট ভুবন-কোষে লিখিয়াছেন :—

বসুধা নান্যাধারা
তিষ্ঠতি গগনে স্ব শক্তৈব।

আবার ভাস্করাচার্য্য বলিয়াছেন :—

নান্যাধারং স্বশক্ত্যা বিয়তিচ নিয়তং তিষ্ঠতীহাস্য পৃষ্ঠে।

আবার সূর্য্য সিদ্ধান্ত আরও গভীর-গামী হইয়া পৃথিবীর নিরলম্বনে ঝুলিবার কারণ অবধারণ করিয়া বলেন :—

বিভ্রাণঃ পরমাং শক্তিং
ব্রহ্মণো ধারণাত্মিকাম্।

অর্থাৎ এই বর্ত্তুলাকার পৃথিবী পরমেশ্বরের প্রদত্ত শক্তিতেই শূন্যে অবস্থান করিতেছে। ইঁহার কি তাত্ত্বিক জ্ঞান, যদ্দ্বারা ইনি পৃথিবীর শক্তিকে সেই আদ্যা শক্তি ঈশ্বরেই নির্দ্দেশ করেন।

আবার আর্য্যভট্ট শূন্যে নক্ষত্রমণ্ডলে পৃথিবীর গতি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

ভপঞ্জরঃ স্থিরো ভূরেবা বৃত্ত্যাবৃত্য প্রতিদৈবসিকৌ,
উদয়াস্তময়ৌ সম্পাদয়তি নক্ষত্রগ্রহাণাম্।

অর্থাৎ নক্ষত্রমণ্ডল, রাশিচক্র বা Zodiac স্থির রহিয়াছে, কিন্তু পৃথিবী বারংবার আবৃত্তি দ্বারা নক্ষত্র ও গ্রহদিগের প্রতি দিবসে উদয় ও অস্ত সম্পাদন করিতেছে।

North Poleর দিকে যে সূর্য্যোদয় হয় না, তাহাও প্রাচীন হিন্দুদিগের জানা ছিল। যথা রামায়ণে আছে, সুগ্রীব তাঁহার বানর সৈন্যদিগকে বলিতেছেন :—

ন কথঞ্চ গন্তব্যং কুরূণামুত্তরেণ বঃ।
অভাস্কর মমর্য্যাদং ন জানিম স্ততঃ পরম্॥

অর্থাৎ হে বানর সৈন্যগণ, তোমরা উত্তর কুরুর (North Siberiaর) উত্তর দিকে যাইও না, সেখানে সূর্য্যের উদয় হয় না, তাহার সীমাও আমরা অবগত নহি।

Sir Isaac Newton জগতের একটি মহাপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার মাধ্যাকর্ষণ শক্তির সম্বন্ধে আবিষ্কার তাঁহাকে লোকমধ্যে চিরকাল স্মরণীয় করিয়া রাখিবে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা কি বিস্ময়কর নহে, তাঁহার বহু পূর্ব্বে প্রাচীন ভারতে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির নিয়ম বিদিত ছিল? যথা ভাস্করাচার্য্য গোলাধ্যায়ে লিখিয়াছেন :—

আকৃষ্টশক্তিশ্চ মহী যৎ তয়া প্রক্ষিপ্যতে
তৎ তয়া ধার্য্যতে।

অর্থাৎ এই পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তি আছে, যেহেতু যাহা প্রক্ষিপ্ত হয়, তাহা আকর্ষণ শক্তি দ্বারা পৃথিবী ধারণ করে।

সূর্য্য ও চন্দ্র গ্রহণ যে পৃথিবীর ছায়াপাতে হইয়া থাকে, তাহা প্রাচীন ভারত বিদিত ছিল। যথা ব্রহ্মপুরাণে লিখিত আছে :—

পর্ব্বকালেতু সম্প্রাপ্তে চন্দ্রার্কৌ ছাদয়িষ্যসি।
ভূমি ছায়া গতশ্চন্দ্রং চন্দ্রগোঽর্কং কদাচন ॥

অর্থাৎ পর্ব্বকালে, আমাবস্যা ও পূর্ণিমার সময়ে, পৃথিবী ভূমি চন্দ্র এবং সূর্য্যকে আচ্ছাদন করিবে।

চন্দ্রের প্রভাবে যে সমুদ্রে জোয়ার ভাঁটা হয়, তাহাও প্রাচীন হিন্দুদিগের পরিজ্ঞাত ছিল। যথা বিষ্ণুপুরাণে :—

স্থালীস্থমগ্নি সংযোগাৎ দত্রকি সলিলং যথা।
তথেন্দুবৃদ্ধৌ সলিলসম্ভোধৌ মুনিসত্তমাঃ ॥
নন্যানা নাতিরিক্তাশ্চ বদ্ধত্যাপো হ্রসন্তিচ।
উদয়াস্তমনেষিন্দোঃ পক্ষয়োঃ শুক্ল কৃষ্ণয়োঃ ॥
দশোত্তরাণি পঞ্চৈব অঙ্গুলানাং শতানি বৈ।
অপাংবৃদ্ধিক্ষয়ৌ দৃষ্টৌ সামুদ্রিণাং মহামুনি ॥

অর্থাৎ যেমন হাঁড়িতে জল ঢাকা দিয়া অগ্নিতাপ দিলে তাহা স্ফীত হইয়া উঠে, জল বস্তুতঃ বাড়ে না বা ক্ষয় হয় না ; সেইরূপ শুক্ল ও কৃষ্ণ পক্ষে চন্দ্রকলার হ্রাস বৃদ্ধির সহিত সমুদ্র জলের ৫১০ অঙ্গুলি পর্য্যন্ত হ্রাস বৃদ্ধি দৃষ্ট হয়।

পৃথিবীর সকল দেশেই যে কখন এক সময় নহে, তাহাদের অবস্থান অনুসারে তাহার বিভিন্নতা ঘটিয়া থাকে, অর্থাৎ যখন এক দেশে সূর্য্যোদয় হইবে, তখন অন্য দেশে সূর্য্যাস্তমন, তাহা প্রাচীন ভারতীয় পণ্ডিতেরা জ্যোতিষের দ্বারা গণনা করিয়া অবগত হইয়াছিলেন। যথা সিদ্ধান্ত শিরোমণির গোলাধ্যায়ে লিখিত আছে :—

লঙ্কাপুরেঽর্কস্য যদোদয় স্যাৎ,
তদা দিনার্দ্ধং যমকোটি পূর্য্যাম্।
অধস্তদা সিদ্ধপুরেঽস্তকালঃ,
স্যাদ্রোমকে রাত্রিদলং তদৈব।

অর্থাৎ লঙ্কায় যখন সূর্য্যোদয়, তখন যমকোটিপুরে অর্থাৎ চীনের পশ্চিমাংশে বেলা দ্বিপ্রহর, তখন সিদ্ধপুরে অর্থাৎ উত্তর কুরুতে বা সাইবিরীয়াতে সন্ধ্যা এবং তখন রোমে রাত্রি। এই গেল পরস্পর উত্তর দক্ষিণ স্থিত দেশদের কালভেদের কথা। আবার পূর্ব্ব পশ্চিমস্থিত দেশদের কালভেদের কথা লিখিত হইতেছে :—

ভদ্রাশ্বোপরিগঃ সূর্য্যো ভারতেঽভ্যোদয়ং রবেঃ।
রাত্র্যর্দ্ধং কেতুমালাখ্যে কুরবেঽস্তমনং তদা ॥

অর্থাৎ যখন চীনে বেলা দ্বিপ্রহর, তখন ভারতে সূর্য্যোদয় ; এবং যখন তুরস্ক পারস্য ও আফগানিস্থানে অর্দ্ধ রাত্রি, তখন উত্তর সাইবিরীয়ায় সূর্য্যাস্তমন। আবার বৎসরের মধ্যে কখন দিন রাত্রি সমান হয়, তাহা Ptolemy জন্মাইবার পূর্ব্বে প্রাচীন হিন্দু পণ্ডিতদের দ্বারা নিরূপিত হইত।

অৰ্চ্চনা, ১৩শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা।

অদৃষ্ট।

[লেখক—শ্রীপ্রভাকর কাব্যস্মৃতিমীমাংসাতীর্থ)

আমরা হিন্দু। সর্ব্ব বিষয়েই আমরা অদৃষ্টের বিধেয়ত্ব স্বীকার করিয়া থাকি। কার্য্যের সাফল্য অসাফল্য উভয় বিষয়ই অদৃষ্টসাপেক্ষ বলিয়া থাকি। এখন এই অদৃষ্ট কি, কেনই বা আমরা প্রতি কার্য্যে অদৃষ্টের প্রাধান্য স্বীকার করি, তাহা বোধ হয় অনেকেই জ্ঞাত নহেন। বাস্তবিক অদৃষ্ট-তত্ত্বটী যেন একটী প্রহেলিকা-মগ্ন বস্তু। উহা যেন দুর্জ্ঞেয় আবরণে আবরিত হইয়াছে। যাহা হউক, অদৃষ্ট-তত্ত্বটী গূঢ় হইলেও আমাদের পূর্ব্বতন মনীষিবৃন্দ, অসাধারণ প্রজ্ঞাবলে দর্শন-শাস্ত্রসমূহে ঐ বিষয়টী যতদূর সম্ভব পরিস্ফুট করিয়া গিয়াছেন।

আমরা প্রতিনিয়ত যে সকল কার্য্য করিতেছি, তৎসমুদায় প্রণিধান করিলে দেখিতে পাই, জগতে দুইটী শক্তি বিদ্যমান আছে। একটী অদৃষ্ট, অপরটী দৃষ্ট। দৈব ও পৌরুষ ইহাদের অপর নাম। এই দুই শক্তি কখনও সমষ্টি ও কখনও ব্যষ্টিভাবে কার্য্যসাধন করিয়া থাকে। কোনও কোনও দার্শনিকের মতে এই শক্তির ব্যষ্টি অর্থাৎ পৃথক ভাবে কার্য্য করিবার শক্তি নাই। তাঁহারা বলেন, যেমন বিহঙ্গমগণ তাহাদের উভয় পক্ষের সাহায্যেই আকাশমার্গে গমন করিয়া থাকে, যেমন কৃষি ও বৃষ্টি মিলিত হইয়া শস্য সকল উৎপন্ন হয়, যেমন অক্ষক্রীড়ায় ক্রীড়কের দক্ষতা ও অক্ষে অনুকূল পতন এতদুভয় জয়ের কারণ, তদ্রূপ দৈব ও পৌরুষ উভয়ে মিলিত হইয়া কার্য্যসাধন করিয়া থাকে। অন্যান্য দার্শনিকগণ আবার বলিয়া থাকেন,—অত্যুৎকট অর্থাৎ প্রবল অদৃষ্ট ও দৃষ্ট অপর কোনও কিছুর অপেক্ষা না করিয়াই কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। যখন কোনও স্তনন্ধয় শিশুকে দত্তকাদিরূপে অতুল সম্পত্তির অধিকারী হইতে দেখা যায়, তখনই পৌরুষ-নিরপেক্ষ দৈবের কার্য্যকারিণী শক্তি অনুভব করি। পক্ষান্তরে কোনও দুর্দ্দান্ত দস্যুকে যখন স্বীয় বাহুবলে সমুদয় বাধা ভিন্ন করিয়া প্রভূত ধনের অধিকারী হইতে দেখি, তখন দৈব-নিরপেক্ষ পৌরুষের কার্য্য প্রত্যক্ষ করি। এই ভাবে দৈব ও পৌরুষ এই উভয় শক্তি সংস্থাপিত হইলেও চার্ব্বাক-মতানুসারী নাস্তিক্যবাদিগণ অদৃষ্ট-শক্তি আদৌ স্বীকার করেন না।

তাঁহারা বলেন, যাহা অ-দৃষ্ট, অর্থাৎ যাহা কখনই দেখা যায় নাই অর্থাৎ কোনও প্রমাণবলে যাহা সংস্থাপিত হইতে পারে না, সেই অত্যদ্ভুত শক্তি যদি আমাদের ইষ্টানিষ্টের বিধাতা হইতে পারে, এবং ঐ অদৃষ্ট,অশ্রুতপূর্ব্ব শক্তির আনুকূল্যার্থ যদি যোগদান ও হোমাদি কার্য্যের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে ইহাও প্রবল আশঙ্কার বিষয় হইতে পারে যে—'আকাশ-কুসুম' নামক যে পুষ্পবৃক্ষ নিরন্তর অন্তরীক্ষে বিরাজমান আছে, তাহার সুবৃহৎ শাখাসমূহ, কোনও দিন প্রবলপ্রভঞ্জনবেগে অথবা অন্য কোনও কারণে ভগ্ন হইয়া আমাদের মস্তকে নিপতিত হইয়া আমাদের মৃত্যু আনয়ন করিতে পারে। যেমন কেহ ঐ কল্পিত গগন-কুসুম-বৃক্ষের শাখা-পতন জন্য ভয়ে ভীত হয় না, তদ্রূপ কাহারও এই ভণ্ড, ধূর্ত্ত ও নিশাচর-কল্পিত, এই 'অদৃষ্ট'-ভয়ে ভীত না হওয়াই উচিত; এবং তজ্জন্য যাগাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান একান্ত নিষ্প্রয়োজন। এরূপ কার্য্যের সহিত উন্মত্তানুষ্ঠিত কার্য্যের কোনও প্রভেদ নাই। ইহাই হইল স্থূলতঃ নাস্তিক্যবাদিগণের অদৃষ্ট-নিরাশের যুক্তি।

এই মত-খণ্ডন জন্য আস্তিক্যমতাবলম্বী দার্শনিকগণ নিম্নলিখিত যুক্তিজাল বিস্তার করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন,—এই যে জগৎময় মনুষ্য, গো, অশ্ব, হস্তী, বিবিধ কীটপতঙ্গ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রাণিজাত, তথা বৃক্ষ, লতা, গুল্ম প্রভৃতি উদ্ভিদ্‌বর্গ এবং উপল, পর্ব্বতাদি স্থাবরসমূহ আমরা নিরন্তর নয়নগোচর করিয়া থাকি, এই সকলের আবির্ভাবের কারণ কি? কোন্ দৃষ্ট প্রয়োজন-সংসাধনার্থ উহারা পরস্পর এরূপ বিভিন্নভাবে আবির্ভূত হইয়াছে? জনশূন্য নিবিড় অরণ্য মধ্যে পুষ্পসকল প্রস্ফুটিত হইয়া সৌরভ বিকীর্ণ করিয়া কোন্ দৃষ্ট প্রয়োজন সংসাধন করিতেছে? কেনই বা তুমি ও আমি একই সূর্য্যের উত্তাপে, একই বায়ুর শ্বাস-প্রশ্বাসে, একই মেঘোদ্ভব বারি পান করিয়া এইরূপ বিভিন্ন প্রকৃতিসম্পন্ন হইয়াছি? একই পিতার ঔরসে, একই মাতার গর্ভে জন্মিয়া কেহ বা মূর্খ কেহ বা পণ্ডিত, কেহ বা জন্মান্ধ কেহ বা চক্ষুষ্মান্, কেহ বা পঙ্গু প্রভৃতি হইতেছে,ইহার দৃষ্ট কারণ কি? ইহা দ্বারা কি পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত অদৃষ্টাপর নাম কর্ম্মফল-প্রভাব প্রত্যক্ষ হয় না? আর এক কথা, যদিও ইহার নাম 'অদৃষ্ট', যদিও ইহাকে গো, অশ্ব, রাম, শ্যামাদির ন্যায় সাধারণ দৃষ্টিশক্তি দ্বারা নয়নগোচর হয় না, তথাপি ইহা প্রণিধানগম্য, এবং অনুমানাদি প্রমাণবলে ইহার অস্তিত্ব সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠিত। যে অদৃষ্টবলে জাতমাত্র বালক স্তন্যপান দ্বারা নিজের ভোগায়তন দেহ পরিরক্ষা করে, সদ্যোজাত শিশু অরণ্যে পরিত্যক্ত হইয়াও যাহার প্রভাবে প্রতিপালিত হয়, যাহার সতর্কতায় সদ্যোজাত ভুজঙ্গশিশু সন্তানভক্ষণপরায়ণা ভুজঙ্গিনীর

কবল হইতে দ্রুত মুক্ত হইতে পারে, নাস্তিক্যবাদিগণের একমাত্র অবলম্বন 'স্বভাব পক্ষ' এই সকল দুরুচ্ছেদ তর্কদ্বারা একেবারে বিধ্বস্ত হইয়া যায় এবং পরপর কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে শেষে কোনও না কোনও স্থানে নাস্তিক্য মতানুসরণকারিগণকে স্বীয় অজ্ঞত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। যাহাকে তাঁহারা বুঝিতে পারেন না, আমরা তাহাকেই সর্ব্বকর্ম্মসমর্থ অদৃষ্ট বলি। অদৃষ্ট-শক্তি প্রভাবে রবি, শশী, গ্রহ, তারা নিরবলম্ব আকাশ-পথে নিরন্তর ভীম-বেগে পরিভ্রমণ করিতেছে। তুমি, আমি, রাম, শ্যাম, পশু, পক্ষী, কীটপতঙ্গ প্রভৃতি অনাদি কাল হইতে বাসনার্জ্জিত অদৃষ্ট জন্যই উৎপন্ন হইয়াছি। আবার অদৃষ্টপ্রভাবেই আমরা একদিন প্রলীন হইয়া যাইব। এই মহাশক্তিশালী অদৃষ্ট অস্বীকার করিলে জগৎ বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়। তাই আমরা সর্ব্বদা অদৃষ্ট-প্রাধান্য স্বীকার করি।

সঙ্কট।*

[লেখক—শ্রীঅম্বুজাক্ষ সরকার, এম্-এ, বি-এল্]

(১)

রহস্যোদ্ঘাটন।

১২২২ খৃষ্টাব্দ। নিস্তব্ধ রজনীর গাঢ় অন্ধকাররাশি ভেদ করিয়া প্রাচীন ক্লুগেনষ্টাইন ক্যাসেলের উচ্চতলস্থিত এক প্রকোষ্ঠ হইতে একটি ক্ষীণ আলোক-রেখা বাহির হইতেছিল। প্রকোষ্ঠটী গুপ্ত মন্ত্রণাগার। সেখানে বৃদ্ধ লর্ড ক্লুগেনষ্টাইন একটা চেয়ারে বসিয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মৃদুস্বরে তিনি বলিলেন, "কনরাড!"

প্রকোষ্ঠে একজন সুন্দর যুবক বসিয়াছিলেন। তাঁহার শরীর নাইটের আভরণে সমলঙ্কৃত। তিনি বলিলেন, "আদেশ করুন পিতা।"

"যে গভীর রহস্য তোমার জীবনকে এতদিন আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে, আজ তাহা উদ্ঘাটিত করিবার সময় আসিয়াছে। তুমি জান, আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উলরিক ব্রাণ্ডেনবার্গের বর্ত্তমান স্বাধীন ডিউক। পিতার মৃত্যুকালে তিনি এইরূপ আদেশ করিয়া যান যে, উলরিক অপুত্রক হইলে এবং আমার পুত্র জন্মিলে

---

* Mark Twain এর An Awful, Terrible, Mediæval Romance-অবলম্বনে।

ব্রাণ্ডেনবার্গ-রাজ্য আমার বংশে আসিবে। যদি উভয়েরই পুত্রসন্তান না জন্মিয়া কন্যা হয়, তাহা হইলে উলরিকের কন্যা সচ্চরিত্রা হইলে ব্রাণ্ডেনবার্গের সিংহাসনে অধিষ্ঠিতা হইবে; সে অসচ্চরিত্রা হইলে এবং আমার কন্যা সর্ব্বতোভাবে সুচরিত্রা হইলে আমার কন্যাই রাজ্যভার পাইবে। পিতার মৃত্যুর পর হইতে আমি ও তোমার গর্ভধারিণী ভগবানের নিকট পুত্র-কামনা করিয়া নিয়ত প্রার্থনা করিয়াছি, কিন্তু আমাদের সে কামনা পূর্ণ হয় নাই। পুত্র না হইয়া যখন তুমি ভূমিষ্ঠ হইলে তখন আমি নিতান্ত হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলাম; উচ্চমর্য্যাদার অমিত গৌরব আমার বংশকে মণ্ডিত করিবে বলিয়া আমি যে আশা এত দিন হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছিলাম, তাহা বুঝি চিরকালের মত নিষ্ফল হইয়া গেল! আমি কত আশাই না করিয়াছিলাম! উলরিক পাঁচ বৎসর যাবৎ বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু তখনও তাঁহার কোনও সন্তান জন্মগ্রহণ করে নাই।

প্রথমে একেবারে নিরাশ হইয়া পড়িয়াছিলাম, কিন্তু পরক্ষণেই মাথায় বুদ্ধি যোগাইল। তুমি গভীর দ্বিপ্রহর রাত্রিতে জন্মিয়াছিলে। ডাক্তার, ধাত্রী এবং ছয় জন দাসী কেবল জানিত যে, তোমার গর্ভধারিণী কন্যা প্রসব করিয়াছেন। এক ঘণ্টার মধ্যে আমি ঐ কয় জনকে বধদণ্ড দিয়া হত্যা করিলাম। পর দিন প্রাতঃকালে মঙ্গলবাদ্য ও নাগরিকগণের জয়োল্লাসের সহিত সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল যে, ব্রাণ্ডেনবার্গের ভাবী উত্তরাধিকারী ক্লুগেনষ্টাইনের পুত্র জন্মিয়াছে। এই গূঢ় রহস্য এত দিন পর্য্যন্ত নিরতিশয় সাফল্যের সহিত রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। তোমার মাতৃষ্বসা তোমাকে শৈশবে, লালনপালন করিবার ভার লইয়াছিলেন। তাঁহাকে অবিশ্বাস করিবার আমাদের কোনও হেতু ছিল না।

তোমার বয়স দশবৎসর হইলে উলরিকের একটি কন্যা জন্মে। ইহাতে আমরা অতিশয় দুঃখিত হইয়াছিলাম। কিন্তু তথাপি আমাদের হৃদয়ে আশা ছিল যে, ডাক্তার বা শিশুদের অন্যান্য প্রবল শত্রু আমাদের আন্তরিক বাসনা সফল করিবে, কিন্তু হায়, আমাদের সে আশা পূর্ণ হয় নাই। সকল শত্রুর মুখে ছাই দিয়া সে সুস্থ দেহে বাড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সেজন্য আর কোনও ভয় নাই। সে তো কন্যা! কিন্তু আমার তো পুত্র রহিয়াছে। আমার পুত্রই তো ব্রাণ্ডেনবার্গের ভাবী ডিউক। স্নেহের কনরাড, এই আটাশ বছরের মধ্যে কখনও তোমাকে কাহারও নিকটে কন্যা বলিয়া পরিচিত করি নাই, এমন কি, আমি নিজেও তোমাকে বরাবর পুত্ররূপে কল্পনা করিয়া আসিতেছি। কখনও তোমাকে 'কনরাড' ভিন্ন অন্য কোনও নামে ডাকি নাই।

এখন দাদা উলরিক বার্দ্ধক্য-প্রযুক্ত রাজকার্য্যের গুরুভার স্বয়ং নির্ব্বাহ করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। তাঁহার ইচ্ছা যে, তুমি তাঁহার নিকট যাইয়া রাজকার্য্যের ভার লইয়া তাঁহাকে গুরুভার হইতে নিষ্কৃতি দাও,—তাঁহার জীবদ্দশাতেই তুমি নামে না হইলেও কার্য্যতঃ ডিউক হও। তোমার অনুচরবর্গ সকলে প্রস্তুত হইয়া আছে; তোমাকে অদ্য রাত্রেই ব্রাণ্ডেনবার্গে যাত্রা করিতে হইবে।

একটী কথা মনোযোগের সহিত শুনিয়া রাখ। আমাদের রাজ্যের অতি প্রাচীন নিয়ম এই যে, সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে অভিষিক্ত না হইয়া যদি কোনও স্ত্রীলোক এক মুহূর্ত্তের জন্যও ডিউকের সিংহাসনে উপবেশন করে, তাহা হইলে তাহাকে মৃত্যুদণ্ড ভোগ করিতেই হইবে। অতএব খুব সাবধান। কখনও কোনও কারণে সিংহাসনে বসিও না। সর্ব্বদা বিনয় প্রকাশ করিয়া সিংহাসনের পাদস্থিত মন্ত্রীর আসন হইতে তোমার রাজাদেশ প্রদান করিবে। যত দিন না তুমি অভিষিক্ত হইয়া সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ হও, তত দিন এইরূপ করিবে। যদিও লোকের নিকট তোমার স্বরূপ-প্রকৃতি প্রকাশিত হওয়ার সম্ভাবনা একেবারেই নাই, তথাপি এই অবিশ্বাস্য মর্ত্ত্য-জীবনে সর্ব্বদা সাবধান থাকাই বুদ্ধিমানের কার্য্য।"

বক্তব্য শেষ করিয়া বৃদ্ধ কনরাডের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। যুবক-বেশী কনরাড নিতান্ত ব্যথিতচিত্তে ব্যাকুলভাবে বলিল, "পিতা, এই জন্যই কি আমার জীবন একটা গভীর মিথ্যা ও ভয়ঙ্কর প্রবঞ্চনাকে আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে! নিরপরাধা জ্যেষ্ঠতাত-কন্যাকে তাহার ন্যায্য অধিকার হইতে এইরূপে বঞ্চনা করা কি আমার উচিত হইবে? পিতা, আপনার কন্যাকে ক্ষমা করুন।"

লর্ড ক্লুগেনষ্টাইন ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন, "কি বলিলে? কত বুদ্ধি খরচ করিয়া তোমার জন্য আমি যাহা করিয়াছি, এই কি তাহার পুরস্কার? সত্য বলিতেছি, তোমার এরূপ ভাবপ্রবণতা একেবারেই অসহ্য; ইহা বরদাস্ত করিবার মেজাজ এখন আমার নাই। এখনই তোমাকে ব্রাণ্ডেনবার্গে যাইতে হইবে। আমার এই সংকল্প যাহাতে কিছুতেই ব্যর্থ না হইতে পারে, সে বিষয়ে সর্ব্বদা সাবধান থাকিবে।"

পিতা-পুত্রে (পুত্রীতে) অনেক ক্ষণ ধরিয়া কথোপকথন চলিল। সে সব লিখিবার আবশ্যকতা নাই। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, দয়ার্দ্র-হৃদয়া কন্যার সকল কাতর অনুরোধ, সকল অশ্রু নির্ম্মম পিতার নিকট ব্যর্থ হইল।

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বৃদ্ধকে তাঁহার চিরপোষিত সংকল্প হইতে সে কিছুতেই বিচ্যুত করিতে পারিল না। অবশেষে নিরুপায় হইয়া কনরাড সেই রাত্রিশেষে সশস্ত্র অনুচরবর্গ ও বহুসংখ্যক ভৃত্য-সমভিব্যাহারে অশ্বারোহণে ক্লুগেনষ্টাইন ক্যাসেল হইতে ব্রাণ্ডেনবার্গ-অভিমুখে যাত্রা করিল।

কন্যা চলিয়া যাওয়ার পর বৃদ্ধ কিছুক্ষণ নিস্তব্ধভাবে বসিয়া রহিলেন। তাহার পর পত্নীর নিকট যাইয়া বলিলেন, "আমাদের আশা সাফল্যের দিকে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। আজ তিন মাস হইল, ধূর্ত্ত ও কমনীয় কাউণ্ট ডেটসিনকে যে পৈশাচিক কর্ম্মের ভার দিয়া ভ্রাতুষ্পুত্রী কনষ্টান্সের নিকট পাঠাইয়াছি, তাহাতে সে অকৃতকার্য্য হইলে আমরা সম্পূর্ণ নিরাপদ নহি। যদি সে কৃতকার্য্য হয়, তাহা হইলে আমাদের কন্যার ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ নিরুপদ্রব হইবে; ডিউক না হইলেও তখন সে ডাচেসরূপে রাজ্যে অভিষিক্ত হইতে পারিবে, সে বিষয়ে কেহ আর কোনও রূপ বাধা দিতে পারিবে না।"

"আমার মনে কেমন একটা অমঙ্গল ভয়ের সঞ্চার হইতেছে। ঈশ্বর করুন যেন সব ভাল হয়।"

"স্ত্রীলোকের মন এমনই দুর্ব্বল! সর্ব্বদা অমঙ্গলের বিভীষিকা কল্পনা করিয়া বৃথা আশঙ্কা ও অশান্তি ডাকিয়া আনে। কোনও রূপ অমঙ্গল চিন্তা করিও না। নিদ্রার আয়োজন কর এবং রাজমাতার মর্য্যাদার স্বপ্নে বিভোর হইয়া পড়।"

(২)

উৎসব ও অশ্রু।

উক্ত ঘটনার ছয় দিন পরে ব্রাণ্ডেনবার্গ নগর উৎসবে ও জয়োল্লাসে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী কনরাড্ আজ উপস্থিত হইয়াছেন। বৃদ্ধ ডিউকেরও হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। প্রথম হই-তেই কনরাডের অনিন্দ্যসুন্দর রূপ ও সরল ব্যবহার তাঁহার স্নেহ আকর্ষণ করিয়াছিল। প্রাসাদের সুবিস্তৃত কক্ষে রাজ্যের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ কনরাডের অভ্যর্থনা করিবার জন্য সমবেত হইয়াছিলেন। উৎসব ও আনন্দের মধ্যে কন-রাডের সমস্ত ভয়, সমস্ত দুঃখ দূর হইয়া গেল। সকলের সহিত আদর-আপ্যায়নে একটা নিরুদ্বেগ আনন্দে ও সন্তোষে তাহার হৃদয় ভরিয়া উঠিল।

কিন্তু প্রাসাদের সুদূরস্থিত এক ক্ষুদ্র কক্ষে এই আনন্দ-স্রোত পৌঁছিতে পারে নাই। বাতায়নের পার্শ্বে ডিউকের একমাত্র কন্যা কনষ্টান্স বিষণ্ণভাবে

দাঁড়াইয়াছিল। তাহার চক্ষু রক্তবর্ণ, অশ্রুপূর্ণ। কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার চক্ষু ফুলিয়া উঠিয়াছিল। কক্ষে আর কেহ ছিল না। বালিকা আর্ত্তস্বরে আবার কাঁদিতে লাগিল। তার পরে বলিল, "ধূর্ত্ত ডেট্‌সিন গিয়াছে—চিরদিনের মত আমাকে পরিত্যাগ করিয়া ব্রাণ্ডেনবার্গ ছাড়িয়া পলাইয়াছে। সে শঠ কপট অবশেষে যে এরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করিবে তাহা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই। আমি তাহাকে কত ভাল বাসিয়াছিলাম, আমার ক্ষুদ্র হৃদয়ের সমস্ত অকৃত্রিম ভালবাসা তাহার পায়ে নিঃসন্দেহে ঢালিয়া দিয়াছিলাম। তাহার সহিত বিবাহে পিতা কখনও মত করিবেন না জানিয়াও আমার দেহ-মন তাহার পদে সঁপিয়াছিলাম। এত ভালবাসার এই পুরস্কার! বিশ্বাসঘাতক, প্রবঞ্চক!—আমি এখন তাহাকে ঘৃণা করি—সমস্ত হৃদয়ের সহিত তাহাকে ঘৃণা করি।—কিন্তু আমার কি হইবে? আজ যে আমি কলঙ্কিনী, নষ্টা, পতিতা! হায়, আমি কি পাগল হইয়া যাইব!"

তরুণী আবার কাঁদিতে লাগিল।

(৩)

ঘটনা ঘনীভূত।

কয়েক মাস অতীত হইয়াছে। কনরাডের শাসনকার্য্যে সকলেই অতিশয় সন্তুষ্ট। বিচারকার্য্যে তাহার দক্ষতা, দণ্ডের সহিত দয়ার সামঞ্জস্য, উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হইয়াও সকলের সহিত সবিনয় ব্যবহার প্রভৃতি কনরাডের সদ্‌গুণরাশি সর্ব্বসাধারণের চিত্ত হরণ করিয়াছে। বৃদ্ধ ডিউক ক্রমে ক্রমে তাহার হাতে সকল কার্য্যের ভার ছাড়িয়া দিয়াছেন। মন্ত্রীর আসন হইতে কনরাড যখন রাজ-কার্য্য সম্পাদন করিত, তিনি তখন নিস্তব্ধ হইয়া তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিতেন; ভাবী উত্তরাধিকারীর বুদ্ধিমত্তায় ও নৈপুণ্যে তাঁহার হৃদয় গৌরবে পূর্ণ হইয়া উঠিত। সকলের নিকট এইরূপ ভাবে আদৃত ও সুপ্রশংসিত হইলেও কনরাডের মনে কিন্তু শান্তি ছিল না। সে জানিতে পারিয়াছে যে, রাজকুমারী কনষ্টান্স তাহাকে ভাল-বাসিতে আরম্ভ করিয়াছে। জগতের আর সকলের স্নেহ ও ভালবাসা তাহার পক্ষে আদরণীয় হইলেও কনষ্টান্সের ভালবাসা তাহার পক্ষে বিশেষ ভয়ের কারণ ছিল। সে ক্রমে বুঝিতে পারিল যে, বৃদ্ধ ডিউকও কন্যার এই প্রেমের কথা জানিতে পারিয়াছেন এবং উভয়ের বিবাহের সংকল্প করিতেছেন। পূর্ব্বে যে বিষাদকালিমা কনষ্টান্সের মুখ আচ্ছন্ন করিয়াছিল, ক্রমে ক্রমে তাহা অপসারিত

হইয়া গেল। নবীন প্রেমের পুলকস্পর্শে তাহার শীততাড়িত হৃদয়ে নব বসন্ত মুঞ্জরিত হইয়া উঠিল। বিষাদ-মলিন মুখে হাসির দীপ্তশ্রী পুনরায় ফুটিয়া উঠিল।

কনরাড্ ভীত হইল। দুঃখভরা হৃদয় লইয়া যখন সে ব্রাণ্ডেনবার্গে পদার্পণ করে, তখন সে শান্তি পাইবার আশায় কনষ্টান্সের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়াছিল; তাহার রমণী-হৃদয় কনষ্টান্সকে সখীভাবে অনেক সাধে বরণ করিয়া লইয়াছিল। তাহার পরিণাম যে এইরূপে দাঁড়াইবে, তাহা কনরাড্ কখনও স্বপ্নেও কল্পনা করে নাই। এখন তাই সে বড়ই অনুতপ্ত হইল। কনষ্টান্সের নিকট হইতে সর্ব্বদা সে দূরে থাকিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু ইহার ফল আরও খারাপ হইল—যতই সে কনষ্টান্সের নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাইতে চাহে, কনষ্টান্স ততই তাহার পথে আসিয়া পড়ে। প্রথমে সে এরূপ ঘটনায় আশ্চর্য্য হইল, পরে স্তম্ভিত হইল। কনষ্টান্স সর্ব্বদা ছায়ার ন্যায় তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘুরিয়া বেড়াইত। দিনে কি রাত্রিতে সকল সময়ে সকল স্থানে কনরাড্ কনষ্টান্সকে সহসা নিজের কাছে দেখিয়া চমকিত হইত।

এরূপ ভাবে চির দিন চলে না। সকলেই তাহাদের সম্বন্ধে নানারূপ কথাবার্ত্তা কহিতে আরম্ভ করিয়াছে। স্বয়ং ডিউক উভয়ের মধ্যে এইরূপ মনোমালিন্যের আভাস পাইয়া বিচলিত হইয়াছিলেন। কনরাড্ দুঃখে ও বিরক্তিতে অবসন্ন ও ম্রিয়মাণ হইতে লাগিল। তাহার হাস্যোৎফুল্লবদনে চিন্তার কৃষ্ণ ছায়া পতিত হইল। এক দিন সে কলাভবন হইতে যখন বাহির হইয়া আসিতেছিল, কনষ্টান্স তখন সহসা কোথা হইতে আসিয়া তাহার হাত-দুটি ধরিয়া বলিল,—

"তুমি আমাকে এরূপ ভাবে পরিত্যাগ করিয়া দূরে সরিয়া যাইতে চাও কেন? আমি তোমার কি করিয়াছি? আমি কি বলিয়াছি, যাহার জন্য তুমি আমাকে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিয়াছ? আগে তো তুমি এরূপ নির্দ্দয় ছিলে না। কনরাড, প্রিয়তম—আমাকে অবহেলা করিও না—এরূপ ভাবে পায়ে ঠেলিয়া দলিত করিও না। এই দুঃখ-মথিত হৃদয়ের প্রতি একটু করুণা প্রকাশ কর। যে কথা এত দিন বলি নাই, যে কথা বলিতে মরম ফাটিয়া যায়, বড় দুঃখেই আজ তাহা মুখ ফুটিয়া বলিতে হইতেছে। কনরাড, আমি তোমাকে ভালবাসি—সমস্ত হৃদয় দিয়া ভালবাসি। তোমার চরণ-তলে আমার এই ক্ষুদ্র হৃদয় সঁপিয়া দিয়া ধন্যা হইয়াছি। পদাঘাতে যদি তাহা চূর্ণবিচূর্ণ করিতে হয় তাহাই করিয়া যাও—"

কনরাডের বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না; চুপ করিয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল। কনষ্টান্স উত্তরের প্রত্যাশায় ক্ষণেকের জন্য কনরাডের মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহার

নির্ব্বাক্ হইয়া থাকিবার অর্থ ভুল বুঝিয়া তাহাকে আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করিল। প্রবল আনন্দের তীব্র জ্যোতিঃতে তাহার চক্ষুর্দ্বয় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে বলিল,—"বুঝিয়াছি, তুমি অনুতাপ করিতেছ, কনরাড—এত দিন আমাকে অবহেলা করার জন্য তুমি অনুতাপ করিতেছ। বুঝিয়াছি, তুমি আমাকে ভাল· বাস। হে প্রিয়, হে দয়িত, একবার নিজমুখে বল যে তুমি আমাকে ভালবাস—"

তীব্র হৃদয়-জ্বালায় অস্থির হইয়া কনরাড চীৎকার করিয়া উঠিল। বিষম বিপদাশঙ্কায় তাহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতেছিল। সে কনষ্টান্সের দৃঢ় আলিঙ্গন-পাশ হইতে নিজেকে সবলে মুক্ত করিয়া দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়া আর্ত্তস্বরে বলিল, —"হায়, পাগলিনি! তুমি যে কি চাহিতেছ তাহা তুমি জান না। তাহা হইবার নহে—একেবারেই অসম্ভব!"

এই কথা বলিয়াই নিতান্ত অপরাধীর ন্যায় সে সেখান হইতে দ্রুতপদে চলিয়া গেল। কনষ্টান্স বিস্ময়ে, নৈরাশ্যে স্তম্ভিত হইয়া গেল। পরমুহূর্ত্তে সে তথায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অনেক কাঁদিল; কনরাডও নিজের প্রকোষ্ঠে গিয়া কাঁদিতেছিল। উভয়েই বিষম হতাশ হইয়াছিল; উভয়েই ভাবী সর্ব্বনাশ চক্ষের সম্মুখে উপস্থিত দেখিতেছিল।

কনষ্টান্স বলিতে লাগিল:—"আমার দুঃখে বুঝি বা তাহার কঠোর হৃদয় দ্রবীভূত হইল ভাবিয়া যে মুহূর্ত্তে আমি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিলাম, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই সে আমার হৃদয়-ভরা প্রেমকে এমন ভাবে অবজ্ঞা করিল! ওঃ! কি নির্দ্দয় সে—কি নির্ম্মম গো! না;—আমি তাহাকে ঘৃণা করি। নীচ কুক্কুরের ন্যায় আমাকে তাহার নিকট হইতে সে অবজ্ঞাভরে অপসারিত করিয়া দিয়াছে, —আমি তাহাকে ঘৃণা করি।"

(৪)

ভয়ঙ্কর সংবাদ।

আরও কিছুকাল অতীত হইল। পুনরায় রাজকুমারীর মুখে বিষাদকালিমা গাঢ়ভাবে ঘনাইয়া উঠিল। কনরাড ও তাহাকে আর কখনও একত্র দেখা যাইত না; উভয়েই দূরে দূরে থাকিত। ইহাতে বৃদ্ধ ডিউক আন্তরিক দুঃখিত ও মর্ম্মা-হত হইলেন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে কনরাডের মন হইতে ভীতি ও অবসাদের ছায়া মুছিয়া গেল, তাহার নষ্ট-দীপ্তি পুনরায় উজ্জ্বলতাপ্রাপ্ত হইল। অধিকতর কৌশল ও নিপুণতার সহিত সে রাজকার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিল।

এই সময়ে প্রাসাদের মধ্যে একটা গুপ্ত বার্ত্তা কানে কানে প্রচারিত হইতেছিল। ক্রমে ক্রমে ইহা আর গোপন রহিল না। প্রাসাদ অতিক্রম করিয়া তাহা নগরে প্রচারিত হইল। নগর ছাড়িয়া যথাসময়ে রাজ্যময় ছড়াইয়া পড়িল। সকলেই জানিল যে, রাজকুমারী কনষ্টান্স একটী সন্তান প্রসব করিয়াছে।

লর্ড ক্রুগেনষ্টাইন এই কথা শুনিবামাত্র আনন্দে অধীর হইয়া বলিয়া উঠিলেন, —"ডিউক কনরাড চিরকাল বাঁচিয়া থাকুক! আজ হইতে তাহার উত্তরাধিকার সম্পূর্ণ নিরাপদ। ডেট্সিন তাহার কর্ত্তব্য কর্ম্মে কৃতকার্য্য হইয়াছে, সে ধূর্ত্তকে তাহার প্রতিশ্রুত পুরস্কার দিতে হইবে।"

তিনি সংবাদটী যাহাতে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে ভাল করিয়া রাষ্ট্র হয় তাহার বিশেষ চেষ্টা করিলেন এবং এই আনন্দ-ঘটনা-উপলক্ষে এক বিরাট উৎসবের আয়োজন করিলেন। তাঁহার ব্যয়ে তাঁহার অনুচর ও আশ্রিতবর্গ কয়েক দিন উৎসবে, আনন্দে ও প্রীতিভোজে মাতিয়া থাকিল।

(৫)

ভীষণ সঙ্কট।

বিচারকাল সমাগত। ব্রাণ্ডেনবার্গের অভিজাত ব্যক্তিবর্গ সকলেই রাজ-প্রাসাদের বিচার-গৃহে সমবেত হইয়াছেন। বিস্তৃত কক্ষে অসংখ্য দর্শকবৃন্দের জনতা হইয়াছে, আর তিলধারণেরও স্থান নাই। রক্তবর্ণ-পরিচ্ছদ-পরিহিত হইয়া মন্ত্রীর আসনে কনরাড্ বসিয়া আছে। তাহার উভয় পার্শ্বে রাজ্যের বিচারকগণ উপবেশন করিয়াছেন। বৃদ্ধ ডিউক তাঁহার কন্যার বিচার যেন নিরপেক্ষভাবে সম্পাদিত হয়, এইরূপ নিষ্ঠুর আদেশ দিয়া ভগ্নহৃদয়ে স্বীয় প্রকোষ্ঠে গিয়া শয্যাগ্রহণ করিয়াছেন। যাহাতে কনষ্টান্সের অপরাধের বিচার তাহাকে করিতে না হয়, তজ্জন্য কনরাড কত বার কাতরভাবে তাঁহার নিকট অব্যাহতি প্রার্থনা করিয়াছিল, কিন্তু তিনি সে প্রার্থনা মঞ্জুর করেন নাই। তাহার হৃদয় দারুণ যন্ত্রণায় নিপীড়িত হইতেছিল। তাহার পিতার হৃদয় কিন্তু আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া নাচিতেছিল। কনরাডের অজ্ঞাতসারে লর্ড ক্রুগেনষ্টাইন বিচার-কার্য্য দেখিবার জন্য ব্রাণ্ডেনবার্গে আসিয়াছিলেন এবং রাজ্যের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি-গণের মধ্যে আসন গ্রহণ করিয়া নিভৃতে বসিয়াছিলেন।

বিচারকার্য্য আরম্ভ হইল। প্রাথমিক অনুষ্ঠানগুলি সমাধা হইবার পর বৃদ্ধ বিচারপতি বলিলেন,—"আসামী, দণ্ডায়মান হও।"

হতভাগিনী রাজকুমারী সর্ব্বসমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া অবগুণ্ঠন মোচন করিল। বিচারপতি বলিতে লাগিলেন,—"রাজকুমারী, রাজ্যের সমাগত বিচারকমণ্ডলীর নিকট ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, তুমি অবিবাহিতা হইয়াও একটি সন্তান প্রসব করিয়াছ। আমাদের চির-প্রচলিত প্রাচীন বিধি-অনুসারে এরূপ অপরাধের শাস্তি—প্রাণদণ্ড। কেবল একমাত্র কারণে সে নিষ্ঠুর দণ্ড হইতে নিষ্কৃতিলাভ ঘটিতে পারে। সে কারণ কি, তাহা বর্ত্তমান যুবরাজ কনরাড্ তোমাকে জানাইবেন। অতএব অবহিত হও।"

কনরাড ধীরে ধীরে রাজদণ্ড গ্রহণ করিল। সে সময় তাহার নারী-হৃদয়ের যাবতীয় কোমলতা কনষ্টান্সের দুর্ভাগ্যে নিরতিশয় আহত ও ব্যথিত হইতেছিল,—তাহার চক্ষুপ্রান্তে অশ্রুরেখা ফুটিয়া উঠিতেছিল। সে রাজাজ্ঞা প্রচার করিতে যাইতেছিল, এমন সময় প্রধান বিচারপতি বলিয়া উঠিলেন—"যুবরাজ, ওখান হইতে নয়। সিংহাসন ব্যতিরেকে অন্য কোনও আসন হইতে এরূপ রাজাজ্ঞা প্রচার করা বিধিসঙ্গত নহে। আপনি সিংহাসনে উপবেশন করুন।"

কনরাডের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। তাহার পিতার কঠোর হৃদয়ও যেন ইহাতে একটু বিচলিত হইয়া উঠিল। কনরাড্ এখনও অভিষিক্ত হয় নাই, সে কি করিয়া সিংহাসনে বসিবে? সে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল, ভয়ে তাহার মুখ শুকাইয়া উঠিল। কিন্তু এখন উপায় নাই। সিংহাসনে বসিতেই হইবে। সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া তাহার ভাবগতিক পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে। সে অনেকক্ষণ ইতস্ততঃ করিলে লোকের মনে সন্দেহ জন্মিতে পারে। সে সিংহাসনে উপবেশন করিল। রাজদণ্ড পুনরায় ধারণ করিয়া সে বলিল,—"আসামী, যে গভীর কর্ত্তব্যের ভার আমার উপর অর্পিত হইয়াছে, ব্রাণ্ডেনবার্গের স্বাধীন ডিউকের নামে আমি তাহা সম্পাদন করিতেছি। আমার কথা মনোযোগের সহিত শ্রবণ কর। তুমি যে অপরাধে অভিযুক্ত, তাহার অনিবার্য্য দণ্ড—মৃত্যু। তোমার অপরাধের সহচর, তোমার গুপ্তনায়ককে রাজহস্তে বিচারের জন্য সমর্পণ করিলে, তুমি মুক্তি পাইতে পারিবে, কিন্তু সে ব্যক্তিকে প্রাণদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। তাহাকে ধরাইয়া না দিলে তোমার শাস্তি—মৃত্যু। ইহাই ব্রাণ্ডেনবার্গের অলঙ্ঘনীয় বিধি। এই সুবিধা ত্যাগ করিও না—ইচ্ছা করিলে এখনও তুমি বধদণ্ড হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পার। তোমার জারজ সন্তানের পিতার নাম কি তাহা প্রকাশ কর।"

বিশাল বিচারগৃহে সুগভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছিল। সব নিস্তব্ধ;

লোকে নিজের হৃৎপিণ্ডের উত্থানপতন-ধ্বনিও স্পষ্ট শুনিতে পাইতেছিল। তখন রাজকুমারী কনষ্টান্স ধীরে ধীরে মুখ উন্নত করিল, তাহার চক্ষে একটা বিরাট্ ঘৃণা ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। সে কনরাডের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন—"তুমিই সেই ব্যক্তি!"

এই কথাতে কনরাডের হৃদয়ের রক্ত জল হইয়া গেল। তাহার নিতান্ত অসহায় অবস্থার কথা মনে করিয়া সে অনুভব করিতে লাগিল যেন মৃত্যু স্বীয় তুষার-হস্ত তাহার সর্ব্বশরীরে বুলাইয়া দিতেছে। পৃথিবীর মধ্যে এমন কি শক্তি আছে যাহা আজ তাহাকে রক্ষা করিতে পারে? রাজকুমারীর অভিযোগ মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতে হইলে ইহা প্রকাশ করিতে হইবে যে, সে পুরুষ নয়· স্ত্রীলোক। কিন্তু স্ত্রীলোক হইয়া অনভিষিক্ত অবস্থায় সে সিংহাসনে উপবেশন করিয়াছে, তাহারও দণ্ড যে মৃত্যু! সে এবং তাহার পিতা উভয়ে একই মুহূর্ত্তে মূর্চ্ছিত হইয়া ধরণীতে পতিত হইল।

(এই লোমহর্ষক গল্পের অবশিষ্টাংশ এই পত্রিকাও বা অন্য কোথাও, বর্ত্তমানে বা ভবিষ্যতে কখনও প্রকাশিত হইবে না। সত্য বলিতে কি, আমি আমার গল্পের নায়ককে বা নায়িকাকে এমন স্থলে আনিয়া ফেলিয়াছি যে, তাহাকে এই বিষম সঙ্কট হইতে কিরূপে উদ্ধার করিতে পারা যাইবে তাহা আমি খুঁজিয়া পাইতেছি না। সেই জন্য আমি নিজে এ কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া এই সঙ্কট হইতে উদ্ধার লাভ করিবার ভার আমার নায়ককে (বা নায়িকাকে) দিলাম। সে যেমন করিয়া পারে এই বিপদ হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া লউক,—না পারে, যেখানে আছে সেখানেই থাকুক। প্রথমে ভাবিয়াছিলাম যে, এই বিপদ হইতে সহজেই একটা পথ আবিষ্কার করিয়া লইতে পারিব, কিন্তু এখন দেখিতেছি, কাজটা তত সোজা নহে)।

বৌদ্ধ প্রসঙ্গ

[লেখক—শ্রীগিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ।]

বৌদ্ধধর্ম্মের আলোচনা ইদানীন্তন সাহিত্যসেবী সুধীদিগের প্রধানতম অবলম্বন বলিয়া গণ্য হইতেছে। প্রত্নতত্ত্বের গন্ধবিহীন সাহিত্য আজ সাহিত্য বলিয়া উল্লিখিত হইতে পারে কি না, তাহাই প্রত্নতত্ত্ব-সর্ব্বস্ব সাহিত্যিকের বিবেচনা-সাপেক্ষ; সুতরাং তাদৃশ সাহিত্যিক কর্ত্তৃক বেদ স্মৃতি পুরাণ তন্ত্র জ্যোতিষ প্রভৃতি সমস্তই আজ ইতিহাসের অঙ্গরূপে আলোচিত হইতেছে, ধর্ম্মের উৎ-

পত্তিকাল, শৈবপ্রভাব শাক্তপ্রভাব বৈষ্ণবপ্রভাব বৌদ্ধপ্রভাব প্রভৃতির ইতিহাস খাড়া করিতে না পারিলে আর বাঙ্গালীর জাতীয় ইতিহাস সুপ্রতিষ্ঠ হইতে পারে না, যাহার ইতিহাস নাই, দুনিয়ার ভিতরে সভ্যসমাজে তাহার বসিবার স্থান ত নাই-ই, অধিকন্তু দাঁড়াইবারও স্থান নাই। সুতরাং যেরূপেই হউক, বাঙ্গালার ইতিহাস সৃষ্টি করিতেই হইবে, শাস্ত্রের দোহাই না দিলে গবেষণা প্রকাশ পায় না, নানা শাস্ত্রে 'ষ্টাডি' ঘোষণা হয় না; কাজেই শাস্ত্রচর্চ্চা শাস্ত্র-ব্যাখ্যাও আজ ইতিহাস নির্ম্মাণের অঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে। প্রাচীন নিরুক্ত নিঘণ্টু ব্যাকরণ প্রভৃতির সাহায্যে যোগ্য ব্যক্তির শাস্ত্রালোচনা প্রসূত সিদ্ধান্ত সমাজের উপকার সম্পাদন করে, ইহাতে কাহারও উদ্বেগের কারণ ছিল না, অদ্যাপি হয় নাই, কিন্তু আধুনিক শিক্ষাদৃপ্তের উর্ব্বরাভাস মস্তিষ্কনিঃসৃত বৈজ্ঞানিক রীতিকল্পিত অভিনব ব্যাখ্যার ফলে বাঙ্গালার ধর্ম্ম এবং সমাজ উভয়ই বিপর্য্যস্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে; এ অবস্থায় আমরা আর উপেক্ষা করিতে পারি না; অনেক বিষয়েই আধুনিক মতের সহিত আমাদের প্রাচীন মতের পার্থক্য দেখা যায়, তন্মধ্যে আজ কেবল বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধেই আলোচনা করিব।

হিন্দুধর্ম্মের দুর্জ্ঞেয় মর্ম্মাবধারণে সম্পূর্ণরূপ অনভিজ্ঞ কতিপয় পাশ্চাত্য মনীষীর অভিমতানুসারে শাক্যসিংহের আবির্ভাবের পর হইতেই বৌদ্ধধর্ম্মের বিমলজ্যোতি পাইয়া নবোদিত ভাস্করের কোমলালোকে সরসীরুহের ন্যায় ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞান ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে ভারতবাসীর তমসাচ্ছন্ন হৃদয়-কন্দরে মৈত্রী করুণা প্রভৃতির পবিত্র নিষ্যন্দ কখনও স্থান পাইত না, তাহারা কেবল হিংসা-বহুল যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকিত, এবং মারামারি কাটাকাটি করিত। সুতরাং শাক্যসিংহের প্রবর্ত্তিত জ্যোতির্ম্ময় ধর্ম্মের অনুকরণেই বর্ত্তমান হিন্দুশাস্ত্রের গ্রন্থাবলীতে অপবর্গ ধ্যান ধারণা প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। এই সিদ্ধান্তের ফলে রামায়ণ প্রভৃতি গ্রন্থে বৌদ্ধের নাম বা নিন্দাবাদ দর্শনে তত্তদ্ গ্রন্থের অর্ব্বাচীনতা অবধারিত হয়।

যাঁহারা বৌদ্ধশাস্ত্রের কিছুমাত্রও অনুশীলন করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই অবগত আছেন যে, শাক্যসিংহই আদি বুদ্ধ নহেন, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী আরও অনেক বুদ্ধ হইয়া গিয়াছেন। বুদ্ধ একটা সংজ্ঞা, বুদ্ধত্ব একটা অবস্থা। দর্শনের অনুশীলন করিতে গেলেই জ্ঞানের ক্ষণিকত্ব নিত্যত্ব চিন্তা অপরিহার্য্য, সৎ হইতে অসতের উৎপত্তি অথবা অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি এ সমস্ত

চিন্তাও দার্শনিকের নিত্য সহচর। ইত্যাদি কারণেই উপনিষদে বিবিধ দর্শনে এবং রামায়ণাদি গ্রন্থেও বৌদ্ধের মত প্রসঙ্গতঃ দেখিতে পাওয়া যায়।

অন্যের মতাপেক্ষা বুদ্ধ সম্বন্ধে বৌদ্ধ পণ্ডিত প্রসিদ্ধ অমরসিংহের মত বিশেষ আলোচনার যোগ্য।

তিনি সাধারণ বুদ্ধ হইতে শাক্যসিংহকে বিশেষরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার উক্তি হইতে জানা যায় যে, সর্ব্বজ্ঞ হইতে মুনি পর্য্যন্ত ১৮ আঠারটি নাম সাধারণ বুদ্ধের বাচক, এবং যিনি শাক্যমুনি অর্থাৎ শাক্যবংশ প্রসূত বুদ্ধ তিনিই শাক্যসিংহ সর্ব্বার্থসিদ্ধি, সৌদ্ধোদনি, গৌতম, অর্ক বন্ধু এবং মায়াদেবী সুত এই কয় নামে পরিচিত *। গাছের সঙ্গে সঙ্গেই যেমন পরগাছা আছে, ভাষার সঙ্গে সঙ্গেই যেমন অপভাষা আছে, তেমনই ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে অপধর্ম্মও আবহমানকাল চলিয়া আসিতেছে। হিন্দুর সমস্ত শাস্ত্রই সমস্বরে সংসারের অনাদিত্ব ধর্ম্মের শাশ্বতিকত্ব ঘোষণা করিতেছে; সুতরাং সেই সকল শাস্ত্রের বৈজ্ঞানিক আজুগবি ব্যাখ্যানের বলে প্রভাব নির্ণয় বাতুলতার পরিচয় মাত্র।

পুরাণাদিতে বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্ম্মের নিন্দাপ্রসঙ্গে ঐ সমস্ত অপধর্ম্মের যে উৎপত্তি বিবরণ কথিত হইয়াছে, তাহাকে ইতিহাসের ছাঁচে ঢালিয়া কালনির্ণয়ের চেষ্টা তুষকণ্ডনের ন্যায় বিফল বলিয়াই মনে হয়। হেমাদ্রির গ্রন্থে অপাসনীয় নিরূপণ প্রসঙ্গে যে পৌরাণিক বৃত্তান্ত অবতারিত হইয়াছে, তাহাতে বৌদ্ধ, শ্রাবক, নিগ্রন্থ, শাক্ত, জীবক, কাপিল, চরক, চীরক, ঔক্ষ, শাক্য, কপালিক, সিদ্ধ-পুত্র এবং সাত্বত প্রভৃতি কতকগুলি অপধর্ম্মের উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে।

নগ্নাদির দর্শনে শ্রাদ্ধীয় বস্তু অপবিত্র হয়, ইহাদের দৃষ্ট বস্তু পিতৃলোকের সমীপে উপস্থিত হইতে পারে না।

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ বলিয়াছেন,—

"নগ্নাদয়ো ন পশ্যেয়ুঃ শ্রাদ্ধ মেতৎ কদাচন।
গচ্ছন্ত্যেতৈ র্দৃষ্টানি ন পিতৄন্ন পিতামহান্॥

---

* সর্ব্বজ্ঞঃ সুগতোবুদ্ধো ধর্ম্মরাজস্তথাগতঃ
সমন্ত ভদ্রোভগবান্ মারজিল্লোকজিজ্জিনঃ॥
ষড়ভিজ্ঞো দশবলোঽদ্বয়বাদী বিনায়কঃ
মুনীন্দ্রঃ শ্রীঘনঃ শাস্তা মুনিঃ—শাক্যমুনিস্তু যঃ।
স শাক্যসিংহঃ সর্ব্বার্থসিদ্ধিঃ শৌদ্ধোদনিশ্চ সঃ।
গৌতম শ্চার্ক-বন্ধুশ্চ মায়াদেবী-সুতশ্চ সঃ॥

নগ্নাদি কাহাকে বলে? ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে শম্ভুর এই প্রশ্নের উত্তরে বৃহস্পতি কর্ত্তৃক নগ্নাদির উৎপত্তি কথিত হইয়াছে। "পূর্ব্বকালে দেবাসুরের যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। সেই যুদ্ধে অসুরগণ পরাভূত হইয়া দেবগণকে জয় করিবার অভিপ্রায়ে তীব্র তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। তখন অসুর নিসূদন ভগবান্ বিষ্ণু অসুরদিগের বুদ্ধিভ্রংশ ঘটাইবার জন্য পাষণ্ডাদি ধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ঐ পাষণ্ড ধর্ম্মই বিবিধ শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে।

বিষ্ণু বুদ্ধরূপ ধারণ করিয়া যাহাদিগকে উপদেশ দিয়াছিলেন যে,—বৌদ্ধধর্ম্মের দ্বারা তোমরা দেবতাদিগকে জয় করিতে পারিবে, তাহারাই শাক্যনামে অভিহিত হইয়াছে। আমাদের জ্ঞানের দ্বারা দেবতারা পরাজিত হইবার শক্য অর্থাৎ যোগ্য, এই বুদ্ধি যাহাদের হইয়াছিল, তাহারাই শাক্য সম্প্রদায়ী হইল, শাক্য শব্দের এই পৌরাণিক নিরুক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ভগবান্ যাহাদিগকে উপদেশ দিয়াছিলেন, যে তোমরা জ্ঞানের সহিত এই ধর্ম্ম অর্থাৎ বেদবিরুদ্ধ ধর্ম্ম আচরণ করিতে "অর্হণ্" অর্থাৎ উপযুক্ত, তাহারাই অর্হন্ত বা আর্হত। বুদ্ধশ্রাবক নিগ্রন্থ এবং সিদ্ধপুত্র দুষ্টধর্ম্মাচারী ইহারা সকলেই অর্হন্ত বলিয়া জ্ঞাতব্য।

যাহাদিগকে উপদেশ করিয়াছিলেন যে, তোমরা বেদোক্ত ক্লেশবহুল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া জীবিত থাক, তাহারাই "জীবক" নামে অভিহিত হইয়াছে।

ভগবান্ আকাশে দিব্যমূর্ত্তিতে স্থিত হইয়া যাহাদিগকে বেদ-বিরুদ্ধ ধর্ম্মের উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহারাই "কাপিল" নামে অভিহিত হইয়াছে। কারণ দিবাকরই কপিল নামে অভিহিত হইয়াছেন। অর্থাৎ ভগবান্ বিষ্ণু সূর্য্যরূপ ধারণ করিয়াই ধর্ম্মোপদেশ করিয়াছিলেন। সুতরাং সাংখ্য-প্রণেতা কপিল এই কপিল হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যক্তি।

"আমার শাসন আচরণ কর" যাহাদিগকে ইত্যাকার উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহারা "চরক"নামে অভিহিত হইয়াছে।

যাহাদিগের প্রতি চীর (বস্ত্রখণ্ড) ধারণের কথা উপদিষ্ট হইয়াছিল, নীলচীরধারী তাহারাই "চীরক"নামে অভিহিত হইয়াছে। মায়াবী ভগবান্ বিষ্ণু যাহাদিগকে উপদেশ করিয়াছিলেন যে, তোমরা এই ধর্ম্ম আশ্রয় কর, উহা অনুষ্ঠিত হইয়া তোমাদিগকে পবিত্র করিবে, তাহারাই ঔক্ষ নামে কথিত হইয়াছে।

ভগবান্ যাহাদিগকে উপদেশ করিয়াছিলেন যে, সেই তুমিই সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান আছ; সুতরাং তোমার পক্ষে আবার অন্যের উপাসনা কি? এই উপদেশ

পাইয়া যাহারা উপাসনা পরাঙ্মুখ হইয়া দেহসেবায় নিরত হইয়াছে, তাহারাই সাত্বত এবং ভাগবত বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। যাহারা ধর্ম্মবুদ্ধিতে বিষ্ঠা ভক্ষণ করে, এবং এক সম্প্রদায় নরকপালের দ্বারা ভূষিত হয়, এক সম্প্রদায় শৈব, এক সম্প্রদায় পাশুপত, এবং এক সম্প্রদায় "পাঞ্চরাত্র" (বেদবিরুদ্ধ পঞ্চরাত্রমতানুবর্ত্তী নারদ পঞ্চরাত্র প্রভৃতি বেদানুযায়ী পঞ্চরাত্র হইতে ঐ সকল নিন্দিত পঞ্চরাত্র স্বতন্ত্র) এইরূপ আরও অনেক আসুরমতানুবর্ত্তী পাষণ্ডমত সেবী রহিয়াছে। নৈরাত্ম্যবাদী অর্থাৎ দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্বাপলাপকারী যজ্ঞ সম্পর্ক রহিত নাস্তিক এবং নিরর্থক জটাধারী মুণ্ডিত-মস্তক বৃথা অম্বরাবৃত-গাত্র বেদবাহ্য যে সকল সম্প্রদায় রহিয়াছে, তাহারাও সকলেই, নগ্নাদি বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। *

ইহাদের নগ্ননাম হইবার কারণ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে কথিত হইয়াছে, যথা,—

"সর্ব্বেষামেব ভূতানাং ত্রয়ীসংবরণং যতঃ
যে বৈ ত্যজন্তিং তাং মোহাৎ তে বৈ নগ্না ইতি স্মৃতাঃ"।

ইহার অর্থ,—ত্রয়ী (বেদ) সমস্ত মানবেরই সংবরণ অর্থাৎ আবরণ স্বরূপ, যাহারা মোহবশতঃ সেই আবরণরূপ বৈদিক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে তাহারাই "নগ্ন" বলিয়া বিবেচিত হয়। বেদ আবরণের তুল্য হইল কি প্রকারে? তাহা হেমাদ্রি-কর্ত্তৃক বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তিনি দেখাইয়াছেন যে, প্রাবরণ যেমন শীতবাতাদিজনিত দুঃখ হইতে মানবদিগকে রক্ষা করে; তেমনই ত্রয়ীও মানবদিগকে উপদেশের দ্বারা স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান করাইয়া দুঃখ হইতে রক্ষা করে। †

ইহার পরেই কথিত হইয়াছে যে,—

"বৌদ্ধ শ্রাবক-নিগ্রন্থ-শাক্ত-জীবক-কাপিলান্।
যেধর্ম্মানমুবর্ত্তন্তে তেবৈনগ্নাদয়ো জনাঃ॥

ইহার অর্থ,—বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্ম্ম যাহারা সেবা করে তাহারা নগ্নাদি বলিয়া বিবেচিত হয়। হেমাদ্রি বৌদ্ধ প্রভৃতি শব্দের অর্থ দেখাইয়াছেন,—বৌদ্ধ পদে সৌগত, শ্রাবক পদে শ্বেত পটধারী, নিগ্রন্থ পদে জৈন, শাক্ত পদে কৌল, জীবক

---

* এই বিষয়ের মূল প্রমাণ পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইবে।

† ত্রয়ী বেদঃ, সংবরণং প্রাবরণম্, যথা প্রাবরণং শীতবাতাদিভ্যঃ পুরুষাং স্ত্রায়তে, এবং ত্রয্যপি স্বধর্ম্মানমুষ্ঠাপয়ন্তী দুঃখেভ্য স্ত্রায়তে ইতি প্রাবরণ-সাদৃশ্যম্। (পরিশেষ খণ্ড ৭অ; ৫২০ পৃঃ।)

পদে চার্ব্বাক, এবং কাপিল পদে নাস্তিক কপিল-প্রোক্ত ধর্ম্ম অভিহিত হইয়াছে। *

এইস্থলে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, শাক্ত শৈব পাশুপদ পাঞ্চরাত্র প্রভৃতি ধর্ম্মের যে নিন্দাবাদ প্রদর্শিত হইয়াছে, উহা বেদ বিরুদ্ধ কৌল অঘোরপন্থী প্রভৃতি ধর্ম্মের পক্ষে বুঝিতে হইবে, কারণ শাক্ত শৈব বৈষ্ণব প্রভৃতি ধর্ম্ম নিত্যই দ্বিজাতির অনুষ্ঠেয়, তাহা বেদ বিরুদ্ধ নহে, প্রত্যুত বেদ সম্মত। যাঁহারা দৈনিক সন্ধ্যাবন্দনাদির অনুষ্ঠান করেন, এবং সন্ধ্যা-মন্ত্রের অর্থ অবগত আছেন, তাঁহারা সকলেই অবগত আছেন যে, প্রত্যহই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, এবং তাঁহাদের ত্রিশক্তির উপাসনা প্রাতর্মধ্যাহ্ন সায়ংকালে যথাক্রমে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে; সুতরাং শাক্ত শৈবের নিন্দা দেখিয়া শক্তির উপাসক শিবোপাসক মাত্রের জন্য জাহান্নমে গমনের কল্পনা করিলে বড়ই বিভ্রাট ঘটিবে। এমন কি, বুদ্ধরূপী বিষ্ণুর উপাসনাতেও নিন্দার কোনও কারণ নাই। হিন্দুসমাজে চিরদিন দশাবতারের পূজা চলিয়া আসিতেছে, অদ্যাপি কর্ম্মাদিতে অন্ততঃ গন্ধ পুষ্পের দ্বারা দশাবতারের পূজা করা হয়। বুদ্ধকে বাদ দিলে দশাবতার পূর্ণ হয় না। তান্ত্রিকানুষ্ঠানে বুদ্ধের তর্পণ পদ্ধতি হিন্দুতন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়।

এইস্থলে আর এক কথা বলা আবশ্যক যে, তান্ত্রিক বুদ্ধ শাক্য বুদ্ধ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইনি মহা চীন দেশবাসী এবং প্রকট-কৌলাচারের প্রবর্ত্তয়িতা; সুতরাং নামমাত্র সাম্যে উভয়ের একত্ব বুঝিলে বড়ই ভুল করা হইবে।

শুদ্ধোদন পুত্রের জন্ম-পত্রিকা ধরিয়া চীনবাসি বুদ্ধের সময় ঠিক করিতে গেলে হাস্যাস্পদ হইতে হইবে।

বৌদ্ধধর্ম্মের "হীনযান" ও "মহাযান" এই দুই বিভাগের পৌর্ব্বাপর্য্য নির্দ্ধারণও সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। কারণ এই সকল ধর্ম্ম স্মরণাতীত কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। তবে এক শ্রেণীর পাশ্চাত্য সিদ্ধান্তের একটা প্রণালী সময় নির্দ্ধারণের পক্ষে বড়ই সহজ এবং কৌতুকাবহ; তাহা এইরূপ, হেমাদ্রির গ্রন্থে বায়ুপুরাণের বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, হেমাদ্রি পাঁচ শত কি সাত শত বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন; অতএব বায়ুপুরাণ পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে। ইহাঁদের এতটুকু ভাবিবার অবসর নাই যে, কোনও নিবন্ধকারই

* বৌদ্ধাঃ সৌগতাঃ। শ্রাবকাঃ শ্বেতপটাঃ। নিগ্রন্থা জৈনাঃ।
শাক্তাঃ কৌলাঃ। জীবকা বার্হস্পত্যাঃ চার্ব্বাকাইতি যাবৎ।
কপিলঃ, লোকায়তিক-দেশীয়ঃ, তেন প্রণীতাঃ কাপিলাঃ।

নিজে পুরাণাদি প্রস্তুত করেন নাই। তাঁহারা প্রসিদ্ধ পুরাণাদি হইতেই প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন মাত্র। এমন কি, তাঁহারা একাধিক পুরাণে এবং সংহিতায় যে বচন দেখিতে পাইয়াছেন, তাহা প্রমাণরূপে উপন্যস্ত করিবার সময়ে প্রত্যেক গ্রন্থের নামোল্লেখ করিয়াছেন।

মোটের উপর দেখা যায়, যিনি যে গ্রন্থের যতটুক দেখিয়াছেন, তদতিরিক্ত বিষয়ের অস্তিত্ব স্বীকার না করাই পাশ্চাত্য মীমাংসা প্রণালীর মূল সূত্র। পাশ্চাত্য মনীষীর সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিয়াই বাঙ্গালী ঐতিহাসিক ধর্ম্ম মীমাংসায় জাতি নির্ণয়ে ব্যাপৃত হইয়া নানারূপ অদ্ভুত মতের উপন্যাস করিতেছেন। নিবন্ধ গ্রন্থে প্রাচীন নিবন্ধকারের বাক্যের ন্যায় "ওয়েভার্ বলিয়াছেন, জেকবি বলিয়াছেন, হর্লি বলিয়াছেন" ইত্যাদিরূপ বাক্যপ্রয়োগ বাঙ্গালী ঐতিহাসিকের গ্রন্থে পদে পদে দৃষ্ট হয়। যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের দুর্জ্জ্ঞেয় মর্ম্মাবধারণে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, তাঁহাদের অভিমতের মূল্য যে কত, তাহা স্বতন্ত্রপ্রজ্ঞ সুধীগণ একবার বিবেচনা করিবেন। কিন্তু পাশ্চাত্য মনীষিদিগের একটি প্রধান গুণ আছে যে, তাঁহারা নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিলে তৎক্ষণাৎ স্বকীয় সিদ্ধান্ত ছাড়িয়া দিতে কুণ্ঠিত হন না। বাঙ্গালী ঐতিহাসিকের পন্থা ইহার বিপরীত, তাঁহারা অনেক স্থলে অভিনব পাশ্চাত্য সিদ্ধান্তের খবর না রাখিয়া পুরাতন খণ্ডিত সিদ্ধান্তই প্রচার করিয়া থাকেন।

পাশ্চাত্য সিদ্ধান্তের অনুসরণের ফলেই হউক, অথবা কোনও গূঢ় উদ্দেশ্য সাধনের অভিপ্রায়েই হউক, এক শ্রেণীর ঐতিহাসিকের গ্রন্থে হিন্দুধর্ম্মের অনেক স্থলেই বৌদ্ধ-বিভীষিকার পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাদের মতে বাঙ্গলার অনেক ব্রাহ্মণে বৌদ্ধ হইয়া গিয়াছিল, ক্রমে তাহারা আবার হিন্দু হইয়াছে। এইস্থলে সিদ্ধান্তীর নিকট আমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারি যে, বৌদ্ধ হইয়া যাওয়াটা কি? বৌদ্ধের মধ্যে কি জাতিভেদ ছিল না? যদি জাতিভেদ না থাকাই সিদ্ধান্ত হয়, তবে তাহার প্রমাণ কোথায়? পক্ষান্তরে যদি জাতিভেদ থাকে, তবে বুদ্ধকে পূজা করিয়াই বৌদ্ধ হইয়াছিল, এমত বলিতে হইবে, তাহা হইলে "ছিল" এমত বলা চলে না, কারণ অদ্যাপি বুদ্ধের পূজা করা হয়; সুতরাং সমস্ত বাঙ্গালীই অদ্যাপি বৌদ্ধ। যে সকল আচরণ বৌদ্ধধর্ম্মের নিজস্ব বলিয়া অবধারিত হইয়াছে, তাহা আদৌ বৌদ্ধের কি হিন্দুর? এ বিষয়ের মীমাংসাই সর্ব্বতোভাবে করা কর্ত্তব্য, কারণ অনভিজ্ঞতার ফলে অনেক স্থলেই দেখা যায় যে, একের জিনিষ অপরের বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে শম্ভুরুবাচ—

নগ্নাদীন্ ভগবন্ সম্যক্ মমাগু পরিপৃচ্ছতঃ
আচক্ষ্ব সর্ব্বথা সর্ব্বান্ বিস্তরেণ যথাতথম্ ॥
এবমুক্তো মহাতেজা বৃহস্পতি রুবাচ তম্
পুরাদেবাসুরে যুদ্ধে নির্জ্জিতেষ্বসুরেষ্বথ ॥
পাষণ্ডাধিকৃতাঃ সর্ব্বে হ্যেতে সৃষ্টাঃ স্বয়ম্ভুবা
তপশ্চরৎ সু সর্ব্বেষু অসুরেষু চ পার্থিব ॥
সুদুস্তরাং মহামায়া মাসাগু সুরনোদিতঃ
মোহয়ামাস যোগাত্মা ততো বিম্নায়তান্ বিভুঃ ॥
স মূঢ়ান্ বুদ্ধরূপেণ তানুবাচ মহামনাঃ
শক্যা জেতুং সুরাঃ সর্ব্বে যুষ্মাভি রিতি দর্শনৈঃ ॥
বৌদ্ধংধর্ম্মং সমাস্থায় শাক্যা স্তেহনুবভূবিরে
তানুবাচার্হতেমস্তে যূয়ং ভূত্বা চ তদ্বিধাঃ ॥
জ্ঞানেন সহিতং ধর্ম্মং তেনার্হন্ত ইতি স্মৃতাঃ
বুদ্ধ-শ্রাবক-নিগ্রন্থাঃ সিদ্ধপুত্রা স্তথৈবচ ॥
এতে চ সর্ব্বে চার্হন্তো বিজ্ঞেয়া দুষ্টচারিণঃ
ত্রয়ীক্লেশং সমুৎসৃজ্য জীবতেত্যব্রবীত্তু যান্ ॥
জীবকা নাম তে জাতাঃ সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতাঃ
যান্ ভূত্বা দিব্যবদ্বোস্মি ধর্ম্মান্ বৈ প্রত্যপাদয়ৎ ॥
কাপিলা স্তেপি সংপ্রোক্তাঃ কপিলোহি দিবাকরঃ
চরদ্ধ স্তানুবাচেদং মচ্ছাশন মতিহ্যতি ॥
চরকাস্তেপি বিজ্ঞেয়া অধর্ম্মচরণাঃ শঠাঃ
দীর্ঘং চীর মিতি প্রোক্তং সূক্ষ্মং বা ধর্ম্মরূপকম্ ॥
ধর্ম্ম শ্চরদ্ধ মিত্যুক্তো যস্মা তে দীর্ঘচক্ষুষঃ
চীরাণি চৈব নীলানি বিভ্রাণা শ্চীরকাস্ততঃ ॥
এষ চোক্ষতি সং বুদ্ধো ধর্ম্ম স্তং শ্রয়তেতি যৎ
উবাচ মায়য়া বিষ্ণু স্তেহি চৌক্ষাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥
সত্বং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভগবানিতি চাব্রবীৎ
সাত্বতা স্তেহপি বিজ্ঞেয়া উক্তা ভাগবতা শ্চ যে ॥
বিড়্ভক্ষা শ্চৈব যে কেচিৎ কপালকৃত-ভূষণাঃ
শৈবাঃ পাশুপতা শ্চান্যে পাঞ্চরাত্রা স্তথাপরে ॥
তথান্যে চ দুরাত্মনঃ সর্ব্বেপ্যাসুরদৈবতাঃ
নৈরাত্ম্যবাদিনশ্চৈব অবজ্ঞা নাস্তিবাদিনঃ ॥

অদৃষ্ট-চক্র।*

[লেখক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ সোম এল্, এম্, এস্।]

(১)

মৃত্যুশয্যায় হরিশ তাহার একমাত্র মাতৃহীন পুত্র সুরেশকে কনিষ্ঠ গিরিশের হাতে সঁপিয়া দিয়াছিল। গিরিশ মনুষ্যত্বের খাতিরে, লোকনিন্দার ভয়ে বা স্বীয় স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য অগ্রজের নিকট হইতে তাঁহার পুত্রের ভার গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে নিশ্চিন্ত হইয়া মৃত্যুর অবকাশ দিয়াছিল। কিন্তু দুই মাস অতিবাহিত হইতে না হইতে ভ্রাতষ্পুত্রের গুরুভারে গিরিশ নিষ্পেশিত হইয়া পড়িবার মত হইল এবং একদিন তাহাকে স্পষ্ট কথায় বলিল—"দেখ সুরেশ, আমি বাপু তোমার ভার নিয়ে চালাতে পার্‌ছি না। আমার আয় অল্প তা'ত জানই।"

সুরেশ বলিল "কাকা, এখনও দু'মাস হয়নি বাবা মারা গেছেন, সাম্‌নেই আমার পরীক্ষা, এখন আমরা দাঁড়াই কোথা? অন্ততঃ আমার পরীক্ষাটা অবধি থাক্‌তে দিন।"

গিরিশ বলিল "বাপু, তোমার পরীক্ষার এখনও তিন মাস বাকী, আমার কাল কি ক'রে চল্‌বে তার ঠিক নেই, তোমায় রাখি কি করে?"

যতদিন হরিশ বাঁচিয়াছিল যাহা উপার্জ্জন করিত গিরিশের হাতে দিত। জ্যেষ্ঠ হইলেও সে নিজে সংসারের কোনও গোলমালে থাকিতে ভালবাসিত না। ফলে গিরিশচন্দ্র বেশ গুছাইয়া লইয়াছিল। গিরিশচন্দ্রের আয় যে খুব বেশী ছিল তাহা নহে, কিন্তু পরিমিত ব্যয়ে তাহার সংসার বেশ স্বচ্ছলে চলিয়া যাইত।

সুরেশ অনেক কাকুতি মিনতি করিল, কিন্তু পাষাণ-হৃদয় গিরিশের মন টলিল না। অগত্যা সুরেশচন্দ্রকে পিতৃব্য-গৃহ হইতে স্থানান্তরে গমন করিতে হইল।

(২)

একটা গলির মধ্যে এক গৃহস্থের বাটীর নিম্নতলে ছোট একখানি ঘরে সুরেশচন্দ্র আশ্রয় পাইল। তাহার ঘরের ভাড়া লাগিবে না। ভাড়ার পরিবর্ত্তে

* সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত।

গৃহস্বামী বরদা বাবুর একটী ছেলেকে পড়াইতে হইবে ও সে একবেলা আহার পাইবে। বরদা বাবুর অবস্থা ভাল ছিল না, তবে পৈত্রিক ভিটাটুকু থাকায় সামান্য আয়ে এক প্রকার চলিয়া যাইতেছিল। বরদা বাবুর গৃহিণী নিজে রাঁধিত ; সুরেশ সে সময়ে তাহার কোলের এক বৎসরের ছেলেটীকে লইয়া বসিয়া থাকিত। এমনই করিয়া তিন মাস অর্দ্ধাশনে দারিদ্র্য-রাক্ষসীর সহিত দ্বন্দ্ব করিয়া নিরাশ্রয় সুরেশ প্রবেশিকা-পরীক্ষা দিল।

(৩)

"হ্যাঁ সুরেশ দাদা তুমি পাশ হ'লে আমাদের বাড়ী আর থাক্‌বে না"—বরদা বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র, সুরেশের ছাত্র, সপ্তম বর্ষীয় সুধীর, ঔৎসুক্যের সহিত এই কথা জিজ্ঞাসা করিল।

"আমি আর কোথায় যাব ভাই, আমার আর কে আছে !"

"কেন তোমার মা নেই, বাবা নেই ?" শিশু সুধীর মনে জানিত মানুষের বাপ মা চিরদিন থাকে, তাহা না হইলে মানুষ বাঁচে কেমন করিয়া !

নয়নের অশ্রু লুকাইয়া সুরেশ বলিল "আমার কেউ নেই !"

সুধীর আবার বলিল "তাঁরা কোথায় ?"

অশ্রুবিজড়িত স্বরে ঊর্দ্ধে অঙ্গুলী-নির্দ্দেশ করিয়া সুরেশ বলিল "ওই, ওই স্বর্গে !"

"ওখানে কেমন ক'রে যে'তে হয়, সুরেশ দাদা ?"

"ও অনেক দূর, ওখানে যাওয়া যায় না।"

"হ্যাঁ সুরেশ দাদা, আমার মাকে তুমি ত মা বল ; মা'ও ত তোমার মা ?"

মা'র নামে সুরেশের চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইল, সে বলিল, "হ্যাঁ ভাই, তোমার মা'ই আমার মা।"

দুই জনে এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় বরদা বাবু আপিস হইতে গৃহে ফিরিয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। সুরেশকে দেখিয়া তিনি সানন্দে বলিয়া উঠিলেন, "সুরেশ, আজ খবর টাঙ্গিয়ে দিয়েছে, তুমি প্রথম বিভাগে পাশ হয়েছ।"

সুরেশের অশ্রুক্লিষ্ট মুখ আনন্দোৎফুল্ল হইয়া উঠিল। বরদা বাবু সুরেশের চোখে জল দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সুরেশ, তুমি কাঁদছিলে ?"

সুরেশ নতমুখে বলিল, "খোকা আমার মার কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ছিল, সেই কথা বল্‌ছিলুম।"

বরদা বাবু বলিয়া উঠিলেন, "খোকা, মাষ্টারের সঙ্গে বুঝি তোমার ওই সব কথা হয় ?"

খোকা বলিল,—"মাষ্টার নয়, সুরেশ দাদা !"

(৪)

গেজেটে বাহির হইল সুরেশ ১৫৲ টাকা বৃত্তি পাইয়াছে। এখন সুরেশকে আর একবেলা খাইতে হয় না। বরদা বাবুর সংসারেই কিঞ্চিৎ অর্থ-সাহায্য করিয়া তাহার তুইবেলা আহার হইত। সুধীরকে সে সহোদরের ন্যায় ভালবাসিত ও অতি যত্ন সহকারে শিক্ষা দিত। কয়েক বৎসরের মধ্যেই মেধাবী সুরেশ আইন-পরীক্ষায় সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইল। বৃত্তি পাওয়ায় তাহার পাঠের কোন অসুবিধা হয় নাই। এক্ষণে সে সংসার-সমুদ্রে ঝম্প প্রদান করিল; কিন্তু অর্থহীন নিঃসম্বল সে, জগতে একাকী, কে তাহার সহায় হইবে ?

(৫)

ছোট আদালতের উকীল রসিক বাবুর স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ায় সহরের বড় ডাক্তারেরা তাঁহার বায়ু-পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা করিলেন। রসিক বাবু বড় উকীল, 'হিসেবী' সে কারণ কৃপণ। তাঁহার পক্ষে এত টাকার পসার ছাড়িয়া বিদেশে যাওয়া ব্যাধি অপেক্ষা ভয়ঙ্কর। বিদেশে যাইলে যাহার হাতে কাজের ভার দিয়া যাইবেন সেই কাজ মারিয়া লইতে পারে। তিনি নিজে উকীল হইয়া উকীলকে বিশ্বাস করিতেন না। তবে তেমন বিষয়বুদ্ধি অনভিজ্ঞ লোক পাইলে তাঁহার চিন্তার কারণ ছিল না। রসিক বাবু বরদা বাবুর আত্মীয়। তিনি একদিন বরদা বাবুকে বলিলেন, "হ্যাঁ হে, তোমার বাড়ীতে সেই যে ছেলেটী থাকৃত সে এবারে উকীল হয়েছে না ?—ছোকরাটী লোক কেমন হে ?"

বরদা বলিল, "খুব ভাল ছোকরা, আপনি যদি একটু সাহায্য করেন, তা'হলে সে আপনার খুব অনুগত হ'য়ে থাকৃবে।"

"বটে ! আচ্ছা তাকে একবার আমার কাছে পাঠিয়ে দিওত।"

"বেশ" বলিয়া বরদা বাবু সুরেশকে খবর দিতে চলিয়া গেল।

(৬)

"দেখ বাপু আমার সেরেস্তার খরচ সমস্ত তোমায় দিতে হ'বে, মুহুরির মাহিনা, গাড়ী ঘোড়ার খরচ, চাকর বাকরের মাহিনা সব তোমায় দিতে হইবে, বাকী যা থাকৃবে তার বার আনা অংশ আমায় পাঠিয়ে দিতে হ'বে, বুঝলে ?"

সুরেশ নতমুখে বলিল, "আপনি যা বল্‌বেন তাতেই আমি রাজি আছি, আমায় দু'মুটো অনুগ্রহ ক'রে খেতে দিবেন, তা ছাড়া আমি বেশী কিছু চাই নে।"

"বটে! তুমি ত বেশ খাসা ছোকরা দেখ্‌ছি। ভাল, ভাল—দেখ গোড়ায় গোড়ায় তোমার কিছু থাক্‌বে না বটে, কিন্তু আমি এসে তোমায় কাজ শিখিয়ে দেব, তখন তুমি এক রকম চালিয়ে নিতে পার্‌বে।"

কথা ঠিক পাকা হইয়া গেল। সুরেশচন্দ্র রসিক বাবুর আদেশ মত চিনির বলদ হইয়া কাজ চালাইতে লাগিল।

(৭)

পুরুষের ভাগ্যের কথা দেবতারও অজ্ঞাত, মানুষের ত পরের কথা। সুরেশের পূর্ব্বে অনেক উকীল আদালতে আসিয়াছে, পরেও অনেকে আসিয়াছে। পসার লাভ অতি অল্পের ভাগ্যেই ঘটিয়াছে। সুরেশচন্দ্র কেমন করিয়া কখন যে পসারের তুঙ্গ শৃঙ্গে আরোহণ করিল, কেহই জানিতে পারিল না।

রসিক বাবু যেমন বলিয়া গিয়াছিলেন সুরেশচন্দ্র তাঁহাকে তিন ভাগ টাকা পাঠাইয়া দিয়াছিল ও তাঁহার অন্যান্য সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিয়াছিল। তাহার কার্য্যে মক্কেলেরা এত সন্তুষ্ট হইয়াছিল যে, অনেকে আসিয়া কার্য্যের জন্য তাহারই খোঁজ করিত।

রসিক বাবু সুস্থ দেহে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "কেমন হে, কাজ কর্ম্ম বুঝতে পার্‌ছ ত? এইবার আমি তোমায় একটু একটু করে কাজ শিখিয়ে দেব, কিন্তু বাপু গোড়াতেই পয়সার দিকে লোভ কর্‌লে চল্‌বে না।"

"আজ্ঞে না, আপনি যেমন অনুমতি কর্‌বেন আমি ঠিক তেমনই কাজ কর্‌বো। সামান্য রকম কাজ শিখে আমি যে আপনার কাজ বজায় রাখ্‌তে পেরেছি, এই আমার পরম সৌভাগ্য।"

"হ্যাঁ, তা পেরেছ বটে, সে জন্য আমি খুব খুসী হয়েছি—দেখ এর জন্য তুমি যাতে মাসে মাসে জল খাবারের পয়সাটা পাও সেজন্য আমি বিশেষ চেষ্টা কর্‌ব, কিন্তু দেখ, প্রথম প্রথম পয়সার লোভ কর্‌লে চল্‌বে না।"

"আপনার আমার প্রতি এ দয়ার জন্য খুব উপকৃত হলুম" ঈষৎ হাসিয়া এই কথা বলিয়া সুরেশ সে স্থান ত্যাগ করিল।

রসিক বাবু দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন যে, এই তিন মাস সময়ের মধ্যে মক্কেল মহলে সুরেশের বিশেষ প্রতিপত্তি হইয়া গিয়াছে!

(৮)

এদিকে গিরিশের অবস্থা দিন দিন বড়ই শোচনীয় হইয়া আসিতে লাগিল। হিসাবের গোল হওয়াতে তাহাকে কার্য্যচ্যুত হইতে হয়। অনেকগুলি পুত্র কন্যা লইয়া তাহাকে অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িতে হইল। বিপদ কখনও একলা আসে না। এই সময় হঠাৎ তাহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল। অনেক দিন শয্যাগত থাকাতে তাহার সামান্য যাহা কিছু সঞ্চিত ছিল তাহা সমস্তই ব্যয় হইয়া গেল। যাহাদের উপার্জ্জন খুব বেশী নহে তাহাদের বেশী দিন শয্যাগত থাকা যে কি বিপদজনক তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত কেহই জানে না। গিরিশের ক্রমে ঋণ হইতে লাগিল। প্রথমে গৃহিণীর অলঙ্কার,পরে ঘটী বাটী বন্ধক পড়িতে লাগিল। শেষে এমন হইল আর বন্ধক দিবার কিছুই নাই। অর্থাভাবে রোগীর চিকিৎসা বন্ধ হইল; পথ্য বন্ধ হইল। সহরের ডাক্তার বিনা পয়সায় রোগী দেখে না। যখন গিরিশের অন্তিম অবস্থা, তখন নিরুপায় হইয়া সে তাহার স্ত্রীকে বলিল—"দেখ, সুরেশকে আমি অসময়ে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি, সেই পাপে আমার আজ এই কষ্ট। মরবার আগে একবার তার কাছে মাপ চেয়ে যাব!"

স্ত্রী বলিল, "তার কাছে আমাদের কি মুখ আছে—ডাক্‌লে পর সে সেই কথা মনে করে আমাদের মুখ দেখ্‌বে না। আজ যদি তাকে রাখ্‌তে পার্‌তুম, তা হ'লে আমাদের এ কষ্টে পড়্‌তে হ'ত না।"

"একবার তাকে বলে পাঠাতে পার, আমার শেষ সময় তাকে না দেখে আমি মর্‌তে পার্‌ব না—সে হয়ত ফিরে আস্‌তে পারে।"

* * *

সুরেশচন্দ্র সংবাদ পাইল, তাহার কাকা অন্তিম সময়ে তাহাকে দেখিতে চাহিয়াছে!

অভিমানবশে এত দিন সংবাদ লয় নাই বলিয়া অনুতপ্ত সুরেশচন্দ্র উত্তেজিত ভাবে—যথায় রোগক্লিষ্ট শীর্ণদেহ পিতৃব্য শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে—সেই নীরব কক্ষে প্রবেশ করিল।

গিরিশ বলিল, "বাবা সুরেশ! আমায় ক্ষমা কর। অসময়ে তোমায় নিরাশ্রয় করে যথেষ্ট শাস্তি পাচ্ছি।"

সুরেশ বলিল, "কাকা মাপ চেয়ে আমার অকল্যাণ কর্‌বেন না। দোষ আমারই, আমিই অভিমান ক'রে আপনার খবর নিইনি, সেজন্য আমাকে ক্ষমা করুন।"

সুরেশের কথায় গিরিশ কেমন হইয়া গেল। তাহার মুখে কথা নাই, চক্ষু বিস্ফারিত, আনন্দাশ্রুসিক্ত। দূরে সুরেশের খুড়িমা বসিয়া অঞ্চলপ্রান্তে অশ্রু মুছিতেছিল। সুরেশ অশ্রুবিজড়িত নয়নে খুল্লতাতকে হাতে ধরিয়া তুলিল ও বলিল—"এখানে আপনাদের থাক্‌তে দেব না। আমার বাড়ীতে চলুন, আপনি ভাল হয়ে আশীর্ব্বাদ কর্‌বেন, তাহাতেই আমার প্রাণে শান্তি আসিবে, আমার উন্নতি সার্থক হইবে।"

স্বদেশ-সেবা।

[লেখক—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।]

কেবল রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য হইলেই জাতীয়তার বিকাশ হয় না, কেবল পাশ্চাত্যের মত নির্ব্বাচন-প্রণালীতে ব্যবস্থাপক সভা গঠিত হইলেই "দেশোদ্ধার" হয় না, একথাটা আমরা এতকাল ধরিয়া বুঝিয়াও কেন বুঝিতে পারি না, এ এক বিষম সমস্যা। কথাটা বলিলে অপ্রিয়ভাজন হইতে হয়, কিন্তু এ সমস্যা ভঞ্জন করিতে গেলে ইহার সত্য কারণটুকুর উল্লেখ না করিলেও উপায় নাই। বাঙ্গালী বিলাসপ্রিয় হইয়াছে, বাঙ্গালী অল্প কাজ করিয়া অধিক মজুরী দাবী করিতে শিখিয়াছে, বাঙ্গালী নামের কাঙ্গাল হইয়াছে, অথচ কাজ করিয়া নাম কিনিবার শক্তি ও সামর্থ্য তাহার নাই। তাই যে কাজ করিলে অল্প পরিশ্রমে অধিক মজুরী পাওয়া যায়, যে কাজ করিলে নিজের ব্যারিষ্টারী, ওকালতী, ডাক্তারী, জমিদারী পেশায় দেশের লোকের নিকট হইতে অর্থ উপার্জ্জন করিতে করিতে অল্প আয়াসে দেশভক্ত, দেশসেবক, সাহিত্যিক প্রভৃতি পদবী পাওয়া যায়, বাঙ্গালী সেই কাজে সরফরাজি করে। মাঝে মাঝে সভাসমিতি করিয়া দুই চারিটা বক্তৃতা দেওয়া ব্যতীত রাজনৈতিক অধিকার লাভের জন্য অধিক পরিশ্রম করিতে হয় না। তাই বছরে একবার করিয়া কংগ্রেসে মিশিয়া তারস্বরে আমরা চীৎকার করিয়া বলি—"আমাদের স্বায়ত্ত শাসন দাও, ইংরাজ দেখিবে আমরা কেমন লায়েক হইয়াছি।" বাঙ্গালীর জাতীয়তার বিকাশ করিতে গেলে আরও অনেক কঠিন গুরুভার বহন করিতে হয়, অনেক স্বার্থত্যাগ করিতে হয়, বুদ্ধিমান বাঙ্গালী সে কথা সম্যকরূপে

বিদিত। কিন্তু পরিশ্রম করিতে, স্বার্থত্যাগ করিতে আমরা একান্ত নারাজ। দেশসেবক বলিয়া পরিগণিত হইবার নেশাটাও আমাদের বেশ জমিয়া গিয়াছে। তাই বিনা পরিশ্রমে ষোল-আনা স্বার্থ বজায় রাখিয়া যেটুকু দেশসেবা সম্ভবপর, আমরা কেবল ততটুকু দেশসেবা করিতে বিধিমতে কৃতসঙ্কল্প। তাই দেশহিতৈষার সম্পূর্ণ বিকাশ করিতে পারি না, তাই বুঝিয়াও বুঝি না যে কেবল রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য হইলেই আমাদের জাতীয়তার বিকাশ হইবে না, কেবল পাশ্চাত্যের মত নির্ব্বাচন-প্রণালীতে ব্যবস্থাপক সভা গঠিত হইলেই "দেশোদ্ধার" হইবে না। সমাজটি একটি দেহ বিশেষ, তাহার সকল অঙ্গগুলি সবল ও কর্ম্মঠ না হইলে সমস্ত দেহটির পরিপোষণ ও বলবৃদ্ধি একেবারে অসম্ভব।

রাজনৈতিক বীরেরা আপনাদের কর্ম্মের উপকারিতা সম্বন্ধে যে যুক্তি প্রয়োগ করেন তাহার মূলে সত্য নাই, সে কথা বলিতেছি না। বাস্তবিক বিদেশী রাজাকে নিজেদের অভাব অভিযোগ না জানাইলে রাজকার্য্য সুচারুরূপে পরিচালিত হইতে পারে না। কংগ্রেসের মত সভা করিয়া পরস্পরের মনোভাবের আদান প্রদান না হইলে দেশের অভাবের তালিকাও সম্পূর্ণ হয় না। ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিতে পারিলে আমাদের পক্ষ হইতে সরকারের নিকট অনেক কথা বলিতে পারা যায়, সে কথাও মানি। কিন্তু যে সকল অভাবের প্রতিকারের ক্ষমতা আমাদের নিজেদের হাতে ন্যস্ত, যে সকল উন্নতি আমরা নিজেদের উদ্যমে সাধিত করিতে পারি, এমন কি যে সকল কাজ আমাদের আপনাদের উদ্যম ব্যতীত সম্পন্ন হইতে পারে না, সেই সকল অভাব মোচনের জন্য, সেই সকল উন্নতি সাধনের জন্য, সেই সকল কার্য্য-সম্পাদনের জন্য আমরা সোজাপথ ছাড়িয়া কেবল বক্তৃতা করি কেন, শাসনকর্ত্তাদের দোষ দিয়াই কর্ত্তব্য-সাধন করি কেন? আমাদের মধ্যে কেমন একটা ধারণা হইয়া গিয়াছে যে, দেশহিতৈষী বলিলে রাজনৈতিক বক্তৃতা-বাগীশকে বুঝায়। যে প্রকৃত-পক্ষে দেশের কল্যাণ সাধন করিতে পারে, তাহার নাম অনেক সময় লোককর্ণের গোচরীভূত হয় না। অনেক সময়ে তাহাকে দারুণ অভাবে বিব্রত হইতে হয়, স্বজাতির জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করিতে হয়। দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমাদের মধ্যে এরূপ নীরব সাধনা করিবার শক্তি ও সামর্থ্য বড় কম।

দেশের কি বিষয়ের অভাব, কোন্ পথে চলিলে আমাদের অভাব ঘুচিবে, একথা লইয়া আন্দোলন করা আবশ্যক, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাই আদর্শ নির্দ্ধারণ করিবার জন্য প্রত্যেক সমাজে এক শ্রেণীর লোকের আবশ্যক। কিন্তু

সেই আদর্শ পথ স্থিরীকৃত হইলে, সেই আদর্শ-সিদ্ধির জন্য কর্ম্মবীরের অধিক আবশ্যক। কেবল সমাজের সম্মুখে একটি আদর্শ চিত্র আঁকিয়া ধরিলে সমাজের কাজ করা হয় না। প্রকৃত নায়ক হইতে গেলে লোককে সঙ্গে করিয়া লইয়া আদর্শের দিকে ছুটিতে হয়। যতদিন সমাজে সে শ্রেণীর নায়ক না জন্মে ততদিন সমাজ আদর্শের দিকে ছুটিতে পারে না। সমাজের দেহের জড়তা বড় বেশী। সেই জড়তা কাটাইয়া নিজের উদ্যমে ছুটিবার সামর্থ্য সমাজের আছে কি না সন্দেহ। নায়ক বিলাস-বিলোল-চক্ষে সমাজের দিকে চাহিয়া কর্ত্তব্য-সাধন করিবার আজ্ঞা দিয়া নিজের স্বচ্ছন্দতার জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিলে, সমাজ অগ্রসর হইতে পারে না। একজন বড় ইংরাজ বলিয়াছিলেন—"আমি আমার লোকেদের বলি না—যাও; আমি বলি—এস। আমি তাহাদের পথ দেখাইয়া লইয়া যাই। তাই তাহারা অত দ্রুত চলিতে পারে। তাই আমাদের সম্মিলিত চেষ্টার ফল এত মিষ্ট।"

দেশভক্তি হৃদয়ের বৃত্তি। দেশভক্তের প্রাণ প্রেমে পূর্ণ থাকা আবশ্যক। যে যশের জন্য স্বজাতির সেবা করে, সে ভক্ত নয় ভণ্ড। যে দেশের লোকের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রার্থনা করে, তাহার দেশভক্তি তামসিক, সে ভক্তের সিদ্ধি নাই। যে পরের উপর ঈর্ষা করিয়া দেশসেবা করিবার ভাণ করে, যে দেশের লোকের পক্ষ সমর্থন করিয়া বিপক্ষ পক্ষের প্রতি গালি বর্ষণ করিয়া দেশের লোকের নিকট বাহাদুরী দেখায়, তাহার দেশসেবা কুটিলতার নামান্তর মাত্র। যাহাদের উপর দেশের শাসনভার ন্যস্ত, কেবল তাহাদিগের কার্য্যের ছিদ্র অনুসন্ধান করিয়া তাহাদের কার্য্যের সমালোচনা করিয়া এক শ্রেণীর দেশসেবক দেশে প্রতিপত্তি স্থাপন করিতে কৃতচেষ্ট। কিন্তু দেশের উন্নতি করিতে গেলে কেবল ভাঙ্গিবার চেষ্টা করা বাতুলতা। উপস্থিত রাষ্ট্র-শাসন ব্যবস্থা মন্দ, উপস্থিত আইনের বিধিব্যবস্থা ভারতবাসীর উন্নতির পরিপন্থী, আধুনিক রাজপুরুষদিগের কর্ত্তব্যবোধ নাই—কেবল এইরূপ ভাবে দোষ দেখাইয়া বিপ্লবের সূত্রপাত করিলে দেশের কার্য্য হয় না। বিধাতার শাসনে অনেক বিধি আছে যাহা আমরা ঠিক বুঝিতে পারি না। যাহারা সেই বিধি পরিবর্ত্তনের জন্য আজন্ম মাথা খুঁড়িয়া বেড়ায় তাহাদের মাথা খোঁড়া সার হয়। যে ব্যক্তি পাহাড়ের নীচে আসিয়া বসিয়া থাকে, ভূমিকম্প হইয়া পাহাড় ধসিলে তবে গিরি লঙ্ঘন করিবে এইরূপ বাসনা করে, তাহার বাসনার কতদূর সিদ্ধি হইতে পারে তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না।

তাই বলিতেছিলাম—কেবল ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিলে দেশের কল্যাণ সাধিত হয় না, কেবল সমালোচনা করিলে শাসন-যন্ত্র সংশোধিত হয় না। দেশকে বড় করিতে গেলে দেশকে গড়িতে হয়। সমাজের প্রত্যেক অঙ্গ গড়িয়া তুলিতে হইবে। যাহাতে প্রকৃষ্টরূপে কৃষিকার্য্য সম্পন্ন হয়, যাহাতে দেশের লোকে শিল্প-কার্য্যে মনোনিবেশ করে, যাহাতে এক গ্রামের হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান এক উদ্দেশ্যে স্বগ্রামের উন্নতি-সাধন করিতে কৃতসঙ্কল্প হয়, যাহাতে জমিদার ও প্রজা সম্মিলিত হইয়া দেশের স্বাস্থ্যোন্নতির বিধান করে, যাহাতে পল্লী-সমাজে পাপ প্রবেশ করিতে না পারে—সেই ব্যবস্থা করিতে না পারিলে, আমাদের প্রকৃত উন্নতি সুদূরপরাহত। কেবল ঢক্কা-নিনাদ করিয়া এ সকল আদর্শের তালিকা বিবৃত করিলে চলিবে না। এ সকল কথা তো বহু দিন ধরিয়া আমরা শুনিয়া আসিতেছি। যাহারা এই মন্ত্র বিশ্বাস করে, যাহারা এই মন্ত্রে দীক্ষিত, তাহারা এই মন্ত্রের সাধনা করিতে দৃঢ়চেষ্ট না হইলে কোন কার্য্যই হইবে না। চেষ্টা করিতে হইবে কার্য্যে—বচনে নয়। সাধনা করিতে হইবে শিষ্যের মত পরিশ্রম করিয়া, কেবল গুরুঠাকুরের মত নিরীহ পল্লীবাসীর কর্ণে সুপরামর্শ দিয়া নয়। সহরে বাস করিবার মোহ কাটাইয়া, সহরের বিলাসিতা উপভোগের লোভ সম্বরণ করিয়া, খবরের কাগজে দেশহিতৈষীর তালিকায় নাম উঠিবে তাহা দেখিয়া চরিতার্থ হইবার ছেলে-মানুষি আশায় জলাঞ্জলি দিয়া, দেশের কৃতবিদ্য মাতৃভক্ত সুসন্তানদের স্বার্থত্যাগ করিয়া পল্লীগ্রামে বাস করিতে হইবে। নিজের জন্মভূমির ক্রোড় ছাড়িয়া সহরে পলাইয়া আসিলে চলিবে না। কেবল দেশের ইষ্ট কামনা করিলে দেশের মঙ্গল হইবে না, দেশের মঙ্গলের জন্য পরিশ্রম করিতে হইবে, দেশের মঙ্গলের জন্য স্বার্থত্যাগ করিতে হইবে। "উদ্যমেন হি সিদ্ধন্তি কার্য্যানি ন মনোরথৈঃ।" উদ্যম ব্যতিরেকে সিদ্ধি-লাভ অসম্ভব। মনোরথে কি হইবে? রাজপুরুষের নিকট স্বত্ব ভিক্ষা করিলে কি হইবে? রাজপুরুষ অনেক করিয়াছে, অনেক করিতেছে। আমরা কি করিয়াছি, আর কি করিতেছি?

অধুনা আমাদের যত কিছু শিল্প-বিস্তারের চেষ্টা হইতেছে—চেষ্টা হইতেছে বলি কেন, যত কিছু জল্পনা হইতেছে—তাহা সহরে বসিয়া বৃহদায়তনের শিল্পশালা খুলিবার জন্য। বড় বড় কলকারখানা বা যৌথ ব্যবসায় খুলিলে যে দেশের শিল্পোন্নতি হইবে তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু এই শ্রেণীর ব্যবসায় করিতে গেলে পাশ্চাত্যের বহুদিন স্থায়ী ব্যবসায়ের সহিত প্রতিযোগিতা

করিতে হইবে। অনেক প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া, অনেক সঞ্চিত অর্থ একত্র করিয়া, অনেক বিশেষজ্ঞের পরামর্শ লইয়া তবে এই শ্রেণীর ব্যবসায় আরম্ভ করিতে পারা যাইবে—সাফল্য দূরের কথা। এরূপ কার্য্যে সাফল্য লাভ করিবার শক্তি সকলের নাই। এরূপ কার্য্যের বাহ্যিক চটক আয়ত্ত করিয়া অনেক দুরাত্মা দেশের লোকের শোণিত শোষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছে বলিয়া আমরা সহজে সঞ্চিত অর্থ অপরের হস্তে ভরসা করিয়া অর্পণ করিতে পারি না।

দেশের উন্নতির জন্য এই শ্রেণীর বড় ব্যবসায় অত্যাবশ্যক। ব্যবসায় বড় বলিয়া ইহাদের দায়িত্বও অনেক বেশী, বাধাবিপত্তিও পর্ব্বত-প্রমাণ। যাঁহারা এ বিষয়ে আন্তরিকতার সহিত আত্মসমর্পণ করিতে পারেন, তাঁহারা ধন্য। কিন্তু সামর্থ্য না বুঝিয়া একার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে যাওয়া বাতুলতা হইবে। এ শ্রেণীর ব্যবসায়ে উন্নতি লাভ করাও সময়-সাপেক্ষ। তাই মনে হয়, কেবল এই শ্রেণীর ব্যবসায়ে সাফল্যলাভ করিবার প্রত্যাশা করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। আমাদের দেশের ছোট ছোট ব্যবসায়গুলির উন্নতি বিষয়ে উদাসীন থাকিলে আর কোনও মতে চলিবে না। কৃষিকার্য্যে মনোনিবেশ না করিলে দেশের হিত-সাধন হইবে না। পল্লী-সমাজ আবার গড়িয়া তুলিতে না পারিলে আর উপায় নাই।

তাই বলিতেছিলাম,আমাদিগকে প্রকৃত পক্ষে দেশহিতৈষী হইতে হইবে, কেবল গলাবাজি করিলে দেশের হিতসাধন হইবে না, নিজের ষোল আনা স্বার্থ বজায় রাখিয়া নায়ক সাজিলে স্বজাতিকে আদর্শের পথে লইয়া যাওয়া হইবে না, পরিশ্রম না করিয়া কেবল ফাঁকি দিয়া বাঙ্গালীর জাতীয়তা জাগাইয়া তুলিতে পারিব না। পল্লী-সমাজে বাস করিয়া, পল্লীগ্রামের প্রত্যেক কৃষক, প্রত্যেক শিল্পী, প্রত্যেক অধিবাসীর শ্রম-সাফল্যের বিধান করিবার ব্যবস্থা না করিলে, সমাজ ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সমাজকে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিলে স্বদেশের প্রকৃত সেবা করা হইবে। কেবল সমালোচনায়, ছিদ্রা-ন্বেষণে সুফল ফলিবে না।

তোমারি।

[লেখক—শ্রীঅবনীকুমার দে।]

তোমারি এ বিশ্বমাঝে যথনি যে দিকে চাই,
তোমারি অপূর্ব্ব লীলা শুধুই দেখিতে পাই।
তোমারি এ রবি শশী তোমারি এ গ্রহ তারা,
তোমারি কিরণে নাথ! পুলকে আপন-হারা।
তোমারি এ মৃদুমধু প্রবাহিত সমীরণ,
যমুনার কুলু কুলু, কুহরিত উপবন;
শ্যামলা রূপসী ধরা তোমারি পূর্ণিমা রাতি,
তোমারি এ ফুলবন রয়েছে আঁচল পাতি।
সকলি তোমার প্রভো! তুমি মাত্র 'একাকার,'
সকলের মূলে তুমি—তুমি সর্ব্ব মূলাধার।
তোমারি রচিত বিশ্বে নিয়ত আবাস মোর,
তুমি পিতা, তুমি পুত্র—তোমারি এ মায়াডোর।
তোমারি নিশ্বাসে নাথ! জীবন ফিরায়ে পাই,
তুমিই দেখাও ব'লে তোমারি আঁখিতে চাই।
তোমারি এ রূপ-রস তোমারি এ শব্দ-গন্ধ,
তোমারি পরাণ প্রিয়! অসীম—পরমানন্দ!
এ দেহ তোমারি দান তোমাতে হইবে লয়,
তোমারি এ মরা-বাঁচা 'আমার' কিছুই নয়।
তবু 'আমি' করি 'আমি,'—বোঝেনা 'আমার' প্রাণ,
'আমার' এ 'আমি'টুকু সেও যে তোমারি দান!

পাখীর খাঁচা।

[লেখক—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।]

(১)

আমি হাসিতাম, আমার সহধর্ম্মিণী হাসিতেন। কি আপদ! আমাদের পল্লী-গ্রামে কেহ ওগুলার দিকে তাকায় না। কিন্তু আমাদের বাসার পার্শ্বে গফুর খাঁ রাজ্যের গাঙ্‌শালিখ্, নেকড়ে শালিখ্, বুলবুলি, পাউই, ঘুঘু, হোরেল প্রভৃতি

অতি সাধারণ শ্রেণীর পক্ষী আনিয়া সেগুলিকে খাঁচায় ভরিয়া রাখিত। আর খাঁচারই বা বাহার কত! কেহ গোল, কেহ চারচৌকা, কাহারও চূড়া মন্দিরের মত। প্রত্যেক গুলির নীচে এক একটা সৌখীন হাতল লাগান টানা—সেগুলা টানিয়া পিঁজরা পরিষ্কার করা যায়, পক্ষীদের আহার্য্য সরবরাহ করা যায়। আমাদের প্রতিবেশীর চিড়িয়াখানায় দুই একটা কাকাতুয়া, ময়না, লাল-মোহন প্রভৃতি ছিল বটে, কিন্তু তাহাদের পিঁজরা বা দাঁড়ের অত চটক ছিল না। সে পাখীগুলা গফুর খাঁর নিজস্ব! তাহারা বারো মাস তাহার বাটীর সম্মুখে সাজান থাকিত, অতি যত্নে প্রতিপালিত হইত। কিন্তু শালিখ বুলবুলির পাল চালান হইত। শুনিয়াছিলাম পাঁচ বৎসর পাখীর ব্যবসা করিয়া গফুর খাঁয়ের এত ঐশ্বর্য্য।

লোকটা বাঙ্গালী মুসলমান—অশিক্ষিত। অশিক্ষিত লোক ধনবান হইয়াছিল তবু শিষ্টাচার বিস্মৃত হয় নাই। আমি অল্পদিন মাত্র কলিকাতায় শরীর সারিতে আসিয়াছিলাম, তাহার বৃহৎ অট্টালিকার পার্শ্বে ২৭৲ টাকা ভাড়ার এক ক্ষুদ্র বাসায় ভাড়া ছিলাম, তবু লোকটা আমায় যথেষ্ট সম্মান করিত। আমার ভৃত্য, খোকাকে তাহার বাটীতে পাখী দেখাইতে লইয়া গেলে সে নিত্যই তাহাকে উপহার দিত—কোনও দিন খেলনা, কোনও দিন ফল, কোনও দিন মিষ্টান্ন। আমি মাথায় কাণে গলায় পশমের গলাবন্ধ তাহার উপর শাল জড়াইয়া, হাতে ঝাল্‌দার মোটা বাঁশের লাঠি লইয়া ধীরে ধীরে গোলদীঘীতে প্রভাতী বায়ু সেবন করিতে যাইতেছিলাম। গফুর খাঁ দরজার সম্মুখে একখানা বেঞ্চের উপর বসিয়া একটা চীনার সহিত কথা কহিতেছিল। আমাকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে উঠিয়া সেলাম করিল। আমি সেলাম করিয়া বলিলাম—"খাঁ সাহেব, আপনি আমার ছেলেটিকে মাটি করবেন। রোজ তাকে অত জিনিস পত্র"—

আমাকে বাধা দিয়া জিহ্বা দংশন করিয়া গফুর খাঁ বলিল—"ছিঃ বাবু, ও কথা বলবেন না। আপনার ছেলে আমার গরীব খানায় আসে, আমার সৌভাগ্য।"

আমি আর জিদ্‌ করিতে পারিলাম না। ভাবিলাম খোকার যাওয়া বন্ধ করিব। কিন্তু ছেলে বড় পাখী ভালবাসে। খাঁ সাহেবকে বলিলাম—ছেলেটা ভারী পাখী ভালবাসে। পাড়াগাঁয়ের ছেলে কি না।

সে বলিল—আঁজ্ঞে হ্যাঁ তা জানি। আমি খোকা বাবুর জন্যে দুটো পাখী পাঠিয়ে দ'ব এখন।

আমি বলিলাম—না না, তা করবেন না। ও দেখে যাবে এখন। আর আপনার যে সব পাখী, আমাদের মফস্বলে ওগুলোকে কেউ কষ্ট করে ধরে না।

গফুর খাঁ হাসিয়া বলিল—আঁজ্ঞে তা জানি। কিন্তু আমি এদেরই বদৌলতে এক মুঠা খেতে পাচ্চি। এই এক একটা শালিকের বাচ্ছা চার পয়সা ছ' পয়সায় কিনি আর দশ টাকায় বেচি। খাঁচা, জাহাজ ভাড়া সব নিয়ে পাঁচ টাকা পড়ে। প্রত্যেক শালিখটায় নিট্ পাঁচ টাকা লাভ।

পাখীগুলা চালান হইত জানিতাম। কিন্তু সেগুলা যে অত দরে বিক্রয় হইতে পারে আমার সে ধারণা মোটেই ছিল না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—বলেন কি ? কোন্ দেশে এদের এমন কদর ?

সে হাসিয়া বলিল—আপনি আর কিছু এ ব্যবসা করছেন না। আপনাকে বলতে দোষ নেই। এই আফিমখোরদের দেশে।

সে চীনাটার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল। চীনবাসী হাসিয়া আমাকে তর্জ্জনী দ্বারা সেলাম করিল। চীন দেশ সম্বন্ধে নানা প্রকার ধারণা করিতে করিতে আমি আমার "প্রভাতী ভ্রমণে" চলিলাম।

(২)

দুই চারিদিন পরে গোফুর মিঞা পিতলের দাঁড়ে একটি কাকাতুয়া পাঠাইয়া দিল। আমার কোন কথা শুনিল না। খোকার বড় আনন্দ, সহধর্ম্মিণী মুখে দুঃখ প্রকাশ করিল বটে, কিন্তু মনে মনে বড় খুসী। উপহার পাইলেই স্ত্রীজাতির আনন্দ। গফুর খাঁর দুইটা ভাল মুলতানি গাভী ছিল। সে এক এক দিন আমাদের দুধ পাঠাইয়া দিত। পরে শুনিয়াছিলাম—তাহার তিনটি স্ত্রী, কিন্তু প্রত্যেকটিই বন্ধ্যা। তাই অপুত্রক গফুরের সহিত আমার খোকার অত সৌহৃদ্য জন্মিয়াছিল।

গফুর খাঁর নিকট নানা প্রকারের লোক আসিত। আমি পুলিসে কার্য্য করিতাম, অবশ্য গফুর তাহা জানিত না। আমি শুনিয়াছিলাম পুলিসের লোক প্রতিবাসী হইলে কলিকাতার লোক বড় সন্দেহের চক্ষে দেখে। তাই কাহাকেও আত্মপরিচয় দিই নাই। আমার পুলিস-কার্য্যের অভিজ্ঞতার বলে মনে হইত যে, গফুর খাঁর নিকট যত লোক আসে প্রত্যেকটিরই চরিত্র যেন সন্দেহজনক। বলিতে লজ্জা করে, গফুর খাঁ সম্বন্ধেও আমার মনে কেমন একটা অভদ্রোচিত সন্দেহ হইত। চীনদেশের লোক শিঙ্গাপুর, অষ্ট্রেলিয়া, মালায় দেশের দ্বীপপুঞ্জের কাকাতুয়া, লালমোহন, হীরামোহন প্রভৃতির আদর না করিয়া বাঙ্গালা

দেশের শালিখ পাখীর এত কদর করে কেন? কথাটা যেন কেমন অসম্ভব বলিয়া মনে হইত। কিন্তু গফুর খাঁ সম্বন্ধে সন্দেহ হইলেই আপনাকে ধিক্কার দিতাম, পুলিসে কাজ করিলে লোকের মনে নীচতা আশ্রয় করে। বাস্তবিকই আমরা পুলিসে কার্য্য করিয়া সন্দিগ্ধচিত্ত হই বলিয়া লোকে আমাদের বিশ্বাস করে না। এইরূপ চিন্তার বোঝা চাপা দিয়া গফুর খাঁ সম্বন্ধে নীচ সন্দেহটুকু যাহাতে মাথা তুলিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করিতাম।

একদিন সন্ধ্যার পর গৃহিণী কতকটা পরমান্ন খাইতে দিলেন। স্ত্রী মন্দ রাঁধিলেও আমি চিরদিন তাঁহার রন্ধন-নৈপুণ্যের প্রশংসা করিতাম। অনেক আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের সহিত কথা কহিয়া বুঝিয়াছি, এরূপ কার্য্য প্রত্যেকেই করিয়া থাকেন। আজ কিন্তু পরমান্ন পরম পরিতোষের সহিত ভোজন করিলাম। গৃহিণীকে বলিলাম—আহা! পায়সটা যেন অমৃত হয়েছে। তোমার হাত খুব মিষ্টি।

স্ত্রী হাসিল—তৃপ্তির হাসি। সে বলিল,—খাঁটী দুধ না হ'লে এসব জিনিস ভাল হয় না। এ গফুর খাঁর দুধে তৈরী। সত্যি একটা কিছু কর। লোকটা রোজ আমাদের কিছু না কিছু দিচ্চে।

আমি বলিলাম—হ্যাঁ! এখনও তো দেড় মাস ছুটি আছে। যাবার সময় ডালি দিয়ে গেলেই হ'বে।

পরদিন প্রভাতে বায়ু সেবন করিতে যাইবার সময় দেখিলাম—মোটঘাট লইয়া অনেকগুলি পশ্চিমের লোক গফুর খাঁর বাটীতে আসিল। এরূপ লোক তাহার নিকট প্রায় আসিত। সে লোকগুলা কেন তাহার বাটীতে সপ্তাহে-সপ্তাহে আসে, তাহা জানিবার জন্য কেমন একটা কৌতূহল জন্মিল। গফুর খাঁকে জিজ্ঞাসা করিলাম—এ লোকগুলি কে?

সে হাসিয়া বলিল—বাবু, ঠিক এক রকম ব্যবসায়ে চলে না। এরা মফঃস্বল থেকে ঘি নিয়ে আসে। আমি কলকাতার বাজারে সেই ঘি উঁচুদরে বিক্রী করি।

সেই দিন দশটার সময় খাঁ সাহেব কতকটা ঘৃত পাঠাইয়া দিল। অতি সুস্বাদু বিশুদ্ধ ঘৃত। বাস্তবিক আত্মগ্লানি হইল—পুলিসে কাজ করিয়া মনের মধ্যে মিথ্যা সন্দেহ পুষিয়া রাখিয়াছি।

(৩)

সে দিন গফুর খাঁ ঘরে ছিল না। তাহার একটি ভৃত্য ছিল—লোকটা কোন্ জাতীয় তাহা নির্দ্ধারণ করিতে আমার অনেক সময় লাগিয়াছিল। পরে শুনিয়া-

ছিলাম, লোকটার মা ব্রহ্মদেশীয়া এবং পিতা হিন্দুস্থানী মুসলমান। তাহাকে সকলে নানকু বলিয়া ডাকিত। নানকুর বয়স কুড়ি বাইস বছর, তাহাঁর কাজের মধ্যে কেবল গফুর খাঁর পক্ষীগুলির পরিচর্য্যা করা। সেদিন বেলা তিন চারিটার সময় আমার পুত্র মহা আনন্দে গফুর খাঁর খাঁচায় করিয়া আমার গৃহে একটি শালিখ পাখী লইয়া আসিল। আমি বলিলাম—কে দিলে?

সে বলিল—নানকু।

আমি বারান্দায় বাহির হইয়া দেখিলাম, উঠানে দাঁড়াইয়া নানকু বিড়ি টানিতেছে। আমি অতি আগ্রহে পুত্রের হস্ত হইতে পিঁজরাটি গ্রহণ করিলাম। সে পিঁজরাগুলি টিনের—বলিয়াছি, তলায় খাবার দিবার একখানি টিন টানিয়া বাহির করা যায়। অবশ্য তাহার নীচে একখানি টিন আছে, তাহা না হইলে সেখানি টানিলে তলায় কিছু থাকিবে না। যে টিনখানি টানা যায় তাহার চারিদিকে কানা আছে, খাঁচাটির নীচের টিন হইতে কানার উপর অবধি প্রায় তিন ইঞ্চি উঁচু। কিন্তু টিন্‌খানি টানিয়া বাহির করিয়া দেখিলাম সেটি মাত্র দেড় ইঞ্চি উঁচু। সেখানির এবং নীচের টিনের মধ্যে তাহা হইলে দেড় ইঞ্চি ব্যবধান আছে। উপর হইতে দেখিলে কিছু বুঝিতে পারা যায় না। এই ব্যবধানটুকু আরও দৃষ্টিগোচর হয় না, কারণ খাঁচার তলায় শুকানো ঘাস দেওয়া থাকে। বোধ হয় পাখীদের গরম রাখিবার জন্য। খাঁচাগুলি প্রায় লম্বে ও প্রস্থে দেড় ফুট করিয়া।

পুলিসের মন। আবার কেমন কু-ভাব আসিল, খাঁচাগুলার তলায় ১॥০ ফুট্ × ১॥০ ফুট্ × ১॥০ ইঞ্চি একটি কামরা থাকে কেন?

এমন সময় নানকু ডাকিল—বাবু!

আমি বাহিরে গিয়া বলিলাম—কি নান্‌কু?

সে বলিল—খোকা বাবু কান্‌ছিল বলে পিঁজরা দিয়েছি। ও পিঁজরা দেবার মিঞার হুকুম নেই।

আমি বলিলাম—ওঃ! আচ্ছা পাঠিয়ে দিচ্চি।

সে বলিল—খোকা বাবু রোয়ে তো জরুরি নেই।

আমি বলিলাম—না, ও কাঁদবে না।

আমার সহিত কথা কহিবার সময় নানকু বিড়ি নামাইয়াছিল। সে আবার নির্ভাবনায় বিড়ি টানিতে লাগিল। আমি খোকাকে শান্তনা করিয়া তাহার পিঁজরাটি প্রত্যর্পণ করিলাম।

তাহার পরদিন সংবাদ পত্রে পাঠ করিলাম—

"অদ্ভুদ্ বাতাবী—কাল লালবাজার পুলিশকোর্টে একটি বড় নূতন রকমের মোকদ্দমা হইয়া গিয়াছে। এজেহারে প্রকাশ যে, কাষ্টম্‌স্ ইনসপেক্টার বুগ্‌লু গত শুক্রবার দিবস উট্রাম ঘাটের জেটিতে পাহারা দিবার সময় দেখিতে পায় যে একটি চীনা হাতে একটি বাতাবী লেবু লইয়া মোট ঘাট সহ রেঙ্গুন মেল জাহাজে আরোহণ করিতে যাইতেছে। তাহার হাব ভাব সন্দেহজনক দেখিয়া বুগ্‌লু সাহেব তাহাকে পণ্টুনের উপর দাঁড় করাইয়া তাহার আসবাব পত্র তল্লাসী করেন। খানাতল্লাসীর ফলে কোন প্রকার পদার্থ না পাইয়া সাহেব রসিকতা করিয়া তাহার বাতাবী লেবুটি ভোজন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। অবশ্য চীনবাসী তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করে। তখন কাষ্টম্‌সের গোমেস সাহেব আসিয়া রঙ্গরসে যোগদান করে। সে চীনার হস্ত হইতে বাতাবী লেবুটি কাড়িয়া বুগ্‌লুর দিকে নিক্ষেপ করে। বুগ্‌লু সেটি লুফিয়া বড় আশ্চর্য্য বোধ করিল—বাতাবী লেবুটি কাঠের ভাঁটার মত ভারী। মিঃ বুগ্‌লু ও মিঃ গোমেস্ তখন বাতাবী লেবুটি কাটিয়া দেখে তাহার ভিতর হইতে সমস্ত শাঁস বাহির করিয়া তাহার ভিতর আফিম ভর্ত্তি করা হইয়াছে। পার্শ্বে এক পয়সার আকারের একটু খোসা কাটিয়া তাহার ভিতর দিয়া সমস্ত শাঁস বাহির করিয়া তাহা অহিফেন পূর্ণ করা হইয়াছিল। পরে ভাল আঠা দ্বারা সেই রন্ধ্র বন্ধ করা হইয়াছিল। প্রধান প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ সুইন্‌হোর বিচারে চীনবাসীর ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে।"

সংবাদটি পড়িয়া শেষ করিবার পূর্ব্বেই একমুখ হাসি লইয়া গৃহে আমার পুত্র প্রবেশ করিল। তাহার হস্তে নানা প্রকার বিলাতী খেলনা। আমি জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিলাম, গফুর মিঞা কলিকাতার বাহিরে গিয়াছিল। খোকার জন্য উপঢৌকন আনিয়াছে। অপুত্রক গফুর খাঁ আমার পুত্রকে স্নেহ করিত সে বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল না। আমি বাস্তবিক বড় অপদস্থ হইলাম।

(৪)

তখন বেলা চারিটা বাজিয়াছে। আমি সান্ধ্য-ভ্রমণে বাহির হইতেছিলাম। গফুর খাঁ দুইজন চাট্‌গেয়ে জাহাজী নাবিকের সহিত কথা কহিতেছিল। আমার কর্ণে তাহার শেষ কথাটা প্রবেশ করিল—আজ চারটা মাল যাবে।

আমি তাহাকে অভিবাদন করিয়া বলিলাম—কি হ'চ্চে?

সে বলিল—আজ মাল পাঠাব তার বন্দোবস্ত করছি। এঁরা জাহাজের

লস্কর। এঁদের হাত দিয়ে মাল পাঠালে ভাড়া লাগে না। এঁদেরও লাভ হয় আর আমারও ফায়দা হয়।

আমি চলিয়া গেলাম। মনের মধ্যে তুমুল ঝড় উঠিল। কি করা কর্ত্তব্য! আমার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না যে গফুর খাঁ পাখী পাঠাইবার ভাণ করিয়া খাঁচার তলায় আফিম ভর্ত্তি করিয়া চালান দেয়। প্রকাশ্য ভাবে না পাঠাইয়া জাহাজের লস্করদের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া ঐ বিচিত্র পিঁজরাগুলার সাহায্যে অবৈধ অফিমের কার্য্য করিয়া লোকটা ধনবান হইয়াছিল। সে বিষয়টী মনের মধ্যে যতই আন্দোলন করিতে লাগিলাম আমার সন্দেহটা যেন ততই বদ্ধমূল হইতে লাগিল। ঐরূপ আকৃতির পিঁজরার সাহায্যে সে যে একটা অবৈধ ব্যবসা করে তাহা নিঃসন্দেহ। বাতাবী লেবুর মোকদ্দমার কথা পড়িয়া মনে আফিমের কথা উঠিয়াছিল। চীনা বন্ধু—বিদেশ হইতে ঘৃত লইয়া প্রতি সপ্তাহে লোকের আমদানী—চালানী খাঁচা অপর কাহাকেও দিবার হুকুম নাই—এমন কি খোকাকেও নয়। লোকটা আমার শিশুকে অত ভালবাসে কিন্তু তাহাকেও একটা চালানী খাঁচা—

আর ভাবিতে পারিলাম না। ট্রাম গাড়িতে বসিয়া মুক্ত বাতায়নের ভিতর দিয়া বাহিরে দেখিলাম। শত শত নরনারী মনের সুখে যেন ভাসিয়া চলিয়াছে আর আমি একাকী মনের মধ্যে কুচিন্তা পুষিয়া একটা ভদ্রলোকের সর্ব্বনাশের আয়োজন করিতেছি। আমার পুত্রের উপর তাহার নিঃস্বার্থ স্নেহের কথা স্মরণ করিয়া প্রাণটা আরও দমিয়া গেল। ছিঃ ছিঃ, কি লজ্জার কথা!

আবার কর্ত্তব্যের কথা ভাবিলাম—সরকারের অন্নে আমি পরিপুষ্ট, দুষ্টের দমনের জন্য আমার নিয়োগ। সমাজের লোক বলিয়াও আমার একটা কর্ত্তব্য আছে। অহিফেনের ব্যবসা ত এক প্রকার বিষের ব্যবসা। আমি এ সংবাদ জানিয়া স্থির হইয়া থাকিলে আমার পক্ষে অধর্ম্ম করা হইবে। কিন্তু শিশু—

আমার পুত্র আমার কর্ত্তব্যের পথ বড় বিষম ভাবে রোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। আবার তাহার কথা স্মরণ করিয়া আমি গফুর খাঁর পক্ষে তর্ক করিতে লাগিলাম। আমার কর্ত্তব্য আমার এলাকার ভিতর, এখানে কর্ত্তব্য-ভার কলিকাতা পুলিসের উপর ন্যস্ত। সমাজের পাপ পুণ্যের ভার ভগবানের হস্তে, আমার ইহাতে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কি থাকিতে পারে? বাস্তবিক লোকটার সৌজন্যে আমি মুগ্ধ। আবার পুলিসের সুর—মন বলিল—বাপু, নিজের লাভের জন্য কর্ত্তব্য হানি করিলে? আবার তর্ক করিয়া স্থির করিলাম যে বাস্তবিক আমি

লোকটাকে ধরাইবার চেষ্টা করিতেছি—আত্মোন্নতির জন্য, পুরস্কারের লোভে, পদোন্নতির লোভে। সমাজ, ধর্ম্ম, কর্ত্তব্য প্রভৃতি বড় বড় কথা; বাসনার মূলে বেশ স্পষ্ট জাজ্বল্য ভাবে অবস্থিত—লোভ।

প্রত্যাবর্ত্তন কালে ট্রামগাড়ি হইতে নামিতে হইল মুচিপাড়ার থানার সম্মুখে। আমাকে লইয়া একটা মহা টানাটানি চলিতে লাগিল। থানার ভিতর যাইব না বাসায় ফিরিব? কর্ত্তব্য ও শিশু—পদোন্নতি ও শিষ্টাচার—মহা আন্দোলন, মহাদ্বন্দ্ব। পার্শ্বে ফিরিয়া দেখিলাম ইনস্‌পেক্টর।

তিনি আমায় অভিবাদন করিলেন। আমার আর কতদিন ছুটি বাকি আছে জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম—বল্‌ছিলাম কি? এই গফুর খাঁ—আমার প্রতিবেশী গফুর খাঁ—

তিনি বলিলেন—হ্যাঁ গফুর খাঁ। চিনি গফুর খাঁকে—লোকে তাকে বলে চিড়িয়া গফুর। তারপর কতদূর বেড়িয়ে এলেন?

আমি বলিলাম—আজ্ঞে এই বেহালা অবধি গিয়েছিলাম। তা আপনাদের থানার কাজ কর্ম্ম কেমন? কোকেন কেস টেস, এই ওর নাম কি, আফিম কেস—

তিনি বলিলেন—হ্যাঁ আফিম কোকেনের ছোট কেস পাই। আসল কর্ত্তাদের তো ধরতে পারি না।

আমার হৃদপিণ্ড নৃত্য করিতেছিল। আমার হাতের ভিতর একটা মস্ত বড় আসল কর্ত্তা রহিয়াছে। কিন্তু কিছুতেই মুখ ফুটিয়া তাহাকে বলিতে পারিলাম না। যতই কথার অবতারণা করিতে গেলাম, কথাটা পাকচক্রে কেমন ঘুর্ণীর মধ্যে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে লাগিল। আমি আর একবার মনের দুর্ব্বলতাটাকে দমন করিয়া বলিলাম—অনেক আফিম বর্ম্মায়, চীনদেশে চালান হ'য়ে যায়, অথচ—

তিনি বলিলেন—হ্যাঁ তাও জানি। কিন্তু ধরা যে বড় মুস্কিল।

তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতে একটা কুলির মাথায় গফুর খাঁর চারিটা খাঁচা লইয়া তাহার একজন ভৃত্য আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের ভিতর দিয়া আমাদের সম্মুখে বৌবাজার ষ্ট্রীটে আসিয়া পড়িল। বুঝিলাম তাহার কথামত গফুর খাঁ চারটি মাল চালান দিতেছে। আর ভাবিবার সময় ছিল না, তর্ক করিবার অবসর ছিল না, পুত্রের মুখের ভাবনা আসিতে পারিল না। তখন জীবনের পুলিস-বৃত্তি জাগিয়া উঠিল, কর্ত্তব্যের কথা মনে হইল। আমি ইনস্‌পেক্টরকে বলিলাম—এই যে চারটে খাঁচা যাচ্ছে তল্লাস করুন দেখি, নিশ্চয় আফিম পাবেন।

এই কথাটা বলিবার সময় আমার কি রকম মুখের ভাব হইয়াছিল জানি না। কলিকাতা পুলিস ইনস্‌পেক্টর বাবু বলিলেন—আপনার কি অসুখ করছে? একটু জল খাবেন?

আমি বলিলাম—না মশায়, সময় নষ্ট করবেন না, শীঘ্র ধরুন, শীঘ্র ধরুন। নিশ্চয় আফিম আছে। টানাটা টানলেই দেখবেন নীচের ডহরে আফিম। আমার নাম করবেন না। বুঝলেন?

ইনস্‌পেক্টর ছুটিয়া গিয়া কুলিটিকে ধরিল। ভীষণ উত্তেজনায় আমার হস্তপদ কাঁপিতেছিল। ইনস্‌পেক্টর বাবু তাহাকে আমার সম্মুখে লইয়া আসিলেন। সঙ্গে সঙ্গে গফুর খাঁর সেই ভৃত্যটি আসিয়া উপস্থিত হইল। ইনস্‌পেক্টর বাবু প্রথমে একটি খাঁচা লইয়া সেই টিনের টানাটি টানিলেন। আমি নিশ্বাস বন্ধ করিয়া দেখিতে লাগিলাম। তিনি আমার মুখের দিকে চাহিলেন। আমি উৎসুক নয়নে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলাম। আফিমের কোন চিহ্ন নাই। দ্বিতীয় খাঁচাটি লইয়া ইনস্‌পেক্টর বাবু তল্লাস করিলেন—সমান ফল। তৃতীয়, চতুর্থ—কিছু নাই।

তিনি আমার মুখের দিকে চাহিলেন, আমি তাঁহার মুখের দিকে চাহিলাম। গফুর খাঁর লোকটি আমাদের উভয়ের মুখের দিকে চাহিল। সকলেই নির্ব্বাক। শেষে গফুর খাঁর লোকই কথা কহিল। সে বলিল—কি মশায়?

ইন্‌স্‌পেক্টর বাবু বলিলেন—এ খাঁচা গুলি বেশ ভাল, তাই দেখছিলাম। আমার এমনি খাঁচা চাই।

লোকটা হাঁসিয়া বলিল—হুকুম করলেই হয়। আজই মিঞাকে বল্‌ব এখন। এগুলা চালান যাচ্চে, না হলে হুজুরের কাছে দিয়ে যেতাম।

তিনি বলিলেন—না আমার দরকার হলে চেয়ে পাঠাব।

লোকটা সেলাম করিয়া চলিয়া গেল। ইন্‌স্‌পেক্টর বাবু একটু ভ্রুকুটি করিয়া বলিলেন—কাজটা একটু নোঙরা হল। আপনার মাথায় এ খেয়াল গেল কেন? গফুর খাঁ ও সব কাজ করলে আমাদের কানে খবর আসত না?

আমি বড়ই অপ্রতিভ হইয়াছিলাম। তাঁহার কথার উত্তর দিতে পারিলাম না।

ধীরে ধীরে গৃহে ফিরিলাম। একটু চেহারার পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। স্ত্রী বলিল—আজ তোমার বড় বেশী মেহনত হ'য়েছে—এত বেশী বেড়ালে আবার অসুখ করতে পারে। তোমার মুখ দেখে আমার ভয় হচ্চে।

(৫)

পরদিন প্রভাতে গফুর খাঁ আমায় ধরিল। সেলাম করিয়া বলিল—বাবু ছুটি ক'দিন আছে ?

আমি বলিলাম—আর দিন কুড়ি পঁচিশ হবে।

সে বলিল—গোলামের একটা সল্লা শুনুন। ছুটি রদ্ করে কাজে ফিরুন।

আমি বলিলাম—কেন ?

সে বলিল—আমাদের একটা বদ-স্বভাব আছে,যে আমাদের কাজে হাত দেয় তার ছেলেকে কেটে ফেলি।

তাহার মুখে সেই সৌজন্যের ভাব।

সে বলিল—এই ধরুন পশ্চিম থেকে আমার আফিম আসে। সেই আফিম বর্ম্মায় চালান করি, বর্ম্মার ভিতর দিয়ে চীন মুল্লুকে যায়। এক সের আফিম বেচলে চাল্লিস পঞ্চাশ টাকা লাভ হয়। বুঝলেন দারোগা বাবু ?

আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া শুনিতেছিলাম। তাহা হইলে সে জানিত, আমি দারোগা, বোধ হয় আমার ভৃত্যের নিকট সংবাদ লইয়াছিল।

সে বলিল—পাড়াগেঁয়ে দারোগা এসব কাজতো বোঝেন না। আফিম আমরা অন্য ঠাঁই রাখি। এখান থেকে খাঁচা চালান হয়, সেখানে আফিম ভর্ত্তি হ'য়ে জাহাজে যায়। যদি ধরা পড়ে, যে লোকটার দখলে আফিম পাওয়া যায়, তার জেল হ'বে। আইন আমায় ছুঁতে পারে না। বুঝলেন ?

আমার বিশ্বাস, আমি খুব নির্ব্বোধের মত তাহার মুখের দিকে চাহিয়াছিলাম। সে বলিল—দেখুন বাবু, আপনার ছেলেটিকে আমি পেয়ার করি। কিন্তু আমাদের মত লোকের কোন দিল্ নেই। জরুরি বোধ করলে সব করতে পারি। এই কোরাণের কসম করে বলছি, যদি আর আমাদের সঙ্গে চালাকি করেন,আপনার ছেলেকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে কাটব, আপনাকে—আপনার জরুকে—

লোকটার চক্ষু দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছিল। আমার হৃদপিণ্ড স্পন্দিত হইতেছিল, মাথা ঘুরিতেছিল, তাহার শেষ কথাগুলা শুনিতে পাইলাম না। আমি ধীরে ধীরে গন্তব্যপথে না গিয়া টেলিগ্রাফ আফিসে গেলাম। সেই দিনই প্রথম ট্রেণে কলিকাতা ছাড়িয়া পলাইলাম। গাড়িতে উঠিবার সময় গফুর খাঁ আমার পুত্রকে কতকগুলা খেলনা দিয়া আমায় বলিল—সেলাম।

উঃ! তাহার তিনটি অক্ষরে কি তীব্র বিষ মাখানো ছিল!

সাহিত্য-সমাচার।

কুল-পুরোহিত। শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত ও ২৪ নং মিডিল রোড, ইটালি, গৃহস্থ পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১।০।

এই গ্রন্থে পনরটী গল্প আছে। সমস্ত গল্পগুলিই দেশী ভাবে, দেশী ঘটনায়, দেশীয় সামাজিক চিত্রে ও চরিত্রে পূর্ণ। কোনটীতেই বিলাতী গল্পের ভাব নাই, গন্ধ নাই। প্রবীন লেখকের সরল তুলিকায় চরিত্রগুলি জীবন্ত হইয়া ফুটিয়াছে।

আধুনিক পুরোহিতদিগের শুধু 'চাল-কলা' বাঁধিবার পটুতা দর্শনে ব্যথিত হইয়া সম্ভবতঃ লেখক 'কুল-পুরোহিত' শীর্ষক প্রথম গল্পটী রচনা করিয়া আদর্শ পুরোহিত-চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। এই গল্পের নামেই পুস্তকের নামকরণ হইয়াছে। এই গল্পটী সকলের অবশ্য পাঠ্য। প্রত্যেক গল্পটীই উৎকৃষ্ট। কোন্‌টী রাখিয়া কোন্‌টীর প্রশংসা করিব? এই গ্রন্থ-অন্তর্গত 'কাল বৌ,' 'পূজা' 'রাঙ্গা কাপড়ের মূল্য' 'সঙ্গিহারা' প্রভৃতি গল্পগুলিও সমানভাবে উপভোগ্য ও শিক্ষাপ্রদ।

লেখক সাহিত্য-ক্ষেত্রে ও 'অর্চ্চনা'র পাঠকবর্গের নিকট সুপরিচিত। গল্প লিখিয়া যাঁহারা 'অর্চ্চনা'কে গৌরবমণ্ডিত করিয়াছেন, নারায়ণ বাবু তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার নিকট আমরা যাহা আশা করিয়াছিলাম সেইরূপই পাইয়াছি। গৃহস্থ পাবলিশিং হাউস এই পুস্তকখানি প্রকাশ করিয়া গৃহস্থের মঙ্গলসাধন করিয়াছেন।

মাধুরী। ঐতিহাসিক উপন্যাস, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ১।০।

গ্রন্থকারের সহিত একমত হইয়া আমরা পুস্তকখানিকে 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' বলিতে পারি না। কারণ স্থানে স্থানে ২।১টী চরিত্র ঐতিহাসিক হইলেও, উপন্যাসের ভিত্তি, গতি বা পরিণতিতে সে চরিত্রগুলির কোনও সংস্রব নাই, এবং তাহাদের অবতারণা না করিলেও, গ্রন্থের কোনও ক্ষতি বৃদ্ধি হইত বলিয়া মনে হয় না।

উপন্যাসের প্রধান নায়িকা 'মাধুরী'র অবতারণা প্রায় গ্রন্থের মধ্যভাগ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। মাধুরীর চরিত্রটী বেশ হইয়াছে। তবে তাহার জীবনের গতি প্রমোদের পিতা কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত না হইলেই ভাল হইত। গ্রন্থকার নবীন। নবীনের নিকট প্রবীণের কৃতিত্বের আশা করা যায় না। সুতরাং তাঁহার ক্ষুদ্র ত্রুটীগুলি মার্জ্জনীয়। লেখকের শক্তি আছে। একনিষ্ঠ সাধনা থাকিলে তিনি কালে যশস্বী হইবেন।

উপন্যাসপ্রিয় পাঠকগণ 'মাধুরী' পাঠে নিরাশ হইবেন না, এ কথা আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি।

"কিস্‌রৌল মোরাদাবাদের শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত জ্বালাদত্ত শর্ম্মা মহাশয় আমার "কনক-রেখা" নামক গল্পের পুস্তকখানি হিন্দী ভাষায় অনূদিত করিয়া আমার কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। "গল্প পঞ্চদশী" নাম দিয়া তিনি অপর একখানি পুস্তকে আমার অন্য পনেরটি গল্প হিন্দী ভাষায় প্রকাশিত করিতেছেন। আমার অন্যান্য গল্প উক্ত ভাষায় অনুবাদ করিবার অধিকার আমি কেবল তাঁহাকেই প্রদান করিয়াছি।"—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।

বৈষ্ণব-ধর্ম্ম।*

[লেখক—শ্রীহরিহর শাস্ত্রী।]

আজ সেই বিশ্ববিশ্রুতকীর্ত্তি, মহারাণী ভবানীর প্রতিষ্ঠাপিত, দেবী জয়-ভবানীর পবিত্র মন্দিরে "বারাণসী-হরিনাম-প্রদায়িনী-সভা"র সপ্তবিংশ বার্ষিকোৎসবের দ্বিতীয় দিন। একদিকে তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা মহেশ-মানসমোহিনী গৌরী, আর একদিকে নবদূর্ব্বাদল-শ্যামলকান্তি, শান্তিময়ী রাধিকার চিন্তাপহারী শৌরি। পরম ব্রহ্মের এই উভয় মূর্ত্তির চরণোপান্তে একাগ্রচিত্তে একোক্তিতে প্রার্থনা করি,—

শ্রীকণ্ঠলিঙ্গনমুখক্ষ্মদঙ্গকান্তি
দূর্ব্বাপলীভবলিলানবভূরি ভূতিঃ।
মাতাঽখিলস্ত জগতামমমুক্তিহেতু
গৌরীহ শৌরিরথ বা মুদমাতনোতু॥

আমরা গৌরী এবং শৌরির নিকটে এই যে আনন্দ বা মঙ্গলের কামনা করিলাম, ইহা কি সাংসারিক আনন্দ? যদি সাংসারিক আনন্দের প্রার্থনা করিয়া থাকি, তবে কি তাহা একান্ত অনুচিত হয় নাই? কবি বলিয়াছেন,—

"মন্ত্বরা সুখসংবিত্তিঃ স্মরণীয়াঽধুনাতনী।
ইতি স্বপ্নোপমান্ মত্বা কামান্ মায়ান্তদঙ্গতাম্॥"

আজ তুমি সুন্দরী সীমন্তিনীর সাহচর্য্য লাভ করিয়া সুখাতিশয়ের অনুভূতিতে আত্মহারা হইয়া সংসারকে নন্দনবন বলিয়া মনে করিতেছ, কাল যখন তোমার এই প্রাণাধিকা প্রিয়তমার প্রাণহীন দেহ ভূলুণ্ঠিত হইবে,—যাহার বামপদের কনিষ্ঠাঙ্গুলীতে কণ্টক বিদ্ধ হইলে তোমার হৃদয় বজ্রাহত হইত, সেই প্রেমাস্পদের সর্ব্বাঙ্গ, যখন চিতাবহ্নির উত্তপ্ত জ্বালা, নিমেষের মধ্যে অপহৃত করিয়া ফেলিবে, তখন তোমার এই ধারাবাহিক সুখ-সাক্ষাৎকার আর থাকিবে না—কেবল অতীতের সেই সুখরাশি, স্মৃতিপথে আবির্ভূত হইয়া তোমার হৃদয়কে দুঃখের ঘনান্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া তুলিবে। সুতরাং স্বাপ্নিক সুখানুভূতি

* ৫ই ও ৬ই কার্ত্তিক (১৩২৩), "বারাণসী-হরিনাম-প্রদায়িনী-সভা"র সপ্তবিংশ বার্ষিক উৎসবে পঠিত।

হইতে তোমার এই বাস্তব সুখানুভূতির পার্থক্য কোথায়? তাই বলি, এই স্বপ্নোপম উপভোগ-সাধনের অধীনতা স্বীকার করিও না।

ভূয়োদর্শী কবি, এই ভাবে সাংসারিক সুখের তুচ্ছতা ঘোষণা করিয়াছেন। সুতরাং যাহাতে নিত্য-সুখের অভিব্যক্তি হইতে পারে, সেই উপায়ের অন্বেষণ করাই কি আমাদের উচিত নহে? সে উপায় আর কিছু নহে,—ভক্তি। এই ভক্তি কাহাকে বলে?—মহর্ষি শাণ্ডিল্য বলিয়াছেন,—

"সা পরানুরক্তিরীশ্বরে।"

ঈশ্বরের প্রতি ঐকান্তিক অনুরক্তির নামই ভক্তি। মহাপুরাণ ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—

"স বৈ পুংসাং পরোধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥"

যে ভক্তির প্রভাবে মানব আত্মপ্রসাদে বিভোর হইয়া উঠে, সেই অহৈতুকী, অপ্রতিহতা ভগবদ্‌ভক্তি, যে শুভাদৃষ্টের ফলে আবির্ভূত হয়, তাহাই পুরুষের পরম ধর্ম্ম। অন্যফলানুসন্ধান-রহিত ভগবদনুরক্তিকেই অহৈতুকী ভক্তি বলা হয়। যাহার হৃদয়ে অহৈতুকী ভক্তির অভ্যুদয় হয়, সে ভগবানের জন্যই ভগবান্‌কে ভালবাসে, তাহার আর কোনও আশা—আকাঙ্ক্ষা নাই। সে সার্ব্বভৌম প্রতিপত্তিকে পদদলিত করে, ব্রহ্মপদ ইন্দ্রপদকে তুচ্ছ করে, যোগসমৃদ্ধি—এমন কি নিঃশ্রেয়স পর্য্যন্ত তাহার আকাঙ্ক্ষনীয় নহে,—সে এক ভগবান্ ভিন্ন আর কিছুই চাহে না। তাই ভগবদ্‌ভক্ত বৃত্রাসুর বলিয়াছিল,—

"ন নাকপৃষ্ঠং ন চ পারমেষ্ঠ্যং
ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা
সমঞ্জস ত্বা বিরহয্য কাঙ্ক্ষে॥"

এই প্রেমলক্ষণা ভক্তির চরম সীমায় উপনীত হইয়া বৃন্দাবনের গোপিকারা বলিয়াছিল,—

"কুলভ্রংশে দোষং গুরুনিবহরোষং জনরবং
সমস্তং জানীমঃ কিমিতি সখি শশ্বৎ প্রলপনৈঃ।
অকস্মাদস্মাকং মধুরমুরলীমোহনরবৈ
র্মনো মগ্নে শ্যামঃ কিমিব করবাম প্রিয়সখি॥"

কুলত্যাগে যে দোষ হয়, তাহা জানি, গুরুজনেরা যে ক্রোধ করিবেন, এবং ভবিষ্যতে যে একটা লোকাপবাদ হইবে, তাহাও বুঝি; আমরা সমস্তই জানি,

বারে বারে আর বলিয়া কি হইবে? সেই ভুবনমোহন শ্যামসুন্দর নটবর, মুরলীর মধুর ধ্বনির মাদকতায় অকস্মাৎ আমাদের চিত্ত অপহরণ করিয়াছেন; প্রিয় সখি, আমরা কি করি বল!!

এই প্রেমলক্ষণা ভক্তির আকর্ষণেই রাকা-সুধাকরের রজতকিরণ-ধারা-প্লাবিত শারদরজনীতে শ্রীকৃষ্ণের মধুর বংশীধ্বনি শুনিয়া গোপবধূরা তাঁহার সমীপবর্ত্তিনী হইয়াছিল।

"তা বার্য্যমাণাঃ পতিভিঃ পিতৃভিভ্র্াতৃবন্ধুভিঃ।
গোবিন্দাপহৃতাত্মানো ন ন্যবর্ত্তন্ত মোহিতাঃ॥"

বৈধী ভক্তির মাহাত্ম্যে ভগবানের প্রতি যাহার চিত্ত আকৃষ্ট হয়, সহস্র বিঘ্ন উপস্থিত হইলেও তাহাকে শ্রেয়োমার্গ হইতে বিচ্যুত করিতে পারে না। তাই কৃষ্ণপ্রেমময়ী গোপাঙ্গনারা কি পতি, কি পিতা, কি ভ্রাতা, কি বন্ধু, কাহারও নিষেধবাণী গ্রাহ্য করিল না;—ভগবৎপ্রেমের আতিশয্যে তাহারা স্ত্রীজনের একান্ত দুস্ত্যজ শালীনতা, অবলীলাক্রমে বিস্মৃত হইল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন গোপীদিগকে সে স্থান হইতে স্ব স্ব গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তনের উপদেশ করিলেন, তখন অভীষ্টদেবের সেই বজ্রাদপি কঠোর বাক্য শুনিয়া গোপীরা বাষ্পাবরুদ্ধকণ্ঠে বলিয়াছিল,—

"চিত্তং সুখেন ভবতাপহৃতং গৃহেষু
যন্নির্বিশত্যুত করাবপি গৃহ্যকৃত্যে।
পাদৌ পদং ন চলতস্তব পাদমূলাদ্
যামঃ কথং ব্রজমথো করবাম কিংবা॥"

তুমি বেণু বাজাইয়া অনায়াসে আমাদের চিত্ত অপহরণ করিয়া লইয়াছ, আর আমরা গৃহে ফিরিয়া কি করিব? গৃহকর্ম্মব্যাপৃত হস্তপদাদিও তোমার দর্শনে স্তম্ভিত হইয়াছে, তোমার নিকট হইতে এক পা'ও চলিবার আমাদের সামর্থ্য নাই; সুতরাং তোমাকে ছাড়িয়া আমরা কেমন করিয়া ব্রজে যাই বল?

প্রতিনিয়ত ভগবানের অনুধ্যান করিতে করিতে মানুষ একবার যদি প্রকৃত ভক্তিরসের আস্বাদ পায়, আর কি তাহাকে সংসারের মরু-মরীচিকা আকৃষ্ট করিতে পারে? সত্য সত্যই ভগবানের চরণে শরণাগত হইতে পারিলে আর তাহার ভব-বন্ধনের ভয় থাকে না। কৃপাময় পরমেশ্বর, শরণাগত ভক্তের সকল বন্ধনভীতি দূর করেন। একজন ভক্ত কবি, অতি সুন্দর ভাবে পরম ব্রহ্মের এই করুণাময়তার বর্ণনা করিয়াছেন,—

"জেয্যাঃ কেশচয়ো নিরীক্ষ্য পতিতান্ দেবান্ মুনীন্ পাদয়োঃ
সর্ব্বারাধ্যতয়া তয়োশ্চ পরমোৎকর্ষং বিদিত্বাঽপতৎ।
শ্রীতারাচরণং গতস্য শরণং নো বন্ধনং সম্ভবে
দিত্যাবেদয়িতুং ববন্ধ ন হিতং সা মুক্তকেশী বভৌ॥"

স্ত্রীজাতি কেশবিন্যাস করিতে বড় ভালবাসে, কিন্তু মার আমার কুন্তলরাশি আজানুলম্বিত কেন?—এই শঙ্কা করিয়া ভক্ত সমাধান করিতেছেন, মা'র কেশজাল আগে কবরীবদ্ধই ছিল, কিন্তু তাহারা দেখিল, কি মনুষ্য, কি মহর্ষি, কি দেবতা—সকলেই আসিয়া মা'র চরণে নিপতিত হয়; তখন সেই কবরীবদ্ধ চিকুররাশি, 'না জানি কতেক মধু ও চরণে আছে গো'—এই ভাবিয়া চরণের দিকে বিলম্বিত হইল। এখন আবার শঙ্কা হইতে পারে, স্ত্রীলোক শত কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলেও অন্ততঃ বাম হাতেও এলো চুলগুলো জড়াইয়া রাখে, আর মায়ের চারি চারিটা হাত, মা কেন আবার চুল বাঁধিলেন না? কবি বলিতেছেন, —না, একবার যে মায়ের ঐ রাঙ্গাচরণে শরণ লইয়াছে, আর তাহার বন্ধনের ভয় থাকে না,—ইহা জানাইবার জন্য মা আর চুল বাঁধিলেন না,—সেই অবধি মা আমার মুক্তকেশী।

অর্জ্জুনের পরমহিতাকাঙ্ক্ষী শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার সখাকে বলিয়াছিলেন,—

"মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি।"

হে অর্জ্জুন, তুমি আমার প্রতি একাগ্রভাবে চিত্ত অর্পণ করিলে তুমি আমারই প্রসাদে অনায়াসে সাংসারিক সকল বিপজ্জাল হইতে মুক্ত হইতে পারিবে। সুতরাং তুমি—

"তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥"

যে আমি সর্ব্বান্তর্যামী নারায়ণ, সেই আমাকে সর্ব্বপ্রকারে আশ্রয় কর। তুমি আমার প্রসাদে পরম শান্তি ও সেই 'তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং' লাভ করিতে পারিবে।

সুতরাং জীব যদি ভগবান্‌কে ভালবাসিতে পারে,—যদি তাঁহার প্রতি অনুরাগ-মাখান মন অর্পণ করিতে পারে, তাহা হইলে আর তাহাকে কাম-ক্রোধাদি-শ্বাপদসঙ্কুল সংসারারণ্যে শরণ্যশূন্য হইয়া বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হয় না।

এই ভগবান্‌কে কি ভাবে প্রকৃত ভালবাসা যায়? তিনি সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পন্ন বিরাট্ পুরাণ-পুরুষ—এ ভাবে মানুষ তাঁহাকে ভালবাসিতে পারে না—ভয় করিতে পারে। ভয়ে আনুগত্যও করিতে পারে, কিন্তু তাহা ভালবাসা নয়।

এই জন্যই ভগবান্ যখন অর্জ্জুনকে বহুবক্ত্রনেত্র, বহুবাহূরুপাদ, সহস্রসূর্য্য-তেজোবিড়ম্বী, নভঃস্পর্শী বিশ্বরূপ দর্শন করাইলেন, তখন অর্জ্জুনের কৃষ্ণপ্রেম তিরোহিত হইয়া তাঁহার হৃদয়ে অপরিমেয় ভীতির সঞ্চার হইল। তাই অর্জ্জুন ভয়ে ভয়ে নানাবিধ স্তব করিয়া শেষে ভগবান্‌কে বলিলেন,—

"অদৃষ্টপূর্ব্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা
ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তদেব মে দর্শয় দেব রূপং
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥"

হে ভগবন্, তোমার এই অদৃষ্টপূর্ব্ব বিশ্বরূপ আমাকেই প্রথমে দেখাইলে এই জন্য আমার প্রতি তোমার প্রীতির অনুমান করিয়া আমি হৃষ্ট হইয়াছি সত্য, কিন্তু আমার মন অত্যন্ত ভীতিবিহ্বল হইয়াছে; তাই আমি প্রার্থনা করিতেছি, তোমার সেই মাধুরীময় রূপ আমাকে দেখাও।

যাহাকে দেখিলে মনে ভীতির উদ্রেক হয়, লোকে কখনও তাহাকে প্রাণ ভরিয়া ভাল বাসিতে পারে না। এই জন্য ভগবান্‌কে সখারূপে, বন্ধুরূপে, দয়িতরূপে, পুত্ররূপে—মাতৃরূপে যেমন ভালবাসা যায়, অন্যভাবে ভগবানের উপর তেমন হৃদয়ভরা ভালবাসা হইতে পারে না। "পদ্মপুরাণে"র উত্তর খণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে,—

"পুরা মহর্ষয়ঃ সর্ব্বে দণ্ডকারণ্যবাসিনঃ।
দৃষ্ট্বা রামং হরিং তত্র ভোক্তুমৈচ্ছন্ সুবিগ্রহম্।
তে সর্ব্বে স্ত্রীত্বমাপন্নাঃ সমুদ্ভূতাশ্চ গোকুলে।
হরিং সম্প্রাপ্য কামেন ততোমুক্তা ভবার্ণবাৎ॥"

দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষিবৃন্দ, রাজার পুত্র রামচন্দ্রকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইল সত্য, কিন্তু তাহারা মূর্ত্তিমান্ মাধুর্য্য শ্রীকৃষ্ণকে দয়িতভাবে উপভোগ করিবার আকাঙ্ক্ষা করিল। ঋষিরা তাহাদের কামনার কথা মুখে না বলিলেও অন্তর্যামী ভগবান্ রামচন্দ্রের প্রসাদে তাহারা পরজন্মে গোকুলে গোপীদেহ ধারণ করিয়া স্ব স্ব আকাঙ্ক্ষানুসারে কৃষ্ণকে লাভ করিল এবং সংসার-পারাবার অনায়াসে উত্তীর্ণ হইল।

গোকুলের এই ভক্তচূড়ামণি গোপবধূরা মধুর-মূর্ত্তি, ইষ্টদেবতা শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়া কি ভাবে তাঁহাকে ভালবাসিয়া যে আত্মতৃপ্তি লাভ করিবে, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিল না।

"পীনপয়োধরভারভরেণ হরিং পরিরভ্য সরাগং
গোপবধূরনুগায়তি কাচিদুদঞ্চিতপঞ্চমরাগম্।
কাপি বিলাসবিলোলবিলোচনখেলনজনিতমনোজং
ধ্যায়তি মুগ্ধবধূরধিকং মধুসূদনবদনসরোজম্।
কাপি কপোলতলে মিলিতাংলপিতুং কিমপি শ্রুতিমূলে
চারু চুচুম্ব নিতম্ববতী দয়িতং পুলকৈরনুকূলে।
কেলিকলাকুতুকেন চ কাচিদমুং যমুনাজলকূলে
মঞ্জুলবঞ্জুলকুঞ্জগতং বিচকর্ষ করেণ দুকূলে।"

শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া গোপীরা প্রেমভরে কত লীলা করিতে লাগিল। ভগবান্‌কে পাইয়া হৃদয় যে কত নব নব আনন্দে বিভোর হইয়া উঠে, তাহা গোপীরাই বুঝিয়াছিল। রাধার চরিত্র আলোচনা করিলে এই প্রেম বা ভক্তির পরাকাষ্ঠা অনুভব করা যায়। রাধিকা প্রেমভরা চোখে শ্রীকৃষ্ণের এমন অপরূপ রূপ দেখিল, যাহা সে বর্ণনা করিয়া উঠিতে পারে না।

"কি কহব রে সখি কানুক রূপ।
কো পতিয়ায়ব স্বপন স্বরূপ।"

সখি, কানুর রূপের কথা আমি কি বলিব,—'স্বপ্ন দিয়ে তৈরী' আমার প্রিয়তমের সে সৌন্দর্য্যের কথা কে প্রত্যয় করিবে?

এই ভুবনমোহন রূপের মাধুরীতে উন্মাদিনী হইয়া নব অনুরাগিণী রাধা, কোনও বাধা বিপত্তি গ্রাহ্য না করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিবার জন্য অভিসারিণী হইয়াছিল।

"নব অনুরাগিণী রাধা।
কছু নাহি মানয়ে বাধা॥
একলি কয়ল পয়ান।
পন্থ বিপথ নাহি মান॥
তেজল মণিময় হার।
উচ কুচ মানয়ে ভার॥"

ভগবান্‌কে ভালবাসিতে পারিলে সে ভালবাসা কখনও পুরাতন হয় না,—তাহা নিত্যই নূতন।

"জনম অবধি হম রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনলু
শ্রুতিপথে পরশ না গেল॥

কত মধু যামিনী রভসে গোঁয়ায়নু
না বুঝনু কৈছন কেলি।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেলি ॥"

ইষ্টদেবতার মূর্ত্তি লক্ষ লক্ষ যুগ হৃদয়ে ধরিয়া রাখিলেও হৃদয় তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না। সে রূপের এমনই মাধুরী,—এমনই নূতনত্ব। কেবল রূপ কেন, সে নাম যদি একবার কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া প্রাণ আকুল করিয়া তুলে, তখন আর কি সাধক স্থির থাকিতে পারে? তখন সাধক সেই নামমন্ত্র জপ করিতে করিতে অবশ হইয়া পড়ে,—সেই নামের ব্যক্তিকে পাইবার জন্য অতিমাত্র আকুল হইয়া উঠে।

"সই, কেবা শুনাইল শ্যাম-নাম।
কাণের ভিতর দিয়া, মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ।
না জানি কতেক মধু, শ্যাম-নামে আছে গো,
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম, অবশ করিল গো,
কেমনে পাইব সই তা'রে ॥"

ভগবান্‌কে পাইবার জন্য সাধক যদি আকুল হইয়া উঠে, তাহা হইলে তিনি তাহাকে দেখা দেন, শুধু দেখা দেন না, ভক্তকে একেবারে আপন করিয়া লন। তখন সেই হৃদয়স্বামী তাঁহার ভক্তকে রাত্রিদিন চোখে চোখে রাখেন, বিনিদ্র নেত্রে সর্ব্বদা তাহার কাছে বসিয়া থাকেন, মুহূর্ত্তে শতবার তাহার মুখচুম্বন করেন।

"রাতি দিনে চোখে চোখে বসিয়া সদাই দেখে
ঘন ঘন মুখখানি মাজে।
উলটি পালটি চায় সোয়াস্ত নাহিক পায়
কত বা আরতি হিয়ার মাঝে ॥"
"জ্বালিয়া উজ্জ্বল বাতি জাগি পোহাইল রাতি
নিদ নাহি যায় পিয়া ঘুমে।
ঘন ঘন করে কোলে ক্ষণে করে উতরোলে
তিলে শতবার মুখ চুমে।"

ভগবান্ যে তাঁহার ভক্তকে কোথায় রাখিবেন, কি করিবেন, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারেন না,—ভক্তের উপর তাঁহার এমনই ভালবাসা!—

"হাত দিয়া দিয়া মুখখানি মোছাঞা
দীপ দিয়া দিয়া চায়।
কতেক যতনে পাইয়া রতনে
থুইতে ঠাঞি না পায়।"

ভক্ত হার নহে যে, ভগবান্ তাহাকে গলায় পরিবেন—চন্দন নহে যে, গায় মাখিয়া রাখিবেন। ভগবান্ ভক্ত-রত্ন পাইয়া স্থির থাকিতে পারেন না।

"হার নহে পিয়া গলায় পরয়ে
চন্দন নহে মাখে গায়।
অনেক যতনে রতন পাইয়া
সোয়াস্ত নাহিক পায়।"

প্রেমের আকর্ষণে ভক্তপ্রিয় ভগবান্ যদি এই ভাবে ভক্তের হৃদয় আশ্রয় করেন, তখন সংসার-দুঃখের মূলভূত কামক্রোধাদি সকল বাধা-বিঘ্ন, চৌরের ন্যায় দূরে পলায়ন করে। তখন দুর্দ্দম প্রেম-প্রহরীর অপূর্ব্ব সামর্থ্যে ভক্তের হৃদয়-মন্দিরে কোনও অভদ্র প্রবেশ লাভ করিতে পারে না।

"হৃদয়-মন্দিরে মোর কানু ঘুমাওল
প্রেম-প্রহরী রহু জাগি।
গুরুজন গৌর চৌর সদৃশ ভেল
দূরহি দূর রহু ভাগি।"

যাঁহার নাম কীর্ত্তন বা শ্রবণ করিলে দেহ, মন পবিত্র হয়, সেই কৃষ্ণের কথার যাঁহারা সর্ব্বদা অনুশীলন করেন, ভক্ত-সুহৃৎ ভগবান্ তাঁহাদের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া, সমস্ত আবিলতা দূরীভূত করিয়া দেন।—

"শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎ সতাম্।"
ভাগবত।

ভগবানের গুণবর্ণনাময় ভাগবত শাস্ত্রের আলোচনায় ও ভক্তের সাহচর্য্যে সঞ্চিত দুরিত রাশি নষ্টপ্রায় হইলে পুণ্যশ্লোক ভগবানের প্রতি চিত্তৈকাগ্রতাপূর্ণ ভক্তির অভ্যুদয় হয়।—

"নষ্টপ্রায়েষ্বভদ্রেষু নিত্যং ভাগবতসেবয়া।
ভগবত্যুত্তমশ্লোকে ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী।"
ভাগবত।

এই নৈষ্ঠিকী ভক্তির আবির্ভাব হইলে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতি রাজসিক ও তামসিক ভাব সমূহ, আর হৃদয় অধিকার করিতে পারে না।

চিত্ত তখন সকল বিষয়-রস বিষের মত উপেক্ষা করিয়া সেই 'রসো বৈ সঃ'—পরম আস্বাদনীয় শুদ্ধসত্ত্বমূর্ত্তি ভগবানের প্রতি আসক্ত হইয়া প্রসন্নতা লাভ করে।

"তদা রজস্তমোভাবাঃ কামলোভাদয়শ্চ যে।
চেত এতৈরনাবিদ্ধং স্থিতং সত্ত্বে প্রসীদতি ॥"

ভাগবত।

এই ভাবে ভগবদ্ভক্তি-যোগের প্রভাবে চিত্তপ্রসাদ লাভ হইলে রাগদ্বেষশূন্য পুরুষ, ঈশ্বর-তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে।

"এবং প্রসন্নমনসো ভগবদ্ভক্তিযোগতঃ।
ভগবৎতত্ত্ববিজ্ঞানং মুক্তসঙ্গস্য জায়তে ॥"

ভাগবত।

গীতাতে ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে।"

ভক্তির প্রসাদে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার ঘটিলে হৃদয়গ্রন্থি—মিথ্যাজ্ঞানজন্য বাসনা সমূলে উন্মূলিত হয়, সকল সংশয় ছিন্ন হইয়া যায়, পাপ পুণ্যের দৃঢ় বন্ধন ক্ষীণ হইয়া পড়ে।

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে ॥"

ভাগবত।

এই অবস্থা হইলে জীব পরম শান্তি লাভ করে,—আর তাহাকে মরু-মরীচিকায় উদ্ভ্রান্ত, তৃষ্ণার্ত্ত পথিকের ন্যায়,সুখ-কণিকার প্রলোভনে ধারাবাহিক দুঃখের কঠোরতায় উদ্বেজিত হইতে হয় না।

জীবের পরম শান্তিলাভের উপায় সম্বন্ধে ভগবান্, "গীতা"তেও বলিয়াছেন,—

"ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥
ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ ॥
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥"

"অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্। সচ্চিদানন্দরূপোঽহং শুদ্ধমুক্তস্বভাববান্ ॥"—এই রূপে ব্রহ্মের সহিত নিজের আহার্য্য অভেদ মানস বোধ করিতে করিতে আত্মা প্রসন্নতা প্রাপ্ত হয়;—আর সে স্ত্রীপুত্র প্রভৃতি প্রিয়জনের বিয়োগে শোকাকুল হইয়া পড়ে না,—বিবিধ ধনরত্নের দুরাশা পোষণ করিয়া উদ্বেলিত হয় না,—রাগদ্বেষের অধীনতা হইতে মুক্ত হইয়া তখন সে সর্ব্ব-

ভূতের প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্ন হয়। জীব এই সোপানে আরোহণ করিতে পারিলেই অকৃত্রিম ভক্তিধনের অধিকারী হয়। তার পর সেই ভক্তির মাহাত্ম্যে ভগবৎ সাক্ষাৎকার ঘটিবার পর মানব পরম শান্তি লাভ করে। সাকারভাবে ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞানই যে এই পরম শান্তিরূপ নিঃশ্রেয়সের উপযোগী, তাহা উপনিষদে উক্ত হইয়াছে,—

"যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং
কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয়
নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥"

এই ত জীবের পরম শান্তির কথা বলা হইল। ভগবানের নাম-কীর্ত্তন, নাম-শ্রবণ ও শাস্ত্রবিহিত উপাসনা প্রভৃতি এই শান্তি লাভের প্রাথমিক উপায়। কিন্তু আমরা এমন দুর্ভাগধেয় জীব যে, একবার দিনান্তেও ভগবানের মহিমময় নামোচ্চারণ করিয়া আত্মার কল্যাণ সাধনের চেষ্টা করি না। দুর্ভাগ্যের কথা আর কি বলিব?

"নাম্নামকারি বহুধা তব সর্ব্বশক্তি
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্ মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ ॥"

হে ভগবন্, এ সংসারে তোমার কত রকমের নাম আবিষ্কৃত করিয়াছ,—যাহার যে নাম ইচ্ছা, সে সেই নাম উচ্চারণ করিতে পারে; তার পর তোমার নিজের অপেক্ষা তোমার নামের মাহাত্ম্য কিছু কম নয়, তোমার সকল শক্তি তুমি তোমার নামে নিয়োজিত করিয়া রাখিয়াছ,—মীমাংসকেরা যে বলেন, "মন্ত্রময় দেবতা" তাহা মিথ্যা নহে; আর সেই নাম স্মরণে কোনও কালাকালের নিয়ম নাই,—যে সময়ে ইচ্ছা, নাম করিলেই তাহার মঙ্গল হইবে; জীবের প্রতি তোমার ত এই রূপ অপার করুণা, কিন্তু নাথ, আমার এমনই দুর্ভাগ্য, তোমার এই কল্যাণময় নামে আমার বিন্দুমাত্রও অনুরাগ হইল না।

কি কৃষ্ণ, কি রাম, কি শিব, কি কালী, কি দুর্গা—পরম ব্রহ্মের সকল মূর্ত্তির উপর সমান শ্রদ্ধা রাখিয়া উপাসনা করাই বৈষ্ণবের ধর্ম্ম। শিব বা শক্তিকে বিদ্বেষ করা বৈষ্ণব-ধর্ম্ম নহে। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

"শিবে চ পরমেশানে বিষ্ণৌ চ পরমাত্মনি।
অভেদবুদ্ধ্যা বর্ত্তেত ভেদকৃন্নরকং ব্রজেৎ ॥"

শিব ও বিষ্ণুকে অভেদ-বুদ্ধিতে উপাসনা করিবে,—ভেদবুদ্ধি নিবন্ধন কোনও মূর্ত্তির উপর দ্বেষ করিলে নিরয়গামী হইতে হয়। একজন ভক্ত বলিয়াছেন, যদি কাহারও সর্ব্বাঙ্গ, শাণিত শস্ত্রাঘাতে ক্ষত বিক্ষত করিয়া—অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া তাহার সেই শরীরে চন্দনানুলেপন করা হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি যেমন প্রীতি অনুভব করেন, শক্তি শিবে বিদ্বেষ করিয়া বিষ্ণুর আরাধনা করিলেও ভগবান্ সেইরূপ অপূর্ব্ব প্রীতি লাভ করেন।—

"বিষ্ণোরর্চ্চনমাচরত্যপি চিরং বিদ্বিষ্য বিশ্বেশ্বরং
যো দ্বিষ্ট্বাঽপি চ দুষ্টচেতনদুরাচারো জগন্মাতরম্।
শস্ত্রাঘাতশতং বিধায় দহনৈর্দগ্ধ্বা পুনশ্চন্দনৈ
রালেপাদিকতুল্যমস্য কিমুতন্নাবৈধমারাধনম্॥"

সুতরাং শক্তি বা শিবকে বিদ্বেষ করা বৈষ্ণব-ধর্ম্ম নহে। এই যে শুনিতে পাইতেছি, দক্ষিণাপথ হইতে রামানুজ-সম্প্রদায়ের একজন বিদ্বান্ আচার্য্য, মহা আড়ম্বরে বারাণসীর ন্যায় পুণ্যক্ষেত্রে আসিয়াছেন, কিন্তু মাসাবধি অতীত হইয়া গেল, এখনও বিশ্বেশ্বর বা অন্নপূর্ণা দর্শন করেন নাই। ইহা কিন্তু বৈষ্ণব-ধর্ম্ম নয়।

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

যে তৃণ হইতেও নিজকে হেয় মনে করে, তরুর মতন যাহার সহিষ্ণুতা জন্মিয়াছে, যাহার হৃদয় হইতে অভিমান উন্মূলিত হইয়া গিয়াছে, যে অন্যের মর্য্যাদা বুঝিতে পারে, সে-ই হরিনাম কীর্ত্তনের অধিকারী। দম্ভ, জিগীষা প্রভৃতি বৈষ্ণব-ধর্ম্ম নহে। আমি অতি সামান্য,আর অধিক কি বলিব?—আসুন, আমরা সকলে মিলিয়া একবার সেই করুণার অপার পারাবার ভগবানের কাছে কাতরকণ্ঠে প্রার্থনা করি,—

"নয়নং গলদশ্রুধারয়া
বদনং গদ্গদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা
তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি॥"

দৈবী লীলা।*

[লেথক—শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার, বি-এ।]

দুর্জ্জয় শীত। অবিচ্ছিন্ন তুষারপাতে চারিদিক আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। আল্পস্ পর্ব্বতের শৃঙ্গে শৃঙ্গে প্রবল ঝঞ্ঝা থাকিয়া থাকিয়া উন্মত্ত দৈত্যের ন্যায় হানা দিয়া উঠিতেছিল। সেই দুর্দ্দিনে সন্ধ্যার প্রাক্কালে আমাফি রাজ্য হইতে ক্রোশৈক মাত্র ব্যবধানে, অধিত্যকার ক্রোড়ে সেই ক্ষুদ্র মঠটি, বৃক্ষকোঠরগত আশ্রয়-নীড়ের ন্যায় জাগিয়াছিল।

ফ্রা-পিয়েট্রো দ্বিতলের গবাক্ষ হইতে সেই তুষার-বর্ষণ লক্ষ্য করিতেছিলেন আর মধ্যে মধ্যে সোৎসুকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দিকচক্রবালের প্রতি চাহিতেছিলেন। সহসা পূর্ব্বদিকে বহুদূরে নীলবর্ণ ক্ষুদ্র কি একটী পদার্থ মুহূর্ত্তে জাগিয়া উঠিয়া পুনরায় তুহিন স্তূপে মিলাইয়া গেল। ফ্রা-পিয়েট্রো চকিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন; তারপর চর্ম্মগাত্র বস্ত্র ও পাদুকা এবং সুদীর্ঘ দণ্ড লইয়া দ্রুতপদে মঠ ত্যাগ করিয়া, ভগবানের নাম স্মরণ করিতে করিতে পূর্ব্বদিক লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হইলেন। প্রায় দুই ঘণ্টা পরে, সন্ধ্যার অন্ধকার যখন গাঢ়তর হইয়া উঠিয়াছে, তখন শ্রান্ত ফ্রা-পিয়েট্রো তুহিনদষ্ট ক্ষীণপ্রাণ এক যুবককে আপন স্কন্ধে বহন করিয়া মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

শীতকালে সে মঠে ইহা নিত্য ঘটনা, সুতরাং অন্যান্য সন্ন্যাসীরা ইহাতে বিস্মিত বা কৌতূহলী হইল না। ফ্রা-পিয়েটো, পথিককে অগ্নিকুণ্ডের সম্মুখে বসাইয়া উষ্ণ আহার্য্য পানীয় দিয়া পরিচর্য্যা করিয়া নির্দ্দিষ্ট কক্ষে তাহার শয্যার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া বিদায় লইলেন। মঠের প্রধান যাজক যখন আসিয়া কুশল প্রশ্ন করিলেন তখন পথিক সুস্থ হইয়াছে, অভিবাদন করিয়া বলিল—"আজ আপনারা আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছেন—কি বলিয়া আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব জানিনা। শুনিয়াছিলাম এ প্রদেশের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি রমণীয় তাই দ্বিপ্রহরে আমাফি দুর্গ হইতে বাহির হইয়াছিলাম। তার পর এই দারুণ দুর্য্যোগে পথ হারাইয়া সমস্ত বৈকাল ঘুরিয়াছি। মৃত্যুর দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া ফ্রা-পিয়েট্রোর অসীম দয়ায় পুনরায় জীবলোকে ফিরিয়া আসিয়াছি, নহিলে সেই তুষার-শয্যাই আমার অন্তিম শয্যা হইত।"

* ইংরাজী হইতে।

"বৎস, ভগবান তোমাকে রক্ষা করিয়াছেন। আমরা কে? আমরা শুধু তাঁর উপলক্ষ্য মাত্র।"

প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ড হইতে অর্দ্ধদগ্ধ কাষ্ঠখণ্ড শতধা বিদীর্ণ হইয়া চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল, স্ফুলিঙ্গগুলি ছোট ছোট চোখে শতবার চাহিয়া চাহিয়া পাংশুবর্ণ হইয়া গেল। অতিথি ও গৃহস্বামী উভয়ে আপনাপন চিন্তায় মগ্ন হইয়া ছিলেন। অবশেষে পথিক বলিল—"সত্য। সবই তাঁর করুণা। তাঁরই চরণে কৃতজ্ঞতা নিবেদন করা আমার প্রথম কর্ত্তব্য। আপনাদের প্রার্থনা-মন্দিরের পথ আমায় দেখাইয়া দিন।"

পুরোহিত অগ্রগামী হইলেন। প্রশস্ত হলের উভয় পার্শ্বে অসংখ্য দেব-দেবী-মূর্ত্তি। পুরোহিত অস্পষ্ট মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে অবশেষে হলের প্রান্তভাগে কুমারী মেরী ও শিশুর তৈল-চিত্রের সম্মুখে আসিয়া সসম্ভ্রমে নতজানু হইয়া প্রণাম করিয়া বলিলেন "ইনিই আমাদের মঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। এঁকে প্রণাম কর।"

পথিক প্রণত হইল; তার পর কক্ষগাত্রস্থ ভিক্ষার ঝুলিতে কয়েকটী স্বর্ণমুদ্রা দিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া এক দৃষ্টিতে সেই অপূর্ব্ব তৈলচিত্রের প্রতি চাহিয়া চাহিয়া বলিল—"অতি সুন্দর চিত্র। কিন্তু মা'র মুখে এ বিষণ্নতা কেন?"

"আমাদের প্রায়শ্চিত্ত!"

"প্রায়শ্চিত্ত? কেন?"

"জান না? তবে শোন" পুরোহিত ধীর গম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিলেন—সে কাহিনী তাঁহার জীবনের সহিত চির-গ্রথিত হইয়া ছিল—"বহুদিন পূর্ব্বে—তখন গ্রেগরি এখানকার প্রধান যাজক—একপক্ষে মিলান ও অপর পক্ষে লম্বার্ডির অপরাংশের সহিত তুমুল যুদ্ধের সূচনা হয়। আমাফি-বংশীয়েরা আমাদের প্রতিবেশী হইলেও এই উপলক্ষে গ্রেগরীর সহিত তাহাদের প্রবল বৈরিতার সঞ্চার হইল। কারণ, তাহারা মিলান পক্ষীয় এবং গ্রেগরী লম্বার্ড দলভুক্ত।

সে বিদ্বেষভাব ঘনীভূত হইবার আর একটা কারণ ছিল। এ ঘটনার বহুবর্ষ পূর্ব্বে কোন এক অজ্ঞাত কারণে গ্রেগরী ও তৎকালীন আমাফিরাজের সহিত গুরুতর মনোমালিন্য ঘটে। বাহিরে তাহার প্রকাশ না থাকিলেও, সাধারণের কাছে সে কথা গোপন থাকিল না। ইহার পর গ্রেগরী সন্ন্যাসী হয় এবং প্রধান যাজকের পদে উন্নীত হইবার অত্যল্পকাল পরেই সেই যুদ্ধ বাধিয়া উঠিয়া ভস্মাবৃত বহ্নিকে প্রদীপ্ত করিয়া দেয়। বলা বাহুল্য, অতঃপর উভয়ে উভয়ের প্রতি জাতক্রোধ হইলেন।

সেদিনও এমনই দুর্য্যোগ। অবিরাম তুহিনপাতে চারিদিক আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। সন্ধ্যার প্রাক্কালে সহসা অগণিত শত্রুসৈন্য আমাফি-দুর্গ আক্রমণ করিল। দুর্গ জয় হইল কিন্তু দুর্গস্বামী ধরা পড়িলেন না। শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়া রক্তাক্ত দেহে গুপ্তদ্বারপথে তিনি অপসৃত হইলেন, কিন্তু মানব-শত্রুর কবল হইতে উদ্ধার পাইলেও প্রতিকূল দৈবের গ্রাস হইতে রক্ষা পাইলেন না। দারুণ দুর্য্যোগে দিক্‌ভ্রান্ত হইয়া মুমূর্ষু আমাফি-রাজ নির্ম্মম প্রকৃতির সহিত জীবনের শেষ শক্তিটুকু লইয়া যুঝিতে লাগিলেন। মঠের দ্বিতলের গবাক্ষ হইতে গ্রেগরী সবই দেখিতে ছিলেন, এক একবার অন্তঃকরণ দ্রবীভূত হইলেও, আশ্রয় দিবার কথা মনে জাগিলেও, হুকুমে চিত্তকে পাষাণের ন্যায় কঠিন করিয়া তিনি তাঁহার চির শত্রুর জীবন-নাট্যের যবনিকা-পতনের অপেক্ষা করিতেছিলেন। সেই তুহিন-শয্যা আমাফিরাজের চির-বিরাম শয্যা হইল। শেষ রাত্রে যখন তাঁর শেষ নিঃশ্বাস বায়ু বাতাসে মিলাইয়া যায় সেই মুহূর্ত্তে আমাদের এ জননীর সহাস্যমুখ বিষাদম্লান হইয়া আসিল।" পুরোহিত ছল ছল চক্ষে চিত্রের প্রতি চাহিয়া বলিতে লাগিলেন—"গ্রেগরীর সে পাপের ক্ষমা নাই। তিনিও অবশেষে তাহা বুঝিয়াছিলেন। সেইজন্যই সেদিন হইতে আজ পর্য্যন্ত পথভ্রান্ত পথিকের জীবন রক্ষা আমাদের সর্ব্বপ্রধান ব্রত হইয়াছে। কিন্তু একদিন না একদিন কি সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে না? দেবীই জানেন!"

চিন্তাভার মনে উভয়ে ধীরে ধীরে পথিকের কক্ষে ফিরিয়া আসিলেন। বিদায় লইবার সময় পুরোহিত বলিলেন—"তাহার পর হইতে কোন আমাফি ও দুর্গে বাস করেন নাই, কিন্তু আমাফি সম্প্রদায় ও এ মঠের সন্ন্যাসীদের সহিত এ পর্য্যন্ত সদ্ভাব প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।"

ক্লান্ত হইলেও পথিকের চোখে ঘুম ছিল না। শয্যায় বসিয়া কক্ষের মলিন প্রাচীর-গাত্রে দৃষ্টিনিবদ্ধ করিয়া আত্মবিস্মৃত হইয়া সে কি ভাবিতেছিল।

মধ্যরাত্রির স্তবগান শেষে যখন সন্ন্যাসীরা একে একে আপনাপন কক্ষে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন তখন পথিক আপনার থলিয়া হইতে ক্ষুদ্র একটী কাষ্ঠের বাক্স বাহির করিয়া নিঃশব্দে নির্জ্জন প্রার্থনা-মন্দিরে আসিয়া পৌঁছিল, তারপর, বেদীর দীপশিখা উজ্জ্বলতর করিয়া দিয়া, বাক্স হইতে রং ও তুলি বাহির করিয়া, তৈল-চিত্রের সম্মুখে প্রণত হইয়া বলিল—'বিশ্বজননি! যদি এতে পাপ না থাকে, তুমি আমার সহায় হোয়ো; আমার চিত্রশিল্পশিক্ষা সার্থক কোরো।' ধীরে ধীরে তাহার নিপুণ হস্তের তুলিকাসম্পাতে সে চিত্রার্পিত বিষণ্ণ আনত ওষ্ঠপুটের

রেখা ঈষদুন্নীত হইয়া আসিল; ম্লান কপোলদ্বয় সুডৌল ও লাবণ্যপূর্ণ, পাটল কেশ তপ্তকাঞ্চনাভ এবং সেই বেদনাকাতর দৃষ্টি আনন্দোজ্জ্বল হইয়া উঠিল। পথিক আপনার কার্য্যে আপনি বিস্মিত হইল। কি গভীর আনন্দ, কত না মমত্ব সে কুমারী দেবীর মুখাবয়বে উছলিয়া পড়িতেছিল! পথিক দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"এতে আমার পাপ কি পুণ্য তুমি মা তার বিচার করিও! কিন্তু পাপ হলে কি এ জিনিষ এত সুন্দর হ'ত?"

* * * *

উষার আলোক তখন সবে মাত্র ফুটিতেছে, সন্ন্যাসীরা একে একে উপাসনা-মন্দিরে প্রবেশ করিতেছিলেন। নতমস্তকে, করজোড়ে, মৃদুস্বরে স্তবগান করিতে করিতে,সকলে আপনাপন নির্দ্দিষ্ট আসনে নতজানু হইয়া উপবেশন করিলেন। ঘৃত-দীপ তখনও জ্বলিতেছিল।

সহসা প্রধান যাজক তৈলচিত্রের দিকে সোৎসুকে চাহিলেন। আপনার চক্ষুকে তিনি বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন না। "না, না,—এও কি সম্ভব!" কিন্তু, সত্যইত! চক্ষুকে অপ্রত্যয় করিবার ত কারণ নাই! সহসা সন্ন্যাসী মণ্ডলীর দিকে ফিরিয়া দুই বাহু বিস্তৃত করিয়া তিনি আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"দেখ, দেখ—কুমারী দেবীর মুখে আজ কি অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ! এ কি দৈবী লীলা! আজ এতদিনে আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত পূর্ণ হইল।" তাঁহার দুই গণ্ড বাহিয়া দরবিগলিতধারে অশ্রু ঝরিতেছিল।

মুহূর্ত্তে সন্ন্যাসীর দল বেদীর দিকে যুগপৎ অগ্রসর হইয়া বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া পড়িল। এ কি সম্ভব! এ কি দৈবী লীলা! কি অপূর্ব্ব আনন্দজ্যোতিঃ কি গভীর বিশ্বাস প্রত্যেকের মুখে প্রতিফলিত হইতেছিল!

সেই আনন্দ ধ্বনি বিনিদ্র পথিকের কর্ণে প্রবেশ করিল। সে বুঝি ইহারই প্রতীক্ষা করিতেছিল। যখন সে অলক্ষ্যে প্রার্থনা-মন্দিরের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হইল তখন সন্ন্যাসীরা প্রার্থনায় বসিয়া গিয়াছেন। পথিক একবার তাহাদের সেই আনন্দোজ্জ্বল মুখের প্রতি চাহিয়া সেই দ্বারপ্রান্তে কতক্ষণ প্রণত হইয়া রহিল।

নবোদিত সূর্য্যের প্রথম কিরণ-ছটা যখন কুমারী দেবীর মুখে ও প্রার্থনারত সন্ন্যাসীদের শিরে অপূর্ব্ব মাধুরী লইয়া প্রতিফলিত হইয়া উঠিতেছিল, তখন পথিক নিঃশব্দে সে স্থান ত্যাগ করিয়া পুনরায় বাহিরের তুহিনময় 'অমল ধবল' জগতের যাত্রী হইল।

প্রধান যাজক যখন পথিকের কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে আসিলেন তাহার কক্ষ তখন শূন্য। শয্যার উপর শুধু একখণ্ড কাগজে লেখা রহিয়াছে— পিয়েট্রো, আমাফি-রাজ!

বাঘ-মৌনী।

[লেখক—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।]

(১)

আমি ধর্ম্মের জন্য বাঘ-মৌনী ঠাকুরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে গিয়াছিলাম, এ কথা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়। যে কোন প্রকারে হউক, গ্রামের লোকের উপেক্ষার প্রতিশোধ লইবার জন্য দিবানিশি আমার প্রাণের ভিতর একটা আগুন জ্বলিত। স্কুলে যখন উচ্চস্থান অধিকার করিয়া চারিদিকে চাহিতাম; দেখিতাম পৃথিবীর সকলেই আপন আপন সুখ দুঃখের জমা খরচ করিতে ব্যস্ত। আমার গুণপনা লইয়া কেহই বড় একটা সমারোহ করে না। যখন এণ্ট্রেন্স ফেল হইলাম তখন সকলে একটু ভ্রুকুটি করিল বটে, কিন্তু সে বিষয় লইয়া কেহ আমার সঙ্গে তর্ক করিল না। তাহা হইলে অবশ্য তাহাদিগকে বুঝাইতে পারিতাম, মেধাবী লোকই অনুত্তীর্ণ হয়, যাহারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় তাহারা তোতাপাখী। অনেকের গায়ে পড়িয়া এ কথাটা বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম, অনেক নজীর দেখাইলাম; বোদেজলসার মহিম সেন এম-এ পাশ করিয়া ছোট ভাইয়ের মত রোজগার করিতে পারে না, কুঁকড়াহাটির গিরিজা বিশ্বাস বি, এ পাশ করিয়া ঘরজামাই ইত্যাদি ইত্যাদি; কিন্তু ফলে সেই উপেক্ষা। মুখের উপর কেহ কিছু বলিত না, আড়ালে লোকে বলিত, ছোঁড়াটা! চ্যাংড়াটা! লেখা পড়া ছাড়িয়া গ্রামের বড় বড় লোকের চরিত্রের সমালোচনা করিতে লাগিলাম, বুড়ার দলের রাশি রাশি ভীমরথীর দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বিপক্ষ দলের নিকট জাহির করিলাম—ফল এক; অপদার্থ অসার বুড়াগুলা একবার বলিল না কেন তাহাদের চরিত্রের ছিদ্রান্বেষণ করিতেছি। যদি তাহারা দুইটা কটু কথাও বলিত, তাহা হইলেও প্রাণের জ্বালা নিভিত।

সত্য কথা বলিতে কি, সে সময় আমার সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করিয়াছিলাম

সেই অজানা শক্তিটুকু লাভ করিবার জন্য—যে শক্তি লাভ করিলে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিব, লোকে আমাকে ভাল কি মন্দ যাহা হউক একটা কিছু বলিবে। কিন্তু সেই মন্ত্রটুকু কি ভাষায় উচ্চারণ করিতে হইবে তাহার কোনও সন্ধান পাই নাই। বাঘ-মৌনী ঠাকুর আমাদের গ্রামে আসিয়া আমার এক নূতন চক্ষু ফুটাইয়া দিলেন। ধর্ম্মের নামে বাঙ্গালী মরে বাঁচে, আলস্যপ্রিয় দেশের লোক সন্ন্যাসী ঠাকুরের ছাই-ভস্ম জপ-তপের সাহায্যে বিনা পরিশ্রমে ইষ্ট লাভের চেষ্টা করে, সুতরাং যদি এই বাঘ-মৌনী ঠাকুরের সুনজরে পড়িতে পারি তাহা হইলে গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা আমার কথা আলোচনা করিবে, তীক্ষ্ণবুদ্ধির বলে, সে সূক্ষ্ম তত্ত্বটুকু ধরিয়া ফেলিলাম। লোককে গালাগালি দিলে তাহারা আমার কথা গ্রাহ্য করে না—এ অপমানের প্রতিশোধ লইবার এক প্রকৃষ্ট উপায় যেন বিধাতা আমার চক্ষের সম্মুখে ধরিয়া দিলেন। বাঘ-মৌনী ঠাকুর কথা কহিতেন না, দিবারাত্র একটা বাঘের চামড়ার আলখালা পরিয়া একটা বাঘের চামড়ার পাগড়ি বাঁধিয়া বসিয়া থাকিতেন। অনেক সাধ্যসাধনার পর তাঁহার শিষ্য শিয়াল-তপা স্বামী তাঁহার হস্তে একখানি শ্লেট দিতেন, ঠাকুর তাহাতে দুই একটা কথা লিখিয়া দিতেন।

বাস্তবিক প্রথম যে দিন এই কিম্ভূতকিমাকার গুরু শিষ্যের দর্শন পাইলাম, সে দিন মনের মধ্যে একটা প্রবল বাসনা হইল যে, ঢাক পিটিয়া গ্রামের লোক-জনকে সতর্ক করিয়া দিই যে. এরূপ ভণ্ড তপস্বীদের গ্রামের দশ যোজন বাহিরে তাড়াইতে না পারিলে দেশের অকল্যাণ হইবে। কিন্তু পরক্ষণেই দেখিলাম কর্ত্তব্য পথটা চোখের উপর বেশ পরিষ্কার ভাবে পড়িয়া রহিয়াছে। দেশের লোককে এই বুজরুকের আকর্ষণের মধ্যে আসিতেই হইবে। আমি যদি ইহাদের ভণ্ডামির কায়দাকরণগুলার ব্যূহভেদ করিতে পারি তাহা হইলে আমি দশের দৃষ্টি আকর্ষণ করিব—কেহ ভণ্ড বলিবে, কেহ ভক্ত বলিবে, উপেক্ষা করিবে না। ঠিক এই রকম জল্পনা কল্পনা করিয়া আমি মৌনী ঠাকুরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে গিয়াছিলাম। কিন্তু এই কু-অভিপ্রায়ে কার্য্য আরম্ভ করিয়া কি দিব্য-জ্ঞান লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম! যাক্, সে কথা ক্রমশঃ বুঝাইব।

বাঘ-মৌনী ঠাকুর মণ্ডলদের পরিত্যক্ত জীর্ণ অট্টালিকার চণ্ডীমণ্ডপ অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। মণ্ডলদের বাটী একেবারে সাপসিউলি নদীর বাঁকের উপর। চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া সেই বাঁকা নদীর দুই বাহু অনেকদূর অবধি দেখা যায়। ওপারের জঙ্গলের শাল গাছের লম্বা শারির ভিতর দিয়া অরুণের প্রভাতী কিরণ

আসিয়া চণ্ডীমণ্ডপের উপর লুটাইয়া পড়ে। আমি সেই প্রভাতী রবিকরের সঙ্গে সঙ্গেই বাঘ-মৌনী ঠাকুরের অস্থায়ী আশ্রমে প্রবেশ করিলাম। সাধ্যমত মনোভাব গোপন করিয়া, অরুণ কিরণের মত চণ্ডীমণ্ডপের উপর লুটাইয়া সেই শার্দ্দূল-চর্ম্মাবৃত সন্ন্যাসী ঠাকুরকে প্রণাম করিলাম। সাধু কোন কথা কহিলেন না, কোন ইঙ্গিত করিলেন না, কোন প্রকার চাঞ্চল্য দেখাইলেন না, আমার ভূলুণ্ঠনের কোন সার্থকতা আছে আকারে ইঙ্গিতে, বচনে ভঙ্গিমায় এমন ভাবের পরিচয় দিলেন না। তাঁহার ঔদাস্যে প্রাণের সুপ্ত সিংহ জাগিয়া উঠিল। আবার সেই উপেক্ষা! আবার আমার ব্যক্তিত্বের অবমাননা! বাঘে সিংহে সংগ্রাম হয় হয়, এমন সময় শৃগাল মাঝে পড়িয়া আমার বিরোধী ভাবটাকে আবার ঘুম পাড়াইয়া দিল। সেই একটা কথায় আমার জীবনের স্রোত একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল।

সে বলিল—বাঃ বেশ ছেলে ত। ভাই তোমার গায়ে যেন মেধা ফুটে বেরুচ্চে।

আমি একটু হাসিলাম। জীবনে প্রশংসালাভ—অন্ততঃ তখনকার দিনে—বড় একটা ঘটিত না। তাহার সেই বিট্‌কেল নামটা আর সেই ভীষণ পোষাকটা আমার প্রাণে মোটেই অশ্রদ্ধা আনিতে পারিল না। আমি তাহার দিকে চাহিলাম, তাহার পরিধানে গৈরিক আলখালা, মাথায় শৃগালের চামড়ার টুপী। টুপীর আকারটা অনেকটা মাল্‌সার মত। টুপীটা খুলিলে লোকটা সুপুরুষ দেখিতে হইবে, আমার মত সমালোচকের পক্ষে সে কথাটা বুঝিতে আদৌ বিলম্ব হইল না। আমি তাহাকেও নমস্কার করিলাম। সে আমাকে তুলিয়া আলিঙ্গন করিয়া বলিল—"জয় শিবশঙ্কর!"

(২)

প্রথম দুইদিন স্থির হইয়া বসিয়া কাণ্ডকারখানা বুঝিতে লাগিলাম। শুধু আমাদের গ্রামের কেন, অন্যান্য গ্রামেরও নরনারী নানাপ্রকার উপঢৌকন আনিয়া সন্ন্যাসী ঠাকুরের সম্মুখে ধরিতে লাগিল। বাঘ-মৌনী নির্ব্বাক, উদাসীন। শৃগাল-তপা সকলকে মিষ্ট ভাবে তুষ্ট করিয়া প্রত্যেকের উপঢৌকন ফেরত দিতে লাগিল। অবশ্য এ কথাটা গ্রামের ভিতর রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছিল যে মৌনী বাবা কাহারও কিছু গ্রহণ করেন না। তবু লোকে কেন ভারে ভারে অর্ঘ্য আনিয়া তাঁহার সন্তোষ কামনা করিত, এ কথাটা, আমার মত লোক-চরিত্র বিশ্লেষণ করিবার ক্ষমতা না থাকিলে, কেহ বুঝিয়া উঠিতে পারিত না। মোহ আমাদের

গ্রামে খুব একাধিপত্য করিয়াছিল। প্রত্যেকেই মোহের বশে আপন আপন দানশীলতার পরিচয় দিবার জন্যই ফল ফুল, দধি, দুগ্ধ, ক্ষীর, সর, নবনী, চাল, চিঁড়া লইয়া বাঘ-মৌনী ঠাকুরের চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া উপস্থিত হইত। অথচ প্রত্যেকেই আপন আপন অর্ঘ্য লইয়া ঘরে ফিরিয়া যাইত। বিনাব্যয়ে এমন বদান্যতার পরিচয় দিবার অবসরটুকুর আমাদের গ্রামবাসীরা বেশ ষোল আনা সদ্ব্যবহার করিয়া লইত।

তৃতীয় দিবসে আমি শিয়াল-তপাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—আপনাদের নাম ও পোষাকগুলার আমি ঠিক মর্ম্ম বুঝে উঠতে পারছি না।

বলিয়া রাখি এই দুই দিন নির্ল্লোভিতা দেখাইয়া আমার মনে ইহারা একটু শ্রদ্ধা জাগাইয়া ছিল। আমাকে শিষ্য ঠাকুর দুই দিন কয়বার প্রশংসা করিয়াছিল। এই শ্রদ্ধা জাগরণের সঙ্গে সেটুকুর একটু কার্য্য-কারণের সম্বন্ধ ছিল, এ কথাটুকু তখন বুঝি নাই। পরে দিব্যজ্ঞান হইলে কথাটা বুঝিয়াছিলাম।

আমার প্রশ্ন শুনিয়া শিষ্য একটু হাসিয়া গুরুদেবের দিকে চাহিল। গুরুদেব তর্জ্জনীর দ্বারা নিজের নাসিকা স্পর্শ করিলেন। দুই দিন বসিয়া বুঝিয়াছিলাম এ ইঙ্গিতের অর্থ—শ্লেট আন।

চেলাজি স্বামীজির হস্তে শ্লেট দিলেন। রামখড়ি দ্বারা গুরুজি লিখিয়া দিলেন —বুঝাও।

আহা! কি অক্ষর! এখনও সেই তিনটি অক্ষর আমার চক্ষের সম্মুখে ভাসিতেছে। কতদিন সে অক্ষরগুলা স্বপ্নে দেখিয়াছি।

শিয়াল-তপা বলিল—আমাদের নামে বোধ হয় একটু নতুন রকম দেখছ, না?

আমি বলিলাম—একটু কেন, বিলক্ষণ নূতনত্ব দেখছি—আর পোষাকে।

শিষ্য বলিল—আমাদের গুরুদেবের—গুরুদেবের নাম—

এই অবধি বলিয়া সে খুব ভক্তিভরে তাঁহাকে প্রণাম করিল, আপনার নাক কান মলিল। তাহার পর বলিতে লাগিল—সিংহ-মোক্ষ। তিনি এই হিংস্রপন্থীর আবিষ্কর্ত্তা। যে সত্যটা সাধারণে বোঝে, সেই সত্যটা নিয়ে তিনি সাধনার পথ আবিষ্কার করেছেন। মানুষের দুটো অংশ—দেহ আর আত্মা। দেহেই যত হিংসা, যত দ্বেষ। সত্ব, রজঃ, তম প্রকৃতির গুণ। ঠিক কি না?

আমি একটা অতৃপ্তির "হুঁ" বলিলাম।

সে বলিল—এই নর-প্রকৃতি কোনটা সিংহের মত, কোনটা শৃগালের মত,

কোনটা বাঘের মত, কোনটা ভালুকের মত। অথচ এটা দেহের, প্রকৃতি, জড়ের প্রকৃতি, রক্ত মাংসের প্রকৃতি। এই প্রকৃতিই আত্মাকে ঘিরে আছেন—কাপড়ের মত।

আমার মাথায় কথাটা প্রবেশ করিতেছিল। [illegible]—এইটা ঠিক মনে ক'রে রাখতে পারলেই সাধনার পথে এগোতে পারা যায়। পুরুষার্থ জ্ঞানের এই প্রকৃষ্ট উপায়। কেমন কি না?

শেষটুকু ভাল বুঝিলাম না। ঘাড় নাড়িলাম। সে বলিল—আমাদের বাহিরের হিংস্রের ছালটা সেই কথা মনে পাড়িয়ে দেবার উপায়—দেহটা হিংস্রের, আসল আমিত্বটুকু নির্লিপ্ত, অথচ বাঘের ছালে, শেয়ালের চামড়ায়, সিংহের কেশরে ঘেরা। তাই আমাদের পোষাক পরিচ্ছদ এ রকমের।

আমি বলিলাম—আর নাম?

সে বলিল—নাম? নামের প্রথমটা দেহের নাম, শেষটুকু সাধন মার্গের। আমি এখন তপস্যা করতে শিখি, আমার দেহটা কিন্তু শৃগালের মত চঞ্চল আর কামী—

আমি বলিলাম—দেহটা না মনটা?

সে বলিল—মন ও দেহের অঙ্গ, কর্ম্মেন্দ্রিয়। গুরুদেবের দেহে ব্যাঘ্রের মত বল, কিন্তু আত্মা কামনা-রহিত, মৌন।

আমি মনে মনে ভাবিতেছিলাম যদি আমার দীক্ষা হয় তো ইহাদের মতে কি নাম পাওয়া কর্ত্তব্য? ভল্লুক, কুম্ভীর, গন্ধগোকুল, ভোঁদড় প্রভৃতি নানাপ্রকার নাম ভাবিতে লাগিলাম। মনটা যেন অবশ শিথিল হইয়া গিয়াছিল। তাহার কথা গুলা যেন প্রাণের একটা লুকান তারে আঘাত করিয়াছিল। কিন্তু সে তারের বড় জোর আওয়াজ। আমি সেই শব্দে আমার পশুত্বটুকু যেন বেশ দিব্য চক্ষে দেখিতে লাগিলাম। কেবল আমি আমি করিয়াই এত দিন কাল কাটাইয়াছি। শ্যেন পাখীর মত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সমাজে বরাবর পরকে লক্ষ্য করিয়াছি বটে, কিন্তু সে আমিত্বের জন্য লোকে আমাকে সমজদার বলিবে এই অভিপ্রায়ে। আমি নিজেকে বলিতে পারিব, আমি ইহাদের অপেক্ষা উচ্চ, আমার যশ হইবে, লোকের দৃষ্টি আমার উপর পড়িবে, এইজন্য। প্রাণের মধ্যে একটা আমিত্বের হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল।

আমি অন্যমনে এইরূপে চিন্তা করিতেছিলাম, মনে মনে একপ্রকার ঠিক করিয়াছিলাম স্বামীজির নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া আপনার নামকরণ করিব—

শ্যেন-যোগী, একটা বাজপাখী মারিয়া তাহার পালকের টুপী নির্ম্মাণ করিয়া মাথায় পরিব। এমন সময় মৌনী স্বামী নাসিকাগ্র স্পর্শ করিলেন।

শৃগাল-তপস্বী শ্লেট লইয়া গেল। তিনি আবার সেই রকম স্পষ্ট অক্ষরে লিখিয়া দিলেন—দীক্ষার বিলম্ব আছে।

লোকটা কি অন্তর্য্যামী নাকি? এবার সত্যই তাঁহার উপর আমার শ্রদ্ধা হইল।

(৩)

স্বামীজির সংসর্গে পাঁচ দিন বাস করিয়া আমার আর একটা ইষ্ট লাভ হইয়াছিল। গ্রামের লোক ডাকিয়া আমায় জিজ্ঞাসা করিত—"ব্যাপারটা কি বুঝ্‌লে? লোকটার ভেতর কিছু মাল আছে, না বাজে ভণ্ড?"

এইরূপ নানা প্রশ্নের আমাকে উত্তর দিতে হইত। যে সকল লোককে গালাগালি দিয়া কেবল উপেক্ষা ভিন্ন কিছু প্রত্যাশা করিতে পারি নাই, আজ তাহাদের চক্ষেই আমি এতটা মর্য্যাদার পাত্র হইয়া উঠিয়াছিলাম। আশাতিরিক্ত ফললাভ হইয়াছিল। সাধু সঙ্গের একটা মহত্ত্ব আছেই। একেবারে সোজা জবাব দিয়া বাঘ-মৌনীর রহস্যটুকু উদ্ধার করিলে আমার দর কমিতে পারে, সেই আশঙ্কায় আমি খুব 'হাতে রাখিয়া' উত্তর দিতাম। মৌমাছি হুল ফুটাইয়া, ক্ষতস্থানে যেমন একটু বিষ ঢালিয়া দেয়, আমিও উত্তরের সঙ্গে এমন একটা বিজ্ঞভাবের বিষ মিশাইয়া দিতাম যাহাতে সকলে বুঝিত যে, আমি যতটুকু বলিতেছি তাহার অপেক্ষা অনেক অধিক কথা জানি।

শৃগাল-তপাকে নানা লোকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিত—মামলার কথা, বন্ধ্যা নারীর পুত্র সম্ভাবনার কথা, নিষ্কর্ম্মার বৃত্তিলাভের কথা। কাহারও কথায় শিয়াল-তপা হাসিত, কাহাকেও বলিত "শিব শঙ্কর জানেন," কাহাকেও বলিত "ভগবানের নাম নিয়ে কোসে চেষ্টা কর"—ইত্যাদি। আজকাল আমার প্রতি তাহার একটা শ্রদ্ধা হইয়াছিল। প্রত্যেককে উত্তর দিবার সময় সে আমার মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিত। তাহাতে লোকে আমাকে একটু শ্রদ্ধা করিতে শিখিয়াছিল। আমার কথা লইয়া পাড়ার লোকেরা আলোচনা করিত, আমি একদিন তাহার প্রমাণ পাইলাম। যথা—

তরফদারদের রোয়াকে বসিয়া বাণী বাবু তামাক টানিতে টানিতে বলিলেন—সাধু হ'ক না হ'ক, বাঘা ঠাকুর একটা কাজ করেছে। আমাদের কেলোটার নিন্দে করার স্বভাবটা যেন একটু কমিয়েছে।

নির্ব্বিকার বাবু বলিলেন—হ্যাঁ, লোকটার ভেতর পদার্থি আছে বৈ কি। আমার বোধ হয় ও কেলোটাকে চেলা করবে।

চিত্তবিকাশ বলিল—দাদা আজ আমি এক মজা কর্‌ব। যে নিন্দুক তাকে ঠিক পথে লাগিয়ে দিতে পারলে সে নিজেরও নিন্দে করে। ওর কাছে কথাটা বার করে নিতে হ'বে যে সন্ন্যাসী ভণ্ড না সত্যি সাধু।

আমি ঠিক তাহাদের পিছনে ঘরের ভিতর ছিলাম, সম্মুখে বাহির হইলে সকলকেই অপ্রতিভ হইতে হইবে, এই ভাবিয়া তরফদারদের পিছনের দরজা দিয়া একেবার হিংস্রপন্থী ঠাকুরের দরদালানে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সেদিন কোন ভিড় ছিল না। নানা কথার মধ্যে আমি শিয়াল-তপাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"আচ্ছা মশায় এক একজন সন্ন্যাসী যে লোককে ওষুধ দেয়, আরাম ক'রে দেয় তার রহস্যটা কি?"

সে বলিল—খুব সোজা কথা। এসব শক্তিগুলা সাধনার প্রথম অবস্থায় পাওয়া যায়। একটা রোগ সারান, কি কিছু টাকা পাইয়ে দেওয়া, কিছু লাভ করিয়ে দেওয়া—

একটু অধর কুঞ্চিত করিয়া যে রকম ঘৃণার স্বরে সে কথা গুলা উচ্চারণ করিল তাহাতে আমার আগ্রহটা যেন শিথিল হইয়া আসিল। এত বড় শক্তি গুলা আয়ত্ব করিতে পারিলে, লোকে আমার পায়ের তলায় লুটাইয়া পড়িবে, ঔদাসীন্য ও উপেক্ষা ছাড়িয়া আমার নাম দিবারাত্র জপ করিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল না। কিন্তু শৃগাল যেরূপ অশ্রদ্ধার সহিত কথাগুলা উচ্চারণ করিল তাহাতে শক্তি লাভ করিয়া অপরের উপর প্রতিপত্তি করিবার বাসনাটা তেমন মাথা তুলিতে পারিল না।

শিয়াল-তপা বলিতে লাগিল—এই যে সাধনার শক্তি দ্বারা পার্থিব কল্যাণ করা, এটা হিংস্রের কাজ—শেয়াল, বাঘ, ভালুকের কাজ। এগুলা মানুষকে নীচ করে। বোঝ দিখি যে টাকার জন্যে মানুষ মরে বাঁচে সেই টাকা যদি তৈরী কর্‌তে পারবার ক্ষমতা থেকেও সে টাকার উপর লোভ না কর্‌তে পারা যায়, তা'হলে কতদূর সাধনার মহত্ব!

আমাকে এ কথা স্বীকার করিতে হইল। কিন্তু ইহারা যে এক একটী টাঁক-শাল সে কথা শুনিয়া বড় রহস্য বোধ হইতে লাগিল। তাহার নৈতিক উপদেশটা যেন আমার মনের নীচের স্তরে পড়িয়া গেল, উপরে ভাসিতে লাগিল—টাকা নির্ম্মাণের রহস্যটা। প্রাণের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য বলিলাম—টাকা তৈরী করা—মন্ত্র বলে?

সে হাসিয়া বলিল—ভোজবাজীর খেলায় কি বেশী শক্তির প্রয়োজন হয়? আসল শক্তি এই হিংস্রের শক্তি দমনে। আচ্ছা তোমায় একটা বাজি দেখাই।

সে তাহার গুরুদেবের দিকে চাহিল। তাঁহার অধর কোণে একটু হাসি ফুটিল। শিষ্য বলিল—শিবশঙ্কর! গুরুদেব আজ্ঞা দিয়েছেন। তোমার কাছে টাকা কি পয়সা কি নোট কিছু আছে?

আমার পকেটে একটী টাকা ছিল আমি সেটি তাহার হস্তে দিলাম। সে চারি দিকে চাহিয়া এক কোণে ছোট একটী মাটীর ভাঁড় দেখিতে পাইল। সে সেই ভাঁড়টীকে গঙ্গাজলে ধুইয়া তাহার ভিতর দুইখানি বিল্বপত্র দিল। আমাকে বলিল—তোমার টাকাটি ইহার ভিতর রাখ।

আমি টাকা রাখিলাম। ভাঁড়ের ভিতর বেলপাতা ভিন্ন অপর কোনও পদার্থ ছিল না। সে ভাঁড়ের উপর আর একটী ভাঁড় চাপা দিল। তাহার পর সেটি গুরুদেবের সম্মুখে ধরিল। গুরুদেব মাত্র দুই মিনিট চক্ষু মুদিয়া মনে মনে কি মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন। তাহার পর তাঁহার আলখালার বাঘের পুচ্ছটি একবার ভাঁড়ের উপর স্পর্শ করিলেন। শিয়াল-তপা বলিল—খুলে দেখ।

আমি উপরের ভাঁড়টী খুলিয়া দেখিলাম দুইটী টাকা। তাহার পর শিয়াল-তপা আবার হাসিয়া বলিল—আবার ঐ দুইটী টাকা রাখ। আমি বিস্মিত হইয়া দুইটী টাকা ভাঁড়ের ভিতর রাখিলাম। আবার ঐরূপ প্রণালী দ্বারা বাঘ-মৌনী ঠাকুর আমার রজত মুদ্রা দুইটীকে চারিটী রজত মুদ্রায় পরিণত করিলেন। তাহার পর আবার একবার শক্তি পরীক্ষা করিলাম – চারিটী মুদ্রার স্থলে আটটি মুদ্রা হইল।

শিয়াল-তপা হাসিয়া বলিল—এই রকম ক'রে যত ইচ্ছে টাকা বাড়ান যায়। এ কাজ হিংস্রপন্থীর সাধুরা তিন বৎসরের সাধনার পর শিখিতে পারে। আর একবার দেখতে চাও?

আমার জঠোরে ক্ষুধা থাকিলেও মুখে লজ্জার পরিচয় প্রদান করিতে হইল। যে ব্যাপারটাকে তাঁহারা অতি তুচ্ছ বলিয়া বিবেচনা করিতেছেন, আপনাদের অনিচ্ছাস্বত্বে কেবল আমার শিক্ষার জন্য, আমার কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য যে ব্যাপারটা সংঘটিত করিতেছেন, আমি কেমন করিয়া সেই ব্যাপারটা আবার ঘটাইতে বলি। আমি বলিলাম—না, না, কাজ নাই, আমি বুঝেছি—বুঝেছি। কিন্তু আমায় দীক্ষা দিতে হবে।

শিয়াল-তপা হাসিয়া বলিল—ঠিক কাল উপস্থিত হ'লেই গুরুদেব তোমাকে দীক্ষা দেবেন।

শক্তি-সংগ্রহ করিবার জন্য আমার মাথার ভিতর আগুন জ্বলিতেছিল।

আমি একেলা বসিয়া সকল কথা ভাবিবার অবসর খুঁজিতেছিলাম। ধীরে ধীরে উঠিলাম। শিয়াল-তপা সেই ভাঁড়ের টাকাগুলি আমার সম্মুখে ধরিল। আমি মাত্র আমার টাকাটি তুলিয়া লইলাম। সে হাসিয়া বলিল—বাকী গুলা?

আমি বলিলাম—ওতে আমার অধিকার কি আছে?

সে হাসিয়া বলিল—তবে কি সাধু সন্ন্যাসীদের আছে নাকি? তোমার গাছের ফল তুমি খাবে। তোমার টাকার বাড় তুমি নেবে।

গুরুদেব সঙ্কেত করিলেন। আমি টাকা গুলি পকেটে ফেলিয়া একেলা নদীর ধারে বসিয়া ভাবিতে চলিলাম। উঠিবার সময় শিয়াল-তপা চুপি চুপি বলিয়া দিল—কাকেও ব'ল না।

(৪)

নদীর ধারে বসিয়া ভাবিতেছিলাম। উপেক্ষার প্রতিশোধ লইব, ঔদাসীন্যের মূলে কুঠারাঘাত করিব! কি ভীষণ শক্তি! কাল যেমন করিয়া পারি গুরু-দেবকে ধরিয়া দীক্ষা লইব। শুভক্ষণে ইহারা আমার জীবনপথে আসিয়াছিল।

আমি একেলা বসিয়া ভাবিতেছিলাম, কখন আমার পার্শ্বে চিত্ত চক্রবর্ত্তী আসিয়া বসিয়াছে তাহা দেখি নাই। লোকটা বড় অবিশ্বাসী, বড় নিন্দুক। আমার সমালোচনা গুলা গ্রামের লোক যেমন উপেক্ষা করিত, চিত্তের নিন্দা তেমনি তাহাদের মুখরোচক ছিল। কারণ চিত্ত তাহাদের সহিত সর্ব্বদা মেলা মেশা করিত। পরনিন্দার সহিত স্তুতিবাদ মিলাইয়া দিত। যাহাদের সমা-লোচনা করিত, তাহাদের সহিত মিলিত মিশিত, তাহাদের আমোদ-আহ্লাদে যোগদান করিত। আমি কিন্তু এ রকম এক হাত গলায় আর অপর হাত পায়ে দিবার ব্যবস্থার মোটেই পক্ষপাতী ছিলাম না।

আমি সমাজে মিশিয়া মিছামিছি শক্তির অপচয় করিতাম না। আমি ছিলাম দর্শক, জীবনে আমার কার্য্য ছিল পরের ত্রুটী দেখাইয়া দেওয়া, মোহান্ধের চক্ষু ফুটান। কিন্তু যাহার জন্য চুরি করিতাম সে আমায় চোর অপবাদ দিত, তাহাতে বড় কষ্ট হইত। আমি তাহাদের নিরর্থক দলাদলি, হাসি ঠাট্টা, আমোদ উৎসবে মিশিতাম না বলিয়া তাহারা আমার জ্ঞান-গর্ভ সমালোচনা গুলাকে উপেক্ষা করিত, আমাকে একটা কীটের মত তুচ্ছ বলিয়া মনে করিত।

চিত্তকে দেখিয়া আমার শ্যেন-বৃত্তি বেশ জাগিয়া উঠিল। আমি বলিলাম—কিহে, এখানে কি মনে করে?

সে বলিল—তোমার বাঘা সন্ন্যাসীর খবর কি? আখ্যানমঞ্জরীর ডুবাল

বেঁচে থাকলে আমি কতকগুলা বেড়ালের চামড়া কিনে একটা আলখালা করতাম্। আমি নাম নিতাম—বিড়াল তপস্বী।

আমার আপাদ-মস্তক জ্বলিয়া উঠিল। আমি বলিলাম—কাল্ ভাগাড়ে দেখেছিলাম ভেনো ধোবার গাধাটা ম'রে পড়ে আছে। তার চামড়াখানা নাও। সত্যেরও মর্য্যাদা রক্ষা হ'বে—নাম হ'বে গাধা-ভণ্ড।

সে গরম হইল না। উপেক্ষা করিয়া একটু ভ্রূকুটি করিল। বলিল—কথক ঠাকুরেরা যেমন মঙ্গলের জন্যে লোকের মাথায় চাঁমর ঠেকায়, তোমার বাঘা ঠাকুর বুঝি সেই রকম বাঘের লেজ বুলিয়ে লোকের রোগ বালাই দূর করে?

ক্রোধে আমার সর্ব্বশরীর জ্বলিতেছিল। আমি শিয়াল-তপার শেষ অনুরোধ ভুলিয়া তাহাকে বলিলাম—সেই লেজের গুণ মূর্খে কি জানবে? এই দেখ।

আমি তাহার সম্মুখে সেই চক্‌চকে টাকা কয়টী ধরিলাম। তাহার বিস্ময় হইল না। ঠিক সেই সময় আমার পিছনে তপন গাঙ্গুলি আসিয়া দাঁড়াইল। চিত্ত বলিল—কেলো পাগল হ'য়েছে, কিসের টাকা দেখাচ্চে দেখ।

সে উপেক্ষা করিয়া চলিয়া গেল। আমি বলিলাম—পর-নিন্দুক, মূর্খ, কথাটা শোনবারও ওর ধৈর্য্য হ'ল না।

তপন গাঙ্গুলি বলিল—ব্যাপারটা কি?

আমি বলিলাম—ছোট মুখে বড় কথা। লোকের নিন্দে ক'রে ক'রে এমন স্বভাব হয়ে গেছে যে সাধু সন্ন্যাসীদেরও বাদ দেয় না।

আমি সমস্ত ব্যাপারটা বলিলাম। মনের আবেগে টাকার কথাটা বলিলাম। টাকার কথাটা তপন গাঙ্গুলির নিকট বলিতে যেন মনে একটু তৃপ্তি হইতেছিল। লোকটা চিরকাল সুদ-খোর, এক পয়সার মা বাপ। সে বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্রে মুখব্যাদন করিয়া আমার গল্প শুনিতে লাগিল, তাহাতে আমার খুব তৃপ্তি হইল। এই লোকটা অনেকবার আমার সম্বন্ধে বলিয়াছে—চ্যাঙড়াটা, ছোঁড়াটা! বোকাটা! আজ সে আমার শক্তির অধীনে আসিয়া পড়িয়াছে।

সে বলিল—এ শক্তিটা আমায় দেখাতে পার না? লোকগুলা তা'হলে সত্যিই গুণিন্।

আমার দুর্ম্মতি হইল। আমি বলিলাম—আসুন।

শিয়াল-তপার পায়ে ধরিলাম, গুরুজির পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত হইলাম। বলিলাম, এ লোকটিকে একটু শক্তি না দেখাইলে গ্রামের নিন্দুকদের মুখ বন্ধ হইবে না। শিয়াল-তপা বুঝাইয়া বলিল, স্তুতিবাদক আর নিন্দুক তাহাদের নিকট তুল্যমূল্য।

বারে বারে শক্তির অপব্যবহার করিলে ক্ষতি হয়। বারে বারে টাকা, কড়ি তুচ্ছ পদার্থ লইয়া নাড়াচাড়া করিলে মনে নীচ ভাব আসে। আমি কিন্তু ছাড়িলাম না। তপন বাবুও খুব ধরিয়া বসিলেন। মৌনী বাবা সম্মতি-জ্ঞাপন করিলেন। শিয়াল-তপা হাসিয়া বলিলেন—আপনার কাছে কি আছে?

তপন বাবু ট্যাকের সাত পাক খুলিয়া একখানি দশ টাকার নোট বাহির করিলেন। শিয়াল-তপা পার্শ্বের কক্ষ হইতে অনুসন্ধান করিয়া দুইটী ভাঁড় লইয়া আসিলেন—বিল্বপত্র আনিলেন। ভাণ্ডের ভিতর তপন গাঙ্গুলি নোট রাখিলেন। মিনিট পাঁচেক পরে তাহা দ্বিগুণ হইল!

লোভী ব্রাহ্মণ লাফাইয়া উঠিল। আমি তাহাকে লইয়া গৃহাভিমুখে চলিলাম। শিয়াল-তপা উভয়কে বলিয়া দিলেন—খবরদার, একথা তৃতীয় ব্যক্তি জানলে আমরা কাল্‌ই গ্রাম ছেড়ে চলে যাব।

(৫)

পরদিন চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া দেখিলাম তপন বাবু বসিয়া আছেন। অনেক লোকের ভিড়। সেই সব ভিড় কমিতে প্রায় দশটা বাজিল। সবাই চলিয়া গেলে তপন গাঙ্গুলি শিয়াল-তপার দুইটি চরণ ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। ছিঃ! ছিঃ! কি অন্যায় করিয়াছি! লোভী সুদখোর ব্রাহ্মণ লাভের আস্বাদন পাইয়াছিল,শার্দ্দূল যেন রক্তের আস্বাদন পাইয়াছিল। সে কিছুতেই ছাড়িল না। আমি অনেক বুঝাইলাম, খুব তীব্রভাবে বাছা বাছা কথায় তাহাকে জ্ঞান দিবার চেষ্টা করিলাম, সে লোভী সে আমারও পা ধরিতে গেল। আমি স্বামীজির মুখের দিকে চাহিলাম। স্বামীজি তর্জ্জনী দ্বারা নাসিকা স্পর্শ করিলেন।

শিয়াল-তপা তাড়াতাড়ি শ্লেট লইয়া গেল। স্বামীজি যে কথা কয়টী লিখিয়া দিলেন তাহা জীবনে ভুলিব না। "প্রবৃত্তি-মার্গে নিবৃত্তি আসে। কেবল বৈরাগ্যের দ্বারা সংসারের অসারত্ব জানা যায় না। প্রদীপ আবরিত করিয়া রাখিলে পতঙ্গ সেই আবরণের জন্য অগ্নির দাহিকা শক্তির পূর্ণ পরিচয় পায় না। সে আগুনে না পুড়িলে তাহার পতঙ্গ-দেহ ঘুচে না। ইহাকে অর্থ দাও। অর্থই ইহাকে অর্থের অসারত্ব বুঝাইবে। ইহাকে জলে ফেলিয়া দাও, প্রাণরক্ষার জন্য এ সাঁতার শিখিবে।"

কি সারগর্ভ কথা! এ কথাগুলা না পড়িলে চিরকাল আমি নিন্দুক থাকিতাম, লোকের কুৎসা করিতাম, নিজে অজ্ঞ, লোককে শিক্ষা দিবার ভ্রান্ত বিশ্বাসে নিজের মনের মধ্যে নরক পুষিয়া রাখিতাম। যাক্ সে কথা।

সেইদিন রাত্রি দশটার সময় তপন তাহার যক্ষের ধন লইয়া আসিল। শিয়াল-তপার অনুরোধে আমিও আসিলাম। একটী নূতন হাঁড়ি ও একখানি সরা আসিল; অনেক ফুল বিল্বপত্র, চন্দন, ধূপ-ধুনা আসিল।

দুই এক টাকা দ্বিগুণ করা খুব সহজ কথা। একেবারে দুই হাজার টাকার নোটকে চৌগুণ করা তত সহজ-সাধ্য নয়। পূজা হইতে লাগিল। ধূপ-ধুনা জ্বলিল, শঙ্খ-নিনাদ হইল। শেষে শিয়াল-তপা তপন গাঙ্গুলির যক্ষের ধন সেই হাঁড়ির মধ্যে রাখিল। আমাকে বলিল—নদীর ধার থেকে একটু চেকনা মাটী নিয়ে এস।

আমি চেক্‌না মাটি আনিলাম। তপন গাঙ্গুলি সাতটী ঢেলা আনিতে গিয়াছিল, সেও আসিয়া পড়িল। হাঁড়ির ভিতর নোটের তাড়াগুলা আবার নাড়িয়া চাড়িয়া রাখা হইল। তাহাদের বেলপাতা চাপা দিয়া মুখে সরা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। চেক্‌না মাটি দিয়া সরাখানি উত্তমরূপে বাঁধা হইল। সরার উপর সাতটী ঢেলা রাখিয়া শিয়াল- তপা হাঁড়িটী স্বামীজির সম্মুখে ধরিল। স্বামীজি ধ্যানস্থ হইলেন। শিয়াল-তপা ধীরে ধীরে হাঁড়ির উপর বাঘের লেজ বুলাইতে লাগিল। আমি স্থির হইয়া দেখিতেছিলাম। লোভী তপন গাঙ্গুলি লোভ-লোলুপ-দৃষ্টিতে সেই হাঁড়ির দিকে চাহিয়াছিল—চির বুভুক্ষিত ব্যক্তিও অত লোভে ভাতের হাঁড়ির দিকে তাকায় না।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে স্বামীজির ধ্যান ভাঙ্গিল। তিনি একটু মৃদু হাসিয়া সঙ্কেত করিলেন। শিয়াল-তপা তাঁহার পুচ্ছটী আমার ও তপন গাঙ্গুলির চোখে মুখে বুলাইয়া দিল। তাহার পর বলিল—ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে।

তপন গাঙ্গুলি ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্ত কি তাহা জানিত না। শিয়াল-তপা বুঝাইয়া দিল। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে বাবলার কাঁটা দিয়া চেক্‌না মাটি সরাইয়া উপরের ঢেলা সাতটির উপর তে-শিরা মনসার আঠা ঢালিতে হইবে। ঢেলা গুলি সাদা হইলে সরা তুলিতে হইবে। আপাততঃ হাঁড়িটী মাথায় করিয়া লইয়া গিয়া লক্ষ্মীর হাঁড়ির পার্শ্বে রাখিবার ব্যবস্থা করা হইল।

(৬)

অত রাত্রে শুইয়া ভোরে উঠা বড় কঠিন। কিন্তু তপন গাঙ্গুলির চীৎকারে আর কপাট নাড়ায় আমার কেন, পাড়ার সকলেরই, ঘুম ভাঙ্গিল। ব্যাপারটা শুনিয়া বিস্মিত হইলাম। এ কথাটা পূর্ব্বে কেন মনে হয় নাই তাহা ভাবিয়া বিস্মিত হইলাম। হাঁড়ির ভিতর কেবল সাদা কাগজ, তাহার যক্ষের ধনের

একখানিও নোট নাই। স্বামীজি? স্বামীজি উধাও, কোনও চিহ্ন নাই। শিয়াল-তপা? তাহার মাথার শিয়ালের চামড়ার টুপিটি মণ্ডলদের চণ্ডীমণ্ডপে পড়িয়া আছে। তাহারও সাক্ষাৎ নাই। কখন পলাইল? নিশ্চয় রাত্রি একটার ট্রেণে। তাহা হইলে নিশ্চয় কলিকাতায় পলাইয়াছে। হ্যাঁ, এ পদার্থ কলি-কাতার বটে। কি জুয়াচোর! টাকা দ্বিগুণ করিত কিরূপে? হাতের সাফাই ভোজবাজী। নোটগুলা বাহির করিল কখন? কেন, যখন আমি চেক্‌না মাটি আনিতে গিয়াছিলাম, আর গাঙ্গুলি ঢেলা আনিতে গিয়াছিল। বেশ কথা, কিন্তু আমরা ফিরিবার পর তো নোট দেখিয়াছিলাম। সেগুলা নোটের আকারের সাদা কাগজ মাত্র। কাগজ দেখিয়াছিলাম, লেখা ত দেখি নাই; তা' বটে! আচ্ছা সন্দেহ করি নাই কেন? পরের উপর শক্তি সংগ্রহ করিতে গিয়াছিলাম বলিয়া বাস্তবিক মোহান্ধ হইয়াছিলাম।

বাঘ-মৌনীর শ্লেটে লেখা উপদেশগুলা মনে পড়িল। প্রবৃত্তির আগে নিবৃত্তির চেষ্টায় গিয়াছিলাম। সংসার না চিনিয়া সংসারের গুরুমহাশয় হইতে গিয়াছিলাম। আমার মত সংসারে সকলের যে একটা আমিত্ব আছে, আমার মত সকলেই যে শক্তির উপাসক তাহা পূর্ব্বে জানা ছিল না। কেবল ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিয়াছি, গাঁথিবার চেষ্টা করি নাই। তাই বাঘ-মৌনীর আমিত্বের ভিতর ঢুকিতে পারি নাই; আমার ভীষণ আমিত্বের মোহ-ঘোরে তাহার আমিত্ব টুকুর সন্ধান করি নাই। তপন গাঙ্গুলি বেচারার আমিত্বটুকুও কল্পনা করি নাই।

পুলিস আসিল, তদন্ত হইল, অনেকে হাসিল, তপন গাঙ্গুলি শিরে করাঘাত করিতে লাগিল। সে অনেক কথা। চিত্ত শ্লেষ করিয়া বলিল—"টাকার ভাগ গাঁয়ের মধ্যেও দিয়ে গেছে।" আমি কোন কথা বলিলাম না। জীবন-নাট্যের পালা বদলাইলাম। সমালোচনা ছাড়িয়া কর্ম্মী হইলাম।

জাপানের অন্তর্দ্দেশীয় সাগর *

[লেখক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ সোম, এল্-এম্-এস্।]

ভারতবর্ষ হইতে জাপানে যাইতে হইলে চীন দেশ হইয়া যাইতে হয়। বৃহৎ অর্ণবপোতগুলি প্রথমে হংকঙ, পরে হংকঙ হইতে শ্যাংঘাই হইয়া জাপানের অন্তর্দ্দেশীয় উপসাগরে প্রবেশ করে। শ্যাংঘাই হইতে অতি প্রত্যূষে যাত্রা করিলে তৃতীয় দিবসে রাত্রি একটার সময় 'কোবে' বন্দরে পৌছান যায়। কোবে হইতে সমুদ্র পথে ইয়োকোহামা আসিতে হইলে প্রায় ৩০ ঘণ্টা সময় লাগে। রেলপথে অনেক শীঘ্র আসিতে পারা যায়। অন্তর্দ্দেশীয় সাগরের মধ্য দিয়া অর্ণবতরী প্রথমে কোবে হইয়া ইয়োকোহামায় আসে। কিন্তু প্রশান্ত মহাসাগর দিয়া যাইতে হইলে ইয়োকোহামা হইয়া 'কোবে' যাইতে হয়। যখন ঝড়-তুফানের ভয় থাকে না, তখন নির্ভীক নাবিক শ্যাংঘাই হইতে প্রশান্ত মহাসাগর দিয়া প্রথমেই ইয়োকোহামায় আসিয়া থাকে। আমি যে সময়ে জাপানে যাই, তখন ঝড়-তুফানের (টাইফুনের) খুব বেশী ভয় ছিল, তাই সুচতুর নাবিক প্রথম হইতেই মহাসাগর ত্যাগ করিয়া অন্তর্দ্দেশীয় সাগরের মধ্য দিয়া গমন করিতে লাগিল। মহাসাগরের পথে দেখিবার কিছুই নাই, কিন্তু এ পথের দৃশ্য বড়ই মনোরম ও চিত্ত-বিমোহন। অনেক ভ্রমণকারী কেবল এই দৃশ্য দেখিবার জন্যই দেশ-দেশান্তর হইতে এখানে আসিয়া থাকেন। নাগাসাকী ও মোজী যাইতে হইলে এই পথ দিয়াই যাইতে হয়।

শ্যাংঘাই হইতে পূর্ব্ব সাগর অতিক্রম করিয়া অর্ণবপোত নাগাশকিতে আসে। নাগাশকী হইতে মোজী অতিশয় নিকট। মোজী অন্তর্দ্দেশীয় উপসাগরের এক প্রকার দ্বার স্বরূপ। উত্তরে জাপান দ্বীপপুঞ্জের সর্ব্ব বৃহৎ "হণ্ডো" দ্বীপ, দক্ষিণে প্রথম "কিউসিউ" ও তৎপরে "শীকোকু" দ্বীপ। এই উত্তর দ্বীপ ও দক্ষিণ দ্বীপ-দ্বয়ের মধ্য দিয়া অন্তর্দ্দেশীয় সাগরটী 'কোবে' অভিমুখে গিয়াছে। দুই দিকেরই স্থলভূমি পর্ব্বতময়। মধ্যস্থিত সাগরের মধ্যে ছোট ছোট গিরিশ্রেণী। সকল পর্ব্বতের উপর বেশ শ্রেণীবদ্ধ ভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাটী নির্ম্মিত হইয়াছে। ক্ষেত্রগুলি 'থাকে থাকে' সাজান। দেখিলে মনে হয়, এখানকার কৃষকেরা শিল্প-চাতুর্য্যে অজ্ঞ নহে।

অনেকগুলি পর্ব্বতের উপর কামান স্থাপিত দেখিলাম। শত্রুর আক্রমণ হইতে এ পথটী ও পর্ব্বত গাত্রস্থিত নগরগুলিকে সুরক্ষিত করিবার জন্য এরূপ

* Inland Sea.

বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। বাষ্পীয়পোত পথিমধ্যস্থিত এই পর্ব্বতগুলি ঘুরিয়া কোবে অভিমুখে যায়। অন্তর্দ্দেশীয় উপসাগরের প্রবেশ-পথের দুই কূলেই মোজী নগর। উত্তরার্দ্ধ "হণ্ডো" দ্বীপের দক্ষিণ সীমায় এবং দক্ষিণার্দ্ধ "কিউসিউ" দ্বীপের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত। এখানে সাগর অত্যন্ত অপ্রশস্ত, কারণ উভয় কূল অতিশয় নিকটবর্ত্তী। দুইখানি ষ্টীমার যাত্রী ও দ্রব্যাদি লইয়া সর্ব্বদা পারাপার করিতেছে। এ স্থানটী অর্ণবপোতের কয়লা লইবার স্থান। বড় জাহাজগুলি সে জন্য অনেক সময় এ স্থানে নঙ্গর করিতে বাধ্য হয়।

জাপানী রমণীরা চীনাদের মত কাল জামা গায়ে দিয়া ও কাল ইজের পরিয়া, মাথায় খ্রীষ্টীয় 'সিষ্টার'দের মত দুই দিকে কাণের উপর কাল কাপড় লম্বিত টুপী মাথায় দিয়া, পিঠে খুব বড় বড় কয়লার বস্তা লইয়া 'জেটী' হইতে জাহাজে কয়লা বোঝাই করিয়া থাকে। হাত ও পা দু'খানির বর্ণ কয়লার গুঁড়াতে পরিধেয়ের বর্ণের সহিত মিশাইয়া গিয়াছে। মাথার উপর টুপীর কাপড়টী ঘোমটার মত বাহির হইয়া থাকায়, মুখখানিতে বেশী কয়লা লাগিতে পারে না। উহা ঘনতমসাবৃত নভোমণ্ডলে স্থিরা সৌদামিনীর মত শোভা পায়। কাহারও কাহারও মুখে বা নাসিকায় কয়লা মাখান অঙ্গুলীর স্পর্শ দেখিলে মনে হয় যেন ভ্রমর প্রস্ফুটিত পদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে!

পুরুষেরাও কেহ কেহ কুলীর কার্য্য করিয়া থাকে, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অল্প। স্ত্রী পুরুষ সকলে সারি সারি দাঁড়াইয়া অতি শীঘ্র এক পৃষ্ঠ হইতে অপর পৃষ্ঠে কয়লা বহন করিয়া থাকে। আমাদের দেশের পাহাড়ীদের মত ইহারা মাথায় কোন জিনিষ বহন করে না।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ব্যতীত মোজী সহরে দেখিবার অন্য কিছুই নাই। মোজীর পর হইতেই অন্তর্দ্দেশীয় সাগর আরম্ভ। প্রাতঃকালে এখান হইতে যাত্রা করিলে প্রায় সমস্ত দিবসই এই সাগরের মধ্য দিয়া যাইতে হয়। পূর্ব্বে বলিয়াছি, সমস্ত পথটী দুই দিকেই পর্ব্বতময়। 'কোবে' যাইতে মনে হয় যেন একটা সুন্দর গিরিবর্ত্মের মধ্য দিয়া চলিয়াছি। মাঝে মাঝে গিরিগাত্রে অনেক কল কারখানা দেখা যায়। কোথাও একটু সমতল ভূমি নাই। এখানে সাগরের জল অচঞ্চল, একখানি স্বচ্ছ মুকুরের ন্যায় গিরিপাদমূল বেষ্টন করিয়া আছে। বাষ্পীয়পোতে কোনও স্পন্দন নাই। সম্মুখে নয়ন তৃপ্তিকর প্রকৃতির অদ্ভুত মনোহর ছবি। এ ছবি একবার দেখিলে হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া যায়। সীমাহীন তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ সাগরের পর এ বিশ্রাম যে কি মধুর ও তৃপ্তিকর, তাহা যে লাভ করিয়াছে তাহার জীবন সার্থক হইয়াছে। এ দৃশ্য জীবনে ভুলিবার নহে।

এই দেহ মন।

[লেখক—শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।]

এই দেহ,—অতি সুকুমার।
নিজ অনুরূপ করি',
আদরে যতনে গড়ি'
দেখান বিধাতা যাহে রূপ আপনার।
এত তরঙ্গের ভঙ্গ,
এত কুসুমের রঙ্গ,—
ঘৃণায় কি দেখিলে না তুমি একবার!

এই মন,—অনুপম ভবে।
অলক্ষ্যে অমরী কত
আসে যায় অবিরত।
সম্ভ্রমে ভুলিয়া যায় নন্দন-বিভবে।
এত প্রেম, এত আশা,
এত সুর, এত ভাষা,—
নিজ করে গড়ি'—কেন হারাও গরবে

মন্মথ-মন্দিরে ইংরাজ মনীষা

[লেখক—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।]

শ্রদ্ধেয় পাঁচকড়ি বাবু মাঝে মাঝে খুব হুঙ্কার দিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করেন যে গণ্যমান্য বরেণ্য হইতে হইলে মানুষের পক্ষে একাধিক বিবাহ করা আবশ্যক। আমাদের দেশের আধুনিক কর্ত্তাদের মধ্যে যাঁহারা বিপত্নীক বা যাঁহারা একাধিক বিবাহ করিয়াছেন, তাঁহাদের একটি তালিকা অন্ততঃ বছরে দুইবার করিয়া 'নায়কে' প্রকাশিত হয়। অনেকে অবৈধ প্রণয়ের উৎপাতে একনিষ্ঠার ব্যত্যয় ঘটাইয়া থাকেন, কিন্তু রুচিবিকারের ভয়ে এবং বোধ হয় মানহানি আইনের কঠোরতার দায়ে পাঁচকড়ি বাবু অবৈধ প্রণয়ীদের 'লিষ্ট' ছাপিতে

পারেন না। কিন্তু গল্প করিবার সময় তিনি যে অনেক গণ্যমান্য বরেণ্য ব্যক্তির অনেক কথা জানেন, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। বিলাতের অনেক বিখ্যাত গদ্য পদ্য কাব্য লেখক, অনেক রাজনৈতিক ও সমর নৈতিক বীরের বৈধ অবৈধ প্রণয়কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া রেভারেণ্ড হার্ডি সাহেব একখানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। আমরা আজ সে কথার একটু আলোচনা করিব। কলঙ্কের কথা ঢাকিয়া রাখা সব সময় ভাল কি না, সে বিষয়ে এখনও মতদ্বৈধ আছে। আমার বোধ হয়, সত্যের স্থান সকলের শীর্ষে। সুতরাং এই সকল খ্যাত ব্যক্তির কলঙ্কের কথাগুলি সাধারণের সমক্ষে প্রচার করিলে বিশেষ অনিষ্ট না হইতে পারে। অনেক লোক এক বিষয়ে নীতিবিরুদ্ধ কার্য্য করিয়া হতাশ্বাস হইয়া পড়ে; মনে করে, তাহার মত হতভাগ্যের দ্বারা কোনও উত্তম কার্য্য সম্ভব-পর নয়। জীবন-চরিতে সব কথা বলা হইলে এই সব লোকের মনে বল-সঞ্চার করা হয়। তবে এক একজন রসিক মনে করিতে পারে—"যদি ডিকেন্স্ অত বড় লোক হইয়া আপনার শালীর সহিত ব্যভিচার করিতে পারে তবে আমি"—ইত্যাদি ইত্যাদি। সে সকল পাপাত্মাদের নজীরেরও আবশ্যক হয় না। আর এক কথা, আমাদের দেশ এখন উদীয়মান লেখক ও কবিতে পূর্ণ। কাব্য-চর্চ্চার সহিত সচ্চরিত্র হইতে পারিলে সোণায় সোহাগা। এই সব ইংরাজ লেখক একনিষ্ঠ হইলে আমাদের আরও অধিক শ্রদ্ধাভাজন হইত। আমার বিশ্বাস, আমাদের লেখক ও কবিগুলি তাঁহাদের কাব্যকলার অনুকরণ করিবেন তাঁহাদের প্রণয়কাহিনী পাঠ করিয়া একনিষ্ঠার মহত্ত্ব ভুলিবেন না। তাঁহারা "নীরং ত্যক্ত্বা ক্ষীরং পিবেৎ"—এ আশা আমার আছে। যে কার্য্য ঘৃণার উদ্রেক করে তাহা যশস্বী বিশ্ববিজয়ী কবির দ্বারা সম্পাদিত হইলেও শোভনীয় হয় না। বরং উত্তমের সংসর্গে পড়িয়া এই মন্দ আরও ভীষণ আকার ধারণ করে।

আমরা এ প্রবন্ধে প্রসিদ্ধ ইংরাজ লেখকদের যে প্রণয়কাহিনী বিবৃত করিব তাহার প্রত্যেকটীই যে অকীর্ত্তিকর তাহা নহে। অনেক কবির স্ত্রীর প্রতি অনুরাগ আদর্শ, কেহ একাধিক বিবাহ করিয়াছেন, কেহ স্ত্রীকে সুখী করিতে পারেন নাই, কেহ বা বিবাহের পূর্ব্বে অন্য রমণীর প্রণয়-অর্জ্জন করিয়া চিরদিন হৃদয়-মন্দিরে তাঁহার পূজা করিয়াছেন। আবার অবশ্য কেহ কেহ প্রদ্যুম্নের শরাঘাতে এমন কার্য্য করিয়াছেন যাহা নীতি বা রুচি অনুমোদিত নহে।

আমাদের দেশের কবিশ্রেষ্ঠ চণ্ডীদাসের রজকিনী-প্রেম প্রসিদ্ধ। চণ্ডীদাসের দোষ ঢাকিবার জন্য সে কাহিনীতে অতিপ্রাকৃতের রসান দিয়া আমরা তাহার কুৎসিত বর্ণটা অনেকটা ঢাকিতে চেষ্টা করিয়াছি। আর বাস্তবিক মানুষ যে চিরকাল মনের মধ্যে এক ভাব পোষণ করিবে, তাহারও কোনও বাধ্যবাধকতা নাই। কবি নানা প্রকার স্বপ্ন দেখে, যখন তাহার চোখে যে স্বপ্নের ঘোরটুকু থাকে, কাণে যে গানের রেসটুকু থাকে, সেইটিকে অতিরঞ্জিত করা, সেইটির প্রাধান্য দেওয়াই যেন অনেকটা কবির স্বভাব। অতবড় কবি দান্তে বিয়াট্রিসের প্রেমে অন্ধ হইয়াছিলেন—তাঁহার প্রেমের উদ্দীপনায় দান্তের প্রাণে বিশ্বপ্রেমের ছায়া পড়িত। তিনি নিজেই একদিন বলিয়াছিলেন—"সে যখন আমার সম্মুখে উদয় হইত, তখন বিশ্বে আমার শত্রু থাকিত না, আমার প্রাণে কারুণিকতার শিখা জ্বলিয়া উঠিত, যাহারা আমার মন্দ করিয়াছে আমি তাহাদিগকে ক্ষমা করিতাম।" সেই মহাকবি দান্তে বিয়াট্রিসের মৃত্যুর দুই বৎসর পরে অপর রমণীর প্রেমাভিলাষী হইয়া তাহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

বিলাতের প্রসিদ্ধ কবি চসার (Chaucer) ইংলণ্ডেশ্বরী মহারাণীর সহচরীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তবু তিনি গোপনে অপর রমণীর প্রেমাকাঙ্ক্ষা করিতেন, তাহার প্রমাণ আছে। তিনি মোটের উপর বলিয়াছেন যে, বিবাহ দিল্লিকা লাড্ডু, যে খায় সেও পস্তায়, যে না খায় সেও পস্তায়। যথা—

"Marriage is such a rabble rout
That those who are out, would fain get in
And those who are in, would fain get out."

কবিশ্রেষ্ঠ সেক্ষপীয়রের জীবন-চরিতের বেশী কথা লোকের জানা নাই। তবে যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে মনে হয় যে, তিনি একনিষ্ঠ ছিলেন। প্রণয়ের দীর্ঘনিশ্বাস না পড়িলে কবি কাব্য লিখিতে পারে না, এ মত তিনি স্বয়ং প্রকাশ করিয়াছেন। তাই আঠার বৎসর বয়সে তিনি ছাব্বিশ বৎসর বয়সের হ্যাথওয়ে কুমারীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন।

জনসন সাহেব মহাকবি মিল্টনের উদ্বাহ-বন্ধনের এইরূপ সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন—"তাঁহার প্রথমা পত্নী বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহাকে ভয় দেখাইয়া ফিরাইয়া আনা হইয়াছিল। দ্বিতীয়ার উপর তাঁহার স্নেহ ছিল বলিয়া মনে হয়, কিন্তু তিনি স্বল্পায়ু ছিলেন। তাঁহার তৃতীয়া দয়িতা মিল্টনের জীবদ্দশায় তাঁহার পুত্রদিগকে নির্য্যাতন করিতেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পর তাহাদিগকে বিষয়ে প্রবঞ্চিত করিয়াছিলেন।" পঁয়ত্রিশ

বৎসর বয়ঃক্রম কালে মহাকবি তাঁহার প্রথমা পত্নী মেরী পাওয়েলের পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি স্বামীকে বর্জ্জন করিয়াছিলেন। শেষে নতজানু হইয়া স্বামীর নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের এই ঘটনা অবলম্বন করিয়া মিল্টন তাঁহার ইভ কর্ত্তৃক আদমের নিকট ক্ষমা ভিক্ষার বর্ণনা লিপি-বদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া জনশ্রুতি আছে। তাঁহার এই স্ত্রীর গর্ভে চারটি সন্তান জন্মে। দ্বিতীয়া স্ত্রী একটি মাত্র সন্তান প্রসব করিয়া লোকান্তরিত হন। মিল্টন বড় আক্ষেপ করিলেন, হা হুতাশ করিলেন, শেষে বুঝিলেন যে একটি "সংসারের সঙ্গিনী ও সহচরী"র আবশ্যক। তাই তিনি তৃতীয় সংসার করিয়াছিলেন। এই তৃতীয়া স্ত্রীকে একজন বড় ইংরাজ গোলাপ ফুল বলিয়া ছিলেন। কবি তাহার উত্তরে বলেন—"আমি বর্ণের বিচারক নই। একথা সত্য হইলেও হইতে পারে, কারণ আমি প্রত্যহই কাঁটা সহ্য করি।"

কবিবর ড্রাইডেন বেশ বড় ঘরে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার পত্নী লেডি এলিজাবেথ, আর্ল অফ বার্কসায়রের কন্যা। কেবল কবিতায় কবিপত্নীর মনস্তুষ্টি হইত না। তিনি একদিন স্বামীকে বলিয়াছিলেন—"আমি যদি পুস্তক হইতাম, তুমি আমাকে অধিক যত্ন করিতে।" সুরসিক কবি বলিলেন—"হ্যাঁ যদি পুস্তকের মধ্যে স্ত্রী পঞ্জিকা হইত, তাহা হইলে বেশ প্রতি বৎসর পরিবর্ত্তন করা চলিত"।

স্কটলণ্ডের স্বভাব-কবি, কৃষক-কবি, বাস্তবিক স্কচদিগের আদরের কবি বার্ণস, বড় সুপুরুষ ছিলেন। যত কবিতা লিখিয়া না হউক, চেহারার জোরে রবার্ট বার্ণস্ অনেক যুবতীর মন হরণ করিয়াছিলেন। হার্ডি সাহেব বার্ণসের বিবাহিতা ও অবিবাহিতা, মাত্র আটটি প্রণয়িনীর নামোল্লেখ করিয়াছেন। নিজের যখন পনের বৎসর বয়স তখন তিনি চৌদ্দ বৎসরের "সুন্দরী নেলের" ভালবাসা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। নেলী, ফিজপাট্রিকের কন্যা, তাঁহারই মত কৃষিকার্য্য করিত। তিনি অনেক গুলি গানে মেরি মরিসানের উল্লেখ করিয়াছেন—তিনি বোধ হয় তাঁর প্রণয়িনী মিস বেগবাই। অন্যান্য রমণীদের মধ্যে তিনি জিন আরমরকে ভাল বাসিতেন। আঠার বৎসর ভাল বাসিবার পর যখন তিনি পুত্র-সম্ভাবিতা হন তখন তাঁহার বদনামের ভয়ে স্বভাব-কবি জিনকে বিবাহ করেন। তাঁহার বিবাহের দুই বৎসর পরে আনা পার্কের গর্ভে তাঁহার একটি জারজ কন্যা হয়। তাহার চারি বৎসর পরে মিসেস হোয়ালপড্লের সহিত তাঁহার প্রণয় জন্মে। তাঁহার প্রণয়কাহিনী সম্বন্ধে অলমতি বিস্তরেণ।

কবি ক্যাম্পবেল একনিষ্ঠ ছিলেন এবং স্ত্রীর প্রতি বড় অনুরক্ত ছিলেন।

বিপত্নীক হইয়া তিনি বড় শোক করিয়াছিলেন। অথচ এই কবি স্বয়ং একদিন লিখিয়াছিলেন।

"Bind the sea to slumber stilly
Bind its odour to the lily
Bind the aspen ne'er to quiver
Than bind love to last for ever."

অর্থাৎ যদি সমুদ্রকে নীরব তন্দ্রায় বাঁধিতে পার, যদি কমলের গন্ধ কমলে আবদ্ধ রাখিতে পার, যদি আস্পেনকে এমন ভাবে বাঁধিতে পার যে সে কাঁপিবে না, তাহা হইলেই প্রেমকে চিরদিনের মত বাঁধিতে পারিবে। তাঁহার Lord Ullin's daughterএর মত করুণ রসাত্মক প্রেমের কথা-কাব্য ইংরাজি ভাষায় অতি অল্পই আছে। সুখের বিষয় কবি ক্যাম্পবেল জীবনে প্রকৃত প্রেমিকের পরিচয় দিয়াছেন।

কোলরিজ এবং সাদে—দুই ভগ্নীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। সাদেকে প্রথমটা অবস্থার বিপাকে পড়িয়া নব-বিবাহিতা স্ত্রীকে ছাড়িয়া প্রবাস বাস করিতে হইয়াছিল। পরে অর্থ সঞ্চয় করিয়া আসিয়া স্ত্রীরত্ন লইয়া পরম সুখে কালাতিপাত করিয়াছিলেন।

কিন্তু তাঁহার শ্যালিকা কবি ভ্রাতা কোলরিজের কণ্ঠে বরমাল্য দান করিয়া বড় কষ্টে পড়িয়াছিলেন। কোলরিজ দারুণ দারিদ্র্যের মধ্যে রাখিয়াও স্ত্রীকে যত্ন করিতেন না। নিজে অহিফেন সেবন করিতেন এবং গৃহে নিত্য কলহ, নিত্য টানাটানি। কবিতা লিখিয়া অর্থোপার্জ্জন করিবার আশায় বসিয়া থাকিতেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার প্রতি বাণী বা কমলার অপেক্ষা ষষ্ঠি দেবীরই কৃপা অধিক বর্ষিত হইয়াছিল। কবি সাদে ভিক্ষা করিয়া কোলরিজের পুত্রকে কলেজে পাঠাইয়া ছিলেন। অশান্ত সংসারে দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া কবি লিখিয়াছিলেন—"সর্ব্বাপেক্ষা হতভাগা অসহায় ও নিরাশা-পীড়িত লোকের কল্পনা কর আমার অবস্থা বুঝিতে পারিবে।" কবি এই জীবন-সমুদ্রেই দেখিয়াছিলেন—

Water water everywhere
And not a drop to drink.

তাঁহার জীবন-সাগর লবণাম্বুতে পূর্ণ ছিল—কবি অপরকে স্বর্গসুখ দান করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু নিজে নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন। কবি বিরক্ত হইয়া বলিয়াছিলেন—স্বামী যদি বধির হয় আর স্ত্রী যদি মন্দ হয় তাহা হইলেই উদ্বাহ-বন্ধন আদর্শ হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহাকে নিত্যই ব্যথিতা স্ত্রীর গঞ্জনা

শুনিতে হইত এবং কোলরিজ পত্নীকে নিত্যই স্বামীর নিশ্চেষ্টতা দেখিতে হইত। তাই তাঁহাদিগের উভয়েরই জীবনে সুখ বা শান্তির লেশ মাত্র ছিল না। কিন্তু কোলরিজের একনিষ্ঠার বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

এই সকল একনিষ্ঠ কবিদিগের মধ্যে ভাবুক কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ বড় প্রেম-সুখে সুখী ছিলেন। বড় যত্নে বড় উৎসাহে তাঁহার স্বাধ্বী স্ত্রী কবিবরের সেবা করিতেন। জীবনের শেষ দশা অবধি "বুড়াবুড়ি দু'জনাতে মনের মিলে সুখে থাকত।" প্রথম প্রথম যখন ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিতা প্রকাশিত হইত, সবজান্তা সমালোচকের দল সেগুলির নিন্দা করিত। কবি-প্রিয়া হাসিয়া স্বামীকে উত্তেজিত করিত। বলা বাহুল্য, সেই সকল কবিতাই এখন বিলাতী কাব্যকুঞ্জে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থকে উচ্চস্থান প্রদান করিয়াছে।

"The fountains mingle with the river
And the rivers with the ocean."

ইত্যাদি অক্ষয় কবিতা-রচয়িতা শেলীর দাম্পত্য-জীবন কলঙ্কম্লান। বিদ্যালয় ছাড়িয়াই শেলী তাঁহার "কাজিন ভগ্নী" হ্যারিয়েটের প্রেমে পাগল হইয়া উঠেন। হ্যারিয়েটও তাঁহাকে ভালবাসিয়াছিলেন এবং উভয় পক্ষের গুরুজনেরা তাঁহাদের প্রণয় অনুমোদন করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষে উভয় পরিবারে ধর্ম্মমত লইয়া মনোমালিন্য হওয়ায় তাঁহাদের প্রণয় মুকুলে নষ্ট হইয়া যায়। ভাবপ্রবণ শেলীর প্রাণে বড় বিষম আঘাত লাগিল। তাহার ভগ্নীর সহিত হ্যারিয়েট ওয়েষ্টব্রোক নামে একটি বালিকা বিদ্যালয়ে পাঠ করিত। একে নাম হ্যারিয়েট তাহাতে তাঁহার মুখের কে জানে কোথায় শেলী তাহার ভগ্নী হ্যারিয়েটের মুখের একটু ছায়া দেখিলেন। তিনি এই হ্যারিয়েটকে প্রেম শাস্ত্র শিক্ষা দিতে লাগিলেন, তাঁহাকে "স্বাধীন চিন্তা"র মন্ত্রে দীক্ষিত করিতে লাগিলেন। হ্যারিয়েটের পিতা ওয়েষ্টব্রুক একটা কাফির দোকানের অধ্যক্ষ। তিনি ষোড়শী কন্যার মুখে স্বাধীন চিন্তার বুলি শুনিয়া সন্ত্রস্ত হইলেন। তিনি কন্যাকে শাসন করিতে লাগিলেন। শেলী প্রণয়িনীকে অবাধ্য হইতে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। ওয়েষ্টব্রুকও ছাড়িবার পাত্র নহেন। শেষে শেলী বুঝিল হ্যারিয়েটের উপর নির্য্যাতন হইতেছে। তিনি সুপরামর্শ দান করিয়া, তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য, হ্যারিয়েটকে লইয়া পলাইলেন। তখন শেলী উনবিংশ বর্ষীয় এবং হ্যারিয়েট ষোড়শী। তাঁহারা পলাইয়া এডিনবারায় গিয়া উদ্বাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন।

সামান্য দোকানদারের কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া শেলীর পিতা তাঁহাকে কোনও অর্থ সাহায্য করিলেন না, দোকানদারও কন্যা-জামাতার খোঁজ খবর লইলেন না। নব-দম্পতী যথাসাধ্য সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

কিন্তু এই প্রেমিক-প্রেমিকা কাহারও সংসারের অভিজ্ঞতা ছিল না। কবির নিকট সামান্য সাংসারিক কথা নীচ বলিয়া মনে হইত, কবি-প্রিয়াও ছোট কাজে মন দিতেন না। ফলে সংসারে সুশৃঙ্খলতার একেবারে অভাব লক্ষিত হইত। যেদিন যেমন জুটিত সেই দিন তেমনি খাওয়া দাওয়া হইত, যে দিন গৃহে সুবিধা হইত না সে দিন শেলী দোকানে গিয়া দুই পকেট বোঝাই করিয়া রুটী কিনিয়া আনিতেন।

ভাবপ্রবণ কবি অধিক দিন হ্যারিয়েটের প্রেমে তৃপ্তি পাইলেন না। কেহ কেহ বলেন যে, হ্যারিয়েটকে বিশ্বাসঘাতিনী সন্দেহ করিয়া শেলী তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন। কিন্তু আসল কারণটা মেরি গড্‌বিন নামক এক যুবতীর প্রেম। কবি দিন কতক চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া রুক্ষ কেশে আলুথালু বেশে ঘুরিয়া শেষে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া মেরিকে লইয়া পলায়ন করিলেন। সাধ্বী স্ত্রী ক্ষোভে, লজ্জায়, ঘৃণায় "সার্পেণ্টাইন" নহরে ডুবিয়া আত্মঘাতিনী হইলেন। এক বৎসর পরে শেলী পূর্ব্ব জীবন স্মরণ করিয়া এক মনোরম কবিতা লিখিয়াছিলেন। *

ওয়ালটার স্যাভেজ ল্যাণ্ডর অতি মনোরম কবিতায় লিখিয়াছিলেন যে তিনি তাঁহার আয়ানথির নাম এমন ভাবে লিখিবেন যে সে লেখা কোন তরঙ্গে মুছিতে পারিবে না, এখনও যাহারা অজাত তাহারা জন্মিয়া সে লেখা পড়িবে।† কিন্তু তাঁহার বাস্তব জীবনে কবি এরূপ অমর ভালবাসার পরিচয় মোটেই দেন নাই। তিনি তাঁহার ভাবী পত্নীকে এক বলনাচে দেখিয়াই বিবাহ করিবার সঙ্কল্প করেন। ইংরাজীতে কথা আছে, তাড়াতাড়ি বিবাহ করিলে অবসর মত অনুতাপ করিতে হয়। কবির জীবনে তাহাই হইয়াছিল। কবি দেখিলেন

---

* "That time is dead for ever, child
Drowned, frozen, dead, for ever !
We look on the past
And stare aghast
At the spectres wailing pale and ghast
Of hopes which thou and I beguiled
To death, on life's dark river."

† "Well I remember how you smiled
To see me write your name upon
The soft sea sand—"*O ! what a child !
You think you're writing upon stone !*"

স্ত্রী বড় মুখরা। কবি-ঘরণী মোটেই বুঝিতেন না যে "এক মুহূর্ত্তে যে কথা বলা যায় তাহা সারা জীবনে ভুলিতে পারা যায় না।" এক হাতে তালি বাজে না, কিন্তু তাঁহাদের দাম্পত্য-জীবনে যে বিশেষ শান্তির অভাব ছিল তাহা নিঃসন্দেহ। শেষে শান্তির জন্য তাঁহারা স্বেচ্ছায় পরস্পরকে বর্জ্জন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। বন্ধু-বান্ধব চেষ্টা করিয়াছিলেন যে অন্ততঃ দুইটি সন্তানের ভরণপোষণের ভার কবি গ্রহণ করেন। কিন্তু সংসারে তাঁহার এমন বিতৃষ্ণা হইয়াছিল যে সে বিষয়ে তিনি মোটেই উৎসাহ দেখান নাই। স্ত্রীর সহিত পৃথক হইবার পর বিশ বৎসর বাথ্ সহরে অবস্থিতি করিয়া তিনি বাণীর আরাধনায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

টমাস মুর খুব একনিষ্ঠ প্রেমিক ছিলেন। তিনি স্ত্রী পুত্রের সংসর্গে বড় সুখে থাকিতেন। কিন্তু তাঁহার অপেক্ষা প্রেমিক ছিলেন হুড্। হুড্-পত্নী কবিকে সাহিত্যসেবায় বিশেষ সাহায্য করিতেন। অনেক সময় হুড্ বলিয়া যাইতেন, হুড্-জায়া স্বামীর ভাষা লিখিয়া লইতেন এবং সময়ে সময়ে তাহা সংশোধন করিতেন। তাঁহার উদ্দেশ্যে কবি অনেক প্রেমের কবিতা লিখিয়া ছিলেন, হুড স্ত্রীকে যে সকল পত্র লিখিতেন সেগুলি খুব আবেগময়।

কবি হুড্ অনেক সময় স্ত্রীকে লইয়া রঙ্গরস করিতেন, তাহাতে কবি-গৃহিণী বিরক্ত না হইয়া কবিকে বলিতেন—"ছিঃ ছিঃ কি বাচালতা করিতেছ?" এস্থলে একটি গল্প লিপিবদ্ধ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। এক বার হুড্ দম্পতী ব্রাইটনে হাওয়া খাইতে গিয়াছিলেন। সেস্থলে সাধারণতঃ যে মাছ পাওয়া যায় তাহার পৃষ্ঠে লাল রঙ্গের দাগ থাকে। পত্নী তাহা জানিতেন না। কবি স্ত্রীকে বুঝাইয়াছিলেন "যখন মেছুনী মাছ বেচিতে আসিবে তখন সাবধান হইয়া মাছ কিনিও। যে মাছের উপর লাল রঙ্গের দাগ থাকিবে, জানিও সে মাছ মন্দ।" স্বামীর নিকট এই গম্ভীর উপদেশ পাইয়া মিসেস হুড্ মেছুনীকে ধরিয়া বসিলেন। তিনি দেখিলেন তাহার সকল মৎস্যই বিকৃত! তিনি বলিলেন "বাপু বিদেশী লোককে ঠকাইতে চাও। সব মাছেই যে লাল দাগ—সবগুলা পচা।" ধীবর-পত্নী বিস্মিত হইয়া বলিল—"ওমা আপনি কোথাকার আনাড়ি? লাল দাগ ভিন্ন কি এ মাছ পাওয়া যায় নাকি?" দরজার অন্তরালে দাঁড়াইয়া রসিক কবি স্ত্রীর কথাবার্ত্তা শুনিয়া আনন্দে হাসিয়া উঠিলেন। (ক্রমশঃ)

I have since written what no tide
Shall ever wash away, what men
Unborn shall read o'er ocean wide
And find Ianthis name again.

উপেক্ষিতা।

[লেখক—শ্রীহরিহর ভট্টাচার্য্য।]

দূরে কেন প্রিয়তম, এস—আরো কাছে এস স'রে,
নয়ন হ'য়েছে শ্রান্ত মরণের শান্ত ঘুম-ঘোরে!
লজ্জা কিবা তাহে প্রিয়, কভু তুমি চুমিয়া অধর,
দাওনিকো অভাগীরে ঠাঁই তব ওই বক্ষ'পর!
জীবন-সর্ব্বস্ব ওগো, তা' ব'লে কি মৃত্যুকালে মোর,
অমন নীরবে রবে, হ'য়ে তুমি বিস্ময়ে বিভোর!
নয়নে সঙ্কোচ কেন, বদনে মালিন্য কেন স্বামি,
ও মুখে দেখিলে হাসি সব যে গো ভুলে যাব আমি!
বক্ষভরা শত শত দীর্ঘ দিবসের দুঃখগুলি,
দাও ঘুচাইয়ে,—মাথে দিয়ে ওই চরণের ধূলি!
শুষ্ক ম্লান এই দেহে একদিন কান্তি ছিল কত,
নয়নের প্রান্তে ছিল শান্তিমাখা দৃষ্টি অবিরত!
প্রাণের দেবতা ওগো, মিলনের প্রথম নিশায়,
মেতে উঠেছিল হিয়া সুপ্ত কত আশার নেশায়!
পূরিল না কোন আশা,—প্রকাশের জানিনিকো ভাষা,
বুঝিলে না ছিল এই ক্ষুদ্র হৃদে কত ভালবাসা!
বুকভরা প্রেমরাশি সার্থক হ'ল না জীবিতেশ,
উদ্বেল আকাঙ্ক্ষা ল'য়ে জীবন হইল অবশেষ!
দীর্ঘ এই সপ্ত বর্ষ বক্ষ ভাসে তপ্ত আঁখি-জলে,
আছে শুধু দগ্ধ প্রাণ মুগ্ধ এক দুরাশার ছলে!
হে আমার প্রিয়, যদি এ দাসীরে দেখা দিলে আজ,
লুকান আকাঙ্ক্ষা এক কর পূর্ণ হে হৃদয়-রাজ!
হৃদয়ে তুলিয়া ল'য়ে 'প্রিয়া' ব'লে ডাক একবার,
জনম সার্থক হ'ক, মরণের সময়ে আমার!

গ্রন্থ-সমালোচনা

ছোট বড়—সামাজিক উপন্যাস। শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাস গুপ্ত এম, এ প্রণীত। প্রকাশক সাহিত্য প্রচার সমিতি লিঃ. ২৪ নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা। ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই সুন্দর; ৪২৬ পৃষ্ঠা—মূল্য ১৷৷০ টাকা মাত্র।

উপাখ্যান-ভাগ কৌশলময় ও কৌতূহলোদ্দীপক করিয়া ক্রমবিকাশে চরিত্রগুলিকে স্বাভাবিক করিয়া ফুটাইয়া তোলা ও ভাষার গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া প্রাঞ্জল অথচ হৃদয়স্পর্শী ভাষায় আদর্শ চরিত্র গুলিকে পাঠকের মনশ্চক্ষে সমাজের উচ্চতম আদর্শ স্বরূপ প্রতিফলিত করিয়া উপন্যাসের অধম চরিত্রগুলির প্রতি বিরাগের সৃষ্টি করাই শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকের কার্য্য। 'ছোট বড়' পাঠ করিয়া আমরা শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের এই প্রধান লক্ষণ গুলি পাইয়াছি। গ্রন্থান্তর্গত সর্ব্বগুণাধার জমিদার পত্নী বিজয়া মূর্ত্তিমতী আদর্শ স্ত্রী। হৃদয়হীন কুশীদজীবী-স্বামীর সংসর্গে থাকিয়া বন্ধ্যানারী কিরূপে তাহার স্বাভাবিক মাতৃ-চরিত্রের পরিচয় দিতে পারে, তাহা ক্ষেমঙ্করীর চরিত্রে সুন্দর ফুটিয়াছে। পতিপ্রাণা মীরা, আদর্শসতী গোপবধূ মালতী, সুরসিকা সাগরী, কুটবুদ্ধি মজুমদার, কুশীদজীবী শম্ভু, প্রভুভক্ত কিষণলাল, সাধু চরিত্র দরিদ্র রাইচরণের চরিত্রগুলি সুন্দর অঙ্কিত হইয়াছে। বারাঙ্গনা বেলার চরিত্রে মহত্ত্বের পরিকল্পনা সুন্দর হইয়াছে। গ্রন্থশেষে চরিত্রগুলির কর্ম্মানুযায়ী পরিণাম স্বাভাবিক হইয়াছে। গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা পরিতৃপ্ত হইয়াছি।

The Matriculation English Weekly—প্রতি সংখ্যার মূল্য /০ এক আনা। ডাক ব্যয় স্বতন্ত্র। শ্রীযুক্ত শাক্যসিংহ সেন বি-এ সম্পাদিত ও কলিকাতা রাধাপ্রসাদ লেন হইতে শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

এই নবপ্রকাশিত সাপ্তাহিক পত্রখানি নূতন প্রণালীতে সম্পাদিত হইতেছে। প্রতি সংখ্যায় উচ্চ ইংরাজী স্কুলের ১ম ও ২য় শ্রেণীর ছাত্রবৃন্দের উপযোগী ইংরেজী-সাহিত্যের প্রশ্নপত্র সন্নিবিষ্ট হইতেছে এবং পরের সংখ্যায় সেই প্রশ্নগুলির উত্তর প্রদত্ত হইতেছে। ২য় বা ৩য় শ্রেণীর ছাত্রেরা যদি নিয়মিতরূপে প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে চেষ্টা করে তাহা হইলে তাহারা খুব সম্মানের সহিত ইংরেজী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে, এ কথা সাহস করিয়া বলিতে পারি। উত্তর গুলি লিখিয়া পাঠাইলে সম্পাদক সেগুলি সংশোধন করিবার ভার গ্রহণ করিতেও ইচ্ছুক, ছাত্রবৃন্দের পক্ষে ইহা কম সুবিধার কথা নহে।

আমাদের মনে হয় প্রশ্নপত্রগুলির উত্তর সম্পাদক মহাশয় স্বয়ং না লিখিয়া ছাত্রবৃন্দের মধ্যে যাহার উত্তর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও যোগ্য হইবে তাহাই তাহার নাম-ধাম-সহ পত্রস্থ করা উচিত। তাহা হইলে ছাত্রেরা যথেষ্ট উৎসাহলাভও করিবে। আমরা এই পত্রের দীর্ঘজীবন, বহুল প্রচার ও উন্নতি কামনা করি।

বসন্ত-পঞ্চমী।

[লেখক—শ্রীহরিহর শাস্ত্রী।]

অহহ সহসা কথং বহতি মলয়ানিলো
মন্দমপি নন্দয়তি গাত্রং
মুকুলভরমঞ্জুতনু- চূতনবমঞ্জরী
রঞ্জয়তি হৃদয়মতিমাত্রম্।
কুন্দকুসুমং কিমিতি মৃদুসুরভিসুন্দরং
জনয়তি চ জননিবহহর্ষং
কিমিতি বিদধাতি ভুবি রজনিপতিরমলবপু-
রমৃতময়রজতকরবর্ষম্।
কুহুরিতি চ কিং নু মুহু- রহহ পিকদম্পতী
গায়তো নূনমভিরামং
নবকণিশশালিনো দধতি যবরাশয়ো
রামণীয়কমপি নিকামম্।
বাণি ভবতী ভবতি সাম্প্রতমুপাগতা
তদিব কিমু সপদি বসুধেয়ং
বাঢ়মভিনন্দয়িতু- মম্ব ভবতীমিদং
মণ্ডনমুপৈতি চ বিধেয়ম্।
এহি খলু মাতরিহ দেহি কৃপয়া পুন-
র্দেহিকুশলায় সুবিবেকং
দময় করুণাময়ি স্বনয়নপাততো
ভুবনগতমাপদতিরেকম্।

পুরাণে বিকাশের বিভাগক্রম ও সংখ্যাক্রম।

[লেখক—শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম-এ।]

ক্রম-বিকাশ-বাদের অন্যতম মূলসূত্র এই যে, বিকাশের ক্রমনিম্নস্তরে সংখ্যা-বাহুল্য, ক্রমোর্দ্ধস্তরে সংখ্যাল্পতা। পাশ্চাত্য ক্রম-বিকাশ-বিজ্ঞান এই সাধারণ নির্দ্দেশ করিয়াই একরূপ ক্ষান্ত হইয়াছে, কিন্তু আমাদের পুরাণ শাস্ত্র ইহাতে বিরত না হইয়া সমস্ত সৃষ্টিতেই ইহার অনুপাতের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। সেই অনুসন্ধানের ফল যেরূপ ভাবে পুরাণে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে তাহাতে পাশ্চাত্য ক্রম-বিকাশ-বাদের আশ্চর্য্য সমর্থনই পাওয়া যায়। আমরা এস্থলে পুরাণের সেই বিবরণটী উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।—

"যঃ সহস্রতমোভাগঃ স্থাবরাণাং ভবেদিহ।
পার্থিবাঃ কৃময়স্তাবৎ সংসেকাদ্যেষু সম্ভবাঃ॥
সংসেকজানাং ভাগেন সহস্রেণৈব সম্মিতাঃ।
ঔদকা জন্তবঃ সর্ব্বে নিশ্চয়াত্তদ্বিচারিতম্॥
সহস্রেণৈব ভাগেন সত্ত্বানাং সলিলৌকসাম্।
বিহঙ্গমাস্তু বিজ্ঞেয়া লৌকিকাস্তে চ সর্ব্বশঃ॥
যঃ সহস্রতমোভাগস্তেষাং বৈ পক্ষিণাং ভবেৎ।
পশবস্তৎ সমাজ্ঞেয়া লৌকিকাস্তু চতুষ্পদাঃ॥
চতুষ্পদানাং সর্ব্বেষাং সহস্রেণৈব সম্মতাঃ।
ভাগেন দ্বিপদা জ্ঞেয়া লৌকিকেঽস্মিংস্তু সর্ব্বশঃ॥
যঃ সহস্রতমোভাগো ভাগে তু দ্বিপদাং পুনঃ।
ধার্ম্মিকাস্তেন ভাগেন বিজ্ঞেয়াঃ সম্মিতাঃ পুনঃ॥
যঃ সহস্রতমো ভাগো ধার্ম্মিকানাং ভবেদ্দিবি।
সম্মিতাস্তেন ভাগেন মোক্ষিণস্তাবদেবহি॥
স্বর্গোপপাদকৈস্তুল্যাঃ॥"

বায়ুপুরাণে ১০১ম অধ্যায়।

"স্থাবরদিগের যে সহস্রতম ভাগ, তাবৎ সংখ্যক পার্থিব কৃমি, ইহারা সংসেক হইতে উৎপন্ন। এই সংসেকজাত কৃমিদিগের সহস্র ভাগই জলীয় জন্তুগণ, ইহাই নিশ্চয় পূর্ব্বক বিচারিত। জলীয় প্রাণিগণের সহস্র ভাগে লৌকিক বিহঙ্গমগণ। বিহঙ্গমদিগের সহস্রতম ভাগই, তৎসমকক্ষ লৌকিক চতুষ্পদ পশুগণ। চতু-

পদদিগেব সহস্রতম ভাগে দ্বিপদগণ; দ্বিপদদিগের সহস্রতম ভাগে ধার্ম্মিকগণ, ধার্ম্মিকদিগের সহস্রতম ভাগে স্বর্গীয় ধার্ম্মিকগণ এবং স্বর্গীয় ধার্ম্মিকদিগের সহস্রতম ভাগে মুক্ত পুরুষগণ, পরপর উৎকর্ষের এইরূপই ভাগক্রম পরিজ্ঞেয়॥"

বঙ্গবাসীর অনুবাদ।

এখানে ক্রম-বিকাশের বিভাগক্রম হইতে জানা যাইতেছে যে, প্রথমেই স্থাবর অর্থাৎ উদ্ভিজ্জাদি উৎপন্ন হয়। তৎপর কৃমি প্রভৃতি জীবোৎপত্তি হয়, ইহার পর জলীয় জীবোৎপত্তি হয়। জলীয় জীবের পর, পক্ষি সকলের উৎপত্তি হয়। ইহাদের পর চতুষ্পদ সকল উৎপন্ন হয়। চতুষ্পদের পর দ্বিপদ অর্থাৎ মনুষ্য সকল জন্ম গ্রহণ করে।

এই বর্ণনায় প্রথমেই স্থাবরের কথা হইতে, জীব-বিজ্ঞানের আরম্ভ প্রথম উদ্ভিদ্ হইতে হওয়ার বিষয় যে, পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদিগেরই ন্যায় ঋষিদিগেরও সুস্পষ্ট ধারণাই ছিল, তাহা পরিষ্কাররূপেই প্রতিপন্ন হইতেছে।

উপরে বিকাশের যে ক্রম উল্লিখিত হইয়াছে তাহার সহিত পাশ্চাত্য বিভাগ-ক্রমের বড় প্রভেদ আছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। উদ্ভিজ্জই জীবের সাধারণ খাদ্য, সুতরাং উদ্ভিজ্জের উৎপত্তি পূর্ব্বে হওয়াই প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী বলিয়া বোধ হয়। কৃমি কীট প্রভৃতি মল হইতে উৎপন্ন হয়, ইহারা স্ত্রী পুরুষের সংসর্গে উৎপন্ন হয় না। এই জন্যই ইহারা 'স্বেদজ' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহারা জীববিকাশের অতি নিম্নস্তরবর্ত্তী। তৎপর অণ্ডজ ও জরায়ুজ ক্রমে উর্দ্ধস্তরবর্ত্তী জীব। মৎস্য ও পক্ষি প্রভৃতি অণ্ডজ জীব, সুতরাং ইহারা বিকাশে পরস্পরের বিশেষ নিকটবর্ত্তী। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে মৎস্য হইতেই পক্ষীর বিকাশ অনুমিত হইয়াছে। বস্তুতঃ উড়ুক্কু বা উড্ডয়নশীল মৎস্য প্রভৃতিতে তাহার যথেষ্ট নিদর্শনই দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাণে জলীয় জন্তুর পর পক্ষি-জাতির উল্লেখ হইতে আমরা পাশ্চাত্য বিকাশক্রমই স্পষ্টরূপে কল্পিত দেখিতে পাইতেছি। অণ্ডজ মৎস্য ও পক্ষীর পক্ষ বা ডানাই প্রধান বিচরণযন্ত্র, জরায়ুজ জীবদিগের পদই প্রধান বিচরণযন্ত্র, তাহাতেই পদের দ্বারা তাহারা বিশেষিত হইয়াছে। ইহাদিগের নিম্নস্তর চতুষ্পদ ও উর্দ্ধস্তর দ্বিপদ। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান মনুষ্যেই বিকাশের শেষস্তর নির্দ্দেশ করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছে। পুরাণে মনুষ্যের মধ্যেও আবার ধর্ম্ম ভাবের উৎকর্ষানুসারে উর্দ্ধস্তর কল্পিত হইয়া তাহার তিনটী ক্রম নির্দ্দেশিত হইয়াছে। ধার্ম্মিকদিগের একস্তর, স্বর্গগামিদিগের তদূর্দ্ধ-স্তর এবং মুক্তিপ্রাপ্ত ধার্ম্মিকদিগের সর্ব্বোচ্চস্তর। স্বর্গ, দেবতাদিগেরই স্থান,

মুক্তির স্থান পরমেশ্বরেরই স্থান। সুতরাং উল্লিখিত ধার্ম্মিকদিগের স্তর কল্পনা দ্বারা মনুষ্যের সাধারণ বিকাশের পর—আধ্যাত্মিক বিকাশের দ্বারা মনুষ্য যে ক্রমে দেবত্ব ও ঈশ্বরত্ব লাভে সমর্থ হয়—তাহাই বুঝিতে পারা যায়। ইহা হইতে পাশ্চাত্য বিকাশক্রম যে মধ্যস্থলেই স্থগিত হইয়াছে—শেষ সীমা প্রাপ্ত হয় নাই—কিন্তু পুরাণের বিকাশক্রম যে চরম সীমা পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা আমরা স্পষ্টই উপলব্ধি করিতে পারি।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, বিকাশের সংখ্যা-নির্দ্দেশে যে স্থলে অকৃতকার্য্য হইয়াছে সেস্থলে পুরাণ কিরূপে কৃতকার্য্য হইয়াছে, তাহা জানিবার জন্য বিশেষ কৌতূহলই উপস্থিত হয়। আমরা এই কৌতূহলই নিবারণের জন্য পুরাণে এতৎ সম্বন্ধে যে মুখবন্ধ পাওয়া যায় তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

ঋষয় উচুঃ।

"সর্ব্বেষামেবভূতানাং লোকালোকনিবাসিনাম্।
সংসারে সংসরন্তীহ যাবন্তঃ প্রাণিনশ্চ তান্॥
সংখ্যায়া পরিসংখ্যায় ততঃ প্রব্রূহি কৃৎস্নশঃ।
ঋষীণাং তদ্বচঃ শ্রুত্বা মারুতো বাক্যমব্রবীৎ॥

বায়ুরুবাচ।

ন শক্যা জন্তবঃ কৃৎস্না প্রসংখ্যাতুং কথঞ্চন।
অনাদ্যন্তাসু সঙ্কীর্ণা হ্যপ্যূহেন ব্যবস্থিতাঃ।
গণনা বিনিবৃত্তৈষামানন্ত্যেন প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
ন দিব্যচক্ষুষা জ্ঞাতুং শক্যাজ্ঞানেন বা পুনঃ।
চক্ষুষা বৈ প্রসংখ্যাতুমতোঽন্তে নরাধিপাঃ॥
অনাধ্যানদেবেদ্যাত্মানৈব প্রশ্নো বিধীয়তে।
ব্রহ্মণা সংজ্ঞিতং যত্তু সংখ্যয়া তন্নিবোধত॥"

বায়ুপুরাণ ১০১ম অধ্যায়।

"অতঃপর যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণেরা পুনরায় বায়ুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে বায়ো! লোকালোক নিবাসী নিখিল ভূতবৃন্দের মধ্যে যে সকল প্রাণী এ সংসারে বিচরণ করে, তাহাদিগকে সংখ্যাপূর্ব্বক সম্পূর্ণ রূপে কীর্ত্তন কর। ঋষিগণের সেই কথা শুনিয়া বায়ু বলিলেন,—সমুদায় প্রাণিগণের সংখ্যা নির্দ্দেশ করিবার শক্তি আমার নাই। জন্তু প্রবাহ, অনাদি, অনন্ত, সুসঙ্কীর্ণ ও মাত্র তর্কাবগম্য। আনন্ত্যপ্রযুক্ত ইহাদের গণনা হওয়াই অসম্ভব। অদিব্য চক্ষু বা অজ্ঞান নেত্র দ্বারা ঐ সমুদয় জন্তুকে জানিবার বা সংখ্যা করিবার শক্তি কাহারও নাই।

অচিন্ত্য ও অবেদ্য বলিয়া এক্ষণে এরূপ প্রশ্ন বিধেয় নহে। তবে ব্রহ্মা, সংখ্যা পূর্ব্বক উহা যেরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর।”

উদ্ধৃত বর্ণনা হইতে বিকাশের সংখ্যা যে সাধারণ জ্ঞানের সাধ্য নহে, পরন্তু উহা যে তত্ত্বজ্ঞানেরই মাত্র সাধ্য, তাহাই আমরা বুঝিতে পারিতেছি। আমরা মনুষ্যের বিকাশে মুক্তি বা ঈশ্বরলাভের যে উর্দ্ধতম স্তর প্রাপ্ত হইয়াছি, যাঁহারা সেই স্তরে উপনীত হইয়াছেন, তাঁহাদের জ্ঞানের দ্বারাই মাত্র সেই বিকাশ-সংখ্যা আয়ত্ত হইতে পারে।

বিকাশের সংখ্যা নিরূপণে যে স্থলে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানই এখনও নীরব রহিয়াছে সেস্থলে তৎসম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপন ও তাহার সমাধানের চেষ্টা প্রাচ্য ঋষি দিগের কেবল ক্রমবিকাশ-বিজ্ঞান গঠনের প্রমাণই বলিতে হইবে তাহা নহে, কিন্তু পাশ্চাত্য ক্রমবিকাশ-বিজ্ঞান অপেক্ষাও তাহাকে পূর্ণতাপ্রদান চেষ্টার প্রমাণ বলিয়াই বলিতে হইবে।

কবি ও কবিতা।

[লেখক—শ্রীযতীন্দ্রকুমার লাহা।]

ইদানীং মাসিক পত্রিকা সমূহে ও বহুল প্রকাশিত কবিতাগ্রন্থে বঙ্গভাষা যেরূপ কবিতাপ্লাবিত হইয়া উঠিতেছে, তদ্দর্শনে এই বন্যার উৎপত্তি ও গতি বিশেষভাবে পর্য্যালোচনা করিবার দুরাশা অবশ্য মার্জ্জনীয়। সহসা বাঁধ ভাঙ্গিয়া দুর্গমশৈলাঙ্কপালিতা কবিতা নির্ঝরিণী সহস্রমুখী হইয়া কিরূপে বঙ্গদেশ প্লাবিত করিল, এবং তৎফলে বঙ্গকাব্যকানন উর্ব্বরিত হইয়া নানাসুগন্ধ বৃক্ষ শোভিত হইতেছে কিংবা কণ্টক বৃক্ষজননে মনীষিগণ-রোপিত অপূর্ব্ব পরিমল সুরভিত বাগ্দেবীর মনোরম কুঞ্জকানন সমূহ শ্রীহীন হইবার উপক্রম হইয়াছে, সাহিত্যানুরাগীর দৃষ্টি তদ্বিষয়ে স্বভাবতঃ আকৃষ্ট হয়।

ভাবের সৌন্দর্য্য ও পূর্ণ অভিব্যক্তি এবং পাঠকের হৃদয়ে তাহার উদ্দীপনা যে প্রকৃত কবিতার লক্ষণ, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু এই উভয় গুণের সম্পূর্ণ অসদ্ভাবই এই সকল কবিতার অধিকাংশের প্রধান বিশেষত্ব। আধুনিক কবিগণ ইন্দ্রজিতের ন্যায় দুর্ভেদ্য ভাষা ও কল্পনার অন্তরালে অন্তর্হিত থাকিয়া এরূপ কবিতাধারা বর্ষণ করেন যে পাঠকগণ বর্ণনীয় বিষয়ের অবধারণে অসমর্থ

হইয়া নিতান্ত অসহায় ও বিমূঢ়ের ন্যায় ছন্দজালে আবদ্ধ হইয়া পড়েন। ফলতঃ কবির কল্পনা কবির মানসকুঞ্জেই গুঞ্জন করিতে থাকে, পাঠকগণের অনুভূতির অগম্য হওয়াতে তাহাদের চিত্তবিনোদনে সমর্থ হয় না। কদাচ আবাস পরিত্যাগ করিয়া মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইলেও বিসদৃশ আবরণের প্রচ্ছন্নতাহেতু তাহার সৌন্দর্য্য ও মাধুরী এরূপ বিকৃতিপ্রাপ্ত হয়, যে তাহার স্বাভাবিক প্রকৃতির কোনও চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় না।

বর্ত্তমান যুগে আধ্যাত্মিক ও নীতিমূলক ক্ষুদ্র কবিতারই প্রাচুর্য্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ঐ সকল কবিতা অত্যন্ত অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিলেও পাঠক প্রায়শঃ তাহাদের অন্তর্নিহিত গূঢ় আধ্যাত্মিকতা বা গভীর উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয় না। কারণ কবির উদ্দাম ও অসংযত কল্পনার অপ্রতিহত বেগে কবিতাত্মক ভাব সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত হইয়া এরূপ বিলীন হয় যে ফলতঃ কবিতাটী ভাববিহীন জটিলকল্পনারহস্যে পরিণত হইয়া তদোদ্ঘাটনের ব্যর্থ প্রয়াসে যেন পাঠকগণকে উপহাস করিতে থাকে। প্রহেলিকার মধ্যে ভাবের সামান্য স্ফুরণ হইলেও উহা এত ক্ষীণ যে, পাঠকের হৃদয়ে উহার রেখা-মাত্রও পতিত হয় না।

কবিত্ব-শক্তির একান্ত অভাব যে সর্ব্বত্র এই সকল বিকলাঙ্গ ও নিষ্ফল কবিতার কারণ,এরূপ অনুমান অসঙ্গত। কতিপয় কবিতায় যে লেখকের কবিত্বের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়, ইহা কেহই অস্বীকার করিবেন না। কিন্তু তথাপি লেখকের রচনা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর না হইয়া কি হেতু ভাববিহীন বাক্যচ্ছটামাত্রে পর্য্যবসিত হয়, ইহা পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক। আধুনিক কবিগণের রচনারীতি কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিলে প্রতীয়মান হয় যে ভাবের জটিলতা তাঁহারা কবিত্বের একমাত্র অঙ্গ বলিয়া অনুমান করেন। কবিতাসুন্দরী অশরীরী জ্যোতির্ম্ময় আত্মা বিশেষ; সুতরাং পার্থিব যুক্তির শৃঙ্খলে তাঁহাকে আবদ্ধ করিবার চেষ্টা নিতান্ত গর্হিত। যুক্তি গদ্যের প্রকৃতি ও শাসন; যুক্তিবন্ধন উপেক্ষা করিয়া অনিয়ন্ত্রিত কল্পনাকৌতুক পদ্যের প্রকৃতি ও স্বাভাবিক গতি। বোধ হয় এবম্প্রকার ধারণার ফলে এই সকল অপকবিতার সৃষ্টি হইতেছে। প্রকৃতপক্ষে

'True wit is Nature to advantage dressed

What oft was thought but ne'er so well expressed'.

স্বয়ং কবি কবিতার এই লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যুক্তি দ্বারাই মনুষ্য ইতর

প্রাণী হইতে বিশিষ্ট। সুতরাং যুক্তি যে মনুষ্যভাষার,—কি গদ্য, কি পদ্য এতদুভয়ের ভিত্তি ইহা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে। যুক্তিহীন ভাষা বাতুলতা প্রমাদ বলিয়া কথিত হয়। গদ্য ও পদ্যের প্রভেদ এই যে, পদ্যে যুক্তি উপযোগী ও প্রাসঙ্গিক কল্পনাভরণ হেতু স্ফুটতর ও মনোরম হইয়া পাঠকের হৃদয়গ্রাহী হয়; গদ্যে আভরণের আবশ্যকতা নাই। সাধারণতঃ গদ্য নিরাভরণ যুক্তিপ্রয়োগে পাঠককে বর্ণনীয় বিষয়ের সত্যাসত্য বিচারে প্রবৃত্ত করে; পদ্য কল্পনাপ্রভাবে তাহার মনে সত্যের উপলব্ধি উৎপাদন করে। কল্পনার আস্তরণে কবির উক্তি প্রতিভাত হওয়াতে ইহার সত্যতা স্বতঃ উপলব্ধি হয়। পৃথিবীর মহাকবিগণের রচনার ইহাই বিশেষত্ব এবং এই কারণে পদ্য মানবহৃদয় মার্জ্জিত ও উন্নত করিতে অধিকতর উপযোগী।

লেখকগণের ধৈর্য্যের অভাবও অনেক সময়ে এইরূপ কবিতা-বিভ্রাটের সহায়তা সম্পাদন করে। ভাবের সঞ্চারমাত্র কবি কল্পনা উৎপীড়ন করিয়া কবিতা রচনা করিতে ঈদৃশ অধীর হইয়া উঠেন যে, ইহার গুণদোষ বিচার করিবার তাঁহার অবসর থাকে না। এরূপ অকালপ্রসূত কবিতা যে অপরিপুষ্ট ও সারবিহীন হইবে, ইহা কিছুই বিচিত্র নহে। ভাষা ও ভাবের ভূয়ঃ সংস্কার সুকবিতা রচনার মূল। ভাবাবেশে কবিতারচনা উচ্চস্তরের শ্রেষ্ঠ ও অভ্যস্ত কবিগণের পক্ষে সম্ভবপর হইলেও, নবপ্রয়াসী অনভ্যস্ত কবির পক্ষে একান্ত অসম্ভব। এমন কি, পৃথিবীর মহাকবিগণও তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ কাব্যসমূহ বহুকালব্যাপী তীক্ষ্ণ আলোচনার ফলে মার্জ্জিত করিয়া সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইচ্ছাসৃষ্টি একমাত্র স্রষ্টার আয়ত্ত। কঠোর ও তীব্র সাধনা মানবের উৎকর্ষের সোপান। এই বিধি উপেক্ষা করিয়া মনুষ্য কখনও মহত্বে উপনীত হইতে পারে না।

পুরাকালে কবিত্বের আদর্শ অত্যন্ত উচ্চ ও কবিযশঃ নিতান্ত দুর্লভ ছিল। বহু সাধনার ফলে সিদ্ধ তপস্বীগণই নিত্য ও পবিত্র কবিধামে স্থানলাভ করিতেন। কিন্তু ইদানীং আদর্শের হীনতা হেতু বাগ্দেবীর পবিত্র মন্দির জনসাধারণের সুগম হওয়াতে, ও 'কবি', 'সুকবি', ও 'মহাকবি' প্রভৃতি আখ্যার উচ্চ গৌরবলাভ কথঞ্চিৎ সুপ্রাপ্য হওয়াতে অনেকেই কবিত্বের পথে অগ্রসর হইতে সাহসী হইয়াছেন, এবং সেই হেতু বঙ্গভাষা ক্ষীণ ও হীন কবিতাপ্লাবিত হইয়া উঠিতেছে। ইহার সত্বর ও সমূল সংস্কার না হইলে বঙ্গভাষার প্রভূত অমঙ্গলের আশঙ্কা।

স্নেহের জয়।

[লেখক—শ্রীচৈতন্যচরণ বড়াল, বি-এ]

(১)

"কাকী-মা!—কাকী-মা কোথায় গো!"

সেদিন প্রাতে শ্রীমতী কাদম্বিনী দাসী ওরফে নবীনের মা' তাড়াতাড়ি স্নানাদি সমাপন পূর্ব্বক রন্ধনের উদ্যোগে ব্যস্ত ছিলেন। কারণ তাঁহার পুত্র নবীন আহারাদি করিয়া কলিকাতা যাত্রা করিবে। কেন—তাহা পরে বিবৃত হইবে। এমন সময় সহসা এই পরিচিত কণ্ঠের আহ্বান তাঁহার কর্ণে ধ্বনিত হইবামাত্র মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহাকে অন্যমনস্ক করিয়া তুলিল। কিন্তু তিনি তৎক্ষণাৎ আত্মসংযম পূর্ব্বক প্রাঙ্গণে আসিলেন।

অনিলভূষণ আবার ডাকিল, "কাকী মা!"

"কে অনিল! কি মনে করে?"

অতি সঙ্কুচিত ভাবে প্রাঙ্গণ মধ্যে অগ্রসর হইয়া লজ্জাবনত মুখে জড়িত স্বরে সে উত্তর দিল, "কেন—তুমি কি জান না কাকী মা?" কাকী-মা সমস্ত জানিতেন। কিন্তু নিজ মনোভাব তাহার নিকট প্রকাশ করিতে তিনি আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না। বিরক্তি পূর্ণ স্বরে তিনি বলিলেন, "আমি আর কি ক'রে জান্‌বো বল—তোমরা এখন—"

বাধা দিয়া অনিল বলিল, "ও সব কথা ভুলে যাও। আমি এসেছি। তোমাকেই এ কাজের সমস্ত ভার নিতে হবে। তুমি না গেলে চল্‌বে না।"

কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া নবীনের মা বলিলেন, "তাহ'লে বিবাহ স্থির?"

নত মস্তকে অনিল উত্তর দিল, "হাঁ"।

"তা, আমি ত' যেতে পার্ব্বনা। আমার আশা ছেড়ে দাও।"

একটু জোরের সহিত অনিল বলিল, "মা—তা' হবে না। লোকে যাহাই বলুক, আমি কিন্তু তোমাকে আমার সেই কাকী-মা' বলেই জানি। তাই সকলের আগে তোমার কাছে এসেছি। তোমাকে তো আমি ছাড়্‌তে পার্‌বো না।"

অনিল বুঝিতে না পারিলেও তখন নবীনের মাতার হৃদয় মধ্যে এক ঝঞ্ঝা প্রবাহিত হইতেছিল। এক দিকে এই বালকের সরল স্নেহভরা কাকুতি

মিনতি আর অন্য দিকে বিষম পারিবারিক অভিমান তাঁহার রমণী-হৃদয়কে আলোড়িত করিয়া তুলিতেছিল। অবশেষে অভিমানই জয়লাভ করিল। ঈষৎ কম্পিত স্বরে মাটিপানে চাহিয়া তিনি উত্তর দিলেন, "না অনিল, আমি যাব না।"

এই স্পষ্ট প্রত্যাখ্যানে অনিলের মনে বড়ই আঘাত লাগিল। সে যে তাহার মাতার শত আপত্তি—স্বজনের সহস্র গঞ্জনা অগ্রাহ্য করিয়া—উভয় পরিবার মধ্যে সমস্ত বিবাদের কথা মন হইতে দূরে নিক্ষেপ করিয়া তাহার পূর্ব্বের মমতাময়ী কাকী-মা'র কাছে অতীতের ছোট বালকটির মত মত্ত আবেগে ছুটিয়া আসিয়াছিল। উভয় পরিবার মধ্যে শত বিসদৃশ আচরণেও সে বিশ্বাস করিতে পারে নাই যে, তাহার এ আনন্দের দিনে কাকী-মা' ক্ষুদ্র স্বার্থের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া তাহাকে কোলে টানিয়া লইবে না। সে বুঝিতে পারে নাই যে, কাকী-মার পূর্ব্ব স্নেহরাশি অভিমানের—পারিবারিক দ্বন্দ্বের পঙ্কিল প্রবাহে অদৃশ্য হইয়াছে। হায়! অতীতের সে সুখ-রাশি যদি শুধু স্মৃতিতেই পর্য্যবসিত হইবে, তবে কেন এ রমণী মায়ার কঠিন নিগড়ে তাহার শিশু-হৃদয় বাঁধিয়া রাখিয়াছিল!

রুদ্ধ ও শুষ্ক কণ্ঠে অনিল জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি তা'হলে আমাকে ছাড়্‌লে?"

নবীনের মা' কোন উত্তর না দিয়া চলিয়া গেলেন। মুহূর্ত্তকাল স্থির থাকিয়া অনিল জিজ্ঞাসা করিল, "নবীন যাবে তো?"

রান্নাঘর হইতে উত্তর আসিল, "সে আজ কলিকাতা যাইবে।" একটী দীর্ঘ শ্বাস ফেলিয়া অনিল চলিয়া গেল।

(২)

এই স্থানে একটু পূর্ব্ব কথার আলোচনা আবশ্যক। শ্যামাচরণ ও বামাচরণ উভয়ে জ্ঞাতি ভ্রাতা, পাশাপাশি বাটীতে বাস করিতেন। কনিষ্ঠ বামাচরণ কোম্পানীর কাগজের দালালী করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়া অতি অল্প বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন। নবীন তাঁহার একমাত্র পুত্র। বামাচরণ বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়া যখন দেশে তালুকের পর তালুক কিনিতে লাগিলেন তখন হইতে শ্যামাচরণ বিশেষ ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠিয়াছিলেন; তারপর যখন নবীনের মাতা তাহারই বাটীর পার্শ্বে থাকিয়া নিত্য যাগযজ্ঞের আয়োজন করিতে লাগিলেন—গ্রামের সকলের প্রশংসা অর্জ্জন করিতে লাগিলেন, তখন তিনি আর

সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি এই বিধবার ধ্বংসের আয়োজন করিতে লাগিলেন। শ্যামাচরণের অর্থ না থাকিলেও তাঁহার যথেষ্ট কূটবুদ্ধি ছিল। তাঁহার পরিচিত সকলেই স্বীকার করিত যে, মস্তিষ্কের চালনায় অনেক প্রবীণ এটর্ণীও তাঁহার নিকট হার মানে। এহেন শ্যামবাবু ঐ অনাথা বিধবার বিরুদ্ধে তীব্র সায়কসমূহ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। ফলে, নবীনের মাতা দেখিলেন, তাঁহার চিরশান্ত প্রজারা বিদ্রোহী হইতেছে, চিরবিশ্বস্ত কর্ম্মচারীবর্গ বিশ্বাস-ঘাতকতা করিতেছে। সকলেই তাঁহাকে বিপদে ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে। শীঘ্রই তিনি তাঁহার এই বিপদের কারণ বুঝিতে পারিলেন। প্রথম প্রথম নিজ পুত্রসম প্রিয় বালক অনিলের মুখ চাহিয়া তিনি সমস্ত নীরবে সহ্য করিতেন। অনিলকে যে তিনি হাতে করিয়া মানুষ করিয়াছেন! প্রথম হইতেই তিনি স্বীয় পুত্রের সহিত অনিলের কোন পার্থক্য রাখেন নাই। সুতরাং তাহার পিতার এই অন্যায় অত্যাচারের প্রতিশোধ লইতে স্নেহশীল হৃদয়ে সে বড়ই বেদনা অনুভব করিত। অবশেষে, একদিন যখন তিনি আশ্চর্য্যের সহিত শুনিলেন যে, খাজনার দায়ে তাঁহার স্বামীর শ্রেষ্ঠ সম্পত্তির অন্যতম পায়স পাথার গ্রাম প্রকাশ্য আদালতে বিক্রীত হইয়া গিয়াছে, আর শ্যামবাবুই তাহার ক্রেতা, তখন তিনি আর সহ্য করিতে পারিলেন না। সেই হইতে পুনরায় উভয় পরিবারে অবিশ্রান্ত কলহের আরম্ভ। পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে, শ্যামবাবুর অর্থ না থাকিলেও বিষয়-বুদ্ধি বিলক্ষণ ছিল। সুতরাং নবীনের মাতা এ যুদ্ধে পুনঃ পুনঃ পরাজিত হইতে লাগিলেন। তবে এ বিবাদে শ্যামবাবুরও প্রাণে শান্তি ছিল না, কারণ মোকদ্দমার ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে তাঁহাকে আকণ্ঠ ঋণজালে আবদ্ধ হইতে হইয়াছিল। তিনি বুঝিয়াছিলেন, সে দায় হইতে তাঁহার মুক্তি অসম্ভব। তবুও শ্যামবাবু নিজ সর্ব্বস্ব পণ করিয়াও এই ধনবতী বিধবাটিকে কিঞ্চিৎ শিক্ষা দিতে মোটেই অনিচ্ছুক ছিলেন না। কিন্তু এই জিদের সময় কালের অলঙ্ঘ্য আহ্বানে তাঁহাকে বিষয়কার্য্য ইহজন্মের মত ত্যাগ করিতে হইল!

এইবার নবীনের মাতার সুযোগ আসিল। শ্যামবাবুর মৃত্যুর সঙ্গে তাঁহার বিপুল ঋণভারের কথা প্রচারিত হইল। তখন ত্রয়োদশ বর্ষীয় বালক অনিল-ভূষণ শুধু নীরবে দাঁড়াইয়া দেখিল, তাহার পিতার উত্তমর্ণগণ ক্ষুধিত গৃধিনীর ন্যায় তাহার সমস্ত সম্পত্তি গ্রাস করিতে আসিয়াছে, আর তাহার কাকী মা' এতদিনের শত্রুতার প্রতিশোধ স্বরূপ একে একে সমস্ত ক্রয় করিয়া লইতেছেন! ক্ষুদ্র বসতবাটী ব্যতীত তাহাদের আর কিছুই রহিল না।

"এইরূপে নানা দুর্দ্দশার হস্তে নিপীড়িত হইয়া ছিন্ন বস্ত্রে অর্দ্ধাশনে দুই বৎসর কাটাইয়া অনিল প্রবেশিকা-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। সেই আনন্দের দিনে সকলে তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিল; সকলে ভবিষ্যতের উজ্জ্বল মোহন ছবি তাহার সম্মুখে ধরিয়াছিল। কিন্তু এক কাকী-মা' না আসাতে সে যেন পূর্ণানন্দ ভোগ করিতে পারিতেছিল না। অনিল তাঁহার সহিত দেখা করিতে গেলে তিনি দেখা পর্য্যন্ত করেন নাই!

পাশ করিয়া অনিল যখন আরও পড়িতে চাহিল, তখন তাহার মাতা দশ দিক্ অন্ধকার দেখিলেন। কোন্ মাতা স্বেচ্ছায় নিজ পুত্রের উন্নতির পথে বাধা দিতে চাহে? কিন্তু বালক অনিল তো জানিত না কি কষ্টে তিনি পুত্রকে পড়াইয়াছেন। দুই বৎসর তো নহে—যেন দুই যুগ কাটিয়া গিয়াছে। অনাহারে—চিন্তায় তিনি নিজ স্বাস্থ্য পর্য্যন্ত হারাইয়াছেন। বাঙ্গালার কন্যাভার-পীড়িত অভিভাবকগণ কিন্তু এ সুযোগ ছাড়িল না। সকলে নানা প্রলোভনে দরিদ্রা রমণীকে বশীভূত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। অবশেষে তাহাদেরই একজনের জয় হইল। মাতা পুত্রের বিবাহ দিতে স্বীকৃতা হইলেন, এই সর্ত্তে যে, বৈবাহিক ভবিষ্যতে জামাতার পাঠের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিবেন।

(৩)

অনিল ভাবিতেছিল, এই কি সেই কাকীমা? যিনি বাল্যে নিজ সন্তান নবীনের সহিত তাহাকেও সম্মুখে বসিয়া না খাওয়াইয়া তৃপ্তিলাভ করিতেন না; একবার মাথা ধরিলে নিজ পুত্রকে ফেলিয়া তাহার সেবা করিতে ছুটিয়া আসিতেন, প্রত্যহ নিদ্রাভঙ্গের পর একবার তাহার নিকট না হাজির হইলে সে সমস্ত দিন দুঃখ প্রকাশ করিত, যে সারা বাল্যকালটা তাহাকে তাহার নিজ মাতার ন্যায় অনাবিল স্নেহের সরিতে তাহাকে অভিষিক্ত করিয়াছে—আজ সেই কাকীমা হীন প্রতিশোধ কামনায়—নীচ স্বার্থবশে তাহার স্নেহব্যাকুল কণ্ঠের কাতর আহ্বানেও কর্ণপাত করিলেন না! বালক অনিল তো জানিত না যে, রমণী হৃদয় যখন একদিকে প্রধাবিত হয় তখন কাহার সাধ্য সে উদ্দাম গতি রোধ করে?

বিবাহের ছয়মাস পরে অনিল তাহার মাতাকে হারাইল। পূর্ব্ব হইতেই সে কতকটা সন্দেহ করিতেছিল, এখন মাতার মৃত্যুর পর স্থির বুঝিল যে, বিবাহ করিয়া সে শ্বশুর কর্ত্তৃক প্রতারিত হইয়াছে। এখন তাঁহার নিকট হইতে কোন প্রকার সাহায্য চাহিলেই তাঁহার মুখ বর্ষার ঘন মেঘের ন্যায়

অন্ধকার হইয়া আসে। বিশ দিন প্রার্থনার পর হয়তঃ কখন কিছু দেন আবার কখনও নিরুত্তর থাকিয়া প্রকারান্তরে সাহায্যে অস্বীকৃত হন। এ অবস্থায় নিজেকে অপমানিত বোধে সে শ্বশুরের সংশ্রব ত্যাগ করিল।

মাতার শ্রাদ্ধের কিছুদিন পরে সে সিন্দুক খুলিয়া দেখিল তাহাতে মাত্র স্যাতাইশ টাকা দশ আনা আছে। এই সামান্য অর্থে তাহার কয়দিন চলিবে? ইহার উপর তাহার অধ্যয়নের খরচ আছে। এই ভাবনায় বেচারী এত আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিল যে, পত্নী সুষমা উপর্য্যুপরি কয়েক বার ডাকারি পর সাড়া না পাইয়া গাত্রে হস্তার্পণ করিতে তাহার চেতনা হইল।

সুষমা বলিল, "কি ভাব্‌ছো? বেলা যে অনেক হোল।"

অনিল শুধু এক দীর্ঘশ্বাস ফেলিল।

সুষমা আবার বলিল, "চল"।

অনিল বলিল, "কি ভাব্‌ছি জান সুষমা! ভাব্‌ছি এর পর কি হবে!

"কার পর?"

"এই যখন টাকা কয়টা ফুরিয়ে যাবে। আর বুঝতেই পাচ্ছ যে, এটা ফুরাইতেও বড় বেশী দিন লাগিবে না।"

সুষমা বলিল, "তা ভেবে কি কর্‌বে?"

"তাই ভাবিতেছি।"

সুষমা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া স্বীয় বস্ত্রাঞ্চল বাম হস্তের অঙ্গুলীতে বেষ্টন করিতে করিতে নতমুখে বলিল, "আমার একটা কথা রাখ্‌বে?"

সন্দিগ্ধ ভাবে তাহার মুখপানে চাহিয়া অনিল বলিল, "কি, বল না।"

"আমার গহনাগুলো বেচ্‌লে কত দাম হবে?"

"গহনাগুলো! সবে তো ঐ কয়গাছা চুড়ী আর হার তোমার আছে, আর সবই তো খেয়ে ফেলেছি। তুমি কি ও গুলোও নষ্ট কর্ত্তে বল?"

ঈষৎ হাসিয়া সুষমা বলিল, "এ কি নষ্ট করা?"

"নিশ্চয়।"

"বেশ তাই যদি হয় হোক। এরপর সময় হলে তুমি একখানার জায়গায় পাঁচখানা দিও আমি হাসিমুখে নেবো। কিন্তু এখন দরকারের জন্য বেচিতে দোষ কি?"

অনিল আর শুনিতে পারিল না। তাহাতে একান্ত নির্ভরশীলা এই ব্রততীটিকে নিজ বাহু বেষ্টনে জড়াইয়া ধরিয়া সে শুধু বলিল: "যে আশায় আমি বিবাহ

করেছিলাম তাহাতে বঞ্চিত হ'লেও তোমার মত স্ত্রী-রত্ন লাভ করে আমি গর্ব্ব অনুভব কচ্চি।"

(৪)

"না বাপু, শুধু হাতে আমি টাকা দিতে পার্ব্ব না।"

"বড় কষ্টে পড়েছি কাকী-মা, নাহ'লে, এত করে চাহিতাম না। চাকরীর চেষ্টায় এই তিন মাস নানাস্থানে ঘুরিয়াছি, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কোথাও কিছু পাই নাই।"

"তোমাদের কাছে যতক্ষণ একটি পয়সা থাক্‌বে ততক্ষণ চুপ করে বসে থাবে, আর ফুরিয়ে গেলেই ভিক্ষা কর্ব্বে। তা, বারমাস কে কাকে দিতে পারে বল।"

উক্ত ঘটনার পর প্রায় এক বৎসর অতীত হইয়াছে। আজ অনিলের সহিত নবীনের মাতার কথা হইতেছিল। এই সময়টা অনিল—বাঙ্গালীর শেষ সম্বল—পত্নীর গহনা বন্ধক রাখিয়া ও মাষ্টারী ইত্যাদি করিয়া অতি কষ্টে এফ্‌ এ, পাশ করিয়াছে। এখন সে আর পড়িবার বৃথা আশা ত্যাগ করিয়া চাকুরীর সন্ধানে ঘুরিতেছে। কিন্তু তাহার ন্যায় সুপারিশহীন বালককে কে চাকুরী দিবে! আবার তাহার এই দুঃখের উপর সুষমার এক পুত্র জন্মলাভ করিয়াছে। সুতরাং এ অবস্থায় অনিলের খরচ বাড়িয়াছে অথচ আয় মোটেই নাই। একে একে সুষমার সমস্ত গহনাগুলি সে নবীনের মাতার নিকট বন্ধক রাখিয়া টাকা লইয়াছিল কিন্তু আর তো গহনা নাই, অথচ উদরের অত্যাচার যথেষ্ট আছে, তাই সে নবীনের মাতার নিকট কিছু ভিক্ষা করিতে আসিয়াছে। কিন্তু তাঁহার এই স্পষ্ট প্রত্যাখ্যানে তাহার আশা-সূত্র কোথায় অদৃশ্য হইল। তবু শেষ সে আর একবার চেষ্টা করিল, বলিল, "কাল থেকে যে আমাদের উপোস্‌ কর্ত্তে হবে কাকী মা!" নবীনের মাতা বলিলেন, "যদি তোমাদের বরাতে তাহাই থাকে আমি কি প্রকারে রোধ করিব, বল। আমি তো আর দানসত্র খুলি নাই যে, দুই হাতে সকলকে দান করিব।"

বারবার এই ভিক্ষার কথায় অনিলের মর্ম্মে আঘাত লাগিল, ঈষৎ উত্তেজিত স্বরে সে বলিল, "কখনও যে তোমার নিকট এক পয়সা ভিক্ষা নিয়েছি—তাহা ত আমার মনে পড়ে না।"

নবীনের মাতাও ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন, "না; তোমার জমীদারীর প্রাপ্য খাজনা আমি এতদিন দিতেছি। যে গহনা রাখিয়াছ, বিক্রয় করিলে তাহার অর্দ্ধেক টাকা আমি পাইব কি না সন্দেহ। সেই সামান্য গহনার দরুণ আবার টাকা চাহিতে লজ্জা করে না!"

হায়! এই রমণীই একদিন যাহার হাসি মুখ দেখিবার জন্য না করিতে পারিত এমন কার্য্য ছিল না, আজ তিনিই তুচ্ছ অভিমানবশে চিরপ্রিয়কে দরিদ্র ও নিতান্ত অসহায় দেখিয়াও রমণীর অনুপযুক্ত তীব্র ভাষায় তাহার মর্ম্মে আঘাত দিতেছে। তাহার আর সহ্য হইল না; অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে সে বলিল, "তবে কি তুমি বাল্যে আমার প্রতি যে মমতা, যে স্নেহ দেখাইয়াছিলে তাহা শুধু ছলনা মাত্র?"

মন যতই পরিবর্ত্তনশীল হোক না কেন, সে কখনও অতীত ভুলে না। এই স্মৃতিই তাহাকে স্বর্গে তুলিয়া দেয় আবার এই স্মৃতিই তাহাকে টানিয়া নরকের নিম্নতর স্তরে নিক্ষেপ করে। তাই, অনেকে স্মৃতি ভুলিতে চাহে আবার অনেকে ইহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া গনা দিনগুলা নীরবে কাটাইয়া দিবার জন্য প্রস্তুত হয়। নবীনের মাতা শত চেষ্টায় অতীতের সেই ক্ষুদ্র বালক অনিলের মধুর আহ্বান বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। অবশেষে মনের সহিত দীর্ঘ সংগ্রামের পর ক্ষত বিক্ষত হৃদয় লইয়া তিনি স্থির করিয়াছিলেন যে, তিনি অনিলের প্রতি পূর্ব্ব স্নেহ দমন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কিন্তু তাহার একটা কথায় তাঁহার মাতৃ-হৃদয়ের এক অনাদৃত তার সহসা ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল, তিনি নিজ ভ্রম বুঝিতে পারিলেন। এতো বাজে অভিযোগ নহে—এযে তাঁহার মাতৃস্নেহের প্রতি তীব্র আক্রমণ। নারী সব সহিতে পারে; পারে না শুধু নিজ মাতৃগর্ব্বের প্রতি আঘাত। এই একটা কথায় তিনি নিজ হৃদয়-দ্বারে উঁকি মারিয়া দেখিলেন, তাইত! তিনি যে মিথ্যা প্ররোচনায় নিজেকে সান্ত্বনা দিয়া আসিতেছেন। নতুবা আজ সেই পুরাতন স্নেহ ভস্মমুক্ত বহ্নির মত উজ্জ্বল গরিমায় দেখা দিতে চাহে কেন? তাঁহার ইচ্ছা হইল একবার জোর করিয়া হৃদয়ের এই দৌর্ব্বল্য দূরে নিক্ষেপ পূর্ব্বক অনিলকে বলেন যে, তাহার বাল্যের কাকী-মা মরিয়া গিয়াছে। কিন্তু এত বড় মিথ্যা—এ প্রাণান্তকারী অভিনয় তাঁহার নারীশক্তির অতীত! না—তিনি তাহা পারিবেন না!

অনিল একটু অপেক্ষা করিলে দেখিত পাইত যে, অভিমান ধীরে ধীরে স্নেহকে সিংহাসন ছাড়িয়া দিতেছে—সাক্ষ্য তাহার কাকীমার চক্ষের দুই বিন্দু অশ্রু। সত্যই রমণী আর নিজ পরাভব গোপন করিতে পারিতেছিল না।

(৫)

পরদিন দ্বিপ্রহরে নবীনের মাতা আহারাদির পর যখন নিজ কক্ষে বিশ্রাম করিতেছিলেন তখন সহসা পথের কোলাহলে তাঁহার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। অতিমাত্র বিরক্তির সহিত বাতায়ন পার্শ্বে আসিয়া দেখিলেন, আদালতের

পেয়াদা সহ এক ব্যক্তি অনিলের বাটীর সম্মুখে চীৎকার করিতেছে। তাহার কথা হইতে বুঝিলেন, সে ব্যক্তি গোয়ালা। দুধের টাকার জন্য অনিলের নামে নালিশ করিয়াছে, এবং ডিক্রী পাইয়া সম্পত্তি ক্রোক করিতে আসিয়াছে। কিন্তু পুনঃ পুনঃ আহ্বানেও বাটীর কেহ সাড়া দিতেছে না দেখিয়া সে চীৎকারে পাড়া জাগাইয়া তুলিয়াছে। সকলের সম্মুখে অনিলের কুৎসা করিতেছে। আর সে স্থলে না দাঁড়াইয়া নবীনের মাতা ছাদে উঠিলেন। আজ দশ বৎসর পরে তিনি ছাদের দ্বার খুলিলেন। এই দ্বার দিয়া অনিলের ছাদে যাওয়া যায়। তাঁহার মনে পড়িল, নবীনের পিতার মৃত্যুর পর যে দিন হইতে অনিলের সহিত তাঁহার বিবাদ আরম্ভ হইয়াছে সেই দিন হইতে তিনি ছাদে আসেন নাই; কি জানি যদি অনিলদের গৃহের দিকে চাহিতে হয়! আজ তাঁহার মনে কৌতূহল জাগিল, দেখিতে হইবে অনিল বাড়ী আছে কি না! মনের এ মত্ত আবেগ তিনি দমন করিতে পারিলেন না। সেই দিবসের দ্বিতীয় প্রহরে জ্যৈষ্ঠের প্রখর সূর্য্য কিরণ উপেক্ষা করিয়া তিনি অনিলের বাটীর ভিতরে দৃষ্টিপাত করিলেন। সহসা সোপানাবলীর পার্শ্ব পর্য্যন্ত আসিয়া তাঁহার দৃষ্টি বদ্ধ হইয়া গেল। অপলক নেত্রে তিনি দেখিলেন এক কিশোরী সদ্য প্রস্ফুটিত গোলাপের ন্যায় এক অনিন্দ্য সুন্দর শিশুকে নিজ বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া মর্ম্মর প্রতিমার ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে। তাহার পরিধানে ছিন্ন বসন, হাতে কাঁচের চুড়ী, আর সীমন্তের উজ্জ্বল সিন্দুর বিন্দু রক্তিম গরিমায় জ্বলিতেছে। প্রথম দর্শনেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, মূর্ত্তিমান দারিদ্র্য ইহার চতুর্দ্দিকে শতফেরে গ্রন্থি দিয়াছে। প্রথমে নবীনের মাতা বুঝিতে পারিলেন না যে, রমণী জীবিত কি মৃত! সহসা তিনি দেখিলেন কিশোরীর পাণ্ডুর গণ্ড বহিয়া পাষাণভেদী নির্ঝরিণীর ন্যায় নির্ম্মল মুক্তার মত অশ্রু রাশি ধারায় ধারায় ধরণীপৃষ্ঠ সিক্ত করিতেছে। আর ক্রোড়স্থ বালক মাতৃস্তনের আস্বাদ ভুলিয়া গিয়া বিস্মিত নেত্রে মাতার মুখপানে চাহিয়া—বুঝি উচ্চ চীৎকারে তাহার সাহস নাই—পাছে মাতার সে বেদনার উৎস শুষ্ক হইয়া যায়, জীবন্ত মূর্ত্তি সত্যই পাষাণে পরিণত হয়।

নবীনের মাতা বুঝিলেন, এই অনিলের স্ত্রী আর এই তাহার শিশুপুত্র।

তিনি আর থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার রমণীহৃদয় আর বশ মানিল না। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে তিনি ডাকিলেন, "বৌমা!"

সহসা অপরিচিতের আহ্বানে সন্ত্রস্তা হইলেও পর-মুহূর্ত্তে উপরে এই রমণী মূর্ত্তি দর্শনে সুষমা আত্মসংবরণ করিল ও আসিয়া ছাদের দ্বার খুলিয়া দিল।

তাহার শত দুঃখ-ভার-পীড়িত হৃদয় আর সহ্য করিতে পারিতেছিল না। নবীনের মাতা তাহার হাত ধরিবা মাত্র তাহার রোদনের উৎস যেন আবার শত রুদ্ধ দ্বার খুলিয়া দিল—সে বসিয়া পড়িল। তাহাকে টানিয়া তুলিয়া নবীনের মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন "অনিল কোথা ?"

বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে সুষমা জানাইল, সে সকালে বাহির হইয়া গিয়াছে, তখনও আইসে নাই।

"তোমার খাওয়া হয়েছে ?"

সুষমা চুপ করিয়া রহিল। নবীনের মাতা বুঝিল সে এখনও অভুক্ত।

"অনিল কখন আস্‌বে বলে গেছে কি ?"

সুষমা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল "না।"

তিনি আবার অনিলের প্রতি চটিলেন, বলিলেন, "খুব ত আক্কেল তা'র! বেলা একটা বেজে গেল এখনও না খেয়ে ঘুরে বেড়াচ্চে ?"

এ কিন্তু অভিমানজনিত ক্রোধ নহে—এ সেই পূর্ব্ব স্নেহের অভিব্যক্তি মাত্র।

তিনি আর অপেক্ষা না করিয়া অনিলের পুত্রকে নিজক্রোড়ে লইয়া বিস্মিতা সুষমাকে নিজ বাটীতে টানিয়া লইয়া যাইতে যাইতে বলিলেন, "বৌমা! তুমি আমায় চেনো না। কি করেই বা চিন্‌বে বল; কিন্তু অনিল আমায় চিনে—আমি যে তার কাকী মা।"

সুষমা তাহার স্বামীর নিকট এই কাকীমার স্নেহের কথা এত শুনিয়াছে যে, ইহাকে দেখিবামাত্র যেন কত কালের পরিচিত বোধ করিল। নীরবে তাঁহার অনুসরণ করিল।

কিছুক্ষণ পরে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে, ক্লান্তদেহে আর ততোধিক ক্লান্ত মনে অনিল নিজ গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া ডাকিল, "সুষমা!"

"কে, অনিল! আয় বাবা!" সহসা অনিলের কর্ণে বাল্যের সেই চির-পরিচিত স্নেহ ব্যাকুল কণ্ঠের আহ্বান প্রবেশ করিল!

তখন গোয়ালা নিজ প্রাপ্য লইয়া প্রস্থান করিয়াছে।

প্রথমে অনিল নিজ কর্ণকে বিশ্বাস করিতে পারিল না। কিন্তু কক্ষমধ্যে দৃষ্টিপাত করিতেই দেখিল তাহার সেই কাকীমা আবার স্নেহময়ী মাতৃমূর্ত্তি ধরিয়া তাহারই একমাত্র পুত্রকে নিজ বক্ষে লইয়া তাহাকে আহ্বান করিতেছে। তখন কাকীমার মুখে হাসি—আর সুষমার চক্ষে জল।

এতো স্বপ্ন নহে—এযে অভ্রান্ত মূর্ত্তিমান সত্য!

মন্মথ-মন্দিরে ইংরাজ মনীষা।

[লেখক—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।]

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমে যে সকল ইংরাজ গদ্য-লেখক ইংরাজী সাহিত্যাকাশ সমুজ্জ্বল করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে জোনাথান সুইফ্‌ট সাহেবের স্থান অতি উচ্চ। সূক্ষ্মদর্শন রসিক লেখক কথার ছলে, আজগুবি গলিভারের ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিখিয়া সমসাময়িক রাজনৈতিক বীরপুরুষদের যে প্রকার কষাঘাত করিয়াছিলেন, সে প্রকার কষাঘাত অতি অল্প লেখক করিতে পারেন। কিন্তু বাণীমন্দিরে জয়মাল্য লাভ করিয়া পাদ্রী সুইফ্‌ট মন্মথ-মন্দিরে কলঙ্ক অর্জ্জন করিয়াছিলেন। যিনি ওয়ালপোল, বলিঙ্‌ব্রুক, প্রিন্স অফ ওয়েলস্‌ প্রভৃতি মহারথী রাজনীতি-বিশারদদিগের দুর্ব্বলতা দেখিয়া গলিভারের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে তীব্র উপহাস ব্যঙ্গে সহস্র সহস্র নরনারীকে মুগ্ধ করিয়াছেন, সেই লেখক নিজের চরিত্রে তিনটি যুবতীর মোহে যেরূপ হৃদয়হীনতা ও দুর্ব্বলতার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিলে লজ্জিত হইতে হয়।

উত্তর আয়ার্লাণ্ডে ডিনের পদ প্রাপ্ত হইয়া সুইফ্‌ট ভারিনা নাম্নী এক সুন্দরীকে বিবাহ করিবার জন্য প্রস্তাব করিয়াছিলেন। ভারিনা তাঁহার সহিত ভাগ্য বাঁধিতে সম্মতা হন নাই। হতাশ-প্রেমিক ঈশপের দ্রাক্ষালোভী শৃগালের মত বলিয়াছিলেন—বিবাহের চারিটি সন্তান—অনুতাপ, বিরোধ, ক্রোধ ও বিরক্তি।

পরে কুমার সুইফ্‌ট গৃহপরিচর্য্যার জন্য মিসেস্‌ জনসন নাম্নী এক রমণীকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার এস্‌থার নাম্নী একটি অষ্টম বর্ষীয়া বালিকা ছিল। সুইফ্‌ট স্নেহভরে সেই কুমারীটিকে স্বয়ং লেখাপড়া শিখাইতে লাগিলেন এবং বড় যত্নে তাহাকে লালন পালন করিতে লাগিলেন। তাহার আদরের নাম ছিল ষ্টেল্লা। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সুন্দরী ষ্টেল্লার গুরুর প্রতি অনুরাগ বাড়িতে লাগিল—সে সুইফ্‌টকে আদর্শ পুরুষ বলিয়া বুঝিল, সুইফ্‌টও তাহাকে বড় স্নেহে পালন করিল। কিন্তু গোলাপের কাঁটার মত প্রেমের প্রতিযোগিতা। ইহাঁদের ভাগ্যাকাশে এক ধূমকেতুর আবির্ভাব হইল।

তখন পাদ্রীর বয়স চুয়াল্লিশ বৎসর। সুইফ্‌ট কার্য্যব্যপদেশে লণ্ডনে গিয়াছিলেন। অষ্টাদশী কুমারী হেষ্টার ভ্যানোমৃগ তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইল। প্রৌঢ় সুইফ্‌টেরও বড় গর্ব্ব হইল—সুন্দরী অষ্টাদশী যুবকদের পূজা অবহেলা

করিয়া তাঁহাকে অর্ঘ্যপ্রদান করিতেছে। ক্রমে বন্ধুত্ব যুবতীর কাল হইল। সে আবেগময়ী ভাষায় সুইফ‍্টকে প্রেম জানাইয়া পত্র লিখিতে আরম্ভ করিল। রসিক সুইফ‍্ট ধরা দিলেন না, ব্যঙ্গ করিয়া পত্রের উত্তর দিতে লাগিলেন। কোনও পত্রে তাহাকে ব্যায়াম দ্বারা প্রেম-ব্যাধির অবসান করিতে পরামর্শ দিলেন, কোন পত্রে তাহাকে সুলিখিত পুস্তক পাঠ করিতে বলিলেন।

প্রেমোন্মাদিনী আয়ার্লাণ্ডে আসিলেন। যেদিন সুইফট তাঁহার গৃহে আসিতেন তিনি সে দিন মাল্যপতাকায় বাগান সাজাইতেন। বলা বাহুল্য, অভাগিনী ষ্টেলার বড় মর্ম্মপীড়া হইল। তাহার দেবতা তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া যায়— এ বিপদে সে বিধিমত সুইফ‍্টের মনোরঞ্জন করিতে লাগিল। সাহিত্যিক পাদ্রী উভয়সঙ্কটে পড়িলেন, প্রতিযোগী তরঙ্গের মাঝে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে লাগিলেন।

শেষে কুমারী হেষ্টার দেখিলেন যে ষ্টেল্লার সহিত সুইফ‍্টের কি সম্পর্ক তাহা স্পষ্ট ভাবে বুঝিতে না পারিলে তাঁহার কর্ত্তব্যপথ নির্দ্ধারিত হইবে না। তিনি ষ্টেল্লাকে এক পত্র লিখিলেন, তাহাতে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন সুইফ‍্ট কি তাঁহার স্বামী। রোরুদ্যমানা ষ্টেল্লা সেই পত্র লইয়া সুইফ‍্টকে দিল। তাহার অবমাননায় সুইফ‍্ট জ্বলিয়া উঠিলেন। তিনি সেই পত্র লইয়া গিয়া হেষ্টারের টেবিলের উপর ফেলিয়া দিয়া তাঁহার সহিত সকল সম্বন্ধ ছেদন করিয়া আসিলেন। ইহাতে যুবতীর বুক ভাঙ্গিয়া গেল। সে ব্যথিতা হইল, সঙ্কট রোগাক্রান্ত হইল, শেষে ইহলীলা শেষ করিল। পাদ্রী নারীহত্যা করিলেন বলিয়া বড় বিব্রত হইলেন।

ষ্টেল্লার সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল সে কথা তিনি প্রকাশ করেন নাই। ষ্টেল্লাকে কিন্তু তিনি এই সময় বিবাহ করিয়াছিলেন এবং বিবাহের রাত্রি হইতে আজীবন তাঁহারা স্বতন্ত্র ভাবে বাস করিয়াছিলেন।

ডন্ জুয়ান রচয়িতা লর্ড বায়রণ মন্মথ-মন্দিরের একজন নিষ্ঠাবান ভক্ত ছিলেন, কারণ অন্যান্য অনেক কবির মত তাঁহাকে অতি সুকুমার বয়সেই পঞ্চশরের মারাত্মক মহিমাটুকু বুঝিতে হইয়াছিল। তিনি অতি শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন ও বড় সুপুরুষ ছিলেন ; কাজেই তাঁহার কন্দর্প মূর্ত্তিতে আকৃষ্ট হইয়া অনেক রমণীকে শুধু বায়রণ প্রতিভায় নয় বায়রণের রূপে মজিতে হইয়াছিল। একজন জার্ম্মাণ লেখক বলেন যে ললনাকুল আকুল অন্তরে কবিকে দিবারাত্র ঘিরিয়া থাকিত। অবশ্য স্ত্রীলোককে মুগ্ধ করিবার সকল গুণই কবিবরের ছিল—সুঠাম

বপুঃ, সুমিষ্ট কথা, সুললিত কবিতা লিখিবার ক্ষমতা, রাজসম্মান, উচ্চ পদবী তাহার উপর নিজ বিবাহিতা স্ত্রীর সহিত সম্বন্ধচ্ছেদ। বিলাতী রমণীদের মোহ উৎপন্ন করিতে হইলে নাকি বিবাহ-বন্ধন কাটিতে হয়! যাহা হউক, কবি-প্রবর পনের বৎসর বয়সেই মেরি অ্যান সবর্থ (Chaworth) নাম্নী যুবতীর প্রেমে উন্মত্ত হন। যুবতী কিন্তু তাঁহার প্রেমের প্রতিদান করেন নাই। তিনি তাঁহাকে স্কুলের ছোকরার মত দেখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কবি ভাঙ্গা মন জোড়া দিবার জন্য এথেন্স নগরে গিয়া ইংরাজ ভাইস-কন্‌সালের বিধবার সংসারে বসবাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার কবিতায় বর্ণিত "এথেন্সের কুমারী", এই বিধবার প্রথমা কন্যা।

১৮১৩ খৃঃ অব্দে বায়রণ সার রাল্‌ফ্‌ মিল্‌ব্যাঙ্কের একমাত্র কুমারীকে মন-মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করিলেন। তাঁহার সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইবার জন্য তিনি ব্যস্ত হইলেন। বন্ধুবান্ধব কবির ভাবগতিক বুঝিয়া তাঁহাকে নিরস্ত হইতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু প্রেমিকের মনের উদ্দাম গতি সামান্য বাধা বিঘ্ন মানে না। কুমারী মিল্‌ব্যাঙ্ক নিজে তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। কিন্তু দুই বৎসর পরিশ্রম করিয়া কবিবর বিজয়লক্ষ্মী লাভ করিলেন। ১৮১৫ সালের জানুয়ারী মাসের প্রথমেই শুভকার্য্য সুসম্পন্ন হইল।

শুভ বিবাহের এক বৎসর পরেই অশুভ গৃহবিবাদ কবিবরের জীবনে অশান্তি বর্ষণ করিতে লাগিল। তিনি নিজে লিখিয়াছিলেন—"আমি সমস্ত পৃথিবীর সহিত এবং ভার্য্যার সহিত যুদ্ধ করিতেছি।" ইহাঁদের দাম্পত্য-কলহের কারণ সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলিয়াছেন। মিসেস ষ্টৌ বলেন যে, এই সময় লর্ড বায়রণ তাঁহার বৈমাত্রী ভগ্নীর সহিত অবৈধ প্রণয়জালে বদ্ধ হইয়াছিলেন। তাহা জানিতে পারিয়া লেডী বায়রণ রণরঙ্গে মাতিয়া উঠিয়াছিলেন। এ কুৎসিত কথাটা একেবারে অসত্য বলিয়া সকলের বিশ্বাস। লেডী বায়রণ পিতার এক-মাত্র কন্যা ছিলেন, কাজেই অনেক আদরযত্নে লালিতা হইয়াছিলেন। কবিবরের সংসারের উচ্ছৃঙ্খলতা তাঁহার পক্ষে আদৌ তৃপ্তিকর হইতে পারে নাই। কবির মেজাজও সকল সময় শান্ত থাকিত না। ক্রোধে তাঁহার জ্ঞানলোপ হইত। তিনি একদিন ক্রোধপরবশ হইয়া তাঁহার বহুমূল্য ঘড়ি অগ্নিতে ফেলিয়া দিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়াছিলেন। এক বৎসরের মধ্যে নয়বার দেওয়ানী আদালতের পেয়াদা আসিয়া তাঁহাদের মালপত্র ক্রোক করিয়াছিল। স্বামীকে কেবলমাত্র অর্থের জন্য ঋণগ্রস্ত দেখিলে লেডী বায়রণ স্বামীগৃহ পরিত্যাগ করিতেন কি না

সন্দেহ। তাঁহার স্বামীকে অনেক প্রেমের ধার পরিশোধ করিতে হইত—এ দৃশ্য অবশ্য কবি-গৃহিণীর চক্ষুশূল হইয়া উঠিয়াছিল। কাজেই স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ ঘটিল।

বিবাহ-বাঁধন টুটিবার পর কবি কাউণ্টেস গুইক্কিওলি প্রভৃতির প্রেম-সুখে সুখী হইয়াছিলেন। সে সকল কাহিনী হার্ডি সাহেব বিবৃত করেন নাই। আমরাও বিরত হইলাম।

মন্মথ-মন্দিরে কবি ব্রাউনিঙ জয়মাল্য লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার ও মিস্ ব্যারেটের প্রণয়-কাহিনী বড় মনোরম, বড় শিক্ষাপ্রদ। তাঁহাদের অনুরাগ, তাঁহাদের দুই প্রাণের মেশামিশি, তাঁহাদের শান্ত উজ্জ্বল গৃহস্থ-জীবন, কবি দম্পতীর প্রতি শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। বায়রণ, শেলী, বার্ণস্ প্রভৃতিকে আমরা যেমন কবি বলিয়া ভালবাসি, ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ, ব্রাউনিঙ্, টেনিসন্ প্রভৃতিকে আমরা কেবল কবি বলিয়া ভালবাসি না। আমরা তাঁহাদের কবিতায় মুগ্ধ হই, তাঁহাদের নির্ম্মল চরিত্রের জন্য তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা করি। সাহিত্য-সেবার সহিত উচ্চনীতির সেবা করিতে পারিলে মানুষের মনুষ্যত্ব ফুটিয়া উঠে—মানুষ জীবনে মরণে লোকের ভক্তিভাজন হয়। জীবন কালে অনেক কবি জনপ্রিয় হইতে পারেন না, তাহার কারণ তাঁহাদের স্বভাব-চরিত্র সাধারণে অনুমোদন করে না। সমসাময়িক সমালোচকগণ কবির রচনা সমালোচনা করিবার সময় তাঁহার আসল চরিত্রটুকু বিস্মিত হইতে পারেন না। কিন্তু কবির মৃত্যুর পর লোকে তাঁহাদের জীবনের অনেক কথা ভুলিয়া যায়, তাহারা কাব্যের ভিতর দিয়া রচনার ধারা হইতে কবির চিত্র আঁকিয়া লয়। কবির প্রকৃত জীবনের কুৎসিত দাগগুলা তাহারা জানিতে পারে না, তাহারা পরিচয় পায় কেবল কবির কল্পিত আদর্শের। ব্রাউনিঙ্ ও তাঁহার পত্নী তাঁহাদের অমল প্রেমের জন্য সাধারণের প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। অবশ্য উভয়েই শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর কবি। অনেকে আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে দুইজন কবির মিলন সুখের হইবে না। কিন্তু ইহাঁদের বাস্তব জীবনের প্রেম সমসাময়িক সকলকেই মুগ্ধ করিয়াছিল। আমাদের স্যর রবীন্দ্রনাথের আধুনিক কবিতার মত ব্রাউনিঙের অনেক কবিতা অস্পষ্ট। তাঁহার সহিত মিস্ ব্যারেটের বিবাহের প্রস্তাব শুনিয়া কবি ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ বলিয়াছিলেন—"আশা করি তাহারা পরস্পর পরস্পরকে বুঝিতে পারিবে।" মিস্ ব্যারেট বিবাহের পর একজন বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন—"আমার মত কেহ আমার স্বামীকে বুঝিতে পারে না। কারণ আমি তাঁহার অন্তরে বিরাজ করি, আমি তাঁহার নিশ্বাস শুনিতে পাই।"

দাম্পত্য-জীবনে সুনীতি দেখাইয়াছিলেন লর্ড টেনিসন। লর্ড ও লেডি টেনিসন পরস্পরের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সকল প্রিয়পাত্রই সুচরিত্র ছিলেন। তিনি কেবল মেধা দেখিয়া কাহাকেও কৃপাদান করিতেন না। নিজের মহান চরিত্রের আদর্শে ইংলণ্ডের সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে সুনীতির প্রসার করিয়াছিলেন।

দান্তে গাব্রিয়েল রোসেটির প্রেমে একটা বড় রোমান্স্ মিশ্রিত আছে। আমি বহুদিন পূর্ব্বে বিপত্নীক রোসেটির Blessed Damozel নামক কবিতার সহিত বিপত্নীক বড়াল কবির 'এষা' কাব্যের একটি কবিতার তুলনা করিয়াছিলাম। রসেটির কবিতার সহিত একটা করুণ কাহিনী জড়িত আছে। কবি-প্রিয়ার মৃত্যুর পরদিন,তাঁহার 'কফিন' বন্ধ হইবার পূর্ব্বে কবি 'কফিনে'র নিকট গিয়া সকলের সম্মুখে মৃতা স্ত্রীর সহিত কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন। অবশ্য উত্তর পাইলেন না। শেষে তাঁহার সমুদায় কবিতার পাণ্ডুলিপি লইয়া সেগুলিকে কফিনে রাখিলেন। কবি-পত্নীর সহিত কবির সমস্ত কবিতার সমাধি হইল। লোকে সেই অপ্রকাশিত কবিতাগুলিকে লুপ্তরত্ন ভাবিয়া তাহাদের স্মৃতিকে শ্রদ্ধা করিতে শিখিয়াছিল। কিন্তু বন্ধুবান্ধব সর্ব্বদা কবর খুলিয়া কবিতাগুলি উদ্ধার করিতে রোসেটিকে অনুরোধ করিত। সাত বৎসর পরে কবি সম্মতি প্রদান করিয়াছিলেন। রাষ্ট্রসচিবের অনুমতি লইয়া তাঁহার সমাধির ভিতর হইতে সেই পাণ্ডুলিপিগুলি বাহির করিয়া প্রকাশিত করা হইয়াছিল।

অনেকের ধারণা যে প্রকৃত প্রেম কেবল লোকের প্রথমা পত্নীর সহিত হইতে পারে, প্রথমা পত্নীর বিয়োগের পর লোকে বিবাহ করে "পঞ্চজনার অনুরোধে," প্রেমের জন্য নহে। বিখ্যাত গদ্যলেখক সার রিচার্ড ষ্টীলের জীবনচরিত পাঠ করিলে অন্য রকম ধারণা হয়। তিনি প্রথমে এক বিধবার পাণিগ্রহণ করেন। বিধবা-স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি সুন্দরী মিস্ মেরি স্কারলকের প্রণয়ে উন্মাদ হইয়া উঠেন। উন্মাদ হইয়াছিলেন বলিতেছি, কারণ তিনি তাঁহাকে চারি শতের অধিক প্রেমপত্র লিখিয়াছিলেন এবং সেই সকল পত্রাবলী হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, তাঁহার প্রেমটা একটু অসাধারণ রকমের রোমান্টিক। তিনি একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন—"তুমি আমাকে একখানা পাখা, কিম্বা কতকটা মৃগনাভি কিম্বা তোমার হাতের একপাটি দস্তানা পাঠাইও। তাহা না হইলে আমি বাঁচিব না। তাহা না হইলে এবার যখন আমি তোমার পার্শ্বে বসিব তখন তোমার হস্তে চুম্বন করিব, না হয়ত তোমার রুমাল চুরি করিব।" এ রকম

প্রেমের উচ্ছ্বাসে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা অসম্ভব বুঝিয়া এক মাসের মধ্যে মিস স্কারলক্ তাঁহার সহিত পরিণীতা হইতে সম্মতা হইয়াছিলেন।

দুঃস্থ সাহিত্যসেবীর গৃহে কবি-পত্নীকে বে-আদব পাওনাদারের গঞ্জনা সহ্য করিতে হইত, দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিতে হইত আর সংসারকার্য্যে অনভ্যস্ত স্বামীর অভিভাবকতা করিতে হইত। কিন্তু ষ্টীল্ তাঁহাকে মিষ্ট ভাষায় তুষ্ট করিতেন বলিয়া তিনি দারিদ্র্যের কশাঘাত হাসিমুখে সহ্য করিতে পারিতেন।

'পামলা'-প্রণেতা রিচার্ডসন সাহেব বড় রমণী-প্রিয় ছিলেন। "তিনি এক প্রকার রমণী-ফুল-কাননে বাস করিতেন। রমণীরাই তাঁহাকে উৎসাহ দিতেন, তাঁহার সমালোচনা করিতেন, তাঁহার সুখ্যাতি করিতেন, তাঁহার সহিত পত্র বিনিময় করিতেন। তিনি সর্ব্বদাই রমণী পরিবেষ্টিত হইয়া থাকিতেন এবং তাঁহাদিগের সহিত ভাবের কথা কহিয়া তাঁহাদিগকে অন্তর্নিহিত বুদ্ধি-শক্তির পরিচয় দিতে প্রোৎসাহিত করিতেন।" বলা বাহুল্য, এরূপ আচরণে তাঁহার স্ত্রীর প্রাণে ঈর্ষা জন্মিত, সুতরাং তাঁহাদের দাম্পত্যজীবনে শান্তির অভাব পরিলক্ষিত হইত।

তাঁহার প্রথমা পত্নীর মৃত্যুর পর ফিলডিঙ্ তাঁহার স্ত্রীর দাসীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। দাসী কিন্তু পরলোকগতা প্রভু-পত্নীর স্থান অধিকার করিয়া শক্তির অপব্যবহার করেন নাই। তিনি সতীন পুত্রদের বেশ সুখে রাখিয়াছিলেন। ফিলডিঙের আমিলিয়া নামক গ্রন্থ তাঁহার মৃতা প্রথমা ভার্য্যার স্মৃতির জন্য লিখিত হইয়াছিল।

সার ওয়ালটার স্কট্ মাত্র একবার বিবাহ করিয়াছিলেন। লেডী স্কট্ ফরাসী বংশসম্ভূতা ছিলেন। তিনি পতি-প্রাণা ছিলেন এবং কবির বড় সমাদর করিতেন। মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইয়াও তিনি সর্ব্বদা হাস্যমুখে সার ওয়াল্টারকে সম্ভাষণ করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর দশ দিন পূর্ব্বে স্কট্ নিজের ডায়েরিতে লিখিয়াছিলেন—"এখনও হাসিমুখে আমাকে অভ্যর্থনা করিতেছে আর জোর করিয়া বলিতেছে ভাল আছি।" ঊনত্রিশ বৎসর লেডী স্কট্ প্রসিদ্ধ কবি ও ঔপন্যাসিকের সুখ দুঃখ, আশা নিরাশার সাথী থাকিয়া ইহলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর স্কট্ বড় অধীর হইয়াছিলেন। তিনি বলেন—"তাহার পর আর আমি সুখের কথা লিখিতে পারি নাই।"

কিন্তু এই রমণীর পাণিগ্রহণ করিবার পূর্ব্বে স্কট্ স্যর্ জন্ ষ্টুয়ার্টের কন্যা

মার্গারেটের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়াছিলেন। সে প্রেমের প্রারম্ভও রোমান্টিক। তখন স্কটের বয়স মাত্র উনিশ বৎসর। তিনি গির্জ্জা হইতে বাহির হইয়া দেখিলেন—বৃষ্টি পড়িতেছে। সেই বর্ষার ধারায় সিক্ত হইয়া একটি সুন্দরীও গির্জ্জাদ্বার হইতে বাহিরে আসিল। ভদ্রতা করিয়া স্কট্ তাঁহাকে নিজের ছাতাটি ব্যবহার করিতে দিলেন। তাহা হইতেই উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব জন্মিল। সেই বর্ষাধারা-সিক্ত যুবতীকে নবীন কবি হৃদয়-রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। যখন সকলে নৃত্যকলার আমোদে উৎফুল্ল হইয়া বল-নাচে ব্যাপৃত থাকিত, এই যুবক যুবতী বহুক্ষণ ধরিয়া এককোণে প্রেমালাপ করিতেন। স্কটের রোকবী কাব্যের এবং উড্‌ষ্টক উপন্যাসের নায়িকাদ্বয় এই মারগারেট। কিন্তু কার্য্যের সময় মারগারেটের প্রেম কবির পক্ষে বিফল হইয়াছিল। তিনি ধনী স্যর উইলিয়ম ফর্বসের পুত্রকে বিবাহ করিয়া কবির প্রাণে বিষম ব্যথা দিয়াছিলেন। এ বিবাহে কবির হৃদয় ভাঙ্গে নাই বটে কিন্তু ফাটিয়া ছিল। তাঁহার স্বার্থপর প্রণয়িনীর জন্য স্কটের হৃদয়ের কোণে চিরদিন প্রেম ছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর কবি তাঁহার জন্য অনেক কাঁদিয়াছিলেন।

জেরেমী বেন্থাম যৌবনে একজন যুবতীকে ভালবাসিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার সহিত উদ্বাহ-বন্ধনে ভাগ্য বাঁধিতে যুবতী স্বীকৃত হন নাই। ষাট বৎসর বয়সের সময় বেন্থাম আর একবার তাঁহাকে পরিণয়সূত্রে বাঁধিবার চেষ্টা করিয়া বিফল-মনোরথ হন। অশীতি বৎসর বয়ঃক্রম-কালে তিনি তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন যে এতদিন তিনি অপর কাহারও ভজনা করেন নাই। এ প্রেম প্রশংসনীয় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

অহিফেন-সেবা-নিরত ডিকুইন্‌সী একনিষ্ঠ প্রেমিক ছিলেন। তাঁহার দুঃস্থ পরিবারে তাঁহার ভার্য্যা যথাসাধ্য মিতব্যয়িতার দ্বারা শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করিতেন।

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক গ্রোট্ সাহেব মিস্ লিউইন নাম্নী একটি সুশিক্ষিতা [যু]বতীর সহিত গির্জ্জায় পরিচিত হয়েন এবং এই গির্জ্জাঘরেই কন্দর্পদেব ঐতি[হ]াসিককে শরাঘাত করেন। বিবাহের পূর্ব্বে তাঁহার এক বিশ্বাসঘাতক বন্ধু [গ্]রোটকে বলিয়াছিল যে লিউইন কুমারী অপর যুবকের নিকট বাগ্‌দত্তা। [ত]াহাতে মেধাবী গ্রোট্ বড় আকুল হইয়া 'হা হুতাশ' করিয়াছিলেন। শেষে [ত]াহাকে পত্নীত্বে লাভ করিয়া জীবন সফল বিবেচনা করিয়াছিলেন। গ্রোট-[দম্]পতী আজীবন প্রেম-সুখে কালযাপন করিয়াছিলেন। স্বামী প্রাচীন ইতিহাস

পড়িতেন, গ্রীসের ইতিহাস লিখিতেন—স্ত্রী নবীন ইতিহাস নবীন কাব্যে মনোনিবেশ করিতেন। তাই গ্রোট্ বলিতেন—আমাদের পাঠাগারটি প্রাচীন ও নবীন জগতের সমন্বয় ক্ষেত্র।

প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক লর্ড লীটনের দাম্পত্য-জীবন হলাহল পূর্ণ। তাঁহার জননী ভাবী লেডী লীটনকে দেখাইয়া পুত্রকে বলিয়াছিলেন—"বুলওয়ার দেখ কেমন সুন্দর মুখ! কে ও সুন্দরী?" মাতার প্রশ্ন পুত্রের কাল হইল। মাতৃ-আজ্ঞা পালন করিয়া সুন্দরীকে চিনিতে গিয়া লীটন তাঁহাকে বিবাহ করিলেন। উভয়েরই মেজাজ কড়া—কাজেই স্বামী স্ত্রীতে সদ্ভাব হইল না। অল্পদিন পরেই উভয়ের বিরোধ ঘটিল, পরস্পরের স্বাতন্ত্র্য ঘটিল। লেডী লীটন এক পুস্তক লিখিয়া স্বামীর নিষ্ঠুরতার কাহিনী প্রকাশ করিলেন। একবার যখন পার্লামেণ্টের মেম্বর হইবার জন্য লর্ড লীটন ভোটদাতাদিগের সমক্ষে বক্তৃতা করিতেছিলেন তখন লেডী লীটন উঠিয়া স্বামীর নিষ্ঠুরতা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়া সভা ভঙ্গ করিয়া দিয়াছিলেন!

ঔপন্যাসিক ডিকেনসের দাম্পত্য জীবনের শনি হইয়া উঠিয়াছিলেন তাঁহার ভার্য্যার ভগ্নী মেরী। কথাবার্ত্তায় চালচলনে মেরী তাঁহার ভগ্নী অপেক্ষা পটু ছিলেন। তাই ডিকেনসের ঘরে তিনি সর্ব্বে-সর্ব্বা হইয়া উঠিয়াছিলেন। কবি একেবারে তাঁহার করতলগত হইয়াছিলেন। কেবল তাহাকে সম্মানিত করিয়াই ডিকেনস্ সন্তুষ্ট ছিলেন না, তিনি স্ত্রীকে তিরস্কার করিয়া সর্ব্বদাই বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন যে, মেরী রমণীকুলের আদর্শ। ফলে, স্বামী স্ত্রীর পক্ষে একত্র বাস করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। বাৎসরিক ৬০০ পাউণ্ড লইয়া জ্যেষ্ঠ পুত্র সমভিব্যাহারে মিসেস্ ডিকেন্স্ স্বতন্ত্র বাস করিতে লাগিলেন এবং ঔপন্যাসিক অবশিষ্ট পুত্রকন্যা লইয়া শ্যালিকার পরিচর্য্যায় গ্রন্থ লিখিয়া অমরত্ব লাভ করিতে কৃতচেষ্ট হইলেন।

সুপণ্ডিত জনসন্ সর্ব্বদা যুবতী পরিবৃত হইয়া থাকিতে ভালবাসিতেন। তিনি তাঁহার হৃদয়-সিংহাসন শূন্য রাখিতেন না। সতের বৎসর বয়স হইতেই অভিধান-প্রণেতা মন্মথ-মন্দিরে অর্ঘ্য প্রদান করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। জনসন্ সর্ব্বত্রই সুন্দরীদের প্রশংসা পাইতেন। তিনি নাট্যশালায় যাইলে নাকি অভিনেতৃবৃন্দের মধ্যে একটা হুড়াহুড়ি পড়িয়া যাইত। তাঁহার জীবন-বৃত্তান্ত, লেখক বস্ওয়েল তাঁহার অনেক গল্প লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমরা মাত্র একটি গল্পের উল্লেখ করিব। একবার একটি বিবাহিতা রমণী তাঁহার ক্রোড়ে বসিয়া

পাঁচজনের প্ররোচনায় পণ্ডিত জনসনের গলা জড়াইয়া তাঁহাকে চুম্বন করিয়াছিলেন। জনসন্ তাঁহাকে চুম্বন করিয়া বলিয়াছিলেন—"আবার কর। দেখি উভয়ের মধ্যে কে প্রথমে ক্লান্ত হইয়া পড়ে।"

তাঁহার স্ত্রীর সহিত তাঁহার কলহ হইত আবার সম্প্রীতি হইত। সুখের মধ্যে তাঁহাদের ছাড়াছাড়ি হয় নাই।

প্রসিদ্ধ ইংরাজ লেখক কার্লাইল তাঁহার ছাত্রী মিস্ ওয়েলসকে বিবাহ করিয়াছিলেন। মিস্ ওয়েলস্ প্রথমে তাঁহার প্রথম শিক্ষক ইরভিঙকে ভালবাসিয়াছিলেন, কার্লাইলও প্রথমে অপর যুবতীকে ভালবাসিয়াছিলেন। কাজেই উভয়ে ফাটা হৃদয় লইয়া পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহাদের গৃহে আদৌ সুখ ছিল না। কার্লাইল দিবারাত্র লেখাপড়ায় সময় কাটাইতেন, স্ত্রীকে যত্ন করিতে সময় পাইতেন না। তিনি যখন লিখিতেন, তখন তাঁহার ভার্য্যা গৃহে প্রবেশ করিলে তিনি বিরক্ত হইতেন। একবার তিনি নিবিষ্টচিত্তে "ফ্রেডেরিক দি গ্রেট্" নামক প্রসিদ্ধ পুস্তক প্রণয়ন করিতেছিলেন। তাঁহার স্ত্রী ধীরে ধীরে আসিয়া সেই গৃহে বসিয়া সীবনকার্য্য করিতেছিলেন। লেখক বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"আঃ কি ভীষণ শব্দ করিতেছ?" তিনি স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে কার্লাইল বলিলেন—"আঃ জেন্! তোমার নিশ্বাসের শব্দ শুনা যাইতেছে।" তিনি ধীরে ধীরে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্তা হইলেন। তাই তিনি একবার বলিয়াছিলেন—"কোনও স্ত্রীলোক যেন সাহিত্যিককে বিবাহ না করে।"

কিন্তু স্ত্রীকে যত্ন করিবার সময় না পাইলেও কার্লাইলের প্রাণে প্রেম ছিল। তিনি স্ত্রীকে ভালবাসিতেন। লেডী এস্‌বারটনের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেন বলিয়া তাঁহার স্ত্রী ঈর্ষাপরবশ হইয়া একবার তাঁহার সহিত কলহ করিয়াছিলেন, পরে কিন্তু উভয়ের মধ্যে খুব সদ্ভাব জন্মিয়াছিল।

আমরা এই প্রবন্ধে অনেক ইংরাজ সাহিত্যসেবীর প্রণয়-কাহিনী বিবৃত করিয়াছি। অনেকের রচনায় উচ্চ প্রেমের আদর্শ বর্ণিত হইলেও তাঁহাদের চরিত্রে সুনীতির বিষম অভাব ছিল। বলা বাহুল্য, তাঁহাদের কথিত নীতি নিজ নিজ চরিত্রের দ্বারা পরিস্ফুট হইলে তাঁহাদের শিক্ষা আরও ফলবতী হইত।

নৃত্য গীত।

[লেখক—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দে।]

নৃত্য ও গীত চৌষট্টি কলার অন্তর্গত। সেই চৌষট্টি কলা অতি উচ্চ অঙ্গের বিদ্যা। যাঁহারা নৃত্য গীতের সহিত কোনরূপ সম্বন্ধ রাখেন না, তাঁহারা ইহার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবেন না। তাঁহারা সাধারণতঃ মনে করেন যে, যাহারা নৃত্যাদি বিদ্যার চর্চ্চা করে এবং যাহারা তাহা উপভোগ করে তাহারাও বৃথায় সময় নষ্ট করে। তবে কোনও কোনও স্থলে নৃত্য-গীতের অভিনয়-দর্শন বা শ্রবণ বিড়ম্বনা স্বরূপ হইয়া থাকে। নৃত্যগীতাদি বিদ্যার প্রধান কার্য্য—শ্রোতা ও দর্শকদিগকে অভিনয়ের সহিত একীভূত করা, কিন্তু যে অভিনয়-দ্বারা তাহা হয় না তাহা উপভোগ করা বিড়ম্বনা। গায়ক গায়িকা বা নর্ত্তক নর্ত্তকী কিম্বা বাদ্যকর যদি আপন আপন কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের চিত্তবিনোদন করিতে না পারে তাহা হইলে তাহাদিগের অভিনয় পণ্ডশ্রম মাত্র। যে অভিনেতা স্বীয় অভিনয় মধ্যে নিমজ্জিত হইতে পারে না,—যে অভিনেতা অভিনয়ের ভাবে নিজে মুগ্ধ হইতে পারে না,—সে কখনও অপরকে মুগ্ধ করিতে পারে না। এ স্থলে ভাবের ভেদ লইয়া কথা নহে, কারণ ভাব সু হউক বা কু হউক, তাহাতে কিছু আসে যায় না। চিত্রকর যখন চিত্রাঙ্কনে প্রবৃত্ত হয় তখন সে মনে মনে একটা আদর্শ গড়িয়া লয়, সেই কল্পিত আদর্শের মধ্যে ডুবিয়া যায়, তাহার চিত্তপটে তাহা অঙ্কিত হইয়া যায়, ক্রমে সেই চিত্তপটের ছবি তুলিকা সাহায্যে পটে প্রতিফলিত হয়। যে চিত্রকর স্বীয় চিত্তপটে সঙ্কল্পিত চিত্র অঙ্কিত করিতে অপারগ হয়, সে কখনই তুলিকা-অঙ্কিত চিত্র দ্বারা অপরকে মুগ্ধ করিতে পারে না। চিত্র দেখিলেই চিত্রকরের কল্পনা-কৌশল বুঝিতে পারা যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কেবল চিত্রকরের উল্লেখ করা গেল, কিন্তু সকল প্রকার কথা সম্বন্ধে সেই কথা সমভাবে প্রযোজ্য। শিল্পীর শিল্পকৌশল কার্য্যে প্রতিফলিত হইয়া থাকে। কবি স্বরচিত কাব্যের ছত্রে ছত্রে যদি পাঠক বা শ্রোতাকে টানিয়া লইয়া যাইতে না পারেন; শিল্পমাধুর্য্যে যদি লোকের চিত্ত হরণ করিতে না পারেন, তাহা হইলে তাঁহার কাব্য কেবল শব্দবিন্যাস মাত্র। কাব্যের অলঙ্কার শব্দবিন্যাস বটে,

কিন্তু কেবল শব্দবিন্যাসই কাব্য নহে। কাব্যের মূল—ভাব, শব্দ তাহার বিকাশ পথ বা প্রতিধ্বনি মাত্র। ভাবকে সুললিত ভাবে—পটে হউক বা শব্দে হউক—বিবৃত করিতে পারিলেই সুকবি হওয়া যায়। এই হিসাবে কবি ও চিত্রকর একই শ্রেণীর শিল্পী।

যে গায়ক বা গায়িকা গীত দ্বারা শ্রোতার মর্ম্মস্পর্শ করিতে না পারে, শ্রোতার হৃদয়ে সঙ্গীতের ভাব প্রস্ফুটিত করিতে না পারে, শ্রোতাকে ক্ষণিকের জন্যও আত্মাধিকারে আনিতে না পারে, তাহার পরিশ্রম পণ্ড হয়।

সঙ্গীত শাস্ত্রকে ঐতিহাসিক বিভাগের অঙ্গবিশেষ রূপে পরিগণিত করিলে অসঙ্গত হয় না। ভক্তচূড়ামণি রামপ্রসাদ কবে বাঙ্গালা দেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন তাহা অনেকেই অবগত নহেন কিন্তু তৎপ্রণীত গীতগুলি আজও হাটে বাটে, মাঠে ঘাটে, বারোয়ারিতলায় বৈঠকখানায়, দেবমন্দিরে, শুণ্ডিকালয়ে, ভক্তের গৃহে, বারবিলাসিনীর বিলাসাগারে, গীত হইতেছে—এবং সেই গান শুনিয়াই তৎপরবর্ত্তী বংশধরগণ তাঁহার বিষয় জানিতেছে, তৎ সময়ের ভাব ও ভাষা হৃদয়ঙ্গম করিতেছে, ইহা বড় কম লাভের কথা নহে। এমন ত লক্ষ লক্ষ, কোটী কোটী মানব জন্ম গ্রহণ করিতেছে, এবং কাল পূরণ করিয়া মহাকালের বিরাট সাগরে ভাসিয়া যাইতেছে, কিন্তু কে তাহাদিগের সংবাদ রাখে? কথায় হউক বা বিদ্যায় হউক—যে এ সংসারে কিছু রাখিয়া যাইতে পারে, তাহার নাম,—বিষয়ের বিশেষত্ব ও গুরুত্ব অনুসারে,—অল্প বা অধিককাল স্থায়ী হইয়া থাকে। রামপ্রসাদ যত বড়ই ভক্ত হইয়া থাকুন তাহাতে বিশ্ব মানবের কিছু আসিয়া যায় না, তবে তিনি যে ভক্তির স্রোত ঢালিয়া গিয়াছেন তাহাই তৎকৃত গীত দ্বারা প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ মুখে ধ্বনিত হইয়া পরবর্ত্তী বংশধরদিগকে অতীতের অনেক কথা বলিয়া দিতেছে, প্রণেতার মর্ম্ম কথা, ধর্ম্মভাব প্রভৃতি দ্বারা সকলকে অনুপ্রাণিত করিতেছে। রামপ্রসাদের গীত না থাকিলে আজ কে তাঁহার নাম জানিত? কবিকুলতিলক ভারতচন্দ্র যে অন্নদামঙ্গল, ও বিদ্যাসুন্দর রচনা করিয়া গিয়াছেন,তাহা পৃথিবীর কাব্য-সাহিত্যে উচ্চ আসন পাইবার যোগ্য। এক্ষণে ভারতচন্দ্র বা তাঁহার সমসাময়িক কেহই নাই,কিন্তু সেই ভারতচন্দ্রের কাব্য পাঠ করিলে আমরা তৎসাময়িক ঐতিহাসিক, সামাজিক, নৈতিক, রাজনীতিক অনেক বিষয়ের অনেক কথা অবগত হইতে পারি। ভারতচন্দ্রের কাব্য একদিকে যেমন উৎকৃষ্ট পান্তুয়া বা লেডিকেনির ন্যায় দানায় দানায় রসভরা,অন্যদিকে তেমনি ললিত ও সরল শব্দরূপ দানাগুলিও মধুর—মোলায়েম। এইজন্য ভারতচন্দ্রের

কাব্য কবিতা গান হাটে বাজারে, সর্ব্বত্র সমানভাবে আদৃত। গ্রাম্য কৃষক বালকের মুখেও ২।৫টী ভারতের গান ছড়া শুনিতে পাইবে, কিন্তু আধুনিক মহা মহা কাব্যরথীদিগের কয়টা গান বা ছড়া তেমন আদর পাইয়াছে ?

নৃত্য—অপূর্ব্ব সামগ্রী, মানব জাতির অমূল্য সম্পত্তি। সভ্য সমাজের ন্যায় বর্ব্বর জাতিদিগেরও নৃত্য আছে, তাহার মধ্যে যে মাধুর্য্য আছে, আধুনিক চাঁচা-ছোলা ও 'কায়দা-কারণ'-সমন্বিত নৃত্যে তাহা নিতান্ত বিরল। আজ কালের রঙ্গালয়ে অনেক রকমের নৃত্য প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে সাঁওতাল, ভীল, মেথর প্রভৃতি হীন জাতিদিগের নৃত্যও স্থান পাইয়াছে, কিন্তু শেষোক্ত নৃত্যে যে মাধুর্য্য আছে, যে পারিপাট্য আছে, যে স্ফূর্ত্তি আছে, আধুনিক নৃত্যে তাহা নাই। সন্ধ্যাকালেই ধাঙ্গড় মেথরদিগের নৃত্য গীতের সময়। ইহারা পুরুষ ও রমণী একত্র হইয়া নৃত্য গীত করে। যখনই সেই নৃত্য গীত দেখিয়াছি, তখন বাস্তবিকই আমি অতুল আনন্দ উপভোগ করিয়া আসিয়াছি। আমি যে কৌতূহল পরিতৃপ্তির জন্য পথশ্রম করিয়া রাত্রিকালে তথায় যাইতাম তাহা নহে, সে নৃত্য গীতে কেমন একটা গ্রাম্য কাব্য পাইতাম তাহা বিবৃত করিতে আমি অক্ষম। বাপ মা, ভাই বোন, ঝি বৌ—সকলে একত্র এক আসনে স্বাধীন ভাবে নৃত্য গীত করিতেছে। এই পবিত্র গ্রাম্য-মঞ্চে অপবিত্র ভাব একেবারেই আসিতে পারে না। কলুষিত চিত্ত লইয়া সে স্থানে গেলে পারিপার্শ্বিকতার গুণে তাহার সে ভাব ক্ষণেকের নিমিত্তও তিরোহিত হয়। নৃত্যকালে ইহাদিগের হাব-ভাব, অঙ্গ পরিচালনা অতি পরিপাটী। বলা বাহুল্য, ইহাদিগের মধ্যে 'অপেরা-মাষ্টার', নাই, ইহারা দেখে আর শেখে।

ইদানীং কবি, যাত্রা, পাঁচালী প্রভৃতি গ্রাম্য আমোদ-প্রমোদ আর বড় দেখা যায় না। উল্লিখিত আমোদের ভিতর দিয়া লোকশিক্ষার কত সহায়তা হইত তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। কথকতাও সেই আমোদের অন্তর্ভুক্ত। প্রাচীন কাল হইতে এই সকল অনুষ্ঠান চলিয়া আসায় তাৎকালিক অনেক বিষয় অবগত হইবার আমরা সুবিধা পাই, অথচ এই সকল বিষয় পুস্তকাদি পাঠ করিয়া প্রায় কেহ অভিজ্ঞতা লাভ করে না। পূর্ব্বকালের কবি, যাত্রা, পাঁচালী না থাকিলে লোকশিক্ষার এত সহায়তা হইত না। যাত্রা, পাঁচালী যেরূপ সঙ্গীতকলার অন্তর্গত, কথকতাও সেইরূপ তাহার সহিত অনুস্যূত। এইগুলির দ্বারা লোকশিক্ষার প্রচার যত শীঘ্র, যত সহজ, যত অধিক হইতে পারে, এরূপ আর কিছুতেই হয় না।

আমরা জাতীয় আমোদ প্রমোদ নৃত্য গীতাদি বর্জ্জন করিয়া দিন দিন নীরস ভাবাপন্ন বা prcsaic হইয়া পড়িতেছি, ইহা জাতীয়তার পক্ষে শুভকর নহে, উপরন্তু সেরূপ রসহীন, কাব্যহীন জীবনও দীর্ঘ হয় না। যাহারা এরূপ জীবন বহন করে, তাহারা কথনও প্রফুল্লচিত্ত হইতে পারে না।

সবুজ চক্ষু।

[লেখক—শ্রীঅনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল।]

(১)

"মৃগটা আহত হয়েছে,—এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। পর্ব্বতপাত্রস্থ বৃক্ষপত্রে রক্তের দাগ লেগে আছে। বনপথে লাফাতে লাফাতে ইহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অবসন্ন হয়ে পড়েছে। যুবরাজ অল্প বয়সেই শিকার-কৌশলে দক্ষ হয়ে উঠেছেন, দেখছি। অপরে বহু বৎসর মৃগয়ায় রত থাকিয়াও এত স্থিরলক্ষ্য হতে পারে না। চল্লিশ বৎসর আমি এই পাহাড়ে শিকার করে বেড়াচ্ছি, কিন্তু এরূপ অব্যর্থ লক্ষ্য আমি আর কখনও দেখি নাই। কিন্তু সাবধান, হরিণটাকে ঐ সবুজবর্ণ শালগাছের পাশ দিয়ে যেতে দিও না। খুব জোরে শিঙ্গা বাজাও; ঘোঁড়াদের গায়ে জুতার ঠোক্কর দিয়ে উহাদিগকে উত্তেজিত কর। দেখতে পাচ্ছ না, হরিণটা শালবৃক্ষ বেষ্টিত ঝরণার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। ওখানে যাবার আগেই ওকে ধরতে হবে, তা না' হ'লে আমাদের সকল আশাই নির্ম্মূল হবে।"

রাজার প্রধান শিকারীর এই আদেশ শুনিয়া, অধীনস্থ শিকারীগণ নবোৎসাহে মৃগের পশ্চাদ্ধাবন করিতে লাগিল। শিঙ্গার শব্দে, শিকারী কুকুরের চীৎকারে, অশ্বের পদধ্বনিতে পর্ব্বতগুহা প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

তাহাদের সমস্ত চেষ্টাই বিফল হইল। দ্রুতগামী কুকুরেরা শালকুঞ্জের নিকট আসিয়া দেখিল, পরিশ্রান্ত মৃগ ইতিমধ্যেই তীরবেগে দৌড়াইয়া গিয়া নির্ঝর পার্শ্বস্থ বন্যপথের সীমাস্থিত কুঞ্জবনের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে।

প্রধান শিকারী চীৎকার করিয়া উঠিল,—"তোমরা সবাই থাম, আর অগ্রসর হইও না। দেখ্‌ছি ভগবানের ইচ্ছা নয় যে, আমরা মৃগটাকে বধ করি।"

শিকারীরা থামিয়া গেল। শিঙ্গাধ্বনি নীরব হইল। কুকুরেরাও আদিষ্ট হইয়া অনিচ্ছায় ফিরিয়া আসিল।

এমন সময় যুবরাজ অশ্বারোহণে আসিয়া তাহাদের সহিত মিলিত হইলেন। তিনি রাগান্বিত ভাবে প্রধান শিকারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি হয়েছে? সব চুপ করে দাঁড়িয়ে কেন?" তাঁহার মুখে ক্রোধের চিহ্ন সম্যক পরিস্ফুট। তাঁহার চক্ষুদিয়া অগ্নিকণা নির্গত হইতেছে। "একি, তোমরা কচ্ছ কি? দেখতে পাচ্ছ না প্রাণীটা আহত হয়েছে। এই প্রথম প্রাণী আমার শরে আহত হলো, আর তোমরা তার অনুসরণ না করে দাঁড়িয়ে রয়েছ! মৃগশিশু বনের ভিতর গিয়ে মরে থাকবে, এ বুদ্ধি তোমাদের মাথায় যোগাল না? তোমাদের জানা উচিত যে, আমি হরিণ শিকার করতে এসেছি, বাঘ ভালুককে মৃত হরিণ খাওয়াতে আসি নাই।"

"যুবরাজ!" প্রধান শিকারী বিড় বিড় করিয়া বলিল "ইহার পশ্চাদ্ধাবন করা এখন অসম্ভব।"

"অসম্ভব! কেন?"

"এই বনপথ এক ঝরণার পাশে গিয়ে পড়েছে। সেই ঝরণার জলের ভিতর এক রাক্ষসী বাস করে। মৃগটা নিশ্চয়ই এতক্ষণে সেই ঝরণার পাশে গিয়ে পৌঁছেছে; সেখান পর্য্যন্ত তার পশ্চাদ্ধাবন করলে আপনার বিপদ নিশ্চিত।"

"তা বলে মৃগটাকে ছেড়ে দেব! কথনই না। বরং পৈতৃক রাজত্বও ত্যাগ করতে পারি, কিন্তু আজ শিকারের প্রথম দিন যে জন্তু আমার শরে আহত হয়েছে তা'কে কিছুতেই ছাড়তে পারিনা। ঐ দেখতে পাচ্ছ? মাঝে মাঝে এখান থেকে মৃগটাকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে! ওর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শিথিল হয়ে পড়েছে। আর দৌড়তে পারছে না। যাই; আমার অশ্বের রাশ ছেড়ে দাও। আমাকে বাধা দিলে, তোমাকে মাটিতে ফেলে তার উপর ঘোঁড়া চালিয়ে চলে যাব। হয় ত বা ও নির্ঝরের পাশে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই আমি ওর নাগাল ধরতে পারব। আর যদিই বা এর মধ্যে সে ঝরণার কাছে গিয়ে পৌঁছিয়ে থাকে, তাহলেই বা ভয় কি?" পরে তাঁহার অশ্বকে উত্তেজিত করিয়া বলিলেন, "জোর চল্, আমাকে ওর কাছে শীঘ্র নিয়ে যেতে পারলে তোর গলায় আমি হীরার হার পরিয়ে দিব।"

যুবরাজ অশ্বারোহণে ঝড়ের ন্যায় বেগে চলিয়া গেলেন।

যতক্ষণ দেখা গেল প্রধান শিকারী যুবরাজের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। পরে যুবরাজ ঝোপের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেলে, সে তাহার চতুষ্পার্শ্বে একবার তাকাইল। তাহার ন্যায় পার্শ্বস্থ সকলেই নীরব নিশ্চল ও বিস্ময়াভিভূত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

সে তাহাদের দিকে ফিরিয়া বলিল "ব্যাপার সবাই তোমরা দেখলে। আমি যুবরাজকে অগ্রসর হতে যথাসাধ্য বাধা দিয়েছি, শেষে আমাকে প্রাণনাশের ভয় দেখিয়ে চলে গেলেন। আমার কর্ত্তব্য আমি করেছি। অসম সাহসী হলেও সে রাক্ষসীকে দমন করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। শিকারী তীরধনু লয়ে এই পর্য্যন্ত আসতে পারে, কিন্তু কেবল যারা ভূতের মন্ত্র জানে, তারাই ঝরণার মুখে নির্ব্বিঘ্নে অগ্রসর হতে সমর্থ হয়।"

(২)

"আপনাকে বড়ই বিমর্ষ দেখাচ্ছে। দিন রাতই মৌন হয়ে বসে আছেন। আপনার কি হলো? যেদিন থেকে আপনি সেই আহত হরিণের অনুসরণে ঝরণার নিকট গিয়াছিলেন, সেই দিন থেকেই আপনার মনের ভাব একেবারে বদলে গেছে। মনে হয় কোন রাক্ষসী আপনাকে মায়ার দ্বারা মুগ্ধ করেছে। আপনি আর শিকারী কুকুরদের সঙ্গে নিয়ে পাহাড়ে মৃগয়ায় যান না; আপনার শিঙ্গাধ্বনি আর গিরিগহ্বরে প্রতিধ্বনিত হয় না। প্রত্যহ প্রাতঃকালে তীরধনু লয়ে আপনি একাকী যাত্রা করেন, শালকুঞ্জের মধ্যে নির্জ্জনে বসিয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সেখানে গভীর চিন্তায় মগ্ন থাকেন। সন্ধ্যার তিমির-পুঞ্জে ধরাতল আচ্ছন্ন হলেই,আপনি বিষণ্ন মুখে ধীর পদবিক্ষেপে প্রাসাদে ফিরে আসেন; আমি কত আশা করে বসে থাকি, আপনি হয় ত শিকারলব্ধ জন্তু সঙ্গে করে আনবেন, কিন্তু আমার সব আশাই নিষ্ফল হয়। কেনই বা আপনি প্রিয়জনদের নিকট হইতে দূরে থাকিয়া একাকী সময় অতিবাহিত করেন, বুঝতে পারি না।"

প্রধান শিকারী যুবরাজকে সম্বোধন করিয়া এই কথাগুলি বলিল।

যুবরাজ গভীর চিন্তামগ্ন হইয়া পার্শ্বস্থ একটি চারাগাছের ডাল ছোরা দিয়া কাটিতেছিলেন। এই কথায় আদৌ কর্ণপাত করিলেন না। চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার পর যুবরাজ প্রধান শিকারীর প্রতি মুখ ফিরাইয়া এরূপ ভাবে কথা বলিলেন, যেন তিনি তাঁহার পূর্ব্ব কথিত কথার একটি বর্ণও শুনেন নাই।

"—তুমি ত বৃদ্ধ হয়েছ, এই পাহাড়ের সমস্ত গহ্বরই তোমার পরিচিত। এই পাহাড়ের পাদদেশে বন্যজন্তুর শিকারে বহুকাল অতিবাহিত করেছ। বলতে পার, কখন কি এই পাহাড়ের অধিবাসিনী এক রমণীকে দেখেছ?"

"রমণী!"—প্রধান শিকারী বিস্মিত ও স্থিরদৃষ্টিতে প্রভুর প্রতি তাকাইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল।

"হাঁ, রমণী! এক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটেছে—মনে করেছিলাম এ ব্যাপার চির-কালের জন্যই গুপ্ত রাখিব, কিন্তু এখন দেখছি তা অসম্ভব। আমার অন্তঃকরণের মধ্যে দিনরাত দাউ দাউ আগুন জ্বলছে। মুখের ভাবও সম্পূর্ণ বিকৃত হয়ে গেছে। তোমাকে সব ঘটনা খুলে বলি, শোন। তুমি চেষ্টা করিলে রহস্য উদ্ঘাটনে আমাকে সাহায্য করতে পার। তাহাকে আর কেহ চক্ষে দেখিয়াছে কি না, তাহার সম্বন্ধে কোন সংবাদ দিতে পারিবে কি না সন্দেহ।"

প্রধান শিকারী গম্ভীর বদনে যুবরাজের নিকট সরিয়া বসিল। যুবরাজ আবার বলিতে লাগিলেন,—"যেদিন তোমার কথা না শুনে নির্ঝর পর্য্যন্ত আমি সেই মৃগের অনুসরণ করেছিলাম, সেই দিন হইতে সর্ব্বদাই আমার নির্জ্জনে থাকতে বড় ইচ্ছা হয়।

সে স্থানটি বোধ হয় তোমার পরিচিত নহে। একবার কল্পনানেত্রে ভাব, নির্ঝরটি পাহাড়ের এক গহ্বরের মধ্যে অবস্থিত। বিন্দু বিন্দু জল সেই নির্ঝরের চতুষ্পার্শ্বস্থ চারাগাছের পাতাগুলিকে ভাসাইয়া-সমতল তৃণভূমির উপর পড়িতেছে। পরে স্বর্বর্ণময় গোলকের আকার ধারণ করে সুমিষ্ট তানে বহিয়া যাইতেছে। সে ধ্বনি, ফোটাফুলের উপর বসিতে উদ্যত মৌমাছির গুণ গুণ স্বরের ন্যায় শ্রুতিমধুর জলবিন্দুগুলি একত্র হইয়া সঙ্কীর্ণ স্রোতের আকারে বালুকারাশির উপর দিয়া বহিয়া চলিতেছে। এই স্রোত হাসিতে হাসিতে গান গাহিতে গাহিতে নানা বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া নাচিয়া নাচিয়া চলিয়াছে। শেষে এক পাহাড়ের গহ্বর মধ্যস্থ হ্রদে গিয়া পড়িয়াছে। সেই পাহাড় গাত্রে বসিয়া ব্যথিত অন্তঃ-করণে আমি জলের মৃদুধ্বনি শুনি। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, সান্ধ্যসমীরণ প্রবাহেও ঐ হ্রদের জল বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় না।

সে স্থানের সর্ব্বত্রই গম্ভীরতা বিরাজমান। নির্জ্জনতা তাহার সহস্র সহস্র অবোধগম্য শব্দ লইয়া সেই স্থানের উপর আধিপত্য করিতেছে। এ দৃশ্যে দর্শকের মনে গভীর বিষাদের সঞ্চার হয়। মনে হয় যেন, শালবৃক্ষের পত্রছায়া পাহাড়ের অন্ধকারময় গহ্বর, ও হ্রদের জল হইতে প্রকৃতি দেবীর অশরীরী আত্মা আমাদের সঙ্গে কথা কহিতেছে।

প্রত্যুষে যখন দেখ, ধনু লইয়া নির্ঝরের দিকে যাত্রা করি, মনে ক'র না, শিকারের অন্বেষণে বাহির হই। না, আমি হ্রদের তীরে গিয়ে বসে জলের দিকে তাকিয়ে থাকি। কেন থাকি শুনতে চাও? তা কিন্তু ঠিক জানি না। বোধ হয় এ একটা পাগলামি। প্রথম যে দিন অশ্বারোহণে সেখানে উপস্থিত

হয়েছিলাম, হ্রদের গভীর জলের মধ্যে এক আশ্চর্য্য জিনিষ দেখেছিলাম বলিয়া মনে হয়—স্ত্রীলোকের দুটি চক্ষু।

হয়ত দেখতে ভুল হয়ে থাকবে; সে চক্ষু নয়, সূর্য্যের রশ্মি জলের ভিতর প্রবেশ করেছিল। কিংবা হয়ত যে সব ফুল জলেই ফুটিয়া জলের মধ্যে ভাসিতে থাকে, যাদের পুষ্পকোষ মরকতের ন্যায় উজ্জ্বল, সেই দুটা ফুল। তা ঠিক করে বলতে পারি না। যাই হোক না কেন, আমার মনে হল, যেন সে চক্ষুদ্বয়ের দৃষ্টি আমার মুখের উপর নিবদ্ধ। সেই দৃষ্টিই আমার মনের মধ্যে এক প্রবল ইচ্ছা জাগিয়ে তুলেছে; সেই চক্ষুর ন্যায় যার চক্ষু এমন স্ত্রীলোকের সাক্ষাৎ লাভ করতে আমি বড়ই উদ্গ্রীব হয়ে পড়েছি। যদিও মনে বেশ বুঝতে পারছি যে, সে ইচ্ছা জীবনে কখনও পূর্ণ হবে না।

এই অভিলাষ পূরণ করবার মানসে আমি প্রত্যহই সেই জায়গায় গিয়ে থাকি।

শেষে একদিন সন্ধ্যায়,—আমার মনে হলো যেন স্বপ্ন দেখছি, কিন্তু তা য় সত্য ঘটনা—এখন তোমার সঙ্গে যেমন কথা কচ্ছি, তার সঙ্গে ঠিক তেমনি াবে কথা কয়েছিলাম—দেখিলাম হ্রদের তীরে এক অনিন্দ্যসুন্দরী বালিকা বসে য়েছে। তার পরিধানের নীল সাড়ির অঞ্চল হ্রদের জলের উপর পড়ে ভাসছে। ার কেশরাশি সোণালী রংয়ের; তার চোখের লোমগুলি অগ্নিকণার মত জ্বল- ছল; ভিতর হইতেই সেই চঞ্চল চক্ষু দু'টি ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল। মণীর সেই চক্ষুদ্বয় সদাই আমার মানস-নেত্রে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। সে চাখের রং বর্ণনাতীত, চোখদুটি দেখতে—"

প্রধান শিকারী ভয়ে আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "বোধ হয় বুজ বর্ণের।"

তাঁহার মনের কথা পূর্ব্বেই ইহাঁকে বলিতে শুনিয়া যুবরাজ বিস্মিত ইলেন। উদ্বেগ ও আনন্দ মিশ্রিত কণ্ঠে তিনি বলিলেন,—"তবে তুমি কি া'কে চেন?"

"না, না, ভগবান, করুন, তাকে যেন কখন চিনতে না হয়। আমার পিতা ামাকে হ্রদের কাছে যেতে নিষেধ করবার সময় অনেক বার বলেছিলেন যে, জলের মধ্যে যে প্রেতাত্মা, ভূত, সয়তান বা স্ত্রীলোক বাস করে, তার চখের ঃ ঠিক ঐ রকম। পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা আপনার যা প্রিয়, তা'র শপথ করে নুরোধ করছি, আর সেই তালবৃক্ষ বেষ্টিত নির্ঝরের নিকট যাবেন না।

একদিন না একদিন, আপনাকে সেই রাক্ষসীর বিদ্বেষের পাত্র হতে হবে এবং সে স্থানের শান্তিভঙ্গ করার অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হতে হবে।"

যুবরাজ দুঃখের হাসি হাসিয়া বলিলেন,—"পৃথিবীতে সব চেয়ে যা বেশী ভালবাসি, তার দিব্যি দিচ্ছ!"

"হাঁ, আপনার পূর্ব্বপুরুষগণের, আপনার পিতামাতার, আপনার এই দাসের,—যে আপনাকে ভূমিষ্ঠ হতে দেখেছে,—এই সবার দিব্য—"

"তুমি কি জান, এখন আমি পৃথিবীতে সব চেয়ে কি বেশী ভালবাসি? তুমি কি জান, কিসের জন্য আমি পিতার ভালবাসা, জীবনদায়িনী জননীর অগাধ স্নেহ, আমাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক শতশত রমণীর আদর যত্ন সব ত্যাগ করতে পারি? কেবল মাত্র সেই চক্ষুদ্বয়ের একটি দৃষ্টির বিনিময়ে। আমি কেমন করে প্রতিজ্ঞা করি যে সেই চক্ষুদ্বয়ের অন্বেষণ হতে বিরত থাকবো, বল?"

যুবরাজ এরূপ করুণ ভাবে কথাগুলি বলিলেন যে তাহা শুনিয়া প্রধান শিকারীর চক্ষু দিয়া বড় বড় অশ্রুবিন্দু বহিয়া পড়িতে লাগিল। সে দুঃখ বিগলিত কণ্ঠে কেবল বলিল,—"ভগবানের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্!"

(৩)

"তুমি কে? তোমার বাসভবন কোথায়? প্রত্যহই আমি তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য এখানে আসি, কিন্তু তুমি কখন আস বা যাও, কিছুই বুঝতে পারি না। রাত্রির নিবিড় অন্ধকারের ন্যায় যে রহস্যময় আবরণে তুমি আচ্ছন্ন রয়েছ, সে আবরণ ক্ষণেকের জন্য মোচন কর। আমি তোমাকে যথার্থই ভালবাসি, প্রাণভরে ভালবাসি। তুমি সৎ হও, অসৎ হও, দেবী হও, সয়তান হও, আমি চিরকাল তোমারই প্রেমপাশে আবদ্ধ থাকব।"

সূর্য্য পর্ব্বত-শৃঙ্গের পশ্চাতে ডুবিয়া গিয়াছে। সন্ধ্যার নিবিড় অন্ধকার রাশি দ্রুত পদবিক্ষেপে পাহাড়ের গাত্র ও তলদেশকে আচ্ছন্ন করিতে উদ্যত! নির্ঝরের পার্শ্বস্থিত বৃক্ষশ্রেণীর পত্রাবলীর মধ্যে সান্ধ্য-সমীরণ গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছে। ঘন তিমির রাশি হ্রদবক্ষ হইতে ধীরে ধীরে চোরের ন্যায় উত্থিত হইয়া তীরস্থ ভূমিখণ্ডকে আচ্ছন্ন করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

যুবরাজ এক পতনোন্মুখ প্রস্তরখণ্ডের উপর দাঁড়াইয়া। তাঁহার প্রতিবিম্ব হ্রদবক্ষে প্রতিফলিত হইয়াছে। তিনি সেই অনন্ত রহস্যময়ী প্রিয়তমা রমণীর চরণতলে হাঁটুগাড়িয়া বসিয়া তাহার অলৌকিক জীবনী-কথা জানিবার জন্য বপ তাহাকে প্রশ্ন করিতেছেন।

রমণী সুন্দরী—সুন্দরী ও মলিনা, যেন প্রস্তর নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি। তাহার একরাশি চুল স্কন্ধে পড়িয়া বস্ত্রাবরণের ভাঁজের মধ্যে কুণ্ডল পাকাইয়া গড়াইয়া বেড়াইতেছে। দেখিলে মনে হয় যেন সূর্য্যরশ্মি নিবিড় মেঘমালার মধ্যে তাহার পথ অন্বেষণ করিয়া লইতেছে। তাহার উজ্জ্বল নয়নের নিম্নভাগ স্বর্ণময়, মরকতের ন্যায় চক্ষুদ্বয় জ্বল জ্বল করিতেছে।

যুবরাজ থামিলে, রমণী যেন কিছু বলিবার জন্য তাহার ওষ্ঠদ্বয় খুলিল। কিন্তু তাহার ওষ্ঠ হইতে কেবল এক গভীর দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া বাতাসে মিলাইয়া গেল। সে দীর্ঘশ্বাস অতীব ক্ষীণ, দুঃখব্যঞ্জক, যেন একটি ক্ষুদ্র তরঙ্গ মৃদু সমীরণে আহত হইয়া আবার জল মধ্যেই বিলীন হইয়া গেল।

যুবরাজ হতাশভাবে বলিলেন,—"তুমি উত্তর দিচ্ছ না কেন? তোমার সম্বন্ধে লোকমুখে যা শুনেছি তা' কি বিশ্বাসযোগ্য? তুমি কি আমাকে ভালবাস? সে কথা জানতে চাই। আরও জানতে চাই, তুমি মানবী না প্রেতাত্মা?"

"যদি প্রেতাত্মাই হই?"

যুবরাজ মুহূর্ত্তের জন্য ইতস্ততঃ করিলেন। তাঁহার ভ্রূযুগলের উপর শীতল স্বেদবিন্দু ঝরিতেছে। চক্ষুদ্বয় প্রসারিত ও রমণীর চক্ষুদ্বয়ের উপর নিবদ্ধ। সেই চক্ষুর দীপ্তিশীল ঔজ্জ্বল্যে মুগ্ধ হইয়া তিনি প্রবল অনুরাগ ভরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "তাহলেও আমি তোমাকে ভালবাসব। এখনও তোমাকে যেমন ভালবাসছি, তখনও তেমনি বাসবো। এ জীবনের পরপারেও তোমার প্রতি আমার ভালবাসার একটুও হ্রাস হবে না।"

"যুবরাজ!" রমণী বীণাবিনিন্দিত সুরে বলিতে লাগিল,—"আমার চেয়ে আমি তোমাকে বেশী ভালবাসি। এর প্রমাণ স্বরূপ দেখ, আমি অশরীরী আত্মা হয়েও নর-মানুষের প্রেমমুগ্ধ হয়েছি। আমি পৃথিবীর সাধারণ স্ত্রীলোকের দল-ভুক্ত নহি, কিন্তু সাধারণ মানুষ হইতে উচ্চতর যে তুমি, তোমার স্ত্রী হবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। এই হ্রদের গভীর তলদেশে আমি বাস করি; ইহারই জলের ন্যায় আমি অস্থায়ী, অশরীরী ও স্বচ্ছ। আমি জলের মৃদুতানের সহিত কথা কহি, বীচিমালা আমার ক্রীড়ার সঙ্গিনী।"

রমণীর কথা শুনিতে শুনিতে যুবরাজ তাহার অপরূপ সৌন্দর্য্য-সাগরে মগ্ন হইলেন এবং এক অবোধগম্য শক্তির দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া পাহাড়ের সীমানার দিকে একটু একটু করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

রমণী বলিতে লাগিল,—"হ্রদের ঐ স্বচ্ছ তলদেশ দেখতে পাচ্ছ? জলের

ভিতর ঐ যে বড় বড় সবুজ বর্ণ পাতাবিশিষ্ট চারাগাছ মৃদু সমীরণে এদিক ওদিক হেলছে দুলছে, দেখতে পাচ্ছ ? ঐখানে গেলে তুমি এত সুখ পাবে যে, জীবনে স্বপ্নেও কখনও তা ভাবতে পারনি। এত সুখ তুমি আর কিছুতেই পাবে না। এস ! হ্রদ হইতে উত্থিত অন্ধকার রাশি আমাদের চারদিকে ভেসে বেড়াচ্ছে, আমাদের আচ্ছন্ন করছে। তরঙ্গ সকল অবোধগম্য স্বরে—আমাদিগকে ডাকছে, সমীরণ বৃক্ষপত্রের মর্ম্মর ধ্বনিতে ভালবাসার গান গাচ্ছে, এস—এস !"

রাত্রির অন্ধকার চারিদিকে ঘনাইয়া আসিল। হ্রদবক্ষে চন্দ্রকিরণ প্রতিবিম্বিত হইল। জলাভূমিতে আলেয়ার আলোর ন্যায় রমণীর সবুজ চক্ষুদ্বয় অন্ধকারে জ্বল জ্বল জ্বলিতে লাগিল।

"এস ! এস !" এই কথাগুলি মন্ত্রের ন্যায় যুবরাজের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল।—"এস !" সেই রহস্যময়ী নারীমূর্ত্তি তাঁহাকে গহ্বরের কিনারায় ডাকিয়া আনিল। তাঁহার মনে হইল যেন রমণী শূন্যে ঝুলিতেছে। সে মুখ বাড়াইয়া যুবরাজকে চুম্বন করিতে উদ্যত হইল। যুবরাজ তাহার দিকে মাত্র এক পা অগ্রসর হইলেন,—আর এক পা। তিনি রমণীর কোমল ভুজবল্লরী তাঁহার গলদেশে বেষ্টিত রহিয়াছে অনুভব করিলেন। তাঁহার মনে হইল যেন সেই পাষাণমূর্ত্তি তাঁহার ওষ্ঠাধারে শীতল চুম্বন অঙ্কিত করিয়া দিল। তিনি ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন, সম্মুখে অগ্রসর হইলেন, পরে অস্ফুট যন্ত্রণাধ্বনি উচ্চারণ করিয়া হ্রদের গভীর জলে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন।

চঞ্চল জলরাশি উজ্জ্বল বিন্দু বিন্দু আকারে লাফাইয়া তাঁহাকে ডুবাইয়া ফেলিল। তাহাদের রৌপ্যোজ্জ্বল চক্রাকার বাড়িতে বাড়িতে শেষে তীরে লাগিয়া বিলীন হইয়া গেল।

সঙ্কীর্ত্তনে।

[লেখক—শ্রীঅবনীকুমার দে।]

সপ্তলোক মুখরিয়া লক্ষ তারে সঙ্গীতের সুর,
উথলি অমিয়া-সিন্ধু করে আজি চিত্ত ভরপুর।
পাপীয়ার মধুকণ্ঠ বনানীর স্নিগ্ধ কোণ হতে,
বরষিছে সুধাধারা তৃষাতুর এ মর জগতে।

জননী ধরিত্রী আজি শ্যাম অঙ্গে দেহ বিলেপিয়া,
সঙ্কীর্ত্তনে বিষ্ণুপ্রিয়া তালে তালে ছুটিছে নাচিয়া।
প্রেমের পশরা লয়ে আত্মহারা মুগ্ধা মন্দাকিনী,
কুলুকুলু স্বরে আজি হরিনামে ঘোর উন্মাদিনী।
আজি বিশ্বভরা ব্রজধাম শ্যামস্বপ্নে বৃন্দাবন,
হের কুঞ্জে কুঞ্জে রাধা অই যাচে শ্যাম দরশন।
আজি মিলিত মন্দিরে যত ভক্তবৃন্দ দলে দলে,
শুনিতে শ্রীকৃষ্ণ নাম প্রতি পুষ্প-পাত্র-ফলে ফলে।
আমিও তাঁ'দেরি মত প্রতীক্ষায় একা একজন,
হৃদয় দেউলে তব স্থাপিয়াছি কনক আসন।
মানসের ধূপগন্ধ অন্তরের শঙ্খ-ঘণ্টা-ধ্বনি,
প্রেমের পরাগ মাখি প্রধূমিত হইবে এখনি।
এস তাই এস কৃষ্ণ! এস মোর হে বাঞ্ছিত সখা!
ভকত-বৎসল প্রাণ দাওহে বারেক দেখা।

শঙ্করাচার্য্য।

[শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য এম্-এ]

কালের কুটিল সূক্ষ্ম　চক্র আবর্ত্তনে　কভু ধর্ম্ম যায় রসাতল।
অধর্ম্ম বিজয় ভেরী　স্বীয় ভীম স্বনে　দীর্ণ করে গগন মণ্ডল।
বিলুপ্ত বিচ্ছিন্ন করি　এই ধরাতলে　সনাতন বেদের বাঁধন।
উচ্ছৃঙ্খল নিরঙ্কুশ　করে পাপিদলে　মনসাধে পাপ-আরাধন।
পাপের চরণ ভরে　কভু নত হয়　চিরস্থির বাসুকির শির।
প্রলয় সলিল মাঝে　পায় যেন লয়　চিরধন্যা নাম অবনির।
এ হেন সঙ্কটকালে　হও আবির্ভূত　ওগো তুমি সাধনার ধন।
আবার ধরণি ধরে　নিজ বক্ষে পূত　তোমার ও রাতুল চরণ॥

সে যে বহুদিন তুমি　বুদ্ধরূপে ভবে　আবির্ভূত হ'য়ে নারায়ণ।
করুণায় সিক্ত হ'য়ে　নিখিল মানবে　করেছিলে মুক্তিপরায়ণ।
স্বরসুধা বৃষ্টি করি　বুঝাইয়া দিলে　ক্ষণস্থায়ী বিশ্ব পরিণাম।
জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালি　হরি' তুমি নিলে　মোহ যত ওগো প্রাণারাম॥

পুনঃ কালধর্ম্ম বশে অবিদ্যা নিদ্রায় আর্য্যগণ হ'ল অচেতন।
বিবেকের পূর্ণচন্দ্রে গ্রাসিল রে হায় পুনরায় কামিনীকাঞ্চন।
প্রাণে তা'র সঞ্চারিয়া হর্ষ অভিনব তৃপ্তি করি পিপাসিত হিয়া।
এলে তুমি ভগবন্ দেহ দীপ্তি তব দশ দিশি দিল উজলিয়া।
পাপের নিঃশ্বাসে তপ্ত মরুর আকার শুষ্ক প্রায় হৃদয়ে তাহার।
ঢালিয়া পীযুষ পুণ্য করিলে বিস্তার কি মহান্ প্রেম পারাবার।
নব জলধর মন্দ্র তব সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা শ্রবণে ভাসি' আসি'
জাগাইয়া দিল ওগো কোন্ অতীতের লুপ্ত আর সুপ্ত স্মৃতিরাশি?
তোমার পবিত্র ওই চরণ যুগল করিল গো স্পর্শ যেই স্থল।
ভেদিয়া কঠিন সেখা ধরণীর তল বিকশিল ফুল্ল শতদল।
তোমার কৃপায় ওগো সাধনার ধন জ্ঞানসূর্য্য উদিল আবার।
ভারত হৃদয় হ'তে দূরে পলায়ন তমোময় করে অন্ধকার।
শারদগগন প্রান্তে জলদ নির্ভয় কান্ত শুভ্র শশধর প্রায়।
আপনার পানে এবে অমৃত তনয় অনিমেষে মুগ্ধ হ'য়ে চায়।
ছিল তারা জিতেন্দ্রিয় করিল আবার ইন্দ্রিয়ের দাসত্ববরণ।
অমৃতের পথ ছাড়ি' হইল সবার মরণের চরণ শরণ।
পারিল না যাইবারে সে বস্তুর কাছে নহে যাহা চিত্তের বিষয়।
বলিতে লাগিল তারা "কা'র সত্তা আছে? নহে কি গো সব মায়াময়?
"মিথ্যা ওগো এ প্রপঞ্চ ব্রহ্ম-মিথ্যা তাও শূন্য শুধু শূন্য একাকার!
"যেয়োনা সাধন পথে ওগো ফিরে চাও ভবিষ্যৎ ঘোর অন্ধকার!
"জীবের জীবনী এই সৌদামিনী লেখা ক্ষণতরে তাহার স্ফুরণ
"পরে আর পাবে কোথা আনন্দের দেখা? কর আশা এখনি পূরণ।"
এইরূপে ধীরে ধীরে সৃজিল গো তারা তান্ত্রিকের ঘৃণ্য অভিচার।
করিতে লাগিল সবে স্বার্থে আত্মহারা যুক্তিহীন শিশুর বিচার।
সনাতন আর্য্য ধর্ম্ম সেই অত্যাচারে আর বুঝি জিয়ে নাহি রয়।
এলে তুমি ভগবন্ শঙ্কর আকারে কিছু আর কিছু নাহি ভয়।

এ ভারতভূমি ওগো আরাধ্য রতন কতদিন তন্দ্রাহীন প্রাণে।
প্রোষিত পতিকা কোন নারীর মতন চেয়েছিল তব পথপানে।